হিমুসমগ্র
১ম খন্ড
হুমায়ূন আহমেদ

- ময়ূরাক্ষী
- দরজার ওপাশে
- হিমু
- পারাপার
- এবং হিমু ...
- হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম
- হিমুর দ্বিতীয় প্রহর
- হিমুর রূপালী রাত্রি
- একজন হিমু কয়েকটি ঝিঁঝিঁপোকা
- তোমাদের এই নগরে
- চলে যায় বসন্তের দিন
- সে আসে ধীরে

একটি শুভম ক্রিয়েশন

হিমু সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

প্রকাশক: মনিরুল হক
অনন্যা
বাংলাবাজার ঢাকা ৩৮/২
প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় সংস্করণএপ্রিল ২০১০
চতুর্থ সংস্করণফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণধ্রুব এষ
আলোকচিত্রগোলাম মুস্তাফা, পলাশ খান

কম্পোজ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম আটশত টাকা
ISBN 984 412 611 8

Hirmu Samagra by Humayun Ahmed,
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Forth Edition : February 1012, Cover Designe: Dhrubo Esh
Price : 800.00 Take Only.

U.K. Distributor C. Sangeeta Limited
22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor D. Muktadhara
37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor D. Anyamela
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202
Canada Distributor D ATN Mega Store

উৎসর্গ

এ-দেশের
হিমুদের জন্য
উপহার নগণ্য।

ভূমিকা

হিমুকে নিয়ে কতগুলি বই লিখেছি নিজেও জানি না। মন মেজাজ খারাপ থাকলেই

হিমু লিখতে বসি । মন ঠিক হয়ে যায়। বেশি লেখার ফল সব সময় শুভ হয় না। আমার ক্ষেত্রেও হয় নি। অনেক জায়গাতেই ল্যাজে গোবরে করে ফেলেছি। হিমুর পাঞ্জাবির পকেট থাকে না অথচ একটা বই-এ লিখেছি সে পকেট থেকে টাকা বের করল। হিমুর মাজেদা খালা এক বই-এ হয়ে গেলো মাজেদা ফুপু। তবে হিমু যে ঠিক আছে তাতেই আমি খুশি । হিমু ঠিক আছে, হিমুর জগৎ ঠিক আছে। তার বয়স বাড়ছে না। সে বদলাচ্ছে না। এই আনন্দ সংবাদ দিয়ে ভূমিকা শেষ করছি।

সব হিমুকে বন্দি করে যে প্রকাশক বিশাল হিমু সমগ্র বের করলেন তাকে (মনিরুল হক, অনন্যা) ধন্যবাদ।

সূচিপত্র

ময়ূরাক্ষী
হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
ময়ূরাক্ষী
হুমায়ূন আহমে
SUVOM

১

এ্যাই ছেলে, এ্যাই ।

আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম। আমার মুখভরতি দাড়িগোঁফ । গায়ে চকচকে হলুদ পাঞ্জাবি। পর পর তিনটা পান খেয়েছি বলে ঠোঁট এবং দাত লাল হয়ে আছে। হাতে সিগারেট । আমাকে 'এ্যাই ছেলে' বলে ডাকার কোনোই কারণ নেই। যিনি ডাকছেন তিনি মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা । চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার সঙ্গে আমার একটি ব্যাপারে মিল আছে। তিনিও পান খাচ্ছেন। আমি বললাম, আমাকে কিছু বলছেন?

তোমার নাম কি টুটুল ?

আমি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মহিলাকে আমি আগে কখনো দেখিনি। অথচ তিনি এমন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে আমি যদি বলি – "হ্যাঁ আমার নাম টুটুল" তাহলে ছুটে এসে আমার হাত ধরবেন।

কথা বলছ না কেন? তোমার নাম কি টুটুল?

আমি একটু হাসলাম ।

হাসলাম এই আশায় যেন ধরতে পারেন আমি টুটুল না। হাসিতে খুব সহজেই মানুষকে চেনা যায়। সব মানুষ ভঙ্গিতে কাঁদে কিন্তু হাসার সময় একেক জন একেক রকম করে হাসে। আমার হাসি নিশ্চয়ই ঐ টুটুলের হাসির মতো না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ভদ্রমহিলা আমার হাসিতে আরো প্রতারিত হলেন । চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, ওমা, টুটুলই তো!

ভাবছিলাম তিনি আমার দিকে ছুটে আসবেন। তা না করে ছুটে গেলেন রাস্তার ওপাশে পার্ক-করা গাড়ির দিকে। আমি শুনলাম তিনি বলছেন, 'তোকে বলিনি ও টুটুল। তুই তো বিশ্বাস করলি না। ওর হাঁটা দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। কেমন দুলে দুলে হাঁটছে।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার এপাশে নিয়ে এল। ড্রাইভারের পাশের সিটটা খালি । ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, টুটুল, উঠে আয় । আমি উঠে পড়লাম।

বাইরে চৈত্র মাসের ঝা-ঝা রোদ। আমাকে যেতে হবে ফার্মগেট। বাসে উঠলেই মানুষের গায়ের গন্ধে আনার বমি আসে। কাজেই যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। খানিকটা লিফট পাওয়া গেলে মন্দ কী! আমি তো জোর করে গাড়িতে চেপে বসি নি! তাছাড়া

আমার চিন্তার সূতা কেটে গেল। ভদ্রমহিলার পাশে বসে থাকা মেয়েটি বলল, মা, এ টুটুল ভাই নয়।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের ভঙ্গিতে হাসলাম । যে হাসি দিয়ে মেয়ের মাকে প্রতারিত করেছিলাম, সেই হাসিতে মেয়েটিকে প্রতারিত করার চেষ্টা। মেয়ে প্রতারিত হলো না। এই যুগের মেয়েদের প্রতারিত করা খুব কঠিন। মেয়েটি দ্বিতীয়বার আগের চেয়েও কঠিন গলায় বলল, মা, তুমি কাকে তুলেছ ? এ টুটুল ভাই নয়। হতেই পরে না। এ অন্য কেউ ।

ড্রাইভার বারবার সন্দেহজনক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম, সামনে চোখ রেখে গাড়ি চালাও, এ্যাকসিডেন্ট হবে।

ড্রাইভার আমার গলা এবং কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সম্ভবত তাকে কেউ তুমি

করে বলে না। আমার মতো সাজপোশাকের একজন মানুষ অবলীলায় তাকে তুমি বলছে এটা তার পক্ষে হজম করা কঠিন।

মেয়ের মা বললেন, আচ্ছা, তুমি টুটুল না ?

না।

মেয়েটি কঠিন গলায় বলল, তাহলে টুটুল সেজে গাড়িতে উঠে বসলেন যে ?

টুটুল সেজে গাড়িতে উঠতে যাব কেন ? আপনার মা উঠতে বললেন। উঠলাম। মেয়েটি তীব্র গলায় বলল—ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান তো। ইনাকে নামিয়ে দিন।

যা ভেবেছিলাম, তাই। এই ড্রাইভারকে আপনি করে বলে । ড্রাইভার মনে মনে হয়তো এরকম হুকুমের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। বড় সাহেবদের মতো ভঙ্গিতে বলল, নামেন।

গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে দেবে - এটা সহ্য করা বেশ কঠিন। তবে এ জাতীয় অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস হয়ে আছে। আমাকে এবং মজিদকে একবার এক বিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। কনের এক আত্মীয় চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, জানেন, আমরা আপনাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে পারি। ভদ্রবেশী জোচ্চোরকে কিভাবে ঠাণ্ডা করতে হয় আমি জানি। সেই অপমানের তুলনায় গাড়ি থেকে বের করে দেয়া তো কিছুই না।

ড্রাইভার রুক্ষ গলায় বলল, ব্রাদার নামুন।

সূর্যের চেয়ে বালি গরম একেই বলে। আমি ড্রাইভারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ফার্মগেটে যাব। ঐখানে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

আমরা ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছি না ।

কোনো দিকে যাবেন ?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার— নামুন বলছি।

না নামলে কী করবেন ?

আমি এইবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমার মনে ক্ষীণ আশা, ভদ্রমহিলা বলবেন, এই ছেলে যেখানে যেতে চায় সেখানে নামিয়ে দিলেই হয়। এত কথার দরকার কী ? ভদ্রমহিলা তা করলেন না। তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছেন। অপরাধী ভঙ্গিতে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি মেয়েকে ভয় পান। আজকাল অধিকাংশ মায়েরাই মেয়েদের ভয় পায় ।

ড্রাইভার বলল, নামতে বলছে, নামেন না।

আমি হুংকার দিয়ে উঠলাম, চুপ ব্যাটা ফাজিল। এক চড় দিয়ে চোয়াল ভেঙে দেব। আমাকে চিনিস ? চিনিস তুই আমাকে ?

ড্রাইভারের চোখমুখ শুকিয়ে গেল। বড়লোকের ড্রাইভার এবং দারোয়ান এরা খুব ভীতু প্রকৃতির হয়। সামান্য ধমকাধমকিতেই এদের পিলে চমকে যায়। আমার কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। অত্যন্ত গভীর ভঙ্গিতে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট নোট বইটা চেপে ধরলাম। ভাবটা এরকম যেন কোনো ভয়াবহ অস্ত্র আমার হাতে। আমি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললাম, এই ব্যাটা, গাড়ি স্টার্ট দে। আজ আমি তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিল। এই ব্যাটা দেখছি ভীতুর যম। বারবার আমার ব্যাগটার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালা

হারামজাদা। এ্যাকসিডেন্ট করবি ।

আমি এবার পেছনের দিকে তাকালাম। কড়া গলায় বললাম, আদর করে গাড়িতে তুলে পথে নামিয়ে দেয়া, এটা কোনো ধরনের ভদ্রতা?

ভদ্রমহিলা বা তার মেয়ে দুজনের কেউই কথা বলল না। ভয় শুধু ড্রাইভার একা পায়নি—এর দুজনও পেয়েছে। মেয়েটাকে শুরুতে তেমন সুন্দর মনে হয়নি। এখন দেখতে বেশ ভালো লাগছে। গাড়ি-চড়া মেয়েগুলি সবসময় এত সুন্দর মনে হয় কেন? তবে এই মেয়েটার গায়ের রঙ কম ফরসা হলে ভালো হতো। চোখ অবশ্যি সুন্দর। এমনও হতে পারে, ভয় পাওয়ার জন্যে সুন্দর লাগছে। ভীত হরিণীর চোখ যেমন সুন্দর হয়, ভীত তরুণীর চোখও বোধহয় সুন্দর হয়। ভয় পেলেই হয়তো-বা চোখ সুন্দর হয়ে যায় ।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, গাড়িতে খানিকটা ঘুরব। জাস্ট ইউনিভার্সিটি এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে তারপর যাব ফার্মগেট ।

কেউ কোনো কথা বলল না।

আমি বললাম, গাড়িতে কোনো গান শোনার ব্যবস্থা নেই? ড্রাইভার, ক্যাসেট দাও তো ।

ড্রাইভার ক্যাসেট চালু করে দিল । ভেবেছিলাম কোনো ইংরেজি গান বোধহয় বাজবে। তা না। নজরুল গীতি ।

হায় মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম

ডক্টর অঞ্জলী ঘোষের গাওয়া। এই গানটা আমার পছন্দ, রূপাদের বাসায় শুনেছি। গানটায় আলাদা একধরনের মজা আছে। কেমন জানি কাওয়ালি-কাওয়ালি ভাব ।

গাড়ি আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল। আমি কিছু বোঝার আগেই ড্রাইভার হুট করে নেমে গেল। তাকে যতটা নির্বোধ মনে করা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সে তত নির্বোধ নয়। সে গাড়ি থামিয়েছে মোটর সাইকেলে বসে-থাকা একজন পুলিশ সার্জেন্টের গা ঘেসে । চোখ বড় বড় করে কী সব বলছে। অঞ্জলী ঘোষের গানের কারণে তার কথা বোঝা যাচ্ছে না।

পুলিশ সার্জেন্ট আমার জানালার কাছে এসে বলল, নামুন তো ।

আমি নামলাম ।

দেখি ব্যাগে কী আছে।

আমি দেখালাম ।

একটা নোটবই। দুটা বল পয়েন্ট, শীষ ভাঙা পেনসিল। পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা এক প্যাকেট চিপস ।

পুলিশ সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি এর বিরুদ্ধে কোনো ফরম্যাল কমপ্লেইন করতে চান ? ভদ্রমহিলা তার মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটি বলল, অবশ্যই চাই। আমি জাস্টিস এম. সোবহান সাহেবের মেয়ে। এই লোক আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল। মাস্তানি করছিল।

আপনাদের কমপ্লেইন থানায় করতে হবে। রমনা থানায় চলে যান।

এখন তো যেতে পারব না । এখন আমরা কাজে যাচ্ছি।

কাজ সেরে আসুন। আমি একে রমনা হ্যান্ডওভার করে দেব। আসামির নাম জানেন তো ?

না।

পুলিশ সার্জেন্ট আমার দিকে বলল, এ্যাই, তোর নাম কী ?
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম । আমাকে আপনি বলছে, এখন সুন্দর একটা মেয়ের সামনে তুই করে বলছে!
এ্যাই তোর নাম বল ।
আমি উদাস গলায় বললাম, আমার নাম টুটুল।
পুলিশ সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, ভুল নাম দিচ্ছে – যাই হোক, এই নামেই বুকিং হবে। হারামজাদারা ইদানীং সেয়ানা হয়েছে। কিছুতেই কারেক্ট নাম বলবে না। ঠিকানা তো বলবেই না।
বিশাল কারো গাড়ি হুশ করে বের হয়ে গেল। ফার্মগেটে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার– ইন্দিরা রোডে আমার বড়ফুপুর বাসায় দুপুরে খাওয়ার কথা। সেই খাওয়া মাথায় উঠল। সার্জেন্ট আমাকে ছাড়বে না। রমনা থানায় চালান করবে, বলাই বাহুল্য। জাস্টিসের নাম শুনেছে। বড় কারোর নাম শুনলে এদের হুঁশ থাকে না।
আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম। হাজতে থাকতে হলে সঙ্গে সিগারেট থাকা ভালো । আমার ধারণা ছিল সার্জেন্ট তার মোটর সাইকেলের পেছনে আমাকে বসিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। তা করল না। আজকাল পুলিশ খুব আধুনিক হয়েছে। পকেট থেকে ওয়াকি-টকি বের করে কী বলতেই পুলিশের জিপ এসে উপস্থিত। অবিকল হিন্দি মুভি ।
সম্পূর্ণ নিজের বোকামিতে দাওয়াত খাবার বদলে থানায় যাচ্ছি। মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার, খারাপ হচ্ছে না। বরং মজা লাগছে। অঞ্জলী ঘোষের গানের পুরোটা শোনা হলো না এইজন্যে অবশ্যি আফসোস হচ্ছে। হায় মদিনাবাসী বলে চমৎকার টান দিচ্ছিল ।

থানার ওসি সাহেবের চেহারা বেশ ভালো ।
মেজাজও বেশ ভালো। চেইন স্মোকার । ক্রমাগত বেনসন অ্যান্ড হেজেস টেনে যাচ্ছে। বাজারে এখন সত্তর টাকা করে প্যাকেট যাচ্ছে। দিনে তিন প্যাকেট করে হলে মাসে কত হয় ? দুশোদশ গুণন তিরিশ। ছ-হাজার তিনশ । একজন ওসি সাহেব বেতন পান কত, এক ফাঁকে জেনে নিতে হবে।
ওসি সাহেবরা শুরুতে প্রশ্ন করেন ভাব বাচ্যে। শুরুর কয়েকটি প্রশ্নে জেনে নিতে চেষ্টা করেন আসামি কোনো সামাজিক অবস্থায় আছে। তার ওপর নির্ভর করে আপনি তুমি বা তুই ব্যবহৃত হয়।
ওসি সাহেব বললেন, কী নাম ?
চৌধুরী খালেকুজ্জামান। ডাকনাম টুটুল।
কী করা হয় ?
সাংবাদিকতা করি।
কোন পত্রিকায় ?
বিশেষ কোনো পত্রিকার সঙ্গে জড়িত নই। ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিকতা। যেখানে সুযোগ পাই ঢুকে পড়ি। টুটুল চৌধুরী নামে পা হয়। হয়তো আপনার চোখে পড়েছে। পুলিশের ওপর একটা ফিচার করেছিলাম।
কী ফিচার ?
ফিচারের শিরোনাম হচ্ছে—একজন পুলিশ সার্জেন্টের দিনরাত্রি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে কী করতে হয় তাই ছিল বিষয়। অবশ্যি এক ফাঁকে খুব ড্যামেজিং

কয়েকটা লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

যেমন ?

বলেছিলাম, এই পুলিশ সার্জেন্ট তার একটি কর্মমুখর দিনে তিন প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস পান করেন। তিনি জানিয়েছেন, টেনশন দূর করতে এটা তার প্রয়োজন। অবশ্যই তিনি খুব টেনশনের জীবনযাপন করেন। এই বাজারে দিনে তিন প্যাকেট করে বেনসন খেলে মাসে ছ-হাজার তিনশ টাকার প্রয়োজন। আমাদের জিজ্ঞাস্য— তার বেতন কত ?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসিমুখে বললাম, তবে শেষের লাইন তিনটা ছাপা হয়নি। এডিটর সাহেব কেটে দিয়েছিলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ছাপাতে চায় না।

ওসি সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, আপনি করে বলছে। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এখন চাইলে এক কাপ চা-ও চলে আসতে পারে। পুলিশরা উঁচুদরের আসামিদের ভালো খাতির করে । চা-সিগারেট খাওয়ায়।

আপনি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ?

অভিযোগ যে কী তা আমি নিজেই জানি না। ওরা অভিযোগ করলে তারপর জানা যাবে। নারী অপহরণের অভিযোগ হতে পারে।

নারী অপহরণ ?

জি। জাস্টিস সাহেবের স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে ওদের গাড়িতেই পালাতে চেষ্টা করেছিলাম। মাছের তেলে মাছ ভাজা বলতে পারেন।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন? দয়া করে করবেন না। আমি আপনার চেয়েও বেশি রসিক, কাজেই অসুবিধা হবে।

জি আচ্ছা, রসিকতা করব না।

আপনি কোনার দিকের ঐ বেঞ্চিতে বসে থাকুন।

হাজতে পাঠাচ্ছেন না ?

ফাইনাল অভিযোগ আসুক, তারপর পাঠাব। হাজত তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

এক কাপ চা কি পেতে পারি ?

এটা কোন রেস্টুরেন্ট না।

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে আমার ব্যাগের জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। নোটবইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। আমি বললাম, ওটা আমার কবিতার খাতা। মাঝেমধ্যে কবিতা লিখি।

তার মুখের কাঠিন্য তাতে একটুও কমল না। কবি শুনে মেয়েরা খানিকটা দ্রবীভূত হয়। পুলিশ কখনো হয় না। পুলিশের সঙ্গে কবিতার নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো বিরোধ আছে।

চুপচাপ বসে থাকা অনেকের জন্যেই খুব কষ্টকর। আমার জন্যে ডালভাত। শুধু হেলান দেবার একটু জায়গা পেলে আরাম করে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থাকতে পারি। বেঞ্চিতে হেলান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে না বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তবে সেই অসুবিধাও অসহনীয় নয়। এইরকম পরিস্থিতিতে আমি আমার নদী-টা বের করে ফেলি। তখন অসুবিধা হয় না।

নদী বের করার ব্যাপারটা সম্ভবত আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। একটু ব্যাখ্যা করলেই পরিষ্কার হবে ।

ছোটবেলার কথা। ক্লাস সিক্সে পড়ি। জিওগ্রাফি পড়ান মফিজ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকলে চেয়ার-টেবিলগুলি পর্যন্ত ভয়ে কাপে। স্যার মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু হাতের থাবাটা বিশাল। আমাদের ধারণা, ছাত্রদের গালে চড় বসাবার জন্যে আল্লাহতালা স্পেশালভাবে স্যারের এই হাত তৈরি করে দিয়েছেন। স্যারের চড়েরও নানা নাম ছিল—রাম চড়, শ্যাম চড়, যদু চড়, মধু চড়। এর মধ্যে সবচে’ কঠিন চড় হচ্ছে রাম চড়, সবচে' নরমটা হচ্ছে মধু চড়।

স্যার সেদিন পড়াচ্ছেন—বাংলাদেশের নদ-নদী। ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এই, একটা নদীর নাম বল তো। চট করে বল ।

মফিজ স্যার কোনো প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায়। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মনে হয়, মাথার খুলির ভেতরে জমে-থাকা কিছু বাতাস কানের পরদা ফাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কী ব্যাপার, চুপ করে আছিস কেন ? নাম বল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, আড়িয়াল খাঁ ।

স্যার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব রাম চড়। হুংকার দিয়ে বললেন, এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে তোর মনে এল আড়িয়াল খাঁ ? সবসময় ফাজলামি ? কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক ।

আমি কানে ধরে সারাটা ক্লাস দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক আগে পড়ানো শেষ করে স্যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে আয় ।

আরেকটা চড় খাবার জন্যে আমি ভয়ে ভয়ে স্যারের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বিষন্ন গলায় বললেন, এখনো কানে ধরে আছিস কেন ? হাত নামা।

আমি হাত নামালাম। স্যার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তোকে শাস্তি দেয়াটা অনায় হয়েছে। খুবই অন্যায়, তোকে নদীর নাম বলতে বলেছি, তুই বলেছিস । আয়, আরো কাছে আয়, তোকে আদর করে দেই।

স্যার এমন ভঙ্গিতে মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন যে আমার চোখে পানি এসে গেল । স্যার বিব্রত গলায় তোর কাছ থেকে সুন্দর একটা নদীর নাম শুনতে চেয়েছিলাম, আর তুই বললি আড়িয়াল খাঁ। আমার মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে । আচ্ছা, এখন সুন্দর একটা নদীর নাম বল ।

আমি শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললাম, ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষী? এই নাম তো শুনি নি। কোথাকার নদী?

জানি না স্যার ।

এই নামে আসলেই কি কোনো নদী আছে ?

তাও জানি না, স্যার।

স্যার হালকা গলায় বললেন, আচ্ছা থাক। না থাকলে নেই। এটা হচ্ছে তোর নদী। যা জায়গায় গিয়ে বোস । এমনিতেই তোকে শাস্তি দিয়ে আমার মনটা খারাপ হয়েছে। তুই তো দেখি কেঁদে কেঁদে আমার মন-খারাপটা বাড়াচ্ছিস । আর কাঁদিস না।

এই ঘটনার প্রায় বছর তিন পর ক্যান্সারে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মফিজ স্যার

মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্যারকে দেখতে গিয়েছি। নোংরা একটা ঘরে নোংরা বিছানায় শুয়ে আছেন। মানুষ না— যেন কফিন থেকে বের করা মিশরের মমী। স্যার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। উচু গলায় তার স্ত্রীকে ডাকলেন, ওগো, এই ছেলেটাকে দেখে যাও। এই ছেলের একটা নদী আছে। নদীর নাম ময়ূরাক্ষী ।

স্যারের স্ত্রী আমার প্রতি কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। স্যার সেই অনাদর পুষিয়ে দিলেন। দুর্বল হাতে টেনে তার পাশে বসালেন। বললেন, তোর নদীটা কেমন বল তো ?

আমি নিচু গলায় বললাম, আমি স্যার কিছু জানি না। দেখিনি কখনো।

তবু বল শুনি। বানিয়ে বানিয়ে বল ।

আমি লাজুক গলায় বললাম, নদীটা খুব সুন্দর।

আরে গাধা, নদী তো সুন্দর হবেই। অসুন্দর নদী বলে কিছু নেই। আরো কিছু বল।

আমি বলার মতো কিছু পেলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম।

স্যার যেদিন মারা যান সেই রাত্রিতেই আমি প্রথম ময়ূরাক্ষী স্বপ্নে দেখি। ছোট্ট একটা নদী । তার পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুধারে দূর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছে বিষণ্ণ গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে ।

নদীর ধার ঘেঁষে পানি ছিটাতে ছিটাতে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি শুধু এক ঝলক তার মুখটা দেখতে পেলাম। স্বপ্নের মধ্যেই তাকে খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। যেন কত দীর্ঘ শতাব্দী এই মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছি।

ময়ূরাক্ষী নদীকে একবারই আমি স্বপ্নে দেখই। নদীটা আমার মনের ভেতর পুরোপুরি গাঁথা হয়ে যায়। এরপর অবাক হয়ে লক্ষ্য করি কোথাও বসে একটু চেষ্টা করলেই নদীটা আমি দেখতে পাই। তার জন্যে আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না, চোখ বন্ধ করতে হয় না, কিছু না। একবার নদীটা বের করে আনতে পারলে সময় কাটানো কোনো সমস্যা নয়। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আমি নদীর তীরে হাঁটি। নদীর হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে বসি । শরীর জুড়িয়ে যায়। ঘুঘুর ডাকে চোখ ভিজে ওঠে।

ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

আমি চোখ মেললাম । চারদিকে অন্ধকার । আরে সর্বনাশ! এতক্ষণ পার করেছি। ওসি সাহেব বললেন, যান, চলে যান। জাস্টিস সাহেবের বাসা থেকে টেলিফোন করেছিল । ওরা কোনো চার্জ আনবে না। You are free to go.

জাস্টিস সাহেব নিজেই টেলিফোন করেছিলেন ?

না, তার মেয়ে ।

মেয়েটা কী বলল, দয়া করে বলবেন ?

বলল, ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দিতে।

তাহলে দয়া করে ধমক-ধামক দিন। তারপর যাই ।

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন । পুলিশের যে একেবারেই রসবোধ নেই সেটা ঠিক না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, মেয়েটা কি তার নাম আপনাকে বলেছে ?

হ্যাঁ বলেছে। মীরা কিংবা মীরু এই জাতীয় কিছু।

আপনি কি নিশ্চিত যে সে জাস্টিস এম. সোবহান সাহেবের মেয়ে ? অন্যকেউও তো হতে পারে। আপনি একটা উড়ো টেলিফোন কল পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন, তারপর জাস্টিস সাহেব ধরবেন আপনাকে, আইনের প্যাচে ফেলে অবস্থা কাহিল করে দেবেন।

ভাই, আপনি যান তো। আর শুনেন, একটা উপদেশ দেই। পুলিশের সঙ্গে এত মিথ্যা কথা বলবেন না। মিথ্যা বলবেন ভালো মানুষদের কাছে। যা বলবেন তারা তাই বিশ্বাস করবে। পুলিশ কোনোকিছুই বিশ্বাস করে না। খোঁজখবর করে।

আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করেছেন ?

হ্যাঁ। সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে খোঁজ নিয়েছি। জেনেছি, টুটুল চৌধুরী নামের কোনো ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক নেই।

আপনি কি আমার মুচলেকা-ফুচলেকা এইসব কিছু নেবেন না?

না। এখন দয়া করে বিদেয় হোন।

আপনারা গাড়ি করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি কি আশা করতে পারি না আবার গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আসবেন ?

কোথায় যাবেন ?

ফার্মগেট ।

চলুন, নামিয়ে দেব।

আমি হাসিমুখে বললাম, আপনার এই ভদ্রতার কারণে কোনো একদিন হয়তো আমি আপনাকে ময়ূরাক্ষীর তীরে নিমন্ত্রণ করব।

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কী বললেন বুঝতে পারলাম না।

ঐটা বাদ দিন। সবকিছু বুঝে ফেললে তো মুশকিল। ভালো কথা, আপনি ডেইলি ক-প্যাকেট সিগারেট খান তাকি জানতেপারি ?

ওসি সাহেব বললেন, আপনি লোকটা তো ভালো ত্যাদড় আছেন। দুই থেকে আড়াই প্যাকেট লাগে।

২

বড়ফুপুর বাসায় দুপুরে যাবার কথা।

উপস্থিত হলাম রাত আটটায়। কেউ অবাক হলো না। ফুপুর বড়ছেলে বাদল আমাকে দেখে উল্লসিত গলায় বলল, হিমুদা এসেছ? থ্যাংকস। অনেক কথা আছে, আজ থাকবে কিন্তু। আই নিড ইওর হেল্প ।

বাদল এবার ইন্টারমিডিয়েট দেবে। এর আগেও তিনবার দিয়েছে। সে পড়াশোনায় খুবই ভালো। এস.এস.সি. তে বেশ কয়েকটা লেটার এবং স্টার মার্কস পেয়েছে। সমস্যা হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটে। পরীক্ষা শেষপর্যন্ত দিতে পারে না। মাঝামাঝি জায়গায় তার একধরনের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায়। তার কাছে মনে হয় পরীক্ষার হল হঠাৎ ছোট হতে শুরু করে । ঘরটা ছোট হয় । পরীক্ষার্থীরাও ছোট হয় । চেয়ার-টেবিল সব ছোট হতে থাকে। তখন সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে আসামাত্রই দেখে সব স্বাভাবিক। তখন সে আর পরীক্ষার

হলে ঢোকে না। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি চলে আসে ।

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার সময় অনেক ডাক্তার দেখানো হলো। অষুধপত্র খাওয়ানো হলো। সেবারও একই অবস্থা। এখন আবার পরীক্ষা দেবে। এবারে ডাক্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পীর-ফকির। বাদলের গলায়, হাতে, কোমরে নানান মাপের তাবিজ ঝুলছে। এর মধ্যে একটা তাবিজ না-কি জিন-কে দিয়ে কোহকাফ নগর থেকে আনানো । কোহকাফ নগরীতে না-কি জিন এবং পরীরা থাকে। আমার বড়ফুপা ঘোর নাস্তিক ধরনের মানুষ এবং বেশ ভালো ডাক্তার। তিনিও কিছু বলছেন না।

বাদলেরও দেখি আমার মতো অবস্থা দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে হুলস্থূল। লম্বা লম্বা চুল। সে খুশি-খুশি গলায় বলল, হিমুদা, আমি পড়াশোনা করছি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমার ঘরে চলে আসবে।

পড়াশোনা হচ্ছে কেমন ?

হেভি হচ্ছে। একই জিনিস তিন-চার বছর ধরে পড়ছি তো, একেবারে ঝাড়া ঝাড়া হয়ে গেছে। হিমুভাই, তুমি এমন ডার্ক হলুদ পাঞ্জাবি কোথায় পেলে ?

গাউছিয়ায় ।

ফাইন দেখাচ্ছে। সন্নাসী-সন্নাসী লাগছে – সন্নাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের নীচে একদা ছিলেন সুপ্ত।

যা, পড়াশোনা কর। আমি আসছি।

কী আর পড়াশোনা করব। সব তো ভাজা ভাজা ।

তবু আরেকবার ভেজে ফেল। কড়া ভাজা হবে ।

বাদল শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি হেচকির মতো চলতেই থাকল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই ছেলের অবস্থা দেখি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কেউ হাসে ?

ফুপু গম্ভীরমুখে খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে দুপুরে প্রচুর আয়োজন ছিল। সেই সব গরম করে দেয়া হচ্ছে। পোলাওয়ে টক-টক গন্ধ । নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে? আমার পেটে অবশ্যি সবই হজম হয়ে যায়। পোলাওটা মনে হচ্ছে হবে না। কষ্ট দেবে ।

ফুপু বললেন, রোষ্ট আরেক পিস দেব ?

দাও ।

এত খাবারদাবারের আয়োজন কী জন্যে একবার জিজ্ঞেস করলি না ?

আমি খাওয়া বন্ধ করে বললাম, কী জন্যে ?

আত্মীয়স্বজন যখন কোনো উপলক্ষে খেতে ডাকে তখন জিজ্ঞেস করতে হয় উপলক্ষটা কী ? যখন আসতে বলে তখন আসতে হয় ।

একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছিলাম। উপলক্ষটা কী ?

রিনকির বিয়ের কথা পাকা হলো ।

বাহ, ভালো তো ।

ফুপু গভীর হয়ে গেলেন। আমি খেয়েই যাচ্ছি। টক গন্ধ পোলাও এত খাওয়া ঠিক হচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছি। তবু নিজেকে সামলাতে পারছি না। যা হবার হবে। ফুপু শীতল গলায় বললেন, একবার তো জিজ্ঞেস করলি না কার সঙ্গে বিয়ে, কী সমাচার ।

তোমরা নিশ্চয় দেখেশুনে ভালো বিয়েই দিচ্ছ।

তুই একবার জিজ্ঞেসও করবি না ? তোর কোনো কৌতূহলও নেই ?

আরে কী বল, কৌতুহল নেই। আসলে এত ক্ষুধার্ত যে কোনোদিকে মন দিতে পারছি না। দুপুরে খাওয়া হয়নি। ছেলে করে কী ?

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

বল কী! তাহলে তো মালদার পাটি।

ফুপু রাগী গলায় বললেন, ছোটলোকের মতো কথা বলবি না তো, মালদার পার্টি আবার কী ?

পয়সাআলা পার্টি, এই বলছি।

হ্যাঁ, টাকাপয়সা ভালোই আছে।

শর্ট না তো ? আমার কেন জানি মনে শর্ট টাইপের ছেলের সাথে রিনকির বিয়ে হবে । ছেলের হাইট কত?

ফুপুর মুখটা কাল হয়ে গেল। তিনি নিচু গলায় বললেন, হাইট একটু কম। উঁচু জুতা পরলে বোঝা যায় না।

বোঝা না গেলে তো কোনো সমস্যাই নেই। তাছাড়া বেঁটে লোক খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়। যত লম্বা হয় বুদ্ধি তত কম। আমি এখন পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিমান লম্বা মানুষ দেখিনি। সত্যি বলছি।

ফুপুর মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। তখন মনে পড়ল—কী সর্বনাশ! ফুপা নিজেই বিরাট লম্বা। প্রায় ছ-ফুট । আজ দেখি একের-পর-এক ঝামেলা বাধিয়ে যাচ্ছি।

তুই যাবার আগে তোর ফুপার সঙ্গে কথা বলে যাবি। তোর সঙ্গে নাকি কী জরুরি কথা আছে।

নো প্রবলেম ।

আর রিনকির সঙ্গে কথা বলার সময় জামাই লম্বা কি বেঁটে এ জাতীয় কোনো কথাই বলবি না।

বেঁটে লোকেরা যে জ্ঞানী হয় এই কথাটা ঠিক কায়দা করে বলব ?

তোর কিছুই বলার দরকার নেই।

ঠিক আছে ঠাণ্ডা পেপসি-টেপসি থাকলে দাও। তোমরা তো কেউ পান খাও না । কাউকে দিয়ে তিনটা পান আনাও তো ।

রিনকির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এই মেয়ে নাইন-টেনে পড়ার সময় রোগা-ভোগা ছিল— এখন দিন দিনই মোটা হচ্ছে। আজ অবশ্যি সেরকম মোটা লাগছে না। ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে এরচেয়ে কম মোটা হলে তাকে মানাত না ।

কী রে, ক্লাস ওয়ান একটা বর জোগাড় করে ফেললি ? কনগ্রাচুলেশনস ।

রিনকি অসম্ভব খুশি হলো। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলল, ক্লাস ওয়ান বর না ছাই। ক্লাস থ্রি হবে বড়জোর।

মেয়েদের আমি কখনো খুশি হলে সেই খুশি প্রকাশ করতে দেখিনি। একবার একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে ইন্টারমিডিয়েটে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফাস্ট হয়েছে। আমি বললাম, কী খুকী, খুশি তো ? সে ঠোঁট উল্টে বলল, উহু, বাংলা সেকেন্ড পেপারে যা পুওর নাম্বার পেয়েছি। জানেন, মার্কসিট দেখে কেঁদেছি। রিনকিরও দেখি সেই অবস্থা। খুশিতে মুখ ঝলমল করছে অথচ মুখে বলছে– ক্লাস

থ্রি ।

হিমুভাই, ও কিন্তু দারুণ শর্ট। মনে হয় কলিংবেল হাত দিয়ে নাগাল পাবে না।

আমি অত্যন্ত খুশি হবার ভঙ্গি করলাম। খুশি গলায় বললাম, তাহলে তো তুই লাকি। ভাগ্যবতী মেয়েদের বর খাটো হয়, খনার বচনে আছে।

যাও ।

সত্যি— খনা বলছেনঃ খাটো গাছের পেয়ারা ভালো । কাটো স্বামীর মন... তারপর আরো কী কী যেন আছে মনে নেই।

বানিয়ে বানিয়ে কী যে মিথ্যে কথা তুমি বল। এই ছড়াটা তুমি এক্ষুনি বানালে, তাই না?

হু।

কেন বানালে বল তো ?

তোকে খুশি করবার জন্যে।

খুশি করবার জন্যে দরকার নেই, আমি এমনিতেই খুশি ।

সেটা তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বর পছন্দ হয়েছে ?

হু। তবে খুব বিরক্ত করছে।

বিরক্ত করছে মানে ?

আজই মাত্র কথাবার্তা ফাইনাল হলো । এর মধ্যে তিনবার টেলিফোন করেছে। তারপর বলেছে রাত এগারোটার সময় আবার করবে। লজ্জা লাগে না ? তার ওপর টেলিফোন বাবার ঘরে। বাবা সন্ধ্যে থেকে তার ঘরে বসা আছে। আমি কি বাবার সামনে তার সঙ্গে কথা বলব ?

লম্বা তার আছে। তুই টেলিফোন তোর ঘরে নিয়ে আয়।

আমি কী করে আনব ? আমার লজ্জা লাগে না ?

আচ্ছা যা, আমি এনে দিচ্ছি।

পরে কিন্তু তুমি এই নিয়ে ঠাট্টা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আনতে বলিনি। তুমি নিজ থেকে আনতে চেয়েছ।

তা তো বটেই। ঐ ভদ্রলোক টেলিফোনে কী বলে—

কী আর বলবে, কিছু বলে না।

আহা বল না, শুনি ।

উফ তুমি বড় যন্ত্রণা কর— আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না।

রিনকি লজ্জায় লাল-নীল হতে লাগল। মনে হচ্ছে সে এখন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটাচ্ছে। বড় ভালো লাগছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। রিনকির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। থাকা গেল না। ফুপা ডেকে পাঠালেন।

ফুপার ঘর অন্ধকার।

জিরো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। লক্ষণ সুবিধার না। ফুপার মাঝেমধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এই কাজটা বেশিরভাগ সময় বাইরেই সারেন। বাসায় ফুপুর জন্যে তেমন সুযোগ পান না। ফুপুর শাসন বেশ কঠিন। হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিশেষ উপলক্ষে বাসায় মদ্যপানের অনুমতি পান। আজ পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

মদ্যপান করছে এরকম মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হয়। কারণ তাদের মুড মদের পরিমাণ এবং কতক্ষণ ধরে মদ্যপান করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। ফুপার তরল অবস্থায় তার সঙ্গে আমার কর্তাবার্তা বিশেষ হয়নি। কাজেই

তরল অবস্থায় তার মেজাজ-মর্জি কেমন থাকে তাও জানি না।
ফুপা আসব ?
হিমু এসো। দরজা ভিড়িয়ে দাও। তে খুব জরুরি কথা আছে। বস, সামনের চেয়ারটায় বস।
আমি বসলাম ।
তিনি গ্লাস দেখিয়ে বললেন, আশা করি এইসব ব্যাপারে তোমার কোনো প্রিজুডিস নেই।
জি না ।
তারপর বল, কেমন আছ । ভালো ?
জি ।
রিনকির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল শুনেছ বোধহয় ?
জি ।
ছেলে ভালো, তবে খুবই খাটো। আমাদের সঙ্গে এইরকম একটা ছেলে পড়ত— তার নাম ছিল স্ক্রু। এই ছেলেরও নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো নাম-টাম আছে। বেটে ছেলেদের নাম সাধারণত স্ক্রু হয় কিংবা বল্টু হয়।
আমি চুপ করে রইলাম। ফুপাকে নেশায় ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। না ধরলে নিজের জামাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলতে পারতেন না।
আপনার ছেলে পছন্দ হয়নি ?
আরে পছন্দ হবে কী ? মার্বেল সাইজের এক ছেলে ।
পছন্দ হয়নি তো বিয়েতে মত দিলেন কেন ?
আমার মতামতের প্রশ্নই তো ওঠে না। আমি হচ্ছি এই সংসারে টাকা বানানোর মেশিন। এর বেশি কিছু না। আমি কী বলছি না বলছি তা কেউ জানতে চায় না। তারপরেও বলতাম। কিন্তু দেখি, মেয়ে এবং মেয়ের মা দুজনেই খুশিতে বাকবাকুম।
তার গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো খানিকটা ঢাললেন। আমি তাকিয়ে আছি দেখে বললেন– এটা পঞ্চম পেগ, আমার লিমিট হচ্ছে সাত । সাতের পর লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। সাতের আগে কিছুই হয় না।
আমি বললাম, ফুপা, এক মিনিট। আমি টেলিফোনটা রিনকির ঘরে দিয়ে আসি। ও কোথায় যেন টেলিফোন করবে।
ফুপা মুখ বিকৃত করে বললেন, কোথায় করবে বুঝতে পারছ না ? ঐ মার্বেলের কাছে করবে। টেলিফোন করে করে অস্থির করে তুলল।
আমি রিনকিকে টেলিফোন দিয়ে এসে বললাম, আপনি কী যেন জরুরি কথা বলবেন?
ও হ্যাঁ, জরুরি কথা, বাদল সম্পর্কে।
জি বলুন।
ও তোমাকে কেমন অনুকরণ করে সেটা লক্ষ্য করেছ ? তুমি তোমার মুখে দাড়ি-গোঁফের চাষ করছ— কর। সেও তোমার পথ ধরেছে। আজ তুমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছ, আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে কাল দুপুরের মধ্যে সে হলুদ পাঞ্জাবি কিনবে। আমি কি ভুল বললাম ?
না— ভুল বলেননি। তুমি যদি আজ মাথা কামাও, আমি সিওর, ব্যাটা কাল মাথা কমিয়ে ফেলবে । এরকম প্রভাব তুমি কী করে ফেললে এটা তুমি আমাকে বল।

You better to explain it.

আমার জানা নেই, ফুপা ।

ভুলটি আমার। মেট্রিক পাস করে তুমি যখন এলে আমি ভালো মনে বললাম, আচ্ছা থাকুক। মা-বাপ নেই ছেলে—একটা আশ্রয় পাক। তুমি যে এই সর্বনাশ করবে তা তো বুঝিনি! বুঝতে পারলে তখনই ঘাড় ধরে বের করে দিতাম ।

আমি জেনেশুনে কিছু করিনি।

তাও ঠিক। জেনেশুনে তুমি কিছু করনি। আই ডু এগ্রি । তোমার লাইফ-স্টাইল তাকে আকর্ষণ করেছে। তুমি ভ্যাগাবন্ড না, অথচ তুমি ভাব কর যে তুমি ভ্যাগাবন্ড। জোছনা দেখানোর জন্যে চন্দ্রায় এক জঙ্গলের মধ্যে বাদলকে নিয়ে গেলে । সারারাত ফেরার নাম নেই। জোছনা এমন কী জিনিস যে জঙ্গলে বসে দেখতে হবে ? বল তুমি । তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই ।

শহরের আলোয় জোছনা ঠিক বোঝা যায় না।

মানলাম তোমার কথা। ভালো কথা, চন্দ্রায় গিয়ে জোছনা দেখ, তাই বলে সারারাত বসে থাকতে হবে ?

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোছনা কীভাবে বদলে যায় সেটাও একটা দেখার মতো ব্যাপার। শেষরাতে পরিবেশ ভৌতিক হয়ে যায়।

তাই নাকি ?

জি। তাছাড়া জঙ্গলের একটা আলাদা এফেক্ট আছে। শেষরাতের দিকে গাছগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তোমার কথা বুঝলাম না। গাছগুলি জীবন্ত হয় মানে ? গাছ তো সবসময়ই জীবন্ত ।

জি না। ওরা জীবন্ত, তবে সুপ্ত। খানিকটা জেগে ওঠে পূর্ণিমা রাতে। তা-ও মধ্যরাতের পর থেকে। জঙ্গলে না গেলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। আপনি একবার চলুন না, নিজের চোখে দেখবেন। দিন তিনেক পরেই পূর্ণিমা।

দিন তিনেক পরেই পূর্ণিমা ?

জি ।

এইসব হিসাব-নিকাশ সবসময় তোমার কাছে থাকে?

জি ।

একবার গেলে হয়।

বলেই ফুপা গভীর হয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি আমাকে পর্যন্ত কনভিন্সড করে ফেলেছিলে। মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে । অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে নেশার ঘোরে থাকার জন্যে ।

তা ঠিক । কিছু মানুষ ধরেই নিয়েছে, তারা তাই ঠিক। তাদের জগৎটাই একমাত্র সত্যি জগৎ। এরা রহস্য খুঁজবে না। এরা স্বপ্ন দেখবে না।

চুপ কর তো ।

আমি চুপ করলাম।

ফুপা রাগী গলায় বললেন, তুমি ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরবে আর ভাববে বিরাট কাজ করে ফেলছ। তুমি যে অসুস্থ এটা তুমি জানো ? ডাক্তার হিসেবে বলছি—তুমি অসুস্থ। You are a sick man.

ফুপা, আপনি নিজেও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বেশি খাচ্ছেন। আপনি বলছেন আপনার লিমিট সাত । আমার ধারণা, এখন নয় চলছে।

তোমার কাছে সিগারেট আছে ?

আছে ।

দাও ।

তিনি সিগারেট ধরালেন। খুক খুক করে কাশলেন। ফুপাকে আমি কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি। তবে মদ্যপানের সঙ্গে সিগারেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এরকম শুনেছি।

হিমু!

জি ।

রাস্তায় রাস্তায় ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে তুমি যদি আনন্দ পাও– তুমি অবশ্যি তা করতে পার। It is your life. কিন্তু আমার ছেলেও তাই করবে তা তো হয় না।

ও কি তা করছে নাকি ?

এখনো শুরু করেনি, তবে করবে। দু-বছর তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। একই ঘরে ঘুমিয়েছ। এই দু-বছরে তুমি ওর মাথাটা খেয়েছ। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না।

জি আচ্ছা । আসব না।

এ বাড়ির ছায়া তুমি মাড়াবে না।

ঠিক আছে।

এই বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে পিটিয়ে তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলব।

আপনার নেশা হয়ে গেছে, ফুপা । পিটিয়ে ছাল তোলা যায় না। আপনার লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ।

ফুপার সিগারেট নিভে গেছে। সিগারেটে অনভ্যস্ত লোকজন সিগারেটে আগুন বেশিক্ষণ ধরিয়ে রাখতে পারে না। আমি আবার তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। ফুপা বললেন, তোমাকে আমি একটা প্রপোজাল দিতে চাই। একসেপ্ট করবে কি করবে না ভেবে দেখ।

কী প্রপোজাল ?

তোমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে চাই। As a matter of fact আমার হাতে একটা চাকরি আছে। আহামরি কিছু না। ত চলে যাবে।

বেতন কত ?

ঠিক জানি না। তিন হাজারের কম হবে না। বেশিও হতে পারে।

তেমন সুবিধার চাকরি বলে তো মনে হচ্ছে না।

ভিক্ষা করে জীবনযাপন করার চেয়ে কি ভালো না?

না। ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার আলাদা আনন্দ আছে। প্রাচীন ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের সবাই ভিক্ষা করতেন। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। এরা অবশ্যি ভিক্ষা বলে না। এরা বলে মাধুকরি।

আমার কাছে লেকচার ঝাড়বে না।

ফুপা, আমি কি তাহলে উঠব ?

যাও, উঠ। শুধু একটা জিনিস বল— যে ধরনের জীবনযাপন করছ তাতে আনন্দটা কী?

যা ইচ্ছা করতে পারার একটা আনন্দ আছে না ?
যা ইচ্ছা তুমি কি তা-ই করতে পারবে?
অবশ্যই পারব। বলুন কী করতে হবে।
খুন করতে পারবে ?
কেন পারব না! খুন করা আসলে খুব সহজ ব্যাপার।
সহজ ব্যাপার ?
অবশ্যই সহজ ব্যাপার। যে-কেউ করতে পারে। রোজ কতগুলি খুন হচ্ছে দেখছেন না। খবরের কাগজ খুললেই দেখবেন । আমার তো রোজই একটা-দুটা মানুষকে খুন করতে ইচ্ছা করে ।
হিমু, You are a sick man. You are a sick man.
আর খাবেন না, ফুপা । আপনি মাতাল হয়ে গেছেন।
কী করে বুঝলে মাতাল হয়ে গেছি? কী করে বুঝলে ?
মাতালরা প্রতিটা বাক্য দু-বার করে বলে। আপনিও তাই বলছেন। আপনি বাথরুমে গিয়ে বমির চেষ্টা করুন। বমি করলে ভালো লাগবে ।
বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে সরে গেলাম। বমির কথা মনে করিয়ে দিয়েছি। কাজেই ফুপা এখন হড়হড় করে বমি করবেন। হলোও তাই। তিনি চারদিক ভাসিয়ে দিলেন। ওয়াক ওয়াক শব্দে ফুপু ছুটে এলেন। তিনি তার সাজানো ঘরের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত । ফুপাকে দেখে মনে হচ্ছে তার নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে। হঠাৎ হয়তো দেখব বমির সঙ্গে তার পাকস্থলী বের হয়ে আসছে। সেই দৃশ্য খুব সুখকর হবে না। আমি বারান্দায় চলে এলাম। রিনকি ছুটে এসেছে, বাদলও এসেছে।
ফুপা চিঁ চিঁ করে বলছেন– সুরমা, আমি মরে যাচ্ছি। ও সুরমা, আমি মরে যাচ্ছি।
বমি করতে করতে কোনো মাতাল মারা যায় বলে আমার জানা নাই। কাজেই আমি রাস্তায় নেমে এলাম । সিগারেট কেনা দরকার ।
আকাশে মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে। হলে ভালোই হয়। এই বছর এখনো বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। নবধারা জলে স্নান বাকি আছে।
সিগারেটের সঙ্গে জর্দা দেয়া দুটো পান কিনলাম। জর্দার নাম সবই পুংলিঙ্গে - দাদা জর্দা, বাবা জর্দা। মা জর্দা, খালা জর্দা এখনো বাজারে আসেনি, যদিও মহিলারাই জর্দা বেশি খান। কোনো একটা জর্দা কোম্পানিকে এই আইডিয়াটা দিয়ে দেখলে কেমন হয়।
প্রথমবার ঢোকার সময় ফুফুকে যত গম্ভীর দেখলাম, দ্বিতীয়বারে তারচেয়েও বেশি গম্ভীর মনে হয়। ফুপু কোমরে হাতই দিয়ে দাঁড়িয়ে। কাজের মেয়ে বালতি আর ঝাঁটা হাতে যাচ্ছে। কাজের ছেলেটির হাতে ফিনাইল । ফুপুর কিছুটা শুচিবায়ুর মতো আছে। আজ সারারাতই বোধহয় ধোয়াধুয়ি চলবে।
ফুপু বললেন, তুই তাহলে আছিস আমি ভাবলাম চলে গিয়েছিস ।
পান কিনতে গিয়েছিলাম। ফুপার অবস্থা কী ?
অবস্থা কী জিজ্ঞেস করছিস! লজ্জা করে না? তোর সামনে গিলল, তুই একবার না করতে পারলি না ? চাকর-বাকর আছে। কী লজ্জার কথা! তুই কি আজ এখানে থাকবি?
হ্যাঁ ।
এখানে থাকার তোর দরকারটা কী ?

এত রাতে যাব কোথায় ? ফুপু শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। টেলিফোনে ক্রমাগত রিং হচ্ছে । এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে । রিনকির ঘর পর্যন্ত টেলিফোন নেয়া যায়নি। তার এত লম্বা নয়। টেলিফোন বারান্দায় রাখা। আমি রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলা পাওয়া গেল, এটা কি রিনকিদের বাসা ?

হ্যাঁ ।

দয়া করে ওকে একটু ডেকে দেবেন ?

আপনি কে আমি জানতে পারি? এ বাড়ির নিয়মকানুন খুব কড়া, অপরিচিত লোক যদি রিনকিকে ডাকে তাহলে রিনকিকে বলা যাবে না ।

আমি এজাজ ।

আপনি কি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ?

জি।

আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম...

আপনি কে তা আমি বুঝতে পেরেছি— আপনি হচ্ছেন হিমুভাই।

আমি সত্যি সত্যি চমৎকৃত হলাম। এর মধ্যে রিনকি আমার গল্প করে ফেলেছে ? এমনভাবে করেছে যে ভদ্রলোক চট করে আমার কয়েকটা বাক্যতেই আমাকে চিনে ফেললেন। ভদ্রলোকের বুদ্ধি তো ভালোই। এমন বুদ্ধিমান একজন মানুষ রিনকির মতো গাধা টাইপের একটি মেয়ের সঙ্গে জীবন কী করে টেনে নেবে কে জানে। হ্যালো! হ্যালো! লাইন কি কেটে গেল?

না, কাটেনি।

আপনি কি হিমু ভাই ?

হ্যাঁ।

রিনকি বলেছে আপনার নাকি অলৌকিক তা আছে।

কী রকম ক্ষমতা।

প্রফেটিক ক্ষমতা । আপনি নাকি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন । আপনি যা বলেন তা-ই নাকি হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। এই জাতীয় প্রসঙ্গে এলে চুপ করে থাকাই নিরাপদ। হ্যাঁ-না কিছু বললেই তর্কের মুখোমুখি হতে হয়। তর্ক করতে আমার ভালো লাগে না।

হ্যালো! হ্যালো! লাইনটা ডিসটার্ব করছে।

হ্যালো হিমুভাই!

বলুন।

আপনি কি দয়া করে একটু রিনকিকে...

ওকে তো দেয়া যাবে না। ও আশেপাশে নেই। বাবার সেবা করছে। উনি অসুস্থ ।

অসুস্থ ? কী বলছেন? সিরিয়াস কিছু ?

সিরিয়াস বলা যেতে পারে।

বলেন কী! আমি আসব?

আমি কয়েক মুহূর্ত দ্রুত চিন্তা করে বললাম, আসতে অসুবিধা হবে না তো ?

না-না অসুবিধা কী! আমার গাড়ি আছে।

আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

হোক। বিপদের সময় উপস্থিত না থাকলে কী করে হয় ?

তা তো বটেই। আপনি এক্ষুনি রওনা না হয়ে ঘণ্টাখানেক পরে আসুন।

কেন বলুন তো ?

এমনি বললাম ।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনার কথা অগ্রাহ্য করব না। যেসব কথা আমি শুনেছি— মাই গড। আপনি দয়া করে আমার সম্পর্কেও কিছু বলবেন। মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ।

আচ্ছা বলব ।

হিমুভাই, তাহলে রাখি ? আর ইয়ে, আমি যে আসছি এটা রিনকিকে বলবেন না। একটা সারপ্রাইজ হবে।

আমার টেলিফোন-ব্যাধি আছে। একবার টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বললে, আবার অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। রূপাদের বাসায় করলাম। রূপার বাবা ধরতেই বললাম, আচ্ছা, এটা কি রেলওয়ে বুকিং? রূপার বাবা বললেন, জি-না। আপনার রঙ নাম্বার হয়েছে। তখন আমি বললাম, জাস্ট ওয়ান মিনিট, রূপা কি জেগে আছে ?

রূপার বাবার হাইপ্রেসার বা এই জাতীয় কিছু বোধহয় আছে। অল্পতেই রেগে গিয়ে এমন হৈচৈ শুরু করেন যে বলার মত না। আমার কথাতেও তাই হল। তিনি চিড়চিড়িয়ে উঠলেন, কে ? কে ? এই ছোকরা, তুমি কে ?

তিনি খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। আমি রিসিভার রেখে দিলাম। রূপার বাবা নিশ্চয়ই সবাইকে ডেকে এই ঘটনা বলবেন। রূপা সঙ্গে সঙ্গে বুঝবে কে টেলিফোন করেছিল। সে হাসবে না রাগ করবে কে জানে। যেখানে রাগ করা উচিত সেখানে সে রাগ করে না, হাসে । যেখানে হাসা উচিত সেখানে রাগ করে ।

আমি ওয়ান সেভেনে রিং করে জাস্টিস এম. সোবহানের বাসা চাইলাম । সম্ভব হলে মীরা বা মীরুর সঙ্গেও কথা বলা যাবে। কী বলব ঠিক করা হলো না। যা মনে আসে, তাই বলব। আগে থেকে ভেবেচিন্তে কিছু বলা আমার স্বভাবে নেই।

হ্যালো ।

কে, মীরা ?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

আমার নাম টুটুল।

কে ?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। মনে হচ্ছে মীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত। আমার মনে হয়, কথা বলবে কি বলবে না বুঝতে পারছে না।

ভুলে গেছেন ? ঐ যে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। কী করেছিলাম আমি বলুন তো?

কোত্থেকে টেলিফোন করছেন ?

হাসপাতাল থেকে । পুলিশ মেরে আমার অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে। রক্তবমি করছিলাম ।

সে কী কথা, মারবে কেন !

পুলিশের হাতে আসামি তুলে দেবেন আর পুলিশ আসামিকে কোলে বসিয়ে মণ্ডা খাওয়াবে ? আমি তো আপনাদের কোনোই ক্ষতি করিনি। গাড়িতে ডেকেছেন, উঠেছি। তাছাড়া আপনারা টুটুল টুটুল করছিলেন। আমার ডাকনামও টুটুল।

আপনি কিন্তু বলেছেন, আপনার নাম টুটুল নয়।

হ্যাঁ বলেছিলাম। কারণ, বুঝতে পারছিলাম আপনি অন্য টুটুলকে খুঁজছিলেন যার কপালে একটা কাটা দাগ ।

ওপাশে অনেকক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। অন্ধকারে ঢ়িল ছুড়েছিলাম। মনে হচ্ছে লেগে গেছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! যা বলি প্রায় সময়ই তা কেমন যেন মিলে যায়। টুটুলের কপালের কাটা দাগের কথাটা হঠাৎ মনে এসেছিল। ভাগ্যিস এসেছিল!

হ্যালো, আপনি কোনো হাসপাতালে আছেন ?

কেন, দেখতে আসবেন ?

বলুন না কোন হাসপাতালে?

বাসায় চলে যাচ্ছি। ওরা বুকের এক্সরে করেছে। দুটা স্টিচ দিয়েছে। বলেছে ভর্তি হবার দরকার নেই।

আমি এক্ষুনি বাবাকে বলছি। থানায় টেলিফোন করবেন।

আমি শব্দ করে হাসলাম ।

হাসছেন কেন ?

পুলিশ কি কখনো মারের কথা স্বীকার করে ? কখনো করে না। আচ্ছা রাখি ।

না না, রাখবেন না। প্লিজ । না । প্লিজ।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। ঠিক তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হলো । কালবোশেখি ঝড়। কালবোশেখি ঝড় সাধারণত চৈত্র মাসেই হয়। ঝড়ের নাম হওয়া উচিত ছিল কালচৈত্র ঝড়। দেখতে দেখতে অসহ্য গরম চলে গিয়ে চারদিক হিম-শীতল হয়ে গেল । নির্ঘাৎ আশেপাশে কোথাও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজব কি ভিজব না মনস্থির করতে পারছি না।

রিনকি বের হয়ে এল বাবার ঘর থেকে । তাকে কেমন যেন শঙ্কিত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, রিনকি, তুই একটু বসার ঘরে যা । কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে দিবি।

রিনকি বিস্মিত গলায় বলল, কেন ?

তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

রিনকি নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেল বাজল । আমার মনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দেখা হোক দুজনের। দীর্ঘস্থায়ী হোক এই মুহূর্ত। রিনকি দরজা খুলেছে। না জানি তার কেমন লাগছে।

আমি বাদলের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। নদীটাকে আনা যায় কিনা দেখা যাক। যদি আনতে পারি ওদের দুজনকে কিছুক্ষণের জন্যে এই নদী ব্যবহার করতে দেব।

হিমুভাই!

তুই কি এখনো জেগে আছিস ?

হু। রাতে আমার ঘুম হয় না।

বলিস কী!

ঘুমের অষুধ খাই। তাতেও লাভ হয় না। দশ মিলিগ্রাম করে ফ্রিজিয়াম।

আজ খেয়েছিস ?

না । আজ সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব ।

গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। আয়, তোকে ঘুম পাড়িয়ে দি।

ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।

আজ ঘুমিয়ে থাক। কাল গল্প করব।

ঘুম আসবে না।

বললাম, ঘুম এনে দিচ্ছি। না-কি তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না ?

কী যে বল ! কেন বিশ্বাস করব না ? তুমি যা বল তাই হয়।

বেশ, তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করলাম ।

মনে কর তুই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। চৈত্র মাসের কড়া রোদ। হাঁটছিস শহরের রাস্তায়।

হ্যাঁ।

এখন তুই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিস। গ্রাম, বিকেল। সূর্য নরম। রোদে কোনো তেজ নেই। ফুরফুর বাতাস। তোর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

হু।

হঠাৎ তোর সামনে একটা নদী পড়ল। নদীতে হাঁটুজল। কী ঠাণ্ডা পানি! কী পরিষ্কার! আঁজলা ভরে তুই পানি খাচ্ছিস । ঘুমে তোর চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে নদীর মধ্যেই শুয়ে পড়তে।

হু।

নদীর ধারে বিশাল একটা পাকুড় গাছ। তুই সেই পাকুড় গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিস। এখন শুয়ে পড়লি। খুব নরম হালকা দূর্বাঘাসের উপরে শুয়েছিস। আর জেগে থাকতে পারছিস না। রাজ্যের ঘুম তোর চোখে ।

বাদল এবার আর হু বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। এই ঘুম সহজে ভাঙবে না।

কেউ যদি এটাকে কোনো অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু ভেবে বসেন তাহলে ভুল করবেন । পুরো ব্যাপারটার পেছনে কাজ করছে আমার প্রতি বাদলের অন্ধভক্তি। যে ভক্তি কোনো নিয়ম মানে না। যার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো।

বাদল না হয়ে অন্য কেউ যদি হতো তাহলে আমার এই পদ্ধতি কাজ করত না । এই ছেলেটা আমাকে বড়ই পছন্দ করে। সে আমাকে মহাপুরুষের পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। আমি মহাপুরুষ না ।

আমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলি। অসহায় মানুষদের দুঃখকষ্ট আমাকে মোটেই অভিভূত করে না। একবার আমি একজন ঠেলাঅলার গালে চড়ও দিয়েছিলাম। ঠেলাআলা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে রাস্তার ড্রেনে ফেলে দিয়েছিল। নোংরা পানিতে আমার সমস্ত শরীর মাখামাখি। সেই অবস্থাতেই উঠে এসে আমি তার গালে চড় বসালাম। বুড়ো ঠেলাআলা বলল, ধাক্কা দিয়া না ফেললে আপনে গাড়ির তলে পড়তেন। আসলেই তাই। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখান দিয়ে একটা পাজেরো জিপ টার্ন নিল। নতুন আসা এই জিপগুলির আচার-আচরণ ট্রাকের মতো। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মরলে মরতাম। তাই বলে তুমি আমাকে নর্দমায় ফেলবে ?

ঠেলাআলা করুণ গলায় বলল, মাফ কইরা দেন। আর ফেলুম না।

আমি আগের চেয়ে রাগী গলায় বললাম, মাফের কোনো প্রশ্নই আসে না। তুমি কাপড় ধোয়ার লন্ড্রির পয়সা দেবে।

গরিব মানুষ।
গরিব মানুষ, ধনী মানুষ বুঝি না। বের কর কী আছে ?
অবাক বিস্ময়ে বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে রইল।
আমি বললাম, কোনো কথা শুনতে চাই না বের কর কী আছে। মাঝে মাঝে মানুষকে তীব্র আঘাত করতে ভালো লাগে। কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় কাউকে দগ্ধ করার আনন্দের কাছে সব আনন্দই ফিকে । এই লোকটি আমার জীবন রক্ষা করেছে। সে কল্পনাও করেনি কারোর জীবন রক্ষা করে সে এমন বিপদে পড়বে। যদি জানত এই অবস্থা হবে তাহলেও কি সে আমার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করত ?
বুড়ো গামছায় মুখের ঘাম মুছতে বলল, বুড়ো মানুষ, মাফ কইরা দেন।
টাকাপয়সা কিছু তোমার কাছে নেই ?
জ্বে না। কাইলও কোনো টিরিপ পাই নাই, আইজও পাই নাই।
যাচ্ছ কোথায় ?
রায়ের বাজার।
ঠিক আছে। আমাকে কিছুদূর তোমার গাড়িতে করে নিয়ে যাও। এতে খানিকটা হলেও উসুল হবে।
আমি তার গাড়িতে উঠে বসলাম। বৃদ্ধ আমাকে টেনে নিয়ে চলল। পেছন থেকে ঠেলছে তার নাতি কিংবা তার ছেলে। এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় তারা দুজনই মর্মাহত। পৃথিবী যে খুবই অকরুণ জায়গা তা তারা জানে। আমি আরো ভালোভাবে তা জানিয়ে দিচ্ছি।
রাস্তায় এক জায়গায় ঠেলাগাড়ি থামিয়ে আমি চা আনিয়ে গাড়িতে বসে বসেই খেলাম। তাকিয়ে দেখি, বাচ্চা ছেলেটির চোখমুখ ক্রোধ ও ঘৃণায় কাল হয়ে গেছে। যেকোনো মুহুর্তে সে ঝাপিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি তার ভেতর এই ক্রোধ এবং এই ঘৃণা আরো বাড়ুক তাই চাচ্ছি। মানুষকে সহ্যের শেষসীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সহজ কথা না। সবাই তা পারে না। যে পারে তার ক্ষমতাও হেলাফেলা করার মতো ক্ষমতা না ।
বুড়ো রাস্তার উপর বসে গামছায় হাওয়া খাচ্ছে। তার চোখে আগেকার বিস্ময়ের কিছুই আর এখন নেই। একধরনের নির্লিপ্ততা নিয়ে সে তাকিয়ে আছে।
আমি চা শেষ করে বললাম, বুড়ো মিয়া, চল যাওয়া যাক। আমরা আবার রওনা হলাম। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় এসে বললাম, থামাও, গাড়ি থামাও । এখানে নামব ।
আমি নামলাম। পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করলাম। আমার মানিব্যাগ সবসময়ই খালি থাকে। আজ সেখানে পাচশ টাকার দুটা চকচকে নোট আছে। মজিদের টিউশনির টাকা । মজিদ টাকা হাতে পাওয়ামাত্র খরচ করে ফেলে বলে তার টাকাপয়সার সবটাই থাকে আমার কাছে।
বুড়া মিয়া।
জি ।
তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। কাজটা খুব ভালো করনি। যাই হোক, করে ফেলেছ যখন তখন তো আর কিছু করার নাই। তোমাকে ধন্যবাদ। দেখি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে কেমন লাগে। তোমাকে আমি সামান্য কিছু টাকা দিতে চাই। এই টাকাটা আমার জীবন রক্ষার জন্যে না । তুমি যে কষ্ট করে রোদের মধ্যে

আমাকে টেনে টেনে এতদূর আনলে তার জন্যে। পাঁচশ তোমার, পাঁচশ এই ছেলেটার।

বুড়ো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি কোমল গলায় বললাম, এই রোদের মধ্যে আজ আর গাড়ি নিয়ে বের হয়ো না। বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর ।

বুড়োর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

ব্যাপারটা এরকম ঘটবে আমি তাই আশা করছিলাম। বাচ্চা ছেলেটির মুখে ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন এখন আর নেই। তার চোখ এখন অসম্ভব কোমল। আমি বললাম, এই, তোর নাম কী রে ?

লালটু মিয়া।

প্যান্টের বোতাম লাগা বেটা। সব দেখা যাচ্ছে। লালটু মিয়া হাত দিয়ে প্যান্টের ফাকা অংশ ঢাকতে ঢাকতে বলল, বোতাম নাই।

তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান । হাত সরিয়ে ফেল। আলো হাওয়া যাক ।

লালটু মিয়া হাসছে।

হাসছে বুড়ো ঠেলাঅলা। তাদের কাছে এখন আমি তাদেরই একজন। বুড়ো বলল, আব্বাজি আসেন, তিনজনে মিল্যা চা খাই । তিয়াশ লাগছে।

পয়সা কে দেবে ? তুমি ? আমার হাতে কিন্তু আর একটা পয়সাও নেই।

বুড়ো আবার হাসল।

আমরা একটা চায়ের দোকানের দিকে রওনা হলাম। নিজেকে সেই সময় মহাপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। আমি মহাপুরুষ নই। কিন্তু এই ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার বড় ভালো লাগে । মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করি, মনে হয় ভালোই করি। সত্যিকার মহাপুরুষরাও সম্ভবত এত ভালো করতেন না।

আমি অবশ্যি এখন পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ দেখিনি। তাদের চিন্তাভাবনা কাজকর্ম কেমন তাও জানি না। মহাপুরুষদের কিছু জীবনী পড়েছি। সেইসব জীবনীও আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। টলষ্টয় তেরো বছরের একজন বালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সেই ভয়াবহ ঘটনা তিনি স্বীকার করেছেন। আমরা সবাই তো আমাদের ভয়ঙ্কর পাপের কথা স্বীকার করি না ।

আমার মতে, মহাপুরুষ হচ্ছে এমন একজন যাকে পৃথিবীর কোনো মালিন্য স্পর্শ করেনি। এমন কেউ কি সত্যি সত্যি জন্মেছে এই পৃথিবীতে ?

ঘুমুতে চেষ্টা করছি। ঘুমুতে পারছি না। অসহ্য গরমে ঘুমুতে আমার কষ্ট হয় না, কিন্তু আজকের এই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছে না। শীত-শীত লাগছে। খালিগায়ে থাকার জন্যে লাগছে। খালিগায়ে থাকার কারণ আমার পাঞ্জাবি এখন বাদলের গায়ে ।

শুয়ে শুয়ে ছেলেবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। বিশেষ কোনো কারণে নয় । ঘুমুবার আগে কিছু-একটা নিয়ে ভাবতে হয় বলেই ভাবা।

আমার শৈশব যাদের সঙ্গে কেটেছে—তারা কেমন!

জন্মের সময় আমার মা মারা যান । মার কথা কিছুই জানি না। তিনি দেখতে কেমন তাও জানি না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তার কোনো ছবি নেই।

বাবা মারা যান আমার ন-বছর বয়সে। তার কথা তেমন মনেও নেই। তার কথা মনে পড়লেই একটা উদ্বিগ্ন মুখ মনে আসে। সেই মুখে বড় বড় দুটি চোখ। ভারি চশমায় ঢাকা বলে সেই চোখের ভাবও ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় পানির ভেতর থেকে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবার উদ্বিগ্ন গলা, কী রে তোর ব্যাপারটা কী বলত? যত্ন হচ্ছে না? আমি তো প্রাণপণ করছি। অবশ্যি ছেলে মানুষ করার কায়দা-কানুনও আমি জানি না। কী যে ঝামেলায় পড়লাম! তোমার অসুবিধাটা কী বল তো ? পেট ব্যথা করছে?

বাবার বোধহয় ধারণা ছিল শিশুদের একটিমাত্র সমস্যা— পেটে ব্যথা । তারা যখন মন খারাপ করে বসে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেট ব্যথা করছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে কোনো শিশু যদি জেগে উঠে কাঁদতে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেটে ব্যথা । বাবার কাছ থেকে কত অসংখ্যবার যে শুনেছি— কী রে হিমু, তোর কি পেটব্যথা নাকি ? মুখটা এমন কালো কেন ? কোন জায়গাটায় ব্যথা দেখি ।

বাবা যে একজন পাগল ধরনের মানুষ এটা বুঝতে আমার তেমন দেরি হয়নি। শিশুদের বোধশক্তি ভালো। পাগল না হলে নিজের ছেলের নাম কেউ হিমালয় রাখে ?

স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন– হেডস্যার গম্ভীর গলায় বললেন, ছেলের নাম কী বললেন ? হিমালয়!

জি ।

আহম্মদ বা মোহম্মদ এইসব কিছু আছে ?

জি না, শুধুই হিমালয়।

হেডস্যার অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নদীর নামে মানুষের নাম হয়, ফুলের নামে হয়, গাছের নামে হয়, হিমালয়ের নামে নাম হতে দোষ কী ?

হিমালয় নাম রাখার বিশেষ কোনো তাৎপর্য কি আছে ?

অবশ্যই আছে—যাতে এই ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মতো বড় হয় সেইজন্যেই এই নাম ।

তাহলে আকাশ নাম রাখলেন না কেন ? আকাশ তো আরো বড়।

বড় হলেও তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হিমালয়কে স্পর্শ করা যায়।

কিছু মনে করবেন না, এই নামে স্কুলে ছেলে ভর্তি করা যাবে না।

এমন কোনো আইন আছে যে হিমালয় নাম রাখলে সেই ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না ?

আইন-টাইন আমি জানি না। এই ছেলেকে আমি স্কুলে নেব না।

কেন ?

আগে তো বললেন সিট আছে।

এখন নেই।

শিক্ষক হয়ে মিথ্যা কথা বলছেন- তাহলে তো এখানে কিছুতেই ছাত্র ভর্তি করা উচিত না । মিথ্যা কথা বলা শিখবে।

খুবই ভালো কথা। তাহলে এখন যান।

এই দীর্ঘ কথোপকথনের কিছুই আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। বাবা প্রতিটি ঘটনা লিখে রেখে গেছেন বলে বলতে পারলাম। বাবার মধ্যে গবেষণাধর্মী একটা স্বভাব ছিল। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে গেছেন। তার বিদ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার পর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। আর ফিরে যাননি। জীবিকার জন্যে ঠিক কী করতেন তা পরিষ্কার নয়।

জ্যোতিষবিদ্যা,সমুদ্রজ্ঞান, লক্ষণবিচার এই জাতীয় বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয় মানুষের হাত-টাত দেখতেন। একটা প্রেসের সঙ্গেও সম্ভবত যুক্ত ছিলেন। কয়েকটা নোটবইও লিখেছিলেন। নোটস অন প্রবেশিকা সমাজবিদ্যা। এরকম একটা বই।

তার পরিবারের কারোর সঙ্গেই তার কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তাদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি বাবার মৃত্যুর পর। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা তার বড়বোনকে একটি চিঠি লিখে জানান যে তার মৃত্যু হলে আমাকে যেন আমার মামার বাড়ি পাঠানো হয়। এটাই তার নির্দেশ । এর অন্যথা যেন না হয় ।

চিঠি পাওয়ার পরপরই বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনে আমাদের ছোট্ট বাসা ভর্তি হয়ে যায়। আমার দাদাজানকে আমি তখনি প্রথম দেখি। সুঠাম স্বাস্থের টকটকে গৌর বর্ণের একজন মানুষ। চেহারার কোথায় যেন জমিদার-জমিদার একটা ভাব আছে। তিনি আমার মরণাপন্ন বাবার হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমি বাবা তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে, আর না।

আমার বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা যাক, ক্ষমা করলাম। কিন্তু আমি চাই না আমার ছেলে আপনাদের সঙ্গে মানুষ হোক। ও যাবে তার মামাদের কাছে।

তার মামারা কি আমাদের চেয়ে ভালো ?

না, ওরা পিশাচশ্রেণীর—ওদের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু শিখবে।

আমার দাদাজান এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। বৃদ্ধ একজন জমিদার-ধরনের মানুষ কাঁদছে এই দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন—

তুই এক পাগল, তোর ছেলেটাকেও তুই পাগল বানাতে চাস ?

এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

আমাদের বড়লোক আত্মীয়স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের বাসার সাজসজ্জা দেখতে থাকেন। এর ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে আমার দাদাজানের কিছু কথাবার্তা হলো । যেমন—

ঢাকায় কতদিন ধরে আছিস ?

প্রায় তিনবছর ?

এর আগে কোথায় ছিলি ?

তা দিয়ে আপনার দরকার কী?

তোর মা যখন অসুস্থ তখন খবরের কাগজে তোর ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম ।

খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

আমার বড়ফুপু এই পর্যায়ে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকলেন। আদুরে গলায় বললেন, খোকা, তোমার নাম কী ?

আমি বললাম, হিমালয়।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন ছেলের নাম কি সত্যি সত্যি হিমালয় রেখেছিস ?

হু ।

বাবার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাকে বড় একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো । আপত্তি করার মতো অবস্থাও তার ছিল না। কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দু-একটা ছোটখাটো বাক্য বলতেও তার অসম্ভব কষ্ট হতো। তাকে বাইরে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হবে এমন কথা শোনা যেতে লাগল। বাবা তাদের সেই সুযোগ দিলেন না। ক্লিনিকে ভর্তি হবার ন'দিনের দিন মারা গেলেন।

সজ্ঞানে মৃত্যু যাকে বলে। মৃত্যুর আগ মুহুর্তেও টনটনে জ্ঞান ছিল। আমাকে বললেন, তোমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছি। সেগুলি মন দিয়ে পড়বে। তবে লেখাটা অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ করবার সময় হলো না। আমার দিকের কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না এবং তাদের সাহায্য নেবে না। তবে ষোলো বছর পর তুমি যদি মনে কর আমার সিদ্ধান্ত ভুল, তখন তুমি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এর আগ পর্যন্ত মামাদের সঙ্গে থাকবে। মনে রাখবে, তোমার মামারা পিশাচশ্রেণীর। পিশাচশ্রেণীর মানুষদের সংস্পর্শে না এলে, মানুষের সৎগুণ সম্পর্কে ধারণা হবে না।

ডাক্তার সাহেব এই পর্যায়ে বললেন, আপনি দয়া করে চুপ করুন। ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

বাবা শীতল গলায় বললেন, প্রতিপদ শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ায় আমার মৃত্যু হবার কথা। কাজেই আমাকে বিরক্ত করবেন না। সবচে’ জরুরি কথাটাই আমার ছেলেকে বলা হয়নি— শোন হিমু, কোনোরকম উচ্চাশা রাখবি না। টাকাপয়সা করতে হবে, বড় হতে হবে, এইসব নিয়ে মোটেও ভাববি না। সমস্ত কষ্টের মূলে আছে আমাদের উচ্চাশা। আমার উচ্চাশা ছিল বলে প্রথমদিকে খুবই কষ্ট পেয়েছি। শেষেরদিকে উচ্চাশা ত্যাগ করতে পেরেছিলাম। তাই খানিকটা আনন্দে ছিলাম। আনন্দে থাকাটাই বড় কথা । সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করবি ।

বাবা কথা বলতে বলতেই একটু থামলেন, হটাৎ গভীর আগ্রহ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে তাকালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, ও আচ্ছা, তাহলে এর নামই মৃত্যু। এটা মন্দ কী ? মৃত্যু তাহলে খুব ভয়াবহ নয়।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবার মৃত্যু হলো।

আমি কিছুদিন আমার দাদাজানের সঙ্গে থাকলাম । তিনি আমার প্রসঙ্গে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন ।

আরে, এটা কেমন ছেলে! বাবা মরে গেল, একফোঁটা চোখের পানি নেই। এ তো দেখি তার বাপের চেয়ে পাগল হয়েছে। এইদিকে আয় । বাপ-মা মারা গেলে চোখের পানি ফেলতে হয় ।

আমি শীতল গলায় বললাম, আমাকে তুই তুই করে বলবেন না।

তিনি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ।

দাদাজানের বাড়িটা বিশাল। সেই বিশাল বাড়ির দোতলায় একটা ঘর আমাকে দেয়া হলো। সেই ঘরে এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রাইভেট টিউটর থাকেন। তার নাম কিসমত মোল্লা ।

তিনি যখন শুনলেন আমি কোনো স্কুলে পড়ি না, এতদিন বাবার কাছে পড়েছি, তখন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

কী পড়েছ বাবার কাছে ?

ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, আর নীতিশাস্ত্র।

নীতিশাস্ত্রটা কী ?

কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এইসব ।

কী বলছ কিছুই তো বুঝলাম না।

যেমন ধরুন মিথ্যা। মিথ্যা বলা মন্দ। তবে আনন্দের জন্যে মিথ্যা বলায় অন্যায় নেই। মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

বলছ কী এসব ? বুঝিয়ে বল।

যেমন ধরুন, গল্প উপন্যাস এসব মিথ্যা। কিন্তু এসব মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

মাস্টার সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

নিজেকে অতিদ্রুত সামলে নিয়ে বললেন,– অমাবস্যা ইংরেজি কি জানো ?

জানি। অমাবস্যা হল নিউমুন, বলে নিউমুন কিন্তু আকাশে তখন চাঁদ থাকে না।

মৃন্ময় শব্দের মানে কী?

মৃন্ময় হলো মাটির তৈরি।

মাস্টার সাহেব আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। কিন্তু এই বাড়ির অন্য কেউ হলো না। আমার দাদাজান ক্রমাগত বলতে লাগলেন– তোর বাবা ছিল পাগল । উন্মাদ । ও যেসব শিখিয়েছে সব ভুলে যা। সব নতুন করে শিখবি। তোকে ভালো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর শোন, তোর নাম দিলাম চৌধুরী ইমতিয়াজ। মনে থাকবে ?

দাদাজান বাড়িতে ঘোষণা করে দিলেন- একে কেউ হিমালয় বা হিমু, কিছুই ডাকতে পারবে না। এর নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী, ডাক নাম টুটুল। মনে থাকবে ? এই ছেলের মাথার ভিতর এই নাম দু'টা ঢুকিয়ে দিতে হবে। সারাদিনে খুব কম করে হলেও একে পঁচিশ বার চৌধুরী এবং পঁচিশ বার টুটুল ডাকতে হবে, its an order.

প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ময়লা পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর একটা কোট চড়িয়ে অত্যন্ত রুগ্ন এক লোক বসার ঘরে বসে আছে। তার হাতে চকচকে নতুন একটা ছাতা, মনে হচ্ছে আজই কেনা হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখভর্তি পান। এস্ট্রেতে সেই পানের পিক ফেলছেন। তার বসে থাকার ভঙ্গি, পান খাওয়ার ভঙ্গি এবং পানের পিক ফেলার ভঙ্গিতে কোনো সংকোচ নেই। যেন এই বাড়ির সঙ্গে তার খুব ভালো পরিচয় । যেন এটা তার নিজেরই ঘরবাড়ি।

আমি ঘরে ঢোকামাত্রই বললেন— বাবা হিমালয়, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমি তোমার বড়মামা । আমাকে সালাম কর।

দাদাজান গম্ভীর গলায় বললেন, আমি তো আপনাকে বলেছি তাকে নিতে পারবেন না। সে গ্রামে গিয়ে কী করবে ? সে এইখানেই থাকবে। পড়াশোনা করবে। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

আমার বড়মামা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। যেন এইরকম হাস্যকর কথা তিনি আগে কখনো শুনেননি ।

দেখেন তালই সাহেব, ছেলের বাবা পত্র-মারফত আমাকে এই অধিকার দিয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা দিতে না চান বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। কোর্টে ফয়সালা হবে। উপায় কী! যদিও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা কোনো কাজের কথা না ।

দাদাজানের মুখে কোনো কথা এল না। বড়মামা এস্ট্রেতে আর একবার পানের পিক ফেলে বললেন, বাবার ইচ্ছামতোই কাজ হোক। খামাখা আপত্তি করছেন কেন ? ছেলের খরচাপাতির জন্যে মাসে মাসে টাকা দিবেন। তাহলেই তো হয় ।

আপনি কী করেন ?

তেমন কিছু না। সামান্য বিষয়-সম্পত্তি আছে। টুকটাক ব্যবসা আছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম। এইবার জিততে পারি নাই। তেরো ভোটে ঠগ খেয়েছি। যদি অনুমতি দেন একটা বেয়াদবি করি ?

কী বেয়াদবি ?

একটা সিগারেট ধরাই। এমন নেশা হয়েছে, না খেলে দমটা বন্ধ হয়ে আসে।

বড়মামা অনুমতির অপেক্ষা না করেই সিগারেট ধরালেন।

দাদাজান বললেন, আপনি একে নিতে চাচ্ছেন, কারণ, আপনার ধারণা একে নিলে মাসে মাসে মোটা টাকা পাবেন । তাই না ?

বড়মামা অত্যন্ত বিক্ষিত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, এই হাতের পাঁচ আঙুলের ভিতর দিয়া অনেক টাকা গেছে। অনেক টাকা আসছে। টাকা আমার কাছে কিছুই না। আসছি রক্তের টানে। রক্তের টান কঠিন তালই সাহেব । এই যে বোন বিয়ে দিলাম, তারপর আর কোনো খোঁজ নাই। কী যে যন্ত্রণা! কোনো চিঠিপত্র নাই। শুনি আজ এই জায়গায়, কাল শুনি ভিন্ন জায়গায়। কী যে যন্ত্রণা! যাক, হিমালয় বাবাকে দেখে মনটা শান্ত হয়েছে। তা বাবা, নাম কি সত্যি হিমালয় ?

আমি কিছু বলার আগেই দাদাজান বললেন, না, ওর নাম চৌধুরী ইমতিয়াজ ।

চৌধুরী আগে কী জন্যে ? চৌধুরী থাকবে পিছে। আগে ঘোড়া তারপর গাড়ি। কি বলেন তালই সাব ?

দাদাজান কোনো উত্তর দিলেন না। তার চোখেমুখে ক্রোধ ও ঘৃণা।

চা এবং কেক এনে কাজের ছেলে সামনে রাখল। বড়মামার মুখে পান, সেই

অবস্থাতেই চায়ে চুমুক দিলেন। কেক হাতে নিলেন।

দাদাজান বললেন, আমার ছেলে আপনার বোনের খোজ পেল কী করে ? সেটা তালই সাব, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হতো। আফসোস, সে জীবিত নাই! আমরা আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করি নাই। সে বন্ধুর সাথে আমাদের অঞ্চলে এসেছিল। তারপরে কেমনে কেমনে হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী, তালই সাব, বিয়ের পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বোনের খোঁজ নাই। বোনজামাইয়েরও খোঁজ নাই। নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে নামকাওয়াস্তে বিয়ে করে নিয়ে গেছে, পাচার করে দেবে। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, তারপর ধরেন মিডল ইষ্ট । এইসব জায়গায় মেয়েকে ভাড়া খাটাবে।

বাচ্চাছেলের সামনে এরকম কুৎসিত কথা বলবেন না।

কুৎসিত কথা না, এগুলি সত্যি কথা। এইরকম পার্টি আছে।

সত্যি কথা সবসময় বলা যায় না।

আমার কাছে এটা পাবেন না, তালই সাব । সত্য কথা আমি বলবই। ভালো লাগুক আর না লাগুক ।

তাই নাকি ?

জি। আর হিমালয় বাবাকে নিয়ে যাব। পরশু সকালে এসে নিয়ে যাব । তৈরি থাকতে বলবেন । মামলার তদবিরে এসেছি। দুটা দিন লাগবে।

এই ছেলেকে আমি আপনার সঙ্গে দেব না।

এসব বলবেন না তালই সাব। আত্মীয়ের মধ্যে গণ্ডগোল আমার পছন্দ হয় না। আইনের আশ্রয় নিলে আপনারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি। আর্থিক ক্ষতি, মানসিক ক্ষতি । কোর্ট ফি এখন বাড়ায়ে করেছে তিনগুণ। গরিব মানুষ যে একটু মামলা-মোকদ্দমা করবে সে উপায় রাখে নাই। বাবা হিমালয়, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও না ?

চাই ।

এইটা তো বাপের ব্যাটা। আজ তাহলে উঠি তালই সাব। বেয়াদবি যদি কিছু করে থাকি মাফ করে দিবেন। আপনার পায়ে ধরি।

বড়মাম সত্যি সত্যি পা ধরতে এগিয়ে গেলেন। দাদাজান চমকে সরে গেলেন।

দুদিন পর আমি মামার সঙ্গে রওনা হলাম।

গন্তব্য ময়মনসিংহের হিরণপুর।

আমার বাবা অনেকবারই বলেছেন, আমার মামারা পিশাচশ্রেণীর। কাজেই তাদের সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল। আমি বড়মামা এবং অন্য দুই মামার আচার-আচরণে মোটেই অবাক হলাম না।

মামার বাড়ি উপস্থিত হবার তৃতীয় দিনের একটা ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনা থেকে মামাদের মানসিকতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

বড়মামার বাড়িতে তিনটা বিড়াল ছিল। এরা খুবই উপদ্রব করত। বড়মামার নির্দেশে বিড়াল তিনটাকে ধরা হলো । তিনি বললেন, হাদিসে আছে বিড়াল উপদ্রব করলে— আল্লাহর নামে এদের জবেহ করা যায়। তাতে দোষ হয় না। দেখি বড় ছুরিটা বার কর । এই কাজ তো আর কেউ করবে না। আমাকে করতে হবে উপায় কী !

মামা নিজেই উঠানে তিনটা বিড়ালকে জবাই করলেন। এর মধ্যে একটা ছিল গর্ভবতী ।

ঐ বাড়িতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। তিন মামা একসঙ্গে স্কুলঘরের মতো লম্বা একটা টিনের ঘরে থাকতেন। পুরো বাড়িতে ছেলেপুলের বিশাল দল। তাদের জগৎ ছিল ভিন্ন। একসঙ্গে পুকুরে ঝাপ দেয়া, একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসা, একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া। জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলা, গোল্লাছুট খেলা। খাওয়াও হতো একসঙ্গে । এক মামী ভাত দিয়ে যাচ্ছেন, আর-এক মামী দিচ্ছেন একহাতা করে তরকারি, দুইহাতা ডাল। চামুচে যা উঠে আসে তাই। কেউ বলতে পারবে না আমাকে এটা দাও-ওটা দাও। বললেই চামচের বাড়ি।

আমাদের মধ্যে মারামারি লেগেই ছিল। এ ওকে মারছে। সে তাকে মারছে। সেসব নিয়ে কোনো নালিশও হচ্ছে না। নালিশ দেয়ায় বিপদ আছে। একজন নালিশ দিল, কার বিরুদ্ধে নালিশ, কী সমাচার ভালোমতো শোনাই হলো না। হাতের কাছে যে-কয়জনকে পাওয়া গেল পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা হলো। সত্যিকার অপরাধী হয়তো শাস্তিও পেল না।

আমি এই বিশাল দলের সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেলাম। সীমাহীন স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা সচরাচর শিশুরা পায় না।

আমরা কী করছি না করছি বড়রা তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাত না।

একজনের হয়তো জ্বর হয়েছে। সে বিছানায় শুয়ে কুঁ কুঁ করছে। কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। নিতান্ত বাড়াবাড়ি না হলে ডাক্তার নেই। মাসে একবার নাপিত এসে সবকটা ছেলের মাথা প্রায় মুড়িয়ে দিয়ে ধান নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাপড়-জামারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এ ওরটা পরছে ! ও তারটা পরছে।

মামাদের বাড়ি থেকেই আমি মেট্রিক পাশ করি। যে-বছর মেট্রিক পাস করি বড়মামা সেই বছরই মারা যান। তার শত্রুর অভাব ছিল না। বলতে গেলে গ্রামের সবাই ছিল তার শত্রু ।

এক অন্ধকার বৃষ্টির রাতে একজন কেউ মাছ মারবার কোঁচ দিয়ে বড়মামাকে গেঁথে ফেলে। বিশাল কোচ। মামার পেট এফোড়-ওফোড় হয়ে যায়। কোচের খানিকটা পিঠ ছেদা করে বের হয়ে থাকে।

উঠানে চাটাই পেতে মামাকে শুইয়ে রাখা হয়। দৃশ্য দেখার জন্যে সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে। তাকে সদরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা হলো। মামা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এতক্ষণ বাঁচব না। তোমরা আমাকে থানায় নিয়ে যাও। মরার আগে আমি কারা এই কাজ করেছে বলে যেতে চাই ।

মামা কাউকেই দেখেননি তবু তিনি মৃত্যুর আগে আগে থানায় ওসির কাছে চারজনের নাম বললেন। তিনি বললেন, তার হাতে টর্চ ছিল। তিনি টর্চ ফেলে ফেলে এদের দেখেছেন ।

ওসি সাহেব মামার দেয়া জবানবন্দি লিখতে লিখতে বললেন– ভাই সাহেব, এই কাজটা করবেন না। ডেথ-বেড কনফেসন খুব শক্ত জিনিস। শুধুমাত্র এর ওপরই কোর্ট রায় দিয়ে দেবে। নির্দোষ কিছু মানুষকে আপনি জড়াচ্ছেন। এদের ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন হয়ে যাবে।

মামা বললেন, যা বলছি সবই সত্যি। কোরান মজিদ আনেন। আমি কোরান মজিদে হাত দিয়া বলি– ।

ওসি সাহেব বললেন, তার দরকার হবে না। নিন, এখানে সই করুন। এটা আপনার জবানবন্দি ।

মামা সই করলেন। মারা গেলেন থানাতেই। মরবার আগে মেঝো মামাকে কানে কানে বললেন—

এক ধাক্কায় চার শত্রু শেষ। কাজটা মন্দ হয় নাই ।

চার শত্রু শেষ করার গাঢ় আনন্দ নিয়ে মামা মারা গেলেন। তবে মৃত্যুর আগে আগে মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। তাকে খুবই আনন্দিত মনে হলো ।

বড়মামী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন, তাকে ডেকে বললেন, তওবা করে ফেলছি। এখন আর চিন্তা নাই। সব পাপ মাপ হয়ে গেল। সরাসরি বেহেশতে দাখিল হব । খামাখা কান্দ কেন ? তওবা সময়মতো করতে না পারলে অসুবিধা ছিল। আল্লাহপাকের অসীম দয়া! সময় পাওয়া গেছে। কান্দাকাটি না করে আমার কানের কাছে দরুদ পড়। কোরান মজিদ পাঠ কর ।

মামার মৃত্যুর পর আমি ঢাকা চলে এলাম। নতুন জীবন শুরু হলো বড়ফুপুর সঙ্গে ।

৪

প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি বড়ফুফু। পাশের বিছনা বালি। বাদল নেই। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে-জিনিসটা জানতে ইচ্ছা করে তা হচ্ছে– কটা বাজে ?

বড়ফুপুকে এই প্রশ্ন করব , তখন তিনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কেলেঙ্কারি হয়েছে।

কি কেলেঙ্কারি ?

মানুষকে মুখ দেখাতে পারব না রে ।

আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রাতে এসেছিল, তারপর আর ফিরে যায়নি— তাই তো ?

তুই জানলি কী করে ?

অনুমান করছি।

আমি সকালে একতলায় নেমে দেখি ঐ ছেলে আর রিনকি ? ছেলে নাকি রাতে তোর ফুপার অসুখের খবর পেয়ে এসেছিল। ঝড়বৃষ্টি দেখে আর ফিরে যায়নি। আর ঐ বদমেয়ে সারারাত ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প করেছে।

বল কী !

আমার তো হাত ঘামছে। কী রকম বদ মেয়ে চিন্তা করে দেখ। মেয়ের কত বড় সাহস ঐ ছেলে এসেছে ভালো কথা। আমাকে তো খবরটা দিবি ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ঐ ছেলেরই-বা কেমন আক্কেল ? রাত-দুপুরে এল কী জন্যে?

হ্যাঁ, দেখ না কাণ্ড! বিয়ে হয়নি। কিছু না, শুধু বিয়ের কথা হয়েছে—এর মধ্যে নাকি সারারাত জেগে গল্প করতে হবে! রাত কি চলে গেছে নাকি ?

খুবই সত্যি কথা ।

এখন ধর, কোনো কারণে বিয়ে যদি ভেঙে যায় তারপর আমি মুখ দেখাব

কীভাবে?

আমি এক্ষুনি নিচে যাচ্ছি ফুপু, ঐ ফাজিল ছেলের গালে ঠাস করে একটা চড় মারব। তারপর দ্বিতীয় চড় রিনকির গালে। মেয়ে বলে তাকে ক্ষমা করার কোনো অর্থ হয় না।

তুই সবসময় অদ্ভুত কথাবার্তা বলিস কেন ? ঐ ছেলের গালে তুই চড় মারতে পারবি?

কেন পারব না ?

যে ছেলে দুদিন পরে এ বাড়ির জামাই হচ্ছে তার গালে তুই চড় মারতে চাস ? তোর কাছে আসলাম একটা পরামর্শের জন্যে!

আজই ওদের বিয়ে লাগিয়ে দাও ।

আজই বিয়ে লাগিয়ে দেব ?

হু। কাজি ডেকে এনে বিয়ে পড়িয়ে দাও— ঝামেলা চুকে যাক। তারপর ওরা যত ইচ্ছা রাত জেগে গল্প করুক। আসল অনুষ্ঠান পরে হবে। বিয়েটা হয়ে যাক ।

ফুপু নিঃশ্বাস ফেললেন—মনে হচ্ছে আমার কথা তার মনে ধরেছে। আমি বললাম, তুমি চাইলে আমি ছেলেকে বলতে পারি।

ওরা আবার ভাববে না তো যে আমরা চাপ দিচ্ছি।

চাপাচাপির কী আছে ? ছেলে এমন কী রসগোল্লা ? মার্বেলের মতো সাইজ। বিয়ে যে দিচ্ছি এতেই তার ধন্য হওয়া উচিত। তার তিনপুরুষের ভাগ্য যে, আমরা...ফুপু বিরক্ত স্বরে বললেন, ছেলে এমনকী খারাপ ?

খারাপ তা তো বলছি না— একটু শর্ট। তা পুরুষ মানুষের শর্টে কিছু যায় আসে না। পুরুষ হচ্ছে সোনার চামুচ। সোনার চামুচ বাঁকাও ভালো ।

আজই বিয়ের ব্যাপারে ছেলে কি রাজি হবে ?

দেখি কথা বলে। আমার ধারণা, হবে।

তোর কথা তো সবসময় আবার মিলে যায়—একটু দেখ কথা বলে।

আমি আমার পাঞ্জাবি খুঁজে পেলাম না। ফুপু বললেন, বাদল ভোরবেলায় ঐ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বের হয়েছে।

আমি বাদলের একটা শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নামতেই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, হিমুভাই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। খুব লজ্জা লাগছে অবশ্যি ।

বলে ফেল ।

রিনকির খুব শখ পূর্ণিমা রাতে সমুদ্র কেমন দেখায় সেটা দেখবে। দুদিন পরেই পূর্ণিমা।

ও আচ্ছা— দুদিন পরেই পূর্ণিমা তা তো জানতাম না।

মানে কথার কথা বলছি। ধরুন, আজ যদি বিয়েটা হয়ে যায়—তাহলে আজ রাতের ট্রেনে রিনকিকে নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওনা হতে পারি। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা শেষ করে রাখা আর কী। পরে একটা রিসিপশানের ব্যবস্থা না হয় হবে।

তোমার দিকের আত্মীয়স্বজনরা...

ওদের আমি ম্যানেজ করব। আপনি যদি শুধু এদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটু রাজি করান— মানে রিনকি বেচারির দীর্ঘদিনের শখ । ওর জন্যেই খারাপ লাগছে।

না না, তা তো বটেই। দীর্ঘদিনের শখ থাকলে তা তো মেটানোই উচিত। রাতের টিকেট পাওয়া যাবে তো ? পুরো ফাস্টক্লাস বার্থ রিজার্ভ করতে হবে।

রেলওয়েতে আমার লোক আছে, হিমুভাই।

তাহলে তুমি বরং ঐটাই আগে দেখ। আমি এদিকটা ম্যানেজ করছি।

আনন্দে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখ চকচক করছে। সে গাঢ় গলায় বলল, রিনকি আমাকে বলেছিল— হিমুভাইকে বললেই উনি ম্যানেজ করে দিবেন। আপনি যে সত্যি সত্যি করবেন বুঝিনি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কী নিয়ে গল্প করলে সারারাত ?

গল্প আর কী করব বলুন। রিনকি এমন অভিমানী—কিছু বললেই তার চোখে পানি এসে যায়। সুপার সেনসিটিভ মেয়ে। কথায় কথায় একসময় বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হেনা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল—এতেই রিনকি কেঁদে অস্থির। আমাকে বলছে আর কোনোদিন যদি ঐ মেয়ের নাম মুখে আনি সে নাকি সুইসাইড করবে। এরকম সেনসিটিভ মেয়ে নিয়ে বাস করা কঠিন হবে। খুবই দুঃশ্চিন্তা লাগছে হিমু ভাই।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কিন্তু ও চিন্তিত মনে হলো না। বরং খুবই আনন্দিত মনে হলো । আমার ধারণা, প্রায়ই সে হেনার কথা বলে রিনকিকে কাঁদাবে। কাঁদিয়ে আনন্দ পাবে। রিনকিও কেঁদে আনন্দ পাবে। ওদের এখন আনন্দেরই সময় ।

আমি বললাম, কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই, তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে বল, তারচেয়ে যা জরুরি তা হচ্ছে টিকিটের ব্যবস্থা। আমি ফুপা-ফুপুকে রাজি করাচ্ছি।

রাজি হয়েছেন কিনা জেনে গেলে ভালো হতো না হিমুভাই ?

আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি তুমি কি এটা জানো না ?

জানি ।

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তোমরা দুজন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছ। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। সমুদ্রের পানি রূপার মতো চকচক করছে, আর তোমরা...

আমরা কী ?

থাক । সবটা বললে রহস্য শেষ হয়ে যাবে।

আপনি একজন অসাধারণ মানুষ হিমুভাই! অসাধারণ!

আমি এবং বাদল ওদের এগারোটার ট্রেনে তুলে দিতে এলাম। ফুপা-ফুপু এলেন না। ফুপার শরীর খারাপ করেছে।

ট্রেন ছাড়বার আগ-মুহূর্তে রিনকি বলল, হিমুভাই, আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে।

কিসের ভয় ?

এত আনন্দ লাগছে। আনন্দের পরই তো কষ্ট আসে। যদি খুব কষ্ট আসে।

কষ্ট আসবে না। তোদের জীবন হবে আনন্দময়। তোদেরকে আমি আমার ময়ূরাক্ষী নদী ব্যবহার করতে দিয়েছি। এই নদী যারা ব্যবহার করে তাদের জীবনে কষ্ট আসে না ।

তুমি কী যে পাগলের মতো কথা মাঝে মাঝে বল! কিসের নদী ?

আছে একটা নদী। আমি আমার অতিপ্রিয় মানুষদের শুধু সেই নদী ব্যবহার

করতে দেই। অন্য কাউকে দেই না। তুই আমার অতিপ্রিয় একজন। যদিও খানিকটা বোকা, তবু প্রিয়।

তুমি একটা পাগল। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ট্রেন নড়ে উঠল। আমি জানালার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে লাগলাম। রিনকির আনন্দময় মুখ দেখতে এত ভালো লাগছে! রিনকির চোখে এখন জল। সে কাঁদছে। আমি মনে মনে বললাম, হে ঈশ্বর, এই কান্নাই রিনকি নামের মেয়েটির জীবনের শেষ কর হোক।

৫

প্রায় দশদিন পর আস্তানায় ফিরলাম।

আস্তানা মানে মজিদের মেস – দ্য নিউ বোর্ডিং হাউস ।

মজিদ ঐ বোডিং হাউসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। কলেজে যখন পড়তে আসে তখন এই অন্ধ গহবর খুঁজে বের করে । নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর। সেই ঘরে একটা চৌকি, একটা টেবিল। চেয়ারের ব্যবস্থা নেই কারণ চেয়ার পাতার জায়গা নেই।

মজিদের চৌকিতে একটা শীতল পাটি শীত গ্রীষ্ম সবসময় পাতা থাকে। মশারিও খাটানো থাকে। প্রতিদিন মশারি তোলা এবং মশারি ফেলার সময় মজিদের নেই। তাকে সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানান ধান্ধায় ঘুরতে হয়, প্রতিমাসে তিনটি মনিঅর্ডার করতে হয়। একটা দেশের বাড়িতে, একটা তার বিধবা বড়বোনের কাছে এবং তৃতীয়টি আবু কামাল বলে এক ভদ্রলোককে। এই ভদ্রলোক মজিদের কোনো আত্মীয় নন। তাকে প্রতিমাসে কেন টাকা পাঠাতে হয় তা মজিদ কখনো বলেনি। জিজ্ঞেস করলে হাসে । এইসব রহস্যের কারণেই মজিদকে আমার বেশ পছন্দ ।

আমাকে মজিদের পছন্দ কিনা আমি জানি না। সে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনগ্রহ নিয়ে মেশে। কোনো কিছুতেই অবাক বা বিস্ময় প্রকাশ করে না। সম্ভবত শৈশবেই তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় তাকে একবার একটা ম্যাজিক শো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাচ এক যাদুকর জার্মান কালচারাল সেন্টারে যাদু দেখাচ্ছেন। বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা একের-পর-এক ঘটে যাচ্ছে। একসময় তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীকে করাত দিয়ে কেটে দু-টুকরা করে ফেললেন। ভয়াবহ ব্যাপার। মহিলা দর্শকরা ভয়ে উ উ জাতীয় শব্দ করছে। তাকিয়ে দেখি মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষীণ নাক ডাকার শব্দও আসছে। আমি চিমটি কেটে তার ঘুম ভাঙালাম। সে বলল, কী হয়েছে ?

আমি বললাম, করাত দিয়ে মানুষ কাটা হচ্ছে।

মজিদ হাই তুলে বলল, ও আচ্ছা ।

সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অথচ আমি অনেক ঝামেলা করে দুটা টিকিট জোগাড় করেছি যাতে একবার অন্তত সে বিস্মিত হয়। আমার ধারণা, তাজমহলের সামনেও তাকে যদি নিয়ে যাওয়া হয় সে হাই চাপতে চাপতে বলবে, ও আচ্ছা, এটাই তাজমহল! ভালোই তো । মন্দ কী ।

মজিদকে আমার একবার তাজমহল দেখানোর ইচ্ছা। শুধু দেখার জন্যে সত্যি

সত্যি সে কী করে। বা আসলেই কিছু করে কিনা!

দশদিন পর মজিদের সঙ্গে আমার দেখা— সে একবার মাত্র মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। তার পরপরই পত্রিকা পড়তে লাগল। বছরখানিক আগের বাসি একটা ম্যাগাজিন। একবার জিজ্ঞেস করল না, আমার খবর কী ? আমি কেমন। এতদিন কোথায় ছিলাম।

আমি বললাম, তোর খবর কী রে মজিদ ?

মজিদ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না।

তোর আজ টিউশনি নেই ? ঘরে বসে আছিস যে ?

আজ শুক্রবার ।

তখন মনে পড়ল ছুটির দিনে যখন হাতে তার কোনো কাজ থাকে না, তখনই সে ম্যাগাজিন জোগাড় করে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘুমায়, আবার জেগে উঠে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়, কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জীবনের কাছে তার যেন কিছুই চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। চার-পাঁচটা টিউশনি, মাঝেমধ্যে কিছু খুচরা কাজ এবং প্রুফ দেখার কাজেই সে খুশি । বিএ পাস করার পর কিছুদিন সে চাকরির চেষ্টা করেছিল। তারপর– ধুর আমার হবে না এই বলে সব ছেড়েছুড়ে দিল ।

আমি একবার বলেছিলাম, সারাজীবন এই করেই কাটাবি নাকি ? সে বলল, অসুবিধা কী ? তুই তো কিছু না করেই কাটাচ্ছিস ।

আমার অবস্থা ভিন্ন। আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তাছাড়া আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, তুই তো কিছু করছিস না।

মজিদ কিছুই বলল না। আমি ভেবেছিলাম, একবার হয়তো জিজ্ঞেস করবে কিসের এক্সপেরিমেন্ট, তাও করল না। আসলেই তার জীবনে কোনো কৌতুহল নেই।

রূপাকে অনেক বলে-কয়ে একবার রাজি করেছিলাম যাতে সে মজিদকে নিয়ে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসে। আমার দেখার ইচ্ছা একটি অসম্ভব রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী মেয়েকে পাশে পেয়ে তার মনের ভাব কী হয়। আগের মতোই সে কি নির্লিপ্ত থাকে, না জীবন সম্পর্কে খানিকটা হলেও আগ্রহী হয় ।

আমার প্রস্তাবে রূপা প্রথমে খুব রাগ করল। চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, তুমি নিজে কখনো আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছ ? চিনি না জানি না একটা ছেলেকে নিয়ে আমি যাব। তুমি আমাকে পেয়েছ কী ?

সে যতই রাগ করে, আমি ততই হাসি। রূপাকে ঠাণ্ডা করার এই একটা পথ । সে যত রাগ করবে আমি তত হাসব । আমার হাসি দেখে আরো রাগবে। আমি আরো হাসব। সে হাল ছেড়ে দেবে। এবারো তাই হলো। সে মজিদকে নিয়ে যেতে রাজি হলো। আমি এক ছুটির দিনে মজিদকে বললাম, তুই চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আয়। পত্রিকায় দেখলাম জিরাফ এসেছে।

মজিদ বলল, জিরাফ দেখে কী হবে ?

কিছুই হবে না। তবু দেখে আয়।

ইচ্ছা করছে না।

আমার এক দূর-সম্পর্কের ফুপাতো বোন—বেচারির চিড়িয়াখানা দেখার শখ। সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ না-থাকায় যেতে পারছে না। আমার আবার জন্তু-জানোয়ার ভালো লাগে না। তুই তাকে নিয়ে যা।

মজিদ বলল, আচ্ছা।

আমার ধারণা ছিল রূপাকে দেখেই মজিদ ধাক্কা খাবে। সেরকম কিছুই হলো না। রূপা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। মজিদ গম্ভীর মুখে ড্রাইভারের পাশে বসল।

রূপ হাসিমুখে বলল, আপনি সামনে বসছেন কেন ? পেছনে আসুন। দুজন গল্প করতে করতে যাই। মজিদ বলল, আচ্ছা।

মজিদ পেছনে এসে বসল। তার মুখ ভাবলেশহীন। একবার ভালো করে দেখলও না তার পাশে যে বসে আছে সে মানবী না অপ্সরী।

ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলি ?

ভালোই ।

কথা হয়েছে রূপার সঙ্গে ?

হু।

কী কথা হলো ?

মনে নেই।

আচ্ছা, রূপার পরনে কী রঙের শাড়ি ছিল বল তো ?

লক্ষ্য করিনি তো ।

আমি মজিদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাই। রাতে তার সঙ্গে এক চৌকিতে ঘুমাই। তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি কী করে আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হওয়া যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক সাধনায় যে স্তরে পৌছেন মজিদ সে স্তরটি কী করে এত সহজে অতিক্রম করল তা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

আমার বাবা তার খাতায় আমার জন্যে যেসব উপদেশ লিখে রেখা গেছেন তার মধ্যে একটার শিরোনাম হচ্ছে— নির্লিপ্ততা । তিনি লিখেছেন :

নির্লিপ্ততা

> পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানীরা এই জগৎকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র চিন্তা ও ক্ষুদ্র বিবেচনায় দেখিয়াছি আসলেই মায়া। স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম যেমন মায়া বই কিছুই নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নির স্নেহসম্পর্কও তাই। যে-কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবা মাত্র স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতাভগ্নির ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হইবে। কোনোকিছুর প্রতিই তুমি যেমন আগ্রহ বোধ করিবে না আবার অনগ্রহও বোধ করিবে না। মানুষ মায়ার দাস। সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল তোমাকে ভাঙিতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে তুমি তা পরিবে। তোমার ভিতরে সেই ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা আমি তোমায় শৈশবেই করিয়াছি। একই সঙ্গে তোমাকে আদর এবং অনাদর করা হইয়াছে। মাতার প্রবল ভালোবাসা হইতেও তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। এই সমস্তই একটি বড় পরীক্ষার অংশ। এই পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারলে প্রমাণ হইবে যে ইচ্ছা করিলে মহাপুরুষদের এই পৃথিবীতে তৈরি করা যায় ।
>
> যদি একটি সাধারণ কুকুরকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, সেই কুকুর শিকারি কুকুরে পরিণত হয়। একজন ভালোমানুষ

পরিবেশের চাপে ভয়াবহ খুনীতে রূপান্তরিত হয়। যদি তাই হয় তবে কেন আমরা আমাদের ইচ্ছ অনুযায়ী মানব সম্প্রদায় তৈরি করিতে পারিব না ?

বাবা আমার ভেতর থেকে মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন। শৈশবের কথা কিছু কিছু মনে আছে। একটা খেলনা আমার হয়তো খুব পছন্দ হলো। তিনি কিনে আনলেন। গভীর আনন্দে আমি আত্মহারা। তখন হঠাৎ বাবা বললেন, আচ্ছা আয়, এইবার এই খেলনাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

এমনি ।

বাবা একটা হাতুড়ি নিয়ে খেলনা ভাঙতে বসতেন। আমি কাঁদো কাঁদো চোখে তাকিয়ে দেখতাম ।

একবার খাঁচায় করে একটা টিয়াপাখি নিয়ে এলেন। কী সুন্দর সবুজ রঙ লাল টুকটুকে ঠোট । আমি বললাম, বাবা, আমরা কি এটা পুষব ?

তিনি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, টিয়াপাখি কী খায় বাবা ?

শুকনা মরিচ খায় ।

ঝাল লাগে না ?

না। একটা শুকনা মরিচ নিয়ে এসে দাও, দেখবে কীভাবে কপ কপ করে খাবে।

আমি ছুটে গেলাম শুকনা মরিচ আনতে। মরিচ এনে দেখি বাবা টিয়াপাখিটা গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। এমন সুন্দর একটা পাখি মরে পড়ে আছে। ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা লাগল। বাবা বললেন, মন খারাপ করবি না। মৃত্যু হচ্ছে এ জগতের আদি সত্য। তিনি তার পুত্রের মন থেকে মায়া কাটাতে চেষ্টা করছেন।

তার চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে ? মায়া কি কেটেছে ? আমার তো মনে হয় না।

এই যে মজিদ চুপচাপ বসে আছে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে— কেন জানি বড় মায়া লাগছে তাকে দেখে। এই মায়া আমার বাবা শত ট্রেনিং-এও কাটাতে পারেননি। অথচ মজিদ কোনো রকম ট্রেনিং ছাড়াই সব মায়া কাটিয়ে বসে আছে। মজিদকে ছাত্র হিসেবে পেলে বাবার লাভ হতো।

মজিদ !

কী ?

আমার হাতে একটা চাকরি আছে। করবি ?

কী চাকরি ?

কী চাকরি জানি না। আমার বড়ফুপা বলেছিলেন জোগাড় করে দিতে পারেন।

তিনি আমাকে চেনেন কীভাবে ?

চেনেন না। চাকরিটা আমার জন্যে। তবে আমি তোকে পাইয়ে দেব।

দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ?

টাকাপয়সার টানাটানি তো এখন আর আগের মতো নেই। দেশে এবার থেকে আর পাঠাতে হবে না।

কেন ?

বাবা মারা গেছেন।

সে কী!

আমি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। মজিদ বলল, এত অবাক হচ্ছিস কেন ? বুড়ো হয়েছে, মারা গেছে। কিছুদিন পর আর বোনকেও টাকা পাঠাতে হবে না।

সেও কি মারা যাচ্ছে ?

না। তার ছেলে পাস করে গেছে। বিএ পাস করেছে। চাকরি বাকরি কিছু পেয়ে যাবে।

তুই চাস না তোর একটা গতি হোক ?

আরে দূর দূর । ভালোই তো আছি।

মজিদ হাই তুলল। আমি বললাম, ভাত খেয়েছিস ?

না। চল খেয়ে আসি ।

রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল, বিয়েবাড়ি-টাড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখবি ? বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে। আমি বললাম, বিয়েবাড়ি খুঁজতে হবে না। চল পুরনো ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তোকে বিরিয়ানি খাওয়াব। টাকা আছে।

আবার অতদূর যাব ? আজ ছুটির দিন ছিল। একটু হাঁটলেই বিয়েবাড়ি পেয়ে যেতাম ।

তুই কি একটা বিয়ে করবি নাকি ?

আমি ? আরে দূর দূর। বিয়ে করা মানে শতেক যন্ত্রণা। শতেক দায়িত্ব। দায়িত্ব ভালো লাগে না ।

সিগারেট খাবি ?

মজিদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। দিলে খাবে। না দিলে খাবে না।

আমি রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। মজিদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টানছে। আমি বললাম, তুই দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছিস বল তো ?

কী হচ্ছি ?

গাছ হয়ে যাচ্ছিস ।

সত্যি সত্যি গাছ হতে পারলে ভালোই হতো।

আমরা রিকশার খোঁজে বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে এলাম। রিকশা আছে তবে ওরা কেউ পুরনো ঢাকার দিকে যাবে না। দূরের ট্রিপে ওদের ক্ষতি। কাছের ট্রিপে পয়সা বেশি পরিশ্রমও কম। এত কিছু মাথায় ঢুকবে না এরকম বোকা একজন রিকশাআলার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ।

মজিদ।

বল ।

তুই দেখ রিকশা পাস কিনা। আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি ।

আচ্ছা ।

আমি টেলিফোন করতে ঢুকলাম তরঙ্গিণী নামের ষ্টেশনারী দোকানে। আজকাল চমৎকার সব দোকান হয়েছে। এদের নাম যেমন সুন্দর, সাজসজ্জাও সুন্দর। আমাকে দেখেই দোকানের সেলসম্যান জামান এগিয়ে এল। এই ছেলের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। একদিন দেখি দোকানে আর আসছে না। মাস দু-এক পরে আবার এসে উপস্থিত সমস্ত মুখভর্তি বসন্তের দাগ। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ পৃথিবী থেকে বসন্ত উঠে গেছে। এই ছেলে সেই বসন্ত পেল কী করে ? সবসময় ভাবি জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তবে তার মুখে দাগ হবার পর তার

ব্যবহার খুব ভালো হয়েছে। আগে ব্যবহার খুব খারাপ ছিল ।

জামান হাসিমুখে বলল, স্যার ভালো আছেন ?

হু।

টেলিফোন করবেন ?

যদি টেলিফোনে ডায়াল টোন থাকে এবং টেলিফোনের চাবি থাকে তাহলে করব । দুটা টেলিফোন করব— এই যে চার টাকা।

টাকা দিয়ে সবসময় লজ্জা দেন, স্যার।

লজ্জার কিছু নেই। টেলিফোন শেষে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। প্রায়ই জিজ্ঞেস করব ভাবি কিন্তু মনে থাকে না। আজ আপনি মনে করিয়ে দেবেন।

জি আচ্ছা ।

আমার সামনে টেলিফোন দিয়ে জামান সরে গেল ।

এইটুকু ভদ্রতা আছে। অধিকাংশ দোকানেই টেলিফোন করতে দেয় না। টাকা দিয়েও না। যদিও দেয়—রিসিভারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে কী কথা হচ্ছে শুনবার জন্যে ।

হ্যালো, কে কথা বলছেন ?

তুমি কি মীরা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মীরা। আপনি কে আমি বুঝতে পারছি— আপনি টুটুল।

আসল জন না । নকল জন ।

ঐদিন খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন কেন ? আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল।

টেলিফোন নামিয়ে রাখিনি তো! হঠাৎ লাইন কেটে গেল।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। অনেকক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসেছিলাম। লাইন কেটে গেলে তাহলে আবার করলেন না কেন ?

টাকা ছিল না।

টাকা ছিল না মানে ?

আমি তো বিভিন্ন দোকান-টোকান থেকে টেলিফোন করি দুটা টাকা পকেটে নিয়ে যাই । আরেকবার করতে হলে আরো দু-টাকা লাগবে । বুঝতে পারছ ?

পারছি। এখন আপনার সরে টাকা আছে তে?

আছে।

ঐদিন আপনার টেলিফোন পাওয়ার পর বাবাকে সব বললাম। বাবাকে তো চেচেন না। বাবা খুবই রাগী মানুষ। তিনি প্রথমে আমাদের দুজনকে খুব বকা দিলেন – আপনাকে রাস্তা থেকে তোলার জন্যে এবং পথে নামিয়ে দেবার জন্যে। তারপর...আচ্ছা, আপনি আমার কথা শুনছেন তো?

হ্যাঁ। শুনছি।

তারপর বাবা গাড়ি বের করে থানায় গেলেন। ফিরে এলেন মন খারাপ করে।

মন খারাপ করে ফিরলেন কেন ?

কারণ ওসি সাহেব আপনার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন। আপনি নাকি পাগল ধরনের। তার ওপর কবি ।

আমি কবি ?

হ্যাঁ। আপনি যে কবিতার খাতাটা থানায় ফেলে এসেছিলেন বাবা সেইটিও নিয়ে এসেছেন ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমি সবগুলো কবিতা পড়েছি।

কেমন লাগল ?

ভালো ।অসাধারণ !

সবচে’ ভালো লাগল কোনটা ?

বলব ? আমার কিন্তু মুখস্থ। কবিতাটার নাম রাত্রি।

পরীক্ষা নিচ্ছি। দেখি সত্যি সত্যি তোমার মুখস্থ কিনা। কবিতাটা বল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল—

অতন্দ্রিলা,
ঘুমাওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে বলি শোনো,
সৌর তারা-ছাওয়া এই বিছানায় সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি
কত দীর্ঘ দুজনার গেল সারাদিন,
আলাদা নিঃশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুই
কী আশ্চর্য দুজনে, দুজনা
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পরে জোছনা ।
দেখি তুমি নেই।

কবিতা সে আবৃত্তি করল চমৎকার। আবৃত্তির শেষে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কি, বলতে পারলাম ?

হ্যাঁ, পারলে। তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো। তবে কবিতা সম্পর্কে কোন ধারনা নেই।

কেন, এটা কি ভালো কবিতা না ?

অবশ্যই ভালো। তবে আমার লেখা না। আমিয় চক্রবর্তীর।

আপনার নোটবইয়ের সব কবিতাই কি অন্যের?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কিছু কবিতা পড়ে মনে হয় এগুলি আমারই লেখার কথা ছিল কোনো কারণে লেখা হয়নি। তখন সেটা নোটবুকে টুকে রাখি।

আপনি কি খুব কবিতা পড়েন ?

না। একেবারেই না। তবে আমার একজন বান্ধবী আছে। সে খুব পড়ে এবং জোর করে আমাকে কবিতা শোনায়।

ওর নাম কী ?

ওর নাম রূপা। তবে আমি তাকে মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষী ডাকি।

বাহ, কী সুন্দর নাম!

সে কিন্তু এই নাম একবারেই পছন্দ করে না।

কেন বলুন তো ?

কারণ এই নামে এলিফেন্ট রোডে একটা জুতার দোকান আছে।

মীরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসল। মনে হলো মেয়েটা যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেই পরিবেশে কেউ রসিকতা করে না । সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে। সামান্য রসিকতায় এই কারণেই সে এতক্ষণ ধরে হাসছে।

হ্যালো, আপনি কিন্তু টেলিফোন রাখবেন না।

আচ্ছা, রাখব না।

ঐদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে এমন হয়েছে, টেলিফোন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই। মনে হয় আপনি টেলিফোন করেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার বলি–মা আপনার জন্যে খুব চমৎকার একটা পাঞ্জাবি কিনে রেখেছেন। ঐ পাঞ্জাবিটা নেয়ার জন্যে হলেও আপনাকে আমাদের বাসায় আসতে হবে।

আসব।

কবে আসবেন ?

টুটুলকে খুঁজে পেলেই আসব।

আপনি ওকে কোথায় খুঁজে পাবেন ?

আমি খুব সহজেই পাব । হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমার খুব নামডাক আছে ।

আচ্ছা ঐদিন আপনি কী করে বললেন যে টুটুল ভাইয়ের কপালে কাটা দাগ আছে?

আমার কিছু সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। আমি মাঝে মাঝে অনেক কিছু বলতে পারি।

বলুন তো আমি কী পরে আছি ?

তোমার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি।

হলো না। আপনার আসলে কোনো ক্ষমতা নেই।

ঠিক ধরেছ।

কিন্তু আপনি যখন বলেছিলেন যে আপনার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম ।

মনে হচ্ছে তোমার একটু মন খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে।

টেলিফোন কি রেখে দেব ?

না না— প্লিজ, আপনার ঠিকানা বলুন।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আর না । মজিদ বোধহয় রিকশা ঠিক করে ফেলেছে। তবে ঠিক করলেও সে আমাকে এসে বলবে না। অপেক্ষা করবে। এর মধ্যেই দ্রুত রূপার সঙ্গে একটা কথা সেরে নেয়া দরকার।

আমি টেলিফোন করতেই রূপার বাবা ধরলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এটা কি রেলওয়ে বুকিং ?

তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ফাজিল ছোকরা, হু আর ইউ ? কী চাও তুমি ?

রূপাকে দেবেন ?

রাসকেল, ফাজলামি করার জায়গা পাও না। আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব !

আপনি এত রেগে গেছেন কেন ?

শাট আপ ।

আমি ভদ্রলোককে আরো খানিকক্ষণ হৈচৈ করার সুযোগ দিলাম। আমি জানি হৈচৈ শুনে রূপা এসে টেলিফোন ধরবে। হলোও তাই, রূপার গলা শোনা গেল— সে করুণ গলায় বলল, তুমি চলে এস।

কখন ?

এই এখন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

আচ্ছা আসছি।

অনেকবার আসছি বলেও তুমি আসনি– এইবার যদি না আস তাহলে ...

তাহলে কী ?

রূপা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, আমি বারান্দায় দাড়িয়ে থাকব।

রূপার বাবা সম্ভবত তার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিলেন । খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। আজ ওদের বাড়িতে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। রূপার বাবা, মা, ভাইবোন কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না! রূপার বাবা তার দারোয়ানকে বলে রেখেছেন কিছুতেই যেন আমাকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে না দেয়া হয়। আজ কী হবে কে জানে?

বাইরে এসে দেখি মজিদ রিকশা ঠিক করেছে। রিকশাআলা রিকশার সিটে বসে ঘুমুচ্ছে। মজিদ শান্তমুখে ড্রাইভারের পাশে বসে বিশ্রাম করছে। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আজও জামানকে জিজ্ঞেস করা হলো না— তার মুখে বসন্তের দাগ এল কী করে। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যা কোনোদিনও করা হয় না। এটিও বোধহয় সেই জাতীয় কোনো প্রশ্ন ।

বিরিয়ানি খেয়ে অনেক রাতে ফিরলাম।

অসহ্য গরম ।

সেই গরমে ছোট্ট একটা চৌকিতে আমি এবং মজিদ শুয়ে আছি। মজিদের হাতে হাতপাখা। সে দ্রুত তার পাখা নাড়ছে। গরম তাতে কমছে না। বরং বাড়ছে। মনে হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদীটাকে বের করতে হবে। নয়তো এই দুঃসহ রাত পার করা যাবে না।

মজিদের হাতপাখার আন্দোলন থেমে গেছে। সে গভীর ঘুমে অচেতন। ঘরে শুনশান নীরবতা। আমি ময়ূরাক্ষী নদীর কথা ভাবতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য পাল্টে গেল। এই নদী একেক সময় একেকভাবে আসে। আজ এসেছে দুপুরের নদী হয়ে। প্রখর দুপুর। নদীর জলে আকাশের ঘননীল ছায়া। ঝিম ধরে আছে চারদিক। হঠাৎ নদী মিলিয়ে গেল। মজিদ ঘুমের মধ্যেই বিশ্রী শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এই মজিদ, এই।

মজিদ চোখ মেলল ।

কী হয়েছে রে ?

কিছু না ।

স্বপ্ন দেখেছিস ?

হু।

দুঃস্বপ্ন ?

না ।

কী স্বপ্ন দেখেছিস বল তো ?

মজিদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণস্বরে বলল, স্বপ্নে দেখলাম, বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মজিদ শুয়ে পড়ল। আমি জানি না মজিদের বাবা কীভাবে তার গায়ে হাত বুলাতেন। আমার ইচ্ছা করছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে মজিদের গায়ে হাত বুলাতে।

হিমু!

কী ?

আমার বাবা আমাকে আদর করত। সব বাবারাই করে। আমার বাবা খুব বেশি করত। একদিন কি হয়েছে জানিস?

বল শুনছি।

না থাক ।

থাকবে কেন, শুনি। এই গরমে ঘুম আসছে না। তোর গল্প শুনলে ভালো লাগবে।

আমি তখন খুব ছোট...

তারপর ?

না থাক ।

মজিদ আর শব্দ করল না । ঘরের ভেতর অসহ্য গরম । আমি অনেক চেষ্টা করেও নদীটা আনতে পারছি না। আজ আর পারব না। আজ বরং বাবার কথাই ভাবি । আমার বাবা কি আমাকে ভালোবাসতেন ? নাকি আমি ছিলাম তার খেলার কোন পুতুল? যে পুতুল তিনি নানাভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কত রকম উপদেশে তিনি তার খাতা ভরতি করে রেখেছেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে হয়তো ভেবেছেন– এইসব উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। আমি কি সেইসব উপদেশ মানি ? নাকি মানার ভান করি ? তার খাতায় লেখা :

উপদেশ নম্বর এগারো

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান

> সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করবে। ইহাতে আত্মার উন্নতি হইবে। সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং আত্মাকে জানা একই ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিও—
>
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

মজিদ আবার কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তবে কাঁদছে ঘুমের মধ্যে। সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কি প্রতিরাতেই কাঁদে ?

বড়ফুপু অবাক হয়ে বললেন, তুই কোত্থেকে ?

আমি বললাম, আসলাম আর কী। তোমাদের খবর কী ?

পনেরোদিন পর উদয় হয়ে বললি, তোমাদের খবর কী ? তোর কত খোঁজ করছি। গিয়েছিলি কোথায় ?

মজিদের গ্রামের বাড়িতে। মজিদকে নিয়ে তার বাবার কবর জিয়ারত করে এলাম।

মজিদ আবার কে ?

তুমি চিনবে না, আমার ফ্রেন্ড। আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিলে কেন ?

বড়ফুপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে খুঁজছি বাদলের জন্যে। ওকে তুই বাঁচা।
অসুখ ?
তুই নিজে গিয়ে দেখ। ও তার পড়ার বইপত্র সব পুড়িয়ে ফেলেছে। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা ।
বল কী ?
বাদলের ঘরে গিয়ে দেখি সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই পড়াশুনা করছে। পরিবর্তনের মধ্যে তার মাথার চুল আরো বড় হয়েছে। দাড়িগোঁফ আরো বেড়েছে। গায়ে চকচকে সিল্কের পাঞ্জাবি। বাদল হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল ।
আমি বললাম, খবর কী রে ?
বাদল বলল, খবর তো ভালোই।
তুই নাকি বই পুড়াচ্ছিস ?
সব বই তো পুড়াচ্ছি না। যেগুলি পড়া হচ্ছে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলছি।
ও আচ্ছা ।
বাদল হাসতে হাসতে বলল, মা-বাবার দুজনেরই ধারণা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
তোর কি ধারণা মাথা ঠিকই আছে?
হ্যাঁ, ঠিক আছে— তবে মাথায় উকুন হয়েছে।
বলিস কী ?
মাথা ঝাঁকি দিলে টুপটাপ করে উকুন পড়ে।
বলিস কী ?
হ্যাঁ, সত্যি। দেখবে ?
থাক থাক, দেখাতে হবে না।
হিমুভাই, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে— বাবাকে বুঝিয়ে যাও। বাবার ধারণা, আমার সব শেষ ।
ফুপা কি বাসায় ?
হ্যাঁ বাসায় ।
কিছুক্ষণ আগেই আমার ঘরে ছিলেন। নানান কথা বুঝাচ্ছেন।
আমি ফুপার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তার স্বাস্থ্য এই কদিনে মনে হয় আরো ভেঙেছে। চোখের চাউনিতে দিশেহারা ভাব । তিনি আমার দিকে বিষণ্ন চোখে তাকালেন। যে দৃষ্টি বলে দিচ্ছে— তুমিই আমার ছেলের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।
কেমন আছেন ফুপা ?
ভালো ।
রিনকি কোথায় ? শ্বশুর বাড়িতে ?
হ্যাঁ।
সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে আছেন যে ? প্র্যাকটিসে যাচ্ছেন না ?
আর প্র্যাকটিস! সব মাথায় উঠেছে।
আমি ফুপার সামনের চেয়ারে বসলাম। মনে হচ্ছে আজও তিনি খানিকটা মদ্যপান করেছেন। আমি সহজ গলায় বললাম, ফুপা ঐ চাকরিটা কি আছে ?

কোন চাকরি ?

ঐ যে আমাকে বলেছিলেন, বাদলকে আগের অবস্থায় নিয়ে গেলে ব্যবস্থা করে দেবেন।

তুমি চাকরি করবে ? নতুন কথা শুনছি।

আমি করব না, আমার এক বন্ধুর জন্যে।

ফুপা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বাদলের ব্যাপারটা আমি দেখছি। আপনি ওর চাকরিটা দেখুন।

বাদলের কিছু তুমি করতে পারবে না। ও এখন সমস্ত চিকিৎসার অতীত। বইপত্র পুড়িয়ে ফেলছে। ছাদে আগুন জ্বলিয়েছে। সেই আগুনের সামনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, আর মাথা থেকে উকুন পড়ছে আগুনে। পটপট শব্দ হচ্ছে। ছি ছি, কী কান্ড! আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম। একবার ভাবলাম একটা চড় লাগাই, তারপর মনে হলো, কী লাভ ?

ফুপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

আমি হাসলাম ।

ফুপা বললেন, তুমি হাসছ ? তোমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে। আমার কাছে না।

আমি বাদলের ব্যাপারটা দেখছি। আজই দেখছি, আপনি আমার বন্ধুর চাকরির ব্যাপারটা দেখবেন ।

তোমার বন্ধু কি তোমার মতো ?

না। ও চমৎকার ছেলে। সাত চড়ে রা নেই টাইপ ।

আমি বাদলকে নিয়ে বের হলাম ।

বাদল মহাখুশি।

রাস্তায় নেমেই বলল, তোমার পরিকল্পনা কী হিমুভাই ? সারারাত রাস্তায় হাঁটব ? দু-বছর আগের কথা কি তোমার মনে আছে ? সারারাত আমরা হাঁটলাম। জোছনা রাত। মনে হচ্ছিল আমরা দস্তয়োভস্কির উপন্যাসের কোনো চরিত্র। মনে আছে ?

আছে ।

আজও কি সেইরকম কিছু ?

না। আজ যাচ্ছি সেলুনে, দাড়িগোঁফ কামাব।

বাদল হতভম্ব হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শুনেনি। ক্ষীণস্বরে বলল, দাড়িগোঁফে, লম্বা চুলে তোমাকে যে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগে তা তো তুমি জানো না। তোমাকে অবিকল রাসপুটিনের মতো লাগে।

রাসপুটিনের মতো লাগলেও ফেলে দিতে হবে। এক জিনিস বেশিদিন ধরে রাখতে নেই। ভোল পাল্টাতে হয়। অনেকটা সাপের খোলস ছাড়ার মতো। কিছুদিন অন্য সাজে থাকব— তারপর আবার...

তাহলে কি আমিও ফেলে দেব ?

দেখ চিন্তা করে।

অবশ্যি উকুনের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ভয়ঙ্কর চুলকায়। রাতে ঘুম ভালো হয় না।

তাহলে বরং ফেলেই দে।

তুমি ফেললে তো ফেলবই।

বাদল হাসতে লাগল। মনে হচ্ছে গভীর কোনো আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে

আছে।

দুজনে চুল কেটে দাড়িগোঁফ ফেলে দিলাম।

বাদল কয়েকবারই বলল, ভীষণ হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে বাতাসে উড়ে যাব।

তুমি বললাম,আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ, নিকেকে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছেনা?

হ্যাঁ হচ্ছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে অচেনা করাও দরকার। যখন যে সাজ ধরবি— সেই রকম ব্যবহার করবি। একে বলে ব্যক্তিত্ব রূপান্তর। বুঝতে পারছিস ?

পারছি ।

ফুপা এবং ফুপু তাদের ছেলেকে দেখে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। সবার আগে নিজেকে সামলে নিলেন ফুপা। আমার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, তোমার বন্ধুকে নিয়ে কাল আমার চেম্বারে এসো। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে । মনে থাকবে ?

হ্যাঁ থাকবে।

হিমু, মেনি থ্যাংকস।

আমি হাসলাম ।

ফুপা বললেন, আমার ঘরে এসো। গল্প করি । তোমার সঙ্গে গল্পই করা হয় না। আমি বললাম, আপনি যান, আমি আসছি। একটা টেলিফোন করে আসি ।

ফুপা বললেন, তোমার এই টেলিফোন-ব্যাধিরও একটা চিকিৎসা হওয়া দরকার। কার সঙ্গে এত কথা বল ? ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কথা। আমার তো দুটা কথা বললেই বিরক্তি লাগে ।

ওপাশ থেকে হ্যালো শুনেই আমি বললাম, কে, মীরা ?

অনেকক্ষণ কোনো শব্দ হলো না । আমি নিশ্চিত, মীরা । নিজেকে সামলাবার জন্যে সময় নিচ্ছে ।

হ্যালো, তুমি কি মীরা ?

আপনি আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ?

কষ্ট দিচ্ছি ?

হ্যাঁ দিচ্ছেন। না হয় আমরা একটা ভুল করেছিলাম। সব মানুষই তো ভুল করে। সামান্য ভুলের জন্যে যদি এত কষ্ট দেন!

আমি টেলিফোন করলে কষ্ট পাও ?

হ্যাঁ পাই। কারণ আপনি হঠাৎ রেখে দেন। আপনি কি মানুষটাই এমন, না ইচ্ছা করে এসব করেন ?

বেশিরভাগ সময় ইচ্ছা করেই করি ।

আপনি কি একবার আসবেন আমাদের বাসায় ?

এখনো বুঝতে পারছি না। হয়তো আসব।

কবিতার খাতাটা নিতে আসবেন না ?

ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম, মীরা।

তার মানে আপনি আসবেন না ?

না। মানুষের মুখোমুখি হতে আমার ভালো লাগে না। এতে অতিদ্রুত মায়া পড়ে যায়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মানোর সম্ভাবনা কম, সেইজন্যেই টেলিফোন

আমার এত প্রিয়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মায় না। মায়া জন্মনোর অনেক কষ্ট। তাছাড়া—

তাছাড়া কী ?

থাক, আরেকদিন বলব।

আপনার বান্ধবী রূপার সঙ্গে কি আপনার প্রায়ই দেখা হয় ?

মাঝে মাঝে হয় । যখন সে যেতে বলে তখন যাই না। যখন যেতে বলে না তখন হঠাৎ উপস্থিত হই।

উনি কি খুবই সুন্দর?

তোমাকে তো একবার বলেছি— ও খুব সুন্দর।

আপনি টেলিফোন রেখে দেবার আগে দয়া করে শুধু একটি সত্যি কথা বলুন।

আমি তো সবই সত্যি বলছি। কী জানতে চাচ্ছ বল তো ?

ঐদিন কি পুলিশ আপনাকে মেরেছিল ?

না ।

এই তো মিথ্যা বললেন।

আজ সত্যি বলছি— ঐদিন মিথ্যা বলেছিলাম ।

আপনার কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা কে জানে ?

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে একটা খবর দেই— টুটুলভাইকে পাওয়া গেছে। কাউকে কিছু না বলে এক মাসের জন্যে কোলকাতা গিয়েছিল। মজার ব্যাপার কি জানেন— এখন আর আমার টুটুলভাইকে ভালো লাগছে না। ঐদিন টেলিফোন করেছিল, আমি কথাও বলিনি। আমার এরকম হলো কেন বলুন তো ?

আমি টেলিফোন রেখে ফুপার খোঁজে গেলাম।

তিনি ছাদে। হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। বরফের পাত্র, ঠাণ্ডাপানি, প্লেটে ভিনিগার মেশানো চিনাবাদাম । আমাকে দেখেই তিনি খুশি খুশি গলায় বললেন, বাদলের পরিবর্তনটা সেলিব্রেট করছি।

ফুপু রাগ করবেন না ?

না, তাকে বলেছি। আজ সে কোনোকিছুতেই রাগ করবে না। বমি করে যদি সারা ঘর ভাসিয়ে দেই তবু রাগ করবে না। তুমি বস হিমু, আরাম করে বস। সম্পর্ক মিশ খাচ্ছে না। মিশ খেলে তোমাকেও খানিকটা দিতাম ।

আপনি ক-পেগ খেয়েছেন ?

আরে না। মাত্র তো শুরু । আমি নটা পর্যন্ত পারি। আমার কিছুই হয় না।

ঐদিন বলেছিলেন ছটা । বলেছিলাম ? বলে থাকলে ভুল বলেছি— নটা হচ্ছে আমার লিমিট। নাইন। এনআই এনই। নাইন ।

আর খাবেন না, ফুপা।

ফুপা গ্রাসে নতুন করে ঢালতে ঢালতে বললেন, খেতে খেতে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি মানুষটা খারাপ না। পাগলা ভাব আছে, তবে ভালো। তোমার বাবা পাগলা ছিল তবে ভালো ছিল না।

ভালো ছিল না বলছেন কেন ?

দেখেছি তো। ও বাড়ি ছেড়ে পালাল আমার বিয়ের অনেক পরে। উন্মাদ ছিল।

ফুপা, আপনি কিন্তু বড় দ্রুত খাচ্ছেন। শুনেছি দ্রুত খাওয়া খারাপ।

ফুপা গভীর গলায় বললেন, নাইন হচ্ছে আমার লিমিট । নাইনের আগে স্টপ

করে দেব। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম - আমার ধারণা তোমার বাবা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর উন্মাদ । এটা হচ্ছে আমার ধারণা ! তুমি আবার রাগ করছ না তো ?

না।

ছেলেকে মহাপুরুষ বানানোর অদ্ভুত খেয়াল উন্মাদের মাথাতেই শুধু আসে, বুঝলে? আরে বাবা, মানুষ কী হবে না হবে সব আগে থেকে ঠিক করা থাকে ।

কে ঠিক করে রাখেন, ঈশ্বর ?

প্রকৃতিও বলতে পার। ফোর্টি সিক্স ক্রমোজমে মানুষের ভবিষ্যৎ লেখা থাকে। সে কেমন হবে কী হবে, সব কিন্তু প্রিডিটারমিন্ড। জিন সব নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফুপা, আর নেবেন না।

আরে এখনি বন্ধ করব কী ? নেশাটা মাত্র ধরেছে। তুমি মানুষ খারাপ না। I like you. তুমি পাগল ঠিকই, তবে ভালো পাগল। তোমার বাবা ছিল খারাপ ধরনের পাগল।

বাবা সম্পর্কে কথাবার্তা থাক ।

ফুপা নিচু গলায় বললেন, কাউকে যদি না বল তাহলে তোমার বাবার সম্পর্কে আমার একটি ধারণার কথা বলতে পারি। আমি আর কাউকে বলিনি। শুধু তোমাকেই বলছি।

বাদ দিন । কিছু বলতে হবে না।

জাস্ট আমার একটা ধারণা। ভুলও হতে পারে। আমার বেশিরভাগ ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়। হা-হা-হা । আমার বোধহয় আর খাওয়া উচিত হবে না। শুধু লাস্ট ওয়ান হয়ে যাক। ওয়ান ফর দি রোড। হিমু।

জি ।

তোমার যদি ইচ্ছা করে খানিকটা খেয়ে দেখতে পার। উল্টোদিকে ফিরে খেয়ে ফেল । আমি কিছুই মনে করব না। আমার মধ্যে কোনো প্রিজুডিস নেই। তুমি হচ্ছ বন্ধুর মতো।

আমি খাব না। আপনিও বন্ধ করুন।

নটা কি হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ ।

দশে শেষ করা যাক। জোড় সংখ্যা– তারপর তোমার বাবা সম্পর্কে কী যেন বলছিলাম ?

কিছু বলছিলেন না।

বলছিলাম। মনে পড়েছে— আমার কি ধারণা জানো ? আমার ধারণা তোমার বাবা তোমার মাকে খুন করেছিল।

আমি সহজ গলায় বললাম, এ রকম ধারণা হবার কারণ কি ?

যখন তোমার বাবার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলো তখন সে অনেক কথাই বলল, কিন্তু দেখা গেল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলছে না। সে কীভাবে মারা গেছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে রেগে গিয়ে বলেছিল, অন্য দশটা মানুষ যেভাবে মারা যায় সেইভাবে মারা গিয়েছিল।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এটা শুনেই আপনি ধরে নিলেন বাবা মাকে খুন করেছেন ?

হ্যাঁ। অবশ্যি আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আমার অধিকাংশ অনুমানই ভুল

হয়।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। ফুপার অধিকাংশ অনুমান ভুল হলেও এই অনুমানটি ভুল নয়। এটা সত্যি। আমি এটা জানি। আমি ছাড়াও অন্যকেউ এটা অনুমান করতে পারে, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ফুপা মদের ঘোরে ঝিম মেরে বসে আছেন। আমি আকাশের তারা দেখছি।

হিমু !

জি ।

তোমার বন্ধুকে কাল নিয়ে এসো। চাকরি দিয়ে দেব।

আচ্ছা ।

বড় ঘুম পাচ্ছে। এখানেই শুয়ে পড়ি কেমন ?

শুয়ে পড়ুন।

ফুপা কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অনেক অনেক দিন আগে বাবা আমাকে ছাদে এনে আকাশের তারা দেখিয়ে বলেছিলেন, যখনই সময় পাবি ছাদে এসে আকাশের তারার দিকে তাকাবি, এতে মন বড় হবে। মনটাকে বড় করতে হবে। ক্ষুদ্র শরীরে আকাশের মতো বিশাল মন ধারণ করতে হবে। বুঝলি ? বুঝে থাকলে বল— হ্যাঁ।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাবা হৃষ্টগলায় বললেন, তোর ওপর আমার অনেক আশা । অনেক আশা নিয়ে তোকে বড় করছি। তোর মা বেঁচে না থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে। ও বেঁচে থাকলে আদর দিয়ে তোকে নষ্ট করত। আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি তার কিছুই করতে দিত না। পদে পদে বাধা দিত। দিত কিনা বল ?

হ্যাঁ দিত।

তোর মা না থাকায় তাহলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছ, তাই না ?

হ্যাঁ।

বাবা হঠাৎ গলা নিচু করে বললেন, তোর মা যে নেই এর জন্যে আমার ওপর কোনো রাগ নেই তো ?

তোমার ওপর রাগ হবে কেন ?

বাবা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। সেই হাসি আমার বুকে বিঁধল । চট করে মনে পড়ল, অনেক অনেক কাল আগে সুন্দর একটা টিয়া পাখিকে বাবা গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। আমি শান্তস্বরে বললাম, মা কীভাবে মারা গিয়েছিলেন বাবা ?

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। তোকেই খুঁজে বের করতে হবে। শুধু হৃদয় বড় হলেই হবে না, তোকে বুদ্ধিমানও হতে হবে। তোর জ্ঞান এবং বুদ্ধি হবে প্রেরিত পুরুষদের মতো। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবি, আমি যা করেছি তোর জন্যেই করেছি। আচ্ছা আয়, এখন তোকে আকাশের তারাদের নাম শেখাই । একবার কালপুরুষের নাম বলেছিলাম না ? বল দেখি কোনটা কালপুরুষ ? এত দেরি করলে তো হবে না। তাড়াতাড়ি বল। খুব তাড়াতাড়ি। কুইক।

আমি ছাদ থেকে নিচে নামলাম ।

একধরনের গাঢ় বিষাদ বোধ করছি। এই ধরনের বিষাদ হঠাৎ হঠাৎ আমাকে

আক্রমণ করে, এবং প্রায় সময়ই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহাপুরুষদের কি এমন হয় ?

তারাও কি মাঝে মাঝে বিষাদগ্রস্ত হন ? হয়তো হন, হয়তো হন না। কোনো একজন মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম। আমাদের কথাবার্তা তখন কেমন হতো? মনে মনে আমি কথোপকথনের মহড়া দিলাম। দৃশ্যটা এরকম—বিশাল বটবৃক্ষের নিচে মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শীর্ণকায় কিন্তু তাকে বটবৃক্ষের চেয়েও বিশাল দেখাচ্ছে । তার গায়ে শাদা চাদর । সেই চাদরে তার মাথা ঢাকা । ছায়াময় বৃক্ষতল। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার জ্বলজ্বলে চোখের কালো মণি দৃশ্যমান। মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর শিশুর কণ্ঠস্বরের মতো কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনলে সেই কণ্ঠস্বরে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শ্লেষজড়িত উচ্চারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো । এই কথোপকথনের সময় তিনি একবারও আমার দিকে তাকালেন না। অথচ মনে হলো তাকিয়ে আছেন।

মহাপুরুষ : বৎস, তুমি কী জানতে চাও?

আমি : অনেক কিছু জানতে চাই। আপনি কি সব প্রশ্নের উত্তর জানেন ?

মহাপুরুষ : আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না। কিন্তু প্রশ্ন শুনতে ভালোবাসি। তুমি প্রশ্ন কর ।

আমি : বিষাদ কী ?

মহাপুরুষ : আমি জানি না।

আমি : আপনি কি কখনো বিষাদগ্রস্ত হন ?

মহাপুরুষ : বিষাদ কী তা-ই আমি জানি না। কাজেই বিষাদগ্রস্ত হই কি হই না তা কী করে বলি ? তুমি আরো প্রশ্ন কর । তোমার প্রশ্ন শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হচ্ছে ।

আমি : আনন্দ কী ?

মহাপুরুষ : বৎস আনন্দ কী তা আমি জানি না।

আমি : আপনি জানেন এমন কিছু কি আছে ?

মহাপুরুষ : না। আমি কিছুই জানি না। বৎস, তুমি প্রশ্ন কর।

আমি : আমার প্রশ্ন করার কিছুই নেই। আপনি বিদেয় হোন।

মহাপুরুষ : চলে যেতে বলছ ?

আমি : অবশ্যই – ব্যাটা তুই ভাগ।

মহাপুরুষ : তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ ?

আমি : হ্যাঁ।

মহাপুরুষ : তাতে লাভ হবে না বৎস্য। তুমি বোধহয় জানো না, আমাদের মানঅপমান বোধ নেই।

কথোপকথন আরো চালানোর ইচ্ছা ছিল । চালানো গেল না। ফুপু এসে বললেন, এই, তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিস কেন ?

আমি বললাম, কথা বলছি।

কার সঙ্গে বলছিস ?

মহাপুরুষের সঙ্গে।

ফুপু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই সবসময় এমন রহস্য করিস কেন ? তুই আমাকে পেয়েছিস কী ? আমাকেও কি বাদলের মতো পাগল ভাবিস? তুই কি ভাবিস

বাদলের মতো আমিও তোর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করব ?

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। ফুপু আমার সেই হাসি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, তুই একটা বিয়ে কর । বিয়ে করলে সব রোগ সেরে যাবে।

বিয়ে করাটা ঠিক হবে না ফুপু।

ঠিক হবে না কেন ?

যেসব রোগের কথা তুমি বলছ সেইসব রোগ কখনো সারাতে নেই। যে-কারণে মহাপুরুষেরা বিয়ে করেন না। আজীবন চিরকুমার থাকেন। বিয়ে করার পর যারা মহাপুরুষ হন তারা স্ত্রী-সংসার ছেড়ে চলে যান। যেমন বুদ্ধদেব ।

ফুপু হতচকিত গলায় বললেন, তুই আমাকে আপনি না বলে তুমি তুমি করে বলছিস কেন ?

আমি তো সবসময় তাই বলি ।

সে কী আমার তো ধারণা ছিল আপনি করে বলিস।

জিনা ফুপু, আপনি ভুল করছেন। আমার খুব প্রিয়জনদের আমি তুমি করে বলি। আপনি যদিও খুব কঠিন প্রকৃতির মহিলা, তবু আপনি আমার প্রিয়জন। সেই কারণে আপনাকে আমি তুমি করে বলি।

এই তো এখন আপনি করে বলছিস ।

কই না তো। তুমি করেই তো বলছি।

ফুপু খুবই বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আমার খুব ভালো লাগে। সম্ভবত আমি মহাপুরুষের পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছি। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছি।

রূপার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রও হচ্ছে বিভ্রান্তি। তাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় শীতকালে ।

৬

পৌষ মাস কিংবা মাঘ মাস ।

কিংবা অন্যকোনো মাসও হতে পারে, তবে শীতকাল এইটুক মনে আছে কারণ আমার গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের চাদর। রূপার গায়ে হালকা লাল কার্ডিগান। প্রথমে অবশ্যি কার্ডিগানের দিকে আমার চোখ পড়ল না। আমার চোখ পড়ল তার মাথায় জড়ানো স্কার্ফের দিকে। স্কার্ফের রঙ গাঢ় সোনালি ! কাপড়ে সোনালি এবং রূপালি এই দুটি রঙ সচরাচর চোখে পড়ে না হয়তো এই দুটি রঙ কাগজে খুব ভালো ধরে, কাপড়ে ধরে না ।

সোনালি রঙের স্কার্ফ মাথায় জড়ানো বলে দূর থেকে তার চুলগুলি মনে হচ্ছিল সোনালি । দেখলাম, সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বসে আছি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির বারান্দায়। বসেছি ছায়ার দিকে। শীতকালে সবাই রোদে বসতে ভালোবাসে। আমিও বাসি, তবু ছায়াময় কোণ বেছে নিয়েছি, কারণ ঐ দিকটায় ভিড় কম।

আমি লক্ষ্য করছি রূপা আসছে। আমি তাকে চিনি, তার নাম জানি, সে যে ধবধবে শাদা গাড়িটাতে করে আসে তার নম্বরও জানি, ঢাকা ভ-৮৭৮২। শুধু আমি

একা নই আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। সবাই কোনো-না-কোনো ছলে রূপার সঙ্গে কথা বলেছে, অনেকেই তার বাসায় গেছে। অতি উৎসাহী কেউ কেউ তার জন্যে নোট এবং বইপত্র জোগাড় করেছে। রূপার জন্মদিনে সব ছেলেরা মিলে একটা জলরঙ ছবি উপহার দিল । ছবিটার নাম বর্ষা। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে— একটি মেয়ে কদম গাছের একটি নিচু ডালে হাত দিয়ে মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

চমৎকার ছবি!

ছবিটা পাওয়া গিয়েছিল বিনা পয়সায়, তবে বাধাতে খরচ হলো পাচশ টাকা । সেই টাকা আমরা সবাই চাঁদা তুলে দিলাম।

রূপা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যার জন্যে চাঁদা তুলে কিছু-একটা করতে কারোর আপত্তি থাকে না । ছেলেরা গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে এদের সঙ্গে মেশে এবং জানে এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে তারা কখনোই খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। এরা যথাসময়ে বাবা-মার পছন্দ করা একটি ছেলেকে বিয়ে করবে। যে ছেলে সাধারণত থাকে বিদেশে ।

রূপা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলে বলল, কেমন আছ ?

রূপাকে যেমন সবাই তুমি করে বলে রূপাও তেমনি সবাইকে তুমি করে বলে। তার সঙ্গে দীর্ঘ দু-বছরে আমার কোনো কথা হয়নি। আজ হচ্ছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আন্তরিক সুরে বললাম, ভালো আছি।

আপনি কেমন আছেন ?

রূপা বিভ্রান্ত হয়ে গেল ।

আমি আপনি করে বলব তা সে আশা করেনি। তাকে অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত মনে হলো। সে এখন কী করে তাই আমার দেখার ইচ্ছা । তুমি করেই চালিয়ে যায়, না আপনি ব্যবহার করে। বাংলাভাষাটা বড়ই গোলমেলে। মাঝে মাঝেই তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করে। রূপা নিজেকে সামলে নিল । সহজ গলায় বলল, আপনি আপনি করছেন কেন ? আমাকে অস্বস্তিতে ফেলবার জন্যে ? আমি এত সহজে অস্বস্তিতে পড়ি না।

আমি বললাম, বস রূপা ।

রূপ বসতে বসতে বলল, অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছা।

কথা বল ।

কেন কথা বলার ইচ্ছা তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

জিজ্ঞেস করলাম না কারণ কেন কথা বলার ইচ্ছা তা আমি জানি। তুমি লক্ষ্য করেছ যে আমি তোমার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি। গায়ে পড়ে কথা বলতে যাইনি, টেলিফোন করিনি, হঠাৎ বাসায় উপস্থিত হইনি। ব্যাপারটা তোমার অহংকারে লেগেছে। সুন্দরী মেয়েরা খুব অহংকারী হয়। তারা সবসময় তাদের চারপাশে একদল মুগ্ধ পুরুষ দেখতে চায়।

রূপা মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার কথা মোটেও ঠিক না। আমি সেজন্যে তোমার কাছে আসিনি। আমি শুনেছি, তুমি ভবিষ্যতের কথা বলতে পার, হাত দেখতে পার। অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তোমার আছে। আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সঙ্গে মিথ্যা বলার দরকার নেই। সত্যি করে বল তোমার কি এ জাতীয়

কোনো ক্ষমতা আছে?

আছে ।

কী ধরনের ক্ষমতা ? আমার কাছে একটা নদী আছে। যে-কোনো সময় সেই নদীটাকে বের করতে পারি।

রূপা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, এইসব আজেবাজে কথা বলে লাভ নেই। তুমি আমাকে কনফিউজ করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে কি তুমি কিছু বলতে পার?

অবশ্যই পারি। তুমি একটা লাল গাড়িতে করে আস। সম্ভবত গাড়ির নাম্বার ঢাকা ভ ৮৭৮২.

রূপার ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখলাম। সম্ভবত আরো কিছু বলতে পারি। বলব?

বল ।

খুব ছোটবেলায় তুমি ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে দুহাত পুড়িয়ে ফেলেছিলে।

রূপা চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, কী করে বললে ?

অলৌকিক ক্ষমতায় ।

অলৌকিক ক্ষমতা না ছাই। আমার এই গল্প সবাই জানে। আমি অনেকের সঙ্গে হাত পুড়ে যাওয়ার গল্প করেছি। আমার মনে হয় আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। তুমি আমাদের কারো কাছ থেকে শুনেছ— ঠিক না ?

হ্যাঁ ঠিক ।

তাহলে তোমার কোনো ক্ষমতা-টমতা নেই ?

না। তবে একটা নদী আছে। নদীটার নাম ময়ূরাক্ষী।

আবার ফাজলামি করছ ?

ফাজলামি করছি না। নদীটা সত্যি আছে। এবং আমার কোনো ক্ষমতা যে নেই তাও ঠিক না। কিছু ক্ষমতা আছে।

কেমন ?

যেমন ধর, আজ তোমাকে নিতে গাড়ি আসবে না। তোমাকে রিকশা নিয়ে ফিরতে হবে।

এটা ঠিক হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে বলে ফেলেছ। আমাদের গাড়ি গ্যারেজে। সাইলেন্সার পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে। সারাতে দিয়েছে।

এছারাও আমি বলতে পারি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কত টাকা আছে।

কত আছে ?

একশ' টাকার নোট আছে দুটা, একটা কুড়ি টাকার নোট । এক টাকার নোট আছে সাতটা। কিছু খুচরা পয়সা, কত বলতে পারছি না।

রূপা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, বাক্স খুলে তুমি গুণে দেখ, ঠিক বললাম কিনা।

আমি গুণতে চাই না ।

গুণতে চাও না কেন ?

গুণলে দেখা যাবে তুমি ঠিক বলনি। তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তোমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে এটা বিশ্বাস করতে আমার ভালো লাগছে। চারদিকে এতসব সাধারণ মানুষ, এর মধ্যে একজন কেউ থাকুক যে সাধারণ নয়, অসাধারণ।

তুমি গুণে দেখ না।

রূপা গুণল এবং অবাক হয়ে বলল, কী করে হলো? কী করে তুমি বলতে পারলে?

আমি বললাম, আমি জানি না রূপা । মাঝে মাঝে কাকতালীয়ভাবে আমার কিছু কথা মিলে যায়। আচ্ছা, আমি যাই। আমি উঠে দাঁড়ালাম। রূপা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

পরের তিনমাস আমি ইউনিভার্সিটিতে গেলাম না । আমি জানি রূপা আমাকে খুঁজবে। যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আমাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। মেঘ আমরা কখনো স্পর্শ করতে পারি না বলেই মেঘের প্রতি মমতার আমাদের সীমা নেই।

তিনমাস পর হঠাৎ একরাতে রূপাদের বাসায় টেলিফোন করে বললাম, রূপা, তুমি কেমন আছ ?

ভালো।

চিনতে পারছ ?

চিনতে পারব না কেন ? তুমি কোথায় ডুব মেরে ছিলে ?

মামার বাড়ি গিয়েছিলাম ।

মামা বাড়ি ? ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মামার বাড়ি ?

হ্যাঁ, মামার বাড়ি। হঠাৎ ওদের খুব দেখতে ইচ্ছা করল।

তারা কি খুব চমৎকার মানুষ ?

না। তারা পিশাচশ্রেণীর।

কী সব কথা যে তুমি বল!

সত্যি বলছি। আমার তিন মামা । তিনজনই পিশাচ । তবে একজন মারা গেছেন। এখন দুজন আছেন। তারা পিশাচ হলেও আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তোমার বাবা-মার কথা বল ।

মার কথা বলতে পারব না। তেমন কিছু জানি না।

তোমার বাবার কথা বল ।

বাবা ছিলেন একজন চমৎকার মানুষ। তবে বাবা একবার একটা টিয়া পখিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।

তুমি এমন সব অদ্ভুত কথা বল কেন?

কী করব বল, আমার চারপাশে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে ।

রূপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি জানো আমি তোমার কথা খুব ভাবি?

আমি জানি।

সত্যি জানো?

হ্যাঁ জানি।

কী করে জানো?

ভালোবাসা টের পাওয়া যায় ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রূপা বলল, কেন জানি তোমার কথা আমার সবসময় মনে হয়। এর নাম কি ভালোবাসা ?

আমার জানা নেই, রূপা ।

তুমি আসবে আমাদের বাসায় ?

আসব।

কখন আসবে ?

এক্ষুনি আসছি।

এত রাতে বাবা হৈচৈ শুরু করবেন। তুমি কি সকালে আসতে পার না ?

না রূপা, আমাকে এক্ষুনি আসতে হবে।

আচ্ছা বেশ, আস।

তোমার কি কোনো নীল রঙের শাড়ি আছে ?

কেন বল তো।

যদি থাকে তাহলে নীল রঙের শাড়ি পরে গেটের কাছে থাক। আমি এলেই গেট খুলে দেবে।

আচ্ছা।

আমি গেলাম না। আবারো মাসখানিকের জন্যে ডুব দিলাম। কারণ ভালোবাসার মানুষদের খুব কাছে কখনো যেতে নেই।

৭

আমি রূপাকে কখনো চিঠি লিখিনি। একবার হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো । লিখতে বসে দেখি, কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। অনেকবার করে একটি লাইন লিখলাম—'রূপা তুমি কেমন আছ ? সমস্ত পাতা জুড়ে একটিমাত্র বাক্য।

সেই চিঠির উত্তরে রূপা খুব রাগ করে লিখল— তুমি এত পাগল কেন ? এতদিন পর একটা চিঠি লিখলে— তার মধ্যেও পাগলামি । কেন এমন কর ? তুমি কি ভাব এইসব পাগলামি দেখে আমি তোমাকে আরো বেশি ভালোবাসব ? তোমার কাছে আমি হাতজোড় করছি— স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ কর। ঐদিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে কেমন পাগলের মতো হাঁটছ। বিড়বিড় করে আবার কী—সব যেন বলছ। দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। তোমার কী সমস্যা তুমি আমাকে বল।

আমার সমস্যার কথা রূপাকে কি আমি বলতে পারি? আমি কি বলতে পারি— আমার বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্যে সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরি। মহাপুরুষ হবার সাধনা করি। যখন খুব ক্লান্তি অনুভূব করি তখন একটি নদীর স্বপ্ন দেখি । যে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজন তরুণী ছুটে চলে যায়। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে তাকায় আমার দিকে। তার চোখে গভীর মায়া ও গাঢ় বিষাদ । এই তরুণীটি আমার মা। আমার বাবা যাকে হত্যা করেছিলেন।

এইসব কথা রূপাকে বলার কোনোই অর্থ হয় না। বরং কোনো-কোনোদিন তরঙ্গিনী স্টোর থেকে তাকে টেলিফোন করে বলি– রূপা, তুমি কি এক্ষুনি নীল রঙের একটা শাড়ি পরে তোমাদের ছাদে উঠে কার্নিশ ধরে নিচের দিকে তাকাবে ? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। একটুখানি দাঁড়াও । আমি তোমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাব।

আমি জানি, রূপা আমার কথা বিশ্বাস করে না, তবু যত্ন করে শাড়ি পরে। চুল বাঁধে । চোখে কাজলের ছোঁয়া লাগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। সে অপেক্ষা করে। আমি কখনো যাই না।

আমাকে তো আর-দশটা সাধারণ ছেলের মতো হলে চলবে না। আমাকে হতে হবে অসাধারণ। আমি সারাদিন হাঁটি। আমার পথ শেষ হয় না। গন্তব্যহীন গন্তব্যে যে যাত্রা তার কোনো শেষ থাকার তো কথাও নয় ।

= = = সমাপ্ত = = =

দরজার ওপাশে

হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
হুমায়ূন আহমেদ
দরজার ওপাশে
SUVOM

১

ঘুমের মধ্যেই শুনলাম কে যেন ডাকল, হিমু, এই হিমু।

গলার স্বর একইসঙ্গে চেনা এবং অচেনা। যে ডাকছে তার সঙ্গে অনেক বছর আগে পরিচয় ছিল, এখন নেই। মানুষটাকে ভুলে গেছি, কিন্তু স্মৃতিতে তার গলার স্বর রয়ে গেছে।পুরুষালী ভারী গলা।একটু শ্লেষ্মা জড়ানো। আমি আধোঘুমে জবাব দিলাম, কে? কেউ উত্তর দিল না। ভয়াবহ ধরণের নিরবতা। আমি আবার বললাম, কে? কে ওখানে? ছোট্ট করে কেউ নিঃশ্বাস ফেলল। আশ্চর্য! নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটাও আমার চেনা। টুক টুক করে দু'বার শব্দ হল দরজায়। দরজার ওপাশের মানুষটি চাপা গলায় ডাকল, হিমু, এই হিমু।

আমার অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। ঘর অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে দরজা—জানালা বন্ধ করে শুয়েছি।রেডিয়াম ডায়ালের টেবিল ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার দেখছি। ঐ তো দেয়ালের ক্যালেন্ডার দেখা যাচ্ছে। ক্যালেন্ডারের লেখাগুলি পর্যন্ত পড়তে পারছি।এর মানে কি? এটা কি তাহলে স্বপ্ন? পুরো ব্যাপারটা ঘটছে স্বপ্নে? দরজার ওপাশে আসলে কেউ নেই? চেনা এবং অচেনা গলায় আমাকে ডাকছে না? ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি, এবং ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারছি এটা স্বপ্ন। স্বপ্নটা শেষপর্যন্ত দেখতে ইচ্ছা করছে না। আমি দরজা খুলে দেখতে চাই না – দরজার ওপাশে কে দাঁড়িয়ে আছে। আমার জানার কোন ইচ্ছা নেই ভারি গলায় কে আমাকে ডাকছে। আমি জেগে ওঠার চেষ্টা করছি। জাগতে পারছি না কেউ আমাকে স্বপ্নের শেষটা দেখাতে চায়, আমি দেখতে চাই না। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে করতে আমি জেগে উঠলাম।

ঘরের হাওয়া গরম হয়ে আছে। দরজা-জানালা বন্ধ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি বাতি জ্বালালাম। স্বপ্নে দেয়ালে যে জায়গায় ক্যালেন্ডার ছিল সেখানে ক্যালেন্ডার নেই। খাটের নিচে টকটক শব্দ হচ্ছে। প্রায়ই হয়। কিসের শব্দ আমার জানা নেই। ইঁদুর হবে না, ইঁদুর টকটক শব্দ করে না। আমি হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুললাম।

ভোর হয়েছে। আলো হয়ে আছে চারদিক। আমার দরজা-জানালা বন্ধ ছিল বলেই ঘর হয়েছিল অন্ধকার। বারান্দায় এসে দেখি, পাশের ঘরের বায়েজিদ সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছেন। তাঁর চোখ টকটকে লাল। এটা কোন নতুন ব্যাপার না। বায়েজিদ সাহেবের চোখ সব সময়ই লাল। তিনি আমাকে দেখে নিচু গলায় বললেন, কি ব্যাপার হিমু সাহেব? এত সকালে জেগে উঠেছেন, ব্যাপার কি?

'ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

'সুবেহ সাদেকের সময় ঘুম ভাঙ্গা ভাল। এই সময় আল্লাহ পাক বেহেশতের জানালা খুলে রাখেন। ঐ জানালা দিয়ে বেহেশতের হাওয়া আসে পৃথিবীতে। ঐ হাওয়া যাদের গায়ে লাগে তারা বেহেশতবাসী হয়।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, শোনা কথা।

'আপনি কি এই জন্যেই রোজ ভোরে উঠে বেহেশতের হাওয়া গায়ে লাগান?'

বায়েজিদ সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন। ভোরবেলা অদ্ভুদ আলোর কারণেই তাঁকে আজ অনেক কম বয়স্ক মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁকে দেখে আমার সবসময় মনে হয়েছে তাঁর গা থেকে কেউ একজন

লেবুর মত সমস্ত রস চিপে নিয়ে নিয়েছে। হাঁটেন খানিকটা কুজো হয়ে। চোখে চোখ পড়লে চোখ নামিয়ে নেন। রাস্তায় দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করি, 'কেমন আছেন বায়েজিদ সাহেব?' তিনি বিব্রত গলায় কোন রকমে বলেন, 'এই আছি'। ছুটির দিনে তিনি তাঁর ঘরে থাকেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে। ছুটির দিনগুলিতে মেসে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়। সবাই একসঙ্গে বসে খায়। তিনি কখনো বসেন না। সবার খাওয়া হয়ে গেলে এক সময় চুপি চুপি খেতে যান। মাথা নিচু করে অতি দ্রুত খাবার পর্ব শেষ করেন। যেন খাওয়া একটা অন্যায় কাজ। যত দ্রুত শেষ করা যায়, তত ভাল। এই লোক আমাকে দেখে এতগুলি কথা বলবে, ভাবা যায় না। আমি তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বেহেশতের জানালা খোলার ব্যাপার যখন আছে তখন দোজখের জানালা খোলার ব্যাপারও থাকার কথা। ঐটা কখন খোলা থাকে জানেন?'

'রাত বারোটা থেকে সুবেহ সাদেকের আগ পর্যন্ত। এই জন্যে এই সময় ঘরের ভেতর থাকার বিধান আছে। সবই অবশ্য শোনা কথা। সত্যি মিথ্যা জানি না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সত্যি হলে আমার জন্যে খুব মুশকিল। আমার অভ্যাস হল গভীর রাতে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা'।

বায়েজিদ সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি জানি। তবে আপনার জন্যে কোন সমস্যা নাই'।

'সমস্যা নেই কেন?'

'আপনি সঠিক মানুষ'।

'আমি সঠিক মানুষ আপনাকে কে বলল? রাত-বিরাতে রাস্তায় হাঁটলেই মানুষ সঠিক হয়ে যায়? তাহলে তো চোর পুলিশ সবচে বড় সঠিক'।

বায়েজিদ সাহেব আবার মাথা নিচু করে ফেললেন। সম্ভবত তিনি আর কথা বলবেন না। একদিনে বেশি কথা বলে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগছে। ভদ্রলোক দু'বছরের উপর আমার পাশের ঘরে আছেন। এই দু'বছরে তাঁর সঙ্গে আমার তিন চার বারের বেশি কথা হয়নি। সেই সব কথাও—"কেমন আছেন বায়েজিদ সাহেব?" "এই আছি।' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ভদ্রলোক কি করেন, তাঁর দেশ কোথায়, তাঁর চোখ সবসময় টকটকে লাল কেন কিছুই জানি না।

'বায়েজিদ সাহেব।'

'জ্বি'।

'কাল রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিলাম। রেসকোর্সের ভেতরে হেঁটে হেঁটে দোজখের হাওয়া লাগাচ্ছিলাম। বৃষ্টি যখন শুরু হল তখন ঘরে এসেছি। এত সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গার কথা না। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গেছে। স্বপ্নটা পুরোপুরি দেখতেও পারিনি। মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্ন। দেখতে ইচ্ছা করছিল না বলে দেখিনি। জেগে উঠেছি।'

বায়েজিদ সাহেব শান্ত গলায় বললেন, সুবেহ সাদেকের সময় আল্লাহপাক কাউকে দুঃস্বপ্ন দেখান না।

'তাই না-কি?'

'জ্বি। সুবেহ সাদেক খুব একটা ভাল সময়। এই সময় আল্লাহপাক মানুষকে মঙ্গলের কথা বলেন, আনন্দের কথা বলেন।'

'এটাও কি মওলানার কাছ থেকে শোনা কথা?'

'জ্বি-না, আমার স্ত্রীর কথা। সে জীবিত নেই। উনিশ বছর আগে মারা গেছে। আমার কন্যার জন্মের সময় মারা গেল। সে জীবিত থাকার সময় অদ্ভুদ অদ্ভুদ কথা বলত। তখন হাসাহসি করতাম। এখন করি না। এখন তার সব কথাই সত্যি মনে হয়।'

'বেহেশত এবং দোজখের জানালার কথাও কি তাঁর কথা?"

'জ্বি'।

'আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনি আর বিয়ে করেন নি?'

'জ্বি-না'।

'আপনার মেয়েটির বয়স তাহলে এখন উনিশ?'

'জ্বি'।

'তার কি বিয়ে হয়েছে?'

'জ্বি-না।'

'সে থাকে কোথায়?'

'তার মামাদের কাছে থাকে। নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলাম। সামর্থ্য হল না।অতি ছোট চাকরি করি । বেতন যা পাই তা দিয়ে ঢাকায় ঘর ভাড়া করে থাকা সম্ভব না।'

'আমি আপনাকে অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি-না'। আমি কিছুই মনে করি নি। আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেক দিন থেকে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সাহসে কুলায়নি।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছিলেন কেন?'

'আপনি মহাপুরুষ ধরণের মানুষ। আপনি আমার মেয়েটার জন্যে একটু প্রার্থনা করলে তার মঙ্গল হবে, এই জন্যে। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছি না। দুষ্ট লোকজন আমার মেয়েটার নামে বাজে একটা দুর্নাম ছড়িয়েছে। পুরো ব্যাপারটা যে মিথ্যা সবাই জানে, কেউ বিশ্বাস করে না, আবার সবাই বিশ্বাস করে। মেয়েটা খুব কষ্টে আছে ভাই সাহেব। আমি জানি, আপনি মেয়েটার কষ্ট কমাতে পারবেন। আমার মেয়েটা যে কত ভাল তা একমাত্র আমি জানি আর জানেন আল্লাহপাক। আপনার কাছে আমি হাতজোড় করছি।'

বায়োজিদ সাহেব সত্যি সত্যি হাত জোড় করলেন। আমি বিব্রত গলায় বললাম – 'ভাই, আপনি আমার হলুদ পাঞ্জামি, লম্বা দাড়ি-গোঁফ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনার দোষ নেই, অনেকেই হয়। বিশ্বাস করুন, আমি মহাপুরুষ না। অতি সাধারণ মানুষ প্রচুর মিথ্যা কথা বলি, অনেক ধরণের ভড়ং করি। মানুষকে হকচকিয়ে দেয়ার একটা সচেতন চেষ্টা আমার মধ্যে থাকে। কাজকর্ম করার কোন ক্ষমতা নেই বলেই আমি ভবঘুরে। বুঝতে পারছেন'?

বায়োজিদ সাহেব আগের মতো কোমল গলায় বললেন, 'আপনি একটু দোয়া করবেন আমার মেয়েটার জন্যে। অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। সাহস পাইনি। আজ আল্লাহপাক সুযোগ করে দিয়েছেন'।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ঠিক আছে, প্রার্থনা করলাম। অসম্ভব রুপবান এবং ধনবান ছেলের সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ে হবে। তারা দু'জনে মিলে ঘুরবে দেশ থেকে দেশান্তরে'।

বায়েজিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনার অসীম শুকরিয়া।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপুরুষদের মতেই গম্ভীর ভঙ্গিতে নিচে নেমে গেলাম। ভাল যন্ত্রনা হয়েছে। আমারেক অলৌকিক ক্ষমতাধর মনে করে এমন লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।একটা আশ্রম-টাশ্রম খুলে বসার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে।

কমন বাথরুম নিচে। এত ভোরে কেউ উঠেনি। বাথরুম খালি পাওয়া যাবে। কল ছেড়ে কিছুক্ষণ মাথা পেতে বসে থাকব। তারপর পর পর তিন কাপ চা খেতে হবে। রাতে ঘুম না হওয়ায় মাথা জাম হয়ে আছে। চা খেয়ে রফিকের বাসায় একবার যেতে হবে। সে গত এক সপ্তাহ ধরে দুদিন পর পর আমার কাছে আসছে। কখনো দেখা হচ্ছে না। সে এমন সময় আসে যখন আমি থাকি না। তার ব্যাপারটি কি, কে জানে?

বাথরুমের বেসিন অনেকদিন ধরেই ভাঙ্গা। আজ দেখি নতুন বেসিন। বেসিনের উপর নতুন আয়না। মেসের মালিক বসিরুদ্দিন সাহেব খরচের চুড়ান্ত করেছেন বলে মনে হচ্ছে। বেসিনের কাছে না গিয়েও বলতে পারছি কোন রিজেকটেড বেসিন বসিরুদ্দিন সাহেব কুড়িয়ে এনে ফিট করে দিয়েছেন। আয়নাটাও হবে ঢাকা শহরের সবচে সস্তা আয়না। মুখ দেখা যাওয়ার কোন কারণ নেই।

আয়না দেখলেই আমার কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। খুবই ক্ষুদ্র ইচ্ছা। এবং নির্দোষ ইচ্ছা। তবু অতি ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। একবার প্রশ্রয় দেয়া শুরু করলে সব ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিতে মন চাইবে। “যে মানব সন্তান ক্ষুদ্র কামনা জয় করতে পারে সে বৃহৎ কামনাও জয় করতে পারে।” এই মহৎ বাণী আমার বাবার। চামড়ায় বাঁধানো তিনশ একুশ পৃষ্টার একটা খাতায় তিনি এইসব বাণী মুক্তার মত গোটা গোটা হরফে লিখে রেখে গেছেন। পুরো খাতাটাই হয়তো ভরে ফেলার ইচ্ছা ছিল। সময় পাননি। মাত্র চার দিনের নোটিসে তাঁকে পৃথিবী ছাড়তে হল। জ্বর হল। জ্বরের চতুর্থ দিনে বিস্ময় এবং দুঃখ নিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হল। আমাকে হতাশ গলায় বললেন, আসল কথা তোকে কিছুই বলা হল না। অল্প কিছু লিখেছি—এতে কিছুই হবে না। তিনি আঠারো পৃষ্টা পর্যন্ত লিখেছেন। কিছু কিছু বাণী লেখার পরও কেটে ফেলা হয়েছে, তাঁর পছন্দ হয়নি। বাণীর মধ্যেও ভেজাল আছে। এ রকম একটা ভেজাল বাণী হল:

> “হে মানব সন্তান, সুখের স্বরুপ নির্ধারণের চেষ্টা কর। যে সুখের স্বরুপ জেনেছে
> সে দুঃখ জেনেছে। দুঃখের বাস সুখের মাঝখানে।”

এই বাণ লাল কালি দিয়ে কেটে তার নিচে বাবা লিখেছেন—ভাব অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে।

কলের নিচে মাথা পেতে মনে হল জগৎ সংসারে সবটাই কি অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে নয়? স্বপ্নকে আমরা অস্পষ্ট । বাস্তব কি স্বপ্নের চেয়েও অস্পষ্ট নয়?

শুধু মাথা ভেজানোর জন্যে গিয়েছিলাম, পুরো শরীর ভিজিয়ে ফেললাম। আরাম লাগছে। একটু শীত ভাব হচ্ছে—আরামদায়ক শীত ভাব। অর্থাৎ আমি সুখ পাচ্ছি। এই সুখের স্বরুপ জানলেই দুঃখ কি তা জেনে ফেলব। ভেজাল বাণী তাই বলেছে। চোখ বন্ধ করে কলের নিচে মাথা পেতে আছি। সারাদিন এভাবে বসে থাকলে কেমন লাগবে। চোখ বন্ধ থাকায় বৃষ্টির মত লাগছে। মনে হচ্ছে আষাঢ় মাসের মুষল বর্ষণে গা পেতে আছি।

মেসের ঠিকা ঝি ময়নার মা'র কথা কানে না এলে কল্পনা আরো ফেনানো যেত। ময়নার মা চলে এসেছে। সে কথা না বলে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। আশেপাশে কেউ নেই বলে কথা বলছে বাসনগুলির সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে কথা বললে তেমন কৌতুহলী হতাম না। বাসন কোসনের সঙ্গে কথা বলছে বলেই কৌতুহলী হয়ে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। মানুষ শুধু যে প্রাণী জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাই না, জড় জগতের সঙ্গেও চায়।

ময়নার মা চাপা গলায় গভীর বেদনার সঙ্গে বলছে, চেপ্টা থালা। আমিও চেপ্টা, তুইও চেপ্টা। আমার চেপ্টা কপাল, তরও চেপ্টা কপাল। কান্দাভাঙা ডেকচি। তর যেমন কান্দাভাঙা, আমারও কান্দাভাঙা। তর কান্দা ভাঙছি আমি ময়নার মা। ক'দেহি আমার কান্দা কে ভাঙছে?

ময়নার মা'র কথা শোনার ইচ্ছা করছে, ক্ষুদ্র এবং নির্দোষ ইচ্ছা। এটা ঠিক হচ্ছে না। কলের পানি আরো জোরে ছাড়তে পারলে কাজ হতো। পানিতে আর জোর নেই। আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। ময়নার মা আমাকে দেখে লম্বা ঘোমটা দিল। ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, আব্বার শইল ভাল? সে গোড়া থেকেই আব্বা ডাক ধরেছে। নিষেধে কাজ হয়নি।

'ভাল। তুমি কেমন আছ, ময়নার মা?'

'আমি হইলাম আফনের কান্দাভাঙা ডেগ। আফনের মাথার দরদ কমছে?'

'কয়েকদিন হচ্ছে না।'

'বদ্যি গেরামের একখান তেল আছে, মাথার দরদে খুব আরাম। আফনেরে আইন্যা দিমু।'

'আচ্ছা দিও।'

'দেশের বাড়িত কেউ নাই, যাওয়া পড়ে না। আফনের জইন্যে যামু।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার দিক থেকে কোন সাড়া পেলে সে কথা বলা থামাবে না।

'মাথার দরদ ভাল জিনিস না। ময়নার বাবা মরল মাথার দরদে। ফাল্গুন মাসে আমার পরথম বলল, আইজ কাজে যামু না—মাথার মইদ্যে দরদ। আমি কইলাম এইটা কেমুন কথা? মাথার মইদ্যে দরদ হইছে বইল্যা কাম কামাই করবেন? যান কামে যান। তা ধরেন মানুষটা গেল...'

ময়নার মা'র এই গল্প আগেও কয়েকবার শোনা। আবারো শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছি। শুনতে মোটেও ইচ্ছা করছে না। গল্পটা আবার বলতে পেরে সে যতটা আনন্দ পাচ্ছে আমি ঠিক ততটাই বিরক্ত হচ্ছি। সব মিলে সমান সমান।

রফিকের কাছে যাব বলে ভেবেছিলাম তার প্রয়োজন হল না। ভেজা কাপড়ে দোতলায় উঠে দেখি রফিক বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত সুপুরুষ একজন মানুষ। আমার ধারণা, সে ছেড়া শার্ট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে রাজপুত্রের মত লাগবে। সে শেভ করেনি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। তার পরেও এত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, কি খবর রফিক?

রফিক একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। জবাব দিল না। চুপ করে রইল। প্রশ্ন করলে সে কখনো জবাব দেয় না। আগে কিছুটা দিত, ইদানীং একেবারেই দিচ্ছে না। ব্যাপারটা যত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আসলে তত অস্বাভাবিক

না। প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকার কারণ সে নিজেই ব্যাখ্যা করছে। সেই ব্যাখ্যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় স্যারেরা তাকে প্রশ্ন করতেন, পড়া ধরতেন। সে যে উত্তরই দিত মার খেতে হত। মার খেতে খেতে প্রশ্নের উপরই তার এক ধরণের ভীতি জন্মে গেছে। প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না, গম্ভীর হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তরে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। তার কাছে কিছু জানতে হলে এমনভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় যেন কখনো প্রশ্ন বলে মনে হয় না।

'দাঁড়া আমি কাপড় ছাড়ি। তারপর চা খেয়ে আসি। তুই কয়েকবার আমার খোঁজ করেছিস। ব্যাপার কি?'

রফিক চুপ করে রইল। চুপ করে থাকবে, জানা কথা। শেষের দিকে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি কাপড় ছাড়লাম। শার্ট-প্যান্ট পরতে পরতে বিরক্ত গলায় বললাম, কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকলে কোন লাভ হবে না। কিছু বলার থাকলে বলে ফেল।

'তোর কোন মন্ত্রীর সাথে পরিচয় আছে?'

'কেন?'

রফিক নিঃশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না। আমি হতাশ গলায় বললাম, তুই যা বলার বলে যা আমি নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করব না।

'চাকরি চলে গেছে। সাসপেনশন অর্ডার হয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি কিছুই করি নি। সুপারিনটেনডেন্ট ইনজিনিয়ার এসেছিলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি জবাব দিলাম না। উনি মনে করলেন আমি ইচ্ছা করে বেয়াদবী করছি'।

'যারা তোকে চেনে, তোর সঙ্গে কাজ করে, তারা তো তোর স্বভাব-চরিত্র জানে। তারা কিছু বলল না? তারা জানে তোকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তুই চুপ করে থাকিস।'

রফিক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কেউ আমার পক্ষে কিছু বলে নি। আমার সাসপেনশন অর্ডার হওয়ায় সবাই খুশি। কেউ আমাকে দেখতে পারে না।'

'তোকে দেখতে না পারার তো কোন কারণ নেই।'

'আমাকে শো-কজ করেছিল। শো কজের জবাব দিয়েছি। জবাব ওদের পছন্দ হয় নাই। সবাই বলেছে আমাকে ডিসমিস করে দেবে।'

'শো কজে কি লিখেছিলি? কথা বল গাধা। তোকে প্রশ্ন করছি না—এমি জিজ্ঞেস করলাম।'

রফিক চুপ করে রইল। আমি বিরক্ত গলায় বললাম, ওদের কোন দোষ দিচ্ছি না। আমি তোর বস হলে অনেক আগেই ডিসমিস করে দিতাম। প্রশ্নের জবাব দে যাতে বুঝতে পারি ব্যাপারটা কি। শেষ প্রশ্ন।

'কবে শো কজ করেছে? কবে জবাব দিয়েছিস?'

এক বাক্যে ডাবল প্রশ্ন। রফিক শুধু ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমি জবাবের জন্য অপেক্ষা করলাম না। চা খাবার জন্য রওনা হলাম। রফিক ক্ষীণ স্বরে বলল, 'অনেক আজেবাজে কথা শো কজে লিখেছে—আমি নাকি কাজ জানি না, কাজের প্রতি আমার আগ্রহ নাই। ইনসাবর্ডিনেশন। মনটা খারাপ হয়েছে। তোর জানাশোনা মন্ত্রী আছে?"

এবার আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে থাকলে রফিক নিজেই বলবে। রফিক

বলল, আমার এক খালাত ভাইয়ের আত্নীয় আছে মন্ত্রী। খালাতো ভাইকে বললে হয়। বলতে ইচ্ছা করে না। খালাতো ভাইটা বিরাট বদ। তুই কোন মন্ত্রী চিনিস না, তাই না? চেনার অবশ্য কথা না। ভাল মানুষদের সঙ্গে মন্ত্রীর পরিচয় থাকে না। বদগুলির সঙ্গে থাকে। খালাতো ভাইটা একটা বদ এই জন্যেই......

রফিক কথা শেষ করল না। মাঝে মাঝে সে দীর্ঘ বাক্য শুরু করে। যেই মূহুর্তে মনে করে অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেল, সেই মুহুর্তে চুপ করে যায়। বাক্যটা শেষ পর্যন্ত করে না।

চায়ের টেবিলে দু'জন মুখোমুখি বসলাম। রফিক নাশতা করে এসেছে কি-না জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। জবাব দেবে না। দু'জনের নাশতা দিতে বললেই ভাল।

'রফিক, এই সপ্তাহেই তোদের বাড়িতে যাব। তোরা তো এখনো নারায়নগঞ্জ ড্রেজার কলোনিতে থাকিস? জবাব দিতে হবে না উপরে নিচে মাথা নাড়, তাহলে বুঝব'।

রফিক মাথা নাড়ল।

'নদীর কাছে না তোদের বাড়ি?'

রফিক আবার মাথা নাড়ল।

'তুই এক কাজ করতে পারবি—নদীর তীরে বালির ভেতর দুটা গর্ত খুঁড়ে রাখতে পারবি? মানুষসমান গর্ত। যেন গর্তে ঢুকলে শুধু মাথাটা বের হয়ে থাকে। কাজটা করতে পূর্ণিমার আগের দিন'।

রফিক বিরস গলায় বলল, আচ্ছা।

গর্ত কেন খুঁড়তে হবে, কি ব্যাপার, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। এই স্বভাবই তাঁর না। পূর্ণিমার আগের দিন তার বাড়িতে উপস্থিত হলে দেখা যাবে সে ঠিকই গর্ত খুঁড়ে বসে আছে।

পরোটা ভাজি দিয়ে গেছে। রফিক খাচ্ছে না। অর্থাৎ সে বাড়ি থেকে নাশতা করে বের হয়েছে। ভোররাতে রওনা না হলে এত সকালে কেউ ঢাকায় পৌঁছতে পারে না। এত ভোরে কে তাকে নাশতা বানিয়ে দিয়েছে? তার বউ? বছর খানিক আগে রফিক বিয়ে করেছে। যতদুর জানি, মেয়েটা চমৎকার। আপন-পর বলে তার মধ্যে কিছু নেই। সবাই আপন। প্রচন্ড মাথা ব্যথা নিয়ে রফিকের কাছে গিয়েছি। তার স্ত্রীর সঙ্গে সেবারই প্রথম দেখা। সে রাগী গলায় বলল, মাথা ব্যথা করছে আমাকে বলেননি কেন? আমি মাথা ব্যথার এমন একটা ম্যাসেজ জানি দু'মিনিটে ব্যথা উধাও হবে। দেখি মাথা নিচু করুন তো। বৌ-এর সঙ্গে তার মিল হয়নি। বউ বেশিরভাগ সময়ই বাপের বাড়িতে থাকে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে না জানি, তবু জিজ্ঞেস করলাম, তোর বউ তোর সঙ্গে থাকে, না বাপের বাড়ি থাকে?

'বাপের বাড়ি।'

'আসে না তোর এখানে?'

'আর আসবে না।'

রফিককে খুব চিন্তিত বা বিষাদগ্রস্ত মনে হল না। কখনো মনে হয় না। দুঃখিত বা বিষাদগ্রস্ত হবার ক্ষমতা সম্ভবত তার নেই। আমি সিগারেট ধরালাম। রফিকের দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিতেই সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সিগারেট খাই না। বউ পছন্দ করে না। তোর চেনা মন্ত্রী নাই? মন্ত্রী ছাড়া কিছুই হবে না।

আমি হালকা গলায় বললাম, একজন মন্ত্রীকে আমি খুব সামান্য চিনি। জহিরের

বাবা। জহির আমার সঙ্গে স্কুল পড়ত। দেখি উনাকে বলে কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না। চিন্তা করিস না।

'আমি চিন্তা করি না।'

তবে সমস্যা কি জানিস—আমি একটা কোন কথা বললেই তো মন্ত্রী শুনবে না। তিনি যেন মন দিয়ে আমার কথা শুনেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আরেক কাপ চা খাবি?'

রফিক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। সে মনে হল আরো সুন্দর হয়েছে। বসে আছে কেমন হতাশ ভঙ্গিতে। বড় মায়া লাগছে। রফিকের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজে ওঠার পর। কোন একটা সমস্যা হলেই সে আমার কাছে এসে সমস্যাটা বলে নিশ্চিত হয়ে যায়। এখন সে বাড়ি যাবে পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হয়ে। পঞ্জিকা দেখে পূর্ণিমার দিন গর্ত খুঁড়ে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। কোন কারণে সেদিন ঝড়বৃষ্টি হলেও সে দমবে না। তার এই আনুগত্য আমার একার প্রতি না, সবার প্রতি। এ ধরণের অন্ধ আনুগত্য শুধু পশুদের দেখা যায়। রফিক পশু না, মানুষ। বুদ্ধিমান সৎ ভালমানুষ ধরণের মানুষ। এমন সুন্দর একজন মানুষ যে দেখলেই মনে হয় প্রকৃতি তার এই সৌন্দর্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করেছে। সেই উদ্দেশ্য কি কে জানে?

'রফিক।'

'হু।'

'তোর মা'র শরীর আশা করি ভালই আছে।'

'বেশি ভাল না। শিগগির মারা যাবেন। কিছু খেতে পারেন না। খুব নাকি গরম লাগে। সারাক্ষণ তালপাখা পানিতে ভিজিয়ে সেই পাখায় হাওয়া করতে হয়। ফ্যানের হাওয়া সহ্য হয় না।'

'হাওয়া কে করে? তুই?'

রফিক আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না, পর পর দুটি প্রশ্ন করা হয়ে গেছে। তার জবাব দেবার কথা না।

২

পিচগলা রোদ উঠেছে।

রাস্তার পিচ গলে স্যান্ডেলের সঙ্গে উঠে আসছে। দুটা স্যান্ডেলে সমানভাবে লাগলে কাজ হত, তা লাগেনি। ডান দিকেরটায় কম। শুধুমাত্র রোদের কারণে এই মুহুর্তে আমর ডান পা, বা পায়ের চেয়ে লম্বা। আমি ইচ্ছা করে ডান পায়ের স্যান্ডেলে আরো খানিকটা পিচ লাগিয়ে দেড় ইঞ্চি হিল বানিয়ে ফেললাম। এখন আমাকে হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমার হাঁটার ভঙ্গি দেখে যে-কেউ মনে করতে পারে —উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রা। আসলে তা নয়। দুপুর রোদে অকারণে হাঁটছি না। বিশেষ উদ্যেশ্য আছে, বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আমি যাচ্ছি মন্ত্রীর সন্ধানে। সরাসরি মন্ত্রী ধরা যাচ্ছে না। জহিরের মাধ্যমে ধরা হবে। সুক্ষ্ম পরিকল্পনার ব্যাপার আছে।

চৈত্র মাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে আমার গায়ে একটা গরম চাদর। চুল দাড়ি কাটা হয়নি

বলে চেহারা হয়েছে ভয়ংকর। দুটা অসমান পা নিয়ে হাঁটছি। তারপরেও আমাকে দেখে মনে হতে পারে আমি পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছি। কারণ আমার হাতে জলন্ত সিগারেট। মাঝে মাঝে আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছি।

রাস্তাঘাট ফাঁকা। হরতাল হরতাল ভাব। প্রভেদ এইটুকুই—হরতালের সময় রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেপুলেদের মহানন্দে খেলতে দেখা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে না। পথের ধারে বেলের শরবত বিক্রি হচ্ছে। শরবত যারা বিক্রি করে তাদের চোখে-মুখে তৃষ্ণার্তের ভঙ্গি থাকে। এই শরবতওয়ালার মধ্যে সেই ভঙ্গি খুব বেশি মাত্রায়। সে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এত আগ্রহ নিয়ে গত তিন বছরে কেউ আমার দিকে তাকায়নি। মানুষের আগ্রহকে উপেক্ষা করা ঠিক না। আমি থমকে দাঁড়ালাম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে এবং হাসিমুখে বললাম, খবর ভাল?

বেচারা হকচকিয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না। তাকাল জগের দিকে। জগভর্তি হলুদ পানীয়তার উপরে বরফের কুচি ভাসছে। আমার ধারণা, পৃথিবীতে যে ক'টি কুৎসিত পানীয় আছে বেলের শরবত তাদের মধ্যে এক নম্বর। দু'নম্বরে আছে তোকমার শরবত। তোকমার শরবত খাবার সময় মনে হয় ছোট ছোট কেচোর টুকরা পানিতে গুলে খেয়ে ফেলছি।

শরবতওয়ালার হকচকানো ভাব কমানোর জন্যে বললাম, বেলের শরবত কত করে?

'ডবল তিন টেকা। সিঙ্গেল দুই টেকা'।

'তোকমারশরবত বিক্রি করেন না?'

'জ্বি না। চলে না। ভাল জিনিসের কদর নাই।'

'দেখি এক সিঙ্গেল বেলের শরবত'।

'ডবল খান। ডবল শইলের জন্যে ভাল।'

'দিন ডবলই দিন।'

শরবতের জগের চারপাশে ভনভন করে মাছি উড়ছে। যে পানিতে শরবত বানানো হয়েছে সেখানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কিলবিল করার কথা। বরফে আছে টাইফয়েডের জীবাণু । এরা না-কি ঠান্ডায় ভাল থাকে।

দুটা বড় গ্লাসে শরবত ঝাঁকাঝাঁকি হচ্ছে। লেবু চিপে খানিকটা লেবুর রস দেয়া হল। মনে হচ্ছে, এক চিমটি লবণও মেশানো হল। একটা বোতল থেকে গোলাপজলের পানি ছিটানো হল। সামান্য তিন টাকায় এত কিছু পাওয়া যাচ্ছে। গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে শরবতওয়ালা গম্ভীর মুখে বলল, মধু আর বেল এই দুই জিনিসের মধ্যে আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে।

'তাই না-কি?'

'জ্বি। তয় মধু শইল গরম করে, আর বেল করে ঠান্ডা।'

'দুটা এক সঙ্গে খেলে কি হবে? শরীর চলে আসবে মাঝামাঝি অবস্থায়? ঠান্ডাও না, গরমও না। তাই না?'

শরবতওয়ালা সরু চোখে তাকাচ্ছে। আমি রসিকতা করছি কি-না বোঝার চেষ্টা করছে। তার সমগোত্রীয় কেউ রসিকতা করলে সে হেসে ফেলত। আমাকে সমগোত্রীয় মনে হচ্ছে না। একধাপ উপরের মনে হচ্ছে। উচু ক্লাসের রসিকতা

অপমান হিসেবে ধরে নিতে হয়। তাই নিয়ম।

একটানে সরবত শেষ করে তৃপ্তির ভঙ্গি করে বললাম, আহা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। জিনিস ভাল। অতি উত্তম। শরবতওয়ালার মুখের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। এটাকেও সে রসিকতার অংশ হিসেবেই মনে করছে। আমি চকচকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। উদার গলায় বললাম, পুরোটা রেখে দিন। বখশিশ।

এইবার মুখের অন্ধকার একটু কাটল। সরবতওয়ালা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোকমার সরবত খাইতে চাইলে আইসেন। আইন্যা রাখব। ইসপিসাল বানায়ে দিব। খায়া আরাম পাইবেন।

'কবে আসব?'

'শুক্কুরবারে আইসেন। বুধবারে দেশে যাব। শুকুরবার সকালে ফিরব।'

'এই খানেই পাওয়া যাবে আপনাকে?'

'জ্বে।'

'নিন ভাই একটা সিগারেট খান।'

শরবতওয়ালা হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মোটেই অস্বস্তি বোধ করল না। যে অধিকারের সঙ্গে সে নিল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে শুক্রবারে যদি আমি আসি সে তোকমার সরবত খাওয়াবে এবং দাম নেবে না। এরা এসব ব্যাপারে খুব সাবধান।

'নাম কি ভাই আপনার?'

'এমদাদ মিয়া।"

'যাই। ভাল শরবত খেলাম।"

'মনে কইরা আইস্যেন শুক্কুরবারে'।

দুপুর দুটা, চৈত্র মাসের দুপুর দু'টা কারো বাড়িতে যাবার উৎকৃষ্ট সময় নয়। তারপরেও যাচ্ছি কারণ অসময়ে মানুষের বাড়িতে উপস্থিত হবার অন্য রকম মজা আছে। আমি অল্প যে কটি বাড়িতে যাই, ইচ্ছা করে অদ্ভুদ অদ্ভুদ সময়ে উপস্থিত হই। জহিরদের বাড়িতে একবার রাত দেড়টায় উপস্থিত হলাম। জহিরের বাবা তখনও মন্ত্রী হননি। হব হব করছেন এমন অবস্থা। কলিংবেল শুনে হবু মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোবারক হোসেন ভীতমুখে নিজেই নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দু'জন কাজের লোক। তিনি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? হু আর ইউ?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমার ডাক নাম হিমু। ভাল নাম হিমালয়। স্যার ভাল আছেন?

তিনি উত্তেজনায় দুইঞ্চির মত লম্বা হয়ে বললেন, আই সি। ব্যাপারটা কি?'

'জহির আছে? আমি জহিরের বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ব্যারিষ্টার সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ছেলের যে এই জাতীয় বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে তাই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। অধিক শোকে প্রস্তরীভূত অবস্থা।

'তুমি জহিরের বন্ধু?

'জ্বি চাচা। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা ঢাকা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি?'

'আই সি।'

আমি মুখের বিনয়ী ভাব সারা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যারিষ্টার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, চাচী ভাল আছেন?

উনি সঙ্গে সঙ্গে একটু দুরে সরে গেলেন। জহিরের বাবা বললেন, 'এত রাতে কী

ব্যাপার?’

‘ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।’

‘রাত ক’টা বাজে জান?’

‘ জিও না’।

‘ওয়ান ফর্টি। রাত একটা চল্লিশে কেউ কারোর বাড়িতে অকারণে আসে আমার জানা ছিল না।’

‘অকারণে আসিনি স্যার—অনেকদিন দেখা হয় না। ও ভাল আছে তো?’

‘হ্যাঁ ভাল আছে। তোমার নাম কি যেন বললে? এভারেস্ট?’

‘জ্বি না, এভারেস্ট না। হিমালয়। বাবা শখ করে রেখেছিলেন। উনার ইচ্ছা ছিল আমি হিমালয়ের মত হই। হা হা হা।’

‘শোন হিমালয়, এখন বাসায় যাও। আমার ধারণা, তুমি নেশা টেশা করে এসেছ। নেশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে হৈ চৈ করে লাভ নেই বলে চুপ করে আছি। জহিরের সঙ্গে দেখা করতে হলে সকালে বা বিকেলে আসবে। আন আর্থলি টাইমে আসবে না। মনে থাকবে?’

‘জ্বি স্যার মনে থাকবে।’

আমি পা ছুয়ে সালাম করবার জন্যে নিচু হলাম। দু’জনই খানিটা সরে গেলেন। ঠিক তখন, “কার সঙ্গে কথা বলছ মা?” বলতে বলতে জহিরের ছোট বোন তিতলী এসে দাঁড়াল। আমি হাসিমুখে বললাম, তিতলী ভাল আছ? এখনও ঘুমাওনি? একটা চল্লিশ বাজে।

তিতলীও তার বাবা-মা'র মত কিংবা তাদের চেয়েও বেশীরকম চমকাল। কারণ সে আমাকে চেনে না, দেখেনি কোনদিন আমি জহিরের কাছ থেকে ওর নাম জানি। চেহারায় মিল দেখে আন্দাজে তিতলী বললাম।

একটা পুরো পরিবারকে হকচকিয়ে দেবার মধ্যে আনন্দ আছে। জহিরদের পরিবার নিয়ে এ জাতীয় আনন্দ আরো কয়েকবার পাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তা সম্ভব হয়নি। কারণ ঐ ঘটনার ছ’মাসের মধ্যে জহিরের বাবা মন্ত্রী হয়ে গেলেন।

কিছু কিছু লোক মন্ত্রী-কপাল নিয়ে জন্মায়। জিয়া, এরশাদ যেই থাকুক, এরা মন্ত্রী হবেই। জহিরের বাবা এরকম একজন ভাগ্যবান মানুষ।

মন্ত্রীদের বাড়ি রাত দেড়টা বা দু’টোর সময় যাওয়া সম্ভব না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে বাঁশডলা দেবে। দুপুরের দিকে যাওয়া যায়। এই সময় দর্শনার্থীর ভীড় থাকে না। তবে দুপুরে ঢুকলেও সরাসরি বাড়িতে যাওয়া যায় না। গেটে পুলিশের কাছে স্লিপ দিতে হয়। সেই স্লিপ একজন ভেতরে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার কাজটা করে নিতান্তই অনিচ্ছায়। যেন সে হাঁটা ভুলে গেছে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নতুন হাঁটা শিখছে।

জহিরের আচার আচরণ, ভাবভঙ্গি কোনটাই মন্ত্রীর ছেলের উপযোগী নয়। কোন কালেও ছিল না। বোহেমিয়ান ধরণের ছেলে। ঘর-পালানো রোগ আছে। কোন কারণ ছাড়াই দেখা যাবে হঠাৎ একদিন হাঁটা ধরেছে। কোনবারই নিজ থেকে ফিরে না। লোকজন পাঠিয়ে ধরিয়ে আনতে হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। তবে বছর কয়েকের মধ্যে পালায়নি। রোগ সম্ভবত সেরেছে। তাকে দেখলাম গেটের পুলিশ দু’জনের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মুখভর্তি পান। চিবুক গড়িয়ে পানের রস

পড়ছে। আমি কোন একটা মজার গল্পের মাঝামাঝি উপস্থিত হলাম। পুলিশ দু'জন অত্যন্ত সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। চাদর গায়ে মন্ত্রীদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করা সম্ভবত নিষেধ। দুজন পুলিশই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার চাদরের দিকে। জহির পানের পিক ফেলে উঠে এল। আমাকে হাত ধরে রাস্তার ও-পাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, কি কাজে এসেছিস চট করে বলে চলে যা দোস্ত। বাবা এসে যদি দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আডডা দিচ্ছি, সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আড্ডা দেই। এতেই বাবা সারাক্ষণ নাইনটি নাইন হয়ে থাকে। বাড়িতে তোর পজিশন পুলিশের চেয়েও খারাপ। মন্ত্রী হবার পর বাবার মেজাজ যা হয়েছে। আমাকে দেখতেই পারে না। শূল কিভাবে বানানো যায় এই কায়দা জানা থাকলে বাবা নিজেই কাঠমিস্ত্রি ডাকিয়ে একটা শূল বানিয়ে রাখত। সকাল বিকাল আমাকে শূলে চড়াত। লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে দোস্ত।

'বাসায় তোর অবস্থা তাহলে কাহিল?'

'কাহিল বলে কাহিল—'Gone' অবস্থা।'

'কাজকর্ম কিছু করছিস?'

'কাজকর্ম জানি যে করব? কাগজে কলমে এক প্লাস্টিক কোম্পানির এ্যাডভাইজার। মাসে দশ হাজার টাকা দিয়ে যায়। তাও আমার কাছে না—বাবার কাছে'।

'তুই প্লাস্টিক কোম্পানির এ্যাডভাইজার? কি এ্যাডভাইজ করিস?'

'আরে দূর দূল, কি এ্যাডভাইজ করব?আমি প্লাস্টিকের জানি কি? সকালবেলা ওদের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আমার একটা ঘর আছে, ঐখানে বসে তিন চার কাপ কফি খাই, চলে আসি। এখন বল দোস্ত কি জন্যে এসেছিস? টাকা ধার চাইতে এলে কিছু করতে পারব না। হাতে একটা ফুটো পয়সাও নাই। বিশ্বাস কর। বন্ধুবান্ধবরা আসে–চাকরি বাকরি নাই—বড় মায়া লাগে। চাকরির ব্যবস্থা তো দূরের কথা, ঘরে নিয়ে যে এককাপ চা খাওয়াব সেই উপায় নেই.আমার কোন বন্ধুবান্ধব ঘরে ঢুকতে পারবে না। বাবার হুকুম। কি জন্যে এসেছিস তাড়াতাড়ি বলে চলে যা দোস্ত। বাবা যে কোন সময় চলে আসবে। আজকাল তিনটার সময় আসে। দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার বিদায়। তিনটা বোধহয় বাজে। তুই কোন সুপারিশ নিয়ে আসিসনি তো?

'না।'

'বাঁচালি। বন্ধুবান্ধব কেউ এলেই বুকে ধাক্কা লাগে। মনে হয সুপারিশ নিয়ে এসেছে। তোর ব্যাপারটা কি?'

আমি গলার স্বর নিচু করে বললাম, এক জায়গায় যাবি আমার সাথে?

'কোথায়?"

'জায়গাটার নাম ড্রেজার কলোনী। নারায়নগঞ্জের কাছাকাছি।'

'সেখানে কি?'

'খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। ড্রেজার দিয়ে নদী খুঁড়ে সেই বালি জমা করে কলোনী বানানো হয়েছে। চারদিকে চিক চিক করছে বালি। চাঁদের আলো যখন সেই বালিতে পড়ে—অসাধারণ দৃশ্য আজ আবার পূর্ণিমা পড়ে গেল।'

'বলিস কি?'

জহিরের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ইন্টারেস্টিং একটা প্লান করে রেখেছি। রফিককে তো চিনিস। ও থাকে ড্রেজার

কলোনীতে। রফিক নদীর কাছাকাছি দুটা গর্ত খুঁড়ে রাখবে। গলা পর্যন্ত হাইটে গর্ত। আমরা দু'জন গর্তে ঢুকে বসে থাকব। ঠেসে বালি দেয়া হবে। শুধু দুজনের মাথা বের হয়ে থাকবে।

জহিরের চোখের ঝকঝকে ভাব আরো বাড়ল। কয়েকবার ঢোঁক গিলল। তার ঢোক গেলা মাছের টোপ গেলার মত। সে ফিসফিস করে বলল, এক্সাইটিং হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমি গলার স্বর আরো নিচু করে বললাম, অবশ্যই এক্সাইটিং। তাছাড়া জিনিসটাও খুবই সায়েন্টিফিক ।

'এর মধ্যে সায়েন্টিফিক আবার কি?'

'পুকুরে গোসল করার সময় আমরা কি করি? সারা শরীর পানিতে ডুবিয়ে মাথা বের করে রাখি। এখানেও তাই করব। সারা শরীর মাটিতে ডুবিয়ে মাথা বের করে রাখব।'

'তাতে লাভ কি?'

'মাটির সঙ্গে একাত্মতা।'

'এটা কি তোর অরিজিনাল আইডিয়া?'

'না, এই আইডিয়া ধার করা। জগদীশচন্দ্র বসু এই জিনিস করতেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়িতে যখন বেড়াতে যেতেন তখনি পদ্মার চরে গর্ত খুড়ে মাথা বের করে পড়ে থাকতেন। তাঁর ধারণা, এত শরীরে বায়োকারেন্ট তৈরি হয়। সেই বায়োকারেন্টের অনেক উপকারী দিক আছে।'

জহির আরো দু'বার ঢোঁক গিলে ফিসফিস করে বলল, ইন্টারেস্টিং হবে তো?

অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। কল্পনায় দৃশ্যটা দেখ। ধূ ধূ করছে বালি। মাথার উপরে পূর্ণ চন্দ্র। জোছনার বান ডেকেছে। কোথাও জনমানব নেই। চাঁদের আলোয় শুধু দুটা মাথা দেখা যাচ্ছে।

দুটা মাথা না, একটা মাথা। শুধু তোরটা দেখা যাচ্ছে। আমি গর্তে ঢুকব না। ঘটনাটা কোন কারণে লিক হয়ে পড়লে বাবা সত্যি সত্যি আমাকে গর্তে ঢুকিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিবে। মাথা বের করে রাখার কনসেশান দেবে না। রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না। তবে আমি অবজার্ভার হিসেবে থাকব। চল যাই।'

আমরা নারায়নগঞ্জের বাসে উঠে পড়লাম। জহির বলল, আজ সত্যি সত্যি জ্যোৎস্না তো।

'সত্যি জ্যোৎস্না। পঞ্জিকা দেখে বের হয়েছি।'

ব্যাপারটা যেন কল্পনা করে রেখেছিলাম তেমন হল না। দেখা গেল ড্রেজার কলোনি জায়গাটা জনবহুল। বাড়িঘর গিজগিজ করছে। এর মধ্যেই একটা ফাঁকা জায়গায় রফিক দুটা গর্ত খুঁড়ে বিরস মুখে বসে আছে। সে একা না, তার সঙ্গে আরো লোকজন আছে। লোকজন তাকে বিরক্ত করে মারছে। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে—

'এইখানে বিষয় কি ভাইজান? লাশ পুঁতা হবে?

'লাশ কি দুইটা?'

রফিক সব প্রশ্নের জবাবে হাই তুলছে। আমাদের দেখে নিশ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রের মত গলায় বলল, মা'র শরীর খারাপ, আমি চলে যাব।

কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই।

জহির শুরু থেকে না না করছিল—গর্ত দেখে তার উৎসাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে আমার কানে কানে বলল, নিয়মটা কি? নেংটো হয়ে ঢুকব, না আন্ডারওয়্যার থাকবে?

'নেংটো হয়ে ঢোকাই নিয়ম। তুই ইচ্ছা করলে আন্ডারওয়্যার রাখতে পারিস।'

'কোন প্রয়োজন দেখছি না। করব যখন নিয়ম মাফিকই করব। নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার কোন মানে হয় না। হু কেয়ারস?'

আমরা তৎক্ষণাৎ গর্তে ঢুকলাম না। রাত এগারোটার দিকে লোকজন কমে যাবার পর ঢুকলাম। রফিক বিরস মুখে কোদার দিয়ে বালি ফেলতে ফেলতে বলল, তোদের মাটিচাপা দিয়ে বাসায় চলে যাব। মা'র শরীর খুবই খারাপ। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে লোকজন জমে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

জহির বলল, তুই চলে যা। আমরা ম্যানেজ করে নেব। শুধু ভোরবেলা এসে আমাদের মাটি খুঁড়ে বের করিস।

রফিক বলল তোদের শার্ট-প্যান্ট কি করব? বাসায় নিয়ে যাব না পাশে রেখে দেব?

জহির বলল , শার্ট-প্যান্ট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দে। আমার এই সবের দরকার নেই। আমি প্রকৃতির সন্তান। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকা যে এমন এক্সাইটিং আগে জানতাম না। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রাত বারোটার মধ্যে আমাদের চারপাশে হাজার খানিক লোক জমে গেল। শুধু মানুষ না, পশুরাও ব্যাপারটায় খুব উৎসাহ পাচ্ছে। দুটা কুকুর আমাদের ঘিরে ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করছে। লোকজনের প্রশ্নেরও কোন সীমা নেই।

'ভাই সাহেব, আপনারা কে?'

'এইখানে কি করতেছেন?'

'জিন্দা কবর নিয়েছেন?'

'আপনারা থাকেন কোথায়?'

আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না তবে জহির প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক জবাব। রাত একটার দিকে মনে হল পুরো নারায়নগঞ্জের মানুষ জড়ো হয়েছে। বিকট হৈ চৈ। জহির বলছে—আপনারা হৈ চৈ করছেন কেন? নিরবতা কাম্য। দয়া করে নিরব থাকুন। প্রকৃতি নিরবতা পছন্দ করে।

দেড়টার দিকে পুলিশ চলে এল। ওসি সাহেব দু'জন কনস্টেবল নিয়ে নিজেই এসেছেন। ওসিরা সহজভাবে কোন কথা বলতে পারেন না। ইনিও পারলেন না। হুংকার দিলেন – কি হচ্ছে এসব? আপনারা কে?

জহির শীতল গলায় বলল, অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন? মানুষ এই ফিলসফিক প্রশ্নের মীমাংসা গত দুহাজার বছর ধরে করার চেষ্টা করছে। মীমাংসা হয়নি।

আপনারা আন্ডার এ্যারেস্ট। উঠে আসুন।

জহির হিমশীলতল গলায় বলল, আন্ডার অ্যারেস্ট মানে? মশকরা করছেন? আমরা দেশের কোন আইনটি ভঙ্গ করেছি দয়া করে বলুন। বাংলাদেশ পেনাল কোডের কোন ধারায় আছে যে গর্ত খুঁড়ে মাটিতে বসে থাকা যাবে না? আমরা যদি পানিতে শরীর ডুবিয়ে থাকতে পারি, তাহলে মাটিতেও পারি।

ওসি সাহেব যুক্তি-তর্কে গেলেন না। কনস্টেবল দু'জনকে হুকুম দিলেন আমাদের টেনে তুলতে। জহির হুংকার দিয়ে বলল, আমি কে পরিচয় দিলে আপনি কিন্তু ভাই

প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবেন প্যান্ট পাঠাতে হবে ধোপার কাছে। ডবল চার্জ নেবে।

ওসি সাহেব সেপাইকে বললেন, এই পাগলার গালে একটা চড় দাও। সেপাই সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে লাথি বসিয়ে দিল।

জহির হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, বুঝলেন ভাই সাহেব, আপনাকে এমন জায়গায় ট্রান্সফার করা হবে যে এক পয়সা ঘুষ পাবেন না। হালুয়া টাইট হয়ে যাবে। একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। টেলিফোন করে জেনে নিন আমি কে? পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে আদরে আদরে প্রাণ অতিষ্ঠ করে ফেলবেন।

ওসি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, পুলিশের আদর কত প্রকার ও কি কি— কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।

আমরা থানার দিকে রওনা হলাম। উৎসাহী জনতার বড় একটা অংশ আসছে আমাদের পিছু পিছু। জহির আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, যতটা এক্সাইটিং হবে ভেবেছিলাম তারচে দশগুন এক্সাইটিং হয়েছে। এই জাতীয় প্রোগ্রাম আরো ঘন ঘন করতে হবে। নেক্সট পূর্ণিমা কবে? পূর্ণিমাগুলি একমাস পর পর আসে, না পনের দিন পর পর? সিস্টেমটা কি?

তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মোবারক হোসেন সত্যি সত্যি জহিরের বাবা এই পরিচয় পাওয়ার পর ওসি সাহেবের মুখের হা তেলাপিয়া মাছের মত বড় হতে লাগল এবং ছোট হতে লাগল। তখন অধিক শোকে ওসি সাহেব পাথরের মত হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ জহিরের দিকে তাকান, খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকান। জহির বলল, আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন ওসি সাহেব, আমার বাবা বাইরের মানুষের কাছে অত্যন্ত মাই ডিয়ার ধরণের লোক। আপনাকে উনি কিছুই বলবেন না। তাছাড়া আপনাকে কিছু বলার প্রশ্নও আসে না। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন।

এর উত্তরে ওসি সাহেব চাপা গলায় বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, যার কিছুই বোঝা গেল না।

জহির বলল, ওসি সাহেব, চা খাওয়াতে পারেন?

এতেও ওসি সাহেবের হতভম্ভ ভাব গেল না। সেকেন্ড অফিসার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এক্ষুণি চা-কেক নিয়ে আসছি স্যার। এক্ষুণি আনছি। জিলিপী খাবেন? এখানে গরম গরম জিলিপী পাওয়া যায়।

জহির বলল, জিলিপী খাওয়া যায়। আপনারা কেউ যদি কাইন্ডলি রফিকের বাসা থেকে আমাদের কাপড়গুলি এনে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। বাবা এসে যদি দেখেন আমরা আন্ডারওয়্যার পরে থানায় বসে আছি, উনি কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন। মন্ত্রী মানুষ তো, সামান্যতেই বিরক্ত হন।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি। স্যার, আপনারা গা ধুয়ে নেন। শরীর ভর্তি বালি। বাথরুমে সাবান আছে।

গা ধোয়ার আগেই তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোবারক হোসেন উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তার পি. এ., দুজন পুলিশ গার্ড। মোবারক হোসেন সাহেব হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

আমি বললাম, স্যার ভাল আছেন?

তিনি জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনিও ওসি সাহেবের মত অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়েছেন।

সমস্ত থানা জুড়ে এক ধরণের আতংক। পুলিশরা সব এ্যাটেনশন হয়ে আছে।

ব্যারিস্টার সাহেব ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা কি করেছিল বললেন, গর্ত খুঁড়ে বসেছিল?

‘জ্বি স্যার। শুধু মাথা বের হয়ে ছিল। আমি খবর পেয়ে দু’জন কনস্টেবল নিয়ে উপস্থিত হলাম।’

‘আই সি।’

‘আমি স্যার পাগল ভেবেছিলাম–মানে স্যার, ঠিক বুঝতে পারি নি।’

‘বুঝতে পারার কথাও না। আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ। ঘটনাটা থানায় জিডি এন্ট্রি করে রাখুন। মন্ত্রীর ছেলে বলে পার পেয়ে যাবে, তা হবে না। আর এই ছেলে, যার নাম সম্ভবত হিমালয়, একে ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সে-ই বুদ্ধি দিয়ে এইসব করিয়েছে বলে আমার ধারণা। ড্রাগ এডিক্ট হবার সম্ভাবনা। খুব ভালমত খোঁজ-খবর করবেন।’

‘অবশ্যই করব স্যার।’

‘আমি জহিরকে নিয়ে যাচ্ছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে টেলিফোন করবেন।’

‘তার কোন প্রয়োজন হবে না স্যার।’

‘প্রয়োজন হবে না বলবেন না। মন্ত্রীর ছেলে বলে সে কোন আলাদা ফেভার পাক তা আমি চাই না। মন্ত্রী জনগণের সেবক। এর বেশি কিছু না।’

সেকেন্ড অফিসার আমাদের কাপড় এবং চা-নাশতা নিয়ে এসেছেন। মন্ত্রী দেখে তার ভিরমি খাবার উপক্রম হল।

জহির বিরস মুখে শার্ট গায়ে দিল, প্যান্ট পরল।

মোবারক সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বললেন, চল বাবা, যাওয়া যাক। ভঙ্গিটা এমন যেন ছ’সাত বছরের একটা ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলছেন। যে ছেলে না বুঝে দুষ্ট বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সামান্য অপরাধ করে ফেলেছে, যে অপরাধের শাস্তি বকাঝকা না—আদর। যাবার আগে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি এই জিনিসই চাচ্ছি। আমাকে যেন চিনে রাখেন। দ্বিতীয়বার দেখা হলে আমাকে যেন বলতে না হয়—আমি হিমু, হিমালয়।

তাঁরা চলে যাবারও আধঘণ্টা পর থানার অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হর। এই আধঘণ্টায় আমি দু’কাপ চা এবং তিন পিস কেক এবং ছ’টা জিলিপী খেলাম। অর্ধেকটা সিগারেট খেলাম। পুরোটা খাওয়া গেল না। কারণ সেকেন্ড অফিসার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, সিগারেট ফেলুন। নো স্মোকিং।

একটা পিরিচে আট দশটা খিলি পান। দুটা নিয়ে একসঙ্গে মুখে দিলাম। আমার এইসব কর্মকান্ড সবাই দেখছে। বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখছে। তাদের ভাল লাগছে কিনা বুঝতে পারছি না। মনে হয় লাগছে না। চেয়ারে পা উঠিয়ে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসেছিলাম—সেকেন্ড অফিসার কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, পা নামিয়ে বসুন। আমি পা নামিয়ে বসলাম। হাত বাড়িয়ে পিরিচ থেকে আরো দুটা পান নিয়ে মুখে দিয়ে সহজ স্বরে বললাম, পানের পিক কোথায় ফেলব স্যার?

ওসি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। টেবিল থেকে আমার দিকে খানিকটা বুকে এসে বললেন, এবার বলুন আপনি কে?

‘আমার নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু।’

‘কি করেন?’

'কিছু করি না।' কিছু যে করেন না তা বুঝতে পারছি। এটা বোঝার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। থাকেন কোথায়?'

'একটা মেসে থাকি।'

'ঢাকায় আপনার আত্নীয়স্বজন আছেন?'

'আছেন।'

ওসি সাহেব ড্রয়ার থেকে কাগজ এবং পেনসিল বের করলেন। থানায় এই এক মজার জিনিস দেখলাম। সব কাজকর্ম পেনসিলে। সম্ভবত ইরেজার ঘসে লেখা মুছে ফেলার চমৎকার সুযোগ আছে বলেই পেনসিল। ওসি সাহেব শুকনো মুখে বললেন, —এক এক করে আত্নীয়স্বজনদের নাম বলুন, ঠিকানা বলুন। টেলিফোন থাকলে টেলিফোন নাম্বার। সব লিখে নেব।

আমি বললাম, যেসব প্রশ্নের উত্তর লেখার দরকার নেই সেগুলি আগে করুন।

'সেগুলি আগে করব কেন?'

'কারণ আপনার পেনসিলটা ভোঁতা। শার্পনার দিয়ে শার্প করতে হবে। এখন কোন শার্পনার খুঁজে পাবেন না'।

ওসি সাহেব পেনসিলের দিকে তাকালেন। পেনসিলটা সত্যি ভোঁতা। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শাপনার খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পাওয়া গেল না। ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করা হল। ফাইলপত্র উল্টানো হল—শার্পনার নেই। ওসি সাহেব একা না, অন্যরাও শার্পনার খোঁজায় যোগ দিল। ওসি সাহেব গর্জনের মত শব্দ করে বলতে লাগলেন, একটা পুরানো ব্লেড ছিল, সেটা গেল কই? এত বিশৃঙ্খলা। এত বিশৃংখলা! আমি বললাম, একটা বল পয়েন্ট দিয়ে লিখলে কি চলে?

তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন এমন অদ্ভুদ কথা তিনি তাঁর ওসি জীবনে শুনেন নি। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত এরকমই হয়। আমি জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা শাপনার না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সব কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। একজন কাউকে দোকানে পাঠিয়ে একটা শার্পনার আনিয়ে নিলেই হয়, তা আনা হবে না। খোঁজা চলতেই থাকবে এবং সবার রাগ বাড়তে থাকবে। ধমকাধমকি হতে থাকবে।

হোটেল থেকে একটা ছেলে টিফিন ক্যারিয়ারে কি যেন নিয়ে এসেছে। রাত প্রায় শেষ হতে চলল। এ সময়ে খাবার কার জন্যে? ওসি সাহেব নিতান্ত অকারণে তার উপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন এই হারামজাদা, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন—এইটা কি রং দেখার জায়গা?

কেউ আমার দিকে লক্ষ্য করছে না, কাজেই আবার পা উঠিয়ে বসা যাক। ওসি সাহেব আমার দিকে তাকালেন, বলুন আপনি কি করেন?

'আগে একবার বলেছি কিছু করি না। ঘুরে বেড়াই।'

'কোথায় ঘুরে বেড়ান?'

'পথে ঘাটে ঘুরি'।

'ভবঘুরে?'

'তা বলতে পারেন।'

'দেশে ভবঘুরে আইন বলে যে একটা আইন আছে তা কি জানেন? এই আইনে ভবঘুরেদের ধরে ধরে জেলে ঢুকিয়ে ফেলা যায়।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ভাগ্যিস এই যুগে কোন ধর্ম প্রচারক নেই। ধর্ম প্রচারক থাকলে সমস্যা হয়ে যেত। জানেন বোধহয় ধর্মপ্রচারকরা সবাই বলতে

গেলে ভবঘুরে। গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক, যিশুখ্রিষ্ট...’
‘আপনি কি ধর্মপ্রচারক?’
‘জ্বি না। তবে এই লাইনে চিন্তাভাবনা করছি। টাকা-পয়সা যোগাড় করতে পারলে একটা আশ্রম চালু করার ইচ্ছা আছে। মহাপুরষ হবার একটা ক্ষুদ্র চেষ্টা বলতে পারেন।’
‘মহাপুরষ হবার চেষ্টা করছেন?’
‘জ্বি’।
‘কেন জানতে পারি?
‘সত্যি সত্যি জানতে চান?’
‘হ্যাঁ চাই।’
আমি শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, আমার নিজের দিক থেকে মহাপুরুষ হবার তেমন আগ্রহ নেই, তবে আমার বাবার খুব শখ ছিল ছেলেকে মহাপুরষ বানাবেন। সাধারণ বাবারা ছেলেমেয়েকে ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, ব্যারিস্টার এইসব বানাতে চায়। কেউ মহাপুরুষ বানাতে চায় না। আমার বাবা চেয়েছিলেন।
‘আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন?’
‘জ্বি না। ফাজলামি করছি না।’
‘শিয়ালের শিং দেখেছেন?’
‘না।’
‘শিয়ালের শিং আমি দেখিয়ে ছাড়ব। মহাপুরষ কত প্রকার ও কি কি বুঝে যাবেন। গর্তে ঢুকে মহাপুরুষ? শুকর গর্তে ঢোকে, মহাপুরুষ না। এই মবিন, মবিন’।
মবিন নামের একজন কেউ ছুটে এল। ওসি সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, ‘একটা নাপিত ধরে নিয়ে আস। মহাপুরষের চুল, দাঁড়ি, ভুরু সব যেন কামিয়ে দেয়। মহাপুরুষগিরি বার করছি। অনেক মহাপুরুষ দেখা আছে—পেনসিল কাটার পাওয়া গেল?’
‘জ্বি না স্যার।’
‘না শব্দ আমি শুনতে চাচ্ছি না। খুঁজে বের কর।’
ওসি সাহেবের নাম মোহাম্মদ সিরাজুল করিম। তিনি দেখলাম আসলেই করিৎকর্মা লোক। শুধু যে করিৎকর্ম তাই না, বেশ সাহসীও। নাপিত ডাকিয়ে সত্যি সত্যি দাড়ি গোঁফ ভুরু সবই কামিয়ে দিলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, মহাপুরুষের হাতে একটা আয়না দাও। মহাপুরুষ তার চেহারাটা দেখুক ।
আমি হাই তুলে বললাম, চেহারা দেখতে চাচ্ছি না। মহাপুরুষদের আয়নায় নিজেকে দেখা নিষেধ আছে।এতে নিজের চেহারার প্রতি এক ধরণের মুগ্ধতা চলে আসে। এটা ঠিক না।
‘ঠিক না হলেও দেখে রাখুন। চেহারা যে অবস্থায় এখন আছে এই অবস্থা থাকবে না। মন্ত্রী সাহেব কি বলেছেন তা তো শুনেছেন? ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলেছেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শুধু মুখের কথায় হয় না। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ কঠিন জিনিস। শরীরের চামড়াটাই শুধু থাকবে – হাড্ডি যা আছে পানি হয়ে পিশাবের সঙ্গে বের হয়ে যাবে।’
‘মহাপুরুষদের প্রতি আপনার অকারণ রাগের কারণটা জানতে পারি? অবশ্যি বর্তমানে আপনার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী। প্রিয়জন ভয়াবহ রকমের

অসুস্থ থাকলে মনমেজাজ ঠিক থাকে না। সারা পৃথিবীর উপরই রাগ থাকে'।

ওসি সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি আসলে আন্দাজে একটা ঢিল ছুড়েছি। মাঝে মাঝে আমার আন্দাজ খুব লেগে যায়। এটা মনে হচ্ছে লেগে গেছে। মন্ত্রী দেখার পর ওসি সাহেবের যে অবস্থা হয়েছিল এখনও সেই অবস্থা। মনে হচ্ছে হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। তেলাপিয়া মাছের মত মুখের হা বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। ওসি সাহেবের গলার আওয়াজ খানিকটা নিচে নামল। তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমার স্ত্রী যে অসুস্থ এটা কি করে বললেন?

আমি হাসলাম। জবাব দিলাম না। একজন প্রথম শ্রেণীর ভবিষ্যৎবক্তা কথা বলবেন খুব কম। প্রশ্ন করলে অন্য দিকে তাকিয়ে হাসবেন।

'তার কি অসুখ সেটা কি বলতে পারবেন?'

'না আমি তো ডাক্তার না।'

'তাঁর এই রোগের কোন অষুধ আছে?'

'অবশ্যই আছে—সৃষ্টিকর্তা এমন কোন অসুখ তৈরি করেন নি যার প্রতিষেধক তাঁর কাছে নেই। আমাকে দয়া করে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি রোগের অষুধ সম্পর্কে কিছু জানি না।'

ওসি সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, মহাপুরুষগিরি ফলানোর জায়গা পান না? স্ত্রী অসুস্থ? ভাওতাবাজি পুলিশের কাছে? বয়স তো খুব বেশি মনে হয় না। লোক-ঠকানো কায়দাকানুন সব জানা হয়ে গেছে —মবিন, মবিন।

মবিন চলে এল। মবিনের মুখ হাসি হাসি। কারণ তার হাতে পেনসিল কাটার। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সে খুশি খুশি গলায় বলল,

'পেনসিল কাটার পাওয়া গেছে'।

'পেনসিল কাটারের এখন আর দরকার নেই। বাবাজীকে হাজতে নিয়ে যাও। ভালমত আদর-যত্ন কর যাতে যতদিন বাঁচে পুলিশের খাতিরের ব্যাপারটা মনে থাকে। চুল দাড়ি কাটানো ঠিক হয়নি। চুল দাড়ি থাকলে আদর যত্নের সুবিধা হত'।

মবিন আনন্দিত স্বরে বলল, চুল দাড়ির কোন দরকার নেই স্যার। দেখেন না কি করি।

মবিন সাহেব কিছু করার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী মোবারক হোসেন সাহেব আমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে টেলিফোন করলেন। জহিরের চাপাচাপিতেই এটা করলেন, বলাই বাহুল্য। আমি যে খুব আনন্দিত হলাম তা না। পুলিশী মার খাবার চেষ্টা আমি অনেকদিন ধরেই করছি। ব্যাপারটা সম্পর্কে শুধু শুনেছি। অভিজ্ঞতাটা হয়ে যাওয়া ভাল। হেলাল গুন্ডা বলে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাল পরিচয় আছে। তার কাছ থেকে শুনেছি মারের সময় ব্যথা পাচ্ছি ভাবলেই ব্যথা পাওয়া যায়। ব্যথা পাচ্ছি না ভাবলে আর ব্যথা পাওয়া যায় না।

আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম রাত তিনটায়। এত রাতে ঢাকায় ফিরলাম না। চলে গেলাম নারায়নগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনালে। রাত কাটাবার জন্যে লঞ্চ টার্মিনাল ভাল জায়গা। অনেক খালি লঞ্চ বাঁধা থাকে। চুপিচুপি চলে যেতে হয় ছাদে। চাদর মুড়ি দিয়ে টানা ঘুম দিলেই হয়। লঞ্চের লোকজন এলে ভাববে তাদের কেউ।

আমার সঙ্গে চাদর আছে। শরীর ঢেকে ঘুমিয়ে পড়া কোন সমস্যা না।

তাই করলাম। ঘুম ভাঙল ভোর রাতে। লঞ্চ চলছে। কখন যাত্রী উঠল, কখন

লঞ্চ ছাড়ল কে জানে? হু হু বাতাসে রীতিমত শীত ধরে গেছে। আকাশে থালার মত বড় চাঁদ। নদীর দু'পাশে গাছপালা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা সবাই জেগে আছে। উথাল পাথাল জোছনায় গাছপালা ঘুমুতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ। আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে চাঁদের আলো থেকে নিজেকে আলাদা করে ঘুমুতে গেলাম।

ঘুম আসছে না। বারবারই মনে হচ্ছে একটা ছোট ভুল করা হয়েছে। ঢাকা ছাড়ার আগে রুপার সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার ছিল। ঢাকার বাইরে যতবারই যাই, এই কাজটা করি। এইবারই শুধু করা হল না।

মানুষের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকলে চমৎকার হত। লঞ্চের ছাদ থেকে রুপার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা যেত।

'হ্যালো, হ্যালো রুপা?'

'তুমি!তুমি কোথায় এখন?'

'লঞ্চের ছাদে।'

'লঞ্চের ছাদে মানে? লঞ্চে করে যাচ্ছ কোথায়?'

'জানি না।'

'কি পাগলের মত কথা বলছ? তুমি লঞ্চে করে যাচ্ছ আর তুমি জান না কোথায় যাচ্ছ?'

“আমরা কে কোথায় যাচ্ছি কেউই তা জানি না।'

'আবার ফিলসফি শুরু করলে? শোন দার্শনিক, এগুলি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ফিলসফি। পাঁচ হাজার বছর ধরে কপচানো। সত্যি করে বল তো কোথায় যাচ্ছ?'

'জানি না।'

'জান না?'

'না। জগতের পরম সত্য কি জান রুপা? জগতের পরম সত্য হচ্ছে—জানি না, I don't know. এই ফিলসফিটা কেমন লাগল?'

ঘুম এসে যাচ্ছে। কাল্পনিক কথাবার্তা আজকের মত থাক। লঞ্চটা বডড দুলছে। রেলিং দেয়া নেই। গড়িয়ে পড়ে না গেলেই হয়।

সাতদিন পর ঢাকায় ফিরলাম। মানুষের মাথার চুল সাতদিনে ১.৫ মিলিমিটার বাড়ে। দাড়ি, গোঁফ এবং ভুরুর চুলও একই হারে বাড়ার কথা। ব্যাপার মনে হচ্ছে তা না। সাতদিনে আমার দাড়িগোঁফ কিছু গজিয়েছে। মাথার চুল তেমন গজায়নি। ভুরুর চুলের বৃদ্ধি সর্বনিম্ন পর্যায়ে। আগে যা ছিল এখনো তাই। আমার চেহারায় এক ধরণের ভৌতিক ভাব চলে এসেছে। ভৌতিক ভাবের জন্যে গায়ের চাদরও বোধহয় খানিকটা দায়ী।

চেহারায় ভৌতিক ভাব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি গত রাতে। স্টিমারে করে ফিরছি। ফাস্টক্লাসের ডেক কেমন দেখার জন্যে উঁকি দিলাম। ডেক ফাঁকা। অল্পবয়েসী এক মা তার বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। বাচ্চাটা হাত-পা ছুড়ছে এবং বিকট চিৎকার করছে। বাচ্চার বাবা বিব্রত মুখে এক গ্লাস পানি হাতে পাশে দাঁড়ানো। আমাকে দেখে বাচ্চা চোখ তুলে তাকাল। আর ঠিক তখন বাচ্চার মা নিচু গলায় বলল, 'চুপ কর সোনা। চুপ না করলে ঐ ভূত তোকে খেয়ে ফেলবে।'

বাচ্চা চুপ করে গেল। আতংকগ্রস্ত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, এবং গম্ভীর গলায় বললাম, আমি স্টিমারের দোতলায় আছি—বাচ্চা কান্নাকাটি করলে খবর দেবেন, এসে ভয় দেখিয়ে যাব। বাচ্চার মা লজ্জিত মুখে বলল, সরি সরি। কিছু মনে করবেন না।

'না কিছু মনে করি নি। আপনার বাচ্চা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে কি-না দেখুন। প্রয়োজন মনে করলে আরো খানিকটা ভয় দেখিয়ে যাই।'

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মেয়েটা দেখতে খানিকটা রুপার মত। ইচ্ছা করছিল আরো খানিকক্ষণ থাকি—সম্ভব হল না। বাচ্চাটা বেশি ভয় পেয়েছে। ভয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে।

আমাকে যে ভয়াবহ দেখাচ্ছে তার আরো প্রমাণ পেলাম। সেকেন্ড ক্লাসে অন্য একটি বাচ্চা, তিন চার বছর বয়স হবে, আমাকে দেখেই কাঁদতে শুরু করল। এই বাচ্চাটি ছিল বাবার কোলে। সেই ভদ্রলোক বিব্রত গলায় বলতে লাগল—আহা, উনি কিছু করবেন না তো। কিছু করবেন না।

বড় ফুপুর বাড়িতে এমন চেহারা নিয়ে উঠা ঠিক হবে না জেনেও উঠলাম। এই বাড়ির বাথরুম খুব সুন্দর । হালাকা নীল রঙের শ্রীলংকা টালি বসানো বাথরুম। বড় একটা বাথটাব আছে। বাথটাব পানি ভর্তি করে শুধু নাকটা ভাসিয়ে শুয়ে থাকা দারুন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তবে ও বাড়িতে উপস্থিত হবার বেশ কিছু সমস্যা আছে। বড়ফুপা ঘোষনা করে দিয়েছেন, আমাকে যেন তাঁর বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেয়া না হয়। আমি একটি পাবলিক ন্যুইসেন্স। আমার আসল স্থান –মানসিক রুগীদের জন্যে নির্ধারিত কোন হোম। হোমে জায়গা পাওয়া না গেলে সেকেন্ড চয়েস মীরপুর চিড়িয়াখানা। আমার ফুপু তাঁর স্বামীর কোন বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন না, শুধু এই বক্তব্যে একমত। ফুপার বাড়িতে তারপরও মাসে দু'মাসে একবার যাই। ফুপার দুই ছেলেমেয়ে বাদল এবং রিনকি—এই দু'জনের কারণে। দু'জনই আমার মহাভক্ত। বাদলের ধারণা, আমি রাসপুটিন এবং গৌতম বুদ্ধের ফিফটি-ফিফটি মিকচার। শুধু মহাপুরুষ না, পরমপুরুষ। লোকজন এখনো আমাকে চিনতে পারছে না। যেদিন চিনবে, হৈ চৈ পড়ে যাবে। আমার সম্পর্কে রিনকির ধারণা অবশ্যি এত উচ্চ না। মেয়েরা সহজে কাউকে মহাপুরুষ ভাবে না। পুরুষের দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে তারা সবচে' ভাল জানে বলেই তারা অনায়াসে মহাপুরুষকেও সাধারণ পুরুষের দলে ফেলে দেয়।

বাদল বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠল। আনন্দিত স্বরে বলল, আরে হিমুদা! কি যে সুন্দর তোমাকে লাগছে! অদ্ভুদ!

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আছিস কেমন?

বাদল সামাজিক সৌজন্যের ধার দিয়েও গেল না। মুগ্ধ স্বরে বলল, ভুরুও কামিয়ে ফেলেছ? ইস কি অদ্ভুত ভুরু কামানো মানুষ এই প্রথম দেখলাম। সাদা

চাদরে কি অপূর্বই না তোমাকে লাগছে হিমুদা।

'বাসায় লোকজন আছে?'

'সবাই আছে। দাঁড়াও ডাকছি। তুমি এক কাজ কর—সন্ন্যাসীদের মত সোফায় পদ্মাসন হয়ে বস। আমি সবাইকে ডাকি। বাবাও বাড়িতে আছেন, অফিসে যান নি। তাঁর পেটে ব্যথা।'

'তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল বাদল। পিস্তল বের করে আমাকে গুলি-টুলি করে দেয় কি-না কে জানে।'

'গুলি করবে কেন শুধু শুধু। আর যদি করেও তোমার কিছু হবে না। রাসপুটিনকে তিনবার গুলি করা হয়েছিল, পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ানো হয়েছিল, নদীর পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল... তারপরেও...

বাদলের কথা শেষ হবার আগেই ফুপু ঢুকলেন। আমাকে দেখে শুরুতে হকচকিয়ে গেলেও চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। পাথর হয়ে গেলেন। কর্কশ গলায় বললেন, তুই!

বাদল বলল, হিমুদাকে গ্রান্ড দেখাচ্ছে দেখলে মা? উফ অপূর্ব!

ফুপুর গম্ভীল গলায় বললেন, এই নতুন ভং কবে ধরলি?

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ফুপু বললেন, তোকে না এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কি মনে করে এলি?

'গোসল করতে এসেছি ফুপু। গোসল করেই বিদেয় হব। বাথটাবে সারা শরীর ডুবিয়ে...'

'পাগলের মত কথা বলিস না। তোকে আমাদের বাথরুমে ঢুকতে দেব?'

বাদল বলল, আফকোর্স দেবে মা। আমি বাথটাবে পানি দিচ্ছি। ডিপ ফ্রীজে বরফ আছে মা? বাথটাবে বরফের টুকরা ছেড়ে দেব। গ্রাণ্ড হবে।

ফুপুর ক্রুদ্ধ গলায় বললেন তুই আমার সামনে থেকে যা বাদল, হিমুর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

'তুমি কথা বলতে থাক। আমি বাথটাব রেডি করি। বাথটাবটা আরেকটু বড় হলে আমিও তোমার সঙ্গে গোসল করে ফেলতাম।'

বাদল অত্যন্ত ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে গেল। ফুপু বললেনে, তোকে যে পুলিশ খুঁজছে এটা তুই জানিস?

'না। আমি ঢাকায় ছিলাম না।'

'পুলিশ আমাদের এখানেও রোজ একবার করে তোর খোঁজে টেলিফোন করে। তুই না-কি কোন মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছিস?'

'জ্বালানী মন্ত্রীর ছেলে?'

'কোন মন্ত্রী জানি না, তোর ফুপা জানে। সত্যি কিনা বল?'

'না।'

'না হলে খামাখা তোকে পুলিশ খুঁজবে কেন?'

'পুলিশ তো খামাখাই খোঁজাখুঁজি করে ফুপু।'

'তুই তোর ফুপার ঘরে যা। তার সঙ্গে কথা বল। কথা বলে বিদেয় হয়ে যা। এক মুহূর্তও এখানে থাকবি না।'

'গোসল করে ভদ্র হয়ে গেলে কেমন হয়?'

'এই বাড়িতে তোর গোসল হবে না। এক কথা কতবার বলব? যা, তোর ফুপার

ঘরে যা।'

৪

ফুপা বিছানায় কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। টেবিলে বিরাট এক গ্লাস ভর্তি ঘোলাটে রঙের বস্তু। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ওরস্যালাইন চালাচ্ছেন না-কি ফুপা?

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, ওরস্যালাইনা না। ডাবের পানি।

'পেটব্যথা কমেছে কিছু?'

'আমার শরীর সম্পর্কে তোমার কৌতুহল দেখানোর কোন কারণ দেখছি না।'

'ফুপু বলছিল আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তোমার সঙ্গে তো নয়ই। '

'তাহলে ফুপা যাই?'

'না বোস। তোমার ফুপু কি বলেছে যে পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?'

'জ্বি, বলেছেন'।

'মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে না-কি ভেগেছ? করেছ কি? খুন করেছ?'

'না।'

'এখন না করলেও করবে। You will end up in murder. তুমি এক্ষুণি মন্ত্রীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কর। এবং পুলিশকে বল আর যেন তারা টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত না করে।'

'আচ্ছা বলব। আমি কি এখন উঠতে পারি ফুপা?'

'হ্যাঁ উঠতে পার। আমি তোমাকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলাম ,তারপরেও এসেছ?'

'গোসল করার জন্যে এসেছি। গোসল করেই চলে যাব।'

'গোসলের জন্যে বাথরুম খোঁজা তোমার শোভা পায় না হিমু। তুমি গোসল করবে ডোবায়, নর্মায়। মানুষ স্নান করে পরিষ্কার হবার জন্যে, তুমি কর অপরিষ্কার হবার জন্যে। ভুল বললাম?'

আমি জবাব দিলাম না। ফুপাকে শান্ত করার একটা উপায় হচ্ছে তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব না দেয়া। কথা বলতে বলতে তিনি এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যান।

'হিমু!'

'জ্বি'।

'তুমি নিজে একটা বদ্ধ উন্মাদ। তোমার দেখাদেখি আমার ছেলেটাও উন্মাদ হচ্ছে। মানুষ ভালটা কখনো শেখে না, মন্দটা শেখে। এই যে তুমি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কান্ড করেছ— বাদল এই দেখে উৎসাহী হবে। আমি তোমার সঙ্গে একশ টাকা বাজি রাখতে পারি। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে। রাখতে চাও বাজি?'

'জ্বি না।'

'রাখতে চাও না কেন? টাকা নেই?'

'টাকার সমস্যা তো আছেই, তা ছাড়া এ বাজিতে আপনার জিতে যাবার সম্ভাবনা। আমারো ধারণা, বাদল মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, ভুরু কামিয়ে ফেলবে।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, ভুরু কামাবে কেন?

'আমি ভুরু কামিয়েছি তো, তাই।'

'তুমি ভুরু কামিয়েছ!'

'জি'।

'I see. হিমু'।

'জ্বি'।

'আমি তোমাকে একটা প্রপোজাল দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন। দিনে দশ টাকা হিসেবে প্রতি মাসে আমি তোমাকে তিনশ করে টাকা দেব। তার বদলে তুমি এ বাড়িতে আসবে না। রাজি আছ?'

'ভেবে দেখি।'

'আচ্ছা যাও ফাইভ হানড্রেড। প্রতি মাসের এক তারিখে আমি নিজে গিয়ে টাকাটা তোমার হাতে দিয়ে আসব। বাট ইউ গট টু প্রমিজ যে এই বাড়ির দু'হাজার গজের ভেতর তোমাকে দেখা যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি তাহলে রাজি?

'জ্বি রাজি'।

'প্রতিজ্ঞা করছ?'

'করছি।'

'আজ হচ্ছে মাসের কুড়ি তারিখ। তুমি দশদিনের টাকা পাবে। মাসে পাঁচশ হলে দশ দিনে হল ১৬৬ টাকা ৬৬ পয়সা।'

ফুপা মানিব্যাগ বের করলেন। টাকা বের করার আগেই বাদল ঢুকল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, ত্রিশটা টাকা দাও তো বাবা।

'কেন?'

'দুই কেজি বরফ আনব। দশ টাকা করে কেজি। দশটাকা রিকসা ভাড়া।'

'বরফ কি জন্যে?'

'হিমুদা বাথটাবে গোসল করবে। দুই কেজি বরফ এনে ছেড়ে দেব। ডিপ ফ্রীজে একদানা বরফ নেই।'

ফুপা কোন কথা না বলে বাদলে হাতে ত্রিশটা টাকা দিলেন এবং গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত।

'হিমু।'

'জ্বি'।

'কে বলবে তোমার সঙ্গে মেশার আগে আমার এই ছেলে বুদ্ধিমান ছিল?'

'বুদ্ধি এখনো আছে ফুপা।'

ফুপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বিড় বিড় করে বললেন, মানুষের ব্রেইন পুরোপুরি অকেজো করে দেয়ার ক্ষমতা কোন সহজ ক্ষমতা না। সবাই পারে না। তুমি পার।

'ওর ব্রেইন নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ফুপা। ওর ব্রেইন ভাল।'

'ব্রেইন ভাল? ব্রেইন ভালর নমুনা শুনবে? গতমাসে কি করল শোন—বাড়ির পেছনে একটা সজনে গাছ আছে না? এক সন্ধ্যে বেলা দেখি সজনে গাছ জড়িয়ে

ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দা থেকে দেখলাম। নিচে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? সে দাঁত বের করে বলল, গাছের ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছি। আমি বললাম, গাছের ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছিস মানে? গাছের ইলেকট্রন নিতে তোকে কে বলেছে? সে চোখ বড় বড় করে বলল—হিমুদা শিখিয়েছে। এই ছেলের ব্রেইন তুমি ভাল বলবে? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। তুমি কেন আমার এত বড় ক্ষতি করছ?'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'গাছের ইলেক্ট্রন নেয়ার ব্যাপারটা আপনাকে আরেদিন বুঝিয়ে বলব। একবার বুঝিয়ে বললে আপনার কাছে আর তেমন হাস্যকর লাগবে না'।

'আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না। তুমি বিদেয় হও। পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, খুশি হয়েই দিচ্ছি। নিয়ে উধাও হয়ে যাও। দয়া করে বাদল বরফ নিয়ে ফিরে আসার আগেই যাও। ওর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকলে—তোমার কাছ থেকে আরো কিছু কায়দা কানুন শিখে ফেলবে। এখন গাছ থেকে ইলেকট্রন নিচ্ছে, পরে হয়তো আগুন থেকে ইলেকট্রন নিতে চাইবে। একটাই আমার ছেলে হিমু...ওনলি সান'।

'ঠিক আছে ফুপা আমি যাচ্ছি।'

'থ্যাংকস। মন্ত্রীর ছেলের ব্যাপারটা খোঁজ নিও। ওরা বড় বিরক্ত করছে।'

'আচ্ছা খোঁজ নেব।'

'ওসিকে বলবে আর যেন আমাকে বিরক্ত না করে। এক্ষুনি টেলিফোন করে বলে দাও—টেলিফোন নাম্বার তোমার ফুপুর কাছে আছে?

'আছে ফুপা, এক্ষুণি টেলিফোন করছি'।

'এখান থেকে টেলিফোন করার দরকার নেই। কোন দোকান-টোকান থেকে কর। নাও, টেলিফোনের জন্যে পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও।'

গোসল না করেই ফুপার ঘর থেকে বের হলাম। ডাক্তারখানা থেকে ওসি সাহেব কে টেলিফোন করলাম। ভদ্রলোক হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন বলে মনে হল। আনন্দে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তো তো করে তোতলালেন।

'কে বলছেন, হিমু সাহেব? ও মাই গড। আপনাকে আমরা পাগলের মত খুঁজছি। আপনি আত্মীয়স্বজনের যে লিস্ট দিয়ে গিয়েছিলেন সেই লিস্ট ধরে ধরে সবার কাছে গিয়েছি। যাদের টেলিফোন নাম্বার আছে তাদের অনবরত টেলিফোন করছি।'

'কেন বলুন তো?'

'বিরাট সমস্যা হয়েছে ভাই। মোবারক হোসেন সাহেবের ছেলে –ঐ যে আপনার বন্ধু জহির—ও বাড়ি থেকে পালিয়েছে'।

'ও আচ্ছা'।

'আপনি যত সহজে 'ও আচ্ছা' বললেন ব্যাপারটা তত সহজ না। সারা শহর উলট-পালট করে ফেলা হয়ছে। পাওয়া যাচ্ছে না। মোবারক সাহেবের ধারণা, আপনি তাকে ফুসলে-ফাসলে নিয়ে গেছেন, কিংবা আপনি জানেন সে কোথায় আছে।'

'আমি জানি না।'

'ভাই, আপনি জানেন কিংবা না জানেন, মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে আপনাকে একটু দেখা করতে হবে। এক্ষুণি'।

'এক্ষুণি তো যেতে পারব না। আমার এখনো গোসল হয় নি।'

'ভাই আমি সামান্য ওসি। ছোট চাকরি করি। আপনারা দু'জন এসে আমাকে

মন্ত্রীর খাবার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এখন উদ্ধার করুন।'

'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন? উনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন?'

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, ঐদিন যদিও আপনি বলেছেন আপনার স্ত্রী সুস্থ আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা, তিনি বেশ অসুস্থ। আমার ইনট্যুইশন পাওয়ার খুব প্রবল। সব সময় তা কাজ করে না। মাঝে মাঝে করে। এখনো করছে। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি—এখনো মনে হচ্ছে তিনি খুব অসুস্থ।

ওসি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ সে অসুস্থ। তাঁর অসুখ সারাবার সাধ্য কারোর নেই। আপনার থাকলেও থাকতে পারে। এটা বড় ব্যাপার না, এই মুহূর্তে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখন আপনি আমাকে দয়া করে উদ্ধার করুন। প্লীজ, ঐ বাড়িতে যান।

'এখন গেলে তো উনাকে পাওয়া যাবে না। মন্ত্রী সাহেব বিকেলে ফিরে ঘণ্টা খানেক ঘুমান, তারপর আবার বের হন। ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা।'

'উনি না থাকলেও উনার স্ত্রী আছেন। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। ভাই, আপনি কি যাবেন?'

'যাচ্ছি।'

'সত্যি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ সত্যি যাচ্ছি।'

'ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি না জেনে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন।'

'ক্ষমা করে দিলাম। আপনার স্ত্রীর অসুখটা কি?'

'ওর গলায় ক্যানসার। মাসখানিক আয়ু আছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি ক্যানসার সারাতে পারেন?'

'না।'

'তাও ভাল স্বীকার করলেন। সবাই বলে সারাতে পারে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা বলে পারে, কবিরাজ বলে পারে, পীর-ফকির বলে পারে'।

'আপনার স্ত্রীর নাম কি রানু?'

'তাকে চেনেন?'

'চিনি না, হঠাৎ মনে হল তাঁর নাম রানু। তাঁর মাথা ভর্তি চুল'।

ওসি সাহেব জবাবে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

জহিরদের বাড়িতে তেমন কোন ঝামেলা ছাড়াই ঢুকলাম। জহিরের মা সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রমহিলা দেখতে অবিকল তিতলীর মত। যেন মা'র মাথা কেটে তিতলীর ঘাড়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মা-মেয়ের চেহারায় এত মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে দু'জনের তাকানোর ভঙ্গি দুরকম। মা শান্ত চোখে আমাকে দেখছেন। মেয়ের চোখে তীব্র রাগ এবং ঘৃণা। এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন মাটির নিচ থেকে অদ্ভুদ জন্তু বের হয়ে এসেছে। মেয়েই প্রথম কথা বলল, আমার ভাই কোথায়?

'আমি জানি না কোথায়।'

'দয়া করে মিথ্যা বলবেন না। আপনি যথেষ্ট যন্ত্রনা করেছেন। আমরা আর যন্ত্রনা সহ্য করব না'।

'জহিরের মা বললেন, তিতলী তুই চুপ কর তো। চুপ করে বসে থাক। যা বলার আমি বলব। বাবা, তুমি কি সত্যি জান না ও কোথায়?

'সত্যি জানি না।'

'কোথায় থাকতে পারে তা কি জান?'

'না, তাও জানি না।'

'কিছু মনে করো না বাবা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি জান। জেনেও বলছ জানি না।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কি?'

'ও একটা চিঠি লিখে গেছে। চিঠি থেকে মনে হচ্ছে তুমি জান। তিতলী চিঠিটা এনে একে দেখা। '

'চিঠি দেখাতে হবে না মা। ব্যক্তিগত চিঠি বাইরের মানুষকে দেখানোর দরকার কি?'

'ও বাইরের মানুষ না, ও জহিরের বন্ধু। তুই চিঠি নিয়ে আয়'।

তিতলী চিঠি আনতে গেল। ভদ্রমহিলা কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁকে খুবেই কাহিল দেখাচ্ছে। চোখ লাল। মনে হয় রাতে ঘুমটুম হচ্ছে না।

'বাবা, তোমার নামটা যেন কি?'

'হিমু।'

'ও হ্যাঁ হিমু। জহির কি তোমার খুব ভাল বন্ধু?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সেটা জহির বলতে পারবে। আমি তো বলতে পারব না। আমি জহিরকে খুব পছন্দ করি—এইটুকুই বলতে পারি।'

'কেন পছন্দ কর?'

''ভাল ছেলে। সরল সাদাসিধা। মনটা গভীর দিঘির জলের মত স্বচ্ছ'।

'ভদ্রমহিলা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মেয়েকে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন। তিতলী আমার সামনে চিঠিটা রাখল। তার ফর্সা মুখ এখনো ঘনায় কুচকে আছে। তিতলীর মা ক্লান্ত গলায় বললেন,

'বাবা,চিঠিটা পড়। তুমি কি দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছ?'

'না।'

'তাহলে এখানেই খাবে। জহিরের বাবা তিনটার দিকে আসবেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে তারপর যাবে।'

' এখানে তো আমি খেতে পারব না। গোসল না করে আমি কিছু খেতে পারি না। সাতদিন আমি আছি গোসল ছাড়া।'

তিতলী বলল, আপনাকে সেটা বড় গলায় বলতে হবে না। আপনার গা থেকে যে বিকট গন্ধ আসছে তা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি।

মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম কঠিন গলায় বললেন, তিতলী, তুই ভেতরে যা। এই ছেলে এখানে খাবে। ও গোসলের ব্যবস্থা করতে বল। বাথরুমে তোয়ালে সাবান দাও।

তিতলী উঠে গেল। তিনি আমার দিকে বললেন—বাবা, তুমি আমার ছেলে প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছ সেগুলি আমার এই মেয়ে প্রসঙ্গেও সত্য। আমার এই মেয়ের মনটাও গভীর দিঘির জলের মত স্বচ্ছ। ও তোমার উপর রেগে আছে বলে এরকম করছে। ওর ধারণা ...

ভদ্রমহিলা কথা শেষ করলেন না। সম্ভবত মেয়ের ধারণার কথা তিনি আমাকে বলতে চান না। আমি জহিরের চিঠি পড়তে শুরু করলাম। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। তবে বোনকে লেখা, তা বোঝা যাচ্ছে।

> আমার এই চিঠি পড়ে খুব রাগ করবি। একবার ভেবেছিলাম চিঠি লিখব না। তাতে সবাই দুশ্চিন্তা বেশি করবে। তাই এই চিঠি। তোদের সঙ্গে আমি থাকতে পারছি না। মানুষ হিসেবে বাবা অত্যন্ত নিম্নমানের। তিনি অনর্গল মিথ্যা বলেন। একের পর এক আজে বাজে কাজ করে যান। কিছু কিছু কাজ এমন যে, শয়তানের পক্ষেও করা সহজসাধ্য না। উদাহরণ দেই—আমাদের গ্রামের বাড়ির বুলু মাস্টার। ভদ্রলোক নিতান্তই ভাল মানুষ। তাঁর অপরাধের মধ্যে অপরাধ হচ্ছে, ইলেকসনের
> সময় বাবার বিরুদ্ধে নানান কথা বলেছে যেন লোকজন বাবাকে ভোট না দেয়। সে যে সমস্ত কথা বলেছে তার প্রতিটি বাক্য সত্য। যাই হোক। বাবা তাঁকে খুনের মামলায় এমন ফাঁসানো ফাঁসিয়েছেন যে এক ধাক্কায় যাবজ্জীবন হয়ে গেল। এই জাতীয় মানুষের সঙ্গে কি বাস করা যায়? তুই-ই বল। মাও যে বাবার চেয়ে আলাদা, তা না। বাবার প্রতিটি অন্যায় মা সমর্থন করে যাচ্ছেন। আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রী। বাবাকে একবার তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে গেল। টাকাটা দিয়ে গেল মা'র হাতে। মা শান্ত ভঙ্গিতে সেই টাকা আয়রণ সেফে তুলে রাখলেন। তাঁর মধ্যে কোন বিকার নেই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাব জানি না। গর্ত খুঁড়ে মাটিতে ঢুকতে ইচ্ছা করছে। ভাল কথা, ঐ রাতে হিমুর সঙ্গে গর্ত খুঁড়ে বসেছিলাম—দারুন লাগছিল। দু'জনেই থানায় গেলাম, বাবা আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন, হিমুকে আনলেন না। বেচারা একা বসে রইল। পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে মারধোরও করেছে। বাবা সেরকম ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। অবশ্য এতে হিমুর কিছুই যাবে আসবে না। পুলিশের পক্ষে ওকে হজম করা মুশকিল। ও কঠিন চিজ। তুই ভাল থাকিস। প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাক যাতে তুইও বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারিস। বাঁচার পথ একটাই। তোর ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেলাম। একবারে খালি হাতে বের হতে সাহস পাচ্ছি না।

'বাবা চিঠি পড়লে?'

'জি পড়লাম' ।

'কিছু বলবে' ।

'ও কত টাকা নিয়েছে?'

'সাতশ তেত্রিশ টাকা'।

'চিন্তার কোন কারণ দেখি না। টাকা শেষ হলেই ফিরে আসবে। আগেও তো অনেকবার পালিয়েছে। নতুন কিছু তো না।'

'জহিরের বাবাও তাই বলেছেন। কিন্তু আমি ভরসা পাচ্ছি না। রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন

দেখি। ঐ দিন দেখলাম...’

তিতলী বলল, গোসলের পানি দেয়া হয়েছে, আপনি আসুন।

মেয়েটা এখনো চোখে-মুখে ঘৃণা ধরে আছে। ভালবাসা অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়, ঘৃণা না। মেয়েটা কি করে ধরে রেখেছে সে-ই জানে।

‘কি হল, বস আছেন কেন? আসুন’।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলাম এবং বাথরুমে ঢোকার আগে থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাদের বাথরুমে কি বাথটাব আছে?

‘হ্যাঁ আছে।’

‘তাহলে দয়া করে দু’কেজি বরফের ব্যবস্থা করুন। বাথটাবে পানি দিয়ে আমি তার মধ্যে দু’কেজি বরফ ছেড়ে দেব। তারপর নাক ভাসিয়ে শুয়ে থাকব।’

‘পাগলামী কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। পাগলামী কথা শুনে আমি মুগ্ধ হই না। আমি জহির না।’

‘আপনাদের ডীপ ফ্রীজে বরফ নেই?’

তিতলী জবাব দিল না। আমি আশাও করিনি।

মন্ত্রীর বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন প্রচুর থাকবে এটা ভাবাই স্বাভাবিক। বিশাল ডাইনিং টেবিল থাকবে।চায়নীজ রেস্টুরেন্টের মত উর্দিপরা বয় থাকবে। ন্যাপকিন-কাঁটাচামচ থাকবে। সে রকম কিছু না। খেতে এসে দেখি খুবই এলেবেলে ব্যবস্থা। খাবার টেবিলটা ছোট। টেবিল ক্লথে তরকারির দাগ লেগে আছে। উর্দিপরা বয় বাবুর্চি দেখলাম না—বৃদ্ধ এক কাজের মেয়েকে দেখলাম তিতলী যাকে বড়বুবু করে ডাকছে। আয়োজনের সামান্য—রুগ্ন ধরনের কই মাছ, মুরগীর মাংস, ডাল এবং কালচে ধরনের পেঁপেভাজি ।

তিতলী কঠিন ভঙ্গিতে বলল, খেতে বসুন।

‘আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?’

‘খাওয়া না হলেও আপনার সঙ্গে বসে খাব এরকম ভাবছেন কেন?’

‘ভাবছি না।’

‘না ভাবলেই ভাল, বড়বুবু আছেন কিছু লাগলে উনাকে বলবেন, উনি দেবেন। আমি এসেছি শুধু আপনাকে একটা খবর দেবার জন্যে’।

‘কি খবর?’

‘আপনি যে এসেছেন বাবাকে বলা হয়েছে। বাবা একটা কেবিনেট মিটিংএ আটকা পড়েছেন আসতে রাত হবে। বাবার সঙ্গে দেখা না করে আপনি যাবেন না। খাওয়া শেষ হলে বড় বুবু আপনাকে ভাইয়ার ঘরে নিয়ে যাবে। আপনি ঐ ঘরে বিশ্রাম করবেন।”

‘হাউস এ্যারেস্ট?’

'ভাইয়া চিঠিতে লিখেছে কেউ আপনাকে হজম করতে পারে না। আমরা পারব কেন? আপনাকে থাকতে বলা হয়েছে, আপনি থাকবেন'।

'ঠিক আছে থাকব। তুমি বস, খেতে খেতে গল্প করি। আমার সঙ্গে গল্প করবে? আমি অনেক হাসির গল্প জানি।'

'আপনার সঙ্গে গল্প করব মানে? হু আর ইউ? তাছাড়া তুমি করে বলছেন কেন? বাংলা সিনেমা পেয়েছেন? সব জায়গায় ভড়ং চলে না। মনে রাখবেন।'

'আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তিতলী তুমি গল্প করতে না চাও - করবে না। চেঁচামেচি করছ কেন? কেউ খাওয়ার সময় চেঁচামেচি করলে আমি খেতে পারি না। হাজার হলেও তোমাদের অতিথি। তাছাড়া খাবার আয়োজনও ভাল না। গল্পগুজব না করলে এইসব খাবার আরো বিস্বাদ লাগে'।

'তুমি তুমি করে কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন? এই অধিকার আপনাকে কে দিল? এত সাহস আপনি কোথেকে পাচ্ছেন? আমি আপনাকে একটা শিক্ষা দেব। এমন শিক্ষা দেব যে আপনি কোনদিন ভুলবেন না।'

জহিরের মা এই পর্যায়ে খাবার ঘরে ঢুকে বললেন, কি হয়েছে?

তিতলী বলল, কিছু না।

জহিরের মা বললেন, বাবা তোমাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতে হবে। তোমাকে কি তিতলী এই কথা বলেছে?

'বলেছে। আমার কোন অসুবিধা নেই।'

'খেতে পারছ বাবা?'

'আমাকে এত ঘন ঘন বাবা বলবেন না। আমার খুব অস্বস্থি লাগে।'

তোমার মা যখন বলেন তখনো কি অস্বস্থি লাগে?'

'মা বলার সুযোগ পান নি। মা বললেও লাগতো বলেই আমার ধারণা।

রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। মোবারক হোসেন সাহেব ন'টার দিকে বাসায় ফিরলেন। আমার ডাক পড়ল দশটায়। দোতলা পেছনের দিকের বারান্দায় তিনি বসে আছেন। বসে না, ইজিচেয়ারে আধাশোয়া অবস্থায় আছেন। পা দুটা মোড়ার উপর। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত তোলা এক লুঙ্গি কোন রকমে কোমরে জড়ানো। তিতলী আমাকে নিয়ে গেল। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, বোস।

হাতলবিহীন একটা চেয়ার রাখা হয়েছে আমার জন্যে। আমি বসলাম। তিনি আবারো হাই তুলতে তুলতে তিতলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘরে টক দৈ আছে কি-না দেখতো মা। থাকলে আমাকে এক বাটি দিয়ে যাও।

তিতলী চলে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। আমার সঙ্গে কথা বলার কোন রকম আগ্রহ দেখলাম না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। তবে মোড়ায় রাখা পা নড়ছে। তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে ভদ্রলোক জেগেই আছেন।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

'প্রথমেই তোমার একটা ভুল ধারণা ভাঙ্গানো দরকার। আমার স্ত্রী এবং কন্যার আচার আচরণে তোমারা হয়ত ধারণা হয়েছে জহিরের পালিয়ে যাবার ব্যাপারটায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। ব্যাপারটা মোটেই তা না। এটা নতুন কোন ঘটনা না। এ জাতীয় ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমি বরং খুশি যে সে বাড়ি থেকে বিদেয়

হয়েছে। তোমাদের বাংলায় একটা প্রবচন আছে না—দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল?'

'উল্টা প্রবচনও আছে স্যার, নাই গরুর চেয়ে কানা গরু ভাল। অবশ্যি প্রবচন একটু অন্যভাবে আছে–নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। মুল ভাব কিন্তু এক।"

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

আমার চেহারায় কোথায় যেন একটু বোকা ভাব আছে। যার সঙ্গেই কথা বলি সেই আমাকে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে। যদিও আমি মানুষটা বোকা না। একটা বোকা লোক সব সরকারের আমলে মন্ত্রী হয় না। এক সরকারের আমলে হয় অন্য সরকারের আমলে জেলে চলে যায়। আমি এখনও জেলে যাইনি'।

'আপনি বুদ্ধিমান এই নিয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'বুদ্ধিমান মানুষ আবার নানা ধরনের আছে। কিছু মানুষ আছে যারা বড় সমস্যা। সমাধানে বুদ্ধিমান, আবার ক্ষুদ্র সমস্যার ব্যাপারে না। আমি ছোট এবং আপাতত তুচ্ছ বিষয়েও বুদ্ধিমান। প্রমাণ চাও?'

'আমি চাচ্ছি না। আপনি দিতে চাইলে দিতে পারেন।'

'বেশ প্রমাণ দিচ্ছি। তোমাকে নিয়ে আমার মেয়ে উপস্থিত হল। আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তায় সে থাকুক। তাকে চলে যেতে ও বলতে চাইলাম না, কারণ তাতে তার ধারণা হতে পারে আমি তোমার সঙ্গে জরুরী কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছি। কাজেই তাকে টক দৈ আনতে বললাম। আমি জানি ঘরে টক দৈ নেই। দোকান থেকে আনতে হবে। এতে খুব কম করে ও হলে আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আধ ঘণ্টা যথেষ্ট। আশা করি প্রমাণ পেয়েছে যে আমি বুদ্ধিমান'।

'জ্বি পেয়েছি। বলুন কি বলবেন'।

আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম জহিরের চিঠি তুমি পড়েছ। যে ছেলে নিজের বাবা-মা সম্পর্কে এত কুৎসিত কথা লিখতে পারে তার বাড়িতে থাকার এমনিতেই কোন অধিকার নেই। সে চলে গেছে ভাল করেছে। গুড ফর হিম। আমার সম্পর্কে যে সব অভিযোগ এনেছে তার প্রত্যেকটার জবাব দেয়া যায়। কী জবাব দেব তুমি কি শুনতে চাও?'

'না।'

'শুধু একটার জবাব দিচ্ছি—বুলু মাষ্টারের ব্যাপারটা। লোকটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। স্কুল টিচার, তার কাজ হচ্ছে ছাত্র পড়ানো। করে পলিটিক্স। সারাক্ষণ আমার বিরুদ্ধে লেগে ছিল। ইচ্ছা করলেই হারামজাদাকে আমি দশ হাত পানির নিচে পুঁতে ফেলতে পারতাম। তা করিনি। আমি মন্ত্রী হয়ে যাবার পর স্থানীয় লোকজন আমাকে খুশী করবার জন্যে তাকে খুনের মামলায় জরিয়ে ফেলল। খেয়াল রাখবে আমি কাউকে কিছু করতে বলিনি। ওসি আমাকে খুশি করতে চাইল, স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যান খুশি করতে চাইল, একদল মিথ্যা সাক্ষী জুটে গেল। একদল অসৎ লোক মিলে কাণ্ডটা করল।'

'আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি সহজে খুশি হই না, সহজে ব্যাজারও হই না। আমার পুত্র এইসব ব্যাপার জানে না। সে জানে আমি শয়তান ধরণের মানুষ। ভাল কথা। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে

সে তার নিজস্ব ধারণা করতেই পারে—ছেলের ব্যাপারে আমার মোটেই মাথা ব্যথা নেই। আমি তোমার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছি।'

মোবারক হোসেন সাহেব এই প্রথম চোখ মেললেন। আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। আমি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, আমার কি ব্যাপার জানতে চান?"

'সব কিছুই জানতে চাই। আমি কিছু খোঁজ-খবর করিয়েছি। এখনো করছি। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? জহিরকে গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে রাখার কাজটা যে তুমি করেছ, আমার ধারণা তা খুব ভেবে চিন্তে করেছ। এর পেছনে তোমার পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটা কি ? চট করে জবাব দিতে হবে না। ভাব। ভেবে ভেবে জবাব দাও।'

আমি চুপ করে রইলাম। মোবারক সাহেব চাপা গলায় বললেন, তুমি কি নিজেকে মহাপুরুষ মনে কর?

'না।'

'অনেকেই মনে করে।'

'কেউ কেউ করে।'

'অনেকের ধারণা তোমার সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। যে ওসি তোমাদের ধরে থানায় নিয়ে গিয়েছিল তাঁরও ধারণা সে রকম। তোমার কি আছে কোন সুপার-ন্যাচারাল ক্ষমতা?'

'না। তবে আমার ইনট্যুশন ক্ষমতা প্রবল। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে ফেলতে পারি।'

'সে তো সবাই পারে। তোমার ইনট্যুশন এই মুহূর্তে কি বলছে?'

'এই মুহূর্তে আমার ইনট্যুশন বলছে আপনি বড় রকমের ঝামেলায় পড়েছেন। এখন আর তেল এবং জ্বালানি মন্ত্রী না।'

মোবারক হোসেন শীতল গলায় বললেন, 'তোমার ইনট্যুশন ক্ষমতা কিছুটা হয়তো আছে, কিন্তু বলা যায় অনুমান শক্তি প্রবল। ব্যাপারটা ঘটেছে আজ রাত আটটায়, তোমার জানার কথা না। প্রেসিডেন্টের গুডবুক থেকে নাম কাটা গেছে, গুড বুক থেকে নাম কাটা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাড বুকে নাম উঠে যায়। সেখানে নাম উঠে গেছে। আমাকে জেলে যেতে হতে পারে। তোমার ইনটুযশন কি বলে?'

'আমার ইনট্যুশন কিছু বলছে না।'

মোবারক হোসেন আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মোড়ায় রাখা তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল কাঁপতে লাগল। মনে হয় এই হল তাঁর চিন্তার পদ্ধতি।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

'আমাকে জেলে ঢুকানো সহজ না। এতে থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। আমাকে অখুশি করাও বর্তমানে সরকারের পক্ষে খুব রিস্কি।' মেরে ফেললে ভিন্ন কথা। তোমার ইনট্যুশন কি বলে?'

'কিছু বলছে না'।

'তোমাকে ডেকে আনার কারণ এখন বলি, ভাল কথা, তুমি নিজে কি কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

'না।'

‘কথা বলার জন্য ডাকলাম আর কিছু না। একটা পর্যায় আছে যখন কথা বলার কেউ আশেপাশে থাকে না। আমার অনেক কথা আছে। বলার মানুষ নেই। জহিরের বিষয় নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। লেট হিম গো টু হেল। অবশ্য গেছেও তাই। কোথায় আছে সেই খোঁজ বের করা আমার পক্ষে কঠিন না। বের করতে চাচ্ছি না। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ, তুমি আমার সঙ্গে একধরনের খেলা খেলার চেষ্টা করছ। ভাল কথা, খেল। শুধু জানিয়ে রাখলাম—যে খেলাটা তুমি গোপনে খেলতে পারছ না। আমি জানি।’

তিতলী টক দৈয়ের বাটি নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, চাচা আমি কি এখন যেতে পারি?

‘অবশ্যই যেতে পার। তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়নি। গুড নাইট ।’

৫

ঘুম ভেঙ্গে কেউ যদি দেখে তার মুখের ঠিক ছ'ইঞ্চি উপর একটি অচেনা মেয়ের মুখ ঝুঁকে আছে, যার চোখ টানা টানা, বয়স অল্প, তাহলে তার ছোটখাট ধাক্কা খাওয়ার কথা। আমি তাই খেলাম। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড মাথা ফাঁকা হয়ে থাকল। তারপর শুনলাম, অচেনা মেয়েটি বলছে—‘আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?’

আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। কোন মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন, তাহলে তার মুখের উপর না বলা যায় না। কেউ বললে আদালতে তার জেল জরিমানা দুই-ই হবার বিধান থাকা উচিত।

‘চিনতে পারছেন তো আমাকে? এর আগে দু’বার দেখা হয়েছে। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি। দাড়ি গোঁফ কেটে ফেলেছেন কেন? আপনাকে সুন্দর লাগতো। আমি ঘরে ঢুকে প্রথম একটু চমকে গেলাম। ভাবলাম, কার না কার ঘরে ঢুকেছি। আচ্ছা, আপনি এমন দরজা খোলা রেখে ঘুমান? চোর এলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত।’

আমি মেয়েটিকে চিনলাম। কথা বলার ভঙ্গি থেকে চিনলাম। এই মেয়ে একনাগাড়ে কথা বলছে। খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। আমার চেনার মধ্যে এরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে একজনই কথা বলে—রফিকের বউ। কিন্তু রফিকের বউয়ের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল—এই মেয়েটিকে দারুণ রোগা লাগছে।

‘আমি কতক্ষণ আগে এসেছি বলুন তো? কাঁটায় কাঁটায় দেড় ঘণ্টা। বেশ কয়েকবার আপনার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছি। দরজায় ঠক ঠক করেছি, খক খক করে কেশেছি। দিনের বেলায় কারো এমন গাঢ় ঘুম হয় আমি জানতাম না। শেষে কি হল জানেন? একটু ভয় লাগল।’

‘কিসের ভয়?’

‘হঠাৎ মনে হল কেউ হয়ত আপনাকে খুনটুন করে গেছে। দরজা খোলা তো, তাই এ রকম মনে হল। নিঃশ্বাস পড়ছে কি-না দেখার জন্যে আপনার মুখের উপর ঝুঁকে ছিলাম।’

আমি উঠে বসতে বললাম, রফিক ভাল?

‘সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।’

‘আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কেন? আপনি জানেন না? দেখা হয় না?’

‘রোজই দেখা হয়। ও রোজ একবার আসে। ঠিক সন্ধ্যার দিকে আসে। ভাইয়ার বসার ঘরে ঘণ্টাখানিক বসে থেকে চলে আসে।’

‘আপনার সঙ্গে কথা হয় না?’

‘না। ভাইয়া আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন কথা না বলি। তারপরেও বলতাম। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার ভাইয়া বাসায় থাকে।’

আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন? চেয়ারটায় বসুন।

‘আমার নাম কি আপনার মনে আছে?”

‘মনে আছে। আপনার নাম যুথী।’

‘অনেকে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে যুখী লেখে। আমিও আগে লেখতাম। এখন লিখি না। আচ্ছা শুনুন, আপনার চিঠি এসেছে। নিচে পড়ে ছিল,আমি টেবিলে রেখে দিয়েছি। নিন।’

‘চিঠি পরে পড়ব। এমন কিছু জরুরী চিঠি না। আমার বাড়ির চিঠি। প্রতি মাসের শেষের দিকে তাঁরা একটা চিঠি পাঠান।’

‘আপনি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ভদ্র হয়ে আসুন–কথা বলি। আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে। আর শুনুন, আপনার এখানে চা পাওয়া যায়?’

আমি হাত-মুখ ধুয়ে, শার্ট গায়ে দিয়ে, ঘরে ঢুকলাম। যুথী খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। যেন এটা তারই বাড়িঘর। আমি চৌকিতে বসতে বসতে বললাম, বলুন কি ব্যাপার?

‘আপনার বন্ধুর চাকরির কি কিছু হয়েছে? ভাইয়া ওকে জিজ্ঞেস করছিল। ও বলল—হিমুকে বলেছি। হিমু সব ঠিক করে দেবে। ভাইয়ার ধারণা ও কাউকেই কিছু বলেনি।’

‘আমাকে বলেছে।’

‘আমি জানি বলেছেন। ও কখনো মিথ্যা কথা বলে না। আমি ভাইয়াকে সেটা বললাম, ভাইয়া আমার উপর রেগে গেল। ভাইয়া ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। বলে সাব-হিউমেন স্পেসিস। ভাইয়া বলে—ওর শুধু চেহারাটা আছে কোল বালিশের খোলটা শুধু ঘুরে, ভেতরে বালিশ নেই’।

‘আপনার ভাইয়া কি রফিকের চাকরির কোনো চেষ্টা করছেন না?’

‘না। করবেও না। বললাম না ওকে দেখতে পারে না। ওর নাম শুনলেও রেগে যায়। তার উপর এখন বলছে—ওকে ডিভোর্স দিতে।'

‘তাই না-কি?’

‘হ্যাঁ। এটা আপনাকে বলার জন্যই এসেছি। ভাইয়ার বাসায় ওকে কেউ দেখতে পারে না। আমার ভাবী বলছিল—যুখী,তুমি যে ঐ ছেলের সঙ্গে থাকতে চাও—ওর তো মাথা খারাপ। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। কোন সুস্থ ছেলে এই কাজ করবে না। একদিন দেখবে ঘুমের মধ্যে তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। তার পর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়িতে ঝুলিয়ে বলবে আত্মহত্যা। পাগলদের বাস্তব বুদ্ধি আবার ভাল থাকে। আমি ভাবীর কথায় গুরুত্ব দেই নি—এখন আপনি বলুন, দিনের পর দিন কেউ যদি কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে—ডিভোর্স দাও, ডিভোর্স দাও, তাহলে কি ভাল লাগে?’

‘ভাল লাগার তো কথা না।’

‘আচ্ছা আপনি কি ওর চাকরির কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন?’

‘পারব।’

‘সত্যি পারবেন?’

‘হ্যাঁ’।

‘তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করবেন। ও চাকরি পেলেই আমি ওর কাছে চলে যাব। তখন আর ভাইয়া বলতে পারবে না—চাকরি-বাকরি নেই। ও তোকে খাওয়াবে কি? আজ তাহলে উঠি।’

যুথী ঝট করে উঠে দাঁড়াল। আর তখনি আমার মনে হল ঐ মেয়েটা রূপার মত। যদিও এরকম মনে হবার কোন কারণ নেই। আমরা পছন্দের মানুষের মধ্যে অতি প্রিয়জনদের ছায়া দেখি। এটাই মূল ব্যাপার।

‘হিমু ভাই, আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আসার সময় দেখেছি কতগুলো বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমায় দেখে একজন বলল, শুটকি রাণী, শুটকি রাণী।’

আমি যুথীকে রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আজ আমার পরিকল্পনা সারাদিন ঘুমানো। সাইকেলটা বদলে দেয়া। সারাদিন ঘুমুব, রাতে জেগে থাকব। আমার বাবার অনেক উপদেশের একটি হচ্ছে—

> ঘুমাইয়া রাত নষ্ট করিও না। দিনে নিদ্রা যাইবে। রাত কাটাইবে অনিদ্রায়। কারণ রাত্রি আত্ম-অনুসন্ধানের জন্য উত্তম। জগতের সকল নিশিষাপন করে। পশু মাত্রই নিশাচর। মানুষ এক অর্থে পশু। নিশিযাপন তার অবশ্যকর্তব্যের একটি।

বিছানায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করার পরও ঘুম আনা গেল না। ঘরে খবরের কাগজ নেই, পুরানো ম্যাগাজিন নেই যে চোখ বুলাব। মামার বাড়ি থেকে আসা চিঠিটা অবশ্যি পড়া যায়, পড়তে ইচ্ছে করছে না। চিঠিতে কি লেখা না পড়েই বলে দিতে পারি। একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে একটি শব্দ এদিক-ওদিক না করে ছোট মামা দীর্ঘ দিন ধরে চিঠি লিখছেন। চিঠির মাথায় আরবীতে লেখা থাকে ইয়া রব। তারপর গুটি গুটি হরফে লেখেন –

> দোয়া গো,
>
> পর সমাচর এই যে, দীর্ঘদিন তোমার কোন পত্রাদি না পাইয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত আছি। আশা করি আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন তোমাকে সুস্থ দেহে রাখিয়াছেন। আমাদের এদিকের সংবাদাদি মঙ্গল। তুমি কোন চিন্তা করিবে না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার এইবার ফসল ভাল হইয়াছে। ব্যবসাপাতিও ভাল। তোমাকে মাসিক যে টাকা পাঠানো হয় তাহাতে তোমার চলে কিনা। জানি না। প্রয়োজন হইলেই জানাইবা। এই বিষয়ে কোন রকম লজ্জা বা সংকোচ করিবে না। তোমাকে যে কি পরিমাণ স্নেহ করি একমাত্র আল্লাহপাক রাববুল আলামীন জ্ঞাত আছেন। শরীরের যত্ন নিবা। পথে পথে ঘোরার অভ্যাস ত্যাগ করিবা। মনে রাখিও, ভিক্ষুকরাই পথে পথে ঘুরে। তুমি ভিক্ষুক নও। কারণ আমরা এখনও জীবিত আছি। আল্লাপাকের ইচ্ছায় তোমার অন্নের অভাব কখনো হইবে না। কোন কারণে আমার মৃত্যু ঘটিলেও চিন্তাযুক্ত হইও না। কারণ আমি তোমার নামে আলাদা সম্পত্তি

লেখাপড়া করিয়া দিয়া রাখিয়াছি। তাহাতে কেহ হাত দিবে না। দোয়া নিও।

ইতি

তোমার ছোট মামা।

বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে মনে হল—অনেকদিন মামার বাড়ি যাওয়া হয় না। কোন এক গভীর রাতে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়?

চার বছর আগে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। ঠাকরোকোণা স্টেশনে নেমে সাত মাইল হেঁটে রাত একটার সময় উপস্থিত হলাম। ছোট মামা ঘুম ভেঙে উঠে এলেন। প্রথমে খানিকক্ষণ হতভম্ভ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আনন্দে কেঁদে ফেললেন। গোসলের জন্যে গরম পানি করা হল। মামা গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন। মুরগী জবেহ করে যেন পোলাও কোরমা করা হয়। রান্না হতে হতে রাত তিনটা বেজে গেল। মামা বললেন, ছেলেটা একা একটা খাবে না-কি—দেখি ওর সাথে আমাকেও দাও।

মাঝের ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা। সেই ঘরের খাট মামার পছন্দ না। খাট খুলে নতুন খাট পাতা হল। বিশাল খাট। জানা গেল, এই নতুন খাট আমার জন্যেই মামা বানিয়ে রেখেছেন। একজন মানুষের প্রতি অন্য একজনের ভালবাসা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে আমার মামাদের না দেখলে তা জানতে পারতাম না। অথচ আশ্চার্যের ব্যাপার, মানুষ হিসেবে মামার পিশাচ শ্রেণীর। তাঁদের সমস্ত ভালোবাসা নিজের মানুষের জন্য, বাইরের কারো জন্যে নয়।

মামার বাড়িতে সেবার দু'মাস কাটিয়ে দিলাম। তারপরেও যখন চলে আসার জন্যে ব্যাগ গুটাচ্ছি, ছোট মামা দুঃখিত গলায় বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি? আর দুটা দিন থেকে যা, সিঁদুর গাছের আমগুলি পাকুক। তোকে যেতে দিতে ইচ্ছা করে না রে হিমু। ইচ্ছে করে মোটা একটা শিকল দিয়ে তোকে বেঁধে রাখি।

৬.

'শিকল দিয়ে কাউকেই বেঁধে রাখা হয় না। তারপরেও সব মানুষই কোন-না-কোন সময় অনুভব করে তার হাতে-পায়ে কঠিন শিকল। শিকল ভাঙতে গিয়ে সংসার-বিরাগী গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে। ভাবে, মুক্তি পাওয়া গেল। দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে গৃহী মানুষ লাফিয়ে পড়ে ফুটপাতে। এরা ক্ষণিকের জন্য শিকল ভাঙার তৃপ্তি পায়।"

এই জাতীয় উচ্চশ্রেণীর চিন্তা করতে করতে নিজ আস্তানার দিকে ফিরছি। উচ্চশ্রেণীর চিন্তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমার বাবার কঠিন উপদেশের ফল ফলতে শুরু করেছে। এখন আর সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে পারি না কিছু একটা ভেবে ভেবে হাঁটি।

রাস্তাঘাঠ আগের মত নিরাপদ না গভীর রাতে বাড়ি ফিরছি। চোখ-কান খোলা রেখে হাঁঠা দরকার। যে কোন মুহুর্তে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে কোন দিকে ঝেড়ে দৌড় দেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। সাধারণ মানুষদের মত মহাপুরুষদের

জীবন সংশয় হয়। তাছাড়া সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে। বড় ফুপার দেয়া টাকাটা খরচ হয় নি। টাকাটা সাবধানে রাখতে হবে। একটা সময় ছিল যখন মহাপুরুষদের অর্থের প্রয়োজন হত না। এখন হয়। এই যুগের মহাপুরুষদের সেভিংস এবং কারেন্ট দুটা একাউন্টই থাকা দরকার।

আমার পেছনে ধীর গতিতে একটা রিকশা আসছে। একজন রিকশাওয়ালার কাছে শুনেছি, আস্তে রিকশা চালানো ভয়ংকর পরিশ্রমের ব্যাপার। রিকশা যত দ্রুত চলবে তত পরিশ্রম তত কম। এই রিকশাওয়ালার পরিশ্রম খুব বেশি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর সে টুন টুন করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। যদিও ঘণ্টা বাজানোর কোন প্রয়োজন নেই। রাস্তাঘাট ফাঁকা। আমি কৌতুহলী হয়ে পেছনে তাকাতেই রিকশা আমার ধার ঘেসে থেমে গেল। যা ভেবেছি তাই। রিকশায় ভদ্র চেহারার একটা মেয়ে বসে আছে। বয়স অল্প, লম্বাটে করুণ মুখ, মাথার চুল বেণী করা। চোখে সম্ভমত কাজল দেয়া, টানা টানা চোখ। মানুষের চোখ এতটা টানা টানা হয় না, গরু-হরিণ এদের চোখ হয়। মেয়েটির পায়ের কাছে বাচ্চাদের স্কুলব্যাংগর সাইজের একটা চামড়ার সুটকেস। মেয়েটি মুখ বের করে শান্ত গলায় বলল, আপনি কি আমায় একটা উপকার করতে পারবেন? তার গলায় স্বর যেমন পরিষ্কার, উচ্চারণও পরিষ্কার। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালা রিকশা রেখে খানিকক্ষণ দুরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। তার ভাবভঙ্গিতে কোন রকম কৌতুহল বা আগ্রহ নেই।

'আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। জামালপুর থেকে রাতের ট্রেনে এসেছি।যাব খালার বাসায় মুগদাপাড়া। মুগদাপাড়া চিনেন?'

'চিনি।'

'অনেক দুর, তাই না?'

'হ্যাঁ। অনেক দূর।'

'আগে বুঝতে পারিনি। আগে বুঝতে পারলে স্টেশনে থেমে যেতাম। অবশ্যি স্টেশনে থাকতে ভয় ভয় লাগছিল। গুণ্ডাধরনের কয়েকটা লোক ঘোরাফেরা করছিল। বিশ্রী করে তাকাচ্ছিল।'

মেয়েটা কথা বলছে হাত নেড়ে নেড়ে। কথা বলার মধ্যে কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই।বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলে সে আরাম পাচ্ছে।

'এখন আমার একা যেতেও সাহসে কুলাচ্ছে না।'

'আপনি কি চাচ্ছেন আমি আপনার সঙ্গে যাই?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমি আবার খালার বাসায় ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। একটা কাগজ এনেছিলাম, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে জায়গাটা কিছু কিছু মনে আছে। দু'বছর আগে একবার এসেছিলাম দিনের বেলা গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমি এখন কি করতে পারি?'

'রাতটা থাকার জন্য আপনি আমাকে একটা জায়গা দিতে পারেন? শুধু রাতটা থাকব। ভোরবেলা চলে যাব। আমার খুব উপকার হয়।'

রিকশাওয়ালার সিগারেট শেষ হয়েছে। তারপরেও সে উঠে আসছে না। রাস্তার ধারে বসে আছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। পিচ করে একবার থুথুও ফেলল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি?

সে হকচকিয়ে গেল। আচমকা নাম জিজ্ঞেস করলে এই জাতীয় মেয়েরা

হকচকিয়ে যায়। এদের বেশ কয়েকটা নাম থাকে। কোনটা বলবে বুঝতে পারে না। কারণ বলতে ইচ্ছে করে আসল নামটি, যে নাম কখনো বলা যাবে না।

আমি বললাম, নাম মনে পড়ছে না?

মেয়েটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সে যে কি পরিমাণ ক্লান্ত তা তার নিঃশ্বাস থেকে বোঝা যাচ্ছে। আগে বোঝা যায় নি।

'আমার নাম সেতু।'

'আসল নাম?'

'হ্যাঁ আসল নাম। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমি আসল নামটা বলি। নকলটা বলি না।'

'শোন সেতু, তোমাকে আমি ধার হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে দি। পরে আমাকে শোধ করে দেবে। রাজি আছ?'

'আপনাকে কোথায় পাব?'

'আমাকে পেতে হবে না। আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।"

'কোথায় খুঁজবেন?'

'পথেই খুজব।'

'আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা না।'

'অবশ্যই তুমি তা না।'

আমি মানিব্যাগ বের করলাম। বড় ফুপার টাকা ছাড়াও সেখানে একটা চকচকে পাশ টাকার নোট আছে। সব দিয়ে দেয়া যাক। সেতু হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। সে টাকাগুলি গোনার চেষ্টা করছে।সে আগের মতই শান্ত স্বরে বলল, আপনাকে আমি চিনি। অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বগুড়ায়। আমরা থাকতাম সূত্রাপুরে। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে?'

'না। বগুড়ায় আমি কোনদিন যাইনি।'

ভুল বলেছি বগুড়ায় না, ঢাকাতেই দেখা হয়েছে। পুরনো ঢাকায়, আগামসি লেনে। আপনি আপনার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলেন। আপনার পরণে একটা ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ছিল। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'

'এক বর্ণও বিশ্বাস করছি না। তুমি কথা বলতে পছন্দ কর। এবং গুছিয়ে কথা বলতে পার। এই স্বভাবের মেয়েরা বানিয়ে অনেক কথা বলে। তুমিও তাই করছ। বাসায় চলে যাও। টাকাটা নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না তো? এ রাস্তায় হাইজ্যাকারের হাতে পড়তে পার।'

সেতু ছিল বলল না। টাকাগুলি সে আবার গুনতে চেষ্টা করছে। সুন্দর একটি মেয়ে। গভীর রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে এই দৃশ্য ভাল লাগে না। মেয়েটির এই মুহুর্তেই থাকা উচিত ছিল উঁচু দেয়াল-ঘেরা প্রাচীন ধরনের একটা দোতলা বাড়ির শোবার ঘরে। শোবার ঘরের খাটটা থাকবে অনেক বড়। সেগুয়ে থাকবে তার স্বামীর পাশে। না না, পাশে না। দুজন থাকবে দুদিকে। মাঝখানে একটি শিশু। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে শিশুটি কেদে উঠবে। সেতু জেগে উঠে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। আদুরে গলায় বলবে—কে মেরেছে আমার বাবুকে? কে মেরেছে? কার এত সাহস? কে আমার বাবুকে মারল?

বাবু শান্ত হচ্ছে না। তার কান্না বেড়েই যাচ্ছে। সেতু তার স্বামীকে ডেকে তুলে

ভয়ার্ত গলায় বলবে, একটু দেখ না ও এত কাঁদছে কেন? বোধহয় পেট ব্যথা করছে। বাতিটা জ্বালাও তো।

সেতুর স্বামী বাতি জ্বালাবেন। আলো দেখে শিশু কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করবে। সেতু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে—ওমা, আমার বাবু এত হাসটু করছে কেন? কেন আমার বাবা এত হাসটু' করছে? কে আমার বাবাকে কাতুকুতু দিয়ে গেল? কে সেই দুষ্ট লোক?

মেসে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রূপাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। রূপাদের বাড়িটি প্রাচীন। উচু দেয়াল-ঘেরা দোতলা বাড়ি। রূপা যে খাটে ঘুমায় তা আমি কোনদিন দেখিনি, তবে আমি নিশ্চিত সেটা বিশাল একটা খাট ।

রাত যদিও অনেক হয়েছে রূপা নিশ্চয়ই ঘুমায়নি। তার এম. এ. পরীক্ষা চলছে। সে অনেক রাত জেগে পড়ে। সে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে বই হাতে নিয়ে পড়ছে। তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তায় দাঁড়ালেই রূপার শোবার ঘরের জানালা দেখা যায়।যদি দেখি জানালার আলো জ্বলছে তাহলে তাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে। আমাদের মেসের সামনে কিসমত রেস্টুরেন্ট সারারাত খোলা থাকে। তাদের একটা টেলিফোন আছে। পাঁচটাকা দিলেই রেস্টুরেন্টের মালিক একটা টেলিফোন করতে দেবে। সমস্যা একটাই, রূপা কি টেলিফোন ধরবে? সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। নিশিরাতের টেলিফোন অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা কখনো ধরে না রাতের টেলিফোন ধরার দায়িত্ব বাড়ির পুরুষদের। রিং হওয়ামাত্র রূপার বাবা গম্ভীর গলায় বলবেন, কে? উনি কখনো 'হ্যালো' বলেন না। বিনয় করে জিজ্ঞেস করেন না, আপনি কে বলছেন? ধমকের স্বরে জানতে চান—কে?

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাসে ভেজা গন্ধ। গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। মনে হয় আজ রাতেও হবে। বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই ঠিক করলাম। কিছুদুর এগুতেই বৃষ্টির ফোটা পড়তে শুরু করল। দৌড়ে গাছের নিচে আশ্রয় নেবার কোন মানে হয় না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ধীরে সুস্থে এগুনোই ভাল। মেসে পৌঁছলাম। কাকভেজা হয়ে।

ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে মেসবাড়ি অন্ধকার। সিঁড়ি ঘরের ছাদ হয়নি বলে বৃষ্টি হলেই সিঁড়ি ভিজে থাকে। খুব সাবধানে রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। কয়েক পা এগুতেই সিঁড়িতে টর্চের আলো পড়ল। সিড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আলো ফেলেছেন বায়েজিদ সাহেব। আমি হাল্কা গলায় বললাম, কি ব্যাপার , বায়েজিদ সাহেব এখনো জেগে আছেন?

'আপনার জন্যে জেগে আছি।'

'কেন বলুন তো?'

'দুপুর বেলায় আপনার বন্ধু এসেছিলেন; রফিক সাহেব। উনি রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেলেন। উনার মা মারা গেছেন এ খবরটা দিতে এসেছিলেন।'

'কিভাবে মারা গেলেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি কিছু বললেন না। উনি প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না।'

আমি ঘরে ঢুকলাম না। ভেজা কাপড়ে ঘরে ঢুকে লাভ নেই। আবার ভিজতে হবে। বায়েজিদ সাহেব নিচু গলায় বললেন, আপনি এখন নারায়নগঞ্জ যাবেন?

'জী।'

‘এত রাতে তো বাস টাস কিছু পাবেন না। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে।’
‘হেটে চলে যাব।’
‘এখুনি কি রওনা দেবেন?’
‘হ্যাঁ এখুনি, দেরি করে লাভ নেই। রফিক অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।’
বায়েজিদ সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার ঘরে কেরোসিন কুকার আছে। এক কাপ গরম চা বানিয়ে দেই। চা খেয়ে যান। শরীরটা গরম থাকবে।
‘আচ্ছা বানান, এক কাপ খাই। রফিক শুধু তার মা'র মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে, আর কিছুই বলেনি?’
‘জ্বি-না।’
আমি আবার রাস্তায় নামলাম, রাত একটা দশ মিনিট। ঘোর দুর্যোগ। ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় একহাঁটু পানি। পানি ভেঙ্গে এগুচ্ছি। চরম দুর্যোগে মানুষকে একা পথে চলতে দেখলে কোত্থেকে একটা কুকুর এসে তার সঙ্গি হয়। ব্যাপারটা আমি আগেও অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আজ আবার করলাম। আমি হাঁটছি। আমার পেছনে পেছন আসছে যমের অরুচি টাইপ কুকুর। আমি থামলে সেও থামে, আমি চলতে শুরু করলে সেও চলে।

৭

রফিকদের একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। মৃত বাড়ির এক ধরণের চরিত্র আছে। অনেক দূর থেকে বোঝা যায় এই বাড়ির একজন কেউ নেই। যত রাতই হোক বাড়ির লোকজন জেগে থাকে। সবার চোখে-মুখে দিশাহারা ভাব থাকে। এরা হাঁটা চলা করে নিঃশব্দে, কিন্তু কথা বলে উচুগলায়। গলার স্বরও বদলে যায়। যে কারণে চেনা মানুষ কথা বললেও মনে হয় অচেনা কেউ। যে কথা বলে সে নিজেও নিজের গলার স্বরে চমকে চমকে ওঠে। মৃত বাড়িতে কখনো বিড়াল থাকে না। এরা নিঃশব্দে বিদেয় হয়। আবার যখন সব শান্ত হয়ে আসে, এদের দেখা পাওয়া যায়।
রফিকের এটা নিজেদের বাড়ি। আত্মীয়স্বজন সব এবাড়িতেই আসবে, এটাই স্বাভাবিক। বাড়ি অন্ধকার। বাইরে বারান্দায় বেঞ্চের উপর একটা বিড়াল শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে না। মাথা উচু করে সম্ভবত বৃষ্টি দেখছে। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর বাতি জ্বলল। দরজা খুলে দিল যুথী। শাশুড়ির মৃত্যুতে একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হয়—সে বাপের বাড়ি থেকে এসেছে এবাড়িতে।
মনে হচ্ছে সেও ঘুম থেকে উঠে এসেছে।
যুখী ক্লান্ত স্বরে বলল, ভেতরে আসুন। ও ঘুমুচ্ছে। তিনদিন, তিনরাত কেউ এক পলকের জন্যেও ঘুমুতে পারিনি। যা ঝামেলা গেছে! ইস, ভিজে টিজে কি অবস্থা! এত রাতে আসার দরকার ছিল না।
আমি বললাম, কবর দেয়া হয়ে গেছে?
‘জ্বি, বাদ আছর কবর হয়েছে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা এসেছিলেন সব রাত আটটার মধ্যে চলে গেছেন। এই বাড়িতে এখন শুধু আমি আর আপনার বন্ধু আছে। আর

কেউ নেই। একটা কাজের লোক ছিল, মার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি হল তখন সে আমাদের টিভিটা নিয়ে পালিয়ে গেল।'

যুখী কথা বলছে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যেন মৃত্যু কিছুই না। আলাদা গুরুত্ব পাবার মত ঘটনা না। একজন মারা গেছে, তাকে কবর দেয়া হয়েছে। ব্যাস, ফুরিয়ে গেল । যুখী হাই তুলতে তুলতে বলল;

'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট বার ইঞ্চি টিভি। বিয়ের সময় আমার যে মামা সিঙ্গাপুরে থাকেন উনি প্রেজেন্ট করেছিলেন। খুব সুন্দর ডিজাইন ছিল। ভায়োলেট কালার। নবগুলি সোনালি। চোর নিয়ে গেছে, কি আর করা যাবে বলুন! কিন্তু মা'র আফসোস যদি দেখতেন। মরবার আধঘণ্টা আগেও আমাকে বললেন, ও বৌমা, টিভিটা যে নিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনি এত অস্থির হবেন না মা। ও আরেকটা কিনে নেব। মা বললেন, ও কোত্থেকে কিনবে? ওর কি চাকরি আছে?'

তওবা করবার জন্যে এক মৌলানা সাহেবকে ডেকে এনেছিলাম। মা ঠিকই তওবা করলেন। ইশারায় দুরাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর মৌলানা সাহেবকে বললেন, হুজুর আমাদের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে। দোয়া কালাম দিয়ে কিছু করা যাবে?

মানুষ মরবার সময় আল্লাহর নাম নিতে নিতে মারা যায়। আম্মা টিভির জন্যে আহজারি করতে করতে মারা গেলেন। বুঝলেন হিমুদা, ওর যদি টাকা থাকতো ওকে বলতাম একটা টিভি কিনে আনতে। একটা টাকা নেই ওর কাছে। রাস্তায় যে ভিখিরীরা থাকে ওদের কাছেও পাঁচ দশ টাকা থাকে। ওর কাছে তাও নেই। আমার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে এখানকার খরচ সামলালাম। খরচও তো কম না। হিমুদা, আপনি বাথরুমে ঢুকে গোসল করে নিন। সাবান গামছা আছে। মরা বাড়ি। চুলা ধরানোর নিয়ম নেই। আমি খবরের কাগজ জ্বালিয়ে আপনাকে এককাপ চা করে দি। আপনি গোসল করে ওর একটা লুঙ্গি পরে ফেলুন। লুঙ্গি অবশ্যি ধোয়া নেই, ময়লা। ময়লা লুঙ্গি পরতে যদি ঘেন্না লাগে তাহলে আমার একটা সুতির শাড়ি লুঙ্গির মত পেচিয়ে পরতে পারেন। নতুন শাড়ি। আমি এখনো পরিনি।

'আমাকে লুঙ্গিই দিন।'

বাথরুম থেকে বের হয়ে চমৎকৃত হলাম। এর মধ্যেই যুথী চা বানিয়ে ফেলেছে। মেঝেতে পাটি পেতে চায়ের কাপ, একবাড়ি মুড়ি, এক গ্লাস পানি সাজানো।

'হিমুদা, একথাল মুড়ি খান, ঘরে আর কিছুই নেই। চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে কি-না দেখুন। আপনি তো আবার চায়ে চিনি বেশি খান।'

'চা খুব ভাল হয়েছে।'

'ওকে কি ডেকে তুলব? আপনি এসেছেন দেখলে সে বড় খুশি হত। অবশ্যি ওর খুশি বোঝা খুব মুশকিল। ও খুশি না ব্যাজার সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমিও পারি। ও সবচে' খুশি হয় কখন জানেন? যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। আর কি যে ভরসা আপনার উপর। ওর ধারণা, আপনি সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। আমার বড় মামা যিনি সিঙ্গাপুর থাকেন, তিনি এসেছিলেন। ওকে ডেকে বললেন, চাকরিটা পাওয়া যায় কিনা দেখ। না পাওয়া গেলে বিকল্প কিছু চিন্তা কর। ছোটাছুটি কর। চুপচাপ বসে থাকলে তো হবে না। ও কি বলল জানেন? ও বলল, হিমুকে বলেছি। ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। আপনি কি কিছু করতে পেরেছেন?'

‘চেষ্টা করছি।’

‘ভাইয়া বলে চেষ্টা-চেষ্টায় কিছু হবে না। আর হলেও ঐ চাকরি টিকবে না। সাব-হউমেন স্পেসিসকে কে চাকরিতে রাখবে? দুদিন পরে আবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে?’

‘আপনার ভাইয়ার কথা ঠিক না।’

‘ভাইয়ার কথা সব ঠিক হয়। ভাইয়া না ভেবে চিন্তে কিছু বলেন না। এই বিয়েতে ভাইয়ার কোন মত ছিল না। ভাইয়া ওকে দেখেই বলেছিলেন, যে-পুরুষ দেখতে সুন্দর সে কখনো কাজের হয় না। ভাইয়ার কথা আমাদের পরিবারে কেউ ফেলে না। তারপরেও কি করে যেন এই বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর ভাইয়া বলল, তোর হাসবেন্ড কি করে চাকরি করছে কে জানে। বেশিদিন চাকরি করতে পারার তো কথা না। দেখবি, হুট করে চাকরি চলে যাবে। তুই পড়বি দশহাত পানির নিচে। হলও তাই।’

আমি বললাম, রফিকের ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ কি আপনার ভাই এখনো দিচ্ছেন?

‘এখন সবই দিচ্ছে। আমার মামাও সেদিন বললেন। মামা খুব বড় লোক তো, তাঁর কথা কেউ ফেলবে না। বড়লোকদের অন্যায় কথাও মনে হয় ন্যায়।’

‘তা হলে তো সমস্যা।’

‘শুধু সমস্যা, বিরাট সমস্যা। ভাইয়া বলছিলেন, তোর এখনো ছেলেপুলে হয়নি। তুই একা আছিস । কোন বন্ধন নেই। এখনও তুই ভাল চিন্তা করতে পারিস। নয়ত পরে খুব আফসোস করবি। তোর হাসবেন্ড মানুষ না। সাব-হিউমেড স্পেসিস। তার বুদ্ধি শিপাঞ্জির বুদ্ধির চেয়ে খানিকটা বেশি। এখনও সময় আছে।’

‘কিসের সময় আছে?’

‘আলাদা হয়ে যাবার সময়। ভাইয়া বলছে একটা হাফম্যানের সঙ্গে জীবন কাটাতেই হবে এমন তো কথা না।’

‘আপনারও কি ধারণা রফিক হাফম্যান?’

‘আমি জানি না। তবে ভাইয়া সব সময় সত্যি কথাই বলে।’

‘রফিক কি আপনাকে প্রচণ্ড রকম ভালবাসে না?’

‘ও কি করে ভালবাসতে হয় তা-ই জানে না। চুপচাপ বসে থাকা কি ভালবাসা? তবু ভাইয়াকে আমি মিথ্যা করে বলেছি ও আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। ভালবাসার কথা বড়ভাইকে বলা লজ্জার ব্যাপার, তবু বললাম।’

‘তিনি কি বললেন?’

ভাইয়া বলল, ‘কুকুর বিড়ালও তো মানুষকে ভালবাসে। ভালবাসা কোন ব্যাপার না।’

‘আপনি আলাদা হয়ে যাবার কথা ভাবছেন না তো?’

‘যখন ভাইয়ার কথা শুনি, তখন তার কথাই ঠিক মনে হয়। আবার যখন ওকে দেখি এত মায়া লাগে!’

আমি যুখীর দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, একটা গোপন কথা বলছি, আপনাদের দুজনের একসঙ্গে থাকা ভয়ংকর জরুরি।

‘জরুরি কেন?’

‘আপনাদের দু’জনকে নিয়ে প্রকৃতির বড় ধরনের কোন পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয়, আপনারা জন্ম দেবেন এমন একটি শিশু, যে ভুবনবিখ্যাত হবে।’

যুখী একই সঙ্গে অবিশ্বাসী ও আনন্দিত গলায় বলল, এসব কে বলল আপনাকে?

'কেউ বলেনি। আমি অনুমান করছি। আপনাদের দু'জনের চরিত্রে কোন মিল নেই আবার একইসঙ্গে অসম্ভব মিল। ও আপনাকে যে পরিমাণ ভালবাসে আপনিও তাকে ঠিক সেই পরিমাণ ভালবাসেন। আবার ভালবাসেনও না। আবার দু'জনের চরিত্রে এক ধরনের নির্লিপ্ততা আছে। যেন কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। চোরের টিভি নিয়ে যাওয়া এবং বাড়ির প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু—দুটি ঘটনা আপনাদের কাছে এক রকম। মায়ের মৃত্যুতে রফিক নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করেনি?

'না করেনি।'

'আপনি যে নিজ থেকে চলে এসেছেন এই নিয়েও সে নিশ্চয়ই কোন মাতামাতি করেনি।'

'মাতামাতি করা ওর স্বভাব না। মা মারা গেছে, একফোটা চোখের জল নেই। আরাম করে ঘুমাচ্ছে।'

'আপনিও শুয়ে পড়ুন। তিনদিন তিনরাত ঘুম হয়নি। নিশ্চয়ই আপনার ও ঘুম পাচ্ছে। আর আমার কথা হেলাফেলা করে ফেলে দেবেন না। আমার ইনট্যুইশন ক্ষমতা খুব ভাল। আপনাদের দু'জনের ব্যাপারে যা বলছি তা শুধু অনুমান থেকে বলছি না, ইনট্যুইশন থেকে বলছি। আপনি ওকে ছেড়ে যাবেন না।'

'ছেড়ে তো যাচ্ছি না। ছেড়ে যাবার কথা বলছেন কেন?'

'রফিকের চাকরি-বাকরি নেই। ও এখন নানান অভাব অনটনের মধ্যে থাকবে। আপনার ভাইয়া ক্রমাগত আপনাকে বুঝিয়ে যাবেন, এই জন্যেই বলছি। প্রকৃতির সুন্দর একটা পরিকল্পনা নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'যুথী গম্ভীর গলায় বলল, পরিকল্পনা যদি প্রকৃতির হয় তাহলে তো প্রকৃতিই সেই পরিকল্পনা নষ্ট হতে দেবে না।'

'প্রকৃতি তার পরিকল্পনা ঠিক রাখার চেষ্টা খানিকটা করে - বেশি না। দু'জন স্বাধীন মানুষকে প্রকৃতি দড়ি দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে রাখবে না।'

যুথী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল। রফিকের ঘুম ভাঙল হাসির শব্দে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে এল। আমাকে দেখে মোটেই বিস্মিত হল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। সে আমার সামনে বসতে বসতে বলল, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তুই মোটেই দুঃস্বপ্ন দেখিস নি। সুবেহ সাদেকের সময় কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে না। রফিক শুকনো মুখে বলল, আমি তো দেখলাম। মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বলল, এই রফিক তোর তো চাকরি বাকরি কিছু হবে না। তুই খাবি কি? বৌমা সঙ্গে থাকলেও একটা কথা ছিল। সেও থাকবে না।

আমি আবার বললাম, সুবেহ সাদেকের সময় কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে না। তোর ঠিকই চাকরি হবে আর যুথীও তোকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

'স্বপ্নটা এত স্পষ্ট। মা আমার বিছানার পাশে বসেছিল। আমার বাঁ হাতটা ধরেছিল।'

যুথী আবারো খিলখিল করে হেসে উঠল। কে বলবে আজই এ বাড়িতে একজন মানুষ মারা গেছে। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বোধহয় বিড়ালটা ঘরে ঢুকেছে। সম্ভবত সে বুঝতে পারছে এ বাড়িতে এখন আর মৃতের ছায়া নেই।

৮

পত্রিকার প্রথম পাতার খবর ছাপা হয়েছে। শিরোনামঃ মন্ত্রী অপসারিত। তদন্ত টিম ।

মোবারক হোসেন সাহেবের যে ছবি হয়েছে তা দেখে সবার মনে হতে পারে, তিনি অপসারিত হওয়ার কারণে খুব সুন্দর আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর মুখ হাসিতে ভরা। ডান হাতের দুটি আঙ্গুলে বিজয়ের 'ভি চিহ্ন দেখাচ্ছেন। সাংবাদিকদের রসবোধ প্রবল। বেছে বেছে এই ছবিটিই তারা ছেপেছে।

ভেতর খবরের সঙ্গে বিজয়ের 'ভি চিহ্ন মোটেই সম্পর্কিত নয়। খবর হল— মোবারক হোসেন মন্ত্রী থাকাকালিন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। দুনীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন। সরকার এই সমস্ত অভিযোগ তদন্তের জন্যে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছেন। মন্ত্রীর পাসপোর্ট আটক করা হয়েছে এবং তাঁর দেশত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

জমাট খবর। বিশেষ প্রতিবেদকের নেয়া ইন্টারভুয ছাপা হয়েছেঃ

প্রতিবেদকঃ আপনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি?

মোবারকঃ আটাচল্লিশ ঘণ্টা পর আপনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছেন?

প্রতিবেদকঃ খবর শোনার পর পর আপনার মনের অবস্থা কি হয়েছিল?

মোবারকঃ বিস্মিত হয়েছিলাম।

প্রতিবেদকঃ দুঃখিত হন নি?

মোবারকঃ দুঃখিত হবার কারণ ঘটেনি। মন্ত্রীত্ব এমন লোভনীয় কিছু না।

প্রতিবেদকঃ মন্ত্রীত্ব লোভনীয় না হতে পারে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হতে পারে।

মোবারকঃ হতে পারে বলছেন কেন? অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হওয়াটাই কি অবশ্যম্ভাবী নয়?

প্রতিবেদকঃ আপনার কি ধারণা, অভিযোগ প্রমাণিত হবে?

মোবারকঃ অভিযোগ কি তাই এখনো জানি না। জানলে বুঝতে পারতাম অভিযোগ প্রমাণিত হবে কি-না।

প্রতিবেদকঃ আপনার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এটা কি সত্য?

মোবারকঃ সত্য নয়। আমার পাসপোর্ট আমার সঙ্গেই আছে। সঙ্গে না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই মুহুর্তে দেশের বাইরে যাবার আমার কোন ইচ্ছা নেই।

প্রতিবেদকঃ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কি?

মোবারকঃ ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এর বেশি কিছু না।

প্রতিবেদকঃ আপনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবার কথা ভাবছেন,

এটা কি সত্যি?

মোবারকঃ আমি নিজে কি ভাবছি না ভাবছি তা আমার চেয়ে সাংবাদিকরা বেশি জানেন বলে সব সময় লক্ষ্য করেছি। কাজেই কিছু বলতে চাচ্ছি না।

ইন্টারভ্যু এখানে শেষ হলেও ‘স্টোরি’ শেষ না। প্রতিবেদক এর পরেও কিছু লিখেছেন। যেমন,

প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। যদিও এই আপাতঃখুশির পুরোটাই যে অভিনয় তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। কারণ এই প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়ের পারিবারিক জীবনেও সংকট দেখা যাচ্ছে। তাঁর একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ নিখোঁজ। ব্যাপক অনুসন্ধানেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর পুত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন – “নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করব না।” প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়ের স্ত্রীও গুরুতর অসুস্থতার কারণে সম্প্রতি গুলশানের এক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর একমাত্র কন্যাও মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি দীর্ঘদিন যাবত একজন মনোবিশ্লেষণ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, তার অসুস্থতা সম্প্রতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

খবরের কাগজের কোন খবর দ্বিতীয়বার পড়া যায় না। এটাই আমি দ্বিতীয়বার পড়লাম। দ্বিতীয়বার পড়ে মনে হল, প্রতিবেদক সাক্ষাৎকারে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। মোবারক হোসেন সাহেব তাঁকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলেন। সেই শোধ তিনি নিয়েছেন কন্যার অসুস্থতার খবর দিয়ে। সত্যের সঙ্গে খানিকটা মিথ্যা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

“দশটি সত্যের সঙ্গে একটা মিথ্যা মিশিয়ে দাও, দেখবে মিথ্যটি সত্য বলে মনে হবে। কেউ এই মিথ্যা আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু দশটি মিথ্যার সঙ্গে যদি একটি সত্যি মিশাও তাহলেও কিন্তু সত্য সত্যই থাকবে। মিথ্যা হবে না।”

এটা আমার বাবার বাণী নয়, এটা আমার নিজের কথা। এসব এখনো পরীক্ষার পর্যায়ে আছে। পরীক্ষা শেষ হলে আমি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হই, তাহলে লিখে ফেলা যাবে।

মোবারক হোসেন সাহেবের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। কখন যাব বুঝতে পারছি না। সবচে'ভাল হয় গভীর রাতে উপস্থিত হলে। রাত দশটায় কোন বিশিষ্ট মানুষের বাড়িতে গেলে সম্ভাবনা প্রায় একশ’ভাগ যে বলা হবে এত রাতে উনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। এগারোটার দিকে গেলে বলা হবে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু রাত একটার উপস্থিত হলে সম্ভাবনা প্রায় নব্বই ভাগ যে বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বিগ্ন মুখে উঠে আসবেন। কাজেই গভীর রাতের দিকে যাওয়াই ভাল।

আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম , বড় ফুপার অফিসে যাব। মাসের এক তারিখ। টাকাটা নিয়ে আসা দরকার। টাকা পেলে এ মাসেও ফুপার বাড়িতে যাব না।

ফুপা অফিসে ছিলেন। আমাকে দেখে বিরস গলায় বললেন , এসো এসো । মনে মনে তোমাকে এক্সপেক্ট করছিলাম।

'টাকা নিতে এসেছি, ফুপা।'

'বুঝতে পারছি। টাকার কথা সবারই মনে থাকে। সৎসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের সবচে বেশি মনে থাকে। বোস চা খাও।'

'আপনার সামনাসামনি বসব, না খানিকটা দূরে বসব?'

'সামনেই বস।'

আপনি ভাল আছেন তো ফুপা?'

'ভাল আছি। বাসার অন্য সবাইও ভাল আছে। কাজেই সামাজিক প্রশ্ন-উত্তরপর্ব শেষ। চা কি দিতে বলব?'

'কফি দিতে বলুন। বড়দরের কোন অফিসারের কাছে গেলে কফি খেতে ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে করলেও খেতে পারবে না। কফি নেই।'

'বেশ, তাহলে চা।'

ফুপা চায়ের কথা বললেন। তার সেক্রেটারিকে বললেন, খানিক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন। কেউ যেন না আসে। ফুপার মুখ থেকে বিরস ভাবটা কেটে যেতে শুরু করেছে।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

ফুপা ভুরু কুঁচকে বললেন, স্যার বলছ কেন? তোমার উদ্রট ধরনের রসিকতা আমার সঙ্গে কখনো করবে না। আমি তোমাকে গোটাদশকে প্রশ্ন করব। তুমি হ্যাঁ এবং না' এর মধ্যে জবাব দেবে।

'সব প্রশ্নের জবাব তো ফুপা হ্যাঁ এবং না দিয়ে দেয়া যায় না।'

'আমি এমনভাবে প্রশ্ন করব যেন 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে জবাব দেয়া যায়।'

'ফুপা, কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে 'হ্যাঁ না দিয়ে জবাব দিলেও জবাব সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমি এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি যার জবাব হ্যাঁ না দিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু জবাব হয় না।'

'উদাহরণ দাও।'

'যেমন ধরুন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আগে যেমন চুরি করতেন এখনো কি করেন? এর উত্তর কি 'হ্যাঁ এবং না' দিয়ে হবে? আপনি যদি বলেন না, তার মানে হবে এখন আপনি চুরি করেন না ঠিকই কিন্তু আগে করতেন।'

'চুপ কর।'

'জ্বি ফুপা, চুপ করলাম।'

'তোমার টাকা আলাদা করে রেখেছি, নিয়ে যাও।'

'থ্যাংকস।'

চা দিয়ে গেছে। ফুপা গম্ভীর মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে ওষুধ খাচ্ছেন। অথচ চা-টা ভাল হয়েছে। এসি লাগানো ঠাণ্ডা ঘরে বসে গরম চা খাওয়ার আনন্দই আলাদা ।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'তুমি কি মিথ্যা কথা বল?'

'আগে কম বলতাম, এখন একটু বেশি বলি।'

'কেন বল?'

‘একটা পরীক্ষা করছি ফুপা। দশটা সত্যের সঙ্গে একটা মিথ্যা বলে পরীক্ষা করছি সত্যের ক্ষমতা কেমন। এক ধরনেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা...’

‘থাম।’

‘আমি থামলাম। ফুপা ড্রয়ার থেকে খাম বের করলেন। তিনি টাকা ঠিকই আলাদা করে রেখেছেন। খামের উপর আমার নাম লেখা।

‘হিমু।’

‘জ্বি।’

‘মিথ্যা বলবে না। যা জিজ্ঞেস করব সত্যিই জবাব দেবে। তুমি আমার বাড়িতে যাওনি ঠিকই কিন্তু আমার ধারণা বাদল এর মধ্যে কয়েকবার তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সত্যি না মিথ্যা?’

‘আংশিক সত্য। কয়েকবার আসেনি। একবার এসেছে। তবে বেশিক্ষণ ছিল না। অল্প কিছু সময় ছিল।’

‘আমরা ধারণা, এই আধঘণ্টা তুমি তাকে গাছ বিষয়ক কোন বক্তৃতা দিয়েছে।’

‘আপরার ধারণা, সত্যি। আমি গাছের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা ওকে বলেছি। আফ্রিকান জুলু জাতির মধ্যে এক ধরনের নিয়ম প্রচলিত। গুরুতর অসুস্থ কোন মানুষ শেষ চিকিৎসা হিসেবে স্বাস্থ্যবান কোন গাছকে জড়িয়ে ধরে দিনের পর দিন পড়ে থাকে। তাদের ধারণা, এতে গাছ তাকে জীবনীশক্তি দেয়। প্রায় সময়ই দেখা যায় স্বাস্থ্যবান গাছটা রোগগ্রস্ত হয়, মানুষটা সেরে উঠে।’

ফুপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। ও আইডিয়া পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। কয়েকদিন ধরেই দেখছি ও আমাদের বাড়ির পেছনের আমগাছটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? জবাব দেয় না, হাসে।

‘ওর তো কোন অসুখ-বিসুখ নেই। শুধু শুধু গাছ জড়িয়ে ধরে আছে কেন?’

‘অসুখ-বিসুখ নেই বলছ কেন? ওর অসুখ ওর মাথায়। ওর ব্রেইন ডিফেক্ট।’

আমি নিচু গলায় বললাম, ব্রেইন ডিফেক্টের ক্ষেত্রে গাছে চিকিৎসায় লাভ হবে কি-না কে জানে। কাজ হলে একটা ইন্টাররেস্টিং ব্যাপার হবে। দেখা যাবে, বাদল সুস্থ হয়ে গেল কিন্তু গাছটার হয়ে গেল ব্রেইন ডিফেক্ট।

‘হিমু, তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছ?’

‘জ্বি না, ফুপা। আমি সিরিয়াসলি ভাবছি—গাছের ব্রেইন ডিফেক্ট হয় কি না। যদি হয় তাহলে গাছ কি করে?’

‘শোন হিমু, তোমার কাছে আমি আরেকটা প্রপোজাল দিচ্ছি।’

দিন।’

‘তুমি এই মেস ছেড়ে দিয়ে অন্য মেসে যাও, যাতে বাদল তোমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। পাঁচশ'র বদলে আমি তোমাকে এক হাজার করে টাকা দেব। শুধু তাই না। আই উইল রিমেইন এভারগ্রেটফুল। ছেলেটাকে তোমার ইনফ্লুয়েন্স থেকে বাঁচাতে হবে। সবচে’ ভাল হত যদি তোমাকে সারিয়ে তোলা যেত। এতে সমাজের একটা উপকার হত। আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হবার কথা ভাব?’

‘প্রায়ই ভাবি।’

‘তাহলে বিয়ে করে ফেল। বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি দেব। একটা শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে কর। আমি মেয়েটার জন্যে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দিব। তোমরা

দুজন আমার বাড়িতে থাকতে পার। একতলার দুটা ঘর আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে দেব। ধীরে সুস্থে তোমরা আলাদা সংসার শুরু করবে।'

'প্রস্তাব খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে ফুপা।'

'আমি শুধু যে প্রস্তাব দিচ্ছি তাই না—আই মিন ইট। তোমার যে একজন পরিচিত মেয়ে আছে— রুপা, ও কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'

'বুঝতে পারছি না। কখনো জিজ্ঞেস করি নি।'

'তহলে জজ্ঞেস কর। এখনই কর। টেলিফোন নাম্বার জানা আছে?'

'আছে।'

'Then call her. ask her.'

ফুপা টেলিফোন সেট এগিয়ে দিলেন। আমি হালকা গলায় বললাম, এত তাড়া কিসের ফুপা?

'তাড়া আছে। তুমি টেলিফোন কর। আমার সামনে কথা বলতে তোমার যদি অস্বস্তিবোধ হয় আমি উঠে যাচ্ছি।'

'আপনাকে উঠতে হবে না।'

রুপাকে পাওয়া গেল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কেমন আছ রুপা? সে অনেক্ষণ কোন কথা বলল না।

'হ্যালো রুপা?'

'বল,শুনছি।'

'পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?'

'ভাল।'

'কি রকম ভাল?'

'বেশ ভাল। তুমি হঠাৎ এতদিন পর টেলিফোন করলে কি মনে করে?'

'জরুরি কাজে টেলিফোন করলাম।'

'আমার সঙ্গে তো কোন জরুরি কাজ থাকার কথা না।'

'রেগে রেগে কথা বলছ কেন, রুপা?'

'রেগে রেগে কথা বলার কারণ আছে বলেই রেগে রেগে বলছি। তুমি তোমার আস্তানা আবার বদলেছ। পুরানো ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে আমি হতভম্ব। তুমি যে ঘরে থাকতে সেখানে গুণ্ডা ধরনের এক লোক লাল রঙের একটা হাফপেন্ট পরে শুয়েছিল। আমি হতভম্ব। কি যে ভয় পেয়েছিলাম! তোমার কি উচিত ছিল না আমাকে ঠিকানা বদলের ব্যাপারটা জানানো?"

'অবশ্যই উচিত ছিল।'

'তোমার কি উচিত ছিল না আমার জন্মদিনে আসা? আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। থাক এসব, এখন তোমার জরুরি কথা বল।'

'রূপা, তুমি কি বিয়ের কথা ভাবছ?'

'কি বললে?'

'তুমি বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছ না-কি?'

'পরিষ্কার করে বল কি বলতে চাও?'

'জানতে চাচ্ছিলাম—আমি যদি তোমাকে বিয়ের কথা বলি, তুমি কি রাজি হবে? অল্প কথায় উত্তর দাও। কুইজ ধরনের প্রশ্ন। হ্যাঁ অথবা না।'

রূপা শীতল গলায় বলল, তোমার এ জাতীয় রসিকতার আমার ভাল লাগে না।

তুমি যে জীবন যাপন কর তাতে এ ধরনের রসিকতার হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আমার জীবনে নেই। তুমি নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট তোমার জীবন নিয়ে করতে পার। আমি পারি না।

'তুমি আসল প্রশ্নের উত্তর দাও নি।'

'সত্যি যদি উত্তর চাও তাহলে বলছি—তুমি চাইলে আমি রাজি হব। আমি জানি তা হবে আমার জীবনের সবচে বড় ভুল। তারপরেও রাজি হব। আমি যে রাজি হব তাও কিন্তু তোমার জানা।'

'আচ্ছা রূপা রাখি, কেমন?'

টেলিফোন নামিয়ে আমি করুণ চোখে ফুপার দিকে তাকালাম। ফুপা বললেন, মেয়ে কি বলল? আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হেসে ফেলল। এখনো বোধহয় হাসছে। আপনরা কথায় টেলিফোন করতে গিয়ে আমি একটা লজ্জার মধ্যে পড়লাম। রূপা এমনভাবে হাসছে যেন পাগলের প্রলাপ শুনল। ফুপা আজ উঠি?

ফুপা ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ তারিখ কত?

'আজ হল আপনার ২২ চৈত্র।'

'বাংলা তারিখ দিয়ে কি করব? ইংরেজীটা বল।'

'এপ্রিলের পাঁচ তারিখ ।'

'দিন তারিখ কি সব মুখস্থ থাকে?'

'সব দিন থাকে না। আজকেরটা আছে। আজ পূর্ণিমা। প্রতিপাদ শুরু হবে ১/১৫/৫৫-এ'.

'প্রতিপাদ ব্যাপারটা কি?'

ব্যাপারটা কি বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ফুপা আমাকে থামিয়ে দিলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, তুমি যাও। পূর্ণিমা দেখ গিয়ে। ভাল করে দেখ।

আসলেই অনেকদিন পূর্ণিমা দেখা হচ্ছ না। জোছনা রাতে পথে বের হলেই পূর্ণিমা দেখা যায় না। তার জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি লাগে।

পূর্ণিমা দেখতে হলে শরীর হালকা করতে হয় । সারাদিন কখনো গুরুভোজন করা যাবে না। অল্প আহার – ফলমূল, দুধ। দিনে কখনো চোখ মেলা যাবে না। সূর্যলোক দেখা বা গায়ে রোদ লাগানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। চাঁদ আকাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলে তবেই চোখ মেলা যাবে। তবে তার আগে বরফ-শীতল পানিতে গোসল করে নিতে হবে। পূর্ণিমা দেখতে হবে বনে গিয়ে। আশেপাশে ইলেকট্রিকের আলো, কুপির আলো বা মোমের আলো কিছুই থাকবে না। জোছনা দেখা যাবে, তবে চাঁদের দিকে একবারও তাকানো যাবে না। সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকতে পারবে না।

এমন কঠিন নিয়ম-কানুনে এখনো জোছনা দেখা হয়নি। তাছাড়া এভাবে জোছনা দেখা দুর্বলচিত্ত মানুষের জন্যে নিষিদ্ধ। এরা সৌন্দর্যের এই রূপ সহ্য করতে পারে না। প্রচণ্ড ভাবাবেশ হয়। যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। জোছনার অলৌকিক জগতে একবার ঢুকে গেলে লৌকিক জগতে ফিরে আসা নাকি কখনোই সম্ভব হয় না।

খুব শিগগিরই এক রাতে জোছনা দেখতে যাব। এদিকের কাজটা একটু গুছিয়ে নেই। রফিকের সমস্যাটা মিটে যাক। মনে অশান্তি রেখে চন্দ্রস্নাত পৃথিবী দেখার নিয়ম নেই।

বেল টিপতেই মোবারক হোসেন সাহেব নিজেই দরজা খুলে দিলেন। সহজ গলায় বললেন এস হিমু। যেন তিনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সাধারণ মানুষ থেকে মন্ত্রী পর্যায়ে উঠা খুব কঠিন, কিন্তু নেমে আসাটা অত্যন্ত সহজ। মোবারক সাহেবকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। উনার পরণে সাদা লুঙ্গি। খালি গা। কাঁধে ভেজা গামছা।

তিনি সহজ গলায় বললেন, শরীরটা তেতে আছে। ভিজে গামছা দিয়ে রাখলাম। এতে শীরর ঠাণ্ডা থাকে। কোন খবর আছে হিমু?

'না কোন খবর নেই। আপনার খবর নিতে এসেছি।'

'আমার খবর নেবার জন্যে তো বাড়িতে আসার দরকার পড়ে না। পত্রপত্রিকায় রোজই কিছু না কিছু বেরুচ্ছে। পত্রিকা পড় না?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।'

'আমার খবর সব আপ-টু-ডেট জান তো?"

'কিছু কিছু জানি।'

'ব্যাংক একাউণ্ট ফ্রাজ করা হয়েছে, এটা জান?'

'না।'

ব্যাংক একাউণ্ট ফ্রীজ করা হয়েছে। বুদ্ধিমান লোক মাঝে মাঝে প্রথম শ্রেণীর বোকার মত কাজ করে, আমিও তাই করেছি। টাকা-পয়সা অনেক ব্যাংকেই ছিল। ছিল আমার নিজের নামে। কিছু যে অন্যের নামে রাখা দরকার, কিছু ক্যাশ দরকার, এটা কখনো মনে হয়নি।'

'আপনার ব্যাংকে কত টাকা আছে?'

জবাব দেবার আগে মোবারক সাহেব কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, পাঁচ কোটি টাকার মত।

আমার ঠিক আগের মত বারান্দায় বসলাম। মোবারক হোসেন সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে মোড়ায় পা তুলে দিলেন। তিতলীকে ডেকে বললেন টক দৈ দিতে।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

'পাঁচ কোটি টাকা আছে জানার পরেও তুমি দেখি তেমন অবাক হওনি। পাঁচ কোটি টাকা যে কত টাকা সে সম্পকে বোধহয় তোমার ধারণা নেই।'

'অনেক টাকা বুঝতে পারছি।'

'পারছ বলে মনে হয় না। অনেক তো বটেই । সেই অনেকটা কত অনেক তা কি জান? পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে কি করা যায় বল তো?'

'পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দিয়াশলাই কেনা যায়। একটা দেয়াশলাইয়ের দাম এক টাকা। তবে একসঙ্গে এত টাকার দেয়াশলাই কিনলে কিছুটা বোধহয় সস্তায় দেবে। আট আনা পিস পাওয়া যেতে পারে। তাহলে দশ কোটি দেয়াশলাই পাওয়া যাবে। এই জীবনে আর দেয়াশলাই কিনতে হবে না।'

'তুমি ব্যাপারটাকে ফানি সাইডে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছ। ফানি সাইডে নেবার দরকার নেই–পাঁচ কোটি টাকা যে কি পরিমাণ টাকা আমি অন্যভাবে তোমাকে ধারণা দেই। ধর, টাকাটা তুমি যদি শুধু ব্যাংকে রেখে দাও তাহলে কি হবে? ফিফটিন পারসেন্ট রেটে ইন্টারেস্ট কত আসে? মনে মনে হিসাব করতে পার। ফাইভ টাইমস ফিফটিন, ডিভাইডেড বাই...'

আমি তাকিয়ে আছি । মোবারক হোসেন সাহেব চোখ বন্ধ করে হিসেব করে

যাচ্ছেন। তিতলী যখন এসে বলল, বাবা দৈ নাও, তখন বিরক্ত মুখে চোখ মেললেন। তাঁর হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। অসময়ে আসার জন্যে তিনি মেয়ের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। তিতলী বলল, বাবা, আমি তোদের সঙ্গে বসব?

‘ আমাদের সঙ্গে বসার দরকার কি?’

‘বারান্দায় চা দিতে বলেছি এই জন্যেই বসতে চাচ্ছি।’

সে আমার মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসল। বাবাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমাকে বলল, ভাইয়ার কোন খোঁজ পেয়েছেন?

‘না।’

‘খোঁজার চেষ্টা করেছেন?’

‘না, তাও করিনি।’

‘এই সত্যি কথাটি যে বললেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। এসেছেন কি জন্যে? আমাদের দুর্দশা দেখতে?’

আমি সহজ গলায় বললাম, আমি আসলে একটা সুপারিশ নিয়ে এসেছি। একজনের চাকরি-বিষয়ে একটা সুপারিশ। আমার এক বন্ধুর চাকরি চলে গেছে। পুরোপুরি এখনো যায়নি, সামান্য সুতায় ঝুলছে। আপনার বাবার সুপারিশে হয়ত তার চাকরিটা হবে।

তিতলী বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। মোবারক হোসেন সাহেব কৌতুহলী গলায় বললেন, তুমি কি সত্যি সুপারিশ নিতে এসেছ?

‘জ্বি স্যার। সবাই তো মন্ত্রীত্ব থাকাকালিন সময়ে নানান সুপারিশ নিয়ে আসে, আমি এসেছি যখন আপনার মন্ত্রীত্ব নেই। কিছুই নেই।’

‘তুমি তাহলে জেনেশুনেই এসেছ আমার সুপারিশে কাজ হবে না?’

‘তা নয় স্যার। আমি জানি, আপনার সুপারিশে এখন অনেক বেশি কাজ হবে। কারণ সবাই জানে, আপনি আবার স্টেজে আসবেন। আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যদিও এখন আপনি কেউ না –নো বডি; তবু ভবিষৎতের কথা ভেবে তারা আপনাকে খুশি রাখবে।’

‘যার সুপারিশ করতে এসেছে তার নাম কি? সুপারিশ কার কাছে করতে হবে?’

আমি পকেট থেকে কাগজ বের করতে করতে বললাম, সব এখানে লেখা আছে স্যার। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর নাম রফিক।

‘তুমি বস, আমি টেলিফোন করে দেখি। তোমার কথা সত্যি কি-না পরীক্ষা হয়ে যাক।’

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। তিতলী নামের রাগী এবং অহংকারী মেয়েটি আমার সামনে বসে আছে। তার ঠোঁট হাসির ক্ষীণ আভাস। কি মনে করে সে হাসছে কে জানে। আমি বললাম, আপনার মা কেমন আছেন?

‘ভাল না।’

‘উনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন,উনাকে একটু দেখতে যাব?’

‘কেন?’

‘এমনি যাব।’

‘আপনি বিনা উদ্দেশ্যে কিছু করেন না। আপনার কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা বলুন। তারপর ঠিকানা দেব।’

উদ্দেশ্য বলার সময় হল না। মোবারক হোসন সাহেব ফিরে এসেছেন। তিনি

ইজিচেয়ারে বসতে বসতে বললেন, হিমু,তুমি তোমার বন্ধুকে আগামীকাল চাকরিতে জয়েন করতে বল। আমি কথা বলেছি।

'ধন্যবাদ স্যার, আমি তাহলে উঠি?'

'বোস, চা খেয়ে যাও। চা আনছে।'

এদের বাড়ির বড়বুবু চা দিয়ে গেছে। মোবারক হোসেন সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। তিতলী চায়ের কাপ মুখের কাছে নিয়ে নামিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছে কিছু বলবে, কি বলবে তা গুছাতে সময় লাগছে। সে বাবার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। মোবারক সাহবে বললেন, তোর কি হয়েছে?

'কিছু হয়নি।'

'এরকম করে তাকাচ্ছিস কেন?'

'যেভাবে আমি তাকাই সেই ভাবেই তাকাচ্ছি।'

'তুই এখান থেকে যা। আমি হিমুর সঙ্গে কথা বলব।'

'যা বলার আমার সামনেই বল। আমি কোথাও যাব না।'

সে আবারো চায়ের কাপে মুখের কাছে নিল, আবারো নামিয়ে রাখল। মেয়েটির এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোন কারণ ধরতে পারছি না। আমি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, স্যার আজ যাই। অন্য আরেক দিন আসব।

তিতলী বলল, অন্যদিন টন্যদিন না। আপনি আর এ বাড়িতে আসবেন না। আর কেউ জানুক না জানুক আমি জানি ভাইয়া নিখোঁজ হয়েছে আপনার কারণে। আপনাকে আমি এত সহজে ছাড়ব না।

আমি আবার বসে পড়লাম। মোবারক সাহেব বললেন, কটা বাজে দেখতো হিমু।

'স্যার আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই।'

মোবারক সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ঘড়িতে কটা বাজ মা?

তিতলী জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। তেজী ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে গেল।

মোবারক সাহেব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েটা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। টেনশান নিতে পারছে না। ঘন ঘন ইমোশনাল আউটবার্স্ট হচ্ছে। সুখের কথা হচ্ছে এইসব আউটবার্স্ট এর স্থায়িত্ব অল্প। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নেবে। হিমু ঐ শোবার ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘড়িতে সময় কত হয়েছে দেখ তো?

আমি ঘড়ি দেখলাম, ন'টা একুশ । তিনি আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজের মনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, তিতলীর মা'কে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্যে নেয়া দরকার। ব্যাংককের আমেরিকান হাসপাতাল ভাল চিকিৎসা করে সেখানেই নেয়ার কথা, নিতে পারছি না। টাকার সমস্যা তো আছেই, তার চেয়েও বড় সমস্যা আমাকে বাইরে যেতে দেবে না। একজনের কাছে টাকা চেয়েছিলাম, রাত আটটায় তার দিয়ে যাবার কথা। মনে হয় সে আর আসবে না। তোমার কি মনে হয়?

'না আসার সম্ভাবনাই বেশি।'

'মানুষকে চেনা বড়ই মুশকিল। যার টাকা নিয়ে আসার কথা সেও বলতে গেলে কোটিপতি। তাকে কোটিপতি করেছি আমি। প্রয়োজনীয় পারমিটগুলির আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি। হিমু, তোমার কি ধারণা এই পৃথিবীতে কত ধরনের মানুষ আছে?'

'স্যার পৃথিবীতে মাত্র দু' ধরনে মানুষ আছে।'

‘দু' ধরনের?’

‘জ্বি, আমি সমস্ত মানুষকে দুভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে আছে 'হ্যাঁ- মানুষ’ । এরাই দলে ভারী। বলতে গেলে সবাই এই দলে। মানুষের সব গুণ তাদের মধ্যে আছে, আবার দোষও আছে। কোনটাই বেশি না। সমান সমান। প্রকৃতি সাম্যাবস্থা পছন্দ করে। একটা পরমাণুর কথাই ধরুন না কেন – পরমাণুতে নেগেটিভ চার্জের যতগুলি ইলেক্ট্রন আছে পজিটিভ চার্জের ঠিক ততগুলি প্রোটন আছে। হ্যাঁ মানুষগুলি পরমাণুর মত।

দ্বিতীয় দলে আছে, ‘না-মানুষ’। মানুষের কোন কিছুই তাদের মধ্যে নেই, তারা শুধু দেখতেই মানুষের মত। আসলে এরা পিশাচ ধরনের। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নীতি এদের মধ্যে কাজ করে না। এদের মনে কোন রকম মমতা নেই। একটা খুন করে এসে হাত মুখ ধুয়ে ভাত খাবে, পান খাবে, সিগারেট টানতে টানতে দু’একটা মজার গল্প করে ঘুমুতে যাবে। তাদের ঘুমের কোন সমস্যা হবে না। কারণ না-মানুষরা সাধারণত স্বপ্ন দেখে না। আর দেখলেও দুঃস্বপ্ন কখনো দেখে না।’

‘এই জাতীয় মানুষ তুমি দেখেছ?’

‘জ্বি দেখেছি, এই জাতীয় মানুষদের সঙ্গে আমি অনেকদিন ছিলাম। আমরা মামারা সবাই এই জাতীয় মানুষ।’

“বল কি?’

‘আমার বড় মামা নিজে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু লোকজন মাছ মারার বড় খোর দিয়ে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছিল। এই অবস্থাতেও তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ ডেথ বেড কনফেসন করে চারজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন এরাই তাকে মেরেছে। ডেথ বেড কনফেসনের কারণে ঐ চারজনের যাবজ্জীবন হয়ে গেছে।’

‘আচার্য!’

‘আমার মেজো মামা গোটা পাঁচেক খুন করেছেন। অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। তাকে কেউ ফাঁসাতে পারেনি। বহাল তবিয়তে এখনো বেঁচে আছেন—সতুরের উপর বয়স। চোখে দেখতে পান না। কেউ কাছে গিয়ে বসলে খুনের গল্প করেন। এই গল্প বলতে পারলে খুব আনন্দ পান। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি মানুষ জবেহ করলে কণ্ঠনালী দিয়ে ফুস করে বাতাস বের হয়।’

‘চুপ কর।’

আমি গল্প থামিয়ে মোবারক সাহেবের মতই পা নাচাতে লাগলাম। মোবারক সাহেব আধশোয়া অবস্থা উঠে বসলেন, তিক্ত গলায় বললেন, ‘অবলীলায় তুমি এই গল্প করলে। তোমার খারাপ লাগলনা?’

‘না।’

‘ওদের রক্ততো তোমার শরীরেও আছে।’

‘তা আছে। আমার বাবা দেখে শুনে ঐ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন যাতে আমি মায়ের দিক থেকে তেইশটি ভয়াবহ ক্রমোজম নিয়ে আসতে পারি।’

‘আনতে পেরেছ?’

‘ঠিক ধরতে পারছি না।’

‘না-মানুষদের কথা শুনলাম। সাধু সন্ন্যাসীরা কোন শ্রেণীর? যারা মহাপুরুষ তাদের দলটা কি?’

‘তারাও না-মানুষ। পিশাচ এবং মহাপুরুষ সবাই এক দলে। এরা মানুষ নন।’

‘এই জাতীয় কথাবার্তা কি তুমি সব সময় বল, না আজ আমাকে বলছ?’

‘সব সময় বলার সুযোগ হয় না। সুযোগ হলে বলার চেষ্টা করি। আমার কিছু শিষ্য আছে। এরা আগ্রহ করে আমার কথা শুনে, বিশ্বাসও করে।’

‘তুমি নিজেকে কোন দলে ফেল?’ না-মানুষের দলে?’

‘জ্বি না। তবে না-মানুষ হবার চেষ্টা করছি,যদিওবা জানি চেষ্টা করে না-মানুষ হওয়া খুব কঠিন। জন্মসুত্রে হতে হয়। আপনি যেমন জন্মসূত্রে না-মানুষ।’

‘পিশাচ অর্থে বলছ নিশ্চয়ই।’

‘জ্বি পিশাচ অর্থেই বলছি। তবে পিশাচ না-মানুষদের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এরা খুব সহজেই মহাপুরুষ না-মানুষ হতে পারে। হ্যাঁ-মানুষরা তা কখনোই পারবে না।’

‘তুমি কি আমাকে ‘প্রীচ’ করার জন্যে এসব কথা বলছ?’

‘জ্বি-না, আমি ধর্ম প্রচারক না। আমি একজন সাধারণ ‘হ্যাঁ-মানুষ’, যে একজন বন্ধুর চাকরির জন্যে মন্ত্রীর কাছে ছোটাছুটি করে। মহাপুরুষরা এই কাজ কখনো করবেন না। তাঁদের মমতা কখনো একজনের জন্যে না—অনেকের জন্যে। তাঁরা ব্যক্তিকে দেখেন না, তাঁরা সমস্টিকে দেখেন।’

‘হিমু।’

‘জ্বি স্যার।’

‘যাও বাড়ি যাও। একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি অতিশয় ধুরন্দর ব্যক্তি। সূচ হয়ে ঢোকার চেষ্টায় আছ। আমার ব্যাপারে এই চেষ্টা করবে না। শিষ্য হবার বয়স আমার না। এই বয়সে তোমার শিষ্য হবে এরকম মনে করার কোন কারণ ঘটেনি। আল্লা,খোদা, পাপ, পুণ্য এসব নিয়ে আমি কোন দিনই মাথা ঘামাইনি। ভবিষ্যতেও ঘামাব না। যাবার আগে আরেকটি কথা শুনে যাও—তুমি যে কাজে এসেছিলে সে কাজ হয়ে গেছে—বন্ধুর চাকরি হয়েছে। কাজেই এ বাড়িতে আর আসবে না।’

‘জ্বি আচ্ছা স্যার। জহিরের কোন খোঁজ যদি পাই তাহলে কি আসব?’

‘না। তাহলেও আসবে না। ভাল কথা জহিরও কি তোমার শিষ্য?’

‘জ্বি না। এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন শিষ্য পেয়েছি। আমার ফুফাতো ভাই বাদল, তার তরঙ্গিনী ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের সেলস-ম্যান আসাদ।’

‘উপদেশ দেয়া আমার স্বভাব না। তবু একটা উপদেশ দেই, শিষ্যের সংখ্যা আর বাড়িও না।’

‘জ্বি আচ্ছা।’

‘তুমি কর কি? কাজকর্মের কথা বলছি না। কাজকর্ম যে কিছু কর না তা বুঝতে পারছি— তারপরেও মানুষ কিছু করে, সেটাই জানতে চাচ্ছি।’

‘আমি ঘুরে বেড়াই। ইন্টারেস্টিং কোন কিছু চোখে পড়লে আগ্রহ নিয়ে দেখি।’

‘একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের কথা বল, তাহলে বুঝতে পারব কোনটা তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং কোনটা নয়।’

‘সব কিছুই আমার কাছে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং লাগে। তবে একটা দৃশ্য একবার দেখলেই ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করে না। সেই অর্থে সব ইন্টারেস্টিং জিনিসই মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। দু’একটা বাকি। সেগুলি দেখা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘আমাকে বল,দেখি আমি পারি কি না।’

'একটা মানুষকে যখন ফাঁসি দেয়া হয় তখন সে কি করে তা আমার খুব দেখার শখ। অর্থাৎ ফাঁসির মঞ্চে উঠবার আগে সে কি করে তাকায়, কিভাবে নিঃশ্বাস নেয়। অবধারিত মৃত্যুর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মৃত্যুক্ষণ জানি না বলে ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। যদি মৃত্যুক্ষণটা জেনে যাই তখন কি হয় সেটাই আমার দেখার বিষয়।'

'মানুষদের যে দুটি শ্রেণীর কথা বললে তার বাইরেও একটা শ্রেণী আছে—উন্মাদ শ্রেণী। তুমি সেই শ্রেণীর। এমন উন্মাদ যা চট করে বোঝা যায় না। আমার আগে কি তোমাকে এই কথা কেউ বলেছে?'

'আমার ফুপা প্রায়ই বলেন?'

'তাঁকে আমার রিগার্ডস দেবে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দেন না'।

'ইদানিং দিচ্ছেন না। তার বাড়িতে যাতে না যাই সেজন্যে আমি মাসে পাঁচশ টাকা পাই।'

'শুনে ভাল লাগল। আচ্ছা তুমি যাও। তুমি আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছ, আর না।'

৯

রাস্তায় নেমে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম কোথায় যাব। রফিককে চাকরির খবরটা দেয়ার জন্যে নারায়ণগঞ্জ যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছে করছে না, মাথায় চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ভয়ংকর ব্যথা আবার আসছে। ব্যথাটা পথের মধ্যে আমাকে কাবু করার আগেই বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। দরজা জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকতে হবে। মাথা ঢেকে রাখতে হবে ভেজা গামছায়। কিছু খেয়ে নেয়াও দরকার। একবার ব্যথা শুরু হলে চব্বিশ ঘণ্টা কিছু মুখে দিতে পারব না। কড়া কিছু ঘুমের অষুধ খেয়ে নিলে হয়? এমন ডোজ খেতে হবে যাতে চব্বিশ ঘণ্টা মরার মত ঘুমিয়ে থাকি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখব মাথায় যন্ত্রণা নেই। বড় দেখে একটা ফার্মেসীতে ঢুকে পড়লাম।

'কড়া কিছু ঘুমের ওষুধ দিতে পারবেন?'

'ফার্মেসির মাঝবয়েসী কর্মচারী নির্লিপ্ত গলায় বলল, ডাক্তারের প্রেক্রিপসন ছাড়া পারব না।'

'ডাক্তার এখন কোথায় পাব বলুন। বিরাট সমস্যা—আমার এক ছোটভাই আছে মেন্টাল কেইস। খুব তাড়াতাড়ি করলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। এখন খুব বাড়াবাড়ি করছে অথচ ঘরে ওষুধ নেই।'

উনার প্রেসক্রিপসনটা নিয়ে আসেন।'

'ছুটে বের হয়ে এসেছি, প্রেসক্রিপসনের কথা মনে ছিল না ভাই। কি যে যন্ত্রণা করছে—লম্বা লাঠি নিয়ে সবাইকে তাড়া করছে। এই সময় কি আর প্রেসক্রিপসনের কথা মনে থাকে?'

'তাকে কোন ওষুধ দেয়া হয় সেটা জানা দরকার না?'

'এতদিন ফার্মেসী চালাচ্ছেন, আপনি কি ডাক্তারের চেয়ে কম জানেন নাকি?

এমন একটা কিছু দিন যাতে চব্বিশঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে।'

'হিপনল নিয়ে যান। দশ মিলিগ্রামের চারটা ট্যাবলেট খাইয়ে দেন। চব্বিশ ঘণ্টা নড়াচড়া করবে না।'

'মরে যাবে নাতো?'

'আরে না। মানুষ মরা কি এত সহজ?'

'খাওয়ার কতক্ষণ পর এ্যাকশন হয়?'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে এ্যাকশন শুরু হবে।'

'দিন তাহলে চারটা হিপনল।'

চারটা হিপনল ফার্মেসীর কর্মচারীর সামনেই মুখে দিয়ে গিলে ফেললাম। হাসি মুখে বললাম, একগ্লাস পানি দিন—মুখ তিতা তিতা লাগছে।

ভদ্রলোক কোন উচ্চবাচ্চ্য করলেন না। তার চোখ অবশ্যি বড় বড় হয়ে গেল। পানি এনে দিলেন। আমি এক চুমুকে পানি খেয়ে হাই তুলতে তুলতে বললাম, একটা টেলিফোন করব। টেলিফোনটা দিন। ভয় নেই, কল পিছু পাঁচটা করে টাকা দেব। আমার বন্ধুকে একটা খবর দিতে হবে। ওর চাকরি হয়েছে সেই খবর। অবশ্যি বন্ধুর বাড়িতে টেলিফোন নেই। ওদের পাশের বাসায় একটা টেলিফোন আছে—অন রিকোয়েষ্ট। অর্থাৎ বিনীত গলায় বললে ওরা ডেকে দেয়।

'টেলিফোন তালাবন্ধ।'

'তালাবন্ধ থাকলে খোলবার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি করবেন ততই ভাল। বেশি দেরি হলে আপনার দোকানে ঘুমিয়ে পড়ব। আমার হার্ট খুবই দুর্বল। যে কড়া ঘুমের অষুধ খাইয়েছেন – এখানেই ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যেতে পারে। তখন আপনি বিপদে পড়বেন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন।'

ভদ্রলোক শংকিত ভঙ্গিতে টেলিফোন বের করে দিলেন। তালাও খোলা হল। আমি ডায়াল করতে করতে বললাম, মিথ্যা কথা বলবেন না ভাই। ছোটখাট মিথ্যা বলতে বলতে পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। একদিন দেখবেন ক্রমাগত মিথ্যা বলছেন। এই যে নাম্বারটা ডায়াল করছি ওদের যখন বলব পাশের বাসার রফিককে একটু ডেকে দিন ওরা বলবে এখন সম্ভব হবে না। বাসায় কাজের লোক নেই। ওরা একটা মিথ্যা কথা বলবে, যে কারণে ওদেরকে রাজি করানোর জন্যে আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। মিথ্যা নিয়ে আসি মিথ্যা । সত্য জন্ম দেয় সত্যের। বুঝতে পারছেন তো ভাই সাহেব?

'হ্যালো? হ্যালো।'

ও পাশ থেকে অল্প বয়সী মেয়ের গলা পাওয়া গেল। রিণরিণে মিষ্টি গলা, আপনি কাকে চাচ্ছেন?

'তোমাদের পাশের বাড়ির রফিককে যার মা মারা গেছেন।'

'উনাকে তো এখন ডাকা যাবে না। আমাদের বাসায় এখন কাজের লোক নেই। কাজের লোক কখন আসবে? অর্থাৎ কখন টেলিফোন করলে রফিককে ডেকে দেয়া যাবে?'

'আমাদের কাজের লোকতো ছুটিতে দেশে গেছে। কবে আসবে কে জানে?'

'তাহলে তো তোমাদের খুব সমস্যা হল।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন অকাজের লোক। শোন খুকি, এই বয়সেই মিথ্যা কথা বলা শুরু

করেছ কেন? রফিককে ডাকা যাবে না এটা সরাসরি বলে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। মাঝখান থেকে মিথ্যা করে কাজের লোকের কথা বলছ।’

‘আমি তো মিথ্যা বলছি না।’

‘বেশ ধরে নিলাম মিথ্যা বলছ না—সত্যি তোমাদের বাসায় কাজের লোক নেই, তাহলেও তো তুমি চট করে তাকে খবরটা দিতে পার। পার না?’

‘না পারি না। কারণ চিকেন পক্স। আমাকে মশারির ভেতর থাকতে হয়।’

‘খুকী, আবার মিথ্যা কথা বলছ? একটা মিথ্যা বললে দশটা মিথ্যা বলতে হয়। কাজের লোক দিয়ে শুরু করেছ—এখন চলে এসেছো জল বসন্তে। আরো খানিকক্ষণ কথা বললে আরো মিথ্যা বলবে।”

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ফেলল। হাসিটা শুনে ভাল লাগল। এত আন্তরিক ভঙ্গির আনন্দময় হাসি অনেকদিন শুনিনি। সঙ্গে সঙ্গে মন ভাল হয়ে গেল। মাথার যন্ত্রণা চট করে খানিকটা কমে গেল। আমি কোমল গলায় বললাম, হাসছ কেন খুকী?

‘আপনার পাগলামী ধরনের কথাবার্তা শুনে খুব মজা লাগল। এই জন্যে হাসছি। আপনি ধরুন, আমি রফিক ভাইয়াকে ডেকে দিচ্ছি।’

মেয়েটি আরো খানিকক্ষণ হাসল। হাসতে হাসতে বলল, আমাকে খুকী খুকী করছেন এই জন্যেও খুব মজা লাগল। আমি মোটেই খুকী না। মেডিক্যাল কলেজে ফিফথ ইয়ারে পড়ি। এবং আমার সত্যি সত্যি চিকেন পক্স। বাসায় শুধু যে কাজের লোক নেই তাই না, কেউই নেই। সবাই বিয়ে বাড়িতে গেছে। আমার খালাত বোনের বিয়ে। আমার কথা কি সত্যি বলে মনে হচ্ছে?

‘হ্যাঁ হচ্ছে।’

‘ধরে থাকুন, আমি ভাইয়াকে ডাকছি।’

‘তাকে ডাকতে হবে না। তাকে শুধু একটা খবর দিয়ে দেবেন যে, তার চাকরির ঝামেলা মিটেছে। সে যেন কালই অফিসে যায়। আর আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।’

‘আপনাকে ক্ষমা করা হল।’

মেয়েটা আবারো হাসছে। আমি টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মাথার যন্ত্রণা পুরোপুরি চলে গেছে। আমি ফার্মেসীর কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। সে শিউরে উঠল। আমি বললাম, কই ঘুম তো আসছে না। আরো দুটা হিপনল দিন। এক গ্লাস পানি আনুন। আরেকটা কথা ভাই সাহেব, আপনার দোকানেই আজ ঘুমাব বলে স্থির করেছি। আপনি কি কোন বেঞ্চ-টেঞ্চ দিতে পারেন? ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ দেয়ার বিপদ দেখলেন?

১০

মোবারক হোসেন সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। নিধু বৈরাগী হত্যা মামলা। চার বছর আগের হত্যাকাণ্ড। নিধু বৈরাগীর ছোট ভাই নিতাই বৈরাগী চার বছর পর মোবারক হোসেনকে আসামী করে মামলা করেছে। মামলা তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে

সিআইডি পুলিশের উপর। তদন্তকারী অফিসার সাংবাদিকদের বলেছেন, তদন্তের গতি সন্তোষজনক। এমন সব এভিডেন্স পাওয়া গেছে যা এত সহজে চট করে পাওয়া যায় না। মোবারক হোসেন সাহেবকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

ঐ বাড়িতে আমার যাওয়া নিষেধ, তবু একদিন গেলাম। বাড়ির গেটে তালা ঝুলছে। বিরাট তালা। বাড়ির লোকজন কোথায় কেউ বলতে পারল না। কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে তাও কেউ জানে না। মানুষজন না থাকলে অতি দ্রুত বাড়ির মৃত্যু ঘটে। বাড়ির আশেপাশে দাঁড়ালেই গা ছমছমানোর ভাব হয়। বাড়ির সামনে পান সিগারেটের দোকানের ছেলেটা বলল, উনার দেশের বাড়ির যান। ঐখানে খোঁজ পাইবেন।

'দেশের বাড়ি কোথায়?'

'কুমিল্লা।'

'কুমিল্লার কোথায়?'

'তা তো ভাইজান জানি না।'

'বাড়ি তালাবন্ধ থাকে, কেউ খোঁজ নিতে আসে না?'

'মন্ত্রী সাহেবের মেয়ে একদিন আসছিলেন। খুব কান্নাকাটি করলেন।'

'কবে এসেছিল?'

'তাও ধরেন এক হপ্তা।'

গুলশানের কোন এক ক্লিনিক উনার স্ত্রী ছিলেন। গুলশান এলাকার যত ক্লিনিক ছিল সব খোঁজলাম। মোবারক হোসেনের স্ত্রী তার কোনটিতেই নেই। কোন দিন না-কি ছিলেন ও না। এদের কোন খোঁজ বের করার একমাত্র উপায় হল মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করা। সেটা কি করে সম্ভব তাও বুঝতে পারছি না। জেলখানায় গেটে গিয়ে যদি বলি–আমি প্রাক্তন মন্ত্রী মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাহলে তারা যে খুব আনন্দের সঙ্গে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। নারায়ণগঞ্জ থানার ওসি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। উনি যদি কোন সাহায্য করতে পারেন। ভদ্রলোক বিমর্ষ গলায় বললেন – আমি সামন্য ওসি। আমার স্থান চুনোপুঁটিরও নিচে—আর এই মামলা, রুই-কাতলার মামলা। দেখা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

'তবু চেষ্টা করে দেখি। কি করতে হবে বলুন তো?'

'নিয়মকানুন আমিও ঠিক জানি না। ডি আই জি প্রিজনকে এ্যাডড্রেস করে দরখাস্ত করতে হবে। কেন দেখা করতে চান, আসামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি—সব দরখাস্তে থাকতে হবে। আমি খোঁজ-খবর করে একটা দরখাস্ত না হয় আপনার জবানীতে লিখে নিয়ে আসি।'

'এতটা কষ্ট আপনি করবেন?'

‘অবশ্যই করব। আপনি বিকেলে আপনার মেসে থাকবেন। আমি সব তৈরি করে নিয়ে আসব। কাজ হবে কি-না তা জানি না।’

‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। রাখি তাহলে?’

‘এক সেকেন্ড হিমু সাহেব, আপনি কি দুমিনিটের জন্যে আমার স্ত্রীকে একটু দেখতে যাবেন? ওকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্যানসার ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়েছি। এখন সে একেবারে শেষের অবস্থায় আছে। আমি দিনরাত প্রার্থনা করি শেষটা যেন তাড়াতাড়ি আসে। আমি নিজেই সহ্য করতে পারছি না। হিমু সাহেব, ভাই যাবেন? আমি আমার স্ত্রীকে আপনার কথা বলেছি।’

'আসুন এক সঙ্গে যাব।'

‘ও এখন কথা বলতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে লিখে জবাব দেয়।’

‘আমি উনাকে কি বলব?’

‘আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি পাশে কিছুক্ষণ থাকলেই ওর ভাল লাগবে। আপনার সম্পর্কে আমি ওকে বলেছি।’

‘কি বলেছেন?’

‘তেমন কিছু না। বলেছি, আপনি সাধক প্রকৃতির মানুষ। আপনি পাশে দাঁড়ালেই ও সাহস পাবে। অন্য একটা জগতে যাত্রা। সে যাচ্ছে ও একা একা। খুব ভয় পাচ্ছে।’

ওসি সাহেবের গলা ধরে এল। কথা জড়িয়ে এল। আমি শান্ত স্বরে বললাম, ওসি সাহেব, আপনি কাঁদছেন না-কি? সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক গলায় বললেন, কাঁদছি না। আমরা পুলিশ। এত সহজে কাঁদলে কি আমাদের চলে?

ভদ্রমহিলা বোধহয় ঘুমুচ্ছিলেন। ওসি সাহেবকে নিয়ে পাশে দাঁড়াতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গল। ভদ্রমহিলা এককালে রুপবর্তী কি ছিলেন না আজ তার কিছুই বোঝার উপায় নেই। কুৎসিত চেহারা। মাথায় কোন চুল নেই। মুখের চামড়া শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে লেগে গেছে। একটা জীবন্ত মানুষ, পড়ে আছে নোংরা শুকনো মাংসের দলার মত। প্রকৃতি এর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, কি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। কিন্তু সব কি নিতে পেরেছে? আমি ভদ্র মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। কি সুন্দর চোখ শুধু পৃথিবীতে নয়, অনন্ত নক্ষত্রবহীন সমগ্র সৌন্দর্য এই দু'চোখে ছায়া ফেলেছে। এত সুন্দর চোখ কোন মানবীর হতে পারে না।

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম, রানু আপা, কেমন আছেন?

ভদ্রমহিলা একটু চমকালেন। তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তিনি হাসলেন। তাঁর সেই হাসি মুখে ধরা পড়ল না, চোখে ধরা পড়ল। ঝিকমিক করে উঠল চোখ। আমি বললাম, রানু আপা, আপনার চোখ এত সুন্দর কেন বলুন তো? এত সুন্দর চোখ মানুষের থাকা উচিত না। এটা অন্যায়।

ভদ্রমহিলা বালিশের নিচ থেকে হাতড়ে হাতড়ে নোটবই বের করলেন। পেনসিল বের করলেন। অনেক সময় নিয়ে কি যেন লিখলেন। বাড়িয়ে দিলেন সেই লেখা। অস্পষ্ট হাতের লেখায় তিনি লিখেছেন–

‘কেমন আছেন ভাই?’

আমি বললাম, আমি ভাল আছি। আপনিও কিন্তু ভাল আছেন। আমি আপনার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। শারিরীক কষ্ট আপনি জয় করেছেন।

তিনি আবার নোটবই হাতে নিলেন। আমি বললাম, আপা, আপনাকে কিছু বলতে

হবে না। আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি চাচ্ছেন আপনি যেন আপনার কপালে হাত রেখে একটু প্রার্থনা করি। কি ঠিক বললাম না? আমি আপনার কপালে হাত রাখছি—প্রর্থনা কিন্তু করব না আপা। প্রর্থনা আপনার প্রয়োজন নেই।

তার চোখ ভিজে উঠল। বাঁ-চোখ থেকে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে গিয়েও পড়ছে না। দীর্ঘ আঁখিপল্লবের কোণায় মুক্তার মত জমে আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই মহিলার চোখের ভাষা আমি সত্যি সত্যি পড়তে পারছি। ঈশ্বর তাঁর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন চোখে।

ভদ্রমহিলার চোখে খুব সুন্দর করে আমাকে বলল, ভাই, আমি সারাক্ষণ একা থাকি। এইটাই আমার কষ্ট, অন্য কোন কষ্ট নেই। তুমি কি জান আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেও কি আমাকে একা থাকতে হবে?

আমি নিচু গলায় বললাম, আপা, আমি জানি না। আমি আসলে কিছুই জানি না। জানার জন্যে এর কাছে তার কাছে যাই - তারাও জানে না। আপনি যদি কিছু জানেন আমাকে জানিয়ে যান।

তিনি হাসলেন। তাঁর চোখ ঝিকমিক করে উঠল। ওসি সাহেব বললেন, হিমু ভাই, আসুন আমরা যাই।

ওসি সাহেবের চোখ ভেজা। কিন্তু গলার স্বর স্বাভাবিক।

হাসপাতালের বাইরে এসে আমি বললাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীর চোখের ভাষা পড়তে পারেন?

‘আগে পারতাম না, কিছুদিন হল পারছি। আগে ভাবতাম মনের ভুল,উইশফুল থিংকিং। এখন বুঝছি মনের ভুল নয়। চোখ দিয়ে মানুষ আসলেই কথা বলতে পারে। হিমু সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। আমাকে বদলি করা হয়েছে চিটাগাং হিলট্রেক্টে। আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছি। ও মারা যাবার পরপরই চলে যাব। যদি কোনদিন পাহাড় জঙ্গল দেখতে ইচ্ছে করে আসবেন আমার কাছে।’

‘আমার মনে থাকবে।’

‘আপনার কাগজপত্র সব তৈরি করে এনেছি। আপনি নাম সই করে আমার কাছে দিন, আমি জমা দিয়ে দেব। তবে আমার মনে হচ্ছে লাভ হবে না।’

‘চেষ্টা করে দেখি।’

'দেখুন, চেষ্টা করে দেখুন। কিছু হবে না জেনেও তো আমার চেষ্টা করি।’

‘আপনি কি আবার হাসপাতালে যাবেন?’

‘জ্বি-না। বাসায় চলে যাব। দুটা ছোট ছোট বাচ্চা বাসায়। পুলিশের ছেলেমেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওরা অসম্ভব ভীতু।’

‘তারা মা’কে দেখতে আসতে চায় না?’

‘চায়। আমি আনি না। আপনার কি মনে হয় আনা উচিত?’

‘ওদের যদি আসতে ইচ্ছা করে অবশ্যই আনা উচিত। চলুন ওসি সাহেব, কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা খাই। চলুন।’

কিছুদূর এগুতেই রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল। চা খাওয়া হল নিঃশব্দে। আমি কাগজপত্র সই করে দিলাম। বেশ কয়েকটা দরখাস্ত। একটি পাবলিক

প্রসিকিউটারের কাছে, একটা ডিআইজি প্রিজনের কাছে, একটা মোবারক সাহেবের উকিলের কাছে।

তিনি কাগজপত্র ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, হিমু সাহেব, আজ উঠি।

আমি বললাম,চলুন আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

'এগিয়ে দিতে হবে না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।'

তিনি দ্রুত পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দরখাস্তে কোন লাভ হল না। অনুমতি পাওয়া গেল না।

জেলখানা, পুলিশ, কোর্ট-কাছারি এইসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন আমার ছোট মামা। ছোট মামাকে চিঠি লিখলাম। চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের দিন তিনি চলে এলেন। আসবেন তা জানতাম। আমার প্রতি মামাদের ভালবাসা সীমাহীন।

একটা হ্যাণ্ডব্যাগ,একটা ছাতা, বগলে ভাঁজ করা কম্বল নিয়ে রাতদুপুরে মামা উপস্থিত। এমনভাবে দরজা ধাক্কাচ্ছেন যেন ভেঙ্গে ফেলবেন। মেসের অর্ধেক লোক জেগে গেল। আমি হস্তদস্ত হয়ে দরজা খুললাম। ছোট মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, বিষয় কি রে, আমি খুবই চিন্তাগ্রস্ত। বাড়িতে বিরাট যন্ত্রণা—না বললে বুঝবি না। তারপরে ও চিঠি পেয়ে স্থির থাকতে পারলাম না। শরীর ভাল?

'জ্বি ভাল।'

'কই, কদমবুসি তো করলি না।'

'আমি কদমবুসি করলাম। মামা খুশি খুশি গলায় বললেন, থাক থাক, লাগবে না। আল্লাহ বাঁচায়ে রাখুক। তোর গায়ের রঙটা ময়লা হয়ে গেছে। রোদে ঘোরাঘুরি এখনও ছাড়লি না।

'হাত-মুখ ধোন, মামা।'

'হাত-মুখ আর ধোব না। একবারে গোসল করে ফেলব। ঘরে জায়নামাজ আছে? নামাজ ক্বাজা হয়ে গেছে। ক্বাজা আদায় করতে হবে। নামাজ শেষ করে তোর বিষয় কি শুনব। ঝামেলা বাঁধিয়েছিস?'

'হু।'

'পুলিশী ঝামেলা?'

'হু।'

মামার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। হাসিমুখে বললেন, কোন চিন্তা করিস না। পুলিশ কোন ব্যপারেই না। আমরা তো বেঁচে আছি, এখনো মরি নাই। তোর চিঠি পড়েই বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। চিঠি পেলাম একটায়, চারটায় পাড়ি ধরলাম। তোর আমি চিল্লাচিল্লি করতেছিল – দিলাম ধমক। মেয়ে ছেলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে না। তাকে বললাম, অবস্থা সিরিয়াস না হলে হিমু চিঠি লেখে? সেকি চিঠি লেখার লোক?

মামা গোসল করে জায়নামাজে বসে গেলেন। দীর্ঘ সময় লাগালো নামাজ শেষ করতে। তাঁর চেহারা হয়েছে সুফি সাধকের মত। ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। মোনাজাত করবার সময় টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আমি অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখলাম।

'তারপর বল, কি ব্যাপার?'

‘একজন লোক জেলখানায় আছে মামা। ওর সঙ্গে দেখা দরকার দেখা করার কায়দা পাচ্ছি না। দরখাস্ত করেছি, লাভ হয়নি।’

‘খুনের আসামী? তিনশ’ বার ধারা?’

‘কোন ধারা তা জানি না তবে খুনের আসামী?

‘এটা কোন ব্যাপারই না। টাকা খাওয়াতে হবে। এই দেশে এমন কোন জিনিস নাই যা টাকায় হয় না।’

‘টাকা তো মামা আমার নেই।’

‘টাকার চিন্তা তোকে করতে বলছি না-কি? আমরা আছি কি জন্যে? মরে তো যাই নাই। টাকা সাথে নিয়ে আসছি। দরকার হলে জমি বেচে দিব। খুনের মামলাটা কি রকম বল শুনি। আসামী ছাড়ায়ে আনতে হবে?’

‘তুমি পারবে না মামা। তোমার ক্ষমতার বাইরে।’

‘আগে বল, তারপর বুঝব পারব কি পারব না। টাকা থাকলে এই দেশে খুন কোন ব্যাপারই না। এক লাখ টাকা থাকলে দুটা খুন করা যায়। প্রতি খুনে খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার। পলিটিক্যাল লোক হলে কিছু বেশি লাগে।’

আমি মোবারক হোসেন সাহেবের ব্যাপারটা বললাম। মামা গালে হাত দিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশের সাজানো মামলা—পেছনে আছে বড় খুঁটি। কিছু করা যাবে না। ট্রাইব্যুনাল করলে কোন আশা নেই। সিভিল কোর্ট হলে আশা আছে। জাজ সাহেবদের টাকা খাওয়াতে হবে। আগে জাজ সাহেবেরা টাকা খেত না। এখন খায়। অনেক জাজ দেখেছি কাতলা মাছের মত হা করে থাকে। কেইস সিভিল কোটে উঠলে আমারে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।

‘তুমি কি করবে?’

‘সাক্ষী যে কয়টা আছে সবার মনে একটা ভয় ঢুকায়ে দিতে হবে। বলতে হবে সাক্ষী হয়েছে কি জান শেষ। এই সব কথা এরা বিশ্বাস করবে না। তখন একটাকে মেরে ফেলতে হবে। একটা শেষ হয়ে গেলেই বাকীগুলো ভয় পেয়ে যাবে। এছাড়াও আরো ব্যাপার আছে। তুই ছেলেমানুষ বুঝবি না। তুই আমারে খবর দিস, চলে আসব।'

‘মামলা মোকদ্দমা তোমার খুবই ভাল লাগে?’

‘এইসব ভাল লাগার ব্যাপার? তুই একটা ঝামেলায় পড়েছিস...’

‘আমি কোন ঝামেলায় পড়েনি মামা।’

‘তোর চেনাজানা একজন পড়েছে। ব্যাপার একই। ভাই বেরাদার, বন্ধু এদের না দেখলে দেখব কাকে? পাড়ার লোককে দেখব?’

‘মামা কিছু খাবনে? হোটেল সারারাত খোলা থাকে। চলুন যাই।’

‘না কিছু খাব না।’

‘ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাব।’

‘এতক্ষণ জেগে থাকবেন?’

‘কোরান তেলাওয়াত করব, তুই ঘুমা।’

মামা ফজরের নামাজ পড়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলেন। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখি মামা নেই। সারাদিন অপেক্ষা করলাম। তিনি ফিরলেন ঠিক সন্ধ্যায়। আমার সঙ্গে একটি কথাও না বলে মাগরেবের নামাজ শেষ করে আমাকে ডাকলেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, ব্যবস্থা করে এসেছি। কাল সকাল দশটায় জেলগেটে চলে

যাবি। আর শোন হিমু, আমি আর থাকতে পারব না। বাড়িতে বিরাট যন্ত্রণা রেখে এসেছি। কেলেংকারী অবস্থা। গিয়ে সামাল দিতে হবে। এখানকার মামলা শুরু হোক। তুই খবর দিস। খবর দিলেই চলে আসব। তোর জন্যে মনটা সবসময় কাঁদে।

আমি মামাকে রাতের ট্রেনে তুলে দিতে গেলাম। দু'জন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছি—গার্ড সবুজ বাতি দেখয়ে দিয়েছে, মামা বললেন, তাড়াতাড়ি কদমবুসি করে ফেল। ট্রেন ছেড়ে দিবে।

আমি কদমবুসি করতেই মামা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। মামা বললেন, থাক, বাদ দে। একদিন তোর সাথে থেকেই যাই। কাল রাতের ট্রেনে গেলেই হবে। আসছি যখন মীরপুরের মাজার শরীফটা জিয়ারত করে যাই। খুব গরম মাজার।

না-মানুষদের অন্তরে ভালবাসা থাকে না এটা ঠিক না। না-মানুষদের অন্তরে ভালবাসা তীব্র ভাবেই থাকে।

মোবারক হোসেন সাহেব আমাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বিস্ময় গোপন করার কোন চেষ্টা করলেন না। তাঁর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সারা গায়ে পানি এসেছে। হাতে-মুখে পানি এসেছে। ঘনঘন ঢোক গিলছেন।

'হিমু, তুমি দেখা করার ব্যবস্থা করলে কি করে? কাউকেই তো দেখা করতে দিচ্ছে না। তিতলীকেও দেয়নি। অন্যের কথা বাদ দাও।'

আমি বলালম, ব্যবস্থা করেছি। দেখা করা কোন সমস্যা না। আপনার জন্য দু'প্যাকেট সিগারেট এনেছি।

'থ্যাংকস। মেনি থ্যাংকস। তোমাকে দেখে ভাল লাগেছ। ঐদিন তোমাকে আজেবাজে কথা বলেছি। যদি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই, যদি বের হতে পারি, তোমাকে আমি খুশি করে দেব।'

'আমি এমিতেই খুশি । চাচা, আপনি সিগারেট খান। আমি দেখি।'

'তাও জানি। ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। এখন মনে হচ্ছে আমি একেবারে একা না। একজন হলেও আছে—যে আমার জন্যে খানিকটা হলেও অনুভব করে। তুমি আজ প্রথম আমাকে চাচা *ETEI, Iam feeling honoured.'

মোবারক হোসেন সাহবের চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন কেন?

'দুর্বল হয়েছি কারণ নানান ধরণের অন্যায় এই জীবনে করছি। সৎ মানুষ যদি হতাম দুর্বল হতাম না। আমি সৎ মানুষ না। তোমার ভাষায় আমি হচ্ছি না-মানুষ। তবে এরা যে মামলা সাজিয়েছে তা মিথ্যা মামলা। মিথ্যা বলেই শাস্তি হয়ে যাবে। সত্য মামলার অনেক ফাঁকফোকর থাকে। মিথ্যা মামলার থাকে না। হিমু!'

'জ্বি।'

'তোমার না-কি ইনট্যুইশন প্রবল। তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে ঝুলিয়ে দেবে?'

'আমার ইনট্যুইশন কাজ করছে না।'

'আমারটাও কাজ করছে না। তোমার মত আমার ইনট্যুইশনও প্রবল। কিন্তু এখন কিছু করতে পারছি না। ভাল কথা, তোমাকে এখানে কতক্ষণ থাকতে দেবে?'

'এক ঘন্টা।'

'গুড, ভেরি গুড। কথা বলার মানুষ নেই। ও আচ্ছা, তোমার ঐ বন্ধু—ওর

চাকরিটা হয়েছে তো?'

'জানি না। আমি আর খোঁজ নেইনি। ওকে খবর দিয়ে দিয়েছি।'

'যে চাকরির জন্য এত ঝামেলা করলে সেটার শেষ অবস্থা জানলে না?'

'একদিন যাব। খোঁজন নিয়ে আসব।'

'জহিরের কোন খোঁজ নেই, তাই না?'

'জ্বি- না।'

'হিমু।'

'জ্বি।'

'তোমার ইনট্যুইশন কি বলে জহির বেঁচে আছে? আমার কয়েকদিন থেকেই অন্য রকম মনে হচ্ছে। বেঁচে থাকলে এই অবস্থায় সে লুকিয়ে থাকত না। সে তার চিঠিতে আমাতে শয়তান বলেছে। খাঁচায় ঢুকে পড়লে শয়তান আর শয়তান থাকে না। সে তখন চিড়িখানার পশু হয়ে যায়। আমি এখন চিড়িয়াখানার চিড়িয়া।'

'খাঁচা থেকে যদি বের হতে পারেন তখন কি হবেন?'

'বলতে পারছি না। বলা খুব মুশকিল। কোন কিছুই আগেভাগে বলা যায় না।'

মোবারক হোসেন সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। ধরাতে কষ্ট হল। মনে হল তাঁর হাত কাঁপছে।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'আমার মেয়েটার সঙ্গে ইতিমধ্যে কি তোমার দেখা হয়েছে?'

'না। তারা কোথায় আছে জানি না। আপনার বাড়ি তালাবন্ধ।'

ও পুরানো ঢাকায় আছে। আগামসি লেন। ঠিকানা দিচ্ছি, একবার দেখা করবে।'

'কিছু বলতে হবে?'

'বলবে, ভাল আছি। চিন্তা করতে নিষেধ করতে। মেয়েটা একলা হয়ে গেছে। ওর মাকে চিকিৎসার জন্যে ওর ভাইরা সিঙ্গাপুর নিয়ে গেছে, জান বোধহয়?'

'জানতাম না, এখন জানলাম।'

'একঘণ্টা হয়ে গেছে হিমু?'

'না, এখনো কুড়ি মিনিট আছে।'

'বল কি, এখনো কুড়ি মিনিট ? এই কুড়ি মিনিট কি নিয়ে কথা বলা যায় বল তো? আমার আবার আরেক সমস্যা হয়েছে। গলা শুকিয়ে যায়। একটু পরপর ঢোক গিলতে হয়?'

'আপনার যদি কথা বলতে ইচ্ছে না হয় তাহলে আমি চলে যাই। 'আচ্ছা, যাও— আসলেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মোবারক হোসেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন।

ছোট মামার রাতের ট্রেনে যাবার কথা। কাপড় পরে তৈরি হয়েছেন। বেরুতে যাব, হঠাৎ বললেন— আচ্ছা বাদ দে, আরেকটা রাত থেকে যাই। তোর সাথে দেখাই হয় না। একা একা থাকিস, বড় মায়া লাগে।

'বাড়িতে কি সব সমস্যা না-কি আছে।'

'থাকুক সমস্যা। এক রাতে কি আর হবে? তোর সাথে গল্পগুজবই করা হয় না।'

'বেশ তো মামা, আসুন গল্পগুজব করি।'

'তুই এবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর। একা একা কত দিন থাকবি। অবশ্যি একা

থাকায়ও আরাম আছে। তাই বলে সারা জীবন তো একা থাকা যায় না। ঠিক না?'

'জ্বি মামা ঠিক।'

'দেখে শুনে পাত্রী ঠিক করতে হবে। নন মেট্রিক হলে ভাল হয়। এইসব মেয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে। যা বলবি শুনবে। পড়াশোনা জানা মেয়ে খ্যাঁচখ্যাঁচ করবে। কালো মেয়ে খুঁজে বের করতে হবে। মুখের ছিরি ছাঁদ আছে কিন্তু রং কালো। ফর্সা মেয়েদের মেজাজ থাকে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কালো মেয়ে দশ চড়েও শব্দ করবে না। মেয়ে দেখব না-কি হিমু?'

'এখন না মামা। চাকরি-বাকরি নেই, খাওয়াবো কি?'

'খাওয়ানোর মালিক আল্লাহপাক। কে খাওয়াবে এই সব নিয়ে চিন্তা করা মহাপাপের সামিল। এই জগতের সমস্ত পশুপাখি, মানুষ, জ্বিন সবার খাওয়ার দায়িত্ব আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এই ধর—পিঁপড়া, পিঁপড়ার কখনো খাওয়ার অভাব হয়? হয় না। আল্লাহপাক তার খাওয়ার ব্যাবস্থা করে রেখেছেন। পিঁপড়ার মত এত ক্ষুদ্র প্রাণীর খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আর মানুষের থাকবে না? তাই এইসব নিয়ে চিন্তা করিস না।'

'চাকরি-টাকরি হোক। তারপর তোমাকে বলব। মেয়ে দেখতে বেশি দিন তো লাগবে না।'

'কি বলিস বেশিদিন লাগবে না? বিচার বিবেচনা আছে না? হালের গরু আর ঘরের জরু এই দুজিনিস বিচার বিবেচনা করে আনতে হয়। চাকরি চাকরি করে মাথা খারাপ করিস না –চাকরিতে বরকত নাই। বরকত হল ব্যবসায়। নবীজীও ব্যবসা করতেন। তোকে ব্যবসায় লাগিয়ে দেব।'

'কিসের ব্যবসা?'

'কাপড়ের ব্যবসা। সাহুদের বড় একটা কাপড়ের দোকান আছে আমাদের অঞ্চলে। হারামজাদাকে স্ক্রু টাইট দিতেছি। এমন টাইট দিতেছি যে জলের দামে দোকান বেচে ইন্ডিয়ায় ভাগা ছাড়া গতি নেই। ঐ দোকান তোকে কিনে দিয়ে দেব। দোতলা ঘর আছে। এক তলায় দোকান,দোতলায় তুই বৌ নিয়ে থাকবি। কি রাজি? হাসতেছিস কেন? হাসির কি বললাম?'

'রাস্তায় হাঁটতে যাবে মামা?'

'রাতদুপুরে রাস্তায় হাঁটব কি জন্য? তোর একেবারে পাগলের স্বভাব হয়ে গেছে। দুপুর রাতে রাস্তায় কে হাঁটে? চোর হাঁটে আর পুলিশ হাঁটে; তুই চোরও না, পুলিশও না। তুই খামাখা হাঁটবি কেন?'

'খানিকক্ষণ রাস্তায় না হাঁটলে আমার ঘুম আসে না মামা। তুমি শুয়ে পড়। আমি খানিকক্ষণ হেঁটে আসি।'

'হাঁটাহাটির একমাত্র অষুধ বিবাহ। বিয়ের পর দেখবি হাতি দিয়ে টেনেও তোকে বউয়ের কাছ থেকে সরানো যাবে না। বাহিরমুখী পুরুষ বউ অন্তপ্রাণ হয়, শাস্ত্রকথা ...।'

পথে নেমেই মনে হল সেতু মেয়েটির সঙ্গে আজ দেখা হবে। সে কিছু টাকা ফেরত দেবার জন্য পথে পথে ঘুরছে।

অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। দেখা হল না। একটা ষোল-সতেরো বছরের ছেলে এসে একসময় জিজ্ঞেস করল, স্যার কাউরে খুঁজেন? আমি বললাম, না। সে বয়স্কদের মত ভারী গলায় বলল, একটা ভাল জায়গা আছে , যাইবেন?

‘না।’

সে তবু পেছন ছাড়ল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ঠিক পাশাপাশি না, খানিকটা দূরত্ব রেখে। আমি এক সময় বললাম, আমার সঙ্গে কুড়ি টাকার একটা নোট আছে। তোমার দরকার থাকলে নিতে পার। ধার হিসেবে, পরে ফেরত দিতে হবে। ছেলেটি ধার নেয়ার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখাল না। তবে এবার আর দুরে দুরে রইল না। কাছে এগিয়ে এল। আমরা দু’জন হাটছি। কেউ কাউকে চিনি না।

১১

আরে হিমু, প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ, এসো এসো।’ আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে উচ্ছসিত হবার কোন কারণ নেই, কিন্তু বড় ফুপা উচ্ছসিত। তাঁর মুখভর্তি হাসি। আমি শংকিত বোধ করলাম, মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, আজ এক তারিখ ফুপা।

‘অবশ্যই আজ এক তারিখ। তোমার এ্যালাউন্স খামে ভরে রেখেছি। এখন বল কি খাবে? গতবার কফি খেতে চেয়েছিলেন দিতে পারি নি। দিস টাইম আই হ্যাভ কফি। গুড কফি। খাবে?’

‘না।একটা কাজে যাচ্ছি।’

‘আরাম করে বোস। মনে হচ্ছে অনেকদিন পর তোমাকে দেখছি।’

‘আপনাকে এতে খুশি খুশি লাগছে কেন?’

‘খুশি খুশি লাগছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘খুশির কারণ ঘটেছে। কারণটা বলার আগে তোমার উপর যে এমবারগো ছিল তা উঠিয়ে নেয়া হল নো এমবারগো। ইচ্ছে করলে তুমি এখন আমার বাড়িতে যেতে পার। এজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট আমাদের সঙ্গে বাস করতে পার। এক কাজ করতে পার, আজই আস। সন্ধ্যার পর আস। ডিনার কর আমাদের সঙ্গে।’

‘ঠিক আছে ফুপা, যাব। এখন যাই।’

বড় ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, এমবারগো কি জন্যে উঠিয়ে দেয়া হল জানতে চাচ্ছ না?

‘না।’

‘আশ্চর্য ব্যাপার! সামান্য কৌতুহলও কি বোধ করছ না?’

‘এমবারগো নেই। এটাই বড় কথা। কেন নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাচ্ছি না।’

‘বোস তো। বলি কি জন্যে এমবারগো বাতিল হয়েছে।’

‘সন্ধ্যাবেলা যখন খেতে যাব তখন শুনব।’

‘আহা এখনি শোনো। তোমার কৌতুহল না থাকতে পারে, আমার বলার আগ্রহের দাম দেবে না? আরাম করে বোস। তোমার পা উঠিয়ে বসার অভ্যাস। পা উঠিয়ে বোস। কফি খাও। এই কফিটা তোমার জন্যেই আনানো। ঐদিন কফি খেতে চাইলে –দিতে পারলাম না।’

আমি বসলাম। আনন্দিত মানুষের মুখের দিকে তাকানোও আনন্দময় ব্যাপার।

ফুপাকে দেখে ভাল লাগছে। তাছাড়া মুখে যাই বলুন, আমাকে বেশ পছন্দ করেন।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'বাদল বলে তোমার নাকি অনেক ক্ষমতা-টমতা আছে। বল দেখি আমি কি জন্যে খুশি?'

'বাদল সম্পর্কে আপনার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে বলেই আপনি খুশি ও দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। খুব সম্ভব আমেরিকা।'

ফুপা অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রেইলেন। হতভম্ভ ভাব খানিকটা কাটার পর বিড় বিড় করে বললেন, আসলেই তোমার ক্ষমতা আছে। ইয়েস, ইউ হ্যাভ পাওয়ার। বাদল ভুল বলেনি। আমি ইমপ্রেসড়। থরোলি ইমপ্রেসড়।

ফুপা ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে আছেন। আমি তাঁর ঘোর অনেকখানি কাটিয়ে দিতে পারি। বাদল বাইরে চলে যাচ্ছে এটা বলার জন্যে কোন ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। আমি অনুমান থেকে বলেছি। যেহেতু ফুপা আমার উপর থেকে এমবারগো তুলে নিচ্ছেন সেহেতু আমি ধরে নিয়েছি বাদলকে নিয়ে তাঁর আর ভয় নেই। আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারটাও সহজ অনুমান –বাদলের বড়বোন রিনিকি আছে আমেরিকায়। সেই ব্যবস্থা করেছে।

'হিমু।'

'জ্বি ফুপা।'

'আমি সত্যি অবাক হয়েছি। সুপারন্যাচারাল পাওয়ার তাহলে মানুষের আছে!'

'তা আছে।'

'ভবিষ্যৎ তুমি কি কিছু বলতে পার?'

'সবাই খানিকটা পারে।'

'না না, সবাই পারে না। এটা সবার পারার ব্যাপার না। আচ্ছা আমার ভবিষ্যৎ কি বল তো?'

'আপনার ভবিষ্যৎ খুব ভয়াবহ।'

ফুপা হকচকিয়ে গেলেন। চট করে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, কেন?

'আপনার জীবন হবে নিঃসঙ্গ। প্রচুর মদ্যপান করবেন। দু'বছরের মাথায় বড় ধরনের স্ট্রোক হবে। যদি বেঁচে যান তাহলেও সমস্যা। ফুপুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকবে। শেষটায় এমন দাঁড়াবে যে দুজন থাকবেন দু'বাড়িতে।'

'এসব তুমি কি বলছ?'

'যা ঘটবে তাই বলছি ফুপা।'

'তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থেকে বলছ না অনুমান করছ?'

'আধাত্মিক ক্ষমতা থেকে বলছি, তবে লজিকও একে সাপোর্ট করবে। মেয়ে কাছে নেই, ছেলেও চলে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ হওয়াটা তো স্বাভাবিক। সামনের বছর রিটায়ার করছেন। কাজেই মেজাজ থাকবে খারাপ। এমিতেই আপনি সিগারেট বেশি খান। তার পরিমাণ আরো বাড়বে। নিঃসঙ্গতার দূর করার জন্যে মদ্যপানের মাত্রা দেবেন বাড়িয়ে। স্ট্রোক হবে। যতই দিন যাচ্ছে, ফুপুর সঙ্গে ততই আপনার দুরুত্ব বাড়ছে। যেহেতু বাড়ি ছাড়াও ঢাকায় আপনার একটি এপার্টমেন্ট আছে, কাজেই অনুমান করছি শেষের ভয়ংকর দিনগুলিতে দুজন থাকবেন দু'জায়গায়।'

কফি চলে এসেছে। ফুপা শুকনো মুখে কফির পেয়ালার চুমুক দিচ্ছেন। ফুপার মুখের ভাব দেখে আমার মায়াই লাগল। আমি কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এতটা মন খারাপ করার কিছু নেই ফুপা। আগেভাগে সমস্যা জানা থাকলে সমস্যা এড়ানো যায়।

ফুপা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি যা বলছ তাই হবে। আমি সমস্যা এড়াতে পারব না। আমার সেই ক্ষমতাই নেই। তুমি তো খবর রাখ না, মদ্যপান তিনগুণ বেরেছে। এখন রোজই খাই। ফুপুর সঙ্গে বাক্যালাপ সাতদিনের ভেতর দুদিনই থাকে বন্ধ। তুমি এসো, আজ সন্ধ্যায় কথা বলব।

ফুপার বাড়িতে যাবার আগে আগে পুরানো ঢাকায় গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিতলী যে বাড়িতে থাকে সেটা বের করলাম। ভঙ্গুর দশার এক দোতলা বাড়ি। আধঘণ্টার মত কড়া নাড়ার পর বুড়ো মত এক লোক বের হয়ে এলেন। আমি তিতলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে তিনি খুবই সন্দেহজনক চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন।

'তিতলী এ বাড়িতে থাকে আপনাকে কে বলল?'

'তার বাবা বলেছেন।'

'তিনি বলবেন কিভাবে? তিনি তো জেলে।'

'ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক সময় লাগবে। আপনি তিতলীকে দয়া করে বলুন হিমু এসেছে।'

'আপনি কোথেকে এসেছেন?'

'এতসব জানার কোন দরকার নেই। আমার নাম বললেই হবে।'

'কি নাম বললেন?'

'হিমু। হিমালয়।'

'দাঁড়ান এইখানে।'

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বিরস মুখে বললেন, তিতলী বলেছে দেখা হবে না।

'আপনি কি আমার নাম বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম।'

'গুবলেট পাকননি তো। একটা বলতে গিয়ে আরেকটা বলেননি তো?'

'বলেছি হিমু দেখা করতে চায়। হিমালয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক ভেতরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আবার দরজা খুলে বলবেন—অপ্রস্তুত গলায় বলবেন, আপনাকে বসতে বলেছে। ইনট্যুইশন কাজ করল না। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরেও দরজা খুলল না।

ফুপার পুরো বাড়ি অন্ধকার। পোর্চেও আলো নেই। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না। গেট খুলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকলাম। মনে হচ্ছে বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই। বারান্দায় পা দিতেই ফুপা বললেন, এসো হিমু, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

'বাড়ি অন্ধকার কেন?'

'বুঝতে পারছি না। সব বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে, শুধু এখানেই নেই। কোন

মানে হয় বল তো? ইলেট্রিসিয়ানকে খবর দিয়েছিলাম—সে বলল কাট-আউট চুরি হয়ে গেছে। কাট-আউট কোন বাড়িতে চুরি হয়? চোর কাট-আউট দিয়ে কি করবে বল দেখি?'

'কাট-আউট লাগিয়ে দিলেই হয়।'

'এখানে যেসব পাওয়া যায় সেগুলি ফিট করে না। ব্যাংকক থেকে এনেছিলাম। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি খুঁজে দেখতে কোথাও পায় কিনা।'

'বাড়িতে কেউ নেই?'

'তোমার ফুপু নেই। সমান্য একটু আর্গুমেন্ট হয়েছে। সুটকেস গুছিয়ে সন্ধ্যাবেলা চলে গেল।'

'গেছেন কোথায়?'

'বলে গেছে হোটেলে গিয়ে উঠবে। যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট সামথিং হ্যাজ টু বি ডান। মনে হয় না এই মহিলার সঙ্গে বাস করতে পারব।'

'বাদল বাড়িতে নেই?'

'আছে। ঘরে বসে কি সব যেন করছে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।'

'আমি ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি ফুপা। অনেক দিন কথা হয় না।'

'যাও। ও, আরেকটা কথা, তোমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলাম, সরি, এবাউট দ্যাট কিছু রান্নাই হয় নি। কাজের মেয়ে দু'জন আছে, ওরা রাঁধতে পারত। তোমার ফুপু তাদের নিষেধ করে

দিয়েছে। দু'জনকেই ছুটি দেয়া হয়েছে।'

'এটা কোন সমস্যা না ফুপা। পাউরুটি আছে তো, ঐ খেয়ে নেব।'

'পাউরুটি খেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলেছি যা পায় নিয়ে আসতে। বাদলের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার বলে তুমি ছাদে চলে এসো।'

বাদলের ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের সামনে সে পদ্মাসন হয়ে বসে আছে। তার পরণে গেরুয়া চাদর।

'হচ্ছে কি এসব?'

'মনটা স্থিতি করার চেষ্টা করছি। তুমি বলেছিলে না—মন বিক্ষিপ্ত হলে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে মন স্থিতি করা যায়।'

'বলেছিলাম নাকি।'

'কি আশ্চার্য না বললে আমি জানব কোথেকে?'

'মন কি খানিকটা স্থিতি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না হিমুদা। এসো ঘরে এসো।'

'তোর সাধনায় বিঘ্ন হবে না তো?'

'কি যে তুমি বল।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি বললাম, কাট-আউট তুই-ই চুরি করেছিস?

বাদল বিস্মিত হয়ে বলল, কি করে বুঝলে? ও আচ্ছা, তুমি তো বুঝবেই। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার না করলে প্রদীপের আলো স্পষ্ট বোঝা যায় না। এইজন্যেই কাট-

আউট খুলে ড্রয়ারে রেখেছি। ভাল করিনি হিমুদা?

বাদল উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিকই আছে। শুনলাম তুই আমেরিকা যাচ্ছিস? বাদল হাসল।

'কি পড়বি সেখানে?'

'আমেরিকা গেলে তবে তো পড়ব?'

'যাচ্ছিস না?'

'তুমি পাগল হলে হিমুদা? আমি আমেরিকা যাব কেন?'

'তাহলে যাওয়া হচ্ছে না?'

'অফকোর্স না এমিতে অবশ্যি কাউকে কিছু বলছি না। সবাই ভাবছে আমি যাচ্ছি। কাজেই আমাকে কেউ ঘাটাচ্ছে না। যা ইচ্ছা করতে পারছি। হিমুদা, আমি এইখানেই থাকব।'

'ফুপা-ফুপু মনে কষ্ট পাবেন।'

'আমি চলে গেলে আরো কষ্ট পাবেন।'

'তা ঠিক। তবে নিজের জীবন নিয়েও তো ভাবতে হবে। বড় হয়ে কি করবি?'

'তুমি যা করছ আমি তাই করব। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। হিমুদা, এখন তুমি আমাকে মন স্থিতি করার কৌশলটা ভালমত শিখিয়ে দাও। প্রদীপটা শুধু কাঁপছে। দরজা জানালা বন্ধ করে দেব। পদ্মসনটা কি ঠিকমত হয়েছে?'

'সবই ঠিক আছে। দরজা খোলা রাখাই ভাল। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।'

'চাদরটা খুলে খালি গা হব?'

'রেশমী কাপড় গায়ে থাকলে ভাল? তোর মটকা পাঞ্জাবি আছে না? ঐ একটা পরে নে।'

'ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে হিমু দা। তুমি না এলে কি যে হত।'

'তুই সাধনা চালিয়ে যা আমি ফুপার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'না না, তুমি এখানে বস।'

'এখানে বসলে হবে কি করে? তুইতো এখন সাধনা করবি।'

'ও আচ্ছা, তাও তো কথা। আচ্ছা তুমি যাও।'

যা ভেবেছিলাম, তাই। বড় ফুপা পানের যাবতীয় আয়োজন নিয়ে ছাদে বসেছেন। আইসবক্সে বরফ। ঝাল মরিচ মাখানো চিনা বাদাম। তিনি বসে আছেন শীতল পাটিতে। ঠিক বসে নেই – আধশোয়া হয়ে আছেন।

'বস হিমু। তোমার ফুপু চলে যাওয়ার একদিকে ভাল হয়েছে। ক্যাট ক্যাট করে কথা শুনাবে না। মুখ গম্ভীর করে থাকবে না। পুরো বোতল শেষ করলেও কারো কিছু বলার নেই।'

'পুরো বোতল শেষ করবেন?'

'না। শরীরে সহ্য হয় না। পাঁচ পেগের বেশি এখন আর পারি না। এর কম হলে ঘুমের অসুবিধা হয়। বেশি হলে বমি বমি ভাব হয়।'

'আপনি কি নিয়মিতই পাঁচ করে চালাচ্ছেন?'

'কাল একটু বেশি হয়ে গেল। দশ ক্রস করে ফেললাম। তারপর বমি টমি করে কেলেংকারী অবস্থা। তবে কাল ঘুম খুব ভাল হয়েছিল। এক ঘুমে রাত কাবার। এখন বল হিমু তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

ফুপা গ্লাসে লম্বা চুমুক দিতে দিতে বললেন,নেশাটা ঠিকমত ধরুক, তারপর হায়ার ফিলসফি নিয়ে আলাপ করব। মনের তরল অবস্থায় হায়ার ফিলসফি নিয়ে আলাপ করতে ভালো লাগে। আচ্ছা, তুমি কি মওলানা জালালুদ্দিন রুমীর কবিতা পরেছ?'

'না।'

'আমিও পড়িনি। শুনেছি – উনি মদ্যপান নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা লিখেছেন। ভালো কাজ করলেও লোকে ভালো কথা বলে না। মদ্যপান তো কোনো ভালো কাজ না। এই নিয়েও একটা লোক ভালো কথা বলবে ভাবাই যায় না। পড়ে দেখা দরকার। কি বল হিমু?'

'আপনি দেখি দ্রুত চালিয়ে জাচ্ছেন ফুপা।'

'প্রথম তিনটা অতি দ্রুত খেতে হয়। তারপর স্লো- স্টিডি হয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ম।'

'আজকে আপনি পাঁচের ভেতর থাকবেন, না সীমা অতত্রুম করবেন।'

'তোমার ফুপু নেই। সুযোগ যখন পাওয়া গেছে হা হা হা – সীমা অতিক্রম করার আনন্দ আছে হিমু। আনন্দ আছে বলেই সবাই সীমা অতিক্রম করতে চায়। অবশ্যি আমাদের হলি-বুকে সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। হা হা হা।'

'আপনি শুধু শুধু হাসছেন ফুপা।'

'শুধু শুধু হাসছি নাকি? যা ভাবছ তা না। এখনো নেশা হয় নি। আনন্দে হাসছি। তোমার ফুপু বাড়িতে নেই এইজন্য আনন্দবোধ হচ্ছে। আই হেট দিস উইম্যান। সারা জীবন হেট করেছি, মুখে কখনো বিলিনি। ভদ্রতা করে বিলিনি। আজ তোমাকে বললাম।'

আমি তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে অন্ধকারেও ফুপার চোখ চকচক করছে। বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'মাঝে মাঝে এ মহিলাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করে। আমাকে খুশি করার জন্য সে আবার কখনো কখনো আহ্লাদী ধরনের কথা বলে। আমি মনে মনে বলি —"চুপ হারামজাদী"। কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাই যেন বড় আনন্দিত।'

'ফুপু কি আপনাকে পছন্দ করেন?'

'কে জানে করে কি-না। হু কেয়ারস? বুঝলে হিমু, আমার জীবনটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি। তেইশ বছর এমন একজন মহিলার সঙ্গে কাটালাম যাকে আমি সহ্যই করতে পারিনা।'

'ফুপা আর খাবেন না। আপনি ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না। কথা জড়িয়ে জাচ্ছে।'

'কথা জড়ালে কিছু আসে যায় না। কী বলছি তা বুঝতে পারছ তো? বুঝতে পারলেই হলো। একটু সরে বস। হঠাৎ করে বমি-টমি হয়ে যেতে পারে। কি যেন তোমাকে বলছিলাম—কি পরিমাণ ঘৃণা তোমার ফুপুকে করি সেটা ব্যাখ্যা করছিলাম। উদাহরণ দিলে তুমি বুঝবে। উদাহরণ না দিলে বুঝবে না। চার বছর আগের কথা। অফিসে গেছি, রিনকি কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন করেছে। ডিম ভাজতে গিয়ে না-কি তার মার শাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সমস্ত শরীর পুড়ে গেছে। খবরটা শুনে এমন একটা আনন্দ হল, তোমাকে কি বলব হিমু। বারবার মনে হতে লাগল, আপদ

গেছে, আপদ গেছে। বাঁচলাম, বাঁচলাম। ভাগ্যিস মানুষের মনের কথা কেউই বুঝে না। মনের কথা বুঝতে পারলে বিরাট কেলেংকারী হয়ে যেত। মনের কথা বুঝতে পারে না বলে কেউ কিছু বুঝল না। আমি এমন একটা ভাব করলাম যে মনের দুঃখে মারা যাচ্ছি। সারা রাত না ঘুমিয়ে তোমার ফুপুর পাশে বসে থাকি। হা-হা-হা।'

'ফুপা। '

'বল।'

'বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে কেমন হয়? আপনি যেভাবে মাথা দুলাচ্ছেন তাতে মনে হয়...'

'মাতাল হয়ে গেছি বলে ভয় পাচ্ছ? মোটেই না। মাতাল হলে 'ডাবল-ভিসন' হয়। সব জিনিস দুটা করে দেখা যায়। আমি কিন্তু একটাই হিমু দেখতে পাচ্ছি। ওনলি ওয়ান হিমু। বড় আনন্দ লাগছে। সত্যি কথা বলার আনন্দ।'

'আপনি কিন্তু ফুপা সত্যি কথা বলছেন না?'

'সত্যি বলছি না।'

'এক বিন্দুও না। ফুপুর গা যখন আগুনে পুড়ে গেল তখন আপনি ভয়ংকর মন খারাপ করেছিলেন।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা ছিল অভিনয়। আমি তোমাদের আসাদুজ্জামান নুরের চেয়ে অনেক ভাল অভিনয় জানি। ওই ছাগলা দাড়িকে আমি অভিনয় শেখাতে পারি। হা-হা-হা।'

'আপনি তাহলে জেনে শুনে এমন ভয়ংকর জীবন যাপন করছেন কেন?'

'উপায় নেই বলেই করছি।'

'উপায় যে একেবারে নেই তাই-ই বা বলছেন কেন?'

'উপায়টা কি?'

'এক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাত-মখ ধুবেন। নাশতা খাবেন, চা খাবেন। পরপর দু'কাপ চা, দুটা সিগারেট। তারপর শিষ দিতে দিতে ঘর থেকে বের হবেন। একটা রিকশা নেবেন। পাঁচ টাকার রিকশা যতদূর যেতে চায় ততদূর যাবেন। তারপর রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করবেন। হাঁটতেই থাকবেন। হাঁটতেই থাকবেন। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে থআমতে পারেন। কিন্তু কখনোই পেছনের দিকে তাকাবেন না।'

'কতদিন হাঁটব?'

'পাঁচ বছর দশ বছর, কুড়ি বছর। নির্ভর করে কতদিন আপনি বাঁচবেন তার উপর।'

'হিমু, তুমি আসলেই পাগল। খারাপ ধরনের পাগল। এ ডেনজারাস মেড ম্যান। ডেনজারাস বলছি কারণ তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।'

'পছন্দ না-হবার কারণ নেই ফুপা। এই পৃথিবী, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনটাই স্থির না। সব কিছু প্রচণ্ড গতিময়। ইলেকট্রন ঘুরছে নিউক্লিয়াসের চারদিকে, নিউক্লিয়াস ঘুরছে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। ছায়াপথ ছুটে ছুটে যাচ্ছে। শুধু মানুষ হাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে। এক সময় কিন্তু মানুষও ঘুরে বেড়াতো যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত। পাখিদের দেখুন, তারা মহাসমুদ্র উড়ে পার হয়। শীতের দেশ থেকে আসে গরমের দেশে। আবার উড়ে যায় শীতের দেশে।

সারাক্ষণই উড়ছে। সমুদ্রের মাছের ঝাঁকও তাই করে। মানুষেরও তাই করা উচিত।'

'তাই করলে আজকের সভ্যতা, আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি হত।'

'এইসবের প্রয়োজন নেই ফুপা?'

'প্রয়োজন নেই?'

'না–From dust I have come, dust I will be.'

'তুমি পাগল হিমু। পাগল। বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমরা সবাই পাগল ফুপা। পৃথিবীটাই একটা ম্যাড হাউস। আমি আজ উঠি, মাথা ধরেছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকব।'

'এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসবে।'

'আসুক। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। মাথা ধরলে আমি কিছু মুখে দিতে পারি না।'

ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। বায়েজীদ সাহেব আমার ঘরের সামনের মোড়ায় একা একা বসে আছেন। আমি বললাম, এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছেন, কি ব্যাপার বায়েজীদ সাহেব?

বায়েজীদ সাহেব নরম গলায় বললেন, একটা ভাল খবর ছিল।এত আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে খবরটা না দিয়ে ঘুমুতে পারছি না।

'মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

'জ্বি। আপনি যেমন বলেছিলেন ঠিক সে রকম ছেলে। চাকরি করে। দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়ায়।'

'খুব ভাল খবর বায়েজীদ সাহেব।'

'আপনার জন্যই হয়েছে। ছেলের একটা ছবি আছে আমার কাছে। ছবিটা কি একটু দেখবেন?'

'অন্য একদিন দেখব। আজ প্রচণ্ড মাথা ধরছে। অবশ্যি ছবি দেখার দরকার নেই। আমি জানি ছেলে সুন্দর। সুন্দর না?'

'রাজপুত্রের মত ছেলে। সব আপনার জন্যেই হয়েছে। সব আপনার জন্যে। আমি জানতাম হবে। যেদিন আপনাকে বলেছি সেদিনই আমি জানি। মেয়েকে চিঠিও লিখলাম।'

বায়েজীদ সাহেব চোখ মুছছেন।

দুঃখে মানুষ কাঁদে, আবার আনন্দেও কাঁদে। আনন্দে মানুষ হাসে আবার প্রবল দুঃখেও মানুষ হাসে। এখান থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি – আনন্দ এবং দুঃখ আলাদা কিছু না?

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, কিছু ভাবতে পারছি না।

বায়েজীদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি একটু হাওয়া করি।

'আপনাকে কিছু করতে হবে না। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন।প্লিজ।'

ঘরে কি ঘুমের অষুধ আছে? একগাদা হিপনল খেয়ে শুয়ে থাকব। মাথার যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে
চাচ্ছি না।

মাথার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেলাম। এই যন্ত্রণা দীর্ঘ দিন আমাকে আচ্ছন্ন করে

রাখল। দিন এবং রাত্রির ব্যবধান মুছে গেল। মনে হত সব সময় দিন, সব সময় রাত। মেস থেকে তারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিল। হাসপাতালের ওয়ার্ডটি বিশাল। রুগীরা শুয়ে আছে। আমিও তাদের সঙ্গে শুয়ে আছি। স্থান কাল সম্পের্কেও বিভ্রমের মত হল। এই মনে হয় হাসপাতাল , এই মনে হয় হাসপাতাল নয় স্টীমারের খোলা ডেক। সিটি বাজিয়ে স্টীমার চলছে। আমরা খুব দুলচি।

ক্রমাগতই লোকজন আসছে আমাকে দেখতে। এগুলি মনে হয় বিভ্রম। মস্তিষ্ক কল্পনা করে নিচ্ছে। বড় মামাকে একদিন দেখলাম। তিনি আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বিড় বিড় করে বলছেন—একি সমস্যা বাধালি তো। এই দৃশ্য অবশ্যই বিভ্রম। বড় মামা মারা গেছেন অনেকদিন আগে।

এক গভীর রাতে রূপাকে দেখলাম। সে রাগী-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে –কত কষ্ট করে তোমার ঠিকানা বের করেছি তা কি তুমি জান? আমি তোমাকে হাসপাতালে রাখব না, বাড়িতে নিয়ে যাব।

‘তোমার বাবা-মা–তাঁরা কি বলবেন?’

‘যা বলার বলুক।’

একদিন সেতু এল এক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে। তার মুখ শুকানো। সে লজ্জিত ও বিব্রত। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আপনার টাকাটা নিয়ে এসেছি। এটা কি বালিশের নিচে রাখব?

‘রাখ?’

‘আমি যদি খানিকক্ষণ আপনার বিছানার কাছে বসে থাকি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?’

‘না।’

এই সব দূশ্যের সবই কি কল্পনা? বোঝার কোন উপায় নেই। এক সময় তিতালী এসে উপস্থিত। তার পরণে আকাশী রঙের শাড়ি। হাত ভরতি সবুজ চুড়ি। সে হাতের চুড়ির টুনটুন শব্দ করতে করতে বলল,

‘আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?’

‘পারছি। আপনি তিতালী।’

‘আপনি কেমন আছেন?’

‘আমি ভাল নেই।’

তাই তো দেখেছি। কি রোগা হয়ে গেছেন! কি হয়েছে আপনার?’

‘জানি না কি হয়েছে। সম্ভবত মারা যাচ্ছি। প্রায়ই প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। ইদানীং এর সঙ্গে জ্বর হচ্ছে।’

‘কে দেখছে আপনাকে?’

‘সবাই দেখছে। মেসের একজন ঝি—সে তার দেশ থেকে মাথায় মাখার একটা তেল এনে দিয়েছে। ঐটা মাথায় মাখি। মাথায় মাখলে খুব আরাম হয়।’

‘আপনার আত্মীয়-স্বজনরা আপনাকে দেখছেন না?’

‘দেখছে। সবাই দেখছে। মৃত আত্মীয়স্বজনরাও নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন। আমার বড় মামা তো প্রায়ই রাতে আমার সঙ্গে ঘুমান। ছোট বিছানা, দুজনের চাপাচাপি হয়। উপায় কি? শুধু বাদল আসছে না। অসুখের সময় ও পাশে থাকলে ভাল লাগতো।’

‘ও কোথায়?’

‘ও আমেরিকা গিয়েছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।’

'আমি যদি বিছানায় আপনার পাশে কিছুক্ষণের জন্যে বসি আপনি কি রাগ করবেন?'

'না রাগ করব কেন?'

'আমার বাবারও মাথা ধরার রোগ আছে। মাথায় যন্ত্রণায় উনি যখন ছটফট করতেন আমি হাত বুলিয়ে দিতাম। বাবার ধারণা, আমি হাত বুলালেই বাবার মাথা-ধরা সেরে যেত। আমি কি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'না।'

'আপনি কি আমার বাবার খবর জানেন?'

'না।'

'স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয়েছে। ফাঁসির আদেশ হয়েছে।'

'আপনার বাবা কি আপিল করেছেন?'

'আপিল করেছেন? আপনি যে খুব শান্ত ভঙ্গিতে ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন তা দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'আমার বাবা আমাকে শান্ত থাকতে বলেছেন। আমি শান্ত হয়ে আছি।'

'ভাল। খুব ভাল।'

'আমার ধারণা, আমার বাবা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।'

'আপনার ধারণা ঠিক আছে। পৃথিবীতে অশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে কিছু নেই। সব মানুষই শ্রেষ্ঠ।'

'বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কি যাবেন? আপনার শরীর এত খারাপ। আমার বলতে লজ্জা লাগছে।'

'আমি যাব। অবশ্যই যাব।'

স্বপ্নদৃশ্যগুলিতেও কিছু সত্যি থাকে?

কারণ পুরোপুরি সুস্থ হবার পর শুনলাম—আসলেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মোবারক হোসেন সাহেবের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আপিল করেছেন, অতে লাভ হয়নি। মার্সি পিটিশন করেছেন। তার ফলাফল এখনো জানা যাচ্ছে না।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

মোবারক হোসেন সাহেব খুশি খুশি গলায় বললেন হিমু কেমন আছ?

'ভাল।'

'শুনেছ নিশ্চয় আমাকে ওরা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।'

'শুনেছি।'

দিনক্ষণ এখনো ঠিক করেনি। কিংবা কে জানে হয়ত ঠিক করেছে, আমাকে কিছু বলছে না। ও, ভাল কথা, পরে আবার জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাব। তোমার বন্ধুর চাকরিটা কি হয়েছে?'

'জানি না। আমি খোঁজ নেইনি।'

'কিছুই জান না?'

'জ্বি না।'

'তুমি শুনলে অবাক হবে আমি তোমার ঐ বন্ধুকে একদিন স্বপ্নে দেখলাম? সে আমাকে বলছে— স্যার, একটু দোয়া করবেন আমাদের একটা বাচ্চা হবে। তোমার বন্ধুর সঙ্গে খুব সুন্দর মত একটি মেয়ে। মেয়েটা স্বামীর কথায় খুব লজ্জা পাচ্ছে। আমি তোমার ঐ বন্ধুকে কোনদিন দেখিনি, কিন্তু স্বপ্নে সঙ্গে চিনে ফেললাম।'

মোবারক হোসেন সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন?

মোবারক হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, বুঝতে পারি না। কিছুই বুঝতে পারি না। হিমু!

'জ্বি।'

'আমার মাথাটা বোধহয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—আমাকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেখান থেকে একশ'গজ দুরে জেলখানার ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে কয়েদীরা সেই মাঠে ফুটবল খেলে। একরাতে কি হয়েছে জান? হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানলার শিক ধরে মাঠটার দিকে তাকালাম। দেখি কি জান? মাঠটার মাঝখানে একটা গাছ। বেশ বড় একটা গাছ। চারদিক ধু ধু করছে। আর কিছুই নেই। গাছ কোথেকে এল বল তো?'

তিনি আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিচু গলায় বললেন, তোমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলার জন্যে ডেকেছিলাম। জরুরী কথাগুলি একটাও এখন মনে পড়ছে না। জহির সম্পর্কে কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম মনে করতে পারছি না। জহির তোমার ভাল বন্ধু ছিল, তাই না হিমু?

'জ্বি।'

'সে ছেলে কেমন ছিল বল তো?'

'সে অসাধারণ একটি ছেলে।'

মোবারক হোসেন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, অতি খারাপ মানুষ হয়েও অসাধারণ একটি ছেলের জন্ম দিয়েছি। এই তো কম কথা না, কি বল?

'তা তো ঠিকই।'

'তুমি চলে যাও হিমু, বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না।'

'আমি উঠে দাঁড়ালাম। মোবারক হোসেন সাহেব বললেন, তোমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে হিমু। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করবে না।

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি জেল-কর্তৃপক্ষকে বলে রেখেছি ফাঁসীর দিন-তারিখ হলে তোমাকে যেন জানানো হয়, যেন তোমাকে এই দৃশ্যটা দেখার অনুমতি দেয়া হয়। তুমি একবার বলেছিল তোমার খুব শখ এই দৃশ্য দেখার। এরা আমার এই অনুরোধ হয়ত রাখবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি নিচু গলায় বললেন, তোমার জন্যে সামান্য কিছু হলেও করতে পারছি এই জন্যে একটু ভাল লাগছে। তুমি কি চলে যাবার আগে কিছু বলবে? সান্ত্বনার কোন বাণী?

আমি নিচু গলায় বললাম, Dust we will be.

'কি বললে?'

'কিছু বলিনি চাচা।'

'আচ্ছা যাও। তোমাকে অনুমতি দিলে চলে এসো, কেমন? আচ্ছা হিমু, আজ কি পূর্ণিমা? তুমি তো আবার চন্দ্র-সূর্যের হিসাব খুব ভাল রাখ।'

'আজ পূণিমা না।'

'শুনেছি এরা ফাঁসি দিনের বেলায় দেয়। ভোরবেলা। ক'দিন ধরে মনে হচ্ছে ওদের যদি বলি– আমার বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম করে যদি রাতে করে তাহলে

কেমন হয়। ভরা পূর্ণিমার রাতে। তাহলে কি ব্যাপারটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং হবে না?’

‘চাচা যাই?’

‘আচ্ছা যাও। আমার কতাবার্তায় কিছু মনে করো না। আজকাল কি বলি না বলি তার হিসাব রাখতে পারি না।’

১২

জেল-কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়েছি। বিশেষ বিবেচনায় তাঁরা মোবারক হোসেন সাহেবের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। আমাকে আগামীকাল ভোর চারটায় যেতে বলা হয়েছে। ডিআইজি প্রিজন আমাকে একটি পাস দিয়েছেন। এটা দেখালেই জেলখানায় আমাকে ঢুকতে দেবে।

আমি কি যাব দেখতে?

অবশ্যই যাব। আমাকে যেতে হবে। এই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রকৃতি নিজের হাতে করেছে। একে অগ্রাহ্য করার পথ কোথায়?

কেন জানি মনে হচ্ছে আজ রাতে আমার গাঢ় ঘুম হবে। ঘুমানো মাত্র ঐ স্বপ্নটা দেখব। দরজার ওপাশ থেকে কেউ আমাকে ফিস ফিস করে ডাকবে হিমু, এই হিমু। ঐ স্বপ্ন আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না। আমি আজ সারারাত জেগে থাকব, হাঁটব পথে পথে। ক'দিন ধরেই রাত দশটার দিকে লোড শেডিং হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এতবড় শহর ডুবে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে। আজও লোডশেডিং, কিন্তু আকাশ ভেঙে নেমেছে জোছনা। সমস্ত শহর যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জোছনা দেখতে দেখতে, আমার হঠাৎ মনে হল- প্রকৃতির কাছে কিছু চাইতে নেই, কারণ প্রকৃতি মানুষের ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখে না।

(সমাপ্ত)

হিমু

হুমায়ূন আহমেদ

হিমু

হুমায়ূন আহমেদ

১.

“কি নাম বললেন আপনার, হিমু?”

“জ্বি, হিমু”।

“হিম থেকে হিমু?”

“জ্বি-না, হিমালয় থেকে হিমু। আমার ভাল নাম হিমালয়”।

“ঠাট্টা করছেন?”

“না, ঠাট্টা করছি না”।

আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট বের করে এগিয়ে দিলাম। হাসিমুখে বললাম, “সার্টিফিকেটে লেখা আছে। দেখুন”।

এষা হতভম্ব হয়ে বলল, “আপনি কি সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?”

“জ্বি, সার্টিফিকেটটা পকেটেই রাখি হিমালয় নাম বললে অনেকেই বিশ্বাস করে না, তখন সার্টিফিকেট দেখাই। ওরা তখন বড় ধরণের ঝাঁকি খায়”।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।এষা বলল, “আপনি কি চলে যাচ্ছেন?”

“হু।”

“এখন যাবেন না। একটু বসুন”।

আমার যেহেতু কখনোই কোনো তাড়া থাকে না— আমি বসলাম। রাত ন’টার মতো বাজে। এমন কিছু রাত হয়নি–কিন্তু এ বাড়িতে মনে হচ্ছে নিশুতি। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো মনে হয় এই ফ্ল্যাটের নয়। পাশের ফ্ল্যাটের।

এষা আমার সামনে বসে আছে। তার চোখে অবিশ্বাস এবং কৌতুহল একসঙ্গে খেলা করছে। সে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে, আবার জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। আমি তাদের কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তার দাদীমা রিকসা থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছেন। আমি ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে মাথা ব্যান্ডেজ করে বাসায়ে পৌছে বেতের সোফায় বসে আছি। এদের কাছে এই হচ্ছে আমার পরিচয়।

আমি খানিকটা উপকার করেছি। উপকারের প্রতিদান দিতে না পেরে পরিবারটা একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে।ঘরে বোধহয় চা-পাতা নেই। চাপাতা থাকলে এতক্ষণে চা চলে আসত। প্রায় আধঘণ্টা হয়েছে। এর মধ্যে চা চলে আসার কথা।

আমি বললাম, “আপনাদের বাসায় চা-পাতা নেই, তাই না?”

এষা আবারো হকচকিয়ে গেল বিস্ময় গোপন করতে পারল না। গলায় অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে বলল, “না, নেই। আমাদের কাজের মেয়েটা দেশে গেছে। ওই বাজার-টাজার করে। চা-পাতা না থাকায় আজ বিকেলে আমি চা খেতে পারিনি।"

“আমি কি চাপাতা এনে দেব?”

“না না, আপনাকে আনতে হবে না। আপনি বসুন। আপনি কী করেন?”

“আমি একজন পরিব্রাজক”।

“আপনার কথা বুঝতে পারছি না”।

“আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।”

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, “আপনি কি ইচ্ছা করে আমার প্রশ্নের উদ্ভট উদ্ভট জবাব দিচ্ছেন?”

আমি হাসিমুখে বললাম, “যা সত্যি তাই বলছি সত্যিকার বিপদ হল—সত্যি কথার গ্রহণযোগ্যতা কম। যদি বলতাম, আমি একজন বেকার, পথে-পথে ঘুরি, তা হলে আপনি আমার কথা সহজে বিশ্বাস করতেন”।

“আপনি বেকার নন?”

“জি-না। ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। তবে চাকরিবাকরি কিছু করি না। আজ বরং উঠি?”

“দাদীমা আপনাকে বসতে বলেছে”।

“উনি কী করছেন?”

“শুয়ে আছেন। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি যদি চলে যান তা হলে দাদীমা খুব রাগ করবেন।’

“তা হলে বরং অপেক্ষাই করি”।

আমি বেতে সোফায় বসে অপেক্ষা করছি। আমার সামনে বিব্রত ভঙ্গিতে এষা বসে আছে। বসে থাকতে ভাল লাগছে না তা বোঝা যাচ্ছে। বারবার তাকাচ্ছে ভেতরের দরজার দিকে।এর মধ্যে দু’বার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। উপকারী অতিথীকে একা ফেলে রেখে চলে যেতেও পারছে না। আজকালকার মেয়েরা অনেক স্মার্ট হয়। এষা ফট করে বলে বসে—আপনি বসে-বসে পত্রিকা পড়ুন, আমার কাজ আছে! এ তা বলতে পারছে না। আবার বসে থাকতেও ইচ্ছা করছে না। তার গায়ে ছেলেদের চাদর। বয়স কত হবে – চব্বিশ-পঁচিশ? কমও হতে পারে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমার জন্যে হয়তো বয়স বেশি লাগছে। গায়ের রঙ শ্যামলা। রঙটা আরেকটু ভাল হলে মেয়েটিকে দারুণ রুপবতী বলা যেত। শীতের দিনে ঠান্ডা মেঝেতে মেয়েটা খালিপায়ে এসেছে। এটা ইন্টারেস্টিং। যেসব মেয়ে বাসায় খালিপায়ে হাঁটাহাটি করে তারা খুব নরম স্বভাবের হয় বলে আমি জানি।

এষা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, “আমার পরীক্ষা আছে। আমি পড়তে যাব। একা একা বসে থাকতে কি আপনার খারাপ লাগবে?”

“খারাপ লাগবে না। পত্রিকা থাকলে দিন, বসে বসে পত্রিকা পড়ি। ‘আমাদের বাসায় কোন পত্রিকা রাখা হয় না।’

“ও আচ্ছা”।

টিভি দেখবেন, টিভি ছেড়ে দি?”

“আচ্ছা দিন”।

এষা টিভি ছাড়ল। ছবি ঠিকমত আসছে না। ঝাপসা ঝাপসা ছবি।

এষা বলল, “অ্যান্টেনার তার ছিড়ে গেছে বলে এই অবস্থা”।

“আমার অসুবিধা হচ্ছে না”।

“আমি খুব লজ্জিত যে আপনাকে একা বসিয়ে রেখে চলে যেতে হচ্ছে”।

“লজ্জিত হবার কিছু নেই”।

“আপনি কাইন্ডলি পাশের চেয়ারটায় বসুন। এই চেয়ারটা ভাঙা। হেলান দিয়ে পড়ে যেতে পারেন”।

আমি পাশের চেয়ারে বসলাম। কিছু-কিছু বাড়ি আছে - যার কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। এটা বোধহয় সেরকম একটা বাড়ি। দেয়ালে বাঁকাভাবে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, যার পাতা ওল্টানো হয়নি। ডিসেম্বর মাস চলছে—ধুলা জমে আছে। আমি ক্যালেন্ডার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালাম টিভির দিকে। নাটক হচ্ছে।

মাঝখান থেকে একটা নাটক দেখতে শুরু করলাম। এটা মন্দ না। পেছনে কি ঘটে গেছে আন্দাজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যাওয়া—নাটকে একটি মধ্যবয়স্ক লোক তার স্ত্রীকে বলছে—এ তুমি কি বলছ সীমা? না না না। তোমার এ কথা আমি গ্রহণ করতে পারি না। বলেই ভেউ ভেউ করে মুখ বাঁকিয়ে কান্না।

সীমা তখন কঠিন মুখে বলছে— চোখের জলের কোনো মূল্য নেই ফরিদ। এ পৃথিবীতে অশ্রু মূল্যহীন।

কিছুদুর নাটক দেখার পর মনে হল এরা স্বামী-স্ত্রী নয়। নাটকের স্ত্রীরা স্বামীদের নাম ধরে ডাকে না । সহপাঠী প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারে। মাঝবয়েসী প্রেমিক-প্রেমিকা ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে নাটক দেখছি। মাঝখান থেকে নাটক দেখার এত মজা আগে জানতাম না। জিগ-স পাজল এর মত। পাজল শেষ করার আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাটক শেষ হল। মিলনান্তক ব্যাপার। শেষ দৃশ্যে সীমা জড়িয়ে ধরেছে ফরিদকে। ফরিদ বলছে—জীবনের কাছে আমরা পরাজিত হতে পারি না সীমা। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে—পাখি আমার নীড়ের পাখি। নাটকের শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করার একটা নতুন স্টাইল শুরু হয়ে হয়েছে—যার ফলে গানটা ভাল লাগে, নাটক ভাল লাগে না।

আমি টিভি বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছি। এ বাড়ির ড্রয়িংরুমে সময় কাটাবার মতো কিছু নেই। একটি মাত্র ক্যালেন্ডারের দিকে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়।

দরজার কড়া নড়ছে। আমি দরজা খুললাম। সুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক। ছেলেমানুষি চেহারা। মাথাভর্তি চুল।এত চুল আমি কারোমাথায় আগে দেখিনি। হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল দরজার কড়া নেড়ে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছেন। আমি বললাম, “কি চাই?”

ভদ্রলোক ক্ষীণ গলায় বললেন, “এষা কি আছে?”

“আছে। ওর পরীক্ষা। পড়াশোনা করছে।”

"ও, আচ্ছা”।

ভদ্রলোক মনে হল আরো বিব্রত হলেন। আরো সংকুচিত হয়ে গেলেন। আগের চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, “আমি ওকে একটা কথা বলে চলে যাব”।

“কথা বলতে রাজি হবে কিনা জানি না”।

‘কাইন্ডলি একটু আমার কথা বলুন। বলুন মোরশেদ’।

‘মোরশেদ বললেই চিনবে?’

‘জ্বি’।

‘ভেতরে এসে বসুন, আমি বলছি’।

‘আমি ভেতরে যাব না।এখানেই দাঁড়াচ্ছি’।

‘আচ্ছা দাঁড়ান—কি নাম যেন বললেন আপনার—মোরশেদ?’

‘জ্বি, মোরশেদ’।

আমি কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করলাম। কি করা যায়? এখান থেকে এষা এষা করে ডাকা যায়। ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে কেমন হয়? এষা কোথায় পড়াশোনা করছে তা আমি জানি। ভেতরের বারান্দার এক কোণায় তার পড়ার টেবিল। দাদীমাকে ধরাধরি করে ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিতে গিয়ে আমি এষার পড়ার টেবিলে দেখেছি। আগে যেহেতু একবার ভেতরে যেতে পেরেছি, এখন কেন পারব না? এষা রেগে যেতে পারে। রাগুক না! মাঝে-মাঝে

রেগে যাওয়া ভাল। প্রচণ্ড রেগে গেলে শরীরের রোগজীবাণু মরে যায়। যারা ঘন ঘন রাগে তাদের অসুখবিসুখ হয় না বললেই চলে। আর যারা একেবারেই রাগে না, তারাই দুদিন পরপর অসুখে ভোগে। সবচে' বড় কথা, এষাকে খানিকটা ভড়কে দিতে ইচ্ছা করছে। আমাকে চুপচাপ বসিয়ে সে দিব্যি পড়াশোনা করবে তা হয় না। একটু হকচকিয়ে দেয়া যাক।

আমি পর্দা সরিয়ে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো ভেতরে ঢুকে গেলাম। এষা চেয়ারে পা তুলে বসেছে। বইয়ের উপর ঝুঁকে আছে। তার মনোযোগ এতই বেশি যে আমার বারান্দায় আসা সে টের পেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাচ্চা মেয়েদের মত পড়তেই থাকল। আমি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে খুব সহ গলায় বললাম, 'এষা, মোরশেদ সাহেব এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার সঙ্গে একটা কথা বলেই চলে যাবেন'।

এষা ভূত দেখার মতো চমকে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'ভদ্রলোককে কী চলে যেতে বলব? ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম, উনি রাজি হলেন না'।

এষা কঠিন গলায় বলল, 'আপনি দয়া করে বসার ঘরে বসুন। আপনি হুট করে ঘরে ঢুকে গেলেন কী মনে করে?'

আমি নিতান্তই স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'ভদ্রলোককে কি বসতে বলব?'

'তাঁকে যা বলার আমি বলব। প্লীজ, আপনি বসার ঘরে যান। আশ্চর্য, আপনি কী মনে করে ভেতরে চলে এলেন?'

আমি এষাকে হতচকিত অবস্থায় রেখে চলে এলাম। ভদ্রলোক বাইরে সিগারেট ধরিয়েছেন। আমাকে দেখে আস্ত সিগারেট ফেলে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি বললাম, 'ভেতরে গিয়ে বসুন, এষা আসছে'।

'আমাকে বসতে বলেছে?'

'তা বলেনি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি ভেতরে গিয়ে বসলে খুব রাগ করবে না।'

'আমি বরং এখানেই থাকি?'

'আচ্ছা, থাকুন'।

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় চলে এলাম। আপাতত রাস্তার দোকানগুলির কোন-একটিতে বসে চা খাব। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এষার কথাবার্তা শেষ হবে —আমি আবার ফিরে যাব। ফিরে নাও যেতে পারি। এই জগৎ সংসারে আগেভাগে কিছুই বলা যায় না।

শীতের রাতে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাবার অন্যরকম আনন্দ আছে। চা খেতে-খেতে মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে হয়। সারা শরীরে লাগবে কনকনে শীতের হাওয়া, হাতে থাকবে চায়ের কাপ। দৃষ্টি আকাশের তারার দিকে তারাগুলিকে তখন মনে হবে সাদা বরফের ছোট-ছোট খণ্ড। হাত দিয়ে ছুতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু ছোঁয়া যাবে না।

পরপর দু'কাপ চা খেয়ে তৃতীয় কাপের অর্ডার দিয়েছি, তখন দেখি মোরশেদ সাহেব হনহন করে যাচ্ছেন। মাটির দিকে তাকিয়ে এত দ্রুত আমি কাউকে হাঁটতে দেখিনি। আমি ডাকলাম—এই যে ভাই মোরশেদ সাহেব!

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। খুবই অবাক হয়ে তাকালেন। নিতান্তই অপরিচিত

কেউ নাম ধরে ডাকলে আমরা যেরকম অবাক হই সেরকম অবাক। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারছেন না। আশ্চর্য আত্মভোলা মানুষ তো! আমি বললাম, চা খাবেন মোরশেদ সাহেব?

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জি-না'।

'একটু আগেই দেখা হয়েছে'।

ভদ্রলোক আরো বিস্মিত হলেন। আমি বললাম, 'এখন কি চিনতে পেরেছেন?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'জ্বি জ্বি'। মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি তিনি মোটেই চেনেননি। আমি বললাম—এষার সঙ্গে কথা হয়েছে?

"জ্বি, হয়েছে। এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি এষার ছোটমামা। এষাকে ডেকে দিয়েছেন।"

"আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। আমি অবশ্যি এষার ছোটমামা না। সেটা কোনো বড় কথা না। এষা আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। এটাই বড় কথা।"

"এষা কথা বলেনি।"

"কথা বলেনি?'

"জি-না। আমাকে দেখে প্রচণ্ড রাগ করল। আপনি তো জানেন ও রাগ করলে কেদে ফেলে। কেদে ফেলল। তারপর বলল, বের হয়ে যাও এক্ষুণি বের হও। আমি চলে এসেছি"।

"ভাল করেছেন। আসুন চা খাওয়া যাক"।

"আমি চা খাই না। চা খেলে রাতে ঘুম হয় না"।

"তা হলে চা না খাওয়াই ভাল। এষা আপনার কে হয়?"

"ও আমার স্ত্রী"।
"আমি তাই আন্দাজ করছিলাম। চলুন যাওয়া যাক।"
"চলুন"।
বড় রাস্তায় গিয়ে ভদ্রলোক রিকসা নিলেন। খিলগাঁ যাবেন। রিকসাওয়ালাকে বললেন, "১৩২ নম্বর খিলগাঁ, একতলা বাড়ি। সামনে একটা বড় আমগাছ আছে"।
রিকসাওয়ালাকে এইভাবে বাড়ির ঠিকানা দিতে আমি কখনো শুনিনি। তিনি রিকসায় উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছোটমামা, "আপনি কোনদিকে যাবেন? আসুন আপনাকে নামিয়ে দি"।
"আমি এষার ছোট মামা নই"। কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে এইসব বলা অর্থহীন। তাঁর মাথায় ছোটমামার কাঁটা ঢুকে গেছে। সেই কাটা দূর করা এত সহজে সম্ভব না। আমি বললাম, মোরশেদ সাহেব আমি উল্টোদিকে যাব।
"আপনি এষাকে একটু বলবেন যে আমি সরি। একটা ভুল হয়ে গেছে।এরকম ভুল আর হবে না।"
"যদি দেখা হয় বলব। অবশ্যই বলব।"
"যাই ছোটমামা?"
"আচ্ছা, আবার দেখা হবে"।
আমি উল্টোদিকে হাঁটা ধরলাম। এষাদের বাড়িতে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। কি করব এখনো ঠিক করিনি। ঘণ্টাখানিক রাস্তায় হেঁটে মেসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। রাতের খাওয়া এখনো হয়নি - কোথায় খাওয়া যায়? কুড়ি টাকার একটা নোট পকেটে আছে।অনেক টাকা। কুড়ি কাপ চা পাওয়া যাবে। একজন ভিখিরির দুদিনের রোজগার। ঢাকা শহরে ভিখিরিদের গড় রোজগার দশ টাকা। এই তথ্য ইয়াদের কাছ থেকে পাওয়া সে হল আমার বোকা বন্ধুদের একজন। ইয়াদের অঢেল টাকা। টাকা বোকা মানুষকেও বুদ্ধিমান বানিয়ে দেয়। ইয়াদকে বুদ্ধিমান বানাতে পারেনি।ইয়াদদের পরিবারের যতই টাকা হচ্ছে, সে ততই বোকা হচ্ছে। ইয়াদ ভিখিরিদের উপর গবেষণা করছে। তার পিএইচডি থিসিসের বিষয় হল - ভাসমান জনগোষ্ঠীঃ আর্থ-সামাজিক নিরীক্ষার আলোকে। ইয়াদকে অনেক ডাটা কালেক্ট করতে হচ্ছে। আমি তাকে সাহায্য করছি। সাহায্য করার মানে হল—তার একটা বিশাল পেটমোটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।
তার কালো ব্যাগে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। কাগজপত্র ছাড়াও ছোট একটা টাইপ রাইটার। বোতলে ভর্তি চিড়া-গুড়। ইনসটেন্ট কফি, চিনি, ফাস্ট এইডের জিনিসপত্র। একগাদা লম্বা নাইলনের দড়িও আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—দড়ি কি জন্যে রে ইয়াদ? সে মুখ শুকনো করে বলেছে—কখন কাজে লাগে বলা তো যায় না। রেখে দিলাম। ভাল করিনি? ভাল করিনি—বলাটা ইয়াদের মুদ্রাদোষ কিছু বলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলবে—ভাল করিনি?
ভালো করিনি – বলাটা ইয়াদের মুদ্রাদোষ। কিছু বলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলবে – "ভালো করিনি?"
রাত একটার দিকে মজনুর দোকানে ভাত খেতে গেলাম। ভাতের হোটেলের সাধারণত কোনো নাম থাকে না। এটার নাম আছে। নাম হল—"মজনু মিয়ার ভাত মাছের হোটেল।"
বিরাট সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের এক মাথায় একটা মুরগির ছবি, আরেক মাথায়

ছাগলের ছবি। ভাত-মাছের ছবি নেই। মজনুর দোকানে ভাত খেতে যাওয়ার আদর্শ সময় হল রাত একটা। কাস্টমাররা চলে যায়। কর্মচারীরা দুটা টেবিল একত্র করে গোল হয়ে খেতে বসে। ওদের সঙ্গে বসে পড়লেই হল। মজনুর 'ভাত-মাছের হোটেলের ঝাঁপ ফেলে দেয়া হয়েছে। বয়-বাবুর্চি একসঙ্গে খেতে বসেছে। খাবার যা বাঁচে তাই শেষ সময়ে খাওয়া হয়। আজ ওদের ভাগ্য ভাল—রুই মাছ খাসি দুটাই বেঁচে গেছে। প্রচুর বেঁচেছে। শুধু ভাত নেই। অল্পকটা আছে, তাই একটা টিনের থালায় রাখা আছে। তরকারির চামচে এক চামচ করেও সবার হবে না।আমাকে দেখে এরা জায়গা করে দিল মজনু মিয়া বিরসমুখে বললেন, হিমু ভাই রোজ দেরি করেন। আপনার মতো কাস্টমার না থাকা ভাল। বড়ই যন্ত্রণা।

আমি বললাম, "ভাত নেই নাকি?"

"যা আছে আপনার হয়ে যাবে। আপনে খান। ওরা মাছ, গোছ খাবে। এতবড় পেটি একটা খেলে পেট ভরে যায়।"

"খানিকটা ভাত রান্না করে ফেললে কেমন হয়?"

"হিমু ভাই, আপনি আর যন্ত্রণা করবেন না তো রাত একটার সময় ভাত রানবে?"

"অসুবিধা কি?"

"অসুবিধা আছে। চাল নাই। পোলাওয়ের চাল সামান্য আছে—সকালে বিরানী হবে। এই, তোরা খা। আমি চললাম। আর শুনেন হিমু ভাই, আপনার ঐ পাগলা বন্ধু ইয়াদ সাহেবকে আমার এখানে আসতে নিষেধ করে দিবেন। আজ একদিনে দুইবার দুইবার এসেছে আপনার খোঁজে। দুইবারেই খুব যন্ত্রণা করেছে। বলে, চা দিন। দিলাম চা। বলে কাপ পরিষ্কার হয়নি। গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, আমি ডাবল দাম দিব। দিলাম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে।চা মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিয়ে বলে-চিনি কম দিয়ে আরেক কাপ দিতে বলুন, আমি ডবল দাম দিব কথায় কথায় ডবল দাম। আরে ডবল দাম চায় কে তার কাছে? এতগুলো কাস্টমারের সামনে যে খু করে চা ফেলল, আমার অপমান হয় না? আপনি আপনার বন্ধুকে বলে দিবেন।

"ইয়াদকে আমি বলে দেব"।

"আজেবাজে লোককে হোটেল চিনায়ে দিয়েছেন, এরা জান শেষ করে দেয়"।

মজনু মিয়া ক্যাশ নিয়ে চলে গেল। টিনের থালায় এক থালা ভাত নিয়ে আমরা ছ'জন মানুষ চুপচাপ বসে আছি। বাবুর্চির নাম মোস্তফা। মোস্তফা বসেছে আমার পাশে। সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। মোস্তফা বলল, "হিমু ভাই, আফনে খান। রুই মাছটা ভাল ছিল। আরিচার মাছ। খেয়ে আরাম পাইবেন"।

"আমি একা ভাত খাব, আপনারা শুধু তরকারি?"

"'অসুবিধা কিছু নাই ভাইজান"।

"অসুবিধা আছে। চুলা ধরান, পোলাওয়ের চাল বসিয়ে দিন। পোলাও রান্না করে ফেলুন। ভাল মাছ আছে, পোলাও দিয়ে আরাম করে খাই"।

বাবুর্চি অন্যদের দিকে তাকাল। সবার চোখই চকচক করছে। আমি বললাম, "মাছের তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করতে হবে। চুলা তো ধরাতেই হবে"।

মোস্তফা ক্ষীণ গলায় বলল, "মালিক শুনলে খুবই রাগ হইব"।

"শুনবে কেন? শুনবে না। তা ছাড়া আগামী দু দিন মালিক দোকানে আসবে না"।

"পোলাও বসাইয়া দিমু?"

"দিন"।

“সকালের জইন্যে মুরগি কাটা আছে। মোরগ-পোলাও বসাইয়া দিমু ভাইজান?”

“আইডিয়া মন্দ না। যাহা বাহান্ন তাহা পয়ষট্টি। পোলাও যখন হচ্ছে মোরগ পোলাওয়ে অসুবিধা কি! কতক্ষণ লাগবে?”

“ডাবল আগুন দিয়া রানলে আধা ঘণ্টার মামলা ভাইজান”।

“দিন ডাবল আগুন। সিঙ্গেল আগুনে আজকাল কিছু হয় না”।

মজনু মিয়ার ভাতমাছের দোকানের কর্মচারীদের চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। আমি বললাম, “রান্নাবান্না হোক, আমি আধ ঘণ্টা পর আসব”।

“চা বানাইয়া দেই ভাইজান? বইসা বইসা গরম চা খান।”

“চা খেয়ে খিদে নষ্ট করব না। ভাল-ভাল জিনিস রান্না হচ্ছে”।

আমি চলে গেলাম তরঙ্গিণী ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে। ডাকাডাকি করে মুহিব সাহেবের ঘুম ভাঙালাম। তিনি ষ্টোরের ভেতরেই ঘুমান। মুহিব সাহেব দরজা খুলে সহজ গলায় বললেন, “কি দরকার হিমুবাবু?”

'ছ' বোতল ঠাণ্ডা কোক দিন তো!’

মুহিব সাহেব ছ’টা বোতল পলিথিনের ব্যাগে করে নিয়ে এলেন। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রাত দেড়টায় কোক কি জন্যে।

“মুহিব সাহেব, সঙ্গে টাকা নেই। টাকা পরে দিয়ে যাব।”

“জ্বি আচ্ছা। আপনি আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন হিমু ভাই। খাসদিলে দোয়া করবেন”।

আবার কি হল?

“কিছু হয় নি।এমি বললাম। আজ আপনার জন্মদিন। একটা শুভদিন”।

“জন্মদিন আপনি জানতেন?”

“জানব না কেন? জানি। সকালবেলা একবার আপনার কাছে যাব ভেবেছিলাম—যেতে পারিনি ছুটি পেলাম না। যাক, তবু শুভদিনে শেষ পর্যন্ত দেখা হল”।

“শুভ দিনে দেখা হয়নি মুহিব সাহেব—এখন প্রায় দুটা বাজতে চলল।জন্মদিনের মেয়াদ শেষ। যাই—”

মুহিব সাহেব দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। ছ' বোতল কোক নিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। মজনু মিয়ার ভাত-মাছের হোটেলের লোকজন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ভাল শীত পড়েছে। শীতের সময় সবাই খুব দ্রুত হাঁটে। আমি ধীরে-ধীরে এগুচ্ছি। গায়ে শীত মাখিয়ে হাঁটতে ভাল লাগছে। রাতে হাঁটার সময় আপনাতেই আকাশের দিকে চোখ যায়। প্রাচীণ কালে মানুষ আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরুত। সব মানুষই বোধহয় সেই প্রাচীণ স্মৃতি তার জীনে বহন করে।

২

ঘরের ভেতর দু’টা চিঠি। একটির খাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে রূপার কাছে থেকে এসেছে। কার্টিস পেপারে ধবধবে সাদা খাম। খামের এক মাথায় রূপালি কালিতে এমবস করা রূপার নাম। সাদার উপর রূপালি ফোটে না, তবুও এটাই রূপার স্টাইল।

অন্য চিঠিটি ব্রাউন কাগজের। ঠিকানা ইংরেজিতে টাইপ করা। দুটা চিঠির কোনোটিতেই স্ট্যাম্প নেই—হাতে হাতে পৌছে দেয়া। আমি রূপার চিঠি পকেটে রেখে অন্যটা খুললাম।

যা ভেবেছি তাই—ইয়াদের লেখা। টাইপ করা চিঠি ইংরেজি ভাষায়—টেলিগ্রাফের ধরণে লেখা।

হিমু, খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় আছ?
ভিডিও ক্যামেরা কিনেছি। সব ভিডিও হবে।
ইয়াদ।

ঘরে থাকলেই ইয়াদের হাতে পড়তে হবে। সারা দিনের জন্যে আটকে যেতে হবে। আমার কাজ হবে তার পেটমোটা কালো ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—এখন যেহেতু ভিডিও ক্যামেরা কেনা হয়েছে—ভিক্ষুকদের ইন্টারভ্যু হবে ভিডিওতে। এতদিন ক্যাসেট রেকর্ডারে হচ্ছিল। ইয়াদের কাজকর্ম পরিষ্কার। তৈরি প্রশ্নমালা আছে—ইন্টারভ্যুর সময় তৈরি প্রশ্নমালার বাইরে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্নের নমুনা হল—

নাম?
স্ত্রী না পুরুষ?
বয়স?
শিক্ষা?
পিতার নাম?
ঠিকানা :
ক)স্থায়ী
খ)অস্থায়ী
কতদিন ধরে ভিক্ষা করছেন?
দৈনিক গড় তায় কত?
পরিবারের সদস্য সংখ্যা?
সদস্যদের মধ্যে কতজন ভিক্ষুক?
খাবার রান্না করে খান, না ভিক্ষালব্ধ খাবার খান?

এরকম মোট পঞ্চাশটা প্রশ্ন। একেকজনের উত্তর দিতে ঘণ্টাখানিক লাগে। এক ঘণ্টার জন্যে তাকে পাঁচ টাকা দেয়া হয়। পাঁচ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে নিয়ে অধিকাংশ ভিক্ষুকই চোখ কপালে তুলে বলেন, অতক্ষণ খাটনি করাইয়া এইডা কী দিলেন? আফনের বিচার নাই?

আমি ইয়াদকে বলার চেষ্টা করেছি, এ-জাতীয় প্রশ্ন অর্থহীন। ইয়াদ মানতে রাজি নয়। সে নাকি তিন মাস দিনরাত খেটে প্রশ্ন তৈরি করেছে। প্রশ্ন তৈরির আগে স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল দাঁড় করিয়েছে। কম্পুটার সফটওয়্যারে পরিবর্তন করেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তার বকবকানি শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছি, চুপ কর গাধা। সে খুবই অবাক হয়ে বলেছে—গাধা বলছিস কেন? আমাকে গাধা বলার পেছনে তোর কি কি যুক্তি আছে তুই পয়েন্ট ওয়াইজ কাগজে লিখে আমাকে দে। আমি ঠাণ্ডা মাথায় অ্যানালাইসিস করব। যদি দেখি তোর যুক্তি ঠিক না, তা হলে আমাকে গাধা বলার জন্যে তোকে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এ-জাতীয় মানুষদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আমি সবসময়

দূরে থাকার চেষ্টাই করি। আমি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াই। গাধাটা আমাকে খুঁজে-খুঁজে বের করে। একধরণের চোর-পুলিশ খেলা। আমি চোর—সে পুলিশ। যেহেতু চোরের বুদ্ধি সবসময়ই পুলিশের বুদ্ধির চেয়ে বেশি, সেহেতু সে গত এক সপ্তাহ আমার দেখা পায় নি। আজো পাবে না।

আমি আবার বের হয়ে পড়লাম। আমার কোনো রকম পরিকল্পনা নেই। প্রথমে রূপার কাছে যাওয়া যায়। ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। প্রিয় মুখ কিছুদিন পরপর দেখতে হয়। মানুষের মস্তিষ্ক অপ্রিয়জনদের ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। প্রিয়জনদের ছবি কোনো এক বিচিত্র কারণে কখনো সাজায় না। যে জন্যে চোখ বন্ধ করে প্রিয়জনদের চেহারা কখনোই মনে করা যায় না।

রূপাকে পাওয়া গেল না। রূপার বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন —ও তো ঢাকায় নেই।

এই ভদ্রলোক সহজ গলায় মিথ্যা বলেন। রূপা ঢাকায় আছে তা তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝতে পারছি।

"আমি বললাম, কোথায় গেছে?"

"সেটা জানার কি খুব প্রয়োজন আছে?"

"না, জানার প্রয়োজন নেই—তবু জানতে ইচ্ছা করছে।"

"ও যশোর গিয়েছে।"

"ঠিকানাটা বলবেন?"

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, "ঠিকানা দিতে চাচ্ছি না। ও অসুস্থ। আমরা চাই না অসুস্থ অবস্থায় কেউ ওকে বিরক্ত করে"।

"অসুস্থ অবস্থায় মানুষের বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন পড়ে। আমি ওর খুব ভাল বন্ধু"।

"ওর ঠিকানা দেয়া যাবে না।"

"ও কোথায় গেছে বললেন যেন?"

"যশোর।"

"খুব শিগগির ফেরার সম্ভাবনা নেই—তাই না?"

"দেরি হবে।"

আমি খুব চিন্তিত মুখে বললাম, "একটা ঝামেলা হয়ে গেল যে আজই প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় রুপার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল সে-ই আমাকে বাসায় আসতে বলেছে। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি বলছেন রূপা যশোরে। আপনার মত বয়স্ক, দায়িত্ববান একজন মানুষে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলবেন না। তাহলে রুপার সঙ্গে দেখা হল কী ভাবে?"

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন। কিছু বললেন না। তাঁকে মোক্ষম আঘাত করা হয়েছে। সামলে উঠতে সময় লাগবে। তাঁর মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখতে ভাল লাগছে।

"তোমার নাম হিমু না?"

"জ্বি"।

"মিথ্যা যা বলার তুমি বলেছ। রূপার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, ও যশোরে আছে। আমার সঙ্গে তুমি যে ক্ষুদ্র রসিকতা করার চেষ্টা করলে তা আর করবে না। মনে থাকবে?"

"জ্বি স্যার, থাকবে"।

"গেট আউট।"

"থ্যাংক ইউ স্যার।"

আমি চলে এলাম। এমন কঠিন ধরণের একজন মানুষ রূপার মতো মেয়ের বাবা কী করে হলেন ভাবতে-ভাবতে আমি হাঁটছি—রুপার চিঠি এখনো পড়া হয়নি। পড়লে তো ফুরিয়ে গেল। চিঠির এই হল ম্যাজিক। যতক্ষণ পড়া হয় না, ততক্ষণ ম্যাজিক থাকে। পড়ামাত্রই ম্যাজিক ফুরিয়ে যায়। কোথায় যাওয়া যায়? মেসে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ইয়াদ সেখানে নিশ্চয়ই বসে আছে। আমি মোরশেদ সাহেবের বাসার দিকে রওনা হলাম। খিলগাঁ—দূর আছে। অনেকক্ষণ হাঁটতে হবে। কোনো-একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাঁটতে ভাল লাগে। যদিও জানি মোরশেদ সাহেব কে পাওয়া যাবে না। কোনো-কোনো দিন এমন যায় যে কাউকেই পাওয়া যায় না। আজ বোধহয় সেরকম একটা দিন।

মোরশেদ সাহেব কে পাওয়া গেল না। দরজা তালাবন্ধ। তবে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। বাসার ঠিকানা বলার সমকয় তিনি বলেছিলেন–১৩২ নং খিলগাঁ, একতলা বাড়ি, সামনে বিরাট আমগাছ। সবই ঠিক আছে, শুধু আমগাছ নেই। শুধু এই বাড়ি না, আশেপাশের কোনো বাড়ির সামনেই আমগাছ নেই। মোরশেদ সাহেবের বাড়িতে দারোয়ান জাতীয় একজন কে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"এখানে কি আমগাছ কখনো ছিল?" সে বিরক্ত হয়ে বলল, "আমগাছ কেন থাকবে?"

যেন আমগাছ থাকাটা অপরাধ। আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, "আপনি এ বাড়িতে কতদিন ধরে আছেন?"

"ছোটবেলা থাইক্যা আছি।"

"এটা কি মোরশেদ সাহেবের কেনা বাড়ি?"

"জ্বে না, ভাড়া বাসা। তয় বেশিদিন থাকব না। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিছে।"

"আচ্ছা ভাই, যাই।"

"উনারে কিছু বলা লাগব?"

"না।"

আমি আবার হাঁটা ধরলাম রাত একটা পর্যন্ত পথে-পথে থাকতে হবে। ইয়াদ একটা পর্যন্ত আমার জন্যে বসে থাকবে না।তাকে রাত বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। নীতুর কঠিন নির্দেশ। নীতুর মতো মেয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা ইয়াদের পক্ষে সম্ভব না।

নীতুর সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়? ইয়াদের হাত থেকে বাঁচার সবচে ভাল উপায় হচ্ছে ইয়াদের বাসায় গিয়ে বসে থাকা। সে বসে থাকবে আমার মেসে, আমি বসে থাকব তার বাড়িতে। চোর-পুলিশ খেলার এরচে' ভাল স্ট্রাটিজি আর হয় না। ফুল প্রুফ।

ইয়াদের বাড়ি একটা হুলস্থূল ব্যাপার বাইরে থেকে মনে হয় জেলখানা। গেটটাও এমন যে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। বড় গেট কখনো খোলা হয় না।বড় গেটের সঙ্গে আছে একটা খোকা গেট। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সেটা খোলা হয়। বাড়িতে ঢুকতে হয় মাথা নিচু করে। একবার ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করে—কারণ তীব্র বেগে দুটা অ্যালসেশিয়ান ছুটে আসে। এদের একজন কুচকুচে কালো, অন্যজন ধবধবে শাদা। রঙ ভিন্ন হলেও এদের স্বভাব

অভিন্ন, দুজন ভয়ংকর হিংস্র, এদের একজনের নাম টুটি, অন্যজনের নাম ফুটি। দারোয়ান বলে—চুপ টুটি-ফুটি। এরা চুপ করে, তবে এমনভাবে তাকায় যাতে মনে হয় যে-কোনো সুযোগে এরা ঘাড় কামড়ে ধরবে।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত যেতে খানিকক্ষণ বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হয়। সেই বাগানও দারুন বাগান। এদের বাড়ি দোতলা—সিড়ি মার্বেল পাথরের বাড়ির বারান্দায় ইউ আকৃতিতে কিছু বেতের চেয়ার বসানো। মনে হয় প্রতিদিন চেয়ারগুলিতে রঙ করা হয়, কারণ যখনি আমি দেখি–ঝকঝক করছে। চেয়ারের গদিগুলির রঙ হালকা সবুজ। শাদা ও সবুজে যে এত সুন্দর কম্বিনেশন হয় তা ইয়াদদের বাড়িতে না এলে কখনো জানতে পারতাম না।

ঠিক মাঝখানের বেতের চেয়ারে নীতু বসে ছিল। নীতু হল নায়িকা-স্বভাবের মেয়ে। সব সময় সেজেগুজে থাকে এবং নায়িকাদের মতো চোখে থাকে সানগ্লাস। দিন-রাত সব সময়ই সানগ্লাস তাকে যখনি দেখি তখনি মনে হয়-সে পার্টিতে যাচ্ছে, কিংবা পার্টি থেকে ফিরেছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এই মেয়েটিকে একবার আমার দেখতে ইচ্ছা করে। সেটা বোধহয় সম্ভব না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, হাসিমুখে বলল—যাক, আপনাকে তাহলে পাওয়া গেল! ও খুব ব্যাকুল হয়ে আপনাকে খুঁজছে।

"ব্যাপার কি খোঁজ নিতে এলাম।"

"ব্যাপার কি আমি জানি না, ভিক্ষুক সম্পর্কিত কিছু হবে। আমি জানতেও চাইনি। আপনাকে এমন লাগছে কেন?"

"কেমন লাগছে?"

"মনে হচ্ছে ম্যানহোলের গর্তের কাজ করছিলেন–কাজ বন্ধ করে বেড়াতে এসেছেন। ফিরে গিয়ে আবার কাজ শুরু করবেন।"

"এতটা খারাপ?"

"হ্যাঁ, এতটাই খারাপ। আপনি কি গোসল করেন, না করেন না?"

"শীতের সময় কম করি—"

"বাথটাবে গরম পানি দিলে আপনি কি গোসল করবেন?"

"আমার প্রয়োজন নেই। নোংরা থাকতে ভাল লাগছে"।

"নোংরা থাকতে ভাল লাগছে মানে! এটা কোন ধরণের কথা?"

"রসিকতা করার চেষ্টা করছি।"

নীতু ঠোট বাঁকিয়ে বলল, "রসিকতা বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আপনি আসলেই নোংরা থাকতে ভালবাসেন। যাই হোক—আমার জন্যে হলেও দয়া করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসুন। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। আপনাক নতুন একসেট কাপড় দিচ্ছি। গায়ের কাপড় বাথটাবে রেখে আসবেন। ইস্ত্রি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

আমি হাসলাম। নীতু বলল, "হাসবেন না। হাসির কোনো কথা বলিনি। যান, বাথরুমে ঢুকে পড়ুন। কুইক"।

একদল মানুষ আছে—বাথরুম প্রেমিক। তারা অন্য কিছুতেই মুগ্ধ হয় না, বাথরুম দেখে মুগ্ধ হয়। আমি সেই দলে পড়ি না, কিন্তু ইয়াদের বাড়ির বাথরুমে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে-মনে বলি—'এ কী!' আজ আবার বললাম। বাথটাব ভর্তি পানি। সেই বাথটাব এতবড় যে ইচ্ছা করলে সাঁতার কাটা যায়। ডুব দেয়া যায়।

গোসল করতে-করতে সংগীত শ্রবণের ব্যবস্থা আছে। সংগীতের কন্ট্রোল অবশ্যি বাইরে। যে-রেকর্ড বাজানো হবে, স্পীকারের মাধ্যমে তা চলে আসবে বাথরুমে। এখন গান হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আহত হতেন, কারণ বাথটাবে শুয়ে আমি শুনছি তাঁর মায়ার খেলা। সখী বলছে,

ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে—
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পভূষণ, কোকিল, কুজিত কুঞ্জ।

প্রায় ঘণ্টাখানিক বাথরুমে কাটিয়ে বের হয়ে এলাম। গায়ে ধবধবে শাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, একটা হালকা নীল উলের চাদর। পায়ে দিয়েছি চটিজুতো সেগুলিও নতুন। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেরই লজ্জা লাগছে। নীতু বলল, "বাহ, আপনাকে ভাল দেখাচ্ছে! আসুন, চা খেতে আসুন"।

বিভিন্ন খাবারের জন্যে এদের বিভিন্ন ঘর আছে। চা খাবার জন্যে আছে টী-রুম। আমরা দু'জন টীরুমে বসলাম। পটভর্তি চা। সঙ্গে অ্যাশট্রে এবং টিনভর্তি সিগারেট। নীতু বলল, "চা নিন। সিগারেট নিন। যাবার সময় টিনটা নিয়ে যাবেন। এটা আপনার জন্যে"।

"আচ্ছা, নিয়ে যাব।" এখন আপনার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ খোলামেলা কথা বলব। যা জানতে চাইব আপনি দয়া করে উত্তর দেবেন।"

"দেব।"

"ইয়াদ আপনার কি রকম বন্ধু?"

"ভাল বন্ধু।"

"ভাল বন্ধু যদি হয় তাহলে ওকে আপনি গাধা বলেছিলেন কেন?"

"গাধা একধরণের আদরের ডাক। অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিতদের গাধা বলা যাবে না। বললে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। প্রিয় বন্ধুদেরেই গাধা বলা যায়। এতে প্রিয় বন্ধুরা রাগ করে না। বরং খুশি হয়।"

"আপনি কি জানেন ইয়াদ অন্য দশজনের মতো নয়? সে সবকিছু সিরিয়াসলি নেয়। আপনি গাধা বলায় সে সারা রাত ঘুমায়নি—জেগে বসে ছিল—একটা খাতায় নোট করছিল কেন তাকে গাধা বলা যাবে না।"

"আমি হাসতে-হাসতে বললাম, সে যা করছিল গাধা বলার জন্যে তা কি যথেষ্ট নয়?"

"না, যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে কখনো তাকে গাধা বলবেন না এবং তার মাথায় কোন অদ্ভুদ আইডিয়া ঢুকিয়ে দেবেন না।"

"আমি ওর মাথায় কোনো অদ্ভুদ আইডিয়া ঢোকাইনি।"

"ঢুকিয়েছেন—আপনি ওকে বলেছেন ভিক্ষুকদের জানতে হলে ভিক্ষুক হতে হবে। ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। ওদের মতো ভিক্ষা করতে হবে। বলেননি এমন কথা?"

"বলেছি?"

"আপনি তা বিশ্বাস করেন?"

"করি।"

"তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, কেউ যদি পিঁপড়াদের সম্পর্কে গবেষণা

করতে চায়, তা হলে তাকে পিঁপড়া হতে হবে, এবং পিঁপড়াদের সঙ্গে থাকতে হবে, পিঁপড়াদের খাবার খেতে হবে?”

“ওদের ভালমতো জানতে হলে তাই করতে হবে, কিন্তু সে উপায় নেই। ভিক্ষুকদের ব্যাপারে উপায় আছে। তা ছাড়া পিঁপড়া মানুষ না, ভিক্ষুকরা মানুষ।”

“আমি যে আপনাকে কী পরিমাণ অপছন্দ করি তা কি আপনি জানেন?”

“না, জানি না।”

“মাকড়সা আমি যতটা অপছন্দ করি আপনাকে তারচেয়ে বেশি অপছন্দ করি। আজ আমি বারান্দায় বসে ছিলাম। আপনি যখন আসছিলেন তখন ইচ্ছা করছিল–টুটি-ফুটিকে বলি–ধর ঐ লোকটাকে, ছিড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেল। বলেই ফেলতাম। নিজেকে সামলেছি। আমি নিজেকে কনট্রোল করেছি। আজ যা করেছি অন্য একদিন যে তা করতে পারব তা তো না। একদিন হয়তো সত্যি কুকুর লেলিয়ে দেব। নিন, আরেক কাপ চা খান”।

আমি আরেক কাপ চা নিলাম। নীতু বলল, “আপনার সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আপনি নাকি মহাপুরষ জাতীয় মানুষ। মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আমি তার একবিন্দুও বিশ্বাস করি না”।

“আমি নিজেও করি না।”

“কিন্তু কেউ-কেউ করে। আপনার অদ্ভুদ জীবনযাপন প্রণালীর জন্যেই করে। নোংরা কাপড় পরে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না। যদি হত, তা হলে ঢাকা শহরে তিন লক্ষ মহাপুরুষ থাকত। এই শহরে রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো মানুষের সংখ্যা তিন লক্ষ। বুঝতে পারছেন?”

“পারছি।”

“আপনার কোনো ক্ষমতা নেই তা বলছি না। একটা ক্ষমতা আছে। ভালই আছে। সেটা হল—সুন্দর করে কথা বলা। আপনি যা বলেন তা-ই সত্যি বলে মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা। রাস্তায়-রাস্তায় যারা অষুধ বিক্রি করে তাদেরও এই ক্ষমতা আছে। আপনি যদি দাঁতের মাজন কিংবা সর্বব্যথানিবারণী অষুধ বিক্রি করেন তাহলে বেশ ভাল বিক্রি করবেন।”

নীতুর সঙ্গে অন্যদের এক জায়গায় বেশ ভাল অমিল আছে। রাগের কথা বলতে-বলতে অন্যদের রাগ পড়ে যায়। তার রাগ বাড়তেই থাকে। আস্তে-আস্তে মুখ লাল হতে থাকে। একসময়-সারা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়। এখন যেমন হয়েছে। নীতু বলল, আমি অনেক কথা বললাম, আপনি তার উত্তরে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।

“আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না।”

“তা হলে আপনি কি স্বীকার করে নিলেন, আমি যা বললাম সবই সত্যি?”

“হ্যাঁ।”

“ইন দ্যাট কেইস আপনি কি আমার পরামর্শ শুনবেন?”

“হ্যাঁ, শুনব”।

“আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার মধ্যে যেসব অস্বাভাবিকতা আছে— একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট তা দূর করতে পারবে। আপনি অনেক দিন থেকেই মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অভিনয় করতে-করতে আপনার ধারণা হয়েছে আপনি একজন মহাপুরুষ।”

“এরকম কোনো ধারণা আমার হয়নি।”

“হয়েছে। ইয়াদের কাছে শুনেছি আপনি মজনু মিয়ার মাছ-ভাতের হোটেল নামে একটা হোটেলে ভাত খান। সেখানে এক রাতে বললেন—হোটেলের মালিক দু দিন হোটেলে আসবে না।এবং এই বলে কর্মচারীদের প্ররোচিত করলেন রোস্ট, পোলাওটোলাও রাঁধার জন্যে। করেননি?”

“হ্যাঁ, করেছি।”

“এগুলি হচ্ছে মহাপুরুষ সিনড্রম। নিজেকে আপনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছেন।”

“মজনু মিয়া কিন্তু দু দিন ঠিকই হোটেলে আসেনি।”

“তা আসেনি। কাকতালীয় ব্যাপার। মাঝে-মাঝে কাকতালীয় ব্যপার ঘটে। কেউ-কেউ সেসব ব্যাপার কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যেমন আপনি করেছেন। আপনি একজন অসুস্থ মানুষ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার।”

“আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমি চিকিৎসা করাব। আপনি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিন।”

“সত্যি করাবেন?”

“হ্যাঁ, সত্যি”।

“আমার কাছে কার্ড আছে। কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। আমি টেলিফোনেও উনার সঙ্গে কথা বলে রাখব।”

“আচ্ছা। আজ তা হলে উঠি?”

“আপনার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন না?”

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, ও আজ রাতে বাসায় ফিরবে না। নীতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তার মানে কি? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? আপনি কি আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন? আমাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছেন?

“তা না। আপনি শুধুশুধু রাগ করছেন। আমার মনে হচ্ছে ইয়াদ আজ রাতে বাসায় ফিরবে না। বললাম।”

“শুনুন হিমু সাহেব, আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না। আমি চালাকি পছন্দ করি না।”

নীতু বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। টিটি-ফুটি বারান্দায় বসে ছিল। নীতুকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল।লেজ নাড়া দিয়ে কুকুর কী বোঝাতে চেষ্টা করে? লেজ নেড়ে সে কি বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি? ভালবাসার পরিমাণও কি সে লেজ নেড়ে প্রকাশ করে? কেউ কি এই বিষয়টি নিয়ে রিসার্চ করেছে? ইয়াদের মতো কেউ একজন এসে ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করলেই পারে। “কুকুরের লেজ এবং ভালবাস।”

আমি মেসে ফিরলাম না।এত সকাল-সকাল ফেরা ঠিক হবে না। ইয়াদ হয়তো বসে আছে। রাস্তায় হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে। কেন জানি মাথায় ভোঁতা ধরণের যন্ত্রনা হচ্ছে। মেসে ফিরে যাওয়াই ভাল। মাথার যন্ত্রনা ইদানীং আমাকে কাবু করে ফেলছে। হালকাভাবে শুরু হয় – শেষের দিকে ভয়াবহ অবস্থা। এক সময় ইচ্ছা করে কাউকে ডেকে বলি, ভাই, আপনি আমার মাথাটা ছুরি দিয়ে কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিতে পারেন?

রুপার চিঠি এখনো পড়া হয়নি। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চিঠিটা পড়া যায়। আমি একটা রিকশা নিয়ে নিলাম। ইয়াদ আমার জন্যে মেসে বসে নেই। এটা একটা সুসংবাদ। আগের মতো টাইপ করা ইংরেজি নোট রেখে গেছে—

'খুঁজে পাচ্ছি না। জরুরি প্রয়োজন। দয়া করে যোগাযোগ কর। ভিডিও ক্যামেরা কিনেছি।

ইয়াদ।'

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার সময় মনে হল রুপার চিঠি আমার সঙ্গে নেই। নীতুদের বাসায় পুরানো কাপড়ের সঙ্গে ফেলে এসেছি। কাপড়গুলি ইতমধ্যে নিশ্চয়ই ধোপার বাড়িতে চলে গেছে। মাথার যন্ত্রনা বাড়ছে। এই অসহ্য তীব্র যন্ত্রনার উৎস কি? তীব্র আনন্দ যিনি দেন, তীব্র ব্যথাও কি তাঁরই দেয়া? কিন্তু তা তো হবার কথা না। যিনি পরম মঙ্গলময়, ব্যথা তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না। পাশের ঘরে হৈচৈ হচ্ছে। তাসখেলা হচ্ছে নিশ্চয়ই। আজ বৃহস্পতিবার। সপ্তাহে এই একটা দিন মেসে তাস খেলা হয়। শুধু তাস না, অতি সস্তার বাংলা মদ আনা হয়। যারা এই জিনিস খান না, তাঁরাও দু-এক চুমুক খান। সারা রাতই তাঁদের আনন্দিত কথাবার্তা শোনা যায়। এই আনন্দও কি তাঁর দেয়া?

ধুম-ধুম করে দরজায় কিল পড়ছে।

আমি ঘুমের ঘোরে বললাম, কে? কেউ জবাব দিল না। দরজায় শব্দ হতে থাকল। আমার সমস্যা হচ্ছে—শীতের ভোরে একবার লেপের ভেতর থেকে বের হলে আবার ঢুকতে পারি না। এখনো ঠিকমতো ভোর হয়নি—চারদিক আধার হয়ে আছে। কাঁচের জানালায় গাঢ় কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। এত ভোরে আমার কাছে আসার মতো কে আছে ভাবতে-ভাবতে দরজা খুলে দেখি—ইয়াদ। এই প্রচণ্ড শীতে তার গায়ে একটা ট্রাকিং সুন্ট। পায়ে কেডস জুতা। নিশ্চয় দৌড়ে এসেছে। চোখ-মুখ লাল। বড়-বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। ইয়াদ বলল, জগিং করতে বের হয়েছিলাম। ভাবলাম, একটা চান্স নিয়ে দেখি তোকে পাওয়া যায় কিনা। কতবার যে এসেছি তোর খোঁজে। এই ক দিন কোথায় ছিলি?

আমি জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। বাথরুমের দরজা ঠেলে ইয়াদও ঢুকে গেল। আমি মুখে পানি দিচ্ছি। ইয়াদ পাশে। সে বলল, ছিলি কোথায় তুই?

ইয়াদের স্বভাব-চরিত্রের একটি ভাল দিক হচ্ছে অধিকাংশ প্রশ্নেরই সে কোনো জবাব শুনতে চায় না। প্রশ্ন করা প্রয়োজন বলেই প্রশ্ন করে। জবাব দিলে ভাল, না দিলেও ক্ষতি নেই। সে প্রশ্ন করে যাবে তার মনের আনন্দে।

"হিমু।"

"কি?"

"কাল রাতে আমার বউকে তুই খামোকা ভয় দেখালি কেন?"

"ভয় দেখিয়েছি?"

"অফকোর্স ভয় দেখিয়েছিস—তুই তাকে বললি আমি নাকি রাতে ফিরব না। এদিকে আমি সত্যিসত্যি আটকা পড়ে গেলাম ছোটখালার বাসায়। ফিরতে ফিরতে

রাত দুটা বেজে গেছে। এসে দেখি নীতুর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে—পরিচিত-অপরিচিত সব জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে। ম্যানেজারকে পাঠানো হয়েছে সব হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে আসতে। ম্যানেজার ব্যাটা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে সেই গাড়ি ড্রেনে ফেলে দিয়েছে”।

“এই অবস্থা?”

“হ্যাঁ, এই অবস্থা। নীতুর হাইপারটেনশান আছে। অল্পতেই এমন নার্ভাস হয়। ওর একজন পোষা সাইকিয়াট্রিস্ট আছে।দুদিন পরপর তার কাছে যায়। একগাদা করে টাকা নিয়ে আসে।”

“তোর তো টাকা খরচ করার পথ নেই—কিছু খরচ হচ্ছে, মন্দ কি?”

“টাকা কোনো সমস্যা না, নীতুই সমস্যা। অল্পতেই এত আপসেট হয়—এই কারণেই তোকে খুঁজছি। নীতুকে সামলানোর ব্যাপারে কী করা যায়?”

“সামলানোর দরকার কী?”

“দরকার আছে। তোর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি। ভিখিরি হয়ে যাব। সাত দিনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। সাত দিন ভিখিরি হয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। ভিক্ষা করব।”

“সাত দিনে কিছু হবে না।”

“কত দিন লাগবে?”

“দু' বছর”।

“বলিস কী!”

“ঠিকমতো ওদের জানতে হলে ওদের একজন হতে হবে। ওদের একজন হতে সময় লাগবে।”

“নীতুকে সামলাবো কী করে?”

“যারা ছোটখাট ঘটনাতে আপসেট হয় তারা বড় ঘটনায় সাধারণত আপসেট হয় না। নীতু সামলে উঠবে। আরো বেশি-বেশি করে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে। তুই ঘর ছাড়ছিস কবে?”

ইয়াদ বিরক্ত গলায় বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? এটা তো তোর উপর নির্ভর করছে। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত তুই বললেই শুরু করব—তুই একটা ডেট বল। আমি নীতুকে বলি।

“আমি ডেট বলব কেন?”

“তুইও তো যাবি আমার সঙ্গে। আমি একা-একা পথে-পথে ভিক্ষা করব?”

“হ্যাঁ, করবি। তোরই ভিক্ষুকদের জীবনচর্চা দরকার। আমার না।”

“তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস না?”

“না।”

“ও মাই গড! আমি তো ধরেই রেখেছি তুই যাচ্ছিস। সেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।”

সকালবেলা খালিপেটে আমি সিগারেট খেতে পারি না। শুধুমাত্র বিরক্তিতে আমি সিগারেট ধরালাম। বিরক্তি ভাব গলার স্বরে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলে বললাম –তুই ভিক্ষা করতে যাবি, সেখানেও একজন ম্যানেজার নিয়ে যেতে চাস? তুই ভিক্ষা করবি। তোর ম্যানেজার টাকাপয়সার হিসাব রাখবে। খাওয়াদাওয়া দেখবে। ইট বিছিয়ে আগুন করে পানি ফোটাবে যাতে তুই ফুটন্ত পানি খেতে পারিস। যা ব্যাটা গাধা!”

ইয়াদ আহত গলায় বলল, “গাধা বলছিস কেন?”

“যে যা তাকে তাই বলতে হয়। তুই গাধা, তোকে আমি হাতি বলব? যা বলছি, বিদেয় হ।"

“চলে যেতে বলছিস?”

“হ্যাঁ, চলে যেতে বলছি—আর আসিস না।”

“আর আসব না?”

“না। তোকে দেখলেই বিরক্তি লাগে।”

“বিরক্তি লাগে কেন?”

“বেকুবদের সঙ্গে কথা বললে বিরক্তি লাগবে না?”

“গাধা বলছিস ভাল কথা, বেকুব বলছিস কেন?”

“বাথরুমে ঢুকে পড়েছিস-এই জন্যে বেকুব বলছি।”

ইয়াদ বলল, “ভুল করে বাথরুমে ঢুকে পড়েছি, খেয়াল করিনি। যাই”।

আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বললাম, “আচ্ছা যা, আর আসিস না।”

ইয়াদ বের হয়ে গেল। আমার মনে হল এতটা কঠিন না হলেও বোধহয় হত। তবে আমার কাছ থেকে এ ধরণের ব্যবহার পেয়ে সে অভ্যস্ত। তার খুব খারাপ লাগবে না লাগলেও সামলে উঠবে। ইয়াদকে আমার পছন্দ হয়। শুধু পছন্দ না, বেশ পছন্দ। রুঢ় ব্যবহার করতে হয় পছন্দের মানুষদের সঙ্গে। আমার বাবার উপদেশনামার একটি উপদেশ হল—

হে মানব সন্তান, তুমি তোমার ভালবাসা লুকাইয়া রাখিও । তোমার পছন্দের মানুষদের সহিত তুমি রুঢ় আচরণ করেও, যেন সে তোমার স্বরুপ কখনো বুঝিতে না পারে। মধুর আচরণ করবে দুজনের সঙ্গে নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ইহাই প্রথম পাঠ।

আমাদের মেসে সকালবেলা চা হয় না। চা খেতে রাস্তার ওপাশে ক্যান্টিনে যেতে হয়। সেই ক্যান্টিনে পৃথিবীর সবচে মিষ্টি এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচে’ গরম চা পাওয়া যায়। এই চা প্রথম দু দিন খেতে খারাপ লাগে। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে নেশা ধরে যায়। ঘুম থেকে উঠেই কয়েক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করে।

ক্যান্টিনে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম ইয়াদ আবার আসছে। সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। হয়তো আশা করছে আমি হাত ইশারা করে তাকে ডাকব। আমি কিছুই করলাম না। মুখ কঠিন করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইয়াদ সামনের চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, তুই কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা চিঠি ফেলে এসেছিলি। নিয়ে এসেছিলাম, দিতে ভুলে গেছি।

আমি ইয়াদের হাত থেকে চিঠি নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

ইয়াদ বলল, “পড়বি না?”

"একসময় পড়ব। তাড়া নেই।”

“নীতু বলে দিয়েছে এটা নাকি জরুরি চিঠি।”

“ও পড়েছে বুঝি?”

ইয়াদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, “মনে হয় পড়েছে। ওর খুব সন্দেহবাতিক। হাতের কাছে খাম পেলে খুলে পড়ে ফেলে। খামে যার নামই থাকুক সে পড়বেই। সরি”।

“তোর সরি হবার কিছু নেই। চা খাবি?”

“খাব।”

আমি ইয়াদকে চা দিতে বলে উঠে দাঁড়ালাম। সে বিস্মিত হয়ে বলল “যাচ্ছিস

কোথায়?”

“কাজ আছে।”

“চা-টা শেষ করি—তারপর যা।”

“সময় নেই—খুব তাড়া।”

আমি ইয়াদকে রেখে মেসে ফিরে এলাম। দরজা বন্ধ করে লেপের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আজ আমার কোনো প্ল্যান নেই—সারাদিন ঘুমাব। ঘুম এবং উপবাস। সন্ধ্যায় উপবাস ভঙ্গ করব এবং বিছানা থেকে নামব।

বিশ্রামের সবচে’ ভাল টেকনিক হল—কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়া। মায়ের পেটে আমরা যে-ভঙ্গিতে থাকি—সেই ভঙ্গিটি নিয়ে আসা। মায়ের পেটে গাঢ় অন্ধকার। কাজেই যেখানে বিশ্রাম বিতে হবে, সে-জায়গাটা হতে হবে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। তাপ হতে হবে সামান্য বেশি। কারণ জরায়ুর তাপ শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে তিন ডিগ্রী বেশি।

আমার ঘর এমিতেই অন্ধকার। কম্বলে নাক-মুখ ঢেকে অন্ধকার আরও বাড়ানো হল। আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়ামাত্র দরজার কড়া নাড়ল। আমাদের মেসের মালিক এবং ম্যানেজার জীবনবাবু মিহি গলায় ডাকলেন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।

জীবনবাবুর ডাকে সাড়া দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তিনি আমার কাছে মেসভাড়া পান না। মাসের শুরুতেই ভাড়া দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলেই চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়, তবে তা করা সম্ভব না। কারণ জীবনবাবুর ধৈর্য রবার্ট ব্রুসের চেয়েও বেশি। তিনি ডাকতেই থাকবেন। কড়া নাড়তেই থাকবেন। সিল্কের মতো মোলায়েম গলায় ডাকবেন। চুড়ির শব্দের মতো শব্দে কড়া নাড়বেন।

“হিমু ভাই, হিমু ভাই।”

“কি ব্যাপার?”

“ঘুমুচ্ছেন?”

“যদি বলি ঘুমুচ্ছি তাহলে কি বিশ্বাস করবেন?”

“একটু আসুন, বিরাট বিপদে পড়েছি”।

দরজা খুলতে হল। জীবনবাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, মাথায় বাড়ি পড়েছে হিমু ভাই। অকুল সমুদ্র পড়েছি।

“বলুন কি ব্যাপার?”

জীবনবাবু গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন। কোনো সাধারণ কথাই তিনি ফিসফিস না করে বলতে পারেন না। বিশেষ কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, কারণ আমি তাঁর কোনো কথাই প্রায় শুনতে পারছি না।

“আরেকটু জোরে বলুন জীবনবাবু। কিছু শুনতে পাচ্ছি না।”

“প্রতি বৃহস্পতিবার মেসের ছয় নম্বর ঘরে তাসখেলা হয় জানেন তো?”

“জানি।”

“গত রাতে তাসখেলা নিয়ে মারামারি। মুর্শিদ সাহেব মশারির ডাণ্ডা খুলে জহির সাহেবের মাথায় বাড়ি মেরেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড!”

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, “জহির সাহেব কি মারা গেছেন?”

“মারা যায় নাই—তবে বেকায়দায় বাড়ি পড়লে উপায় ছিল? খুনখারাবি হলে পুলিশ আগে কাকে ধরত? আমাকে। আমি হলাম মাইনোরিটি দলের লোক। হিন্দু। সব চাপ যায় মাইনোরিটির উপর। আপনারা মেজরিটি হয়ে বেঁচে গেছেন।”

“এইটাই আপনার বিশেষ কথা?”

“জ্বি”।

“আমাকে কিছু করতে বলছেন? তাস ওদেরকে কি না-খেলতে বলব?”

“না না, আপনার কিছু বলার দরকার নেই। ঘটনাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। খুনখারাবি যদি সত্যি কিছু হয়—তা হলে পুলিশের কাছে—আমার হয়ে দু-একটা কথা বলবেন”।

“আচ্ছা বলব। এখন তাহলে যান। আজ সারা দিন ঘুমাব বলে প্ল্যান করেছি। আজ হল আমার ঘুমদিবস।”

জীবনবাবু নড়লেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললাম, “আরো কিছু বলবেন?”

“জ্বি, বলব। মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।”

“তেমন জরুরি কিছু নয়। জরুরি হলে মনে পড়ত”।

“মনে পড়েছে—একজন মহিলা এসেছিলেন আপনার কাছে।”

“রূপা?”

“জ্বি-না—উনি না। উনাকে তো চিনি। যিনি এসেছিলেন তাঁকে আগে কখনো দেখেনি—নাম বলেছিলেন। নামটা মনে পড়ছে না। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি গেছে। মাইনোরিটির লোক তো— সারাক্ষণ টেনশনে থেকে থেকে ব্রেইন গেছে।”

“মেয়েটা কিছু বলে গেছে?”

“মেয়ে না তো, পুরুষমানুষ। আমাকে নাম বললেন, একবার না, কয়েকবার বললেন”।

“আপনি দয়া করে বিদেয় হন।”

“নামটা মনে করার চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে না। বললাম না। আপনাকে –ব্রেইন একেবারে গেছে। কিছুই মনে থাকে না। ঐদিন দুপুরে ভাত খেতে গেছি—অতসী, বলল—বাবা, তুমি না একটু আগে ভাত খেয়ে গেল। বুঝুন অবস্থ। এদিকে ব্লাডপ্রেশারও নেমে গেছে। ব্রাডপ্রেশার হয়েছে সিক্সটি। সিক্সটি ব্লাডপ্রেশার মানুষের হয় না। গরু-ছাগলের হয়। গরু-ছাগলের পর্যায়ে চলে গেছি হিমু ভাই......”

জীবানবাবুকে বিদেয়ে করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আশঙ্কা নিয়ে শুয়ে আছি। যে-কোনো মুহূর্তে ভদ্রলোকের নাম জীবনবাবুর মনে পড়বে তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে-দিতে ডাকবেন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।

ঘুম আনার চেষ্টা করছি। লাভ হচ্ছে না। কোনোভাবেই শুয়ে আরাম পাচ্ছি না। বুকপকেটে রাখা খামটা খচখচ করছে। তার চিঠিটা পড়ে ফেলা দরকার। চিঠি পড়ার মুহুর্ত আসছে না। প্রিয় চিঠি পড়ার জন্যে প্রয়োজন প্রিয় মুহুর্তের। আমার প্রিয় মুহূর্ত হল মধ্যরাত, যখন পৃথিবীর সব তক্ষক গম্ভীর স্বরে দু’বার ডেকে ওঠে।

দরজায় আবার ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। জীবনবাবু ডাকলেন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।

আমি জবাব না দিয়ে রূপার চিঠি বের করলাম।

“হিমু ভাই।”

“বলুন। কথা কি মনে পড়েছে?”

“জ্বি-না, মনে পড়েনি। অন্য একটা কথা বলতে এসেছি। বলব?”

“বলুন”।

“তাসখেলা নিয়ে উনাদের কিছু বলবেন না। রাগ করতে পারেন”।

"আচ্ছা বলব না। আর শুনুন জীবনবাবু, এখন একটা জরুরি কাজ করছি—চিঠি পড়ছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না। ঐ লোকের নাম মনে পড়লে—কাগজে লিখে ফেলবেন।"

" জ্বি আচ্ছা।"

ঘরে চিঠি পড়ার মত আলো নেই–আধো আলো আধো আঁধার আমি চিঠি পড়ছি—

ভেবেছিলাম তোমার জন্মদিনে উদ্ভট কিছু করে তোমাকে চমকে দেব। কি করা যায় অনেক ভাবলাম। দামী গিফটের কথা একবার মনে হয়েছিল। গিফটের ব্যাপারে তোমার আসক্তি নেই – মাঝখান থেকে টাকা নষ্ট হবে। তারপর ভাবলাম সব ক'টি দৈনিক পত্রিকায় একপাতার বিজ্ঞাপন দিই—বিজ্ঞাপনে লেখা থাকবে—শুভ জন্মদিন হিমু। বাবার ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে এনে বললাম পরিকল্পনার কথা। শুনে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। আমি বললাম—পরিকল্পনাটা আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?

তিনি বললেন, হচ্ছে।

আমি বললাম, তাহলে খোঁজ নিয়ে বলুন কত লাগবে। আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

তিনি বললেন,হিমু লোকটা কে?'

"আমার চেনা একজন। পাগলা ধরনের মানুষ।"

তিনি মাথা চুলকে বললেন, পাগলা ধরনের একজন মানুষের জন্মদিনের কথা যত কম লোক জানে ততই ভাল। দেশসুদ্ধ লোককে জানিয়ে লাভ কি?

ম্যনেজার চাচার কথা আমার মনে ধরল। আসলেই তো, সবাইকে জানিয়ে কী হবে? যার জানার কথা সেই তো জানবে না। তুমি নিজেই তো পত্রিকা পড় না।

ম্যনেজার চাচা বললেন, মা, তুমি সুন্দর দেখে একটা কার্ড কিনে লিখে দাও—হ্যাপি বাথ ডে। আমি অনাকে দিয়ে আসব। এক শ' টাকার মধ্যে গোলাপের তোড়া পাওয়া যায়, ঐ একটাও না হয় সঙ্গে দিয়ে দিব।

আমি বললাম, আচ্ছা, তাই করব।

ম্যনেজার চাচা চলে গেলেন যাবার সময় অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন আমার নিজের মাথার সুস্থতা নিয়েও তার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

হিমু, আমি আসলেই অসুস্থ বোধ করছি। নানান ধরনের ছোটখাটো পাগলামি করছি। ইচ্ছা করে যে করছি তা নয়। সেদিন বাবার সঙ্গে ঝগরা করলাম। আমার ছোটমামা স্টেটস থেকে মেম-বউ নিয়ে দেশে এসেছেন। সেই মেমসাহেবের সম্মানে পার্টি। সবাই সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে। আমি নিজেও খুব সেজেছি। গয়নাটয়না পরে একটা কান্ড করেছি—গাড়িতে ওঠার সময় কী যে হল, আমি বললাম, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা বললেন, তার মানে কি?

আমি বললাম, আমার রিসিপশনে যেতে ভাল লাগছে না।

"তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

"না, শরীর খারাপ লাগছে না—শুধু যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বাবা বললেন, তুমি আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে আস। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।

সবাই গাড়ি- বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বাবা আমাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলেন।

স্কুলের হেডমাষ্টারদের মতো গলার বললেন, সিট ডাউন ইয়াং লেডি।

আমি বসলাম। বাবা বললেন, তোমার ছোটমামাকে যে পার্টি দেয়া হচ্ছে সেই পার্টি আমরা দিচ্ছি। আমরা হচ্ছি হোস্ট। কাজেই আমাদের উপস্থিত থাকতেই হবে। তোমার শরীর খারাপ থাকলে তোমাকে কিছু বলতাম না। তোমার শরীর ভাল আছে। তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না, সেটা বুঝতে পারছি। অনেক সময় আমাদের অনেককিছু করতে ইচ্ছা করে না। তবু আমরা করি। মানুষ হয়ে জন্মালে সামাজিক রীতিনীতি মানতে হয়। এখন চল আমার সঙ্গে – সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, না।

বাবা খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছি ভেতরে-ভেতরে রাগে তিনি কাঁপছেন। তার পরেও রাগ সমলে নিয়ে বললেন, রূপা, তুমি না হয় খানিক্ষণ থেকে চলে এসো।

আমি আবারো বললাম, না।

বাবা আর কিছু বললেন না। আমাকে রেখে চলে গেলেন। খালি বাসায় আমি একা। তখন আবার মনে হল—কেন যে থাকলাম, চলে গেলেই হত।

হিমু, আমি এরকম হয়ে যাচ্ছি কেন বল তো? ইদানীং বিকট-বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। শুধু যে বিকট তাই না—নোংরা সব স্বপ্ন। এত নোংরা যে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কি দেখি জান? দেখি লম্বা রোগা বিকলাঙ্গ একজন মানুষ সমনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে।কুষ্ঠ রোগীর হাতের মত হাত। তার হাত থেকে পুঁজ, রক্ত আমার সারা গায়ে লেগে যাচ্ছে। চিৎকার করে জেগে উঠি। সারা গা ঘিনঘিন করতে থাকে। আমি বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে গা ধুই। হিমু, আমার কি হচ্ছে বল তো? আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে। তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। দেখা হলে বলতাম, আমার হাতটা একটু দেখে দাও তো!

কোথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব তা না, আজেবাজে সব কথা বলে সময় নষ্ট করছি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা নাও। আমি কথার কথা হিসেবে শুভেচ্ছা বলছি না। আমি মনেপ্রাণে কামনা করছি। তোমার দিন সুন্দর হোক।

রাতে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, যেন তুমি সুখে থাক। মধ্যবিত্তের সহজ সুখ নয়—অসাধারণ সুখ–খুব অল্প মানুষই যে-সুখের সন্ধান পায়।

তোমার সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় না। এবার দেখা হলে কী করব জান? এবার দেখা হলে তোমাকে যশোর নিয়ে আসব। এখানে আমাদের একটা খামারবাড়ি আছে। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। চারদিক গাছ-গাছড়ায় ঢাকা। বাড়ির সামনেই পুকুর। তোমাকে ঐ খামারবাড়িতে নিয়ে যেতে চাই—একটা জিনিস দেখানোর জন্যে—সেটা হচ্ছে—পুকুরের পানি কত পরিষ্কার হতে পারে সেটা স্বচক্ষে দেখা। শীত-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত সব সময় এই পুকুরের পানি কাঁচের মতো ঝকঝক করছে। আমি এই পুকুরের নাম দিয়েছি—“অশ্রুদিঘি। বল তো কেন?

আমার জীবনে অসংখ্য বাসনার একটি হচ্ছে কোনো-এক ভরা পূর্ণিমায় তোমার সঙ্গে অশ্রুদিঘিতে সাঁতার কাটব। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি সাতাঁর জানি না।

আচ্ছা হিমু, আমার এই চাওয়া কি খুব বড় কিছু চাওয়া? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই না। ঠিক করেছি এ জীবনে কিছু চাইব না। আলাদীনের চেরাগের

দৈত্য যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমাকে বলে-রূপা, চট-চট করে বল। তোমার তিনটা ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। তাহলে মাথা চুলকে আমি বলব, স্যার থ্যাংক য়্যু, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। আমার যা চাইবার তা চাইতে হবে হিমুর কাছে। ওকে একটু আমার কাছে এনে আপনি বিদেয় হোন। আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে।......

দরজায় মিহি করে টোকা পড়ছে। জীবনবাবু কয়েক বার কেশে ফিসফিস করে ডাকলেন, হিমু ভাই! হিমু ভাই!

আমি চিঠি পড়া বন্ধ রেখে বললাম, কি হল জীবন বাবু?

“নামটা মনে পড়েছে।”

“বলুন। বলে বিদেয় হোন”।

“এটা ছাড়াও আরো একটা কথা বলতে চাচ্ছি”।

“কাগজে লিখে রাখুন। আমি পরে পড়ব।"

“লিখে রাখতে গিয়েছিলাম—তারপর দেখি বল পয়েন্টে কালি নেই। আপনার কাছে কি বল পয়েন্ট আছে?”

আমি দরজা খুলে বললাম, “লিখতে হবে না। মুখে বলুন, শুনে নিচ্ছি”।

“তরঙ্গিণী স্টোর থেকে মুহিব সাহেব এসেছিলেন”।

“কিছু বলেছেন?”

“জ্বি-না, কিছু বললেনি”।

"ও, আচ্ছা।’ ‘প্রায় সারা দিন বসে ছিলেন। দুপুরে কিছু খানওনি। এক কাপ চা আনিয়ে দিয়েছিলাম—সেটাও

খাননি।”

“চা না খাওয়ারই কথা। মুহিব সাহেব চা পান সিগারেট কিছুই খান না। কি জন্যে এসেছিলেন কিছু বলেননি?”

“জ্বি-না।”

“আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তা হলে যান।”

“অন্য আরেকটা কথা হিমু ভাই। গোপন কথা।”

“বলুন কি বলবেন?”

জীবনবাবু বসলেন। মাথা নিচু করে বসলেন। অসহায় বসার ভঙ্গি।

“খুব বিপদে পড়েছি হিমু ভাই। ভয়ংকর বিপদ।”

“বলুন”।

“আজ থাক, অন্য একদিন বলব।”

“আপনার মেয়ে ভাল আছে তো?”

“জ্বি জ্বি । মেয়ে ভাল আছে। ওর কোনো সমস্যা নয় মেয়েটার বিয়েও মোটামুটি ঠিকঠাক। সিরাজগঞ্জের ছেলে। কাপড়ের ব্যবসা আছে। অতসীকে দেখে পছন্দ করেছে। তিন লাখ টাকা পণ চাচ্ছে। দেব তিন লাখ টাকা। মেসবাড়িটা বেচে দেব। একটাই তো মেয়ে। আমিও একা মানুষ— মেয়ে বিয়ে দিয়ে বাকি জীবণটা হোটেলে কাটিয়ে দেব বুদ্ধিটা ভাল না হিমু ভাই?”

“হ্যাঁ, ভাল।”

“আমি আজ উঠি, অন্য আরেকদিন এসে আমার বিপদের কথাটা বলব।”

“আমাকে বললে আপনার বিপদ কি কমবে? যদি মনে করেন বিপদ কমবে, তা হলে বলুন। আর যদি বিপদ না কমে, শুধুশুধু কেন বলবেন?”

রুপার চিঠির শেষটা আমার পড়া হল না। চিঠি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম –আজ থাক। অন্য কোনো সময় পড়া যাবে।

৪

বড় রাস্তার ফুটপাতে উবু হয়ে বসে বয়স্ক এক ভদ্রলোক ঠোঙ্গা থেকে বাদাম নিয়ে নিয়ে খাচ্ছেন। খাওয়ার ব্যাপারটায় বেশ আয়োজন আছে। খোসা থেকে বাদাম ছড়ানো হয়। খোসাগুলি রাখা হয় সামনে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বাদামে ফু দিতে থাকেন। ফুয়ের কারণে বাদামের গায়ে লেগে থাকা লাল খোসা উড়ে যায়। তখন তিনি অনেক উপর থেকে একটা একটা করে বাদাম তাঁর মুখে ফেলেন। আমি কৌতুহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার মতো আরো কয়েকজন কৌতুহলী হয়েছে। তারাও দেখি দূর থেকে তাকিয়ে আছে।

ভদ্রলোক শেষ বাদামের টুকরো মুখে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, ছোটমামা না?

আজ তিনিই প্রথম আমাকে চিনলেন। আমি চিনতে পারিনি। এখন চিনলাম— মোরশেদ সাহেব। ঐদিন স্যুট-টাই পরা ছিলেন, আজ পায়জামা পাঞ্জাবি চাদর। ভদ্রলোককে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে আরো সুন্দর লাগছে।

“কি করছিলেন মোরশেদ সাহেব?”

“বাদাম খাচ্ছিলাম। অনেক দিন বাদাম খাই না। একটা ছেলে গরমগরম বাদাম ভাজছিল। দেখে লোভ লাগল। দু’ টাকার কিনলাম। অনেকে হাঁটতে-হাঁটতে বাদাম খেতে পারে। আমি পারি না। ফুটপাতে বসে বাদাম খাচ্ছিলাম। লোকজন এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমি একটা পাগল”।

“আপনি ভাল আছেন?”

“জ্বি ছোটমামা ভাল”।

“এষা, এষা কেমন আছে?”

“মনে হয় ভালই আছে। আর খারাপ থাকলেও আমাকে বলবে না।”

“আপনি গিয়েছিলেন কি এর মধ্যে গিয়েছিলেন ওর কাছে?”

“আমি তো দু-তিন দিন পরপর যাই। ও খুব বিরক্ত হয়। তার পরেও যাই।”

“যান ভাল করেন। নিজের স্ত্রীর কাছে যাবেন না তো কার কাছে যাবেন?”

মোরশেদ সাহেব বিষন্ন গলায় বললেন, “এষাকে এখনও স্ত্রী বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ও উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছে। ডিভোর্স চায়”।

“নোটিশ কবে পাঠিয়েছে?”

“কবে পাঠিয়েছে সেই তারিখ দেখিনি। আমি পেয়েছি আজ। মন খুব খারাপ

হয়েছে। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না ছোটমামা, নোটিশ পাওয়ার পর আমার চোখে পানি এসে গেল। সকালে যখন নাশতা খাচ্ছি তখন নোটিশটা এসেছে। তারপর আর নাশতা খেতে পারি না। পরোটা ছিড়ে মুখে দিয়েছি। চাবাচ্ছি তো চাবাচ্ছিই, গলা দিয়ে আর নামছে না। এক ঢোক পানি খেলাম, যদি পানির সঙ্গে পরোটা নেমে যায়। পানি পেটে চলে গেল কিন্তু পরোটা মুখে রইল"।

"আসুন মোরশেদ সাহেব, কোথাও গিয়ে বসি। আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। সারা দিনই বোধহয় হাঁটাহাঁটি করছেন?"

"জ্বি। দুপুরেও কিছু খাইনি। এমন খিদে লেগেছে। তারপর বাদাম কিনে ফেললাম দু' টাকার। কিনতাম না, ছেলেটা গরম গরম বাদাম ভাজছিল। দেখে খুব লোভ লাগল।"

আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গেলাম সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। সময় কাটানোর জন্যে খুব ভাল জায়গা। জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়ে গল্প করে। দেখতে ভাল লাগে। এরা যখন গল্প করে তখন মনে হয় পৃথিবীতে এরা দু জন ছাড়া আর কেউ নেই। কোনদিন থাকবেও না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-বর্ষা কোনোকিছুই এদের স্পর্শ করে না। একবার ঘোর বর্ষায় দু'জনকে দেখেছি ভিজে-ভিজে গল্প করছে। মেয়েটি কাজল পরে এসেছিল। পানিতে সেই কাজল ধুয়ে তাকে ডাইনীর মত লাগছিল। সেই ভয়ংকর দৃশ্যও ছেলেটির চোখে পড়ছে না। সে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে।

"মোরশেদ সাহেব।"

"জ্বি?"

"কিছু খাবেন? এখানে ভ্রাম্যমান হোটেল আছে, চা, কোল্ড ড্রিংস এমনকি বিরিয়ানীর প্যাকেট পর্যন্ত পাওয়া যায়।"

"আমি কিছু খাব না। আচ্ছা ছোটমামা, আপনি আমাকে মোরশেদ সাহেব ডাকেন কেন? আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আপনি হচ্ছেন এষার মামা"।

"আচ্ছা তাই ডাকব। এখন বলুন তো দেখি–এষা আপনাকে ডিভোর্স দিতে চাচ্ছে কেন?"

"আমি তো মামা অসুস্থ। খারাপ ধরণের এপিলেন্সি। ডাক্তাররা বলেন গ্রান্ডমোল। একেকবার যখন অ্যাটাক হয় ভয়ংকর অবস্থা হয়। অসুখের জন্য চাকরি টাকরি সব চলে গেছে।"

"অ্যাটাক কি খুব ঘন ঘন হয়?"

"আগে হত না। এখন হচ্ছে।"

"চিকিৎসা করাচ্ছেন না?"

"চিকিৎসা তো মামা নেই। ডাক্তাররা কড়া ঘুমের অষুধ দেন। এগুলি খেয়ে-খেয়ে মাথা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাসার সামনে কোনো আমগাছ নেই। কিন্তু যখনই আমি বাইরে থেকে বাসায় যাই তখনি আমি দেখি বিশাল এক আমগাছ"।

"চোখে দেখেন?"

"জ্বি, দেখি। শুধু গাছটা দেখি তাই না, গাছে পাখি বসে থাকে, সেগুলি দেখি। ওরা কিচিরমিচির করে, সেই শব্দ শুনতে পাই"।

"বলেন কী!"

মোরশেদ সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে

কথা বলা দরকার। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করে না। তার উপর শুনেছি ওরা অনেক টাকা নেয়। জমানো টাকা খরচ করে করে চলছি তো মামা। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে”।

“আমার চেনা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। আমি একদিন তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।”

“জ্বি আচ্ছা। চলুন, আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি”।

“আমি এখন বাসায় যাব না মামা। উকিল নোটিশটা টেবিলে ফেলে এসেছি। বাসায় গেলেই নোটিশটা চোখে পড়বে। মনটা খারাপ হবে। এখানে বসে থাকতেই ভাল লাগছে।”

“বেশ, তাহলে বসে থাকুন”।

মোরশেদ সাহেব ইতস্তত করে বললেন, “মামা, আপনি কি একটু এষার সঙ্গে কথা বলে দেখবেন? কোনো লাভ হবে না জানি, তবু যদি একটু...”

“আমি বলব”।

“আমার একটা ক্যামেরা আছে। ক্যামেরাটা বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি। হাত এক্কেবারে খালি হয়ে এসেছে। দেখবেন তো কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বিয়ের সময় কিনেছিলাম। এষার খুব ছবি তোলার শখ ছিল। ওর জন্যেই কেনা”।

“আচ্ছা দেখব, ক্যামেরা বিক্রি করা যায় কিনা”।

“থ্যাংকস মামা”।

“আপনি সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গেও একটু কথা বলবেন। কত টাকা নেন, এইসব।”

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে এলাম। মোরশেদ সাহেব পা তুলে সন্ন্যাসীর ভঙ্গিতে বসে আছেন। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগছে।

নীতু একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিয়েছিল। কার্ডটা হারিয়ে ফেলেছি। নীতুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আসতে হবে।

৫

নীতুর সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের নাম ইরতাজুল করিম। নামের শেষে বি সি ডি অনেক অক্ষর এতগুলি অক্ষর যিনি জোগাড় করেছেন তাঁর অনেক বয়স হবার কথা, কিন্তু ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক এবং হাসিখুশি। মুখে জর্দা দেয়া পান। বিদেশি ডিগ্রীধারী ভদ্রলোকেরা জর্দা দেয়া পান খান না। আর খেলেও বাড়িতে চুপিচুপি খান। কেউ এলে দাঁত মেজে বের হন। এই ভদ্রলোক দেখি বেশ আয়েশ করে পান খাচ্ছেন। এবং পিক করে অ্যাশট্রেতে পানের পিক ফেলছেন। তাঁর চেম্বারটাও সুন্দর। অফিস-অফিস লাগে না, মনে হয় ড্রয়িংরুম। ডাক্তার সাহেবের ঠিক মাথার উপর ক্লদ মানের আঁকা water lily-র বিখ্যাত পেইনটিং-এর প্রিন্ট। প্রিন্ট দেখতেই এত সুন্দর, আসলটা না জানি কত সুন্দর! আমি ডাক্তার সাহেবের সামনের চেয়ারটায় বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কেমন আছেন হিমু সাহেব?

“জ্বি ভাল।”

“ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী মিসেস নীতু অনেক দিন আগেই আপনার ব্যাপারে আমাকে

টেলিফোন করেছিলেন। তাও একবার না, দু'বার। তাদের মত ফ্যামিলি থেকে যখন দু'বার টেলিফোন আসে তখন চিন্তিত হতে হয়। আমি চিন্তিত হয়েই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আরাম করে বসুন তো।"

আমি নড়েচড়ে বসলাম। ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, "আসতে এত দেরি করেছেন কেন?"

"টাকাপয়সা ছিল না, তাই দেরি করেছি। আপনি কত টাকা নেন তা তো জানি না।"

"আমি অনেক টাকা নিই। তবে টাকা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার চিকিৎসার সমস্ত ব্যায়ভার মিসেস নীতু নিয়েছেন।"

"আমি তাহলে অসুস্থ?"

"উনার তাই ধারণা।"

"আপনার কী ধারণা ডাক্তার সাহেব?"

"আপনার সঙ্গে খানিকক্ষন কথাবার্তা না বল ধরতে পারব না।"

"কথাবার্তা বললেই ধরতে পারবেন?"

"হ্যাঁ পারব। পারা উচিত। অবশ্যি আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে সত্যি কথা বলতে হবে। আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। অধিকাংশ লোক তাই করে—সাইকিয়াট্রিস্টদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।"

"বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থেকেই তো আপনার ধরতে পারার কথা—লোকটি কী চায়? তার সমস্যা কি?"

"ধরতে চেষ্টা করি। সব সময় পারি না। মানুষের ব্রেইন নিয়ে আমাদের কাজকর্ম—সেই ব্রেইন কেমন জটিল তা কি আপনি জানেন হিমু সাহেব?"

"জানি না, তবে আঁচ করতে পারি।"

"না"।

"আপনি আঁচও করতে পারেন না। মানুষের ব্রেইনে আছে এক বিলিয়ন নিউরোন। এক-একটি নিউরোনের কর্মপদ্ধতি বর্তমানে আধুনিক কম্পুটারের চেয়ে জটিল। বুঝতে পারছেন কিছু?"

"না।"

"বুঝতে পারার কথাও না। এখন আমরা কথা বলা। শুরু করি। আপনি বেশ রিলাক্সড ভঙ্গিতে নিজের কথা বলুন তো শুনি। যা মনে আসে বলতে থাকুন। নিজের কথা বলুন, নিজের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের কথা বলুন, বন্ধুবান্ধবের কথা বলুন।চা খেতে-খেতে, সিগারেট খেতে-খেতে বলুন"।

"আমাকে কি কোচে শুয়ে নিতে হবে না?"

"না, ঐসব ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেছে। আপনি শুরু করুন।"

"আপনার কি তাড়া আছে ডাক্তার সাহেব?"

"না, আমার কোনো তাড়া নেই। অন্যসব রোগী বিদায় করে দিয়েছি। আপনি হচ্ছেন–বিশেষ এক রোগী, ভেরি স্পেশাল। চা দিতে বলি, নাকি কফি খাবেন?"

"চা কফি কিছুই লাগবে না। যা শুনতে চাচ্ছেন বলছি। দু'ভাবে বলতে পারি—সাধারণভাবে কিংবা ইন্টারেস্টিং করে। কীভাবে শুনতে চান?"

"সাধারণভাবেই বলুন। ইন্টারেস্টিং করার প্রয়োজন দেখছি না। আমার ধারণা এমনিতেই ইন্টারেস্টিং হবে।"

“আমি কি পা উঠিয়ে বসতে পারি?”

“পারেন।”

আমি জীবন-ইতিহাস শুরু করলাম।

“ডাক্তার সাহেব, আমার বাবা ছিলেন একজন অসুস্থ মানুষ। সাইকোপ্যাথ। এবং আমার ধারণা খুব খারাপ ধরনের সাইকোপ্যাথ। তাঁর মাথায় কি করে যেন ঢুকে গেল —মহাপুরুষ তৈরি করা যায়। যথাযথ ট্রেনিং দিয়েই তা করা সম্ভব। তাঁর যুক্তি হচ্ছে —ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার, ডাকাত, খুনী যদি শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এ তৈরি করা যায়, তাহলে মহাপরুষ কেন তৈরি করা যাবে না? অসুস্থ মানুষদের চিন্তা হয় সিঙ্গেল ট্র্যাকে। তাঁর চিন্তা সেইরকম হল—তিনি মহাপরুষ তৈরির খেলায় নামলেন। আমি হলাম তাঁর একমাত্র ছাত্র। তিনি এগুলেন খুব ঠাণ্ডা মাথায়। তাঁর ধারণা হল, আমার মা বেঁচে থাকলে তিনি তাঁকে এ-জাতীয় ট্রেনিং দিতে দেবেন না। কাজেই তিনি মা’কে সরিয়ে দিলেন।”

“সরিয়ে দিলেন মানে?”

“মেরে ফেললেন।”

“কী বলছেন এসব!”

“আমি অবশ্যি মা’কে খুন হতে দেখিনি। তেমন কোনো প্রমাণও পাইনি। বাবা প্রমাণ রেখে খুন করবেন এমন মানুষই না। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। তাঁর মাথা এত ঠাণ্ডা যে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হয়তো তিনি অসুস্থ ছিলেন না। অসুস্থ মানুষ এত ভেবেচিন্তে কাজ করে না। অসুস্থ মানুষের মাথা এত পরিষ্কার থাকে না।”

“তারপর বলুন”।

“আপনার কাছে কি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?”

“অবশ্যই ইন্টারেস্টিং, তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।”

আমি হেসে ফেললাম।

ডাক্তার সাহেব বললেন, “হাসছেন কেন?”

আমি বললাম, “গল্প বলে আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা বলছি সবই সত্যি। আপনাকে গল্প ছাড়াই আমি বিভ্রান্ত করতে পারি”।

“করুন তো দেখি!”

আমি হাসিমুখে কিছুক্ষণ ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, “আপনার বাড়িতে এই মুহুর্তে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনার ছোট মেয়ে কিছুক্ষণ আগে তার পায়ে কিংবা হাতে ফুটন্ত পানি ফেলেছে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে”।

“আপনি আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন?”

“জ্বি, বলছি”।

ইরতাজুল করিম সাহেব অ্যাসট্রেতে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, “আপনি কি চান আমি বাসায় টেলিফোন করি?”

“করুন।”

ডাক্তার সাহেব টেলিফোন করতে লাগলেনলাইন এনগেইজড পাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের চোখ-মুখ শক্ত হতে শুরু করেছে। তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখছেন, আবার ডায়াল করছেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে আগ্রহ নিয়ে ডাক্তার

সাহেবকে দেখছি। ডায়াল করতে করতে তিনি আমার দিকে সরু চোখে তাকাচ্ছেন।

লাইন পেতে তাঁর দশ মিনিটের মতো লাগল। এই দশ মিনিটে তিনি ঘেমে গেলেন। কপাল ভর্তি ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। লাইন পাবার পর তিনি কাঁপা গলায় বললেন, "কে, কে?"

ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছি না। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা থেকে বুঝতে পারছি ওপাশে তাঁর স্ত্রী ধরছেন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, "কেমন আছ? সবাই ভাল? শুচি কী করছে? টিভি দেখছে? আমার আসতে দেরি হবে। আচ্ছা রাখি"।

তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে রাগী গলায় বললেন, "আমার ছোটমেয়ে শুচি ভাল আছে। টিভি দেখছে। আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন?"

"ভয় তো দেখাইনি বিভ্রান্ত করেছি। আপনার মতো অতি আধুনিক একজন মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলেন। কাজেই দেখুন—বিভ্রান্ত করতে চাইলে আমি করতে পারি। আমি কি আমার জীবনবৃত্তান্ত বলব, না আপনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন?"

"বলুন। সংক্ষেপে বলুন। ডিটেইলসে যেতে হবে না"।

"সংক্ষেপেই বলছি—বাবা আমাকে মহাপুরুষ বানানোর কাজে লেগে গেলেন। আমাকে সংসার, চারপাশের জীবন, অপরূপ প্রকৃতি প্রসঙ্গে নিরাসক্ত করতে চাইলেন"।

"কীভাবে?"

"বুদ্ধি খাটিয়ে আসক্তি কাটানোর তিনি নানা পদ্ধিতি বের করেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে বলছেন বলেই পদ্ধতিগুলি আর বর্ণনা করছি না।"

"একটি পদ্ধতি বলুন"।

"একবার বাবা আমার জন্যে একটা তোতা পাখি আনলেন। আমার বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ। আমি পাখি দেখে মুগ্ধ। বাবা বললেন, তোতা খুব সহজে কথা শিখতে পারে। তুই ওকে কথা শেখা। রোজ এর কাছে দাঁড়িয়ে বলবি—হিমু, হিমু। একদিন দেখবি সে সুন্দর করে তোকে ডাকবে—হিমু। হি...মু...। আমি মহাউৎসাহে পাখিকে কথা শেখাই। একদিন সত্যি-সত্যি সে পরিষ্কার গলায় ডেকে উঠল—হিমু, হিমু। আমি আনন্দে কেদে ফেললাম। বাবা তখন পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করে একটানে মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন।"

ডাক্তার সাহেব চাপা গলায় বললেন, "মাই গড!"

আমি হাসিমুখে বললাম, "আপনি চাইলে আরো দু-একটা পদ্ধতির কথা বলতে পারি। বলব?"

"না, থাক। আমি আর শুনতে চাচ্ছি না।"

"মানুষের চরিত্রের ভয়ংকর দিকগুলিও আমি যেন জানতে পারি বাবা সেই ব্যবস্থাও করলেন। কিছু ভয়ংকর ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাকে বাস করতে পাঠালেন। তাঁরা সম্পর্কে আমার মামা। পিশাচ-চরিত্রের মানুষ। বলতে পারেন আমার জীবনের একটা অংশ পিশাচদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তবে মামারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যাকে বলে অন্ধ স্নেহ। পাগলদের বিচিত্র মানিসকতা যেন আমি ধরতে পারি সে জন্যে তিনি প্রায়ই বাসায় পাগল ধরে নিয়ে আসতেন যত্ন করে দুদিন-তিন দিন রাখতেন। একজন এসেছিল ভয়াবহ উন্মাদ। সে রান্নাঘর থেকে বটি

এনে আমার গায়ে কোপ বসিয়েছিল। পিঠে এখনো দাগ আছে। দেখতে চান?”

“না। আজ বরং থাক। আর শুনতে ভাল লাগছে না। এক সপ্তাহ পর ঠিক এই দিনে আবার কথা বলব। আমি ডাইরিতে লিখে রাখলাম। একটু রাত করে আসুন, দশটার দিকে”।

“চলে যেতে বলছেন?”

“হ্যাঁ, চলে যান। আমার নিজের শরীরও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনার গল্প আমাকে এফেক্ট করেছে। যাবার আগে শুধু বলে যান—আপনার বাবার এক্সপেরিমেন্ট কি সফল হয়েছে?”

আমি উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম—সফল হয়নি। বাবার এক্সপেরিমেন্টে ত্রুটি ছিল। তিনি মানুষের অন্ধকার দিকগুলিই আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। আলোকিত দিক দেখাতে পারেননি। আমার প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের কাছাকাছি একজন মানুষ—যে আমাকে শেখাবে—ভালবাসা, আনন্দ, আবেগ এবং মঙ্গলময় মহাসত্য। আমি নিজে এখন সেইরকম মানুষই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। পেলে বাবার এক্সপেরিমেন্টের ফল দেখতে পারতাম।

“আপনি বিশ্বাস করনে মহাপুরুষ হওয়া সম্ভব?”

“হ্যাঁ, করি। ডাক্তার সাহেব, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কিছু-একটা বলি, তা লেগে যায়। আপনাকে যখন বললাম আপনার মেয়ে গরম পানিতে পুড়ে গেছে তখন আমি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম যে তাই ঘটেছে। আপনি হয়ত লক্ষ করেননি যে আমি বলেছি আপনার সবচে’ ছোট মেয়ে। আমি জানতাম না আপনার কয়েকটি মেয়ে আছে।”

“কাকতালীয় ব্যাপার, হিমু সাহেব।’ ঠিক কাকতালীয় নয়। আপনি কি আরেকবার টেলিফোন করে দেখবেন?’ না। আপনি একবার আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি দ্বিতীয়বার আমাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ আপনাকে দেব না। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ, তবে আমাকে বোকা ভাবারও কারণ নেই”।

আমি হেসে ফেলাম। ডাক্তার সাহের বললেন, আপনি কোথায় যাবেন বলুন? আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে নামিয়ে দিব।

“চলুন”।

বেশির ভাগ ডাক্তার নিজের গাড়ি নিজেই চালান। শিক্ষকরা যেমন সবাইকে ছাত্র মনে করেন, ডাক্তাররাও সেরকম সবাইকে রোগী ভাবেন। গাড়িও তাঁদের কাছে রোগীর মত। নিজের রোগী অন্যকে দিয়ে ভরসা পান না বলে নিজেদের গাড়ী নিজেরাই চালান। তবে ইনি ব্যতিক্রমী ডাক্তার। কারণ তাঁর গাড়ী ড্রাইভার চালাচ্ছে। তিনি হাত-পা ছড়িয়ে পেছনে সীটে বসেছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম।

“পান খাবেন হিমু সাহেব?”

“জ্বি-না।”

“পান খাওয়ার এক বিশ্রী অভ্যাস এক রোগী আমাকে ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আমি জন্মেও পান খেতাম না। সেই রোগী রূপার তৈরী এক পানের কৌটা বের করে বলল, পান খাবেন ডাক্তার সাহেব? আমি কৌটা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটা পান নিলাম। সেই থেকে শুরু। এখন দিনরাত পান খাই। পান কেনা হয় পণ হিসাবে।”

“সব বড় জিনিস ছোট থেকে শুরু হয়।’ for start by killing a bird, you

end by killing a man. আপনি নামবেন কোথায়?"

"যে-কোনো একজায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।"

"সে কী। পার্টিকুলার কোথাও নামতে চান না?"

"জ্বি-না। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আমার এক বন্ধুকে কি আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন। উনিও কি আপনার মতো?"

"না। আমার কেউ কারো মতো নই ডাক্তার সাহেব। আমরা সবাই আলাদা।"

"আমার কাছে আনতে চাচ্ছেন কেন?"

"ঐ ভদ্রলোকের একটা সমস্যা আছে। উনি থাকেন খিলগাঁয়। একতলা বাসা। উনার বাড়ির সামনে কোনো গাছপালা নেই। কিন্তু উনি সবসময় বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ দেখেন। এর মানে কি?"

"ভদ্রলোককে একবার নিয়ে আসবেন।"

"আচ্ছা, আনব।"

"হিমু সাহেব।"

"জ্বি?"

"চলুন আমার সঙ্গে। আমার বাসায় চলুন—একসঙ্গে ডিনার করব। আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তি নেই।"

"আমরা ধানমণ্ডি তিন নাম্বার রোডে কম্পাউন্ড দেয়া দোতলা বাসার সামনে থামলাম। গেটটা খোলা। গেটের সামনে জটলা হচ্ছে। জানা গেল—এই বাড়ির ছোট মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে গরম পানির গামলায় পড়ে ঝলসে গেছে। তাকে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার ইরতাজুল করিম ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। আমি একা-একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তার সাহেব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরলেন। যান্ত্রিক গলায় বললেন, "চেম্বার থেকে ফিরে আমি সবসময় গরম পানিতে গোসল করি। ঘরে ওয়াটার হীটার আছে। আজই হীটারটি কাজ করছিল না বলে আমার জন্যে পানি গরম করেছে"।

আমি বললাম, "খুব বেশি পুড়েছে?"

ডাক্তার সাহেব নিচু গলায় বললেন, "হ্যাঁ। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে"।

"চলুন, আমারাও হাসপাতালে যাই।"

ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, "আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে না। সরি, আপনাকে আজ ডিনার খাওয়াতে পারছি না"।

মোরশেদ সাহেব সম্ভবত বাসায় ফেরেননি। এখন সবে সন্ধ্যা। যাদের ঘরে কোনো আকর্ষণ নেই তারা সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে না। ঠিক সন্ধ্যায় তারা একধরনের অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়। এই অস্থিরতা শুধু মানুষের বেলাতেই যে হয় তা না—পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও হয়। সেই কারণেই হয়তো সব ধর্মে সন্ধ্যা হল উপাসনার সময়। মনের অস্থিরতা দূর করে মনকে শান্ত করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। পরম

রহস্যময় মহাশক্তির কাছে আবেদন—আমাকে শান্ত কর। আমার অস্থিরতা দূর কর।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।

খোলা গেট দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর অন্ধকার, তবে দরজার তালা নেই। কয়েকবার ধাক্কা দিতেই মোরশেদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন। মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। মাথা ভেজা।

“কি ব্যাপার মোরশেদ সাহেব?”

“কিছু না ছোটমামা। আসুন, ভেতরে আসুন”।

“শরীর খারাপ?”

“জ্বি, দুপুরে একবার এপিলেপটিক সিজার হল। মেঝেতে পড়েছিলাম। ঘরে কেউ ছিল না।”

“একা থাকেন?”

“জ্বি”।

“বাতি জ্বালাননি কেন? সন্ধ্যাবেলা বাড়িঘর অন্ধকার দেখলে ভাল লাগে না।”

মোরশেদ সাহেব বাতি জ্বালালেন । আমি বসতে-বসতে বললাম, "আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই? ওদের কাউকে সঙ্গে এন রাখতে পারেন না? আপনি অসুস্থ মানুষ। একজন কারো তো আপনার সঙ্গে থাকা দরকার"।

"ছোটভাই আছে। সে কানডায় থাকে। ছোটবোন ঢাকাতেই আছে। ওর নিজের স্বামী-সংসার আছে। ওকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করে না। আমি হলাম সবার বড়।"

"এষার সঙ্গে কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে?"

"জ্বি, দেখা হয়েছে। ও এসেছিল।"

"নিজেই এসেছিল। বাহ, ভাল তো।"

"ওর দাদীমাকে নিয়ে এসেছিল। আমাকে বোঝাল যে ডিভোর্সই আমাদের দু'জনের জন্যে মঙ্গলজনক। আমিও দেখলাম এষা ঠিকই বলছে। তা ছাড়া বেচারি আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছে না। আমি তো জোর করে কাউকে ধরে রাখতে পারি না।"

"তা তো বটেই। পশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়, মানুষকে যায় না।"

"আমি এষার সঙ্গে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে কাগজপত্র সই করে এসেছি।"

"ভাল করেছেন।"

"এষার জন্যে হয়ত ভাল করেছি, আমার জন্যে না। আমার মনটা খুব খারাপ। মামা, আপনাকে চা করে দি। ঘরে আর কিছু নেই—শুধু চা।"

"শুধু চাই দিন। রান্নাবান্না কি আপনি নিজেই করেন?"

"চা-টা নিজেই বানাই, বাকি খাবার হোটেল থেকে খেয়ে আসি। সেখানেও বেশিদিন যাওয়া যাবে না। গেলেই টাকার জন্যে তাগদা দেয়। আচ্ছা মামা, আমার ক্যামেরাটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন? এর সঙ্গে আলাদা একটা ঝুম লেন্স আছে। লেন্সটা আমার ভাই কানাডা থেকে পাঠিয়েছে।"

"না না, তায় হয় না। ছোট ভাই তো। আপনি ক্যামেরা বিক্রির ব্যবস্থা করে দিন।"

"ক্যামেরা বিক্রির টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কী করবেন?"

"আমি বেশিদিন বাঁচব না, ছোটমামা। আমার শরীর খুব খারাপ। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আগে ছিল না।"

"কি উপসর্গ?"

"মাথার ভেতরে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে। ঝিঁঝিঁ শব্দ হয়। সবসময় যদি হত তা হলে আমি অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। সবসময় হয় না। মাঝে-মাঝে হয়।"

আমি চা খেলাম। মোরশেদ সাহেবের ঘর-দুয়ার দেখলাম। একা মানুষ, কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। দেখতে ভাল লাগে।

"মোরশেদ সাহেব।"

"জ্বি ছোটমামা?"

"আপনার ঘর তো খুব সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে ছবি নেই কেন? আপনার এত দামী ক্যামেরা। ঘরভর্তি ছবি থাকা উচিত।"

"ছবি ছিল। অনেক ছবি ছিল। সব এষার ছবি। এষা বলল, আমার ছবি দিয়ে ঘর ভর্তি করে রাখার তো কোনো মানে নেই। তোমার এখন উচিত আমাকে দ্রুত ভুলে যাওয়া। ছবি থাকলে তুমি তা পারবে না। তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবে। তোমার নতুন স্ত্রী আমার ছবি দেখলে রাগ করবে। ছবিগুলি তুমি আমাকে দিয়ে

দাও। আমি দিয়ে দিলাম।”

“ভাল করছেন। চলুন আমরা এখন বের হই।”

“কোথায় যাব?”

“আমার একটা চেনা ভাতের হোটেল আছে, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। ওদের রান্না খুব ভাল। তারচে’ বড় কথা—বাকিতে খাওয়া যাবে। মাস পুরালেই টাকা দিতে হবে তাও না। একসময় দিলেই হবে।”

মোরশেদ সাহেব উজ্জ্বল মুখে বলল, “চলুন। ক্যামেরাটা কি এখন দিয়ে দেব?”

“দিন।”

মজনু মিয়া আমাকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল, “হিমু ভাই। আপনার সাথে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে”।

“প্রাইভেট কথা শুনব, তার আগে আপনি আমার ভাগ্নেকে দেখে রাখুন। এর নাম মোরশেদ। এ আপনার এখানে খাবে। টাকাপয়সা একসময় হিসেব করে দেয়া হবে। আপনি খাতায় লিখে রাখবেন।”

মজনু মিয়া বিরস মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, “অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কেন?”

“আপনার সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে।”

“বলুন প্রাইভেট কথা, শুনছি।”

“আসেন, বাইরে আসেন।”

আমি মোরশেদকে বসিয়ে বাইরে এলাম। মজনু মিয়া দুঃখিত গলায় বলল, “আমি আপনারে খুবই পেয়ার করি, হিমু ভাই”।

“তা আমি জানি।” আপনার উপর মনটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। কাজটা আপনি কী করলেন?”

“কোন কাজ?”

“ঐদিন দুপুররাতে মোস্তফাকে বললেন, মোরগ-পোলাও কর। আপনারা সাতটা মানুষ মিলে চারটা মুরগি খেয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েছেন ভাল করেছেন—চার মুরগির জন্য মজনু মিয়া মরে যাবে না।”

“তা হলে সমস্যা কি?”

“ঐ রাতে আপনে বললেন, আমি দুই দিন হোটেলে আসব না। বলেন নাই?”

“বলেছি।”

“কথাটা আপনে এদের বলতে পারলেন, আমারে বলতে পারলেন না? আপনাকে বললে কী হত?”

“আমি সাবধান থাকতাম। সাবধান থাকলে কি অ্যাকসিডেন্ট হয়?”

“অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?”

মজনু মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, “আপনি এমন একটা ভাব ধরলেন যেন কিছুই জানেন না। আপনি পীর-ফকির মানুষ—কামেল আদমী—এটা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। আপনারে যে খাতির করি—ভালবাসা থেকে যতটা করি, ভয়ে তারচে বেশি করি। কখন কি ঘটনা ঘটবে এটা আপনি আগেভাগে জানেন। জানেন না?”

আমি কিছু বললাম না। মজনু মিয়া বলল, “আপনি ঠিকই জানতেন যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হবে। রিকশা থেকে পড়ে পা মচকে যাবে। তার পরেও আমাকে না বলে অন্য সবেরে বললেন। কাজটা কি ঠিক হল হিমু ভাই?”

“বেশি ব্যথা পেয়েছেন?”
“অল্পের জন্যে পা ভাঙ্গে নাই। মচকে গেছে। সাত দিন হয়ে গেছে, এখনো ঠিকমতো পা ফেলতে পারি না। চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।”
“আপনার প্রাইভেট কথা শেষ হয়েছে মজনু মিয়া?”
“জ্বি, শেষ হয়েছে। আবার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন—দেখে তো মনে হয়—মাথা আউলা। ইয়াদ সাহেবের মতো যন্ত্রণা করবে।”
“ইয়াদ কি এখনো আসে? তাকে তো আসতে নিষেধ করেছি।”
“না, উনি আর আসেন না। উনি আছেন কেমন?”
“জানি না কেমন। অনেক দিন দেখা হয় না। ভালই আছে মনে হয়—মজনু মিয়া, ক্যামেরা কিনবেন?”
“ক্যামেরা?”
“জ্বি, ক্যামেরা মিনোলটা। সঙ্গে ঝুম লেন্স আছে।”
“আমি ক্যামেরা দিয়ে কি করব? আমি বেচি ভাত।”
“ভাতের ছবি তুলবেন। পৃথিবীতে সবচে’ সুন্দর ছবি হল—ভাতের ছবি। ধবধবে শাদা”।
মজনু মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, “আপনি বড় উল্টাপল্টা কথা বলেন হিমু ভাই। আগা-মাথা কিছুই বুঝি না।”
“ক্যামেরা কিনবেন না?”
“জ্বি-না।”
“জিনিসটা কিন্তু ভাল ছিল। সস্তায় ছেড়ে দিতাম।”
“মাগনা দিলেও আমি নিব না, হিমু ভাই। আসেন চা খান। নাকি ভাত খাবেন? ভাল সরপুটি আছে।”
“ভাত খাব না। ক্যামেরা বিক্রির চেষ্টা করতে হবে। চলি মজনু মিয়া।”
আমি চলে গেলাম তরঙ্গিণী স্টোরে। মুহিব সাহেব নেই। নতুন একটি ছেলে বিরস মুখে দরজা বন্ধ করছে। রাত মাত্র এগারোটা, এর মধ্যই দোকান বন্ধ। আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাল আছেন? সে সরু চোখে তাকাল। কিছু বলল না।
“মুহিব কোথায়?”
“উনার চাকরি চলে গেছে। উনি কোথায় আমি জানি না।”
“চাকরি গেল কেন?”
“জানি না। মালিক জানে। আপনে উনার কে হন?”
“কেউ হই না। টেলিফোন করতে এসেছি। টেলিফোন করা যাবে?”
“জ্বি-না। মালিকের নিষেধ আছে।”
“পাঁচটা টাকা যদি আপনাকে দিই তাহলে করা যাবে?”
লোকটা টেলিফোন খুলে দিল। আমি ডায়াল ঘোরাতে-ঘোরাতে বললাম, মুহিবকে বদলে আপনাকে নেয়া মালিকের ঠিক হয়নি। আপনার হল চোর-স্বভাব। মাত্র পাঁচ টাকার জন্যে মালিকের নিষেধ অমান্য করেছেন। এক শ’ টাকার জন্যে দোকান খালি করে দেবেন।
লোকটা আমার দিকে ভীত চোখে তাকাচ্ছে। আমি তাকে অগ্রাহ্য করে বললাম, “হ্যালো”।

ওপাশ থেকে ডাক্তার ইরতাজুল করিম বললেন, “কাকে চাচ্ছেন?”

“আপনাকে। আমি হিমু। চিনতে পারছেন?”

“পারছি। কি চান?”

“কিছু চাচ্ছি না। আপনি কি ক্যামেরা কিনবেন? ভাল ক্যামেরা।”

“হিমু সাহেব, রাতদুপুরে আমি রসিকতা পছন্দ করি না।”

“এটা কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা না। এর সঙ্গে দু'জন মানুষের ভালবাসার এবং ভালবাসা ভঙ্গের ইতিহাস জড়ানো আছে। আমি আপনাকে সস্তায় দেব।”

খট করে শব্দ হল। ডাক্তার ইরতাজুল করিম টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমি নীতুকে টেলিফোন করলাম। নীতু আমার গলা খুব ভাল করে চেনে। তবু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, “আপনি কে বলছেন?”

আমি বললাম, “সরি, রং নাম্বার হয়েছে”।

নীতু তৎক্ষণাৎ বলল, “রং নাম্বার হয়নি। আপনি ঠিকই করেছেন। ইয়াদকে চাচ্ছেন? ও বাসায় নেই”।

“আমি ইয়াদকে চাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

“আমার সঙ্গে আবার কী কথা?”

“জরুরি কথা।”

“টেলিফোনে বলা যাবে? টেলিফোনে বলা না গেলে, আপনি চলে আসুন। গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন বলুন”।

“গাড়ি পাঠাতে হবে না। টেলিফোনে বলা যাবে। আপনি কি একটা ক্যামেরা কিনবেন?”

“কি কিনব?”

“ক্যামেরা। সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা। অটোম্যাটিক ম্যানুয়েল দুটাই আছে। প্লাস একটা ঝুম লেন্স। সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও ভাল জিনিস।”

“চোরাই মালের ব্যাবসা কবে থেকে শুরু করলেন?”

“চোরাই মাল নয়। জেনুইন পার্টির ক্যামেরা। কিনবেন কিনা বলুন”।

“আপনার কী করে ধারণা হল যে আমার ক্যামেরা নেই? সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা কেনার জন্যে আমি আগ্রহী...?'

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, “খুব যারা বড়লোক, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসের প্রতি তাদের একধরনের আগ্রহ থাকে। বঙ্গবাজারে যেসব পুরানো কোট বিক্রি হয়—তাদের বড় ক্রেতা হলেন কোটিপতিরা। তারাই আগ্রহী ক্রেতা”।

“কোটিপতিদের সম্পর্কে আপনার খুব ভ্রান্ত ধারণা হিমু সাহেব। কোটিপতিদের কোনোকিছু সম্পর্কেই আগ্রহ থাকে না। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমি তর্কে যেতে চাচ্ছি না। আপনার ক্যামেরা আমি কিনব না। তবে কত টাকার আপনার দরকার আমাকে বলুন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি”।

“হাজার পাঁচেক দিতে পারবেন?”

“এখন পাঠাব?”

“জ্বি, পাঠিয়ে দিন”।

“কোথায় আছেন ঠিকানা বলুন। “আমাকে পাঠাতে হবে না। আমি এক ভদ্রলোকের ঠিকানা দিচ্ছি—তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।”

আমি মোরশেদ সাহেবের ঠিকানা দিলাম। টেলিফোনে শুনতে পাচ্ছি—নীতু

খসখস করে লিখছে।
“হিমু সাহেব।”
“জ্বি?”
“আপনার একটা চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে ছিল। পেয়েছেন? ইয়াদকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।”
“পেয়েছি।”
“পড়ছেন?”
“পুরোটা পড়তে পারিনি—অর্ধেকের মতো পড়েছি।”
“আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে পুরো চিঠি আপনি পড়েন নি অর্ধেক পড়েছেন?”
“বিশ্বাস করতে বলছি।”
“আপনার আচার-আচরণে কতটা সত্যি আর কতটা ভান, দয়া করে বলবেন?”
“ফিফটি-ফিফটি। অর্ধেক ভান, অর্ধেক সত্যি।”
“এই চিঠিটা আমি পড়ে ফলেছি। কিছু মনে করবেন না। আই অ্যাম সরি। আচ্ছা, আপনি কি রূপা মেয়েটিকে নিয়ে একদিন আসবেন আমাদের বাসায়?—উনাকে দেখব। উনি আসতে না চান—আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।”
“আচ্ছা, একদিন নিয়ে যাব।”

৭

এষা দরজা খুলে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছে না। মাফলার দিয়ে মাথা ঢাকা। চিনতে না পাবার সেটা একটা করাণ হতে পারে।
“কেমন আছেন?”
এষা যন্ত্রের মতো বলল, “ভাল”।
“আপনার পরীক্ষা কেমন হল খোঁজ নিতে এলেম।”
“ভেতরে আসুন”।
আমি ভেতরে ঢুকলাম। এষা দরজা বন্ধ করে দিল। রাত আটটা বাজে টিভিতে বাংলা খবর হচ্ছে। খবর পাঠকের মুখ দেখা যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না।এদের বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ। একটু অস্বস্তি লাগে।
“আপনার দাদীমা ভাল আছেন?”
“হ্যাঁ, ভালই আছেন।”
“কাজের মেয়েটা যে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে?”
“না।”
“আমি কি বসব?”
“বসুন”।
আমি বসলাম। এষা আমার মুখোমুখি বসল। তার চোখে আজ চশমা নেই। সে মনে হয় শুধু পড়াশোনার সময় চোখে চশমা দেয়। মেয়েটার চোখ দুটা খুব সুন্দর। আজ এষাকে আরো সুন্দর লাগছে। একটু বোধহয় রোগাও হয়েছে। কানে সবুজ

পাথরের দুটা দুল। ঐ রাতে দুল দেখিনি।

“হিমু সাহেব, ঐদিন আপনি আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?”

“আপনি আপনার হ্যাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কাজেই আপনাদের বিরক্ত করলাম না। বিদেয় হয়ে গেলাম।”

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, “আমি হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম আপনাকে কে বলল? ও বলেছে?”

“আমি অনুমান করেছি। তারপর মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে কথাও বললাম। উনার খিলগাঁর বাসাতেও গিয়েছি।”

“আমি আপনার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। ওকে কি আপনি আগে থেকে চিনতেন?”

“না, চিনতাম না। ঐ রাতেই প্রথম পরিচয় হল।”

“সঙ্গে সঙ্গে বাসায় চলে গেলেন। সবসময় তাই করেন?”

“কাউকে পছন্দ হলে করি। উনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে।”

এষা চাপা গলায় বলল, “পাগল কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এমন মানুষরা কমপেনিয়ন হিসেবে খুব ভালো। সাধারণ মানুষরা বোরিং হয়, কিন্তু এরা বোরিং হয় না”।

“আপনার কাছে কিন্তু হয়েছে।”

“আমার কাছে হয়েছে, কারণ আমাকে তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়েছে। একজন বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন ক্লান্তিকর ব্যাপার। যাই হোক, আপনি এসেছেন যখন বসুন। দাদীমা বাসায় নেই, উনি চলে আসবেন। আপনি চা খেতে পারেন, আজ ঘরে চা চিনি সবই আছে।”

“আমি আজ উঠব। কোনো-একদিন ভোরবেলায় আসব।”

“না—আপনি বসবেন। দাদীমা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি চলে যাওয়ায় ঐদিন আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন। উনার ধারণা—আমিই আপনাকে বিদেয় করে দিয়েছি। আজ আপনি দাদীমার মাথা থেকে ঐ ধারণা দূর করবেন এবং আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যাবেন”।

“আপনার দাদীমা না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে একা-একা বসে থাকতে হবে?”

“আমি থাকব আপনার সঙ্গে। একা বসিয়ে রাখব না।”

“আমরা কী নিয়ে কথা বলব? দু'জন মানুষ তো চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতে পারে না। আমাদের কথা বলতে হবে।”

“বলুন কথা।”

“আপনার দাদীমার কি ফিরতে রাত হবে?”

“বেশি রাত হবার কথা না। তিনি জানেন আমি এখানে একা আছি।”

“আমি টিভির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শব্দহীন খবর পাঠ দেখতে মন্দ লাগছে না। এরও একটা আলাদা মজা আছে। খবর-পাঠকদের কখনোই খুব খুঁটিয়ে দেখা হয় না, তাঁদের কথাই শুধু শোনা হয়। কথা বন্ধ করে দিলেই শুধু ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েন। তাঁদের খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

“হিমু সাহেব।”

“জ্বি?”

“ও যে অসুস্থ সেই খবরটি কি আপনাকে দিয়েছে?”

"এপিলেপ্সির কথা বলছেন?"
"হ্যাঁ।"
"জ্বি, উনি আমাকে বলেছেন"।
"বিয়ের আগে কিন্তু আমাদের কিছু বলেনি। এমন ভয়ংকর একটা অসুখ সে গোপন করে গেছে।"
"বিয়ের আগে অসুখটা হয়ত ভয়ংকর ছিল না।"
"সবসময়ই ভয়ংকর ছিল। ছ'বছর বয়স থেকেই এই অসুখ নিয়ে সে বড় হয়েছে।"
"তা হলে মনে হয়—উনি অসুখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এটা হয়েছে। উনি ধরেই নিয়েছেন, তাঁর অসুখের ব্যাপারটা সবাই জানে, নতুন করে কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করে যে তিনি ব্যাপারটা গোপন করেছেন তা আমার মনে হয় না।"
"আপনি কি তাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছেন?"
"তা করছি। উনি আমার বন্ধুমানুষ। বন্ধুকে বন্ধু ডিফেন্ড করবে। বাইরের কেউ করবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনারা আলাদা হয়ে গেছেন। উনার যা কিছু মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? উনার ভাল যদি কিছু থাকে তা নিয়ে থাকুন"।
"ওর ভাল কিছু নেই। ও পুরোপুরি অসুস্থ একজন মানুষ। ওর খিলগাঁ বাসায় আপনি গিয়েছেন। সেখানে কি কোনো আমগাছ দেখেছেন? দেখেননি। ও কিন্তু প্রায়ই বাসার সামনে একটা আমগাছ দেখে। আমগাছের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। একবার রাতদুপুরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, এষা, চল আমরা দু'জন গাছটার নিচে বসি"।
"আপনি নিশ্চয়ই বসতে যাননি?"
"না, যাইনি।"
"গেলে ভাল হত। আপনি যদি বলতেন—চল যাই বসি গাছের নিচে। কিংবা যদি বলতেন—তোমার এই আমগাছের ডালে একটা দোলনা টানিয়ে দাও—আমি দোলনায় চড়ব—তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং হত।"
"এত কি পাগলামির প্রশ্রয় দেয়া হত না?"
"না, হত না। আপনি যাকে পাগলামি ভাবছেন তা হয়তো পাগলামি নয়। আলেকজান্ডার পুশকিন তাঁর বাড়ির পেছনে সব সময় একটা দিঘি দেখতে পেতেন। জোছনা রাতি দিঘির পাড়ে বেড়াতে বেড়াতে যেতেন।"
"একজন বিখ্যাত ব্যক্তি পাগলামি করে গেছেন বলেই পাগলামিকে স্বীকার করতে হবে?"
"না, হবে না, এমনি বললাম। আপনি ঐ লোককে ছেড়ে এসে ভালই করেছেন। ও বেশিদিন বাঁচবেও না। স্বামীর মৃত্যু আপনাকে দেখতে হবে না। আপনাকে বিধবা শব্দটার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে না। বিধবা খুব পেলেটেবল শব্দ নয়। তা ছাড়া একজন ভয়াবহ অসুস্থ, রুগণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবেন কেন? একটাই আপনার জীবন। একটাই পৃথিবী। দ্বিতীয় কোনো পৃথিবী আপনার জন্যে নেই। সেটাকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া মোরশেদ সাহেবের আপনাকে প্রয়োজন নেই, তাঁর আছে নিজস্ব পৃথিবী, নিজস্ব আমগাছ। অল্প যে-কদিন বাঁচবেন, তিনি তাঁর আমগাছ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন। আপনার তো

কোনো আমগাছ নেই— কাজেই আপনার একজন বন্ধু প্রয়োজন। ওমর খৈয়াম পড়েছেন?—

“এইখানে এই তরুর তলে
তোমার আমার কৌতুহলে
যে ক’টি দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।”

“ও মারা যাবে কেন?”

“শরীর খুবই খারাপ। তা ছাড়া টাকাপয়সাও নেই। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালা খুব তাড়াতাড়িই মনে হয় বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তখন খেয়ে না খেয়ে, পথে-পথে ঘুরতে গিয়ে কিছু –একটা ঘটিয়ে ফেলবেন”।

“আপনি জানেন না, ওর অনেক বড়-বড় আত্মীয়স্বজন আছে।”

“ঐ লোক কি আত্মীয়স্বজনের কাছে যাবে? হাত পাতবে ওদের কাছে?”

“না।”

“এষা, এখন আমি উঠব। আরেকদিন আসব। আপনার দাদীমার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রাত ন’টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট । ন’টা প্রায় বাজতে চলল।”

“কবে আসবেন?’ খুব শিগগিরই আসব। এষা, আপনাকে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কথাটা হচ্ছে— আমার কথাবার্তা থেকে দয়া করে কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেবেন না। মনে করবেন না আমি খুব কায়দা করে মোরশেদ সাহেবের কাছে আপনাকে ফিরে যেতে বলছি।”

“আপনি বলছেন না?”

“অবশ্যই না। মোরশেদ সাহেব যদি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন আমি হয়তো-বা বলতাম। সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। উঠি এষা”।

ডক্টর ইরতাজুল করিম সাহেবও ঠিক এষার মতো ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

“স্নামালিকুম ডাক্তার সাহেব, আমি হিমু।”

“কি ব্যাপার?”

“আপনার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।”

“আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?”

“আপনি ডাইরিতে লেখে রেখেছেন। প্রথম যেদিন এসেছিলাম সেদিনই বলেছিলেন এক সপ্তাহ পর রাত ন’টার দিকে আসতে। বসব?”

“বসুন”।

“শুরু করব?”

“কী শুরু করতে চাচ্ছেন?”

“জীবন-কাহিনী। আমার বাবা কি করে আমাকে মহাপুরুষ বানানো চেষ্টা করতে লাগলেন, তিনি কতটুকু পারলেন, কতটুকু পারলেন না। অর্থাৎ ঐ রাতে যেখানে শেষ করেছিলাম, সেখান থেকে শুরত...”

“হিমু সাহেব।’

“জ্বি?”

“আমার একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। আপনি সেই খবর খুব ভাল করেই জানেন। ওর এখন স্কিন গ্রাফটিং হচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থেকে চামড়া কেটে লাগানো হচ্ছে। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। রোগী দেখছি না। কিছু করার নেই বলে চেম্বারে এসে বসেছি।”

“আমি তা হলে চলে যাই?”

“এসেছেন যখন বসুন। আমার কাছে আপনার একটি ডিনার পাওনা আছে। আসুন, আমরা একসঙ্গে ডিনার করি। ঘরে সাত দনি ধরে রান্নাবান্না হচ্ছে না। আমার স্ত্রী থাকেন হাসপাতালে , কাজেই আমরা কোনো-একটা হোটেলে বসব। আপনার আপত্তি আছে?”

“না, আপত্তি নেই।”

“চলুন তাহলে ওঠা যাক।‘

আমরা গুলশান এলাকার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, “এই রেস্টুরেন্টটা ছোট, কিন্তু খুব ভাল। এদের কুক একজন ভিয়েতনামি মহিলা। তিনি খাবার তৎক্ষণাৎ তৈরি করে দেন। আপনি কি খাবেন মেনু দেখে অর্ডার দিন। আমি নিজে শুধু একটা সুপ খাব। আপনি কি মদ্যপান করেন?”

“জ্বি-না।”

“বিয়ার? বিয়ার নিশ্চয়ই চলতে পারে।”

“আপনি খান। আমার লাগবে না।”

“বিয়ারের ক্যান খুলতে-খুলতে ডাক্তার সাহেব বললেন, আমি আপনার একটি বিষয় জানার জন্যে আগ্রহী। আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কি সত্যি আপনার আছে?”

“আমি ঠিক জানি না। মাঝে-মাঝে যা ভাবি তা হয়ে যায়। সে তো সবারই হয়। আপনারও নিশ্চয়ই হয়?”

“না, আমার হয় না?”

“অবশ্যই হয়। ভাল করে ভেবে দেখুন—এরকম কি হয় না যে আপনি দুপুরে বাসায় ফিরছেন— আপনার মনে হল আজ বাসায় বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না হয়েছে। খেতে বসে দেখেন, সত্যি তাই।”

“এটা হচ্ছে কো-ইনসিডেন্স।”

“আমার ব্যাপারগুলিও কো-ইনসিডেন্স। এর বাইরে কিছু না।”

“আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কোনো ক্ষমতা নেই?”

“না।”

ডাক্তার সাহেব তিনটি বিয়ার শেষ করে চতুর্থ বিয়ারের ক্যানে হাত দিলেন। মদ্যপান তিনি খুব অভ্যস্ত বলে মনে হচ্ছে না। চোখটোখ লাল হয়ে গেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

“হিমু সাহেব।”

“জ্বি?”

“আমার কিন্তু ধারণা, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনার বাবা পুরোপুরি ব্যর্থ হননি —strange কিছু জিনিস আপনার ভেতর তৈরি করতে পেরেছেন। তার একটি হচ্ছে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আপনার প্রচুর আছে।”

“এই ক্ষমতা অল্পবিস্তর সবারই আছে।”
“আপনার অনেক বেশি আছে। ইয়াদ সাহেবের সঙ্গে কি রিসেন্টলি আপনার দেখা হয়েছে?”
“না।”
“আপনি কি জানেন তিনি গত দুদিন ধরে ভিক্ষুক সেজে পথে-পথে ঘুরছেন? দুরাত বাড়ি ফেরেননি?”
“না—জানি না।”
“ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই আমার কাছে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা যে কী পরিমাণ মানসিক অডিয়েলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।”
“আপনি তাঁকে কী বলেছেন?”
“বলেছি এটা সাময়িক ঝোঁক। ঝোঁক কেটে যাবে। ইয়াদ সাহেব বাসায় ফিরবেন”।
“আপনার কি ধারণা হিমু সাহেব?”
“কোন ধারণার কথা জানতে চাচ্ছেন?”
“ইয়াদ সাহেব প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি। উনার ঝোঁক কাটতে কতদিন লাবে?”
“বলতে পারছি না। ঝোঁক নাও কাটতে পারে।”
“তার মানে?”
খাওয়া বন্ধ করে আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, “মানুষ খুব বিচিত্র প্রাণী ডাক্তার সাহেব। সে সারা জীবন অনেক কিছুই অনুসন্ধান করে ফেরে। সেই অনেক অনুসন্ধানের একটি হল—তার অবস্থান। সে কোথায় খাপ খায় তা জানতে চায়—সেই বিশেষ জায়গাটা যখন পেয়ে যায় তখন তাঁকে নড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে”।
“আপনি ভুলে যাচ্ছেন হিমু সাহেব, মানুষ খুব Rotional প্রাণী।”
“মানুষ মোটেই Rational প্রাণী নয়। সমস্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ Rational, মানুষ নয়।যখন বৃষ্টি হয়, পাখি তখন বুষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মানুষের ভেতর ব্যতিক্রম আছে। এদের কেউ-কেউ ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভেজে। কেউ-কেউ গাছের নিচে দাঁড়ায় ঠিকই,কিন্ত মন পড়ে থাকে বৃষ্টিতে। সে মনে-মনে ভিজতে থাকে”।
“হিমু সাহেব।”
“জ্বি?”
“আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। খাবারটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?” “
“জ্বি-না, সবকিছুর মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ পাচ্ছি।”
ডাক্তার সাহেব বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, “আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব বলুন?”
“কোথাও নামাতে হবে না। আমি এখান থেকেই হেটে-হেঁটে চলে যাব।”
“অনেকটা দুর কিন্তু”।
“খুব দুর নয়। আবার কবে আপনার কাছে আসব,ডাক্তার সাহেব?”
“আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি আপনার চিকিৎসা করব না।”
“আপনার কি ধারণা আমি অসুস্থ না?”
“বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, গুড নাইড”।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। মেসের অফিসে বাতি জ্বলিয়ে জীবনবাবু বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, “আপনার জন্যে বসে আছি হিমু ভাই। আপনাকে বলেছি না, আমি একটা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি?”

“বিপদের কথাটা বলতে চান?”

“জ্বি”।

“আসুন আমার ঘরে। বলুন”।

জীবনবাবু অনেকক্ষণ আমার ঘরের চৌকিতে বসে থেকে, কিছু না বলেই চলে গেলেন। খুব জাকিয়ে শীত পড়েছে। আমার ঘরের জানালার একটা কাঁচ ভাঙ্গা। শীতের ঠান্ডা হাওয়া বাতাস আসছে। জীবনবাবুকে বলতে মনে থাকে না। আজ কি বার? বৃহস্পতিবার? পাশের ঘরে তাস খেলা হচ্ছে। হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় যাবার পর লক্ষ করলাম –মাথাধরা শুরু হয়েছে। ইরতাজুল করিম সাহেবকে এই মাথাধরার কথাটা বলা হয়নি।

৮

টেলিফোন করার জায়গা পাচ্ছি না। গ্রীন ফার্মেসি বন্ধ। কম্পউটারের নতুন একটা সার্ভিস সেন্টার হয়েছে। ওদের টেলিফোন আছে—গেলেই টেলিফোন করতে দেয়। সার্ভিস সেন্টারটিও বন্ধ। এসছি তরঙ্গিণী স্টোরে। নতুন ছেলেটা আমাকে দেখেই বলল, টেলিফোন নষ্ট। মিথ্যা বলছে বোঝাই যাচ্ছে। বলার সময় মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। সে মনে হয় আগেই থেকে ঠিক করে রেখেছিল—আমাকে দেখলেই বলবে,“টেলিফোন নষ্ট।”

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, “গোটা দশেক টাকা দিলে কি ঠিক হবে?”

“বললাম তো নষ্ট।”

“আপনার চাকরি কতদিন হয়েছে?”

“তা দিয়ে আপনের কী প্রয়োজন?”

“কোনো প্রয়োজন নেই, এমি জিজ্ঞেস করছি। মুহিব এসেছিল এর মধ্যে?”

“না।”

“ওর ঠিকানা জানেন?”

“না।”

“আপনার ঠিকানা কি?”

“আমার ঠিকানা দিয়ে কি করবেন?”

ছেলাটা কঠিন গলার স্বর বের করছে। একে বিরক্ত করতে ভাল লাগছে। কি করে আরো রাগিয়ে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

“আপনাদের এই দোকান খোলে কখন?”

“খামাখা প্যাচাল পাড়তেছেন ক্যান। সওদা করার থাকলে সওদা করেন, নয়তো যান গিয়া।”

“ আপনার ঠিকানাটা তো এখনও বলেননি?”

“আরে দুক্কেরি”।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, “বল পয়েন্ট কলম আছে? দেখান দেখি”।

সে একটা কলম সামনে রাখল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কলম দিয়ে খোঁচা মেরে সে যদি আমার চোখ গেলে দিতে পারত তাহলে খুশি হত।

“দাম কত?”

“দশ টাকা।”

“বাংলাদেশি বল পয়েন্ট না?”

“হু।”

“এগুলি তিন টাকা করে বাইরে বিক্রি হয়। আপনার এখানে দশ টাকা কেন?”

“আপনে বাইরে থাইক্যা কিনেন।”

“আমি আপনার এখান থেকে কিনতে চাচ্ছি। তিন টাকার জিনিস বেশি হলে চার টাকা হবে। তার চেয়েও বেশি হলে হবে পাঁচ। দশ টাকা কেন?”

“দাম বেশি ঠেকলে নিবেন না।”

মানিব্যাগ খুলে আমি আমার শেষ সম্বল দশ টাকার নোটটা দিয়ে তিন টাকা দামের বল পয়েন্ট কিনে বের হয়ে এলাম। টাকার সন্ধানে যেতে হবে। মাসের প্রথম তারিখে ফুপা আমাকে চার শ টাকা দেন। শর্ত একটাই—আমি কখনো তাঁর বাসায় যেতে পারব না। তাঁর ছেলে বাদল যেন কখনো আমার দেখা না পায়। ফুপার ধারণা, আমার প্রভাবে বাদলের সর্বনাশ হচ্ছে। বাদলকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় আমার কাছ থেকে দুরে রাখা। দু'মাস ফুপার কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়নি।

ফুপার অফিসঘরে শীতকালেও এয়ার কুলার চলে। এয়ার কুলারের বিজবিজ আওয়াজ না হলে বোধহয় তাঁর মেজাজ আসে না।

“কেমন আছেন ফুপা?”

ফুপা ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, “ভেতরে আস। অনেক দিন দেখা হয় না। তোমাকে তুই করে বলতাম, না তুমি করে বলতাম ভুলে গেছি। ভাল আছ?”

“জ্বি”।

“আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি জেলে আছ। তোমার মতো লোক দীর্ঘদিন বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। একসময়-না একসময় তাদের জেলে ঢুকতে হয়। এর মধ্যে পুলিশ ধরেনি তোমাকে?”

“না”।

“আমি অবশ্যি বাদলকে বলেছি—তুমি জেলে আছ। তোমার এক বছরের সাজা হয়েছে। না বললে তোমার খোঁজ বের করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত।”

“আমি কি বসব ফুপা”।

“ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, অনুমতি নিচ্ছ কেন? বস”।

“আপনার অফিসে ঢুকলেই নিজেকে অফিসের একজন কর্মচারী বলে মনে হয়। আপনাকে মনে হয় বড় সাহেব। সামনে বসতে ভয় লাগে।”

ফুপা খুশি হলেন। ফাইল সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

“তোমার টাকা আলাদা করে রেখেছি।”

“থ্যাংকস ফুপা”।

“নাও, খাম দুটা রাখ। চারশ চারশ করে আটশ আছে।”

খাম পকেটে ভরলাম। ফুপা আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, “তুমি ইচ্ছা করলে আমার অফিসে কাজ করতে পার। এন্ট্রি লেভেল অফিসারের একটা

পোস্ট খালি হয়েছে। আমরা অ্যাডভাটাইজ করব না। অ্যাডভাটাইজ করলে সামাল দেয়া যাবে না। তুমি চাইলে আজই তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া যেতে পারে”।

“বেতন কত?”

“বেসিক তিন হাজার প্লাস ফর্টি পারসেন্ট হাউস রেন্ট। টু হানড্রেড কনভেন্স। থ্রী হানড্রেড মেডিকেল–হিসেব কর। কত হল?”

“জটিল হিসাবে আমাকে দিয়ে হবে না ফুপা। তবে আমি খুব ভাল একজন লোক দিতে পারি। ভেরি অনেস্ট।”

“তোমার কাছে তো আমি লোক চাইনি।”

“তা চাননি। তবু হাত যখন আছে তখন বললাম। আমার জানামতে তাঁর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। এর উপর আমি আটশ টাকা বাজি রাখতে পারি। এই টাকাটাই আমার সম্বল। আপনি যদি এমন কাউকে পান যে ঐ লোকটার মতো, তাহলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে আটশ দিয়ে দেব।”

ফুপা চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, “কি আছে লোকটার যা অন্য কারোর নেই?”

“সে তার বাড়ির সামনে একটা আমগাছ দেখতে পার, যদিও সেখানে কোনো গাছ নেই। কোনোদিন ছিলও না। সে পরিষ্কার আমগাছ দেখে, গাছে পাখি বসে থাকতে দেখে। পাখির কিচিমিচির শুনতে পায়।”

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, “তুমি এই বদ্ধ উন্মাদকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাচ্ছ?”

“জ্বি”।

“কেন বল তো?”

“ভদ্রলোকের চাকরি খুব দরকার। উনি অসুস্থ। এপিলেন্সি আছে। আগে ভাল চাকরি করতেন।
এখন চাকরি নেই। যদি চাকরি হয় মানসিক শক্তি পাবেন। এতে শরীর সুস্থ হতে থাকবে”।

“তোমার ধারণা আমার অফিস পাগল সারাবার কারখানা?”

“না, তা হবে কেন?”

“একে উন্মাদ, তার উপর এপিলেপটিক পেশেন্ট, তাকে তুমি আমার এখানে চাকরি দেবার কথা ভাবলে কি করে বল তো?”

“আর ভাবব না ফুপা। এখন তাহলে যাই?”

“যাও । খবদার, বাসায় আসবে না।”

“বাদল আছে কেমন?”

“ও ভালই আছে। তোমার প্রভাব থেকে দুরে আছে, ভাল না থাকার তো কোনো কারণ নেই।”

“আমি কি ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারি ফুপা? অনেক দিন দেখি না– কথা বলতে ইচ্ছা করে।”

“অসম্ভব! টেলিফোন করতে পারবে না। একেবারেই অসম্ভব।”

“বলব—ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে টেলিফোন করা হচ্ছে। মিনিট দুই কথা বলব। দুমিনিটে কী আর হবে।”

“কিছু হবার থাকলে দু মিনিট হবে। বাদলের মাথা খারাপ হয়েই আছে—ঠিক করার চেষ্টা করছি। তোমার টেলিফোন পেলে—আর ঠিক হবে না। হিমু, তুমি বিদেয়

হও। ক্লিয়ার আউট। এখন থাক কোথায়?”

“কোথায় থাকি বলতে যাচ্ছিলাম, ফুপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক, বলতে হবে না।জানতে চাচ্ছি না”।

আমি ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে বললাম, “ফুপা। বাদলের ব্যাপারে একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হতে পারে। ঐ সমস্যাটা নিয়ে কি ভেবেছেন?”

“কি সমস্যা?”

“আমি জেলে আছি শুনে সেও ভাবতে পারে জেলে যাওয়াটা প্রয়োজনীয়। কাজেই জেলে যাবার একটা চেষ্টা করতে পারে।”

ফুপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি চলে এলাম। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে যেতে হবে। ভাতের বিল দিতে হবে। অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে।

মজনু মিয়া হোটেলে খুব ভিড়। প্রচুর কাস্টমার। সবার জায়গা হচ্ছে না। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মজনু মিয়া টাকা গুনতে হিমশিম খাচ্ছে। আমাকে দেখে শীতল গলায় বলল, “ভাইজান, কথা আছে”।

“কি কথা—সাধারণ না প্রাইভেট?”

“প্রাইভেট।”

আমি প্রাইভেট কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। মজনু মিয়া তার ছোট ভাইটাকে ক্যাশে বসিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, “খুব ভাল বিজনেস হচ্ছে, মজনু মিয়া। ব্যাপার কি?”

“ব্যবসাপাতি হইল আপনার ভাগ্যের ব্যাপার। কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। কয়েকদিন ধরে দেখতেছি আমার সামনের হোটেলের সব বান্ধা কাস্টমার এইখানে আসতেছে।”

“বয়-বাবুর্চি তো বাড়াতে হবে। এরা পারছে না। আরো কয়েকজন নিন।”

“দেখি।”

“আর এদের বেতন বাড়িয়ে দিন।”

“বাজে কথা বলবেন না তো হিমু ভাই। বাজে কথা শুনেতে ভাল লাগে না।”

“আচ্ছা যান। বাজে কথা বলব না। আপনার প্রাইভেট কথা শুনব। প্রাইভেট কথাটা কি?”

“আপনি যে আপনার এক ভাগ্নেকে গছায়ে দিয়ে গেলেন—তার আছে মৃগী বেরাম। ঐ দিন দুপুরে শরীর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কাস্টমাররা সব খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।”

“তাতে অসুবিধা কী?”

“অসুবিধা আছে না? এইরকম রোগী নিয়ে কারবার করলে তো হবে না ভাইজান। দোকানের বদনাম হবে। লোক আসা কমে যাবে। আপনে উনারে আমার দোকানে আসতে নিষেধ করে দেবেন।”

“আচ্ছা, নিষেধ করে দেব।”

“আপনি রাগ হলেও কিছু করার নাই। আপনার জন্যে সব মাপ। কিন্তু হিমু ভাই–পাগল, ছাগল, মৃগীরোগী এদের আমি দোকানে ঢুকাব না। ঐদিন আপনার ভাগ্নেরে দেখে আমি কানে হাত দিয়েছি। অনেক কাস্টমার বাইরে দাঁড় হয়েছিল। গণ্ডগোল দেখে ভিতরে ঢুকে নাই। আপনার ভাগ্নেরে আমি বলে দিয়েছি আর যেন এখানে না আসে।”

"আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন?"
"জ্বি ভাইজান, আমি বলেছি। মৃগীরোগী আমার দরকার নেই।"
"আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললাম, রুগ্ন মানুষের প্রতি মমতা দেখানোর বদলে আপনি দেখাচ্ছেন ঘৃণা। এটা কি ঠিক হচ্ছে? রোগটা তো আপনারো হতো পারত। তা ছাড়া এই যে আজ আপনার দোকানে এত বিক্রি বেড়েছে, হয়তো আমার ভাগ্নের কারণেই বেড়েছে। এই কদিন তাকে যত্ন করে খাইয়েছেন বলেই বেড়েছে। এখন তাকে বিদেয় করে দিয়েছেন—দেখা যাবে হুট করে বিক্রিবাটা পড়ে যাবে।"
"আমাকে ভয় দেখায়ে লাভ নাই হিমু ভাই। আমি ভয় খাওয়ার লোক না। ঐ মৃগীরোগী আমি আর দোকানে ঢুকতে দেব না।"
"আচ্ছা, ঠিক আছে।"
"আপনি মনে কিছু নিবেন না হিমু ভাই। আপনার জন্যে আমি আছি। অন্য কারো জন্যে না।"
আমি মজনু মিয়ার টাকাপয়সা মিটিয়ে মোরশেদ সাহেবের খোঁজে গেলাম। খিলগাঁয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। বাড়িওয়ালাকে খুঁজে বের করলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই ঘরে নিয়ে বসালেন। বললেন, উনি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, "কোথায় আছে জানেন?"
"জ্বি-না।"
"বাসা ছেড়েছেন কবে?"
"গত পরশু। দু' মাসের ভাড়া পাওনা ছিল। উনি ভাড়াটাড়া সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি বললাম, থাক, ভাড়া দিতে হবে না। বাদ দেন। রাজি হলেন না।"
"জিনিসপত্রগুলি কোথায়?"
"জিনিসপত্রগুলি কিছু তো ছিল না। একটা খাট, কিছু চেয়ার-টেবিল। ঐসব একটা ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। বলেছি, একসময় এসে নিয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। ভদ্রলোকের উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল, বুঝলেন? ভাল চাকরি করছিল, সুন্দর সংসার—হঠাৎ কি হয়ে গেল দেখেন। সব ছারখার। যাবার সময় বাসার সামনে খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিলেন। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার বড় বৌমা বলল, বাবা, উনাকে বলেন—বাসা ছাড়ার দরকার নাই। উনাকে থাকতে বলেন। এইগুলা হচ্ছে ভাই ভাবের কথা। সংসার তো ভাই ভাবের কথায় চলে না।"
"তা তো ঠিকই।"
"বিনা পয়সায় থাকতে দিলে আমার চলে কী করে। আমি তো এতিমখানা খুলি নাই। এই কথাই বোমাকে বুঝায়ে বললাম।"
"উনি কী বললেন?' কিছু বলে নাই। চুপ করে ছিল। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্বশুরের মুখের উপর কোনো কথা বলবে না। তারপর শুনি–রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি বললাম, ভাত খাও নাই কেন, মা? সে বলল, মানুষটার জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে বাবা। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। কি রকম করে কাঁদছিল। যাই হোক, মেয়েছেলের কথা বাদ দেন। মেয়েছেলে বিড়ালের জন্যেও কাঁদে। এখন বলেন আপনি উনার কে হন?"
"সম্পর্কে মামা হই।"

“ও আচ্ছা। খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে কথা বলে।”

আমি বললাম, “আপনার বড় বৌমাকে একটু ডাকবেন?”

“কেন?”

“একটু দেখব। ভালমানুষ দেখার মধ্যেও পুণ্য আছে। যদি অসুবিধা না হয় একটু ডাকুন”।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়েই তাঁর বড় বৌমাকে ডাকলেন। সাদাসিধে সরল চেহারার মেয়ে, দু-বছরের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত বয়স হবে মেয়েটির? খুব বেশি হলে উনিশ-কুড়ি। তার কোলের শিশুটিও অবিকল তার মতো দেখতে। মা এবং শিশু যেন একই ছাঁচে তৈরী। আমি বললাম, “আপনি কেমন আছেন?”

মেয়েটি জবাব দিল না।

আমি বললাম, ‘আপনার ছেলেটার কি নাম রেখেছেন?”

মেয়েটি এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। বাচ্চা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বলল, আমার বৌমা খুব লাজুক স্বভাবের। বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

আমি বললাম, “আমি কথা বলতে চাইওনি। শুধু দেখেতে চেয়েছি। আচ্ছা ভাই, যাই”।

“আপনার ভাগ্নেকে বলবেন জিনিসপত্র সাবধানে রাখা আছে। যেন চিন্তা না করে।”

“জ্বি আচ্ছা, বলব। আপনার অনেক মেহেরবানী।”

৯

নীতুর একটি চিঠি এসেছে। নীতুর স্বভাবও দেখা যাচ্ছে ইয়াদের মতো। চিঠি পাঠিয়েছে ইংরেজিতে টাইপ করে। ডাকে পাঠায়নি, হাতে-হাতে পাঠিয়েছে। নীতুর ম্যানেজার চিঠি নিয়ে এসেছে। তার উপর নির্দেশ, চিঠি আমার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করবে এবং জবাব নিয়ে যাবে।

বড়লোকের ম্যানেজার শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজের প্রভু ছাড়া সবার উপর বিরক্ত হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোককে দেখলাম মহা বিরক্ত। প্রায় ধমকের স্বরে বলল, কোথায় থাকেন আপনি?

“কেন বলুন তো?”

“এই নিয়ে দশবার এসেছি। বসে যে অপেক্ষা করব সেই ব্যবস্থাও নেই। মেসের অফিস বন্ধ। একজনকে বললাম একটা চেয়ার এনে দিতে, সে আচ্ছা বলে চলে গেল। আর তার দেখা নেই।”

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, “এর পর যখন আসবেন একটা ফোল্ডিং চেয়ার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন”।

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে সে অভ্যস্ত নয়। নীতুর চিঠি বের করে বলল, চিঠি পড়ে জবাব লিখে দিন। আপা বলেছেন–জবাব নিয়ে যেতে।

“এখন চিঠি পড়েতে পাড়ব না।”
ম্যানেজার হতভম্ব গলায় বলল, “এখন চিঠি পড়তে পারবেন না?”
“জ্বি-না।”
“চিঠি আপা পাঠিয়েছেন।”
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, “আপাই পাঠাক আর দিদিমণিই পাঠাক, চিঠি এখন পড়ব না”।
“কখন পড়বেন?”
“তাও তো বলতে পারছি না। আমার মাথাধরা রোগ আছে। খারাপ ধরনের মাথাধরা। এখন সেটা শুরু হয়েছে। আমি খুব ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করব। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাব। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি মাথাব্যথা সেরেছে, তখন পড়তে পারি। আবার নাও পারি।”
“জরুরি চিঠি।”
“আমার ঘুমটা চিঠির চেয়েও জরুরি। আপনি বরং এক কাজ করুন, এখন চলে যান। রাতে একবার খোঁজ নেবেন”।
“আপাকে কি বলব আপনি চিঠি পড়তে চাচ্ছেন না?”
আমি ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকালাম, সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। মানুষজন দ্রুত বদলে যাচ্ছে—সবাই ভয় দেখাতে চায়। ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চায়।
কেউ ভয় দেখালে উল্টা তাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছা করে। ম্যানেজার ব্যাটাকে চূড়ান্ত রকমের ভয় কী করে দেখানো যায়? মাথায় কিছুই আসছে না। ম্যানেজার কঠিন মুখ করে বলল, আমি কি উনাকে বলব যে উনি বলেছেন যখন উনার ইচ্ছা হয় তখন পড়বেন। এখন ইচ্ছা হচ্ছে না।
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, বলতে পারেন।
“আচ্ছা, বলব।”
“চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাতে যখন আসবেন তখন নিয়ে আসবেন।”
“আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।”
“সবাই তো আর ঠিকঠাক কাজ করে না। কেউ-কেউ ভুলভাল কাজ করে। আমি ভুলভাল কাজ করতেই অভ্যস্ত। আপনি চিঠি নিয়ে চলে যান।”
“জ্বি-না, আমি অপেক্ষা করব।”
“বেশ, অপেক্ষা করুন। আমার ঘরে একটা চেয়ার আছে। বের করে নিয়ে যান। বারান্দায় বসুন। শুভ বিকাল।”
আমি চেয়ার বের করে দিলাম। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলাম। ম্যানেজার বসে আছে মূর্তির মতো। আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। দরজা না খুলেই ডাকলাম, ম্যানেজার সাহেব।
“জ্বি?”
“আপনি এখনো আছেন?”
“জ্বি”।
“সঙ্গে গাড়ি আছে?”
“আছে।”
“তাহলে তরঙ্গিণী স্টোরে চলে যান। একটা বল পয়েন্ট কিনে আনবেন। চিঠির

জবাব লিখতে হবে। আমার কাছে একটা বল পয়েন্ট আছে। দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম—লেখা দিচ্ছে না।”

“আমার কাছে কলম আছে।”

“আপনার কলমে কাজ হবে না। আমাকে লিখতে হবে নিজের কলমে।”

“তরঙ্গিণী স্টোর থেকেই কিনতে হবে?”

“জ্বি”।

“স্টোরটা কোথায়?”

“বলছি। আপনার কাছে বল পয়েন্টের দাম হয়ত তিন টাকা চাইবে কিন্তু আপনি দেবেন দশ টাকা। নিতে না চাইলে জোর করে দেবেন।”

ম্যানেজার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “জি আচ্ছা, দেব। আপনি দয়া করে। চিঠিটা পড়ুন”।

তার কঠিন ভাব এখন আর নেই। এখন সে ভীত চোখেই আমাকে দেখছে।

আমি দরজা খুলে চিঠি নিলাম। ম্যানেজার সাহেবকে তরঙ্গিণী স্টোরটা কোথায় বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোক আর একবার বলল, অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনে আনলে হবে না?

আমি কঠিন গলায় বললাম, না।

নীতু লিখেছে—

হিমু সাহেব,

আশা করি সুখে আছেন। অবশ্যি আমার আশা করা না করায় কিছু যায় আসে না। আপনি সব সময় সুখেই থাকবেন, এবং আপনার আশেপাশের মানুষদের নানানভাবে বিভ্রান্ত করবেন, বিপদে ফেলবেন। অন্যদের সমস্যায় ফেলাতেও সুখ আছে। সেই সুখের ঘাটতি আপনার কখনো হয় না।

আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আপনার বন্ধু অবশেষে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিখিরি হয়েছেন। ভিখিরির মতো সাজসজ্জা করে পথে-পথে ঘুরছেন এমন হাস্যকর ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কোনোদিনও কল্পনা করিনি। ইয়াদ বুদ্ধিমান নয় এই তথ্য আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও যে কতটা বোকা তা আপনিই চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন।

ইয়াদের আত্মীয়স্বজনদের আমি বলেছি ব্যাপারটা আর কিছুই না, ইয়াদের একধরনের খেলা। ওরা ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছে, এবং বেশ মজাও পাচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি ব্যাপারটা খেলা হলেও আপনার জন্যে খেলা। ইয়াদের জন্যে নয়। আপনি যে খেলা খেলছেন তা হল dangerous game. আশা করি আপনি জানেন খেলা কোথায় শেষ করতে হয়।

আমি দু'জন লোক ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। ওরা সব সময় তার দিকে লক্ষ রাখছে। আমার ধারণা ছিল, দুদিন পার হবার আগেই ওর মোহভঙ্গ হবে এবং সে বাড়িতে ফিরে আসবে। আমাকে জোর খাটিয়ে কিছু করতে হবে না। কিন্তু সে বাসায়

ফিরছে না। আপনি এই চিঠি পাওয়ামাত্র এমন ব্যবস্থা করবেন যেন সে বাড়িতে ফিরে আসে। আমি একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার করে আপনাকে জানাতে চাই, তা হল—ও বোকা হোক, যা হোক, ওকে আমি অসম্ভব ভালবাসি।

ভালবাসা মাপার যন্ত্র বের হয়নি। বের হলে আমার ভালবাসার পরিমাণ আপনাকে মেপে দেখাতাম । ওর কোনোরকম ক্ষতি আমি সহ্য করব না। কাউকে সেই ক্ষতি করতেও দেব না। ও কোথায় রাত্রি যাপন করে তা আমাদের ম্যানেজার সাহেব জানেন। উনিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। ওর মাথা থেকে ভূত সরিয়ে আপনি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আর কোনোদিনও ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। আপনার জন্যে এই কাজ কঠিন নয়, বেশ সহজ।এই সহজ কাজের জন্যে আমি অনেক বড় মূল্যে দিতে প্রস্তুত আছি। Tell me your price.

আরো কিছু কথা বলার ছিল, ক্লান্ত বোধ করছি।

নীতু

আমি চিঠি শেষ করে ডাকলাম, "ম্যানেজার সাহেব"।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, জ্বি স্যার।

"আপনাকে কি চিঠির জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?"

"জ্বি"।

"বল পয়েন্ট এনেছেন?"

"জ্বি"।

"কত নিয়েছে?"

"চার টাকা চেয়েছিল—আপনি দশ টাকা দিতে বলেছেন, দিয়েছি। নিতে চাচ্ছিল না। আপনার কথা বলে জোর করে দিয়ে এসেছি।"

"ভাল করেছেন।"

"আপনি কি চিঠির জবাব দেবেন?"

"না। তবে আপনাকে নিয়ে ইয়াদের খোঁজে যাব। চলুন যাওয়া যাক।"

"এখন গেলে উনাকে পাওয়া যাবে না। উনার একটা ঘুমাবার জায়গা আছে– রাত এগারোটায় দিকে সেখানে ফেরেন।"

"তাকে কি এখন ভিখিরির মতো লাগে?"

"জ্বি, লাগে"।

"ভিক্ষা শুরু করেছে?"

"জ্বি-না।"

"চলছে কীভাবে?"

"তা ঠিক জানি না। কিছু টাকাপয়সা নিয়ে বের হয়েছিলেন বলে মনে হয়"।

"খাওয়াদাওয়া করছে?"

"প্রথম দিন কিছু খাননি। রাতে একটা পাউরুটি খেয়েছেন।"

"তারপর?"

"আমি শুধু প্রথম দিনের খবর জানি।"

"ওর দিকে লক্ষ রাখার জন্যে লোক রাখা আছে না?"

“জ্বি-আছে।”

“ম্যানেজার সাহেব, আপনি নিজে কি খাওয়া-দাওয়া করেছেন, না দুপুর থেকে এখানেই বসে আছেন?”

“খাইনি কিছু।”

“যান, খেয়ে আসুন”।

“জ্বি-না।”

“না কেন?”

ম্যানেজার জবাব দিল না। আমি বললাম, “নীতু কি বলে দিয়েছে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল না করতে?”

“জ্বি”।

“তা হলে চলুন। আমার সঙ্গেই চলুন। আপনাকে খাইয়ে আনি”।

“লাগবে না।”

“আসুন যাই।”

“স্যার, কিছু খাব না”।

১০

রাত এগারোটায় ইয়াদের সন্ধ্যানে বের হলাম।

ইয়াদ থাকে মীরপুর দশ নম্বরে, সিঅ্যান্ডবি গুদামে। গুদামের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা রাস্তার কালভার্টের সিরামিক স্ল্যাব। দেখতে বিশাল আকৃতির সিলিন্ডারের মতো। তার একটিতে ইয়াদের সংসার। বাইরে থেকে ইয়াদ বলে ডাকতেই সে খুশি-খুলি গলায় বলল, চলে আয়। মাথা নিচু করে ঢুকবি। দাঁড়া এক সেকেণ্ড, বাতি জ্বালাই। সে কুপি জ্বালল। আমি ঢুকলাম। ভক করে খানিকটা পচা দুর্গন্ধ নাকে ঢুকল।

“গন্ধে নাড়িভুড়ি উল্টে আসছে রে ইয়াদ।”

“প্রথম খানিকক্ষণ গন্ধ পাবি। তারপর পাবি না। মাথা নিচু করে ঢোক।”

সিলিন্ডার স্লাবের এক মাথা পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, অন্য মাথায় চটের পর্দা। নিচে পুরানো একটো কম্বল লম্বালম্বি বিছানো। কম্বলের উপর ইয়াদ হাসিমুখে বসে আছে।

“তুই আসবি জানতাম। ইচ্ছা করেই তোকে খবর দিইনি। তুই হচ্ছিস গ্রে হাউন্ড টাইপ। গন্ধ শুকেশুকে চলে আসবি। আমার সংসার কেমন দেখছিস?”

“মন্দ না।”

“মন্দ না মানে? একসেলেন্ট। শীত টের পাচ্ছিস?”

“না।”

“পুব-পশ্চিমে মুখ করা। উত্তর বাতাস ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। মশা লাগছে?”

“না।”

“এক মুখ পলিথিন দিয়ে ঢাকা, অন্য মুখে চটের পর্দা। মশা ঢোকার কোনো উপায়

নেই।”
“এরকম আরামের জায়গার খোঁজ পেলি কোথায়?”
“এরচেয়েও আরামের জায়গা আছে। ভাড়া বেশি।”
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, “ভাড়া দিতে হয়!”
“অবশ্যই দিতে হয়।”
“এর ভাড়া কত?”
“দুটাকা”।
“মাসে দু টাকা?”
ইয়াদ বিরক্ত হয়ে বলল, “তুই পাগলটাগল হয়ে গেলি? শায়েস্তা খাঁর আমল ভেবেছিস? পার নাইট দুটাকা। শীতকালে চার্জ বেশি। গরমকালে পার নাইট এক টাকা। মাসচুক্তির কোনো ব্যাপার নেই”।
“ভাড়া নেয় কে?”
“সর্দার আছে। সর্দার নেয়। সিঅ্যান্ডবি-ব দারোয়ান নেয়, পুলিশ নেয়, অনেক ভাগাভাগি । পুরোপুরি জানি না।”
“দুটাকা ভাড়া দিয়ে কেউ থাকে?”
“অবশ্যই থাকে। কোনটা খালি নেই। তা ছাড়া অনেক স্পেস। কোনো-কোনটায় পুরো ফ্যামিলি আটে। চা খাবি?”
“তোর এখানে কি চা বানাবার ব্যাবস্থা আছে?”
“আরে না। তবে কাছেপিঠেই আছে। ডাক দিলে দিয়ে যাবে। চা, সিগারেট, পান”।
“সুখে আছিস মনে হয়।”
“অবশ্যই সুখে আছি। কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা নেই। কে কি বলল তা নিয়ে মথাব্যাথা নেই –কী আরামের ঘুম যে হয়, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। আমার কি মনে হয় জানিস? আরামের ঘুম কী জিনিস এটা জানার জন্যেই আমাদের সবার কিছুদিনের জন্যে হলেও ভিখিরি হওয়া উচিত। তার উপর ভিখিরিদের মধ্যে কমিউনিটি ফিলিং যা আছে তারও তুলনা নেই। বাইরে থেকে আমাদের মনে হয় এক ভিখিরি অন্য ভিখিরিকে দেখতে পায় না, এটা খুবই ভুল কথা। সবাই সবার খোঁজ রাখে। ধর, সিগারেট খা।”
“সিগারেট ধরেছিস?”
“হু, ধরেছি। হাইকোর্ট মাজারের কাছে এক রাতে গাঁজা খেয়েছি। দুটান দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। উঠলাম সকালে—হা হা হা।”
ইয়াদ গা দুলিয়ে হাসতে লাগল। আমি বললাম, “নীতুর কথা মনে হয় না?”
ইয়াদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “না”।
“একেবারেই না?”
“উহু। তুই বলায় মনে পড়ল।”
“ও কেমন আছে জানতে চাস না?”
“ভাল আছে তো বটেই। খারাপ থাকবে কেন?”
“তোর আসল কাজ কেমন এগুচ্ছে?”
“এগুচ্ছে না। অবশ্যি আমি নিজেই গা করছি না। তাড়া তো কিছু নেই। হোক ধীরেসুস্থে। আগে ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে মিশে নিই—তারপর।”

“ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে এখানো মিশতে পারিসনি?”
“উহু। ওরা খুব চালাক, বুঝলি হিমু, চট করে ধরে ফেলে যে আমি ওদের একজন না। বাইরের কেউ।”
“কিছু বলে না?”
“না, কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। তবে আমার মতো অনেকেই আছে।”
“বলিস কী।”
“নানান ধাক্কায় ভিখিরি সেজে ঘোরে। বিদেশী আছে বেশ কয়েকটা। এর মধ্যে একটা আছে নেদারল্যান্ডের, বিরাট চোর। চা খাবি কিনা তা তো বললি না। খাবি?”
“খাব।”
ইয়াদ চটের পর্দা সরিয়ে ডাকল, “তুলসী, তুলসী, দুটা চা”।
“তুলসীকে দেখে রাখ—অসাধারণ একটা মেয়ে। আমি আমার জীবনে এত ভাল মেয়ে দেখিনি—কী যে বুদ্ধি, তোকেও সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে ফেললে তুই টেরও পাবি না।”
“তুলসীর বয়স কত?”
“সাত-আট হবে। বেশি না।”
“ও কি ভিক্ষা করে?”
“গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে চা বিক্রি করে। তুলসীর বাবা আর সে দু’জনের ব্যবসা। ভাল রোজগার।”
তুলসী চা নিয়ে ঢুকল। মেয়েটার গায়ে সুন্দর গরম সুয়েটার। মাথার চুল লাল। স্বর্ণকেশী বালিকা। ইয়াদ বলল, তুলসী হল আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড।
তুলসী আড়চোখে আমাকে দেখল, কিছু বলল না। ইয়াদ বলল, চায়ের কাপ থাক, পরে নিয়ে যাবি। হিমু, তুলসীকে কেমন দেখলি?
“ভাল।”
“মারাত্মক বুদ্ধি! কি করে বুঝলাম জানিস? তুলসী আমাকে বলল, দু'জন লোক আমার উপর নজর রাখছে। আমি কিছু বুঝিনি।”

“দু'জন তাহলে তোর উপর নজর রাখছে?”

“হু। নীতুর কাণ্ড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখা হল ওর অভ্যাস। কোনোদিন দেখব টুটিফুটিকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে”।

“উপস্থিত হলে কি করবি?”

ইয়াদ গম্ভীর গলায় বলল, “সত্যি সত্যি উপস্থিত যদি হয়, তাহলে বলব, আমার সঙ্গে থেকে যাও নীতু”।

“কি মনে হয় তোর, নীতু থাকবে?”

“কিছু বলা যায় না, থাকতেও পারে। এখানে থাকাটা কিন্তু আরামদায়ক। এক রাত থেকে যা, তুই নিজেই টের পাবি। থাকবি?”

“উঁহু, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।”

“কুপির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হচ্ছে। কুপি নিভিয়ে দিলেই দেখবি—আরাম।”

ইয়াদ ফু দিয়ে কুপি নিভিয়ে দির চারদিকে ঘন অন্ধকার । এমন অন্ধকার আমি আমার জীবনে দেখিনি।'

“হিমু।”

“হু।”

“ভিখিরিদের সঙ্গে আমার একদিন-দুদিন থাকলে হবে না। অনেকদিন থাকতে হবে। এখনো ঠিকমতো ডাটা কালেক্ট শুরু করিনি, তবু অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পাচ্ছি। একটা তোকে বলি—আমাদের ধারণা, মাসের এক-দুই তারিখের দিকে ভিখিরিরা বেশি ভিক্ষা পায়। লোকজনের হাতে বেতনের টাকা থাকে। তারা ভিক্ষা বেশি দেয়। ব্যাপার মোটেই তা না। সবচে'বেশি ভিক্ষা পায় মাসের শেষ সপ্তাহে। ইন্টারেস্টিং না?”

“হু। ইন্টারেস্টিং।”

“রিসার্চের অনেক কিছু আছে। যারা ভিক্ষা দিচ্ছে তাদের নিয়েও রিসার্চ হওয়া দরকার। এই দিকে কোনো কাজই হয়নি। ভিক্ষুকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, এটা জানিস?”

“জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি”।

“নাস্তিকতা যে ভিখিরিদের মধ্যে সবচে' বেশি এটা জানিস?”

“আঁচ করতে পারি।”

“ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ওদের ভেঙে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে থাকে, আবার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গেও কিছুদিন থেকে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। স্বামীর বেলাতেও এটা সত্যি—এরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সমাজ তৈরি করছে। সেই সমাজের আইনকানুন আলাদা। এরা যাযাবরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কোথাও একনাগাড়ে তিন রাতের বেশি থাকবে না। ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তোর কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?”

“লাগছে।”

“ভিখিরিদের রোজগার সম্পর্কে আগে যে সমীক্ষা করেছিলাম সেটা পুরোপুরি ভুল। ভিখিরিদের মধ্যে নতুন মা যারা, অর্থাৎ যাদের বাচ্চার বয়স এক মাস-দু'মাস, তারা খুব ভাল রোজগার করতে পারে। তবে এইসব ক্ষেত্রে নতুন মা'র শীরর দুর্বল বলে বের হতে পারে না—বাচ্চাটা ভাড়া খাটে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাড়া। এত সব তথ্য পাচ্ছি যে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এইসব তথ্য নিতে—নিতেই এক জীবন কেটে যাবে।”

"এর মানে কি এই যে—তুই তোর জীবন এই গর্তে কাটিয়ে দিবি? নীতুর কাছে ফিরে যাবি না?"

ইয়াদ হাই তুলতে তুলতে বলল, "দেখি"।

"আমি আজ যাচ্ছি।"

"কাল আসবি?"

"বুঝতে পারছি না-আসাতেও পারি। তোর কিছু লাগবে? লাগলে বল, নিয়ে আসব।"

"কিছু লাগবে না।"

"টাকাপয়সা লাগবে?"

"না। পকেটে রুমাল থাকলে রেখে যা। সর্দি হয়ে গেছে। রুমালের অভাবে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।"

ইয়াদের কাছ থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে দেখি গাড়ি নিয়ে ম্যানেজার অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, "আপনি এখনো যাননি? চলে যান"।

"আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই স্যার।"

"আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব । পৌঁছে দিতে হবে না।"

"আপাকে কী বলব?"

"আমি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। যা বলার আমি তখন বলব।"

"উনি খুব অস্থির হয়ে আছেন স্যার"।

"বুঝতে পারছি।"

"আগামী কাল সকালের দিকে আসতে পারেন?"

"না।"

"কবে নাগাদ আসবেন? ঠিক দিনটা বললে আমার জন্যে ভাল হয়। আপা জিজ্ঞেস করবেন, কিছু বলতে না পারলে রাগ করবেন।"

"ম্যানেজার হয়ে জন্মেছেন—বসের রাগ তো সহ্য করতেই হবে। ভিখিরি হয়ে জন্মালে কারোর ধার ধারতে হত না। বেঁচে থাকচেন যাদের দয়ায় উপর তাদের সমীহ করতে হচ্ছে না, ইন্টারেস্টিং না?"

ম্যানেজার জবাব দিল না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল। বেচারার জন্যে আমার মায়া লাগছে— কিন্তু কিছু করার নেই। নীতু সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয়নি। নীতুকে অপেক্ষা করতে হবে।

১১

রূপার চিঠি এসেছে। কী অবহেলায় খামটা মেঝেতে পড়ে আছে। আরেকটু হলে চিঠির উপর পা দিয়ে দাঁড়াতাম। খাম খুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম—এতবড় কাগজে একটি মাত্র লাইন, তুমি কেমন আছ? নাম সই করেনি, তারিখ দেয়নি। চিঠি কোত্থেকে লেখা তাও জানার উপায় নেই। শুধু একটি বাক্য—তুমি কেমন আছ? প্রশ্নবোধক চিহ্নটি শাদা কাগজে কী কোমল ভঙ্গিতে আঁকা হয়েছে। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল রূপার আগের চিঠি পুরোটা পড়া হয়নি। কী

লেখা ছিল সেই চিঠিতে? কোনোদিনও জানা যাবে না, কারণ চিঠি হারিয়ে ফেলেছি। নীতুকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। চিঠিটা নীতু পড়েছে। নীতুর কাছে যেতে হবে। যেতে ভরসা পাচ্ছি না, কারণ ইয়াদের খোঁজ পাচ্ছি না। সে আগের জায়গায় নেই। তুলসী মেয়েটি ছিল। সে কিছু জানে না কিংবা জানলেও কিছু বলছে না। নীতুর ম্যানাজারও জানে না। নীতু যাদের ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছিল তাদের ফাঁকি দিয়ে ইয়াদ সটকে পড়েছে। যে-মানুষ ভোল পাল্টে ঢাকার ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে গেছে তাকে খুঁজে বের করা খুব সহজ কথা না। নীতু এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিত্তবানদের শক্তি তুচ্ছ করার বিষয় নয়। এরা একদিন ইয়াদকে খুঁজে বের করবে। নীতু যখন তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ইয়াদকে মাথা নিচু করে তার সঙ্গেই যেতে হবে, কারণ নীতুর আছে ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি।এই শক্তি আগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। এই ক্ষমতা তিনি শুধু তাঁর কাছেই রেখে দিয়েছেন।

ইয়াদ কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হল মোরশেদ। সেও উধাও হয়ে গেছে। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে সে খেতে আসে না। পুরানো বাসায় যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা জানি না। তবে সে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাবে, তাও মনে হয় না।

সে একমাত্র এষার কাছেই যেতে পারে। কেন জানি মনে হচ্ছে তার কাছেও যায়নি। বড় শহরে হঠাৎ হঠাৎ কিছু লোকজন হারিয়ে যায়—কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারে না। মোরশেদও কি হারিয়ে গেছে? অদৃশ্য হয়ে গেছে? প্রকৃতি মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা দেয়নি। তবে মানুষের সেই অক্ষমতা প্রকৃতি পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছে—কেউ অদৃশ্য হতে চাইলে প্রকৃতি সেই সুযোগ করে দেয়।

একদিন গেলাম এষাদের বাড়ি। এষা দরজা খুলে আনন্দিত গলায়, আরে আপনি।

"কেমন আছেন?"

"ভালো আছি। ঐ যে আপনি গেলেন আর খোঁজ নেই। দাদিমা রোজ একবার জিজ্ঞেস করে লোকটা এসেছে।"

"উনি কি আছেন?"

"না, নেই। আমার কি ধারণা জানেন? আমার ধারণা আপনি খোঁজখবর নিয়ে আসেন। যখন দাদীমা থাকে না, তখনি উপস্থিত হন। আসুন, ভেতরে আসুন"।

আজ এষাকে অনেক হাসিখুশি লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়সও কমে গেছে। উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরেছে। তবে আজো খালি পা।

"ঐদিন আপনি দাদীমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। উনার অষুধপত্র লেগেছিল। আপনি কিনে দিলেন। দাদীমা ঐ টাকা আপনাকে দিতে চাচ্ছেন। সে জন্যেই তিনি আপনাকে এত খোঁজ করছেন। আমি দাদীমাকে বললাম, তুমি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছ—টাকা দিলেও উনি নেবেন না।"

"টাকা নেব না এই ধারণা আপনার কেন হল?"

"আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে। আমি মানুষকে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারি।"

"না, বুঝতে পারেন না। টাকা আমি নেব। সব মিলিয়ে একচল্লিশ টাকা খরচ হয়েছে। আজ টাকাটা নিতেই এসেছি।"

"আপনি সত্যি বলছেন?"
"হ্যাঁ।"
"বসুন, টাকা নিয়ে আসছি"।
এষা টাকা নিয়ে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, আপনি বসুন। আমি আবার বসলাম। এষা বসল আমার সামনে। সহজ গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি সামনের সপ্তাহে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমেরিকার নিউজার্সিতে আমার মেজো ভাই থাকেন। ইমিগ্রেন্ট। তিনি আমার জন্যে গ্রীন কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁর কাছে চলে যাব।
"বাহ,ভাল তো!"
"ভাল-মন্দ জানি না। ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।"
"ভাল হবারই সম্ভাবনা। নতুন দেশে, সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। এখানে থাকলে হঠাৎ-হঠাৎ পুরানো স্মৃতি আপনাকে কষ্ট দেবে। হয়তো হঠাৎ একদিন মোরশেদের সঙ্গে পথে দেখা হল। আপনি কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না। কিংবা ধরুন খিলগাঁয় আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, আরে, এই বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে জোছনা রাতে দু'জন বসে কত গল্প করেছি...'
এষা আমাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এসব আমাকে কেন বলছেন?
"এমনি বলছি।"
"শুনুন হিমু সাহেব! আপনি খুব সুক্ষভাবে আমার মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।"
"চেষ্টা করতে হবে কেন ? আপনার ভেতর এমিতেই অপরাধবোধ আছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পেছনেও এই অপরাধবোধ কাজ করছে।"
"সেটা নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়।"
"দূষণীয়। মানুষকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এমন কটি জিনিসের একটি হল অপরাধবোধ। আপনি এই অপরাধবোধ ঝেড়ে ফেলুন"।
"কীভাবে ঝেড়ে ফেলব?"
"দেশ ছেড়ে যাবার আগে মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করুন। কথা বলুন, গল্প করুন। তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা দেখুন। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য ও করতে পারি। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"
"হিমু সাহেব। আপনি নিতান্তই আজেবাজে কথা বলছেন। আমি এর কোনোটিই করব না। এগারো তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট। আমি অসম্ভব ব্যস্ত। তা ছাড়া ইচ্ছাও নেই।"
"টিকিট কাটা হয়েছে?"
"হ্যাঁ, মেজো ভাই টিকিট পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট।"
আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এষা, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতেই হবে এই দেশেই।
"তার মানে!"
"মানে আমি জানি না। আমি মাঝে-মাঝে চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আমি স্পষ্ট দেখছি আপনি মোরশেদ সাহেবের হাত ধরে একটা আমগাছের নিচে

দাঁড়িয়ে আছেন।”

“আপনি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন?”

“ভয় দেখাচ্ছি না। কি ঘটবে তা আগেভাগে বলে দিচ্ছি।”

“প্লীজ, আপনি এখন যান। আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ভুল হয়েছে। শুনুন হিমু সাহেব, এগারো তারিখে বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট—আপনার কোনো ক্ষমতা নেই আমাকে আটকানোর। প্লীজ এখন যান। আর কখনো এখানো এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।”

আমাকে দুটা টেলিফোন করতে হবে। রিকশা নিয়ে তরঙ্গিণী স্টোরে উপস্থিত হলাম। নতুন ছেলেটা কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, বল পয়েন্ট কিনতে এসেছি। এই নিন দশ টাকা। ছেলেটার কঠিন চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমাকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে।

“কয়েকদিন আগে এক ম্যানেজার সাহেবকে কলম কিনতে পাঠিয়েছিলাম। এসেছিল?”

ছেলেটা হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে ভয় আরো গাঢ় হচ্ছে।

“সেই কলমেও লেখা হচ্ছে না বলেই আরেকটা কেনার জন্যে আসা।”

“ভাইজান, আপনার পরিচয় কি?”

“আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি কেউ না। আমি হলাম নোবডি। টেলিফোন ঠিক আছে?”

“জ্বি আছে।”

“দুটা টেলিফোন করব।”

প্রথম টেলিফোন বাদলকে। বাদল চমকে উঠে চিৎকার করল—কে, হিমুদা না?

“হু।”

“কোত্থেকে টেলিফোন করছ?”

“কোত্থেকে আবার? জেলখানা থেকে।”

“জেলখানা থেকে টেলিফোন করতে দেয়?”

“দেয় না, তবে আমাকে দিয়েছে। জেলার সাহেব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।”

“তা তো দেবেনেই।তুমি চাইলে কে “না” বলবে। তোমার কতদিনের জেল হয়েছে?”

“ছ'মাস।”

“সে কী। বাবা যে বলল, এক বছর”।

“এক বছরেরই হয়েছিল। ভাল ব্যবহারের জন্যে মাফ পেয়েছি।”

“তা হলে তোমার সঙ্গে আর মাত্র তিন মাস পর দেখা হবে।”

“হ্যাঁ।”

“আমার দারুণ লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।”

“তুই আমার একটা কাজ করে দে বাদল। একজন লোককে খুঁজে বের করে দে। তাঁর নাম মোরশেদ।”

“কোথায় খুঁজব?”

“কোথায় যে সে আছে বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় ১৩২ নম্বর খিলগাঁয় একতলা একটা বাড়ির সামনে সে গভীর রাতে একবার-না-একবার আসে। ঐ বাড়ির

সামনে ফাঁকা জায়গায়টা সে একটা আমগাছ দেখতে পায়। আসলে কোনো গাছ নেই, কিন্তু লোকটা দেখে। গাছটা দেখার জন্যেই সে প্রতিরাতে একবার সেখানে যাবে। আমার তাই ধারণা।"

"বল কী!"

"ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। জেল থেকে বের হয়ে তোকে সব গুছিয়ে বলব। এখন তোর কাজ হচ্ছে ঐ লোকটাকে বের করা । এবং তাঁকে বলা সে যেন অবশ্যি ১১ তারিখ বেলা তিনটার আগেই এয়ারপোর্টে বসে থাকে।"

"কেন হিমুদা?"

"একজন মহিলা ঐ সময় দেশ ছেড়ে যাবেন। লোকটার সঙ্গে মহিলার দেখা হওয়া উচিত। বলতে পারিব না?"

"অবশ্যই পারব। শুধু যে পারব তা না – আমি নিজেও এয়ারপোর্ট যাব"।

"তোকে যেতে হবে না। তুই শুধু খবরটা দে।" 'আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। মোরশেদ সাহেবকে আমি নিজেও খুঁজে বের করতে পারতাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে ইয়াদের সন্ধানে। নীতুর সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

১২

ইয়াদের বাড়ি সব সময় আলোয় ঝলমল করে। সন্ধ্যার পর থেকেই এরা বোধহয় সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে রাখে। আজ ওদের বাড়ি অন্ধকার। গেট থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের বাতিগুলো পর্যন্ত নেভানো। শুধু বারান্দায় বাতি জ্বলছে। আমি গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ নেই নাকি?

"আপা আছেন।"

"কুকুর দু'টা কোথায়—টুটি-ফুটি?"

"ওরা বান্ধা আছে। ভয় নাই, যান।"

ভয় নেই বললেই ভয় বেশি লাগে। আমি ভয়ে-ভয়ে এগুচ্ছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে নীতুকে বসে থাকতে দেখলাম। আজ তার গায়ে শাদা রঙের শাড়ি। শাদা শাড়িতে নীল ফুলের সুতার কাজ। গায়ের চাদরটাও শাদা। শাদা রঙ মেয়েদের এত মানায় আজ প্রথম জানলাম। নীতু আমাকে দেখে উঠে এল। সহজ গলায় বলল, আসুন।

"ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ, ভাল। এখানে বসবেন, না ভেতরে যাবেন?"

"বারান্দাই ভাল।"

"হ্যাঁ, বারান্দাই ভাল। আপনি কি লক্ষ করেছেন বেশির ভাগ সময় আমি বারান্দায় বসে থাকি?"

"আমি লক্ষ করেছি।"

"আপনার তাড়া নেই তো? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি চা দিতে

বলি। টুটি-ফুটিকে খাবার দিয়ে আসি। আমি খাবার না দিলে ওরা কিছু খায় না।”

নীতু উঠে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভেবেছিলাম নীতুকে খুব আপসেট দেখব। সে রকম মনে হচ্ছে না। আপসেট যদি হয়েও থাকে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমি লক্ষ করেছি ছোটখাট ব্যাপারে যারা অস্থির হয়, বড় ব্যাপারগুলিতে তারা মোটামুটি ঠিক থাকে।

ঘরে তৈরি সমুচা এবং পটভর্তি চা। ট্রে নীতু নিয়ে এসেছে। এই কাজ সে কখনো করে না। খাবার আনার অন্য লোক আছে।

“সমুচাগুলি এইমাত্র ভাজা হয়েছে, খান। ভাল লাগবে। সঙ্গে টক দেব?”

“না। টুটি-ফুটিবে খাবার দেয়া দেয়া হয়েছে?”

“দেয়া হয়েছে।”

“ওরাও কি সমুচা খাচ্ছে?”

“না, ওরা সেদ্ধ মাংস খাচ্ছে। হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা মাংস। দিনে ওরা একবারই খায়।”

আমি সমুচা খেতে-খেতে বললাম, “বিলেতি কুকুর একবার খায়, কিন্তু দেশীগুলি সারাক্ষণ খায়—কিছু পেলেই খেয়ে ফেলে”।

“ট্রেনিং দেয়া হয় না বলে সারাদিন খায়। ট্রেনিং দিলে ওরা একবেলা খেত। চা ঢেলে দেব?”

“দিন।”

নীতু চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম,শাদা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নীতু কানে মুক্তার দুল পরেছে।

“মিষ্টি হয়েছে?”

“হয়েছে।”

নীতু চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বড় নিঃশ্বাস নিল। মনে হচ্ছে সে এখন কঠিন কিছু কিথা বলবে।

“আপনি গিয়েছিলেন ইয়াদের কাছে?”

“জ্বি”।

“তাকে বলেছিলেন পাগলামি বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতে?”

“না।”

“আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি তাকে দেখে খুব মজা পেয়েছেন। একজনকে শুধু কথায় ভুলিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া তো সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। সবাই পারে না। আপনি পারেন।” নীতু হাই তুলতে-তুলতে বলল।

“আমি ওকে কিছু বলিনি, কারণ বলার প্রয়োজন দেখিনি”।

“কেন প্রয়োজন দেখেননি?”

“ও ফিরে আসবে। ওর প্রতি আপনার ভালবাসা প্রবল, সেই ভালবাসা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ওর নেই।”

“বড়-বড় কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাচ্ছেন?”

“না। যা সত্যি তাই বললাম।”

“যা সত্যি তা আপনি কাউকে বলনে না, কারণ সত্যটা কি তা আপনি নিজেও জানেন না। আপনি বিভ্রম তৈরি করতে পারেন বলেই বিভ্রমের কথা বলেন। আমি খুব বিনীতভাবে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আশা করেছিলাম আপন

আসবেন। আসেননি। ইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন—তাও আমার কারণে যাননি। ইয়াদকে আপনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন—তাকে বলেছেন যে দু'জন লোক তার পেছনে লাগানো আছে। যে জন্যে সে ভোররাতে সবার চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি কি ঠিক বলছি না? চুপ করে থাকবেন না। উত্তর দিন"।

আমি বললাম , "একটা সিগারেট কি খেতে পারি?"

নীতু নরম গলায় বলল, "অবশ্যই খেতে পারেন। আপনার বন্ধু গাঁজা খেয়ে মাঠে পড়ে ছিল, আপনি সিগারেট খাবেন না কেন? তবে ভাববেন না আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি শাস্তি দেব"।

"কি শাস্তি?"

"আপনি তো ভবিষ্যৎ বলে বেড়ান। কাজেই আপনি নিজেই অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান ঠিক হয় কি না।"

"অনুমান করতে পারছি না।"

"চা খাবেন আরেক কাপ? পটে চা আছে।"

"না, আর খাব না। আমি এখন উঠব।আর আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না। ইয়াদ চলে আসবে।"

"সান্ত্বনার জন্যে ধন্যবাদ।"

নীতু হাসল। কিন্তু তার চোখ অসুস্থ মানুষের চোখের মতো ঝকঝক করছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নীতু বলল, "আপনাকে কি শাস্তি দেব তা না শুনেই চলে যাচ্ছেন যে। অনুমান করতে পারছেন না?"

"না।"

"একটু চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই পারবেন"।

"পারছি না।"

"আচ্ছা যান।"

নীতু উঠে দাঁড়াল। আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি—এবং ভয় পাচ্ছি।অকারণ তীব্র ভয়। মনে হচ্ছে শীরর ভারী হয়ে এসেছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম নীতু কি শাস্তি দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা করল চেচিয়ে বলি–"না নীতু , না।"

তার সময় পাওয়া গেল না—টুটি-ফুটি উল্কার মতো ছুটে এল। মাটিতে পড়ে যাবার আগে এক ঝলক দেখলাম বারান্দায় আঙুল দিয়ে উচিয়ে নীতু দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে শাদা পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে দেবী প্রতিমার মতো। নীতু হিসহিস করে বলল, Kill him. Kill him.

আমি বাস করছি অন্ধকারে এবং আলোয়। চেতন এবং অবচেতন জগতের

মাঝামাঝি। Twilight zon. আমার চারপাশের জগৎ অস্পষ্ট। আমি কি বেঁচে আছি? আমাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। এটা কি কোনো হাসপাতাল? আমার কোনো ক্ষুধাবোধ নেই, কিন্তু প্রবল তৃষ্ণা। "পানি" বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করতে পারছি না। স্বপ্ন ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। বাস্তব এবং কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এগুচ্ছে। আমি এদের আলাদা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

মোটা গম্ভীর স্বরে একজন কেউ বলছেন,

"হিমু সাহেব! হিমু সাহেব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জবাব দেবার দরকার নেই— জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না। শুধু আঙুল নড়ানোর চেষ্টা করুন। আমি আপনার ডাক্তার। আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে পায়ের আঙুল নড়ানোর চেষ্টা করুন।"

আমি প্রাণপ্রণে পায়ের আঙুল নাড়াতে চেষ্টা করি। পারি কি পারি না বুঝতে পারি না। মোটা গলার ডাক্তার সাহেবের কথাও শুনতে পাই না। আশেপাশে সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসে —তখন গভীর কোনো নৈঃশব্দ থেকে আমার বাবার গলা শুনতে পাই—

"খোকা! খোকা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পেলে আঙুল-ফাঙুল নাড়াতে হবে না। মনে-মনে বল শুনতে পাচ্ছি। তা হলেই আমি বুঝব। শুনতে পাচ্ছিস খোকা?"

"পাচ্ছি। তুমি আমাকে খোকা ডাকছ কেন? তুমিই তো নাম দিলে হিমালয়।"

"তোর মা খোকা ডাকত—এই জন্যে ডাকছি। শোন খোকা, তোর অবস্থা তো কাহিল—টুটি-ফুটি তোর পেটের নাড়িভুড়ি ছিড়ে ফেলেছে। আমি অবশ্যি খুব খুশি"।

"তুমি খুশি?"

"খুব খুশি। মহাপুরুষ হবার একটা ট্রেনিং বাকি ছিল—তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার ট্রেনিং। সেটি হচ্ছে।"

"আমি কি মারা যাচ্ছি?"

"বলা মুশকিল। ফিফটি-ফিফটি চান্স। এটাও ভাল হল—ফিফটি-ফিফটি চান্সে দীর্ঘদিন থাকার দরকার আছে। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।"

"বাবা তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলছ, না এসব আমার মনের কল্পনা?"

"এটাও বলা মুশকিল, ফিফটি-ফিফটি চান্স। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভবনা, পুরোটি তোর অসুস্থ থাকার কল্পনা। আবার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভবনা আমি কথা বলছি তো সঙ্গে। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না, খোকা। ওরা তোকে মরফিয়া দিচ্ছে। তুই এখন ঘুমিয়ে পড়বি।"

"আজ কী বার বাবা? কত তারিখ?"

"জানি না। তোরও জানার দরকার নেই। আমি এবং তুই আমরা দু'জনই এখন বাস করছি সময়হীন জগতে। এই জগতটা অদ্ভুত খোকা। ভারি অদ্ভুত। এই জগতে সময় বলে কিছু নেই। আলো নেই... কিছুই নেই..."

"আমার তারিখ জানার খুব দরকার। এগারো তারিখ এষা চলে যাবে। মোরশেদ সাহেবের এয়ারপোর্টে যাবার কথা। উনি কি গেছেন? এষা কি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছে?"

"তুই কি চাস সে ফিরে আসুক?"

“চাই।”

“তা হলে ফিরে এসেছে। সময়হীন জগতের মজা হচ্ছে, এই জগতের বাসিন্দারা যা চায়—তাই হয়। সমস্যা হচ্ছে এই জগতের কেউ কিছু চায় না।”

“হিমু সাহেব। হিমু সাহেব। আমি আপনার ডাক্তার। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে পায়েল আঙুল নাড়ান। গুড, ভেরি গুড। দেখি, এবার হাতের আঙুল নাড়ান। কষ্ট হলেও চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনি অবশ্যই পারবেন। ভেঙে পড়লে চলবে না—আপনাকে মনে জোর রাখতে হবে। সাহস রাখতে হবে।”

একসময় আমার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেন। আমি অবাক হয়ে চারপাশের অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখি। ফিনাইলের গন্ধভরা হাসপাতালের ঘরটাকে ইন্দ্রপুরীর মতো লাগে। মায়াময় একটি মুখ এগিয়ে আসে আমার দিকে।

“ছোটমামা, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি মোরশেদ। চিনতে পারছেন?”

“পারছি। এষা কোথায়?”

“ও বারান্দায় আছে। ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে কি ডাকব?”

“না, ডাকার দরকার নেই।”

“আপনি কথা বলবেন না, ছোটমামা। আপনার কথা বলা নিষেধ।”

আমি কথা বলি না। চোখ বন্ধ করে ফেলি—আবারো তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। ঘুমের ভেতরই একটা বিশাল আমগাছ দেখতে পাই। সেই গাছের পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জোছনা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। হাত ধরাধরি করে দু'জন হাঁটছে গাছের নিচে। মানব ও মানবী। কারা এরা? কি ওদের পরিচয়? দু’জনকেই খুব পরিচিত মনে হয়। অনেক দুর থেকে চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসে। আমি চমকে উঠে বলি, কে আপনি? কে?

ভারী গম্ভীর গলায় উত্তর আসে। আমি কেউ না, I am nobody!

(সমাপ্ত)

পারাপার

হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
পারাপার
হুমায়ূন আহমে
SUVOM

কাল সারারাত ঘুম হয় নি।
ঘুম না হবার কোনো কারণ ছিল না।
কারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে অনেক কিছু
ঘটে। দিনের আলো ফোঁটা পর্যন্ত অপেক্ষা
করে ঘুমোতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখভর্তি
ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল
স্বপ্ন দেখে। আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম ।
তিনি আমার গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছেন,
এই হিমু, হিমু, ওঠ । তাড়াতাড়ি ওঠ ।
ভূমিকম্প হচ্ছে। ধরণী কাঁপছে।
- আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম, আহ,
কেন বিরক্ত করছ।
- বাবা ভরাট গলায়বললেন, প্রাকৃতিক
দুর্যোগের মতো মজার ব্যাপার আর হয় না।
ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই সময় চোখকান খোলা
রাখতে হয় । তুই বেকুবের মতো শুয়ে আছিস ।
ঘুমোতে দাও বাবা।
তোর ঘুমোলে চলবে না। মহাপুরুষদের
সবকিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম।
ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু । সাধারণ মানুষ
ঘুমায়- ... অসাধারনা জেগে থাকে......

এক

ঢাকা শহরে ঘুঘুর ডাক শোনার কথা না।

কেউ কোনোদিন শুনেছে বলেও শুনি নি। ঘুঘু শহর পছন্দ করে না, লোকজন পছন্দ করে না। তাদের পছন্দ গ্রামের শান্ত দুপুর। তারপরেও কী যে হয়েছে— আমি ঘুঘুর ডাক শুনছি। বাংলাবাজার যাচ্ছিলাম, গুলিস্তানে ট্রাফিক ট্রাফিক জ্যামে পড়লাম। রিকশা, টেম্পো, বাস, ঠেলাগাড়ি সবকিছু মিলিয়ে দেখতে দেখতে জট পাকিয়ে গেল। একেবারে কঠিন গিট্টু। হতাশ হয়ে রিকশায় বসে আছি আর ভাবছি — আধুনিক মানুষের একজোড় পাখা থাকলে ভালো হতো। জটিল ট্রাফিক জ্যামের সময় তারা উড়ে যেতে পারত। ঠিক এই রকম হতাশা জর্জরিত সময়ে ঘুঘু পাখির ডাক শুনলাম। সেই অতি পরিচিত শান্ত বিলম্বিত টানা-টানা সুর, যা শুনলে মুহুর্তের মধ্যে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষের শরীরের ভেতরে যে আরেকটি শরীর আছে তার মধ্যে কাঁপন ধরে।

আমি হতচকিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তার্কালাম। এমন কি হতে পারে যে কেউ খাচায় করে পাখি নিয়ে যাচ্ছে, সেই পাখি ডেকে উঠল ? ইদানীং ঢাকার লোকদের পাখি-পোষা অভ্যাসে ধরেছে নীলক্ষেতে বিরাট পাখির বাজার।

ট্রাফিক জট কমছে না। জট-কমানোর চেষ্টাও কেউ করছে না। রোগা ধরনের এক ট্রাফিক পুলিশ দূরে দাড়িয়ে বাদামওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। এখানে যে কঠিন অবস্থা তা সে জানে বলেও মনে হচ্ছে না। এই তো দেখি সে বাদাম কিনছে একঠোঙা বাদাম, একটু ঝাল লবণ।

যতই সময় যাচ্ছে অবস্থা জটিল হয়ে আসছে। সবাই কিন্তু নির্বিকার— যা হবার হোক এমন এক ভঙ্গি। কারো মধ্যেই কোনো অস্থিরতা নেই। আমার রিকশা ঘেঁসে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে। মাইক্রোবাসের পর্দা টেনে দেয়া। ভেতরের যাত্রীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে শুধু দেখছি। মনে হলো সে খুব মজা পাচ্ছে। একবার সে উচু গলায় বলল, লাগছে গিট্টু।

চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। আশ্বিন মাসে খুব ঝাজালো রোদ ওঠে । বাতাস থাকে মধুর। আজ বাতাস নেই, শুধুই রোদ । রোদের সঙ্গে ঘামের গন্ধ, ঘামের গন্ধের সঙ্গে পেট্রোলের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে ঘুঘুর ডাক ঘু-ঘু-ঘু। মিলছে না একেবারেই মিলছে না। Something is wrong আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, পাখি ডাকছে নাকি ?

আমার রিকশাওয়ালা বিরক্তমুখে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ ঘুঘু ডাকছে না। কিংবা ডাকলেও সে শুনছে না। সবাই সবকিছু শুনতে পায় না। তাছাড়া রাস্তায় যারা জীবনযাপন করে গাড়ির হন শুনতে শুনতে তাদের কান নষ্ট হয়ে যায় ।

মাইক্রোবাসের পর্দা সরে গেল। একজন পান-খাওয়া মহিলা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। ভদ্রমহিলার সিথির চুল পাকা । এছাড়া তার মুখে বয়সের কোনো চিহ্ন নেই। চুল পাকা না থাকলে অনায়াসে তাকে ৩০/৩২ বছরের তরুণী বলে চালানো যেত। তিনি জানালার পর্দা সরিয়েছেন পানের পিক ফেলার জন্যে । অনেকখানি মাথা বের করে একগাদা পানের পিক ফেলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই হিমু না ?

আমি জবাব দিলাম না, কারণ ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারছি না। আমার অতি দূরের কোন আত্মীয় হবেন। মেয়েরা অতি দূরের আত্মীয়কে কাছের মানুষ প্রমাণ করার জন্যে চট করে তুই বলে ।

কী রে, কথা বলছিস না কেন ? তুই কি হিমু ?

হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারছিস ?

না।

আমি আলেয়া খালা। এখন চিনেছিস ?

আলেয়া নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ল না। একজন আলেয়াকেই চিনতাম, সে সিরাজউদৌলা নাটকের নর্তকী । সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর আম্রকাননে তার বিখ্যাত যুদ্ধ যাত্রার আগে আলেয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন, আলেয়া তখন গান ধরল— ‘পথহারা পাখি, কেঁদে ফিরে একা ।

হিমু, তুই এখানে কী করছিস ?

রিকশার সিটের উপর বসে আছি ।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছিস কোথায় ?

যখন রিকশায় উঠেছিলাম, তখন একটা গন্তব্য ছিল। এখন নিজেও ভুলে গেছি।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস কেন ? আমি তোর খালা না ? আয়, উঠে আয় ।

কোথায় উঠে আসব ?

বাসে উঠে আয় । গরমে সিদ্ধ হবি না কি ? তুই যেখানে যাবি, নামিয়ে দেব। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে উঠে আয়।

আমি কথা বাড়ালাম না। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালাকে দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে। অপমানিত বোধ করারই কথা, তার রিকশাকে ছোট করা হয়েছে।

মাইক্রোবাসে ঢুকে মনে হলো— ছোটখাটো একটা চলন্ত বেহেশতে ঢুকে পড়েছি। এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার চালু আছে। শীত-শীত ভাব । মাইক্রোবাসটার ছাদের একটা অংশ কাচের । ভেতরে বসে আকাশ দেখা যাচ্ছে । ছয়জনের বসার জায়গা। প্রতিটি সিট আলাদা। সিটগুলো ঘূর্ণায়মান। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরানো যায়। ভদ্রমহিলা একা যাচ্ছেন না। তার সঙ্গে তার মেয়ে, চেহারা দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে, তবে চেহারা পুরো দেখা যাচ্ছে না, গাঢ় সানগ্লাসে মুখের পুরোটাই প্রায় ঢাকা । মেয়েটির কোলের উপর একটা বই। সানগ্রাস পরে এর আগে আমি কাউকে পড়তে দেখি নি। ভদ্রমহিলা তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আগ্রহ নিয়ে বললেন, ও খুকি, এ হচ্ছে হিমু। খুব ভালো হাত দেখতে পারে । হাত দেখাবি ?

খুকি কোনোরকম উৎসাহ দেখানো দূরে থাকুক, বই থেকে চোখ পর্যন্ত তুলল না। এটা বড় ধরনের অভদ্রতা। তবে রূপবতীদের সব অভদ্রতা ক্ষমা করা যায়। এরা অভদ্র হবে এটাই স্বাভাবিক। এরা ভদ্র হলে অস্বস্তি লাগে ।

কী রে খুকি, হাত দেখাবি? বসেই তো আছিস। দেখা না। হিমু চট করে দেখে ফেলবে।

খুকি বরফশীতল গলায় বলল, কেন বিরক্ত করছ ?

আলেয়া খালা নিজের হাত বারিয়ে বললেন, হিমু, আমার হাতটা দেখে দে তো । মন দিয়ে দেখবি ।

খুকি চোখ তুলে এক পলকের জন্যে মার মুখ দেখে আবার বই পড়তে শুরু করল। এই এক পলকের দৃষ্টিতেই তার মার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কালো চশমার কারণে হয়তো ভস্ম হলেন না ।

আমি বললাম, খালা, আমি হাত দেখা ছেড়ে দিয়েছি।

সে কী!

মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলতাম। মিথ্যা বলতে বলতে এক সময় নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। তারপর ঠিক করলাম, আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

বাজে কথা রেখে হাতটা দেখ তো ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তার দুই হাতের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আপনার সামনে একটা ভয়াবহ দুর্যোগ। পারিবারিক সমস্যা। অসম বিবাহঘটিত সমস্যা ।

ভদ্রমহিলা তার মেয়ের দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলার দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, এই তো হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকানোর অর্থ হচ্ছে, মেয়েকে ইশারায় বলা— কী, বলেছিলাম না ভালো হাত দেখে। দেখলি তো ? হাতেনাতে প্রমাণ ।

আমি বললাম, দুর্যোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, হঠাৎ মানে কবে ?

ধরুন এক মাস। তবে দুর্যোগ আপনারা সামলাতে পারছেন না। আরো জটিল করে ফেলছেন।

ভদ্রমহিলা আবারো মেয়ের দিকে তাকালেন । চোখের ইশারায় আবারো বললেন, দেখলি কত বড় পামিস্ট ?

মেয়েটি হাতের বই মুড়ে রাখল। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি নিঃসন্দেহে হলাম, এই মেয়ে, মানুষ না। এ হলো হুর । এদের শুধু বেহেশতেই পাওয়া যায়। এরা বেহেশতের সঙ্গিনী ।

And there will be companions
With beautiful, big
And lustrous eyes.

এই মেয়েটির চোখ – big, beautiful and lustrous. ami vablam, মেয়েটা কিছু বলবে বোধহয়— ভঙ্গিটা সে রকম। সে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। আবার কালো চশমা পরল, বই পড়তে শুরু করল। এটা কি বিশেষ কোনো বই যা সানগ্রাস ছাড়া পড়া যায় না ?

আলেয়া খালা বললেন, এই সমস্যাটা কখন মিটবে ?

মিটবে না।

তিনি হাহাকার করে উঠলেন, কী বলছিস তুই! মিটবে না মানে ?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম, এই সমস্যা মেটার নয়। সমস্যা বাড়তে বাড়তে এক্সপ্লোশান লিমিটে চলে আসবে। এই সমস্যায় একটি বাচ্চা মেয়ে জড়িত। মেয়েটির মৃত্যুযোগ আছে। সে মারা গেলে হয়তোবা সমস্যা মিটে যাবে।

আলেয়া খালা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সানগ্রাস পরা বেহেশতের পরী এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব তথ্য আপনি আমার মার হাতে লেখা দেখতে পেলেন ?

জি না। আমি বলেছি ইনটুশন থেকে। আমার ইনটুশন প্রবল। যে মেয়েটির কথা বললাম সে বোধহয় আপনার মেয়ে ?

খুকি জবাব দিল না।

মাইক্রোবাস নড়ে উঠল। জ্যাম কমেছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। গাড়ির সামনে একটা ঠেলাগাড়ি আছে বলে গাড়িটাকে শম্বুক গতিতে এগুতে হচ্ছে। আমি উঠে দাড়িয়ে বললাম, যাই।

ভদ্রমহিলা তখনো নিজেকে সামলাতে পারেন নি। আমি যে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি তাও বোধহয় বুঝতে পারেন নি। মাইক্রোবাসের স্নাইডিং দরজা খোলার পর তিনি সংবিত ফিরে পেলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, না না, তুমি যেতে পারবে না।

এতক্ষণ আমাকে তুই বলছিলেন, শেষ সময়ে তুমি। ততক্ষণে আমি নেমে গেছি। মাইক্রোবাসের জানালার কাচ সরিয়ে ভদ্রমহিলা ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, এই হিমু এই, এই! এই ছেলে! আমি তার দিকে তাকিয়ে অভয়দানের হাসি হাসলাম— অর্থাৎ আসব। আবার দেখা হবে।

ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারছি না। এই সমস্যাটা আমার ইদানীংকালে হচ্ছে। মানুষ না-চেনা রোগ। মস্তিষ্কের যে অংশে স্মৃতি জমা থাকে সেই অংশে কিছু বোধহয় হয়েছে। স্মৃতির ফাইল গায়েব হয়ে গেছে। এক সময়কার চেনা লোকজনদের সঙ্গে

দেখা হয়। যেহেতু ব্রেইন সেলে জমা রাখা তাদের ফাইল গায়েব হয়ে গেছে, সেহেতু তাদের চিনতে পারি না। একজন নিওরোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করা দরকার। রোগ আরো বাড়বার আগেই চিকিৎসা দরকার, নয়তো দেখা যাবে কাউকেই চিনতে পারছি না। সবাই অপরিচিত। অবশ্যি আমার ধারণা, সেই অভিজ্ঞতাও মজার অভিজ্ঞতা হবে। ৬০০ কোটি মানুষের বিশাল পৃথিবী, আমি কাউকেই চিনতে পারছি না।

মাইক্রোবাস থেকে বেকায়দা জায়গায় নেমেছি। সামনে পেছনে কোনো দিকেই যেতে পারছি না। দুদিকেই গাড়ির স্রোত। পথচারীকে রাস্তা পার হবার সুযোগ করে দেবার জন্যে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজে পৌছতে পারলেই হলো। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরেকটা ট্রাফিক জ্যামের জন্যে। দেখা যাচ্ছে, ট্রাফিক জ্যামেরও একটা ভালো দিক আছে। এই সময়ে রাস্তা পারাপার করতে পাড়া যায়। To every cloud there is a silver lining.

আমি অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করতে খুব যে খারাপ লাগছে তা না। কারণ তেমন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে বের হইনি। যাচ্ছি গেণ্ডারিয়ার দিকে । মোহাম্মদ ইয়াকুব আলি নামের এক ভদ্রলোক জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। তিনিও সম্ভবত আমাকে চেনেন না। তবে শুনেছি হুলস্থূল ধরনের বড় লোক। হেন ব্যবসা নেই যা তার নেই। ইন্ডাস্ট্রি ফিন্ডাস্ট্রি দিয়ে যাকে বলে—ছেড়াবেড়া' । এমন একজন আমাকে জরুরি তলব পাঠাবেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। জরুরি তলব পাঠালে ধীরে-সুস্থে যাবার নিয়ম । আমিও তাই করেছি। দু ঘণ্টা দেরি করেছি।

আবার ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। দুটা রিকশার পেছনের চাকা একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে গেছে। দুজন রিকশাওয়ালাই দোষ কার তা নিয়ে তর্ক করছে, চাকা ছাড়াবার চেষ্টা করছে। জনতাও দুই ভাগ হয়ে গেছে। একদল খালি গা রিকশাওয়ালার পক্ষে অন্যদল দাড়িওয়ালা রিকশাওয়ালার পক্ষে । কাজেই জ্যাম । গাড়ি-টাড়ি বন্ধ করে ড্রাইভাররা সব গালে হাত দিয়ে বসে আছে ।

আশ্বিন মাসের ঝাজালো রোদ ক্রমেই বাড়ছে। ঘুঘু পাখির ডাক আর শুনছি না।

আজকের দিনটা রহস্য দিয়ে শুরু হলো। পাখি রহস্য।

দুই

এ দেশের বিত্তবান সম্প্রদায় বাস করেন গুলশান, বনানী এবং বারিধারায় । এই প্রচলিত ধারণা ঠিক নয় । পুরনো ঢাকার গলি তস্য-গলি করতে করতে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখানে দু-তিন বিঘার মতো জায়গা নিয়ে এক দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে । চারদিকে জেলখানার মতো উচু এবং ভারি দেয়াল । দেয়ালের মাথায় কাঁটাতার। নিরেট লোহার গেট । সেই গেটে অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করেও লাভ হলো না। শব্দ ভেতরে যাচ্ছে না বলেই আমার ধারণা। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে ভেতর থেকে লোকজন বেরুতে পারে, বাইরের কেউ ঢুকতে পারে না। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

আমি চলে যাবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেবার পরই ঘটাং ঘটাং শব্দ হতে লাগল | যেন কয়লার ইনজিনের শান্টিং হচ্ছে। তারপরেই ঘরঘর শব্দ । গেট খুলে গেল– সুতার মতো সরু একজন লুঙ্গিপরা, খালি গায়ের লোকের মাথা বের হয়ে এলো ।

কাহারে চান ?

এ রকম দুর্বল স্বাস্থ্যের একজন লোককে দারোয়ানের চাকরি কেন দেয়া হলো তাই ভাবছি। আমি কাকে চাই সেটা বলা এখন আর তেমন জরুরি বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া আমি কাউকেই চাই না। এ বাড়ির প্রধান ব্যক্তিটি আমাকে চান। লোকটা কারে চান না বলে কাহারে চান বলছে কেন ?

আফনে কাহারে চান ?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমি কাহারেও চাই না। ইয়াকুব আলি সাহেব আমাকে চান।

আপনের নাম হিমু ?

হু।

আপনি আসতে দেরি করছেন । আপনের আসার কথা দশটার সময় ।

চলে যাব ?

আহেন, ভিতরে আহেন।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ হয়ে গেল। ঘটঘট শব্দে ভেতর থেকে দুটা তালা মেরে দেয়া হলো । তালার চাবি দারোয়ানের কোমরে বাধা । মনে হলো এই গেট আর খুলবে না। দারোয়ান বলল, ভিতরে চলে যান— বলেই সে খুপরিতে ঢুকে গেল। সেখানে একটা দড়ির ক্যাম্পখাটে তার বিছানা । সে অতি দ্রুত দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। এত দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি নিশ্চিত সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি বিস্ময় নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের ভেতর-বাড়ির দিকে তাকালাম। ইংল্যান্ড হলে এই বাড়িকে অনায়াসে ক্যাসেল বলে চালিয়ে দেয়া যেত। হুলস্থূল ব্যাপার। গ্রিক স্থাপত্যের বড় বড় কলামওয়ালা বাড়ি। টানা বারান্দার পুরোটাই মার্বেলের । বাড়ির সামনে ফোয়ারা আছে। ফোয়ারায় অবশ্যি পানি ঝরছে না তবে দেখে মনে হচ্ছে সচল ফোয়ারা । সময়ে সময়ে চালু করা হয় । গাড়ি-বারান্দায় চারপাঁচজন মানুষ । এঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। সবাইকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। আমি খানিকটা এগুতেই ঝকঝকে চেহারার এক যুবক আমার দিকে আসতে শুরু করল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। যুবকটির চেহারা সুন্দর, হাঁটার ভঙ্গি সুন্দর, হালকা ছাই-রঙা প্যান্টের উপর সে পরেছে আসমানি রঙের হাফ শার্ট । শার্টেও তাকে সুন্দর মানিয়েছে। মনে হচ্ছে অন্য কোনো রঙের শার্ট পরলে তাকে মানাত না। যার সব সুন্দর তার কথাবার্তা সাধারণত কর্কশ হয়। দেখা গেল, তার কথাবার্তাও সুন্দর। রেডিওতে অডিশন দিলে প্রথম সুযোগেই খবর পাঠের কাজ পেয়ে যেত।

আপনি কি হিমু সাহেব ?

জি ।

আপনার না দশটার দিকে আসার কথা ?

গাড়ির জ্যামে আটকা পড়েছিলাম।

ও আচ্ছা। আপনি স্যারের কাছে চলে যান। উনি আপনার জন্যে অস্থির

হয়েছেন ।

ব্যাপারটা কী বলুন তো ?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার আপনি জানেন না?

জি না।

বলেন কী! আমার ধারণা ছিল জানেন । যাই হোক, স্যারই আপনাকে বলবেন । দয়া করে স্যারের সঙ্গে কোনোরকম তর্ক বা আগুমেন্টে যাবেন না। উনি যা বলবেন, তাতেই ই ই বলে মাথা নাড়বেন । Be a yes-man, আসুন আপনাকে দেখিয়ে দি ।

যারা অপেক্ষা করছেন তাঁরা সবাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বুঝতে পারছি, এখানে আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শুধু ইয়াকুব আলি সাহেব এক না. এরা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে ।

ইয়াকুব আলি সাহেব অসুস্থ— এ খবরও জানা ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি ইয়াকুব আলি সাহেবের অসুস্থতার খবর আমাকে দেন নি। অসুখ তেমন গুরুতর বলেও মনে হচ্ছে না। বিত্তবানরা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দেশে থাকেন না। সিঙ্গাপুর, ব্যাংককে থাকেন। তাদের কপালে দেশের মাটিতে মৃত্যু লেখা থাকে না। তাদের মৃত্যু অবধারিতভাবে হবে দেশের বাইরে।

হিমু সাহেব!

জি ।

আপনি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটাই স্যারের। দরজায় নক করলেই নার্স দরজা খুলে দেবে। আরেকটা কথা, কাঠের সিঁড়ি তো, আস্তে পা ফেলবেন । শব্দ হয় না যেন । সিঁড়িতে শব্দ হলে স্যার খুব বিরক্ত হন।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললাম, আপনি এক কাজ করুন ভাই। আমাকে বরং কোলে করে দোতলায় দিয়ে আসুন। শব্দটব্দ একেবারেই যেন না হয় সেদিকে আপনি আমার চেয়ে ভালো লক্ষ রাখতে পারবেন ।

ভদ্রলোক আমার কথায় আহত হলেন কি না বুঝতে পারলাম না। তার মুখভঙ্গিতে কোনোরকম পরিবর্ত এলো না। আগে যেমন ছিল, এখনো সে রকম আছে । আমি তার নির্বিকার ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে বললাম, ব্রাদার, আপনার নাম ?

আমার নাম মইন। মইন খান । আমাকে ব্রাদার বলবেন না। যান, আপনি দোতলায় যান। শব্দ করেই যান।

কাঠের সিড়ি হলেও সিঁড়িতে কার্পেট দেয়া। চেষ্টা করেও শব্দ করা গেল না !

দরজায় টোকা দেবার আগেই নার্স দরজা খুলে দিয়ে বলল, আসুন। স্যার জেগেই আছেন। সোজা চলে যান। জুতা খুলে এখানে রেখে যান। আপনার পা দেখি ধুলোভর্তি এক কাজ করুন, বাথরুমে ঢুকে পা ধুয়ে ফেলুন।

শুধু পা ধোব, না ওযু করে ফেলব ?

নার্স কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। এ বোধহয় মইন খানের মতো রসিকতায় স্থির থাকতে পারে না। তবে নার্সের চেহারা সুন্দর। কঠিন চোখে তাকালেও তাকে খারাপ লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে কঠিন চোখে না তাকালেই তাকে খারাপ লাগত। আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, সিস্টার, আপনার নাম জানতে পারি ?

আমার নাম দিয়ে কি আপনার প্রয়োজন আছে ?

জি আছে। আমি যখন অসুস্থ হব তখন সেবা করার জন্যে আপনাকে রাখব।

কল দিলে আসবেন না ?

যান, বাথরুমে যান, কার্বলিক সাবান আছে। ভালোমতো হাতমুখ ধোবেন।

আমি বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

অনেকদিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম। ২০০১ স্পেস অডিসি। ছবির একটি দৃশ্যে বিশাল খাটে একজন বুড়ো মানুষ শুয়ে আছেন। বুড়োর চেহারা অনেকটা সম্রাট শাহজাহানের মতো। ঘরটা প্রকাণ্ড । প্রকাণ্ড ঘরের প্রকাণ্ড খাটে একজন রুগ্ন কৃশকায় মানুষ— দৃশ্যটা দেখামাত্র মনে চাপ সৃষ্টি হয়। ইয়াকুব আলি সাহেবের শোবার ঘরে ঢুকে স্পেস অডিসি ছবির কথা মনে পড়ল। ইয়াকুব আলি সাহেব শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর দীর্ঘ সময় দুজনই চুপচাপ। উনি কিছু বলছেন না। আমিও না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখছি। খাটের পাশে বুক সেলফ। বুক সেলফের বইগুলোর নাম পড়ার চেষ্টা করছি। এত দূর থেকে পড়া যাচ্ছে না। ন্যাপথেলিন এবং অডিকেলনের মিশ্র গন্ধ নাকে আসছে। মোটেই ভালো লাগছে না। তাছাড়া বুড়ো ইয়াকুব সাহেবের চোখ দুটিতে পাখি পাখি ভাব। মানুষের পাখির মতো চোখ এই প্রথম দেখলাম ।

হিমু!

জি ।

বোস ।

বসার জন্যে একটি মাত্র চেয়ার, সেটা ঘরের শেষপ্রান্তে । আমি কি সেখানে বসব না চেয়ার টেনে কাছে নিয়ে আসব তা বুঝতে পারছি না।

চেয়ার টেনে কাছে নিয়ে এসো। শব্দ হয় না যেন । ক্যাচ ক্যাচ শব্দ সহ্য হয় না। এমন কি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও না ।

চেয়ার পর্বতের মতো ভারি, আনতে গিয়ে আমার ঘাম বের হয়ে গেল । এরচে' মেঝেতে বসে পড়া ভালো ছিল।

হিমু!

জি স্যার।

তোমার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয় নি। তবে তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি নাকি সাধু-সন্ত টাইপের মানুষ। তোমার পেশা রাস্তায় ঘোরা। তোমার কিছু সাহায্য আমার দরকার।

স্যার বলুন কী করতে পারি।

ইয়াকুব আলি সাহেব খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। নার্স ঢুকল। মনে হয় কোনো একটা ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। ইয়াকুব সাহেব চোখ না তুলেই হাতের ইশারায় নার্সকে চলে যেতে বললেন।

হিমু!

জি স্যার!

আমি কী চাই সেটা বললে তুমি আমাকে পাগল-টাগল ভাবতে পারো।

আপনি বলুন। আমি সহজে কাউকে পাগল ভাবি না।

তুমি সহজে পাগল ভাবো আর না ভাবো— আমাকে সাবধান হয়েই কথা বলতে হবে। আমি তোমার কাছে কী চাই সেটা বলার আগে তুমি আমার স্ত্রীর কথা শুনে নাও । আমার স্ত্রীর কথা শুনলে আমাকে আর পাগল ভাববে না ।

বলুন।

মন দিয়ে শুনবে ।

জি স্যার, মন দিয়ে শুনব ।

ইয়াকুব আলি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এলেন । তার চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে। মণির সাইজও ছোট। ভদ্রলোকের অসুখটা কী ? যক্ষ্মা ? যক্ষ্মা রোগীর চোখ জ্বলজ্বল করে বলে শুনেছি। যক্ষ্মা হলে ঘনঘন কাশার কথা। তিনি এখনো কাশছেন না ।

আমার প্রথম স্ত্রী বিয়ের দু'বছরের মাথায় মারা যান। পরে আমি আবার বিবাহ করি। আমার প্রথম স্ত্রী গর্ভে কোনো সন্তানাদি হয় নি। আমার দ্বিতীয় স্ত্রীও প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। আমি আবারো বিবাহ করি। সেই স্ত্রী জীবিত আছেন। আমার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না বলে তিনি এখন আলাদা থাকেন। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ ?

জি স্যার, শুনছি।

বলো দেখি, আমার প্রথম স্ত্রী বিয়ের কতদিন পর মারা যান ?

বিয়ের দু'বছরের মাথায় । বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন ।

ইয়াকুব আলি সাহেব পাখির মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বিষ খাওয়ার ব্যাপারটি তিনি বলেন নি। এটা আমি বানিয়ে বললাম। মনে হচ্ছে লেগে গেছে । আমার দুএকটা বানানো কথা খুব লেগে যায়। ইয়াকুব আলি সাহেব গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন এই কথা তোমাকে বলি নি । তোমার জানার কথা না । কোথেকে জানলে ?

অনুমান করে বললাম। আমার অনুমান খুব ভালো ।

তাই দেখছি। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি তা তাহলে মিথ্যা না। যাই হোক, আমার স্ত্রীর কথা বলি— তার নাম জয়নাব । সে আমার উপর মিথ্যা সন্দেহ করে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পর সে তার ভুল বুঝতে পারে বলে আমার ধারণা। কারণ তারপরই সে নানানভাবে আমাকে সাহায্য করতে থাকে।

আমি বললাম, কীভাবে সাহায্য করেন ? বিপদ-আপদে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন কী করতে হবে বা না করতে হবে ?

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। ব্যবসার আয়-উন্নতিও তার জন্যেই হয়েছে। তার উপদেশেই আমি ব্যবসা শুরু করি।

ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাও তো থাকতে পারে...

তুমি কী বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি। অন্য ব্যাখাও আমি জানি। অন্য ব্যাখা হলো— আমার অবচেতন মন আমাকে সাহায্য করছে। আমার মৃতা স্ত্রী আমার অবচেতন মনের কল্পনা।

আপনি এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেন না ?

না ।

অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যেই সম্ভবত ইয়াকুব আলি সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি টেবিলের উপর রাখা রিমোট কনট্রোল নবে হাত রাখলেন। নার্স ছুটে এলো। তিনি বোধহয় সাইন ল্যাংগুয়েজে কিছু বললেন— নার্স মেজারিং গ্লাসের চেয়ে একটু বড় সাইজের গ্লাসে করে কী যেন নিয়ে এল। তিনি এক চুমুক খেয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলেন। যতক্ষণ তিনি চোখ বন্ধ করে থাকলেন ততক্ষণ নার্স কড়া চোখে আমার

দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের ইশারায় বলল, তুমি এই অসুস্থ মানুষটাকে কেন বিরক্ত করছ ? বের হয়ে যাও।

ইয়াকুব আলি সাহেব চোখ খুলে নার্সকে আবার ইশারা করলেন। নার্স চলে গেল। তিনি চাপা গলায় বললেন, হিমু!

জি । আমি অসুস্থ। ভয়াবহভাবেই অসুস্থ। মৃত্যুর ঘণ্টা টং টং করে বাজছে। তোমার তো অনুমান ভালো। বলো দেখি অসুখটা কী ?

বলতে পারছি না। আমার অনুমান সব সময় কাজ করে না।

কতদিন বাঁচব সেটা বলতে পারবে ?

জি না ।

ইয়াকুব আলি সাহেব গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন। তার কথা অস্পষ্ট হয়ে এলো। কথা বোঝার জন্যে আমাকে তার দিকে এগিয়ে যেতে হলো।

আমি শিশুদের একটা অসুখ বাধিয়ে বসেছি। এগুলো সাধারণত শিশুদের হয়। তখন তাদের বাঁচিয়ে রাখতে রক্ত বদলে দিতে হয়। কিছুদিন পর পর নতুন রক্ত। এখন কি অসুখটা বুঝতে পারছ ?

লিউকোমিয়া ?

হ্যাঁ লিউকেমিয়া । আমি প্রতি দশদিন পর পর শরীরে চার ব্যাগ করে রক্ত নিই। ডাক্তাররা বলছেন এই অসুখ থেকে উদ্ধারের কোনো আশা নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী বলেছে উদ্ধারের আশা আছে। সে পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

আপনার মৃত স্ত্রী পথ দেখিয়ে দিয়েছেন ?

হু।

পথটা কী ?

খুবই সহজ পথ, আবার এক অর্থে খুবই জটিল। তবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। এই জন্যেই তোমাকে খবর দিয়ে আনানো।

পথটা কী বলুন।

আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্ত যদি আমি শরীরে নিতে পারি তাহলে রোগ সেরে যাবে। ব্যাপারটা সহজ না ?

জি সহজ ।

জটিল অংশটা কী জানো ? জটিল অংশ হলো— নিষ্পাপ মানুষ পাওয়া।

আপনাকে এখন নিষ্পাপ মানুষ ধরে ধরে তাদের শরীরের সব রক্ত বের করে নিতে হবে ?

তুমি রসিকতা করার চেষ্টা করবে না হিমু। Don't try to be funny, আমি মরতে বসেছি। যে মরতে বসে সে রসিকতা করে না। তুমি আমাকে নিষ্পাপ মানুষ যোগাড় করে দেবে।

নিষ্পাপ মানুষ বুঝব কী করে ?

সেটা তুমি জানো, আমি জানি না। আমি খরচ দেব। টাকা যা লাগে আমি দেব। Is it clear?

স্যার, আপনার বয়স কত হয়েছে ?

নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। আমার বাবা-মা জন্মের দিনক্ষণ লিখে রাখেন নি। আমাকে বলেও যান নি। তবে ৫৮/৫৯ হবে।

অনেকদিনই তো বাঁচলেন ।

তুমি বলতে চাচ্ছ, অনেকদিন বেঁচেছি বলে আর বাঁচতে পারব না ? বেঁচে থাকার আমার অধিকার নেই ?

তা না ।

স্পষ্ট করে বলো কী বলতে চাও।

আজ থাক । পরে বলব। আপনি ক্লান্ত । বিশ্রাম করুন ।

আমি কি আশা করতে পারি তুমি নিষ্পাপ লোক খুঁজে বেড়াবে ?

জি। আমার কাছে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগছে। কাজেই খুঁজব ।

তোমাকেও আমি খুশি করে দেব। I will make you happy এমন খুশি করব যে চিন্তাও করতে পারবে না।

আমি স্যার এমনিতেই খুশি ।

তোমাকে মোট বারদিন সময় দেয়া হলো। দুদিন পর আমি রক্ত নেব । যা পাওয়া যায় তাই নেব । তার দশদিন পর তোমার এনে দেয়া রক্ত নেব ।

স্যার এখন উঠি ?

যাবার পথে আমার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবে । টাকা-পয়সার ব্যাপার আমি সরাসরি ডিল করি না। সে ডিল করে । ওর নাম মইন । মইন খান । ভালো ছেলে। খুব ভালো ছেলে ।

নিষ্পাপ ?

ইয়াকুব আলি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো খানিকটা ধাধায় পড়ে গেলেন। আমি বের হয়ে এলাম। ম্যানেজার মইন সাহেবকে আমার খুঁজে বের করতে হলো না। তিনি সিঁড়ির গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে সরাসরি অন্য একটা কামরায় নিয়ে গেলেন । এই কামরাটা মনে হচ্ছে ম্যানেজারের অফিসঘর। টেবিলে ফাইলপত্র সাজানো। মইন খান বসেছেন রিভলভিং চেয়ারে ।

হিমু সাহেব, বসুন।

আমি বসলাম। মইন কৌতুহলী হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হিমু সাহেব!

জি ।

আপনাকে স্যার কী দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি জানি। স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যদিও কোন ক্ষমতায় আপনি নিষ্পাপ লোক খুঁজে বের করবেন তা বুঝতে পারছি না।

আমি হাসলাম । আমার স্টকে অনেক ধরনের হাসি আছে। এর মধ্যে একটা ধরন হলো— মানুষকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে দেয়া হাসি। মইন খান পুরোপুরি বিভ্রান্ত হলেন । তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল । তিনি শুকনো গলায় বললেন, আপনি কী করেন জানতে পারি কি ?

হাঁটাহাটি করি। আর কিছু না। আমি নগর পরিব্রাজক ।

আপনি কি হেঁয়ালি ছাড়া সহজভাবে কথা বলতে পারেন না ?

সহজভাবেই বলছি।

ভদ্রলোক রেগে গেছেন। রাগ সামলে নিয়ে সহজভাবেই বললেন, এইখানে যে এসেছেন এতে আপনার সময় নষ্ট হয়েছে। আসা-যাওয়ার একটা খরচ আছে । খরচটা দিতে চাচ্ছি। কত দেব ?

আমি চুপ করে আছি। খরচ বলতে ছয় টাকা রিকশা ভাড়া দিয়েছি। ফিরব হেঁটে

হেঁটে ।

পাঁচশ’ টাকা দিলে কি আপনার চলবে ?

আমি হাসলাম । মইন খান একটা ভাউচার বের করে দিলেন । ষ্ট্যাম্প লাগানো ভাউচার । আমি সই করলাম । তিনি পাচ শ' টাকার একটা নোট বের করে দিলেন। ঝকঝকে নোট । মনে হচ্ছে এইমাত্র টাকশাল থেকে ছাপা হয়ে এসেছে।

এছাড়াও আপনার খরচ-পত্তর যা লাগে দেয়া হবে । কোন খাতে কত খরচ হলো — এটা জানিয়ে বিল করলেই খরচ দিয়ে দেয়া হবে। বুঝতে পারছেন ?

জি পারছি।

মইন সাহেবের টেবিলের উপর রাখা দুটি টেলিফোনের একটি বাজছে। তিনি তড়াক করে উঠে দাড়িয়ে টেলিফোন ধরলেন। বোঝাই যাচ্ছে এটা বিশেষ টেলিফোন। বিশেষ বিশেষ লোকজনের জন্যে। হয়তো ইয়াকুব সাহেব করেছেন। আমি শুধু শুনছি মইন খান জি জি করছেন। অল্প খানিকক্ষণ জি জি করেই তার ঘাম বেরিয়ে গেল বলে মনে হয় । তিনি টেলিফোন নামিয়ে সত্যি সত্যি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দয়া করে আপার সঙ্গে দেখা করে যাবেন ।

কার সঙ্গে ?

আপার সঙ্গে । স্যারের মেয়ে ।

উনার কি একটাই মেয়ে ?

হ্যাঁ এক মেয়ে । বাবার অবর্তমানে এই মেয়েই সব পাবে।

এইজন্যেই বুঝি তার ভয়ে আপনি এত অস্থির ?

ম্যানেজার সাহেব অপমান গায়ে মাখলেন না। সব অপমান গায়ে মাখলে ম্যানেজারি করা যায় না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন, উনার কাছে নিয়ে যাই ।

উনার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব না বলব সেই বিষয়ে কি আপনার কোনো ব্রিফিং আছে ?

না । যেভাবে ইচ্ছা কথা বলবেন । উনি থাকেন মিনেসোটায় । আর্কিটেকচারের ছাত্রী। বাবার অসুখের খবর শুনে এসেছেন।

বিয়ে করেছেন ?

বিয়ে করেছেন কি করেন নি সেটা জানার আপনার দরকার কী ?

দরকার আছে। বিবাহিত মেয়ের সাথে একভাবে কথা বলতে হয়, অবিবাহিত মেয়ের সাথে অন্যভাবে ।

না, বিয়ে করেন নি। চলুন।

সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ সব সময় বেশি। এই আপ্তবাক্য ইয়াকুব সাহেবের মেয়ের বেলায় খাটবে কি না বুঝতে পারছি না। মেয়েটি বাবার মতোই লম্বা। ধারালো চেহারা। সবেমাত্র গোসল করে এসেছে। বড় গোলাপি রঙের টাওয়েলে মাথা ঢাকা । কালো রঙের রোব পরেছে। বাঙালি মেয়েদের রোবে মানায় না। এই মেয়েটিকে মানিয়ে গেছে। অনেক দিন বিদেশে আছে বলেই হয়তো ।

বসুন।

আমি বসলাম । তিনতলার বারান্দায় বেতের চেয়ার— টেবিল সাজানো। মেয়েটি বসল না। দাড়িয়ে রইল। চুল ভেজা নিয়ে মেয়েরা বোধহয় বসতে পারে না।

রূপাকেও দেখেছি যতক্ষণ চুল ভেজা ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে ।
শুনেছি, বাবা আপনার উপর একটা কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন।
একটা দায়িত্ব পেয়েছি। কঠিন কি না এখনো জানি না।
বাবা যে খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছেন সেটা কি আপনার মনে হচ্ছে না ?
মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়ালে আমাদের মাথার ঠিক থাকে না। সেই সময় কোনো কিছুই হাস্যকর থাকে না ।
খুবই সত্যি কথা। মৃত্যু ভয়াবহ ব্যাপার। এর মুখোমুখি হলে মাথা এলোমেলো হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু অন্যদের কি উচিত সেই এলোমেলো মাথার সুযোগ গ্রহণ করা ?
আপনি আমার কথা বলছেন ?
জি, আপনার কথাই বলছি। সরি, আপনাকে সরাসরি কথাটা বললাম। আমি সরাসরি কথা বলি এবং আমি আশা করি আপনিও যা বলার সরাসরি বলবেন ।
আমি হাসলাম ।আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত করা হাসি ।তবে এই মেয়ে শক্ত মেয়ে। সে বিভ্রান্ত হলো না। শুধু তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।
বাবা আপনার খোঁজ কোথায় পেয়েছেন বলুন তো ?
আমি জানি না।
জানার ইচ্ছাও হয় নি ?
জি না। আমার কৌতূহল কম।
আপনাকে নিষ্পাপ লোক খুঁজতে বলা হলো, আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ?
আমি কাউকে না বলতে পারি না। আপনি যদি আমাকে কিছু করতে বলেন তাও হাসিমুখে করে দেব।
আপনাকে দিয়ে কোনো কিছু করানোর আগ্রহই আমার নেই। তবে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেয়ার আগ্রহ আছে। মন দিয়ে শুনুন।
জি, আমি মন দিয়েই শুনছি।
বড় রকমের বিপদে পড়লে মানুষ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে যায়। তখন শুরু হয় তন্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ, ঝাড়ফুক। অর্থহীন সব ব্যাপার।
আপনি এইসব বিশ্বাস করেন না ?
কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এইসব বিশ্বাস করে না। আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে মনে করি।
কিছু কিছু ব্যাপার কিন্তু আছে। আমি অনেককেই দেখেছি ভবিষ্যৎ বলতে পারে ।
ভবিষ্যৎ বলতে পারে এমন কাউকে আপনি দেখেন নি। আপনি হয়তো শুনেছেন। ভবিষ্যৎ এখনো ঘটে নি। যা ঘটে নি তা আপনি দেখবেন কী করে ?
করিম বলে একটা লোক আছে। সে হারানো মানুষ খুঁজে বেড়ায় ।চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর চোখ মেলে বলে দেয় হারানো মানুষটা কোথায় আছে ।আমার নিজের চোখে দেখা ।আপনি চাইলে আপনাকেও নিয়ে দেখাতে পারি।
প্লিজ, বাজে কথা বলবেন না।

আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলি ।

I see. আমিও সে রকম ধারণা করেছিলাম। কী ধরনের ভবিষ্যৎ আপনি বলেন ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, এক্ষুণি একটা ভবিষ্যতদ্বাণী করে যাই। আগামী এক-দুদিনের ভেতর ঢাকা শহরে একটা ভূমিকম্প হবে।

ভূমিকম্প ?

জি ভূমিকম্প । বড় কিছু না, ছোটখাটো। সামান্য ঝাকুনি।

মেয়েটির মুখে একটা ধারালো হাসি তৈরি হতে হতে হলো না। আমি মেয়েটির সংযমের প্রশংসা করলাম। অন্য যে কেউ আমাকে কঠিন কথা শুনিয়ে দিত ।

আজ উঠি, না আরো কিছু বলবেন ?

না, আর কিছু বলব না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, আসুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেই। গাড়ি আছে— গাড়ি আপনাকে পৌছে দেবে।

জি আচ্ছা। আপনার অনেক মেহেরবানি ।

এসি বসানো স্টেশন ওয়াগন। ভেলভেটের নরম সিট কভার । এয়ারফেশার আছে। গাড়ির ভেতরে মিষ্টি বকুল ফুলের গন্ধ । জানালায় কী সুন্দর পর্দা! গাড়ি যে চলছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আরামে ঘুম এসে যাচ্ছে। এক কাপ চা পাওয়া গেলে হতো। চা খেতে খেতে যাওয়া যেত। চা এবং চায়ের সঙ্গে সিগারেট। চা গাড়িতে নেই, তবে পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেট আছে। আমি সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিতেই গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত স্বরে বলল, গাড়ির মইধ্যে সিগ্রেট ধরাইবেন না। গাড়ি গান্ধা হইব।

আমি ড্রাইভারের কথা অগ্রাহ্য করলাম। পৃথিবীর সব কথা শুনতে নেই। কিছু কিছু কথা অগ্রাহ্য করতে হয় ।

সিগ্রেট ফেলেন।

এ তো দেখি রীতিমতো ধমক ৷ আশ্চর্য! গাড়ির ড্রাইভার আমাকে দেখেই বুঝে ফেলেছে আমি গাড়ি-চড়া মানুষ নই। রাস্তার মানুষ । আমাকে ধমকালে ক্ষতি নেই।

কী হইল, কথা কানে যায় না ? সিগ্রেট ফেলতে কইলাম না ?

আমি শান্তস্বরে বললাম, তুমি সাবধানে গাড়ি চালাও । বারবার পেছনে তাকিও না। অ্যাকসিডেন্ট হবে।

সিগ্রেট ফেলেন ।

আমি সিগারেট ফেলে দিলে তোমার আরো ক্ষতি হবে। তখন তুমি আফসোস করবে। বলবে, হায় হায়, কেন সিগারেট ফেলতে বললাম!

ফেলেন সিগ্রেট ।

আচ্ছা যাও, ফেলছি।

আমি সিগারেট ফেলে দিলাম। তবে ফেললাম আমার পাশের টকটকে লাল রঙের ভেলভেটের সিট কভারে। দেখতে দেখতে ভেলভেট পুড়তে শুরু করল। বিকট গন্ধ বেরুল ।

হতভম্ব ড্রাইভার গাড়ি থামাল। সে দরজা খুলে বেরুতে বেরুতে সিটের অর্ধেকটা পুড়ে ছাই। ড্রাইভার বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। আমি তার দিকে তাকাচ্ছি হাসিমুখে । ড্রাইভার ক্লান্ত গলায় বলল, এইটা কী করলেন ?

আমি সহজ গলায় বললাম, মন খারাপ করবে না। এই পৃথিবীর সবই নশ্বর। একমাত্র পরম প্রকৃতিই অবিনশ্বর। তিনি ছাড়া সবই ধ্বংস হবে। ভেলভেটের সিট কভার অতি তুচ্ছ বিষয়। গাড়িটা এক সাইডে পার্ক করো। এসো, চা খাও। চা খেলে তোমার হতভম্ব ভাবটা দূর হবে।

ড্রাইভার আমার সঙ্গে চা খেতে এলো। তাকে এখন আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বোধশক্তিহীন জম্বির' মতো দেখাচ্ছে।

ন-দশ বছরের একটা রোগা ছেলে ফ্লাস্কে চা নিয়ে বসে আছে । ছেলেটির পাশে তার ছোট দুই বোন। চা চাইতেই ছোট মেয়েটি হাসিমুখে দুটা কাপ ধুতে শুরু করল। বড় বোন সেই ধোয়া কাপ আবার নতুন করে ধুল। ভাই চা ঢালল। তিনজনের টি-স্টল ।

ড্রাইভার চুকচুক করে চা খাচ্ছে। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে । আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই । আমাদের প্রধান চেষ্টা অন্যকে বোঝা ।

চা কত হয়েছে রে ?

ছোট মেয়েটি হাসিমুখে বলল, দুই টেকা। আমি সদ্য পাওয়া চকচকে পাচ শ টাকার নোটটা তার হাতে দিলাম। সে আতঙ্কিত গলায় বলল, ভাংতি নাই।

আমি সহজস্বরে বললাম, ভাংতি দিতে হবে না, রেখে দাও । মেয়েটা যতটা না বিস্মিত হয়েছে ড্রাইভার তারচেয়েও বিস্মিত। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখে পলক পড়ছে না। আমি বললাম, ড্রাইভার, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমি হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরব । সিট কভার পোড়া নিয়ে কেউ যদি কিছু বলে— আমার কথা বলবে ।

ড্রাইভার কোনো কথা বলছে না। এখনো পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। পলকহীন চোখে মানুষের তাকানো উচিত নয়। পলকহীন চোখে তাকায় সাপ আর মাছ। তাদের চোখের পাতা নেই। মানুষ সাপ নয়, মাছও নয়। তাকে পলক ফেলতে হয় ।

আমি এগোচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, এমন যদি হতো— ড্রাইভার তার গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে দেখে ভেলভেটের সিট কভার আগের মতোই আছে। সেখানে কোনো পোড়া দাগ নেই, তাহলে ড্রাইভারের মনোজগতে কী প্রচণ্ড পরিবর্তনই না হতো! কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি কোনো মহাপুরুষ নই। আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আমি হিমু। অতি সাধারণ হিমু।

তবে অতি সাধারণ হিমু হলেও মাঝে মাঝে আমার কিছু কথা লেগে যায়। অন্যদেরও নিশ্চয়ই লাগে। অন্যরা লক্ষ করে না, আমি করি। ভূমিকম্পের কথা বলাটা অবশ্যি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মনে এসেছে, বলে ফেলেছি।

দুপুরের খাওয়া হয় নি। খিদে জানান দিচ্ছে। আমি নিয়ম মেনে চলি না। কিন্তু আমার শরীর নিয়মের শৃঙ্খলে বাধা। যথাসময়ে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা হয়। ক্ষুধাতৃষ্ণ জয় করার নিয়মকানুন জানা থাকলে হতো। বিজ্ঞান এই দুটি জিনিস জয় করার চেষ্টা কেন করছে না ? আমার চেনা একজন আছে যে তৃষ্ণা জয় করেছে। গত তিন বছরে সে এক ফোঁটা পানি খায় নি। তার নাম একলেমুর মিয়া। সে ফার্মগেটে তার মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষা করে । আমার সঙ্গে ভালো খাতির আছে। আজ দুপুরের খাওয়া তার সঙ্গে খাওয়া যায়। বড় খালার বাড়িতেও যেতে পারি। কিংবা রূপাদের

বাড়ি। তবে রূপার বাড়িতে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। সে কী একটা বই লিখছে। সকালে উঠে তাদের জয়দেবপুরের বাড়িতে চলে যায়। রাতে ফেরে। সেখানে টেলিফোন নেই। ঢাকার বাসায় খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে ।

চট করে কোনো এক দোকান থেকে টেলিফোন করা এখন আর আগের মতো সহজ নয়। টেলিফোন করতে টাকা লাগে। আগে যে-কোনো দোকানে ঢুকে করুণ মুখে বললেই হতো— ভাই, একটা টেলিফোন করব।

এখন টেলিফোনের কথা বলার আগে কাউন্টারে পাচটা টাকা রাখতে হয়।

বিনা টাকায় টেলিফোন করা যায় কি না সেই চেষ্টা করা যেতে পারে। নতুন কোনো টেকনিক বের করতে হবে । এমন টেকনিক যা আগে ব্যবহার করা হয় নি। ভিক্ষার জন্যে যেমন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনিক বের করতে হয়— ফ্রি টেলিফোনের জন্যেও হয়। আমি এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখলাম—

ভাই,

আমার বান্ধবীকে খুব জরুরি একটা টেলিফোন করা দরকার। সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই বলে লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছি না।

বিনীত

হিমু

কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে পড়লাম। সেলসম্যানকে কাগজটা পড়তে দিলাম। সে পড়ল, খানিকক্ষণ বিস্মিত চোখে আমাকে দেখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিল ।

হ্যালো, আমি হিমু।

চিনতে পারছি।

কেমন আছ রূপা ?

ভালো ।

আজ জয়দেবপুর যাও নি ?

না, কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হব।

আচ্ছা, তোমাদের জয়দেবপুরের বাড়িটা কেমন ?

খুব সুন্দর বাড়ি।

কী রকম সুন্দর বলো তো ?

কেন ?

আহা বলো না ।

বললে তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?

যেতে পারি।

সাত একর জমি নিয়ে গ্রামের ভেতর খামারবাড়ি কিংবা বলতে পারো খামার হাউস। বাড়ির পেছনে পুকুর আছে। পুকুর বড় না, ছোট্ট পুকুর। কিন্তু মার্বেল পাথরে বাধানো ঘাট। সেই ঘাটে নৌকা বাধা আছে। বাড়িটা চারদিক দিয়ে গাছপালায় ঘেরা।

বাড়ির ছাদ আছে ? ছাদে বসে জোছনা দেখা যায় ?

ছাদে বসে জোছনা দেখার ব্যবস্থা নেই। টালির ছাদ ।

বাংলো বাড়ি ?

হ্যাঁ, বাংলো বাড়ি। যাবে আমার সঙ্গে ?

ভাবছি।

তুমি কোথায় আছ বলো, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

আমি দ্রুত চিন্তা করছি। রূপার সঙ্গে নির্জন বাংলো বাড়িতে পুরো একটা দিন থাকার লোভ জয় করতে হবে। যে করেই হোক করতে হবে। শরীরের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু মনের উপর তো আছে...

হ্যালো— বলো তুমি কোথায় আছ ?

শোন রূপা । জরুরি কিছু খবর আমাকে এখন লোকজনদের দিয়ে বেড়াতে হবে । নয়তো যেতাম ।

কী জরুরি খবর ?

কাল-পরশুর মধ্যে ভূমিকম্প হবে— এই খবর। যদিও তা হবে ছোট সাইজের, তবুও তো ভূমিকম্প ।

তুমি আমার সঙ্গে কোথাও যাবে না সেটা বলো— ভূমিকম্পের অজুহাত তৈরি করলে কেন ?

অজুহাত না, সত্যি।

তুমি বলতে চাচ্ছ ভূমিকম্পের ব্যাপার তুমি আগে জেনে ফেলেছ ?

হু।

তোমার এই এই...

রূপা কথা পাচ্ছে না। রাগে তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে।

আমি বললাম, টেলিফোন রাখি রূপা ? এখন তোমাদের বাংলো বাড়িতে গিয়ে লাভ হবে না। দিন-তারিখ দেখে যেতে হবে— পূর্ণিমা দেখে। নেক্সট পূর্ণিমায় যাব। অবশ্যই যাব, রাখি কেমন ?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে বের হয়ে এলাম। পাশের একটা দোকানে ঢুকলাম। কাগজের টুকরোটা কতটুকু কাজ করে দেখা দরকার। মনে হচ্ছে ভালো ব্যবস্থা।

এই দোকানটার সেলসম্যান কিংবা মালিক আগের দোকানটার মতো চট করে রিসিভার এগিয়ে দিলেন। ভুরু কুঁচকে কাগজটা দেখতে দেখতে বললেন, আপনি কথা বলতে পারেন না ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

কথা বলতে পারেন তাহলে কাগজে লিখে এনেছেন কেন ? এই ঢং করার দরকার কী ?

আমি হাসলাম। মধুর ভঙ্গির হাসি। ভদ্রলোকের ভুরু আরো কুঁচকে গেল।

বুঝলেন হিমু, যা করবেন স্ট্রেইট করবেন। বাঁকা পথে করবেন না। ছিরাতুল মুস্তাকিম'– সরল পথ। কোথায় আছে বলেন দেখি ?

সূরা ফাতেহা ।

গুড । নিন টেলিফোন, যত ইচ্ছা বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করুন। আবার যখন দরকার হবে চলে আসবেন। স্লিপ ছিড়ে ফেলে দিন। আমার সামনেই ছিঁড়ুন।

আমি স্লিপ ছিঁড়লাম। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, গুড। নিন, কথা বলুন। যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি শুনব না। আমি একটু দূরে যাচ্ছি। ভদ্রলোক সরে গেলেন। রূপাকে দ্বিতীয়বার টেলিফোন করার কোনো অর্থ হয় না। আমার আর কোনো বান্ধবীও নেই। টেলিফোন করলাম বড়খালার বাসায় । খালু ধরলেন, মিহি গলায় বললেন, কে হিমু ?

খালু, আপনি অফিসে যান নি ?

আর অফিসে যাওয়া-যাওয়ি, যে যন্ত্রণা বাসায়!

কী হয়েছে ?

তোমার খালা যা শুরু করেছে এতে আমার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

খালা এখন করছেন কী ?

জিনিসপত্র ভাঙছে। আর কী করবে! আমাকে যে সব কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে তা শুনলে বস্তির মেয়েরাও কানে হাত দিবে।

অবস্থা মনে হয় সিরিয়াস।

আর অবস্থা! তুমি টেলিফোন করেছ কেন ?

জরুরি একটা খবর দেবার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। এখন আপনার কথাবার্তা শুনে ভুলে গেছি।

বাসায় আসো না কেন ?

চলে আসব। এখন কয়েকদিন একটু ব্যস্ত। ব্যস্ততা কমলেই চলে আসব।

তোমার আবার কিসের ব্যস্ততা ?

নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি খালুজান ।

কী খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

নিষ্পাপ মানুষ ।

টেলিফোনেই শুনলাম ঝনঝন শব্দে কী যেন ভাঙল । খালুজান খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আমার মনে হয় পালিয়ে গেলেন ।

দুপুরের খাবার খাচ্ছি ছাপড়া হোটেলে। রুটি ডাল গোশত । গরম গরম রুটি ভেজে দিচ্ছে। ডাল গোশত ভয়াবহ ধরনের ঝাল। জিহবা পুড়ে যাচ্ছে । কিন্তু খেতে হয়েছে চমৎকার। আমাকে খাওয়াচ্ছে একলেমুর মিয়া । সে আজ বড়ই চুপচাপ। অন্য সময় নিচু গলায় সারাক্ষণ কথা বলত। উচ্চশ্রেণীর কথাবার্তা। আজ কিছুই বলছে না। কারণ তার মেয়েটাকে সে দুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা কোনো বড় ব্যাপার না। মেয়েটা পাগলা টাইপের। প্রায়ই উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে ।

একলেমুর মিয়া আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি করল না। খাওয়ার শেষে মিষ্টি পান এনে দিল, সিগ্রেট এনে নিজেই ধরিয়ে দিল ।

একলেমুর মিয়া ।

জি ।

ভিক্ষা করতে কেমন লাগে বলো দেখি ?

ভালো লাগে। কত নতুন নতুন মাইনষের সাথে পরিচয় হয়। এক এক মানুষ এক এক কিসিমের। বড় ভালো লাগে।

একলেমুর মিয়া খিকখিক করে হাসছে। আমি বললাম, হাসছ কেন ?

একবার কী হইছে হুনেন ভাইসাব, গাড়ির মইধ্যে এক ভদ্রলোক বহা আছে । আমি হাতটা বাড়াইয়া বললাম, ভিক্ষা দেন আল্লাহর নামে । সাথে সাথে হেই লোক হাত বাড়াইয়া দিছে আমার গালে এক চড়।

কেন ?

এইটাই তো কথা। কী কইলাম আফনেরে— নানান কিসিমের মানুষ এই দুনিয়ায়। এরার সাথে পরিচয় হওয়া একটা ভাগ্যের কথা। ঠিক কইলাম না ?

ঠিক না বেঠিক বুঝতে পারছি না।

এই এক সারকথা বলছেন ভাইজান । ঠিক-বেঠিক বুঝা দায়। ক্ষণে মনে লয় এইটা ঠিক, ক্ষণে মনে লয় উহু এইটা ঠিক না।

চড় দেয়ার পর ঐ লোক কী করল ? গাড়ি করে চলে গেল ?

সাথে সাথে যায় নাই । লাল বাত্তি জ্বলতেছিল। যাইব ক্যামনে ? সবুজ বাত্তির জন্যে অপেক্ষা করতেছিল ।

তোমাকে কিছু বলে নি ?

জে না । অনেকক্ষণ তাকাইয়াছিল। কিছু বলে নাই।

তুমি কী করলে ?

আমি হাসছি ।

সিগারেট শেষ টান দিতে দিতে আমি বললাম, ঐ লোকের সঙ্গে তোমার তো আবার দেখা হয়েছিল, তাই না ?

বুঝলেন ক্যামনে ?

আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

ধরছেন ঠিক । উনার সঙ্গে দেখা হইছে। ঠিক আগের জায়গাতেই দেখা হইছে। আমি বললাম, স্যার আমারে চিনছেন ? ঐ যে চড় মারছিলেন।

লোকটা কী বলল ?

কিছু বলে নাই, তাকাইয়াছিল। তবে আমার চিনতে পারছে। বড়ই মজার এই দুনিয়া ভাইসাব! লোকে দুনিয়ার মজাটা বুঝে না। মজা বুঝলে— দুঃখ কম পাইত ।

উঠি একলেমুর মিয়া ।

আমি উঠলাম। একলেমুর ফার্মগেটের ওভারব্রিজে গামছা বিছিয়ে বসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন একটা ময়লা এক টাকার নোট ছুড়ে ফেলল গামছায় ।

একলেমুর নিচু গলায় বলল, আচল নোট। টেপ মারা, ছিড়া। কেউ নেয় না। ফকিররে দিয়া দেয়। এক কামে দুই কাম হয়— সোয়াব হয়, আবার অচল নোট বিদায় হয়। মানুষ খালি সোয়াব চায়, সোয়াব। অত সোয়াব দিয়া হইব কী ?

দুপুরে আমার ঘুমের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা আছে– পার্ক। কখনো সোহরাওয়াদী উদ্যান, কখনো চন্দ্রিমা উদ্যান, কখনো সস্তাদরের কোনো মিউনিসিপ্যালটি পার্ক। যখন যেটা হাতের কাছে পাই ।

ফার্মগেট থেকে চন্দ্রিমা উদ্যান এবং সোহরাওয়াদী উদ্যান দুটাই সমান দূরত্বে। তবে সোহরাওয়াদী উদ্যান আমার প্রিয়। সেখানকার বেঞ্চগুলো ঘুমানোর জন্যে ভালো। তাছাড়া সোহরাওয়াদী উদ্যানে ড্রামা অনেক বেশি। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে মজার মজার সব দৃশ্য দেখা যায়। ক'দিন ধরেই করছে। লোকটার হাবভাবেই বোঝা যায় মতলব ভালো না। সুযোগমতো লোকটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে ।

আরাম করে শুয়ে আছি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ফিল্টার হয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। আরাম লাগছে– স্কুলের ওই মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। আচার খাচ্ছে। সঙ্গে মিচকা শয়তানটা আছে। মিচকা শয়তানটা বসার জায়গা পাচ্ছে না। ভালো ভালো সব জায়গা দখল হয়ে আছে। মিচকাটা হতাশ গলায় বলল, পলিন, কোথায় বসি বলো তো ?

পলিন মেয়েটা মুখভর্তি আচার নিয়ে বলল, বসব না। হাঁটব।

লোকটা মেয়েটার বগলের কাছে মুখ দিয়ে কী যেন বলল। পলিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কেন শুধু অসভ্য কথা বলেন ?

লোকটা হে-হে করে হাসছে। লোকটার কথা শুধু যে অসভ্য তাই নয়— হাসিটাও অসভ্য। ঠাস করে এর গায়ে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে আবার নির্বিকার ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয় ?

সভ্য সমাজে আজগুবি কিছু করা যায় না। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন

কাল সারারাত ঘুম হয়নি।

ঘুম না হবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘুমোতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখভর্তি ঘুম । কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখে। আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছেন, এই হিমু, হিমু, ওঠ । তাড়াতাড়ি ওঠ । ভূমিকম্প হচ্ছে। ধরণী কাঁপছে।

আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম, আহ, কেন বিরক্ত করছ ?

বাবা ভরাট গলায় বললেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মজার ব্যাপার আর হয় না। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই সময় চোখকান খোলা রাখতে হয়। তুই বেকুবের মতো শুয়ে আছিস ।

ঘুমোতে দাও বাবা ।

তোর ঘুমোলে চলবে না। মহাপুরুষদের সবকিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধারণ মানুষ ঘুমায়— অসাধারণরা জেগে থাকে ...

দয়া করে বাকুনি বন্ধ করো, প্লিজ।

আমার ঘুম ভাঙল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। চৌকি কাঁপছে। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিওয়ালা এক ক্যালেন্ডার। সেই রবীন্দ্রনাথও কাঁপছেন। আমি বুঝতে পারছি না এটাও স্বপ্নের কোনো অংশ কি না। মানুষের স্বপ্ন অসম্ভব জটিল হতে পারে ।

না, এটা বোধহয় স্বপ্ন না। বোধহয় সত্যি। কটকট, কটকট শব্দ হচ্ছে। অনেকদিন পর ভূমিকম্প অনুভব করছি। আমি বালিশের নিচ থেকে সিগারেট বের করলাম ।

স্বপ্ন সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে সিগারেট ধরানো। স্বপ্ন শুধু যে বর্ণহীন তাই না— গন্ধহীনও । সিগারেট ধরাবার পর তার উৎকট গন্ধ যদি নাকে আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা স্বপ্ন নয় – সত্য। কেউ একজন আযান দিচ্ছে। এই সময় আযানের অর্থ হলো— বিপদ। মহাবিপদ। হে আল্লাহ, রক্ষা করো। বিপদ থেকে বাঁচাও ।

সিগারেট ধরাতে পরছি না। হাত কাঁপছে— শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষের ডিএনএ অণু সুদূর অতীত থেকে ভয়ের স্মৃতি নিয়ে এসেছে। সে ভূমিকম্পের মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ভয় পাওয়াবেই। ভয় পাইতে না চাইলেও ভয় পাওয়াবে।

আগুন দেখলে আমরা তেমন ভয় পাই না। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় ছুটে

পালিয়ে যাই না। একটু দূরে দাড়িয়ে থাকি। দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখি কিন্তু ভূমিকম্পের সামান্য কম্পনেই তীব্র ইচ্ছা করে ছুটে কোথাও চলে যেতে।

না, ভয় পেলে চলবে না। মনকে শান্ত করতে হবে। স্থির করতে হবে। সিগারেট ধরালাম । তামাকের উৎকট গন্ধ ।

এটা স্বপ্ন নয়। এটা সত্যি। ভূমিকম্প হচ্ছে। পরপর দুটা ঝাকুনি। ভয় কমছে। মন শান্ত হয়ে আসছে। চারপাশের পৃথিবীকে এখন আর অবাস্তব মনে হচ্ছে না।

চার

ছোট্ট একটা ভূমিকম্প হয়েছে।

রিখটার স্কেলে এর মাপ দু-তিনের বেশি হবে না। পরপর দুবার সামান্য ঝাঁকুনি । এতেই হইচই, ছোটাছুটি। আমার পাশের ঘরে তাসখেলা হচ্ছিল। গতকাল রাত এগারটায় শুরু হয়েছিল, এখান সকাল আটটা ৷ এখনো চলছে। ছুটির দিনে পয়সা দিয়ে খেলা হয়। ম্যারাথন চলে। তাসুড়েরা তাস ফেলে প্রথম হইচই করে বারান্দায় এলো, তারপর সবাই একসঙ্গে ছুটল সিঁড়ির দিকে । মনে হচ্ছে, এরা সিড়ি ভেঙে ফেলবে।

আমি সিগারেট টানছি। ছুটে নিচে যাবার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে অবহেলার ভঙ্গি করে বিছানায় শুয়ে থাকারও অর্থ হয় না। প্রকৃতি ভয় দেখাতে চাচ্ছে— আমার উচিত ভয় পাওয়া। বাঁচাও বাঁচাও বলে রাস্তায় ছুটে যাওয়া। ভয় পেয়ে দল বেঁধে ছোটাছুটিরও আনন্দ আছে। আমি দরজার বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় দবির খাঁ বসে নামাযের ওযু করছেন। সকাল নটা কোনো নামাযের সময় না। দবির খাঁ প্রায় সারারাত জেগে থেকে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েন বলে ফজরের নামায পড়তে বেলা হয়। দবির খা আমার দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বললেন, হেমু, ভূমিকম্প ।

আমার নাম হেমু নয়, হিমু। দবির খাঁ কখনো হিমু বলেন না। মনে হয় তিনি ই-কারান্ত শব্দ বলতে পারেন না।

হেমু সাহেব, ভূমিকম্প । নামেন নামেন, রাস্তায় যান।

আপনি বসে আছেন কেন ? আপনিও যান।

দবির খাঁ হতাশ চোখে তাকাল। তখন মনে পড়ল— এই লোকের পায়ে সমস্যা আছে। হাঁটতে পারে না। মাটিতে বসে ছেচড়ে ছেচড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। তার পক্ষে দোতলা থেকে একতলায় একা নামা সম্ভব নয় ।

নিচে নামতে চাইলে আমি ধরাধরি করে নামাতে পারি। নামবেন ? নাকি বসে বসে নামায পড়বেন ? আপনার ওযু কি শেষ হয়েছে ?

দবির খাঁ মনস্থির করতে পারছেন না। আমি বললাম, ধরুন শক্ত করে আমার হাত, নামিয়ে দিচ্ছি।

দবির খাঁ ক্ষীণ গলায় বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। আর বোধহয় হবে না ।

হবে। ভূমিকম্পের নিয়ম হলো— প্রথম একটা ছোট, ওয়ানিঙের মতো । সবাই

যাতে সাবধান হয়ে যায়। তারপরেটা বড়। যাকে বলে হেভি ঝাঁকুনি।

বলেন কী ?

নামবেন নিচে ?

জি নামব, অবশ্যই নামব।

দবির খাঁ গন্ধমাদন পর্বতের কাছাকাছি। আমার পক্ষে একা তাকে নামানো প্রায় অসম্ভব কাজের একটি । ডুবন্ত মানুষ যেভাবে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে তিনিও সেভাবে দুহাতে আমার গলা চেপে ধরেছেন। আমরা দুজন প্রায় ফুটবলের মতো গড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি।

কলঘরে মেসের ঝি ময়নার মা বাসন ধুতে বসেছে। ভূমিকম্পের বিষয়ে সে নির্বিকার। একমনে বাসন ধুয়ে যাচ্ছে। আমাদের নামার দৃশ্যে সে খানিকটা আলোড়িত হলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। দবির খাঁ চাপা গলায় বললেন– মাগির কারবার দেখেন। দেখছেন কাপড় চোপড়ের অবস্থা ? এইরকম কাপড় পরার দরকার কী ? নেংটা থাকলেই হয়।

ময়নার মার স্বাস্থ্য ভালো, সে দেখতেও ভালো। মায়া-মায়া চোখমুখ । কাজকর্মেও অত্যন্ত ভালো। শুধু একটাই দোষ তার— কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না, কিংবা সে নিজেই ঠিক রাখে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসছে। তার ব্লাউজের সব কটি বোতাম খোলা । এদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই।

দবির খাঁ চাপা গলায় বললেন, হেমু সাহেব! দেখলেন মাগির অবস্থা! ইচ্ছা করে বোর্ডারদের বুক দেখিয়ে বেড়ায় । শেষ জামানা চলে এসেছে। একেবারে শেষ জামানা। লজ্জা-শরম সব উঠে গেছে। আইয়েমে জাহেলিয়াতের সময় যেমন ছিল— এখনো তেমন ।

আমার রাস্তায় দাড়িয়ে ভূমির দ্বিতীয় কম্পনের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিছুই হলো না। দবির খাঁকে রাস্তার একপাশে বসিয়ে দিয়েছি। তিনি সিগারেট টানছেন। তাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা জটলা । কেউ বোধহয় মজার কোনো গল্প করছে। আমি দূরে আছি বলে গল্পের কথক কে বুঝতে পারছি না। আমি ইচ্ছা করেই দবির খাঁর কাছ থেকে দূরে সরে আছি। এই পর্বতকে আবার দোতলায় টেনে তোলা আমার কর্ম নয়। এই পবিত্র দায়িত্ব অন্য কেউ পালন করুক।

হিমু না ? এদিকে শুনে যান তো ?

আমাদের মেসের মালিক বিরক্তমুখে আমাকে ডাকলেন । এই লোকটা আমাকে দেখলেই বিরক্ত হন। যদিও মেসের ভাড়া আমি খুব নিয়মিত দেই, এবং কখনো কোনোরকম ঝামেলা করি না। আমি হাসিমুখে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, কী ব্যাপার, সিরাজ ভাই ? আমার হাসিতে তিনি আরো রেগে গেলেন বলে মনে হয়। চোখমুখ কুঁচকে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন কী করেন কে জানে— আমি কোনো সময় আপনাকে খুঁজে পাই না।

এই তো পেলেন ।

এর আগে আমি চারবার আপনার খোঁজ করেছি। যতবার খোজ নেই শুনি ঘর তালাবদ্ধ । থাকেন কোথায় ?

রাস্তায় রাস্তায় থাকি ।

রাস্তায় রাস্তায় থাকলে খামাখা মেসে ঘর ভাড়া করে আছেন কেন ? ঘর ছেড়ে

দেবেন। সামনের মাসের এক তারিখে ছেড়ে দেবেন।

এটা বলার জন্যেই খোজ করছিলেন ?

হু ।

রাখতে চাচ্ছেন না কেন ? আমি কি কোনো অপরাধ-টপরাধ করেছি ?

সিরাজ মিয়া রাগী গলায় বললেন, কাকে মেসে রাখব, কাকে রাখব না— এটা আমার ব্যাপার। আপনাকে আমার পছন্দ না ।

ও আচ্ছা। মাসের এক তারিখ ঘর ছেড়ে দেবেন। মনে থাকবে ?

কোনোরকম তেড়িবেড়ি করার চেষ্টা করবেন না। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কী করে বাকা করতে হয় আমি জানি।

সিরাজ মিয়া তর্জনী বাঁকা করে আমাকে বাঁকা আঙুল দেখিয়ে দিলেন। আমি সহজ গলাতেই বললাম— এটাই আপনার কথা, না আরো কথা আছে ?

এইটাই কথা ।

আমি বললাম, কঠিন কথাটা তো বলা হয়ে গেল। এখন সহজ হন। সহজ হয়ে একটু হাসুন দেখি ।

সিরাজ মিয়া হাসলেন না। তবে দবির মিয়াকে ঘিরে যে দলটা জটলা পাকাচ্ছিল সে দলটার ভেতর থেকে হো-হো হাসির শব্দ উঠল।

হাসির অনেক ক্ষমতার ভেতর একটা ক্ষমতা হলো— হাসি ভয় কাটিয়ে দেয়। এদের ভয় কেটে গেছে। এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসবাড়িতে ফিরে যাবে। তাসখেলা আবার শুরু হবে। দবির খাঁ ওযু করে তার ফজরের কাজা নামায শেষ করবেন।

ছুটির দিনের ভোরবেলায় একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হওয়াটা মন্দ না। চারদিকে উৎসব উৎসব ভাব এসে গেছে। বড় একটা বিপদ হওয়ার কথা ছিল, হয় নি। সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহমর্মিতার আনন্দ । বড় ধরনের বিপদের সামনেই একজন মানুষ অন্য একজনের কাছে আশ্রয় খোঁজে। পৃথিবীতে ভয়াবহ ধরনের বিপদ-আপদেরও প্রয়োজন আছে।

মেসে আজ ইমপ্রুভড ডায়েটের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ইমপ্রুভড ডায়েট হয়। আজ তৃতীয় সপ্তাহ চলছে, ইমপ্রভড ডায়েটের কথা না— ভূমিকম্পের কারণেই এই বিশেষ আয়োজন।

আমি ইমপ্রুভড ডায়েটের ঝামেলা এড়াবার জন্যে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছি। হাতে দশটা টাকাও নেই। ইমপ্রভড ডায়েটের ফেরে পড়লে কুড়ি-পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে হবে । কোত্থেকে দেব ?

এরচে' শুয়ে শুয়ে নিষ্পাপ মানুষের প্রাথমিক তালিকাটা করে ফেলা যাক। একলেমুর মিয়ার নাম লেখা যেতে পারে। ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পাপ তার আছে বলে মনে হয় না। ভিক্ষা নিশ্চয়ই পাপের পর্যায়ে পড়ে না। এই পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষই ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। তাছাড়া একলেমুর মিয়ার কিছু সুন্দর নিয়মকানুনও আছে। যেমন— সে ভিক্ষার টাকা জমা করে রাখে না। সন্ধ্যার পর যা পায় তার পুরোটাই খরচ করে ফেলে। অন্য ভিক্ষুকদের রাতের খাওয়া খাইয়ে দেয়।

খাতায় লিখলাম—

১ । একলেমুর মিয়া, পেশায় ভিক্ষুক ।

বয়স ৪৫ থেকে ৫৫
ঠিকানা : জোনাকী সিনেমাহলের গাড়ি বারান্দা।
শিক্ষা : ক্লাস থ্রি পর্যন্ত ।

২। মনোয়ার উদ্দিন ।
পেশায় ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার।
শিক্ষা : বিএ অনার্স |

এই পর্যন্ত লিখেই থমকে যেতে হলো । মনোয়ার উদ্দিন আমার পাশের ঘরে থাকেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু মনে হয় লোকটা ভালো । তাকে একদিন দেখেছি আমার কলঘরে একটা ছ'সাত বছরের বাচ্চার মাথায় পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। তিনি তুলে নিয়ে এসে গা ধোয়াচ্ছেন।

বুঝলেন হিমু সাহেব একটা আস্ত লাক্স সাবান হারামজাদার গায়ে ডলেছি তারপরেও গন্ধ যায় না ।

মনোয়ার উদ্দিন সাহেবের নামটা লিষ্টে রাখা যেতে পারে। ফাইন্যাল স্কুটিনিতে বাদ দিলেই হবে।

আরো দুটো নাম ঝটপট লিখে ফেললাম। প্রসেস অব এলিমিনেশনের মাধ্যমে বাদ দেয়া হবে। এর মধ্যে আছে মোহাম্মদ রজব খোন্দকার, সেকেন্ড অফিসার, লালবাগ থানা। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন— পুলিশ হয়ে জন্মেছি ঘুস খাব না তা তো হয় না। গোয়ালাকে যেমন দুধে পানি মেশাতেই হয় পুলিশকে তেমনি ঘুস খেতে হয়। আমিও খাব। শিগগির খাওয়া ধরব । তবে ঠিক করে রেখেছি প্রথম ঘুস খাবার আগে তরকারির চামচে এক চামচ মানুষের ‘গু’ খেয়ে নেব । তারপর শুরু করব জোরেশোরে । ‘গু’টা খেতে পারছি না বলে ঘুস খাওয়া ধরতে পারছি না। তবে ঘুস তো খেতেই হবে। একদিন দেখবেন আঙুল দিয়ে নাক চেপে চোখ বন্ধ করে এক চামচ মানুষের গু খেয়ে ফেলব। জিনিসটা খেতে হয়তো বা খারাপ হবে না। কুকুরকে দেখেন না— কত আগ্রহ করে খায়। কুকুরের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। এখন নাম হলো চারটা—

(১) একলেমুর মিয়া
(২) মনোয়ার উদ্দিন
(৩) মোহাম্মদ রজব খোন্দকার
(৪) রূপা

মনোয়ার উদিনের নাম রাখাটা বোধহয় ঠিক হবে না। বড়ই তরল স্বভাবের মানুষ। তরল স্বভাবের মানুষের পক্ষে পবিত্র থাকাটা কঠিন কাজ। তাকে প্রায়ই দেখা যায় ময়নার মার সামনে উবু হয়ে বসে গল্প করছেন। ময়নার মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলছে— একটু সইরা বসেন না— এক্কেবারে শইল্যের উপরে উইঠ্যা বসছেন। হি-হি-হি।

সেই হাসি প্রশ্রয়ের হাসি । আহবানের হাসি। তরল স্বভাবের মানুষ যত পবিত্রই হোক এই হাসির আহবান অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

আমি লাল কালি দিয়ে মনোয়ার উদিনের নাম কেটে দিলাম ।

দরজায় টোকা পড়ছে। আমি খাতা বন্ধ করে দরজা খুলে দিলাম ।

কুড়িটা টাকা ছাড়ুন তো হিমু সাহেব। স্পেশাল খানা হবে— রহমত বাবুর্চিকে নিয়ে এসে খাসির রেজালা আর পোলাও ।

আমি শুকনো মুখে বললাম, আমার কাছে একটা পয়সা নেই।
সামান্য কুড়ি টাকাও নেই ? কী বলছেন আপনি দেখি আপনার মানিব্যাগ ?
মনোয়ার সাহেব নাছোড় প্রকৃতির মানুষ। মানিব্যাগ দিয়ে দিলাম। শূন্য মানিব্যাগ তিনি খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন।
এত সুন্দর একটা মানিব্যাগ খালি করে ঘুরে বেড়ান কী করে ?
ঘুরে বেড়াই আর কোথায়, সারাদিনই তো বিছানায় শোয়া।
আচ্ছা থাক, টাকা দিতে হবে না। আপনি আমার গেষ্ট । আপনার খরচ আমি দেব। নো বিগ ডিল । তবে আপনাকে কাজ করতে হবে বসিয়ে রেখে খাওয়াব না।
কী কাজ ?
আমার সঙ্গে বাজার-সদাই করবেন। খাসির গোশত দেখেশুনে কিনতে হবে । চট করে প্যান্ট পরে নিন।
আমি প্যান্ট পরলাম। মনোয়ার সাহেব এলেন পিছু পিছু।
খাসির গোশত কেনা কোনো ইজি ব্যাপার না, বুঝলেন ভাই । ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট জব । খাসির ওজন হতে হয় সাত সের। এরচে' কম ওজনের হলে মাংস গলে যায়। বেশি হলে চর্বি হয়ে যায়। বুঝলেন ?
জি বুঝলাম ।
খাসির গোশত রান্না করাও খুব ডিফিকাল্ট । একটু এদিক-ওদিক হলে all gone. গোশত নষ্ট হয় কিসে বলুন তো ?
বলতে পারছি না। আলু। আলু দিয়েছেন কি কর্ম কাবার। আলু গলে যায়, সরুয়া থিক হয়ে যায়...
ভদ্রলোকের হাত থেকে যে করেই হোক উদ্ধার পেতে হবে। কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না ।
মনোয়ার ভাই ।
বলুন।
একটু বসুন তো আমার ঘরে । এক দৌড় দিয়ে নিচ থেকে আসছি— একটা পান খেয়ে আসি বমি-বমি লাগছে।
যাওয়ার পথে পান কিনে নিলেই হবে ।
না না— এক্ষুণি পান লাগবে।
আমি ছুটে বের হয়ে এলাম। আর ফিরে না গেলেই হবে। মনোয়ার সাহেব অনেকক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবেন । নিজের ঘর থেকে তালা এনে আমার ঘর বন্ধ করবেন। নিচে খানিকটা খোঁজখবরও করবেন— তারপর সব পরিষ্কার হবে । তিনি সাত সের ওজনের খাসি কিনতে বের হবেন ।
মোড়ের পানের দোকান থেকে একটা পান কিনলাম। পান খাওয়ার কথা বলে বের হয়েছি, না খাওয়াটা ঠিক হবে না। মিথ্যার সঙ্গে খানিকটা সত্য মিশে থাকুক। যদিও ভোরবেলা আমি কখনো পান খেতে পারি না। ঘাস খেয়ে একটা দিন শুরু করার মানে হয় না। ঘাস যদি খেতেই হয় দিনের শেষভাগে খাওয়া ভালো।
কোথায় যাব ঠিক করতে পারছি না। ইয়াকুব সাহেবকে কি বলে আসব— চিন্তা করবেন না— কাজ এগোচ্ছে। নাম লিষ্ট করা শুরু হয়েছে। গোটা বিশেক নাম পাওয়া গেছে। সেখান থেকে নাম কাটতে কাটতে একটা নামে আসব। সময় লাগবে। ধৈর্য ধরতে হবে। মানুষের ধৈর্য নেই। মানুষের বড়ই তাড়াহুড়া । পবিত্র গ্রন্থ

কোরান শরিফেও বলা হয়েছে— 'হে মানব সন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া ?

বেশ কয়েকটা খালি রিকশা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালারা আশা-আশা চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে । খালি রিকশা দেখলেই চড়তে ইচ্ছা করে । ভুল বললাম, খালি রিকশা চুপচাপ দাড়িয়ে থাকতে দেখলে চড়তে ইচ্ছা করে না। চলন্ত খালি রিকশা দেখলে চড়তে ইচ্ছা করে। আমি এ রকম চলন্ত একটা রিকশায় প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালা হাসিমুখে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। কোথায় যেতে চাই কিছু জানতে চাইল না। মনে হচ্ছে এ বিপজ্জনক ধরনের রিকশাওয়ালা— যেখানে সে রওনা হয়েছে সেখানেই যাবে। মাঝপথে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়লেও কিছু বলবে না, ভাড়া দেন, ভাড়া দেন, বলে চেচাবে না। ঢাকা শহরে রিকশাওয়ালাদের সাইকোলজি নিয়ে কেউ এখনো গবেষণা করেন নি। গবেষণা করলে মজার মজার জিনিস বের হয়ে আসত ।

মতিঝিলের কাছে আমি লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামলাম । রিকশাওয়ালা আবার হাসিমুখে তাকাল। সে রিকশার গতি কমাল না। যে গতিতে চালাচ্ছিল সেই গতিতেই চালাতে লাগল। আর তখনি বুঝতে পারলাম, এই রিকশাওয়ালা আমার পূর্বপরিচিত। এর নাম হাসান। হাসানের কী যেন একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। গল্পটা মনে পড়ছে না। আচ্ছা, হাসানের নামটা কি লিষ্টিতে তুলব ? আপাতত থাক, পরে কেটে দিলেই হবে। প্রসেস অব এলিমিনেশন । হারাধনের দশটি ছেলে দিয়ে শুরু হবে— শেষ হবে এক ছেলেতে ।

বড় খালুর অফিস মতিঝিলে।

অনেকদিন পর তার অফিস ঘরে উকি দিলাম। ভুরভুর করে এলকোহলের গন্ধ আসছে। খালু সাহেব মনে হয় এলকোহলের মাত্রা বাড়িয়েই দিচ্ছেন। আগে অফিসে এলে এই গন্ধ পাওয়া যেত না। এখন যায়।

আসব খালু সাহেব ?

আয় ।

বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্রচুর পান করেছেন। এমনিতে তিনি আমাকে তুমি করে বলেন। মাতাল হলেই– তুই । মাতালরা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে ।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, গরমের মধ্যে সুট পরে আছেন কেন ?

খালু সাহেব ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছেন না।

বসতে পারি খালু সাহেব ? নাকি জরুরি কিছু করছেন ?

বোস ।

আমি বসলাম । খালু সাহেবকে বুড়োটে দেখাচ্ছে। চকচকে টাইও তার বুড়োটে ভাব ঢাকতে পারছে না। আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললাম, ভূমিকম্প টের পেয়েছিলেন ? বড় খালু ভূমিকম্পের ধার দিয়ে গেলেন না। নিচু গলায় বললেন, চা খাবি ?

হু।

তিনি যন্ত্রের মতো বেল টিপে চায়ের কথা বললেন। আমি হাসিমুখে বললাম, এলকোহলের গন্ধ পাচ্ছি।

বড়খালু রোবটের মতো গলায় বললেন, টেবিলে বার্নিশ লাগানো হয়েছে। বানিশের গন্ধ পাচ্ছিস ।

ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আজকাল অফিসেও চালাচ্ছেন ।

ঠিকই ভেবেছিস । ভালোমতোই চালাচ্ছি। কেউ এলে বলি– টেবিলে বার্নিশ দিয়েছি। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকজন লজ্জা পেয়ে যায়। তুই যেমন পেয়েছিস ।

কিন্তু আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই তো সবাই বুঝে যায় যে বার্নিশ টেবিলে না, আপনি বার্নিশ লাগিয়েছেন আপনার স্টমাকে ।

কেউ কিছু বোঝে না। মানুষের ইন্টেলিজেন্সকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায়। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের এইটাই হলো বড় ক্রটি। বুঝতে পারছিস ?

হু।

নে চা খা । চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যা। টাকা-পয়সা লাগবে ?

না।

নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

হু ।

পাওয়া গেছে ?

গোটা বিশেক নাম পাওয়া গেছে। এদের মাঝখান থেকে বের করতে হবে।

গোটা বিশেক নাম পেয়েছিস ? বলিস কী । সারা পৃথিবীতে তো ২০টা নিষ্পাপ লোক নেই। ষ্ট্রেঞ্জ! নামগুলো পড় তো শুনি ।

পড়া যাবে না। গোপন ।

এই কুড়িটা নাম পেলি কোথায় ?

পরিচিতদের মাঝখান থেকে যোগাড় করেছি।

ছেলে কটা, মেয়ে কটা ?

ফিফটি ফিফটি । দশটা ছেলে, দশটা মেয়ে ।

বড় খালুকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। মাতাল মানুষ সহজেই উত্তেজিত হয়।

বাই এনি চান্স— তোর খালার নাম নেই তো ?

আমি হাসলাম । সেই হাসার যে-কোনো অর্থ হতে পারে। বড় খালু সেই হাসি না-সূচক ধরে নিলেন।

গুড । অতি পাপিষ্ঠা মহিলা । সাতটা দোজখের মধ্যে সবচে' খারাপটায় তার স্থান হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

তাই নাকি ?

অবশ্যই তাই । সাতটা দোজখের নাম জানিস ?

না।

সাতটা দোজখ হলো—

(১) জাহান্নাম

(২) হাবিয়া

(৩) সাকার

(৪) হুতামাহ

(৫) সায়ির

(৬) জাহিম

(৭) লাজা ।

দোজখের নাম মুখস্থ করে রেখেছেন, ব্যাপার কী ?

যেতে হবে তো ওইখানেই । কাজেই মুখস্থ করেছি।

আপনি নিশ্চিত যে দোজখে যাবেন ?

অবশ্যই নিশ্চিত। তবে আমার স্থান সম্ভবত সাত নম্বর দোজখে হবে। সাত নম্বর দোজখ হলো 'লাজা'। এখানে শাস্তি কম । আমার শাস্তি কমই হবে। বড় ধরনের পাপ বলতে গেলে কিছুই করি নি। যেমন ধর, মানুষ খুন করি নি।

মানুষ খুন করেন নি ?

না।

মানুষ খুন করার ইচ্ছা হয়েছে কি না বলুন।

তা হয়েছে। অনেকবারই ইচ্ছা হয়েছে।

খুন করা এবং খুন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা তো প্রায় কাছাকাছি।

তা ঠিক । এই জন্যেই তো আমার স্থান হবে লাজায় কিংবা জাহিমে ।

আমি পকেট থেকে খাতাটা বের করতে করতে বললাম, মজার ব্যাপার কী জানেন বড় খালু– আপনার নাম কিন্তু নিষ্পাপ মানুষদের তালিকায় আছে। বলিস কী ?

বড়খালু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে তার মদের নেশা কেটে যাচ্ছে ।

দেখতে চান ?

তুই ঠাট্টা করছিস নাকি ?

না, ঠাট্টা করব কেন ?

আমি খাতা খুলে বড় খালুর নাম দেখিয়ে দিলাম। তিনি থ হয়ে বসে আছেন । টেবিলের উপর রাখা পানির গ্রাসের পানি এক চুমুকে শেষ করে দিলেন ।

বড় খালু যাই ?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। খকখক করে কাশতে লাগলেন। ভয়াবহ কাশি। মনে হচ্ছে কাশির সঙ্গে ফুসফুসের অংশবিশেষ উঠে আসবে। আমি তার কাশি থামার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা লোক প্রাণপণে কাশছে, এই অবস্থায় তাকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না ।

হিমু!

জি । তুই সত্যি তাহলে আমার নাম তোর লিষ্টে তুলেছিস ?

হু।

নামটা খচ করে কেটে ফেল । তুই একটা কাজ কর। পাপীদের একটা লিস্ট কর । সেই লিস্টের প্রথম দিকে আমার নাম লিখে রাখ– In block letters.

আপনি চাইলে করব ।

করব না— Do it, এক্ষুণি কর, এই নে কাগজ।

পরে এক সময় লিখে নেব ।

নো, এক্ষুণি করতে হবে । রাইট নাউ।

বড় খালু হুঙ্কার দিলেন, হুঙ্কারের শব্দে সচকিত হয়ে তার খাস বেয়ারা পর্দার আড়াল থেকে মাথা বের করল। বড় খালু বললেন— ভাগে । মারেগা থাপ্পড়... ।

বাঙালি মাতাল যখন হিন্দি বলতে থাকে তখন বুঝতে হবে অবস্থা শোচনীয়। এদের ঘাটাতে নেই। আমি দ্রুত পাপীদের একটা তালিকা তৈরি করলাম। এক দুই তিন করে দশটা নম্বর বসিয়ে চার নম্বরে বড় খালুর নাম লিখে কাগজটা তার দিকে

বাড়িয়ে ধরলাম।

চার নম্বরে কী মনে করে লিখলি ? কেটে এক নম্বরে দে । আমার কথা তুই কি আমার চেয়ে বেশি জানিস... গাধা কোথাকার! গিদ্ধর কি বাচ্চা, son of গিদ্ধর ।

আমি দেরি করলাম না— তৎক্ষণাৎ তার নাম কেটে এক নম্বরে নিয়ে গেলাম ।

এখন আরেকটা নাম লেখ— মুনশি বদরুদ্দিন ।

ক নম্বরে লিখব ?

এই লিস্টে না— পুণ্যবানদের লিস্টে ।

মুনশি বদরুদ্দিন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ?

হ্যাঁ, এই লোক হলো পূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন ক্লার্ক। এক পয়সা ঘুস খায় না। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ক্লার্ক কিন্তু ঘুস খায় না— চিন্তা করেছিস কত বড় ব্যাপার ?

পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ক্লার্কদের কি ঘুস খেতেই হয় ?

অবশ্যই খেতে হয়। দৈনিক খাদ্য গ্রহণের মতো খেতে হয় । তুই ওই লোকের কাছে যাবি। তার পা ছুঁয়ে সালাম করবি । পুণ্যবানদের স্পর্শ করলে মন পবিত্র হয় ।

মুনশি বদরুদ্দিন ?

মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদার। সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট । বেঁটেখাটো লোক। খুব পান খায় |

আমি তাহলে উঠি বড় খালু ?

আরেকটু বোস। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে।

মুনশি বদরুদ্দিন সাহেবের কাছে একটু যাব বলে ভেবেছি...।

যাব বললেই তো যেতে পারবি না। সেক্রেটারিয়েটে ঢুকবি কী করে ? পাসের ব্যবস্থা করতে হবে। টেলিফোনে তোর পাসের ব্যবস্থা করে দি— চা খাবি আরেক কাপ ?

না।

মাতালরা অন্যে কী বলছে তা শোনে না। তার কাছে শুধু নিজের কথাই সত্য। বড় খালু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ঐ, চা দিতে বললাম না। তিনি টেবিলের কাবার্ড খুলে– সাদা রঙের চ্যাপ্টা বোতল খুলে এক টোক তরল পদার্থ মুখে ঢেলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেললেন না। কুলকোচার মতো শব্দ করতে লাগলেন। ভালো জিনিস চট করে গিলে ফেলতে তার মনে হয় মায়া লাগছে । মুখে যতক্ষণ রাখা যায় ততক্ষণই আরাম ।

হিমু!

জি বড় খালু।

তুই কেমন আছিস ?

খুব ভালো আছি। আপনার অবস্থা তো মনে হয় কাহিল।

আমিও ভালো আছি। সুখে আছি, আনন্দে আছি। তবে চারপাশের এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় আপনাআপনি আনন্দে থাকা যায় না । তরল পদার্থের কিছু সাহায্য লাগে। বুঝতে পারছিস রে গাধা ? গিদ্ধর কি ছানা, বুঝলি কিছু ?

বোঝার চেষ্টা করছি ।

পারবি। তুই বুঝতে পারবি। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তুই যে পুণ্যবান আর পাপীদের লিষ্ট করছিস– খুব ভালো করছিস। পত্রিকায় এই লিষ্ট ছাপিয়ে দিতে হবে। একদিন ছাপা হবে পুণ্যবানদের তালিকা, আরেকদিন ছাপা হবে পাপীদের তালিকা ।

উঠি বড় খালু ?

এসেই উঠি উঠি করছিস কেন ? সেক্রেটারিয়েটে ঢোকার পাসের ব্যবস্থা করে দি !

বড় খালু টেলিফোন টেনে নিলেন... তার কপাল খুব ঘামছে। মুখ হা হয়ে আছে। টেলিফোনের ডায়ালও ঠিকমতো ঘোরাতে পারছেন না। তিনি ডায়াল ঘোরাচ্ছেন আর মুখে বলছেন— হ্যালো। হ্যালো ।

মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদারকে পাওয়া গেল না। তিনি দুদিন ধরে আসছেন না। আমি তার বাসার ঠিকানা চাইলাম। অফিসের একজন মধুর গলায় বললেন, ঠিকানা দিয়ে কী করবেন ?

একটু কাজ ছিল ।

কী কাজ বলুন। দেখি আমরা করতে পারি কি না।

উনার সঙ্গেই আমার কাজ ছিল ।

উনার সঙ্গে কাজ থাকলে তো উনার কাছে যাবেন । বসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

আমি বসলাম । ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, সিগারেটের বদঅভ্যাস আছে ?

খাই মাঝেমধ্যে ।

মাঝেমধ্যে খাওয়াই ভালো। বিরাট খরচের ব্যাপার। স্বাস্থ্য নষ্ট । পরিবেশ নষ্ট । নেন সিগ্রেট নেন ।

তিনি শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন । বেনসন এন্ড হেজেস । সত্তর টাকা করে প্যাকেট । এই কেরানি ভদ্রলোক বেতন কত পান ? হাজার তিনেক ? তিনি খান বেনসন। ভদ্রলোজ নিজেই লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। সেই লাইটারও কায়দার লাইটার। যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ বাজনা বাজে। ভদ্রলোক বললেন, কাজটা কি মিউটেশন ? বড়ই জটিল কাজ । এই দপ্তরের সব কাজই জটিল। জমিজমা বিষয়-সম্পত্তির কাজ। মানুষের কোনো মূল্য নাই— জমির মূল্য আছে— বুঝলেন কিছু ?

আমি বুঝদারের মতো মাথা নাড়লাম।

এক একটা নামজারির কাজ দেড় বছর-দুবছর ঝুলে থাকে।

নামজারি ব্যাপারটা কী ?

নামজারি বুঝলেন না ? মনে করুন, আপনি কিছু জমি কিনলেন। যার কাছ থেকে কিনলেন সরকারি রেকর্ডে আছে তার নাম । এখন তার নাম খারিজ করে আপনার নাম লিখতে হবে। এটাই নামজারি ।

একজনের নাম কেটে আরেকজনের নাম লিখতে দেড় বছর লাগে ?

দেড় বছর তো কম বললাম। মাঝে মাঝে দুই-তিন বছরও লাগে । নাম খারিজ করা তো সহজ ব্যাপার না ।

এটাকে সহজ করা যায় না ?

কীভাবে সহজ করবেন ?

সবার নাম খারিজ করে দিন । এক্কেবারে লাল কালি দিয়ে খারিজ করে জমির মূল মালিকের নাম লিখে দিন।

ভদ্রলোক হতভম্ব গলায় বললেন, জমির মূল মালিক কে ?

যিনি জমি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মূল মালিক।

সবার নাম কেটে আল্লাহর নাম লিখতে বলছেন ?
জি ।
আপনার কি ব্রেইন ডিফেক্ট ?
কিছুটা ডিফেক্ট। দেখুন ভাই সাহেব, পৃথিবীর জমি আমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছি, নামজারি করছি। জোছনা কিন্তু ভাগাভাগি করে নেই নি। এমন কোনো সরকারি অফিস নেই যেখানে জোছনার নামজারি করা হয়, একজনের জোছনা আরেকজন কিনে নেয়।
ভদ্রলোক আমার কথায় তেমন অভিভূত হলেন না। পাগলদের মজার মজার কথায় কেউ অভিভূত হয় না, বিরক্ত হয়। তিনি একটা ফাইল খুলতে খুলতে বললেন, আপনি এখন যান। কাজ করতে দিন। অফিস কাজের জায়গা । আড্ডা দেয়ার জায়গা না ।
একটা সিগারেট দিন । সিগারেট খেয়ে তারপর যাই ।
তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন এমন অদ্ভুত কথা তিনি এই জীবনে শোনেন নি। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সিগারেট না খেয়ে আমি উঠব না। সিগারেট খাব । চা খাব। আর ভাই শুনুন, আমার হাতে কোনো পয়সাকড়ি নেই, আমি যে মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদারের বাসায় যাব তার জন্যে আপ এন্ড ডাউন রিকশা ভাড়াও দেবেন।
ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। আমি গুনগুন করছি— বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল তবে আমার পানে কেন পড়িল না...
কই ভাই, দিন। সিগারেট দিন ।
ভদ্রলোক সিগারেট প্যাকেট বের করলেন।
মুনশি সাহেবের বাসায় ঠিকানা সুন্দর করে একটা কাগজে লিখে দিন ।
উনার ঠিকানা জানি না।
না জানলে যোগাড় করুন। আপনি না জানলেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে। সেই সঙ্গে আপনার নিজের ঠিকানাটাও এক সাইডে লিখে দেবেন। সময় পেলে এক ফাঁকে চলে যাব। ভাই, আপনার নাম তো এখনো জানলাম না।
চুপ থাকেন।
ধমক দেবেন না ভাই। পাগল মানুষ। ধমক দিলে মাথা আউলা হয়ে যায়। কয়েকটা শিঙ্গাড়া আনতে বলুন তো। খিদে লেগেছে— ।
কেউ কিছু বলছে না। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, ভূমিকম্পের সময় আপনারা কে কোথায় ছিলেন ?
কথা বলবেন না চা খান ।
শিঙ্গাড়া আনতে বলুন। ঘুসের পয়সার শিঙ্গাড়া খেয়ে দেখি কেমন লাগে ? আমি চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছি। অফিসের সবাই মোটামুটি হতভম্ব দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে ।
মুনশি বদরুদ্দিনের যে ঠিকানা তারা লিখে দিল সেই ঠিকানায় এই নামে কেউ থাকে না । কোনোদিন ছিলও না। ওরা ইচ্ছা করে একটা বদমায়েশি করেছে। তবে ওরা এখনো বোঝে নি— আমিও কচ্ছপ প্রকৃতির। কচ্ছপের মতো যা একবার কামড়ে ধরি তা আর ছড়ি না। পূর্ত মন্ত্রণালয়ে আমি একবার না, প্রয়োজনে লক্ষবার যাব। দরকার হলে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় মশারি খাটিয়ে রাতে ঘুমোব।

সারাদুপুর রোদে রোদে ঘুরলাম। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোতে গেলাম সোহরাওয়াদী উদ্যানে। ভরদুপুরে ঘুমানোর জন্যে বাংলাদেশ সরকার ভালো ব্যবস্থা করেছেন। ধন্যবাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পার্কগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে জানা নেই | জানা থাকলে ওদের একটা থ্যাংকস দেয়া যেত। গাছের নিচে বেঞ্চ পাতা। পাখি ডাকছে। এখানে-ওখানে প্রেমিকপ্রেমিকারা গল্প করছে। এরা এখন কিছুটা বেপরোয়া । ভরদুপুর হলো বেপরোয়া সময়। কেউ তাদের দেখছে কি দেখছে না তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। স্কুল ড্রেসপরা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরও দেখা যায়। এরা স্কুল ফাঁকি দিয়ে আসে । একটা আইন কি থাকা উচিত না— আঠার বছর বয়স না হলে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে পার্কে আসতে পারবে না। আইন যারা করেন তাদের ডেকে এনে এক দুপুরে পার্কটা দেখাতে পারলে হতো।

সেই লোক মেয়েটির গায়ের নানান জায়গায় হাত দিচ্ছে । মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে। চাপা গলায় বলছে,– এ রকম করেন কেন ? সুড়সুড়ি লাগে তো ।

লোকটা ঠোট সরু করে বলল, আদর করি। আদর করি ।

বলতে বলতে মেয়েটাকে সে টেনে কোলে বসিয়ে ফেলল। আমি কঠিন গলায় লোকটাকে বললাম, তুই কে রে ?

কোনো ভদ্রলোককে তুই বললে তার আক্কেল গুডুম হয়ে যায়। কী বলবে ভাবতে ভাবতে মিনিটখানেক লেগে যায় । আমি তাকে কিছু ভাবার সুযোগ দিলাম না। হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এই মেয়ে কে ? তুই একে চটকাচ্ছিস ক্যান রে শুয়োরের বাচ্চা ? তুই চল আমার সঙ্গে থানায়। আমি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক ! তোদের মতো বদমায়েশ ধরার জন্যে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি । মেয়েটাকে কোল থেকে নামা। নামিয়ে উঠে দাড়া। কানে ধর উঠ-বোস কর ।

মেয়েটাকে কোল থেকে নামাতে হলো না । সে নিজেই নেমে পড়ল এবং কাদার উপক্রম করল । লোকটি কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আমার কিছু বুঝবার আগেই ছুটে পালিয়ে গেল ।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই লোক কে খুঁকি ?

আমার মামা |

আপন মামা ?

উহু ।

দূরের মামা ?

হু।

পলিন, ঐ লোকটার নাম কী ?

পলিন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বলল, আপনি আমার নাম জানেন ?

আমি তোমার নাড়ি-নক্ষত্র জানি। ওই লোকটা যে বদ তা কি বুঝতে পারছ ?

পলিন ঘাড় বাকিয়ে রাখল। সে লোকটাকে বদ বলতে রাজি নয়।

বুঝলে পলিন, লোকটা মহা বদ । বদ না হলে তোমাকে ফেলে পালিয়ে যেত না। বদরাই বিপদের সময় বন্ধুকে ফেলে পালিয়ে যায়।

উনি বদ না ।

কোন ক্লাসে পড় ?

ক্লাস এইট।

এরকম কারোর সঙ্গে যদি আর কোনোদিন দেখি তাহলে কী করব জান ?

না।

না জানাই ভালো । যাও, এখন স্কুলে যাও— এখন থেকে তোমার উপর আমি লক্ষ রাখব। একদিন তোমাদের বাসায় চা খেতে যাব ।

আপনি কি চেনেন আমার-বাসা ? চিনি না কিন্তু তারপরেও যাব। আপনি কি আমার মাকে সব বলে দেবেন ? তুমি নিষেধ করলে বলব না। আপনি কি আমার মাকে চেনেন ?

না ।

পলিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার মুখ থেকে কালো ছায়া সরে যাচ্ছে। সে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমার মামাকে আপনি খারাপ ভাবছেন। উনি কিন্তু খারাপ না ।

তাই নাকি ?

উনি খুব অসাধারণ।

বলো কী ? আমার তো অসাধারণ মানুষই দরকার। ঠিক অসাধারণ নয়— পবিত্র মানুষ। আমি পবিত্র মানুষদের একটা লিষ্ট করছি। তুমি কি মনে করো ঐ লিষ্টে তার নাম রাখা যায় ?

অবশ্যই যায় ।

তার কী নাম ?

রেজা মামা। রেজাউল করিম।

আমি পকেট থেকে লিষ্ট বের করে লিখলাম— রেজাউল করিম। এখন এই পলিন মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন তাকে দেখেছি। তার ভুরু কুঁচকানোর ভঙ্গি খুব পরিচিত। পলিন চলে যাবার পর বুঝলাম, এই মেয়ে আলেয়া খালার নাতনি। মেয়েটার মার নাম খুকি।

পলিন যেখানে বসেছিল সেখানে সে তার পেন্সিল বক্স ফেলে গেছে। বক্সটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে একদিন যেতে হবে ওদের বাসায়। পবিত্র মানুষ জনাব রেজাউল করিম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

পাঁচ

ইয়াকুব আলি সাহেবের ম্যানেজার মইন খান আজ স্যুট পরেছেন। আজ তাকে আরো সুন্দর লাগছে। বয়স কম লাগছে। গলায় লাল রঙের টাই। লাল টাইয়ে ভদ্রলোককে খুব মানিয়েছে। যারা কোন দিন টাই পড়ে না তারাও এই ভদ্রলোককে দেখলে টাইয়ের দরদাম করবে।

স্নামালিকুম মইন সাহেব ।

ওয়ালাইকুম সালাম ।

আপনি কোত্থেকে ? সেই যে গেলেন আর কোনো খোঁজখবর নেই– স্যার খোঁজ করেন, আমি কিছু বলতে পারি না। আপনার মেসের ঠিকানায় দুদিন লোক পাঠিয়েছি— আপনি তো ভাই মেসে থাকেন না। কোথায় থাকেন ?

ইয়াকুব সাহেবের শরীর কেমন?
ব্লাড ক্যানসারের রোগী- তাঁর আবার শরীর কেমন থাকবে ? যতই দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে বাইরে থেকে রক্ত দেয়া হয় শরীরে । আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায়।
চলুন দেখা করা যাক।
এখন দেখা করতে পারবেন না। স্যার এখন ঘুমোচ্ছেন। আমার ঘরে এসে বসুন, গল্প-গুজব করুন। ঘুম ভাঙলে স্যারের কাছে নিয়ে যাব।
আমি ম্যানেজার সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। গোপন কথা কিছু বলবেন কি না কে জানে!
হিমু সাহেব ।
জি ।
দুপুরে খেয়েছেন ?
জি না, খাই নি। ঠিক করে রেখেছি দুপুরে আমি এক বান্ধবীর বাসায় খাব। ওর নাম রূপা । পুরানা পল্টনে থাকে।
স্যারের সঙ্গে দেখা না করে তো যেতে পারবেন না। এখানেই বরঞ্চ খাবার ব্যবস্থা করি। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আনিয়ে দেই।
জি না। রূপার ওখানে খাব ঠিক করে রেখেছি। ওখানেই যেতে হবে।
কিছুই খাবেন না ?
না। আপনি গোপন কথা আমাকে কী বলতে চান বলে ফেলুন। আমি শুনছি।
গোপন কথা বলতে চাই আপনাকে কে বলল ?
দরজা বন্ধ করা দেখে মনে হলো ।
ও আচ্ছা। না, গোপন কথা কিছু নেই, আপনি এমন কেউ না যার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে হবে। তবে ইয়ে— কিছু জরুরি কথা অবশ্যি আছে।
বলুন।
আপনি বড় ধরনের একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।
কী রকম ?
সিগারেট খাবেন ? সিগারেট দেব ?
দিন ।
আমি সিগারেট ধরালাম। ম্যানেজার সাহেব সিগারেট খান না— অন্যকে বিলিয়ে বেড়ান।
হিমু সাহেব!
জি ।
আপনি একটা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। স্যারের কত বিশাল প্রপার্টি আপনি জানেন না। আমি কিছুটা জানি, পুরোটা না। প্রপার্টির ওয়ারিশান হচ্ছে উনার মেয়ে। স্যারের শরীরের অবস্থা যা তাতে এই প্রপার্টির সুষ্ঠু লেখাপড়া এখনই হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু স্যার কিছুই করছেন না। আপনার জন্যেই করছেন না।
আমার জন্যে করছেন না মানে ?
ওই যে স্যারের ধারণা হয়ে গেছে, নিষ্পাপ মানুষের রক্ত পেলে রোগ সারবে। এবং তার বিশ্বাস হয়েছে আপনি একজন যোগাড় করে আনবেন—
চেষ্টা করছি। যত চেষ্টাই করুন লাভ কিছু হবে না। নিষ্পাপ মানুষের রক্তে ব্লাড

ক্যানসার সারে এই জাতীয় গাঁজাখুরিতে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। নাকি করেন ?
কিছুটা করি। মিরাকল বলে একটা শব্দ ডিকশনারিতে আছে।
আচ্ছা, আপনি তাহলে মিরাকলে বিশ্বাস করেন ?
হু করি ।
আপনি মনে করেন যে, একজন নিষ্পাপ মানুষ আপনি ধরে আনতে পারবেন এবং স্যার সুস্থ হয়ে উঠবেন ?
আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, নিষ্পাপ লোক পাওয়াই মুশকিল। তবে চেষ্টায় আছি। দেখি কী হয় ।
হিমু সাহেব! আপনি কি বুঝতে পারছেন স্যারের এই বিশাল প্রপার্টির ওপর অনেক লোক নির্ভর করে আছে ? সব প্রতিষ্ঠান যাতে ঠিকমতো চলতে পারে তার জন্যে বিলি ব্যবস্থা হওয়া দরকার ।
উনাকে বলে বিলি ব্যবস্থা করিয়ে রাখুন।
উনি তা করবেন না। এইজন্যেই আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ— আপনি স্যারকে বুঝিয়ে বলবেন।
কী বুঝিয়ে বলব ?
কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। আপনি শুধু বলবেন যে, নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে আপনি অপারগ। এতে আপনার লাভ হবে।
কী লাভ হবে ?
মইন খান চুপ করে গেলেন। ভদ্রলোক আমার উপর যথেষ্ট বিরক্ত। একজন অবুঝ শিশুকে বোঝাতে গেলে আমরা যেমন বিরক্ত হই উনিও তেমনি হচ্ছেন। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, কী লাভ হবে বলুন ? টাকা-পয়সা পাব ?
যদি চান পাবেন।
কত টাকা দেবেন ?
ম্যানেজার সাহেব হতাশ ভঙ্গি করে চুপ করলেন। মনে হচ্ছে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আমি আবারো বললাম, কত টাকা দেবেন তা তো বললেন না।
কত টাকা টান আপনি ?
আপনারা কত টাকা দিতে পারেন সেটা জানা থাকলে বা সেটা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা থাকলে চাইতে সুবিধা হতো। ধরুন, আপনারা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন আমাকে এক কোটি টাকা দেবেন, আমি বোকার মতো চাইলাম এক হাজার টাকা....
এক কোটি টাকা যে কত টাকা সে সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা আছে ? এক এর পেছনে কটা শূন্য বসালে এক কোটি টাকা হয় আপনি জানেন ?
রেগে যাচ্ছেন কেন ?
রাগছি না। আপনার বোকামি দেখে হাসছি। একজন অসুস্থ মানুষ মরতে বসেছে — আপনি তার এডভানটেজ নিচ্ছেন। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত ।
আমি কি কোনো এডভানটেজ নিচ্ছি ?
অবশ্যই। এখনো নেন নি, কিন্তু নেবেন। এক বেকুবকে ধরে নিয়ে এসে বলবেন — এই নিন আপনার পুণ্যবান মানুষ। তার শরীর থেকে দুতিন ব্যাগ রক্ত নেয়া হবে এবং সেই রক্ত আপনি নিশ্চয় বিনামূল্যে দেবেন না। নিশ্চয় দাম নেবেন । নেবেন না

?

হ্যাঁ, নেব ।

কত নেবেন ?

পবিত্র রক্তের অনেক দাম মইন সাহেব ।

কত সেই দাম সেটাও শুনে রাখি ।

আরেকটা সিগারেট দিন। চা খাওয়ান, তারপর বলব। আর শুনুন ভাই, আপনি এত রাগ করছেন কেন ? সম্পত্তি ভাগাভাগি হোক বা না হোক আপনার তো কিছু যায় আসে না। আপনি যেই ম্যানেজার আছেন সেই ম্যানেজারই থাকবেন। এমন তো না যে, আপনি ইয়াকুব আলি সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করছেন । সম্পত্তি ভাগাভাগি করলে আপনার লাভ আছে।

চুপ করুন।

আচ্ছা চুপ করলাম।

মাইন খান গম্ভীরমুখে বের হয়ে গেলেন। আমার জন্যে চা আনতে গেলেন, এ রকম মনে হলো না। আমি চেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসলাম । মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকতে হবে। ম্যানেজার সাহেব এখন আর আমাকে সঙ্গ দেবেন না। আশ্চর্য, ম্যানেজার সাহেব নিজেই ট্রে হাতে ঢুকলেন।

নিন হিমু সাহেব, আপনার চা। খালি পেটে খাবেন না— মাখন মাখানো ক্রেকার আছে। ক্রেকার নিন।

থ্যাংকস ।

এখন বলুন, পবিত্র রক্তের দাম কত ঠিক করে রেখেছেন ?

অনেক দাম ।

বুঝতে পারছি অনেক দাম । সেই অনেকটা কত ?

আমি শান্ত গলায় বললাম, সেটা পবিত্র রক্ত শরীরে নেবার আগে ইয়াকুব আলি সাহেবকে বলা হবে।

আগে বলবেন না ?

উহুঁ। তবে পবিত্র রক্ত যখন পাওয়া যাবে তখন তার সঙ্গে টার্মস এন্ড কন্ডিশান নিয়ে আলাপ করব ।

আপনি শুধু ধুরন্ধর না— মহাধুরন্ধর ।

আমি হাসলাম । ম্যানেজার সাহেব বললেন, চা খাওয়া হয়েছে ?

জি ।

তাহলে যান, স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। স্যারের ঘুম ভেঙেছে । আরেকটা কথা, স্যারের পাশে স্যারের মেয়ে বসে আছে, কাজেই কথাবার্তা খুব সাবধানে বলবেন। এমন কিছুই বলবেন না যাতে ম্যাডাম আপসেট হন।

উনাকে কি এখন ম্যাডাম ডাকেন, আগের বার আপা বলছিলেন।

হ্যাঁ ডাকি । দয়া করে আপনিও ডাকবেন।

উনার নাম কী ?

উনার নাম জানার আপনার দরকার নেই ।

ইয়াকুব আলি সাহেব লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাকে একটা সরলরেখার মতো দেখাচ্ছে। এই ক'দিনে শরীর মনে হয় আরো খারাপ করেছে। সব মানুষের ভেতর এক ধরনের জ্যোতি থাকে— সেই জ্যোতি এখন আর তার মধ্যে নেই। তার মাথার

কাছে যে মেয়েটি বসে আছে তার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে। তবে আজ তাকে চেনা যাচ্ছে না। ওইদিন দেখেছিলাম খণ্ডিতরূপে, আজ পূর্ণরূপে দেখছি। মাথায় টাওয়েল বাধা নেই। তার মাথাভর্তি চুল ঢেউয়ের মতো নেমে এসেছে। পানির রঙ কালো হলে কেমন দেখাত তা মেয়েটির চুল দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়। আমি গভীর বিস্ময় নিয়ে তার চুলের দিকে তাকিয়ে আছি। ইয়াকুব সাহেব বললেন, বোসো হিমু।

আমি বসলাম কিন্তু মেয়েটির চুল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। ইয়াকুব সাহেব বললেন, কাউকে পেয়েছ ?

জি পেয়েছি। বেশ কটা নাম পাওয়া গেছে। এখন স্ক্রুটিনি পর্যায়ে আছে। এদের ভেতর থেকে স্ক্রুটিনি করে একজন সিলেক্ট করব।

গুড।

আপনি আরো কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন ।

ধৈর্য ধরেই আছি।

আপনার স্ত্রীকে কি স্বপ্নে আরো দেখেছেন ?

গতকালই দেখলাম । রাত তিনটার দিকে ।

কী বললেন ?

সেই আগের কথা বলল— পুণ্যবান মানুষের রক্ত। আমি তাকে বলেছি, খোঁজা হচ্ছে । শিগগিরই পাওয়া যাবে।

আপনি উনাকেই কেন বলেন না খুঁজে বের করে দিতে । ব্যাপারটা উনার জন্য নিশ্চয়ই সহজ ।

আমি ভেবেছিলাম তাকে বলব। তাকে আমার অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করার আছে। আমি একটা খাতায় লিষ্টি করে রেখেছি কী কী জিজ্ঞেস করব। মৃত্যুর পরের জগতটা কেমন ? সেখানকার দুঃখ-বেদনা কেমন ? কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না। আসলে বাস্তবের জগতটা মানুষের অধীন। স্বপ্নের জগৎ মানুষের অধীন না। স্বপ্নের জগতের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে...

উনি খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন । আমার উচিত তার দিকে তাকিয়ে থাকা। কিন্তু আমি বারবারই মেয়েটির চুলের দিকে তাকাচ্ছি। এত সুন্দর চুল কারোর থাকা উচিত নয়। এতে মানুষের দৃষ্টি তার চুলের দিকেই যাবে। তাকে কেউ ভালোমতো দেখবে না।

হিমু!

জি স্যার ।

তোমার মিশন শেষ হতে আর কতদিন লাগবে বলে মনে হয় ?

বেশি হলে এক সপ্তাহ।

এই এক সপ্তাহ টিকে থাকলে হয়— শরীর দ্রুত খারাপ করছে। মৃত্যু শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বিন্দু হয়ে ঢুকেছে। বিন্দু থেকে তৈরি হয়েছে বৃত্ত। সেই বৃত্ত এখন আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে শুরু করেছে। আসলে......

আসলে কী ?

ইয়াকুব আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, কী বলতে চাচ্ছিলাম ভুলে গেছি।

স্যার, আমি কি এখন উঠব ?

আচ্ছা যাও। আমি ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি, তোমার যা যা লাগবে ওকে

বলবে । হি উইল টেক কেয়ার অব ইট । তোমার বোধহয় সার্বক্ষণিক একটা গাড়ি দরকার। আমি বলে দিচ্ছি...

গাড়ির স্যার প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কত জায়গায় যেতে হবে। মিতু মা, তুই হিমুর সঙ্গে যা। ম্যানেজারকে বলে দে ।

মিতু উঠে দাঁড়াল। এই মেয়েটার নাম তাহলে মিতু। বেশ সহজ নাম। আমি ভেবেছিলাম আরো কঠিন কোনো নাম হবে। প্রিয়ংবদা টাইপ কিছু।

আমি এবং মিতু সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মিতু আমার পাশে পাশে নামছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা বা নামার সময় মেয়েরা কখনো পাশাপাশি হাঁটে না। তারা হয় আগে আগে যায়, নয়তো যায় পেছনে পেছনে।

হিমু সাহেব!

জি ম্যাডাম ।

মিতু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বলছেন কেন ?

ম্যানেজার সাহেব আপনাকে ম্যাডাম বলতে বলেছেন। তাছাড়া ম্যাডাম বলাটাই তো শোভন। আপনাকে মিতু ডাকলে আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না ।

মিতু বলল, আমার চুলগুলো মনে হয় আপনার খুব পছন্দ হয়েছে। বারবার চুলের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

আপনার চুল খুব সুন্দর।

হাত দিয়ে ছুয়ে দেখতে চান ? ছুয়ে দেখতে চাইলে পারেন। কিছু কিছু সৌন্দর্য আছে যা অনুভব করতে হলে স্পর্শ করতে হয়।

ছুয়ে দেখব ?

দেখুন। এতে আমার অস্বস্তিও লাগবে না কিংবা গা ঘিনঘিনও করবে না। কারণ এই চুল নকল চুল। আমি মাথায় উইগ পরেছি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। নকল চুল হাত দিয়ে দেখার কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। সুন্দর একটা মেয়ে, তার মাথার চুলও নিশ্চয়ই সুন্দর। সে নকল চুল পরেছে কেন ?

হিমু সাহেব।

জি ।

ভূমিকম্প হয়েছিল ঠিকই। আগে আগে কীভাবে বললেন ? আপনার টেকনিকটা কী ?

কোনো টেকনিক নেই।

কিছু টেকনিক নিশ্চয়ই আছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, যেমন ধরুন, কুকুর বেড়াল এরা ভূমিকম্পের ব্যাপার আগে আগে টের পায়। আমিও বোধহয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ।

মিতু কঠিন গলায় বলল, আমার নিজেরও তাই ধারণা।

আমাকে প্রায় হতভম্ব করে মিতু নেমে যাচ্ছে। এবার সে যাচ্ছে আগে আগে, আমি পেছনে পেছনে । মেয়েদের ধর্ম সে এখন পালন করছে।

ম্যানেজার সাহেব চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এসি বসানো শেভ্রলেট। আগামী সাতদিন এই গাড়ি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। গাড়ির ড্রাইভার আমার চেনা— তার গাড়ির ভেলভেটের সিটই আমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই সিট কভারই বদলানো হয়েছে। পুরো গাড়ির সিট কভার বদলানো। ঝকঝকে কমলা রঙের সিট কভারে সুন্দর লাগছে ।

ড্রাইভার ভীতমুখে বলল, কোথায় যাব স্যার ?

যেদিকে ইচ্ছা চালাতে থাকুন। আমি যখন বলব, স্টপ, তখন শুধু থামবেন।

যেদিকে মন চায় সেইদিকে চালাব ?

হু।

বিস্মিত এবং ভীত ড্রাইভার গাড়ি চালাতে শুরু করেছে। আমি গাড়ির সিটে গা এলিয়ে আরামে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে এই জীবনটা গাড়িতে গাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হতো না ।

ড্রাইভার ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। তাকে আপনি আপনি করে বলাতেও সে বোধহয় খানিকটা ভড়কে গেছে। বারবার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। ব্যাকভিউ মিরর খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল। অর্থাৎ মিরর এমনভাবে সেট করল যেন ঘাড় না ঘুরিয়েই সে আমাকে দেখতে পায় ।

ড্রাইভার সাহেব!

জি স্যার ।

আপনার নাম কী ?

আমার নাম স্যার ছামছু।

ভালো। খুব সুন্দর নাম, সামছু হলে ভালো হতো তবে ছামছুও খারাপ না । আগের বার আপনার নাম জানা হয় নি। এবার জেনে নিলাম ।

স্যার, আমারে তুমি কইরা বলবেন। আর ড্রাইভার সাব বইলা লজ্জা দিবেন না। আর আফনের সাথে বিয়াদবি কিছু করলে মাফ দিয়া দিবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, ছামছু। ভালোমতো চালাও । আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে চালামু স্যার ?

হু। খানাখন্দ এড়িয়ে চালাবে। ঘুমোচ্ছি তো, হঠাৎ ঝাকুনি খেলে ঘুম ভেঙে যাবে।

জি আচ্ছা স্যার । ছামছু গাড়ি চালাচ্ছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। ছামছু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে না। আমি জানি, সে এখন যাচ্ছে তার বাসার দিকে । বাসার খুব কাছাকাছি যাবার পর সে বলবে, এখন কোথায় যাব স্যার ? তার আগে বলবে না। এই পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র গন্তব্য তার ঘর।

ছামছু মৃদু গলায় বলল, গান দিমু স্যার ?

তোমার নিজের গান শুনতে ইচ্ছা হলে দিতে পারো। আমার লাগবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে দেখি গাড়ি দাড়িয়ে আছে। ড্রাইভার ছামছু তার সিটে চুপচাপ বসা। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল, এখন কোন দিকে যামু স্যার ?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তোমার বাসা কি খুব কাছে ?

জি স্যার। সামনের গলির দুইটা বাড়ির পরে।

তাহলে তুমি বরং এক কাজ করো— বাসা থেকে একটু ঘুরে আসো। ছেলেমেয়েদের দেখে আসো। ততক্ষণে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

ছামছু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

এই পৃথিবীতে সবচে’ সুন্দর জিনিস কী ? মানুষের বিস্মিত চোখ। আমার ধারণা, সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিস্মিত চোখ দেখতেই সবচে' পছন্দ করেন, যে কারণে প্রতিনিয়ত মানুষকে বিস্মিত করার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যান। যাদের তিনি অপছন্দ করেন তাদের কাছ থেকে বিস্মিত হবার ক্ষমতা কেড়ে নেন। তারা কিছুতেই বিস্মিত হয় না।

সত্যি বাসায় যামু স্যার ?

হ্যাঁ যাও । ছামছু চলে গেছে। আমি আগের মতোই গা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব । শরীর জুড়ে আলস্য। সন্ধ্যাবেলা রূপার কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল। অনেকদিন রূপাকে দেখা হয় নি ।

বড় খালুর বাসায়ও যাওয়া দরকার।

খুঁজে বের করা দরকার পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকে নাম হলো— মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদার।

অনেক কাজ। কিন্তু সব কাজ ছাপিয়ে ঘুমানোর কাজটাই আমার কাছে প্রধান বলে মনে হচ্ছে। এই গাড়ির জানালার কাচ মনে হয় রঙিন। বাইরের পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে মজার কোনো খেলা খেলছে। কী একটা সাদা বলের মতো জিনিস একজন আরেকজনের গায়ে ছুড়ে দিচ্ছে। যার গায়ে ছুড়ে দেয়া হচ্ছে সে আনন্দে চিৎকার করছে। যে ছুড়ে মারছে সেও আনন্দে চিৎকার করছে। কত আনন্দই না এই ভুবনে ছড়ানো।

ভালোমতো তাকিয়ে দেখি গোল সাদামতো জিনিসটা একটা কুকুরছানা। সে এই বিচিত্র খেলার কিছুই বুঝতে পারছে না। তার চোখ আতঙ্কে নীল হয়ে আছে। সে জেনে গেছে তার কপালে আছে অবধারিত মৃত্যু। সে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্যে।

আমি হাত উচিয়ে ছেলেগুলোকে ডাকলাম, এই এই—

ছেলেরা কঠিন মুখ করে এগোচ্ছে। কুকুরছানাটা একজনের হাতে। ছানাটার বুক কামারের হাপরের মতো উঠানামা করছে।

তোরা এই বাচ্চাটাকে আমার কাছে বিক্রি করবি ?

না।

আচ্ছা তাহলে চলে যা । বিক্রি করলে আমি কিনব ।

না, বেচব না।

তাহলে চলে যা ।

ছেলেরা চলে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছি খেলা আর জমছে না। তারা গোল হয়ে আলাপ করছে। মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। একদল বিক্রি করতে চায়, একদল চায় না। একটা ছেলে এগিয়ে আসছে। তাকে মনে হয় নিগোসিয়েশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে—

কী রে, বিক্রি করবি ?

হু।

চাস কত ?

পাঁচ শ' টেকা ।
কমাবি না ?
না ।
দেখ কিছু কমানো যায় কি না।
দলের অন্যরাও এগিয়ে আসছে। আসন্ন ব্যবসার সম্ভাবনায় তারা উল্লসিত । সবার চোখ চকচক করছে। আমি বললাম, পাঁচশ টাকা এই কুকুরছানার দাম হয় না তাও হয়তো কিনতাম, কিন্তু লেজটা কালো। কালো লেজের কুকুরের সাহস থাকে না ।
এইটা বিদেশী কুত্তা।
কে বলল বিদেশী ?
দেইখ্যা বোঝা যায়।
দেখে বোঝা গেলেও এত দাম দিয়া কিনব না। কম কত নিবি ?
এক পয়সাও কম নাই ।
তোরা তো ব্যবসা ভালো শিখেছিস ।
আপনে কত দিবেন ?
আমি দশ টাকা দিতে পারি। দশ টাকার এক পয়সা বেশি হলেও নিব না।
ছেলেগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কোথায় পাচ শ' কোথায় দশ! তারা মনে হয় এত হতাশ এর আগে কখনো হয় নি।
কী রে, দিবি দশ টাকায় ?
না।
তাহলে চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?
আমি চোখ বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লাম। আমি জানি এরা যাবে না। এরা দশ টাকাতেই কুকুরটা বিক্রি করবে। আমি একটা পশুর জীবন কিনব দশ টাকায়।
কুকুরটা আমার পাশে বসে আছে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমাকে দেখছে। পশুদের ভেতর কি কৃতজ্ঞতাবোধ আছে ? থাকার কোনো কারণ নেই, কিন্তু এ এত নরম চোখে কেন আমাকে দেখছে ? আমি বললাম, আয় আয়।
সে লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠল। কোলে উঠেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার অবচেতন মন বলছে, তার আর কোনো ভয় নেই।
কী সুন্দর এই কুকুরছানা! সাদা উলের বলের মতো। দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করে। সে বড় হবে পথে পথে । খাবারের আশায় হোটেলের চারপাশে ঘুরঘুর করবে। একদিন হোটেলের কোনো কর্মচারী তার গায়ে গরম মাড় ফেলে দেবে।
অনেক অনেক শতাব্দী আগে এই পশু মানুষের সঙ্গে অরণ্য ছেড়ে চলে এসেছিল। আজ আর তার অরণ্যে ফিরে যাবার পথ নেই। তাকে আশ্রয়ের জন্যে অনুসন্ধান করে যেতে হবে। আধুনিক মানুষ সেই আশ্রয় আজ আর তাকে দেবে না। কুকুরের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। খেলার জন্যে আজ আর তার কুকুরবেড়ালের প্রয়োজন নেই। তার আছে কম্পিউটার।
স্যার কুত্তা কই পাইলেন ? ড্রাইভার ফিরে এসেছে। পান খাচ্ছে। পানের রসে মুখ লাল। হাতে করে একটা পান সে আমার জন্যেও নিয়ে এসেছে।
কুত্তা কই পাইলেন স্যার ?
কিনলাম ।
নেড়ি কুত্তা পয়সা দিয়া কিননের জিনিস না ।

দেখতে সুন্দর।
দেখতে সুন্দর জিনিসের কোনো উবগার নাই।
উচ্চশ্রেণীর ফিলসফি করে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল । খুশি খুশি গলায় বলল, স্যার কই যামু ?
সেক্রেটারিয়েটে চলো। দেখি মুনশি বদরুদ্দিনকে পাওয়া যায় কি না।
সেক্রেটারিয়েটে ঢোকার আমার পাস নেই। তবে আজ পাস লাগবে না। এত দামি গাড়িকে কেউ আটকায় না।
মুনশি বদরুদ্দিনকে আজো পাওয়া গেল না। তার মেয়ে অসুস্থ, সে নাকি মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। আমি বললাম, এসেছি যখন চা খেয়ে যাই। দু'কাপ চা আনানোর ব্যবস্থা করুন। আমার জন্যে এক কাপ, আমার কুকুরটার জন্যে এক কাপ । সেও চা খায় ।
অফিসের সব কটা লোক এমনভাবে তাকাচ্ছে যাতে মনে হয় এরা আজ আমাকে সহজে ছাড়বে না। দরজা বন্ধ করে শক্ত মার দেবে। মার দিলে দেবে— কী আর করা! আমি বেশ আরাম করেই বসলাম। আমার কোলে কুকুরছানা। এর একটা নাম দেয়া দরকার। দুই অক্ষরের নাম । কুকুরের নাম দুই অক্ষরের বেশি হলে ভালো লাগে না ।
কই ভাই চায়ের কথা বলছেন ?
আমাকে অবাক করে দিয়ে একজন সত্যি সত্যি চায়ের কথা বলল। এরা আমাকে মারার সাহস পাচ্ছে না। মনে হয় কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে। অসৎ মানুষ ভীরু প্রকৃতির হয়।
চা এসেছে।
শুধু চা না। চায়ের সঙ্গে বিসকিট। একজন একটা সিগারেটও বাড়িয়ে দিল । চা খেতে খেতে আজকের প্রোগ্রাম ঠিক করে নিলাম— লালবাগ থানায় যাব । সেকেন্ড অফিসারকে পাওয়া যায় কি না দেখব। ফার্মগেটে একলেমুর মিয়াকে খুঁজে বের করব। তার মেয়েটা কি ফিরে এসেছে ?
রূপার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলব, নাকি চলে যাব তাদের বাড়িতে ?
লালবাগ থানার সেকেন্ড অফিসারকে পাওয়া গেল না। তিনি বদলি হয়ে গেছেন মুন্সীগঞ্জে। লালবাগ থানার ওসি সাহেব আমাকে চিনতে পারলেন। চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই— তিনি তার থানা হাজতে আমাকে এক সপ্তাহের মতো আটকে রেখেছিলেন। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললাম, ঘুস ইদানীং কেমন আসছে স্যার ?
ওসি সাহেব এই কথায় রাগ করলেন না। বরং আনন্দিত গলায় বললেন, বসুন। আপনি আজকাল করছেন কী ?
কিছু করছি না। পবিত্র মানুষ খুঁজছি। আপনার সন্ধানে কোনো পবিত্র মানুষ আছে ?
পবিত্র মানুষ খোজার জন্যে তো ভাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না। আমাদের কাজ অপবিত্র মানুষ নিয়ে। যদি কোনোদিন অপবিত্র মানুষের প্রয়োজন হয়, আসবেন। সন্ধান দেব। আপনার মাথার দোষ এখনো সারে নাই ?
আমি হাসলাম ।
বুঝলেন হিমু সাহেব, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধপত্র খান । পীরফকিরের

তাবিজ নেন। ব্রেইন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে বিপদে পড়বেন । মহা বিপদে পড়বেন।

স্যার উঠি ?

আচ্ছা যান। আরেকটা উপদেশ শুনে যান— পুলিশ এভয়েড করে চলবেন। আমি আপনাকে চিনি বলে ছেড়ে দিচ্ছি— অন্যরা তো চিনবে না— মেরে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে। টাকি মাছের ভর্তা। খেয়েছেন কখনো টাকি মাছের ভর্তা ?

জি খেয়েছি।

খেতে ভালো না ?

অতি উপাদেয় ।

দুপুরে তেমন কোনো কাজ না থাকলে বসে থাকুন। টাকি মাছের ভর্তা দিয়ে ভাত খাবেন । স্ত্রীকে বলেছি টাকি মাছের ভর্তা করতে ।

মুরগি খেতে খেতে মুখে অরুচি হয়েছে ?

ওসি সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি উঠে পড়লাম। টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার সময় নেই।

আমার ড্রাইভার ছামছু আকাশ থেকে পড়েছে। সে কল্পনাও করতে পারছে না আমি কী করে রাস্তার একটা ফকিরের সঙ্গে বসে ভাত খাচ্ছি। ছামছুকে খেতে ডেকেছিলাম, সে ঘৃণার সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে মুখ কালো করে গাড়িতে বসে আছে ।

একলেমুর মিয়ার মেয়েটা ফিরে এসেছে। সে খাচ্ছে আমাদের সাথে । মেয়েটা বিচিত্র ধরনের— ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পারে না। কপ কপ করে শুধু ভাত খায়। ভাতের উপর খানিকটা লবণ ছিটিয়ে দিতে হয়। আর কিছু লাগে না ।

একলেমুর মিয়া ।

জি ভাইজান ?

এই জীবনে পাপ কী কী করেছ ?

প্রত্যেক দিনেই তো পাপ করি ভাইজান । মাইনষের কাছে ভিক্ষা চাই... মাইনষে বিরক্ত হয়। মাইনষেরে বিরক্ত করা মহাপাপ ।

এই জাতীয় পাপের কথা বলছি না। বড় পাপ ।

পাপের কোনো বড় ছোট নাই। ছোট পাপ, বড় পাপ সবই সমান— ।

তাই নাকি ?

জি। তার উপরে দুই কিসিমের পাপ আছে। মনের পাপ, আর শরীরের পাপ। ধরেন আমি একটা জিনিস চুরি করলাম। এইটা হইল শরীরের পাপ। চুরি করছি হাত দিয়া। আবার ধরেন মনে মনে ভাবলাম চুরি করব। এইটা মনের পাপ। চুরি না করলেও মনে মনে ভাবার কারণে পাপ হইল। এই পাপও কঠিন পাপ ।

তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে নিস্পাপ মানুষ পাওয়া যাবে না ?

দুই একজন আছে। তবে পাওয়া জটিল।

তোমার সন্ধানে আছে ?

আছে, আমার সন্ধানে একজন আছে।

যদি দরকার হয় তাকে আমার কাছে এনে দিতে পারবে ?

একলেমুর মিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, পারমু। আপনে বললেই আইন্যা দিমু।

গুড।

আমি একলেমুর মিয়ার মেয়েটাকে বললাম, এই গাড়ি চড়বি ?

চড়মু।

আয় আমার সঙ্গে।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ ভাতের থালা ফেলে উঠে এলো। গাড়ি দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল।

এই গাড়ি আফনের ? ই। আপাতত আমার। যা ওঠ।

বাপজানরে লইয়া উঠুম। আইজ আমি আর বাপজান গাড়িত কইরা ভিক্ষা করুম।

এটা মন্দ না।

আমি ছামছুকে বললাম, ছামছু গাড়িতে তেল আছে ?

জি স্যার আছে।

এরা দুইজন আজ গাড়িতে করে ভিক্ষা করবে। তুমি এদের ভিক্ষা করতে নিয়ে যাও।

ছামছু তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়েছে। কপাল ঘামছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, গাড়িতে বইস্যা ভিক্ষা করব ?

হু। গ্রামে আমি ফকিরদের ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে দেখেছি। ঘোড়ায় চড়ে যদি ভিক্ষা করা যায় গাড়িতেও করা যায়। রাত নটা পর্যন্ত তুমি এদের নিয়ে ঘুরবে, তারপর চলে আসবে আমাদের মেসের সামনে, ঠিক সামনে যে গ্রীন ফার্মেসি সেখানে।

জি আচ্ছা স্যার।

মুখ এরকম করে রেখেছ কেন ছামছু ? না, এইটা নিয়া চিন্তিত আর কিছু না।

চিন্তা করবে না। মনে সাহস রাখ ছামছু।

জি আচ্ছা, সাহস রাখব।

মুখ কালো করে ছামছু গাড়ি স্টার্ট দিল। ছোট মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। এত সুন্দর হাসি অনেক দিন শুনি নি।

ছয়

রূপা ঘুম-ঘুম গলায় বলল, হ্যালো।

আমি বললাম, কেমন আছ রূপা ?

সে জবাব দিল না। চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, কেমন আছ রূপা ?

রূপার ছোট্ট করে শ্বাস নেবার শব্দ শুনলাম। তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, ভালো আছি।

ঘুম-ঘুম গলায় কথা বলছ কেন ?

ঘুমোচ্ছিলাম। ঘুম ভেঙে টেলিফোন ধরেছি, এই জন্যেই ঘুম-ঘুম গলায় কথা।

আজ এত সকাল-সকাল শুয়ে পড়লে যে ? মাত্র দশটা বাজে।

আমার জ্বর, এই জন্যেই সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছি।

জ্বর। তাহলে কেন বললে, আমি ভালো আছি ?

ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও।

আমি হেসে ফেললাম। রূপা হাসছে না। এমনিতে সে খুব হাসে। কিন্তু টেলিফোনে আমি তাকে কখনো হাসতে শুনি নি।

রূপা!

শুনছি।

তোমার জন্যে একটা উপহার পাঠিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ড্রাইভার উপস্থিত হবে।

তোমার ড্রাইভার মানে ?

কিছুদিনের জন্যে একটা গাড়ি এবং ড্রাইভার পেয়েছি।

শুনে সুখী হলাম।

উপহার পেয়ে আরো সুখী হবে। উপহারটা হলো একটা কুকুরছানা।

তোমার কাছে আমি কি কুকুরছানা কোনোদিন চেয়েছি ?

না।

তাহলে এই রাতদুপুরে কুকুরছানা পাঠাবার অর্থ কী ?

রূপা, তুমি কি রাগ করলে ?

না, রাগ করি নি, তার সঙ্গেই রাগ করা চলে যে রাগের অর্থ বোঝে। রাগ, অভিমান, ঘৃণা, ভালোবাসা এর কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই। কাজেই আমি তোমার উপর রাগ করা ছেড়েছি। শুধু রাগ না, অভিমান ঘৃণা, ভালোবাসা কোনো কিছুই আর তোমার জন্যে নেই।

তোমার জ্বর কি খুব বেশি ?

কেন, আমার কথাগুলো কি প্রলাপের মতো লাগছে ?

না। খুব স্বাভাবিক লাগছে, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। তোমার জ্বর কত ?

এক শ দুই পয়েন্ট ফাইভ ।

অনেক জ্বর। যাও শুয়ে থাক ।

আমি শুয়েই আছি। কথা বলছি শুয়ে শুয়ে ।

আর কথা বলতে হবে না, বিশ্রাম করো।

রূপা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বিশ্রাম নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার নিজের বিশ্রাম নিয়ে ভাবো। আজকাল কী করছ জানতে পারি ?

কিছুই করছি না। ঘুরে বেড়াচ্ছি বলতে পারো।

মিথ্যা কথা বলছ কেন ? আমি তো যতদূর জানি তুমি পবিত্র রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ও আচ্ছা, হ্যা, ঠিকই বলেছ।

পেয়েছ ?

উহু । তবে পেয়ে যাব।

তোমাকে একটা কথা বলি, খুব মন দিয়ে শোন— তুমি কোনো একজন ভালো সাইকিয়াট্রিষ্টকে তোমার বিখ্যাত মাথাটা দেখাও। প্রয়োজন হলে শক ট্রিটমেন্ট করাও, নয়তো কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে পুরোপুরি দিগম্বর হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছ এবং ট্রাফিক কনট্রোলের চেষ্টা করছ।

তোমার জ্বর কদিন ধরে ?

এই তথ্য জানার তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

না।

তাহলে কেন জিজ্ঞেস করলে ?

কথার পিঠে কথা বলার জন্য ।

কথার পিঠে কথা বলার জন্য আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখছি।

এক সেকেন্ড। একটা জরুরি কথা তোমাকে বলা হয় নি। কথাটা হচ্ছে— কুকুরছানাটার একটা নাম আছে। আমিই নামটা দিয়েছি। তুমি যদি নতুন নাম দিতে চাও, দেবে। আর নতুন নাম খুঁজে না পেলে আমারটা রেখে দিতে পারো। বলব নামটা ?

বলো।

মেয়ে কুকুর তো, কাজেই আমি নাম রেখেছি কঙ্কাবতী। আদর করে তুমি ওকে কঙ্কাও ডাকতে পার। কঙ্কা ডাকলেই সে কান খাড়া করে।

রূপা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটা বিরক্ত মুখে বলল, কথা শেষ হয়েছে ? এতক্ষণ কেউ টেলিফোনে কথা বলে ? কত জরুরী কল আসতে পারে......

আমি হাসলাম । ছেলেটি আরো বিরক্ত হলো । আমি বললাম, ভাই, আরেকটা কল করতে হবে। ভয়ানক জরুরি। না করলেই নয়। কুড়ি মিনিটের বেশি এক সেকেন্ডও কথা বলব না।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?

না, ঠাট্টা করছি না।

আমি এখন দোকান বন্ধ করে বাসায় যাব । যাত্রাবাড়িতে থাকি, আর দেরি করলে বাস পাব না।

বাসের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। আমার গাড়ি আছে। গাড়ি পৌছে দেবে।

গাড়ি আছে ?

অবশ্যই গাড়ি আছে। এসি বসানো গাড়ি ।

কেন এইসব চাল মারেন ?

তার কথার জবাব দেয়ার আগেই আমার গাড়ি এসে উপস্থিত হলো। গ্রীন ফার্মেসির ছেলে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, ভাই, করব একটা টেলিফোন ?

করুন। আরেকটা কথা বলে রাখি– এর মধ্যে যদি আপনার গাড়ির কখনো দরকার হয়— ছেলেমেয়ে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন বা এই জাতীয় কিছু— তাহলে আমাকে বলবেন । গাড়ি এখন আর কোনো সমস্যা না।

টেলিফোন করলাম বড় খালার বাসায়। বড় খালা টেলিফোন ধরলেন। বড় খালা, স্লামালিকুম।

কে, হিমু ?

জি ।

হারামজাদা, জুতিয়ে আমি তোর বিষদাত ভাঙব । কী হয়েছে খালা ?

তোর এত বড় সাহস! ফিচকেল কোথাকার!

খালা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বলে অস্বস্তি বোধ করছি— ব্যাপারটা কী ?

গালাগালি করার আগে ব্যাখ্যা করো কেন গালাগালি করছ।

তুই কি এর মধ্যে তোর খালুর অফিসে গিয়েছিলি ?

হু।

অফিসে গিয়ে তাকে বলেছিস যে সে পুণ্যবান লোক ?

জি খালা । আমি একটা লিষ্ট করেছি। লিষ্টে তার নাম আছে।

তোর কথা শুনে ঐ গাধা পুণ্যবান সাজার চেষ্টা করছে। আমাদের এই বাড়ি সে এতিমখানা বানানোর জন্যে দিয়ে দিতে চায়।

বলো কী!

এত কষ্টের পয়সার বাড়ি, এটা নাকি হবে এতিমখানা! এতিমখানা আমি তার পাছা দিয়ে ঢুকায়ে দেব।

খালা, প্লিজ, আরেকটু ভদ্র ভাষা ব্যবহার করো।

হারামজাদা, ভদ্র ভাষা আবার কী রে ? গাধা পুণ্যবান সাজে। উকিলমোক্তার নিয়ে বাসায় উপস্থিত। আমি ভাবলাম কী না কী, পরে শুনি এই ব্যাপার। আমাকে ডেকে বলে— সুরমা, তুমি কিন্তু সাক্ষী। সাক্ষী আমি বুঝায়ে দিয়েছি ।

মারধর করেছ ?

ইয়ারকি করিস না হিমু। ইয়ারকি ভালো লাগছে না।

খালুজানকে দাও। কথা বলি ।

ওকে দেব কোত্থেকে ? ও কি বাসায় আছে ? জুতিয়ে বের করে দিয়েছি না ? স্যান্ডেল-পেটা করেছি।

স্পঞ্জ স্যান্ডেল, না চামড়া ?

হারামজাদা, রসিকতা করিস না । তোকেও জুতা-পেটা করব।

খালুজানকে কখন বাড়ি থেকে বের করলে ? আজ ?

হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলা । উকিল-মোক্তার সব নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘর থেকে বের হয়েছে। মোক্তার ব্যাটা ফাইল নিয়ে হুড়মুড় করে রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছে।

তুমি কি সত্যি সত্যি স্যান্ডেল-পেটা করেছ ?

অবশ্যই।

রাখি খালা ?

শোন হিমু, গাধাটার সঙ্গে তোর যদি দেখা হয় তাহলে গাধাকে বলবি সে যেন আর ত্রিসীমানায় না আসে...

জি আচ্ছা, আমি বলব। তবে বলার দরকার হবে বলে মনে হয় না।

কত বড় সাহস! আমার জমি, আমার বাড়ি সে দান করে দিচ্ছে, আর আমাকে বলছে সাক্ষী হতে মদ খেয়ে খেয়ে মাথার বারটা বেজে গেছে সেই খেয়াল নেই।

খুব খাচ্ছেন বুঝি ?

অফিসে গিয়েছিলি, কিছু টের পাস নি ? রাত-দিন তো ওর উপরই আছে। গাধার চাকরিও চলে গেছে।

বলো কী!

অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল ।

আমাকে টেলিফোন ছাড়তে হলো না। আপনা আপনি লাইন কেটে গেল। আমি ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেছে। আমার ধারণা, মেসে ফিরে দেখব বড় খালু বসে আছেন। আমার ইনট্যুশন তাই বলছে। কিছুদিন পালিয়ে থাকার জন্যে আমার আস্তানা সর্বোত্তম। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দু’প্যাকেট ডানহিল সিগারেট কিনলাম। বড় খালুর এই হচ্ছে ব্র্যান্ড। আমার ধারণা, মেসে পা দেয়ামাত্র বড় খালু বলবেন, হিমু, সিগারেট এনে দে।

মেসে ফিরলাম ।

আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘর অন্ধকার । খাটের উপর কেউ একজন শুয়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকলাম। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললাম, বড় খালু, আপনার সিগারেট । ডানহিল।

বড় খালু জড়ানো গলায় বললেন, থ্যাংকস। তোর এখানে দু-একদিন থাকব । অসুবিধা আছে ?

আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি থাকতে পারবেন কিনা কে জানে।
নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গায় আমি থাকতে পারি। নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গাই আমার জন্যে স্বর্গ– দি হেভেন !

কিছু খেয়েছেন ?

না ।

চলুন আমার সঙ্গে। হোটেলের খাবার খেতে অসুবিধা নেই তো ?

না ।

বড় খালু উঠে দাঁড়িয়েছেন, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গি শিথিল । বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর মদ্যপান করেছেন। মুখ থেকে ভকভক করে কুৎসিত গন্ধ আসছে। কথাবার্তা পুরো এলোমেলো ।

হিমু!

জি ।

তোর এই মেসের ম্যানেজার এসেছিল । তোর নাকি আজই মেস ছেড়ে দেবার কথা ?

হু।

আমি রিকোয়েস্ট করে আর এক সপ্তাহ টাইম এক্সটেনশান করেছি।

ভালো করেছেন।

এক সপ্তাহ পর যদি বের করে দেয়, দুজন একসঙ্গেই বের হয়ে যাব। কী বলিস ?

সেটা মন্দ হবে না।

শীতকাল হওয়ায় মুশকিল হয়েছে। গরমকাল হলে পার্কের বেঞ্চিতে আরাম করে ঘুমানো যেত।

হু।

তুই শুধু হুঁ হা করছিস কেন ? কথা বল। বি হ্যাপি । বুঝলি হিমু, তোর এই যন্ত্রণা করে খুলে দিয়েছেন। একজন এসে তাস খেলার জন্য ইনভাইট করলেন ।

ভালো তো ।

তোদের এখানে কাজের মেয়েটা যে আছে, কী যেন তার নাম ?

ময়নার মা ?

আরে ধুৎ! ময়না হলো তার মেয়ের নাম। ওর নিজের নাম কী ?

নাম জানি না খালু।

মনে পড়েছে, ওর নাম হলো কইতরী। সুন্দর না নামটা ?

হ্যাঁ, সুন্দর।

কইতরী আমাকে চা এনে দিল । অনেকক্ষণ গল্প করলাম কইতরীর সঙ্গে । অসাধারণ মহিলা । গরিব ঘরে জন্মেছে বলে সে হয়েছে ঝি। বড়লোকের ঘরে খেয়ে গায়ে পড়ে যাচ্ছেন। বেতাল অবস্থা।

বড় খালু, বমি-টমি হবে না তো ?

তুই কি পাগল-টাগল হয়ে গেলি ? আমি কি এ্যামেচার ? আমি হলাম প্রফেশনাল পানকারী। আমার কিছুই হবে না।

না হলেই ভালো ।

বুঝলি হিমু, ঐ কইতরী মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। I like him.

Him না বড় খালু, her.

ঠিকই বলেছিস, her, I like her, Exceptional lady.

তাই নাকি ?

তোর খালাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কইতরীকে বিয়ে করে ফেললে কেমন হয় ? তাহলে তোর খালা সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। উচিত শিক্ষা হবে। সবাই বলবে— ছিঃ ছিঃ! ঝি বিয়ে করে ফেলেছে। হো-হো-হো । হি-হিহি।

আপনার অবস্থা তো কাহিল বলে মনে হচ্ছে।

তোর খালার অবস্থা আরো কাহিল করে ফেলব। একেবারে কাহিলেস্ট করে দেব। কাহিল-কাহিলার-কাহিলেস্ট, তখন সে বুঝবে হাউ মেনি রাইস, হাউ মেনি পেডি। হি-হি-হি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল ।

হিমু!

জি ।

একটা কী যে জরুরি কথা তোকে বলা দরকার, মনে পড়ছে না। ফরগটেন ।

মনে পড়লে বলবেন ।

খুবই জরুরি ব্যাপার। এখানে দাঁড়া। দাঁড়ালে মনে পড়বে।

মাতাল মানুষের কাছে সবই জরুরি। তারা অতি তুচ্ছ ব্যাপারকে আকাশে তোলে। আমি বড় খালুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তার কিছু মনে পড়ছে না।

দাঁড়িয়ে থাকলে মনে পড়বে না। বরং আমরা হাঁটি । হাঁটলে ব্রেইন বাকুনি খাবে, তাতে যদি মনে আসে।

এটা মন্দ না ।

তাকে নিয়ে হোটেলে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ হাঁটলাম । তিনি হাঁটার সময় ইচ্ছে করে বেশি বেশি মাথা ঝাকালেন— তাতেও লাভ হলো না ।

হোটেলে খেতে বসে তার মনে পড়ে গেল। আনন্দিত গলায় বললেন, মনে পড়েছে। আলেয়া এসেছিল তোর কাছে। চিনেছিস তো ? সম্পর্কে তোর খালা হয়। তার বোনের মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিস– খুকি নাম। পরীর মতো মেয়ে।

কী জন্যে এসেছিলেন ?

খুকির বড় মেয়েটাকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না। দুদিন হলো বাসা থেকে উধাও ! তোর কাছে এসেছে, তুই যদি কিছু বলতে পারিস ?

আমি কী করে বলব ?

আমিও সেই কথাই ওদের বললাম। আমি বললাম— হিমু বলবে কী করে ? ও কি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোক ? আলেয়া কিছুতেই মানবে না। আলেয়ার ধারণা, তুই চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ধ্যান করলেই বলতে পারবি মেয়েটা কোথায় আছে। হা-হা-হা ।

মেয়েটার নাম কি পলিন ?

হু। তুই চিনিস নাকি ?
চিনি ।
ধ্যান করে বলতে পারবি মেয়েটা কোথায় ?
না। ধ্যান কী করে করতে হয় জানি না।
খুব ইজি। আমি তোকে শিখিয়ে দেব। প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করবি। তারপর পদ্মাসন হয়ে বসবি। খালি গা। সবচে' ভালো হয় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসলে... চোখ পুরোপুরি বন্ধও না, খোলাও না...
বড় খালু খুব আগ্রহ নিয়ে ধ্যানের কৌশল বলছেন। আমি শুনছি।
ধ্যান করলে সব পাওয়া যায় রে হিমু, সব পাওয়া যায়। ধ্যান কর ।
ধ্যান। ধ্যান করব! রেস্টুরেন্টে ধ্যান সম্ভব না। বাসায় ফিরেই করব।
রেস্টুরেন্টেও সম্ভব। এই দ্যাখ আমি করছি। আমাকে দেখে শিখে নে ।
তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগলেন। এবং ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় কাটা তালগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেলেন। উঠলেন না। ওঠার অবস্থা নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সাত

আকাশ মেঘলা হয়েছিল। শীতকালে আকাশে মেঘ মানায় না। শীতের আকাশে থাকবে ঝকঝকে রোদ। আমি হাইকোর্টের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি বলেই একজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম । আমি লজ্জিত হয়ে কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, মাফ করে দিয়েছি।
আকাশের দিকে তাকিয়ে যে মন-খারাপ ভাবটা হয়েছিল— ভদ্রলোকের এক কথায় সেই মন-খারাপ ভাব দূর হয়ে গেল। ইচ্ছে করছে হাত ধরে ভদ্রলোককে কোনো চায়ের দোকানে নিয়ে যাই । খানিকক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করি। ভদ্রলোক আমাকে সেই সুযোগও দিলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি আপনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন। সব ঠিকঠাক তো ?
জি, সব ঠিকঠাক । আমার বাবা রিটায়ার করার পর ঠিক আপনার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটা অভ্যাস করলেন । ফুটপাতে হাটলেও একটা কথা ছিল— উনি রাস্তাও পার হতেন আকাশের দিকে তাকিয়ে । গত বৎসর রাস্তা পার হবার সময় অ্যাক্সিডেন্ট করেন। একটা ট্রাক এসে তাকে চ্যাপ্টা করে রেখে চলে যায় । অনেকদিন পর আবার আপনাকে দেখলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে । এই অভ্যাস দূর করুন।
জি আচ্ছা, করব।
পথ চলবেন চোখ খোলা রেখে।
চোখ খোলা রাখলে মনের চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
মনের চোখ বন্ধ থাকাই ভালো। আপনাকে কে যেন ডাকছে। ওই দেখুন গাড়ি ?
আমি এগুলাম গাড়ির দিকে । গাড়িতে যিনি বসে আছে তাকে চিনতে পারছি না। বিদেশী মহিলা মনে হয়— তুরস্ক-টুরস্ক হবে। অস্বাভাবিক লম্বা টানা টানা চোখ। কাচা

হলুদের মতো গায়ের রঙ । লালচে চুল । বোরকা পরা। তবে বোরকার ভেতর থেকে মুখ বের হয়ে আছে। কালো বোরকার কারণেই বোধহয় তরুণীকে এমন অস্বাভাবিক রূপবতী লাগছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বলব ? ইংরেজি ? সর্বনাশ হয়েছে— মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে কথা বলা— শাস্তির মতো।

হিমু সাহেব ।

ইয়েস ম্যাডাম ।

কী করছেন ?

কিছু করছি না।

উঠে আসুন।

আমি ড্রাইভারের পাশে বসতে গেলাম, ভদ্রমহিলা ইশারা করলেন তার সঙ্গে বসতে । আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি মিতু ।

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। এই মেয়ে যে শুধু নিজের চেহারা পাল্টে ফেলেছে তাই না— গলার স্বরও পাল্টেছে। ভারি স্বর। ইংরেজিতে একেই বোধহয় বলে 'হাসকি ভয়েস' ।

হিমু সাহেব!

জি ।

আমি যে আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছি সেটা কি জানেন ?

জি না, জানি না।

স্পাই আছে। স্পাইয়ের কাজ হচ্ছে— আপনার ক্রিয়াকর্ম লক্ষ রাখা এবং আমাকে রিপোর্ট করা।

সে কি ঠিকমতো রিপোর্ট করছে ?

হুঁ করছে।

মিতু মুখের উপর বোরকা ফেলে দিল । গাড়ি মিরপুরের রাস্তা ধরে উড়ে চলছে। ব্যস্ত রাস্তা। এমন ব্যস্ত রাস্তায় ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাতে সাহস লাগে। ড্রাইভারের মনে হয় সেই সাহসের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঘনঘন কাশছে। আমি বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

মিতু বলল, কোথাও যাচ্ছি না। ঘুরছি। অকারণে ঘোরার অভ্যাস শুধু আপনার থাকবে, অন্য কারোর থাকবে না এটা মনে করা ঠিক না। আপনার চেয়েও অনেক বিচিত্র মানুষ থাকতে পারে।

অবশ্যই পারে ।

আমার স্পাই আপনার সম্বন্ধে কী বলল জানতে চান ?

জি না। আমার কৌতুহল কম।

আমার কৌতুহল কম না। আমার কৌতুহল অনেক বেশি– আমি এখন আপনার নাড়িনক্ষত্র জানি । হাসবেন না।

আমি কি একটা সিগারেট ধরাতে পারি ?

পারেন ।

আমি সিগারেট ধরলাম। মিতু বলল, আপনার এই বিচিত্র জীবনযাপনের উদেশ্য কী ?

কোনো উদ্দেশ্য নেই। অল্প ক'দিনের জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, নিজের মতো করে বাস করতে চাই ।

আপনি বিয়ে করেন নি ?

জি না ।

করবেন না ?

বুঝতে পারছি না।

কাকে বিয়ে করবেন ? রূপাকে ?

আমি আবারো হাসলাম । মিতু কঠিন গলায় বলল, হাসবেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দিন।

জানা থাকলে জবাব দিতাম । জবাব জানা নেই।

আপনি দেশের বাইরে কখনো গিয়েছেন ?

জি না ।

যেতে চান ?

আমি চুপ করে রইলাম। মিতু বলল, চুপ করে থাকবেন না। এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে– যদি যেতে চান আমাকে বলুন, আমি আপনাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে দেখাব। মরুভূমি দেখবেন— তুন্দ্রা অঞ্চল দেখবেন ।

শর্ত কী ? কিসের শর্ত ?

অকারণে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে এই সুযোগ দিচ্ছেন না। শর্ত নিশ্চয়ই আছে। সেই শর্তটা কী ?

আমারও খুব ঘুরতে ইচ্ছে করে। একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না । একজন সঙ্গী দরকার।

পাহারাদার ?

পাহারাদার না, সঙ্গী। বন্ধু। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমার কোনো বন্ধু নেই। বাবার মৃত্যুর পর আমি একা হয়ে যাব।

আপনার বাবা মারা যাবেন না— আমি পবিত্র মানুষ খুঁজে পেয়েছি।

সেই পবিত্র মানুষটি কে ?

আছে একজন ।

সে কি রূপা ?

হ্যাঁ রূপা। কী করে ধরলেন ?

ইনট্যুশন ক্ষমতা শুধু যে আপনারই প্রবল তাই না— আমারও প্রবল ।

তাই তো দেখছি।

আপনি একবার বলেছিলেন আপনার এক পরিচিত লোক আছে যে হারানো মানুষের সন্ধান দিতে পারে।

হ্যাঁ বলেছিলাম— চানখারপুলে থাকে— করিম।

তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন তো ।

এখন যাবেন ?

হ্যাঁ এখন যাব। তার ক্ষমতা কী দেখব। যদি সে সত্যি কিছু পারে তাহলে...

তাহলে কী ?

আমার একজন হারানো মানুষ আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখব ।

চলুন যাই।

করিম তার ছাপড়ার ঘর থেকে বের হয়ে আনন্দে দাত বের করে ফেলল— আরে, হিমু ভাইজান আফনে ?

কেমন আছিস ?

ভালো আছি। আফনের দোয়া।

ব্যবসাপাতি কেমন হচ্ছে ?

ব্যবসা নাই বললেই হয়। কনটেকে একটা কাম করলাম— পুলা হারাইয়া গেছিল। পাচ হাজার টেকা কনটেক। বাইর কইরা দিলাম— এর পরে আর টেকা দেয় না। চইন্দবার গেছি। কোনোবারে দেয় পঞ্চাশ, কোনোবারে কুড়ি.... শেষে এমন গাইল দিছি— বলছি— হারামির বাচ্চা, তোর মারে আমি...

চুপ চুপ।

ছরি ভাইজান, ছরি। মিসটেক হইছে— আপনের সাথে মেয়েছেলে আছে খিয়াল নাই। বোরকা পরা খালাম্মা— মাফ কইরা দিবেন। ছোটলোকের জাত— মুখের ভাষার নাই ঠিক...।

আমি মিতুর দিকে তাকালাম। বোরকার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে করিমের দিকে । কিছুই বলছে না। আমি বললাম, একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে। পলিন নাম । তার পেনসিল বক্সটা আমার সঙ্গে আছে। মেয়েটা কোথায় আছে বল ।

বাক্সটা দেন দেহি আমার হাতে ।

আমি পেনসিল বক্স তার হাতে দিলাম। বক্স হাতে নিয়েই করিম ফিরিয়ে দিয়ে বিরস গলায় বলল, হারাইছে কই! এই মেয়ে তার মার সাথেই আছে। মেয়ে ইশকুলে পড়ে। তার গালে পোড়া দাগ আছে। ভাইজান, ঠিক বলছি না ?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

মিতু বলল, পেনসিল বক্স হাতে নিয়েই বুঝে ফেললেন ?

জে।

কীভাবে ?

কীভাবে এইটা তো খালাম্মা জানি না। আল্লাহপাক একটা ক্ষমতা দিছে। এই ক্ষমতা বেইচা খাই ।

আমার একটা লোক খুঁজে দিতে পারবেন ?

জে পারব। অবশ্যই পারব। তয় খালাম্মা কনটেকে কাম করব । টেকা পুরাটা দিবেন এডভান্স। কাম করতে না পারলে গলায় ইটার মালা দিয়া কানে ধইরা শহরে চক্কর দেওয়াইবেন । করিমের এক কথা। যার খোজ চান— তার নাম দিবেন, ব্যবহারী জিনিস দিবেন। ছবি থাকলে ছবি দিবেন। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

আচ্ছা, আমি আসব।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, লোকটাকে কি আপনার বিশ্বাস হয়েছে ?

মিতু বলল, আপনার হয় ?

হ্যাঁ হয়। এই ক্ষমতা তার আছে। কীভাবে এই ক্ষমতা তার হয়েছে আমি জানি না। তবে হয়েছে। সে আপনার হারানো মানুষ খুঁজে দেবে। তবে...।

তবে কী ?

যে হারিয়ে গেছে তাকে হারিয়ে যেতে দেয়াই ভালো। হারানো মানুষকে খুঁজে বের করতে নেই।

মিতু বোধহয় কাঁদছে। বোরকায় মুখ ঢাকা বলে বুঝতে পারছি না। তবে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মিতু আমাকে আমার মেসবাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। মুখের উপর থেকে

বোরকার পর্দা উঠিয়ে বলল, আপনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী থাকেন তাহলে আর হারানো মানুষ খুঁজব না। আপনি কি রাজি ?

আমি বললাম, না।

না কেন ? আপনার আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। রূপার চেয়ে প্রবল। আমাকে এর বাইরে থাকতেই হবে ।

কেন ?

আমার উপর এই হলো আদেশ ।

কার আদেশ ?

আমার বাবার। তিনি আমার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মিতু যাই।

মিতু জবাব দিল না।

আট

আপনার নাম কি মুনশী বদরুদ্দিন তালুকদার?

জি।

ভালো আছেন ?

মুনশি বদরুদ্দিন জবাব দিলেন না, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আমার সঙ্গে কথাবার্তাও চালাতে চাচ্ছেন না। তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। রোগা। ক্লান্ত ক্লান্ত চেহারা। নামের সঙ্গে মুনশি থাকার কারণে ক্ষীণ সন্দেহ থাকে, হয়তো তার দাড়ি আছে। ভদ্রলোকের দাড়ি নেই। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

কেন ?

এমনি । কিছুক্ষণ কথা বলব ? কোনো কারণ নেই।

জমিজমা সংক্রান্ত কোনো কাজ ?

না। আমি আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাব । আপনার ঠিকানা বের করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। অফিস থেকে মালিবাগের একটা ঠিকানা দিয়েছিল– দেখা গেল ভুল ঠিকানা।

শুধু শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন ?

শুনেছি আপনি ঘুস খান না। কাজেই আপনার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ বোধ করছি।

ঘুস তো অনেকেই খায় না।

তাও ঠিক । সবার নাম ঠিকানা জানি না। জানলে সবার সঙ্গেই দেখা করতাম |

কেন ?

বারবার কেন কেন জিজ্ঞেস করবেন না তো ভাই— একটু বসতে দিন।

আমার মেয়ে খুব অসুস্থ । আপনি আরেকদিন আসুন।

তার কী অসুখ ?

বুকে ব্যথা ।

আজই বুকে ব্যথা করছে, না অনেকদিনের রোগ ?

অনেকদিনের অসুখ ।

আমি শারীরিক ব্যথা কমাতে পারি। মেয়েটার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

মুনশি বদরুদ্দিনের মুখের মাংসপেশি সামান্যতমও শিথিল হলো না। বোঝাই যাচ্ছে এ কঠিন লোক । দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে দাঁড়িয়েই আছে। এক মুহূর্তের জন্যেও দরজা থেকে হাত সরায় নি। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা ভাই যাই। আরেকদিন আসৰ।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় নেমে গেছি, তখন বদরুদ্দিন ডাকলেন, আসুন ।

আমি ঘরে ঢুকলাম। একজন সৎ মানুষের বসার ঘর যেমন হওয়া উচিত, ঘরটি তেমন। এক কোনায় কয়েকটা কাঠের চেয়ার, অন্য কোনায় বড় চৌকি । অসুস্থ মেয়েটি এই চৌকিতেই শুয়ে আছে। ১৪-১৫ বছর বয়স । মায়া-মায়া মুখ । হাত-পা এলিয়ে শুয়ে আছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ব্যথায় ঠোঁট নীল । এই অবস্থায়ও সে আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছে। আমি হাসলাম । সেও হাসার চেষ্টা করল। আমি সহজ গলায় বললাম, মেয়েটার মা কোথায় ?

দেশের বাড়িতে। বেতন যা পাই তাতে ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকায় থাকা যায় না। আমি একটা ঘর সাবলেট নিয়ে একা থাকি ।

এই মেয়েটি কি আপনার সঙ্গে থাকে ?

একে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম।

চিকিৎসা হচ্ছে ?

বদরুদ্দিন চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আপনার মেয়ের নাম কী ?

ওর নাম কুসুম।

আমি বসে আছি একটা চেয়ারে। বদরুদ্দিনের হাতে একটা গ্রাস এবং চামচ । গ্রাসে সম্ভবত শরবত জাতীয় কিছু আছে। তিনি চামচে করে মেয়ের মুখে শরবত দেয়ার চেষ্টা করছেন। মেয়েটা শরবত খেতে চাচ্ছে না। আমি বললাম, ভাই শুনুন, আপনার মেয়েটার মনে হয় খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে— চলুন মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

না।

না কেন ?

আমি কারো দয়া নেই না ।

দয়া বলছেন কেন ? বলুন সাহায্য ।

আমি কারোর সাহায্যও নেই না।

শুনুন ভাই— এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে সাহায্য নিতে হয় এবং সাহায্য করতে হয়। Give and take.

আমি আপনাকে চিনি না, জানি না— কেন আপনি খামাখা বিরক্ত করছেন ?

মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে, আপনি তার কষ্ট কমাবার চেষ্টা করবেন না ?

আমি আমার সাধ্যমতো করেছি। যেটা আমার সাধ্যের বাইরে সেটা আমি করব না ।

বদরুদ্দিন সাহেব— সততা একসময় রোগের মতো হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় দেখা যায় সৎ মানুষরা ভয়ানক অহঙ্কারী হয়। এরা নিজেদেরকেই শুধু মানুষ মনে করে, অন্যদের করে না। আপনি নিজে যেমন কারোর সাহায্য নেন না— আমি নিশ্চিত, আপনি কাউকে সাহায্যও করেন না। করেছেন, কাউকে কোনো সাহায্য ?

আমি আমার নিজের মতো থাকি ।

নিজের মতো থাকার জন্যে তো আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয় নি।

আপনি কে ?

আমার নাম হিমু। বাইরে ঠাণ্ডা আছে। মেয়েটাকে একটা গরম কাপড় পরান । আমরা তাকে ভালো কোনো কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব। আবার যদি না বলেন— তিনতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেব।

অসুস্থ মেয়েটি তার বাবাকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কুসুম, তুমি কি আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাবে ?

হু।

তোমার ব্যথা কি এখন একটু কমেছে ?

হুঁ। আপনি কে ?

আমার নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়।

মেয়েটি আবারো হেসে উঠল। মনে হচ্ছে সে অতি অল্পতেই হেসে ফেলে।

বদরুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, হাসপাতালে কুসুমকে নিয়ে লাভ হবে না। ওর একটা অপারেশন দরকার। ডাক্তাররা বলছেন এই অপারেশন এখানে হয় না। আগে কখনো হয় নি।

আগে হয় নি বলে কোনোদিন হবে না তা তো না। এবার হবে। মেয়েটার গরম কাপড় নেই ?

বদরুদ্দিন লাল রঙের একটা সুয়েটার বের করে আনলেন । মেয়েটা আনন্দিত মুখে চুল আঁচড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।

তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিলাম। বড় ক্লিনিক বলেই বোধহয় শুধু টাকারই খেলা । ভর্তি করাবার সময়ই সাতদিনের টাকা এডভান্স দিতে হয় । এই সঙ্গে ডাক্তার এবং ওষুধের বিল বাবদ দেড় হাজার টাকা ।

পকেটে আছে দুটা কুড়ি টাকার নোট । একটা পাঁচ টাকার নোট। দ্রুত টাকার যোগাড় করতে হবে। জরুরি সময়ের একমাত্র ভরসা হচ্ছে রূপা । টেলিফোনে তাকে পাওয়া গেলে হয় । ক্লিনিকের রিসিপশান থেকে টেলিফোন করতে হলেও এডভান্স টাকা দিতে হয়। শহরের ভেতর প্রতি কল পাট টাকা । মানুষের রোগ নিয়ে ব্যবসা কত প্রকার ও কী কী হতে পারে তা ক্লিনিকওয়ালাদের মতো ভালো কেউ জানে না।

হ্যালো রূপা ?

হু।

কুকুরছানাটা যে পাঠিয়েছিলাম সে কেমন আছে ?

ভালো আছে।

পছন্দ হয়েছে তো ?

হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। এটা কিন্তু নেড়ি কুকুর না। বিদেশী কুকুর— পুডল।

শুনে আনন্দিত হলাম। এখন তুমি দয়া করে একটা কাজ করো— কুকুরের দাম বাবদ চার হাজার টাকা পাঠিয়ে দাও । আমি লোক পাঠাচ্ছি।

লোক পাঠাতে হবে না। তুমি কোথায় আছ বলো— আমি নিজেই টাকা নিয়ে আসছি। অনেকদিন তোমাকে দেখি না।

আমি ক্লিনিকের নাম বললাম। রূপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। রূপার এখানে

আসতে আসতেও আধ ঘণ্টার মতো লাগবে । এই ফাঁকে আমি সটকে পড়ব । রূপার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

কুসুমের জায়গা হয়েছে রুম নাম্বার ৮-এ । বেশ বড় রুম। টিভি পর্যন্ত আছে। কুসুম তার শরীরের তীব্র ব্যথা অগ্রাহ্য করে তার কেবিনের সাজসজ্জা দেখছে। তার চোখে গভীর বিস্ময় ।

ডাক্তার সাহেব ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিয়েছেন । ডাক্তার সাহেবের মুখ শুকনো। মনে হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ইনজেকশনটা দিলেন। আমি বললাম, রোগী কেমন দেখছেন ডাক্তার সাহেব ?

তিনি রসকষহীন গলায় বললেন, বাইরে আসুন, বলছি।

আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনারা লষ্ট কেইস নিয়ে এসেছেন । এই মেয়ের বাচার কোনো আশা নেই। এর হার্ট পুরোপুরি ড্যামেজড। এ যে কীভাবে বেঁচে আছে সেটাই একটা রহস্য ।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, জগতটাই রহস্যময় ডাক্তার সাহেব। তবে আপনাকে একটা উপদেশ দেই। লস্ট কেইস ধরে নিয়ে কোনো রোগীর চিকিৎসা করবেন না। চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করবেন gain case ধরে, 'lost case' ধরে না।

ভেবেছিলাম আমার কথায় ডাক্তার রাগ করবেন । তিনি রাগ করলেন না। চিন্তিত মুখে আবার মেয়েটির কাছে ফিরে গেলেন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত বোধ করছি। এই মেয়েটিকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। রূপা চলে আসছে। যা করার সে-ই করবে। টাকা না দিয়ে ক্লিনিক ছেড়ে যাচ্ছি - এটা ক্লিনিকের লোকজন পছন্দ করছে না । একজন এসে টাকা দেবে— এই সত্য বিশ্বাস করতে তারা প্রস্তুত নয়। ম্যানেজার জাতীয় এক ভদ্রলোক বললেন, আপনি বসুন নারে ভাই। চা পানি খান। উনি আসলে চলে যাবেন। আমি বললাম, আমার কথার উপর ভরসা হচ্ছে না ?

ছিঃ ছিঃ কী বলেন, ভরসা হবে না কেন ?

জামিন হিসেবে একজন রোগী তো আছেই। টাকা-পয়সা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ঝামেলা হলে ইনজেকশন দিয়ে রোগী মেরে ফেলবেন । গেল ফুরিয়ে । মামলা ডিসমিস।

আপনি অমানুষের মতো কথা বলছেন। আপনি তো একজন ক্রিমিনাল।

ঠিক বলেছেন। এখন দয়া করে অনুমতি দিন— আমাকে মুলীগঞ্জ যেতে হবে । মুসীগঞ্জের ওসি সাহেবের কাছে ধরা দিতে হবে। যেতে পারি ?

কেউ জবাব দিল না।

হাসপাতালের গেটের কাছে মুনশি বদরুদ্দিন দাঁড়িয়ে । তিনি আমাকে দেখলেন। কিছু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি আমাকে পছন্দ করছেন না।

নয়

মোহাম্মদ রজব খোন্দকার থানায় ছিলেন না। থানার ভেতরেই তার কোয়ার্টার ।

গেলাম কোয়ার্টারে। আশঙ্কা ছিল তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না। অল্প কিছুক্ষণের পরিচয় । না পাবারই কথা। পুলিশদের স্মৃতি দুর্বল হয়। কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন, আনন্দিত গলায় বললেন– আরে দি গ্রেট হিমুবাবু।

চিনতে পেরেছেন ?

চিনব না মানে ? মাথা কামিয়ে গর্ত বানিয়ে বসে ছিলেন । আমি ধরে নিয়ে এলাম। এরপরেও চিনব না ? এখন করছেন কী ?

কিছু না।

হণ্টন চালিয়ে যাচ্ছেন? শহরজুড়ে হাঁটাহাটির বদঅভ্যাস আছে এখনো ?

কয়েকদিন হলো হাঁটছি না। গাড়ি করে ঘুরছি— ।

গাড়ি! গাড়ি কোথায় পেলেন ? চোরাই মাল ?

চোরাই মাল না।

অবশ্যই চোরাই মাল। ঢাকা শহরে যত গাড়ি আছে সব ব্ল্যাকমানির গাড়ি । তারপর বলুন হিমু সাহেব— আমার কাছে কী জন্যে ?

আপনি কেমন আছেন দেখতে এসেছি স্যার ।

ভালো আছি। সুখে আছি। মিরপুরে জমি কিনেছি।

ঘুস খাওয়া ধরেছেন ?

অবশ্যই ধরেছি। সকাল বিকাল সন্ধ্যা তিন বেলা খাচ্ছি। কী ঠিক করেছি জানেন — আগামী পাচ বছর খাব। তারপর তওবা করব । ব্যস, আর না। বাকি জীবন আল্লাহ-খোদার নাম নিয়ে পার করে দেব। পাঁচ বছরের অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি হচ্ছেন রহমানুর রহিম। কত কঠিন অপরাধ ক্ষমা করে দেন– ঘুস তো সেই তুলনায় কিছুই না।

স্যার, আপনার কাছে কলম আছে ?

কলম কী জন্যে ?

পবিত্র মানুষদের একটা লিষ্ট করেছিলাম। সেখানে আপনার নাম ছিল— নামটা কেটে দেব।

পবিত্র মানুষদের লিস্ট ?

হু ।

নতুন কোনো পাগলামি ?

হু।

গুড । ভেরি গুড । দু-একটা পাগল-ছাগল সংসারে না থাকলে ভালো লাগে না। হিমুবাবু!

জি স্যার ?

রাতে আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবেন। একজন একটা রুই মাছ দিয়ে গেছে, আট কেজি ওজন । নদীর ফ্রেশ মাছ। পোলাওয়ের চালের ভাত করতে বলেছি। পোলাওয়ের চালের ভাত, কাগজি লেবু আর মাছের পেটি। দেখি মাছ কত খেতে পারেন । মাছ খেতে পারেন তো ?

জি স্যার, পারি।

এখন সত্যি করে বলুন। আসলেই কি পবিত্র মানুষের লিস্ট আছে ?

আছে।

মুন্সীগঞ্জ এসেছেন আমার ব্যাপারে খোজখবর করবার জন্যে ?

জি ।

হিমু সাহেব, পবিত্র মানুষের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এটা পাবেন না। আমি একজন পবিত্র মানুষকে জানতাম— আমার পিতা। অতি পবিত্র। স্কুলশিক্ষক ছিলেন— মধুর ব্যবহার। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। লোকে বলত তাকে দেখলে দিনটা ভালো যায়। সেই লোক কী করত জানেন ? তার কাজ ছিল— কাজের মেয়েদের প্রেগনেন্ট করে ফেলা । চারটা কাজের মেয়ে আমাদের বাসায় পর পর প্রেগনেন্ট হয়েছে। আমার মা এদের টাকা-পয়সা দিয়ে গ্রামে পার করে দিতেন। আর শুধু কাঁদতেন... । বুঝলেন হিমু সাহেব, পবিত্র মানুষ না হয়ে সাধারণ মানুষ হওয়াই ভালো।

রাতে ওসি সাহেবের বাসায় খেতে গেলাম । শাক, ডাল আর ডিমের তরকারি। অবাক হয়ে বললাম, রুই মাছের পেটি কোথায় ? আট কেজি রুই ?

ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, রুই মাছের পেটি পাব কোথায় ? বেতন যা পাই তা দিয়ে আট কেজি রুই একটাই কেনা যাবে। শুধু রুই মাছ কিনলে হবে ?

রুই মাছের কথাটা বললেন যে ?

একজন একটা রুই মাছ দিতে এসেছিল । হাত কচলে বলল, স্যার আট কেজি ওজন। এখন হারামজাদাকে আটবার কানে ধরে ওঠ-বোস করিয়ে বিদেয় করেছি।

মিরপুরে জমি কিনেছেন ?

কিনেছি। মা মারা গেছেন। মার জন্যে কবরের জায়গা কিনেছি।

আপনি তাহলে বদলান নি ওসি সাহেব।

বদলাব কেন? আমি কি গুইসাপ যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাব ? আমি হলাম গিয়ে মানুষ। খেতে পারছেন হিমু ?

জি স্যার, পারছি খেতে, খুব ভালো হয়েছে।

আপনার ভাবিকে একটু বলুন— গেষ্টদের সে ভালোমন্দ খাওয়াতে পারে না, এই জন্যে তার মনটা থাকে খারাপ। কই, শুনে যাও তো......

ঘোমটা দেয়া একজন মহিলা জড়োসড়ো হয়ে দরজার পাশে দাড়ালেন। ওসি সাহেব বললেন, ললিতা, এ হলো গিয়ে হিমু। ডেঞ্জারাস ছেলে। একে জেল-হাজতে রেখে দেয়া উচিত । একে সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে দেয়া উচিত না। যাই হোক, এ বলছে তোমার রান্না ভালো হয়েছে।

ললিতা স্বামীর কথার উত্তরে ফিসফিস করে কী যেন বললেন, ওসি সাহেব হো-হো করে হাসতে হাসতে বললেন, খবরদার এইসব কথা বলবে না। এইসব কথা শুনলে সে আবার ফট করে তোমার নাম পবিত্র মানুষদের লিষ্টে তুলে ফেলবে। এ ভয়ঙ্কর ছেলে। লিষ্টে নাম উঠে গেল ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে... হোহো-হো । হা-হা-হা ।

মুন্সীগঞ্জ থেকে ফেরার সময় ওসি সাহেব এক ডজন কলা কিনে দিলেন। মুন্সীগঞ্জের কলা নাকি বিখ্যাত। আমি স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। পবিত্র মানুষ স্পর্শ করলেও পুণ্য ।

ওসি সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্ত্রীকে হাসতে হাসতে বললেন, এই পাগলাটাকে একদিন রুই মাছ খাওয়াতে হবে ।

দশ

বড় খালা সাধারণত দশটা বাজার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এখন সাড়ে এগারটা বাজে। এত রাত পর্যন্ত তিনি কখনোই জাগেন না। আজ জেগে ছিলেন। কলিংবেল বাজতেই নিজে দরজা খুললেন। আমি বললাম, তুমি দোতলা থেকে নামলে কেন ? আর লোকজন কোথায় ?

বড় খালা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, তোর খালুজান সেই যে গিয়েছে আর ফেরে নি। চারদিন হয়ে গেছে। টেলিফোন করে নি, অফিসেও যায় নি।

অফিসে যাবে কেন ? সেখানে তো শুনেছি চাকরি নেই।

চাকরি যাওয়া এত সোজা ? ওকে ছাড়া অফিস চলবে ? ও একা যত কাজ করে অফিসের পুরো স্টাফ তা করে না।

তবু অফিসে বসে মদ্যপান ।

অফিসে চা খেলে দোষ হয় না, আর একটু-আধটু ইয়ে খেলে দোষ হয়ে গেল ?

একটু-আধটু না খালা, গ্যালন গ্যালন

... চুপ কর।

বড় খালার মুখ কাঁদো-কাঁদো। মনে হয় কাঁদছিলেন। তার পরিবর্তন বিস্ময়কর। আমি বললাম, খালুজান ছাড়াও তো ঘরে লোকজন ছিল। তারা কোথায় ?

কাজের লোকজনের কথা বলছিস ? সব বিদেয় করে দিয়েছি। অসহ্য হয়েছে।

এখন একা থাক ?

কী বোকার মতো কথা বলছিস ? দোকা আমি পাব কোথায় ?

রাতে ভয় লাগে না ? এত বড় বাড়ি একা একা থাক...

ভয় তো লাগবেই। ভয়ের জন্যেই তো জেগে ছিলাম। দুটা সিডাকসিন খেয়েছি, তারপরেও ঘুম আসছে না।

আরো দুটা খাও। আজকাল সিডাকসিনেও ভেজাল । ঘুম আসার বদলে ঘুম চলে যায় ।

রাতদুপুরে ফাজলামি করিস না তো ।

ফাজলামি করছি না খালা । আমি সিরিয়াস । আমার মনে হয় না একা একা তোমার এত বড় একটা বাড়িতে থাকা উচিত। শেষে ভূত-টুত কিছু একটা দেখে বাথরুমে দাত কপাটি লেগে পড়ে থাকবে। খালা, তুমি বরং কোনো আত্মীয়স্বজনের বাসায় চলে যাও । বাড়িতে বিরাট তালা লাগিয়ে দাও ।

আমি অন্যের বাসায় গিয়ে উঠি, আর তোর খালু ফিরে এসে দেখুক বাড়িতে কেউ নেই, তালা ঝুলছে। আজগুবি উপদেশ দিতে তোকে কে বলছে ?

তাহলে বরং এইখানেই থাক, এবং একা একা থাক। একা একা থাকা অভ্যাস হবারও দরকার আছে। খালুজান তোমার দশ বছরের বড়। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললে তিনি বিদেয় হবেন তোমার দশ বছর আগে । খুব কম করে হলেও তোমাকে দশ বছর থাকতে হবে একা একা । মেয়েরা আবার শুনেছি পুরুষদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে । এমনিতে নাকি শারীরিকভাবে দুর্বল। বাঁচার সময় আবার বেশিদিন বাঁচছে— কোনো মানে হয় ?

তুই ক্রমাগত আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছিস কেন ?

চলে যাব ?

চলে যা ।

আর ধর, হঠাৎ যদি পথেঘাটে খালুজানের দেখা পেয়ে যাই তাহলে কী করব ? ধরে নিয়ে আসব ? আমি তো পথে পথেই ঘুরি। আমার জন্যে দেখা পাওয়াটা সহজ ।

কাউকে আনতে হবে না। নিজ থেকে এলে আসবে, না এলে নাই ।

তাহলে আমি বিদেয় হই খালা । তুমি দরজা-টরজা লাগিয়ে জেগে বসে থাক ।

রাতে কিছু খেয়েছিস ?

খেয়েছি।

শুধু মুখে যাবি কেন ? হালুয়া খেয়ে যা ।

হালুয়া আমি খাই না।

ভালো হালুয়া। পেঁপের হালুয়া।

পেপের আবার হালুয়া হয় নাকি ?

হয়। খেতে মোরব্বার মতো লাগে । তোর খালুজান খুব পছন্দ করে খায়।

তুমি কি এখন রাত জেগে জেগে খালুজানের সব পছন্দের খাবার বানাও ?

গাধার মতো কথা বলবি না। ঘরে পেপে ছিল। নষ্ট হচ্ছিল, হালুয়া বানিয়ে রেখে দিয়েছি— খাবি ? এনে দেই পিরিচে করে ?

উহুঁ, তুমি বরং পলিথিনের ব্যাগে করে খানিকটা দিয়ে দাও । মাঝরাতে খিদে পেলে তখন খেয়ে নেব ।

বড় খালা আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন । আমি বললাম, তোমার যদি একা থাকতে ভয় লাগে তাহলে মুখ ফুটে বলো আমি থেকে যাব ।

কাউকে থাকতে হবে না। আর তুই ঠিকই বলেছিস, একা একা থাকার অভ্যাস তো করতেই হবে ।

যাই খালা ?

যা। আর শোন, তুই তো পথে পথেই ঘুরিস। একটু চোখকান খোলা রাখিস । তোর খালুজানকে দেখলে...

অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসব ?

নিয়ে আসতে হবে না । লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে পেছনে যাবি, কোথায় থাকে জেনে আসবি, তারপর আমি গিয়ে ধরব ।

এটা মন্দ না । খালা যাই ।

যা। ভালো কথা, তুই নাকি পবিত্র মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

কে বলল ?

কে বলেছে খেয়াল নেই। তুই নাকি কী একটা লিষ্ট বানিয়েছিস ?

হু।

কী করবি পবিত্র মানুষ দিয়ে ?

চিড়িয়াখানায় রাখা যায় কি না সেই চেষ্টা করব। পবিত্র মানুষ বলতে গেলে রেয়ার স্পেসিস হয়ে গেছে। দুর্লভ প্রাণী, চীনের পাণ্ডার মতো...

সবসময় সবার সঙ্গে রসিকতা করিস না হিমু। মা-খালাদের সঙ্গে রসিকতা করা যায় না ।

আর করব না । পবিত্র মানুষ পেয়েছিস খুঁজে ? একটা প্রিলিমিনারি লিষ্ট তৈরি করেছি। এর মধ্যে বাছাই হচ্ছে...। সেমিফাইনালে চলে এসেছি...।

বড় খালা লজ্জিত গলায় বললেন, তোর খালুজানের নাম কি লিষ্টিতে আছে ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি কি চাও তার নাম লিষ্টিতে থাকুক ?

হু। একজন স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব তার স্বামীকে পুরোপুরি জানা... আমি তাকে যতটুকু জানি তার নাম থাকা উচিত। হাসছিস কেন ?

বড় খালুর নাম লিস্টিতে আছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো, তোমার নামও লিষ্টিতে আছে।

সত্যি বলছিস ? কাগজটা পকেটে আছে। দেখতে চাও ?

না। তোর কথা বিশ্বাস করছি। এত বড় সম্মান এর আগে আমাকে কেউ দেয় নি রে হিমু।

বড় খালা চোখ মুছতে লাগলেন।

মেসে ফিরে এসেছি। আমি শুয়েছি মেঝেতে পাটি পেতে । খালুজান খাটে বসে অন্ধকারে পেপের হালুয়া খাচ্ছেন।

আজ একটু শীত পড়েছে। পাটিতে শুয়ে শীত-শীত লাগছে। হিমালয়ের গুহায় সাধু-সন্ন্যাসীরা নেংটি পরে কীভাবে থাকেন কে জানে ? টেকনিকটা তাদের কাছে শিখে এসে আমাদের দেশের ফুটপাতের মানুষগুলোকে শিখিয়ে দিতে পারলে কাজ হতো। তারা পৌষমাসের নিদারুণ শীত হাসিমুখে পার করে দিতে পারত।

খাটের উপর থেকে বড় খালু ডাকলেন, হিমু!

আমি কিছু বললাম না, তবে নড়াচড়া করলাম যাতে তিনি বুঝতে পারেন আমি জেগে আছি ।

পেঁপের হালুয়াটা তো অসাধারণ হয়েছে— চেখে দেখবি ?

না।

জিনিসটা পুষ্টিকর। পেটের জন্যেও ভালো ।

আমার পেট ভালোই আছে। আমি খান পেট ঠিক করুন।

তোর বড় খালার অবস্থা কী দেখলি ? আমার জন্যে খুব ব্যস্ত ?

না।

সে কী! কিছুই বলে নি ?

না।

মুখে না বললেও মনে মনে খুবই ব্যস্ত। পেঁপের হালুয়া-টালুয়া বানাচ্ছে দেখছিস না ?

পেঁপে পচে যাচ্ছিল। হালুয়া বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছে।

এইসব তুই বুঝবি না। বিয়ে করিস নি তো, বুঝবি কীভাবে ? আমি তো বলতে গেলে একটা থার্ডক্লাস লোক । সেই আমার জন্যে তার টান...

ঘুমান খালুজান ।

অসাধারণ একজন মহিলা ।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, অসাধারণের কী দেখলেন ? তার ঝগড়া করার ক্ষমতাকে যদি অসাধারণ বলেন তাহলে ভিন্ন কথা। বাসায় গিয়ে দেখি তিনি একা, কাজের সব কটা মানুষ বিদেয় করে দিয়েছেন।

উপরে উপরে দেখে তুই কিছু বুঝবি না। উপরে উপরে দেখলে তাকে ঝগড়াটে মনে হবে। কিন্তু ব্যাপার ভিন্ন। শুনবি ?

না, ঘুম পাচ্ছে ?

ইয়াং ম্যান, বারটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়বি এটা কেমন কথা। শোন না— তোর বড় খালা করে কী, অবিবাহিতা যুবতী সব মেয়ে রাখে কাজের মেয়ে হিসেবে। তোর খালার যুক্তি হচ্ছে, এই জাতীয় মেয়েগুলোকে কেউ রাখতে চায় না। এরা কাজ পায় না। শেষটায় দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে। শুনছিস আমার কথা, না ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

শুনছি।

তারপর তোর খালা খোঁজখবর করে এদের বিয়ে দেয়। প্রচুর খরচপাতি করে ।

ছেলে পায় কোথায় ?

যোগাড় করে। টাকা দিয়ে কিনে নেয় বলতে পারিস। কাউকে রিকশা কিনে দেয়। কাউকে পান-বিড়ির দোকান দিয়ে দেয়... কাউকে চাকরি দিয়ে দেয়। এই পর্যন্ত আটটা মেয়ে পার করেছে।

এই ব্যাপারটা জানতাম না ।

বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না রে হিমু। কিছুই বোঝা যায় না। ডাবের শক্ত খোসা দেখে কে বলবে ভেতরে টলটলে পানি ? তুই এক কাজ কর রে হিমু, তোর ঐ লিষ্টিতে তোর খালার নামটা তুলে দে...।

আচ্ছা দেব। আপনি ঘুমান ।

ঘুম আসছে না।

বড় খালার কাছে যেতে চান ?

তুই কি মনে করিস যাব ? তুই যা বলবি তাই করব।

তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন।

একটু আগে না বললাম, ঘুম আসছে না।

তাহলে উঠে শার্ট গায়ে দিন। চলুন দিয়ে আসি ।

আমাকে দেখে রাতদুপুরে আবার হইচই শুরু করে কি না । আল্লাহ যা একটা মেজাজ এই মহিলাকে দিয়েছে।

ভয় লাগলে থাক । দিনেরবেলায় যাওয়া যাবে।

বড় খালু উঠে বাতি জ্বালালেন। শার্ট গায়ে দিলেন। আনন্দিত গলায় বললেন, রাত তেমন বেশি হয় নি, তাছাড়া চাঁদনি পসর রাত ।

বড় খালুকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে মনে হলো— এখন আর নিজের ঘরে ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না। বরং মুনশি বদরুদ্দিনের মেয়েটাকে দেখে আসা যাক । তার ব্যবস্থা কী হয়েছে জেনে আসি। রূপার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে না। সে এতক্ষণ বসে থাকবে না ।

ক্লিনিকের গেটের কাছে আমার ড্রাইভার সামছু চিন্তিত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। তার

এতক্ষণ এখানে থাকার কথা না। রাত এগারটার পর তার ছুটি হয়ে যায়। সে চলে যায় ইয়াকুব আলি সাহেবের বাড়ি।

ছামছু আমাকে দেখে ছুটে এলো। মনে হচ্ছে সে হাতে চাঁদ পেয়েছে।

কী ব্যাপার ছামছু ? বাড়ি যাও নি ?

গিয়েছিলাম স্যার আপনার জন্য আসছি।

বলো কী ব্যাপার ?

বাড়িতে গিয়ে দেখি বড় স্যারের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তাররা রক্ত দিবেন কিন্তু স্যার আপনার আনা রক্ত ছাড়া অন্য রক্ত নিবেন না। আপনাকে স্যার সবাই পাগলের মতো খুঁজতেছে।

তাই নাকি ?

জি স্যার। ম্যানেজার সাহেব আপনার মেসে বসে আছেন। স্যার দেরি করবেন না, চলেন। এক্ষণ চলেন।

এত ব্যস্ত হলে তো চলবে না ছামছু। খালি হাতে উপস্থিত হলে কোনো লাভ নেই। রক্ত নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। আমি রক্তের ব্যবস্থা করি।

যা করার একটু তাড়াতাড়ি করেন স্যার । আমি ক্লিনিকে ঢুকলাম। লবিতে রূপা বসে আছে। শুধু একটিমাত্র মেয়ের কারণে পুরো লবি আলো হয়ে আছে। মানুষের শরীর হলো তার মনের আয়না ।

একজন পবিত্র মানুষের পবিত্রতা তার শরীরে অবশ্যই পড়বে। সে হবে আলোর মতো। আলো যেমন চারপাশকে আলোকিত করে, একজন পবিত্র মানুষও তার চারপাশের মানুষদের আলোকিত করে তুলবে।

রূপা!

রূপা চমকে তাকাল। আমি হালকা গলায় বললাম, তুমি এখনো ক্লিনিকে, ব্যাপার কী ?

রূপা বিরক্ত মুখে বলল, তুমি কী যে ঝামেলা তৈরি করো। বসে না থেকে আমি করব কী ? মেয়েটার তো অবস্থা খুব খারাপ। আমি এসে দেখি এখন মারা যায়, এখন মারা যায় অবস্থা। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। এত বড় ক্লিনিক কিন্তু কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তার নেই– কিছু নেই..

তুমি ডাক্তার যোগাড়ে লেগে গেলে ?

এ ছাড়া কী করব ?

যোগাড় হয়েছে ?

হয়েছে— ডাক্তাররা একটা বোর্ডের মতো করেছেন। বোর্ড মিটিং বসিয়েছেন । মেয়েটাকে মনে হয় দেশের বাইরে নিতে হবে ।

আমি হাসলাম ।

রূপা রাগী গলায় বলর, হাসছ কেন ?

আচ্ছা যাও আর হাসব না। আজ যে পূর্ণিমা সেটা জানো ?

না জানি না। অমাবস্যা-পূর্ণিমার হিসাব আমি রাখি না।

পূর্ণিমায় তোমার সঙ্গে জয়দেবপুরের বাড়িতে যাবার কথা ছিল ভুলে গেছ ?

হ্যাঁ ভুলে গেছি। তোমার কোনো কথায় আমি কোনো গুরুত্ব দেই না। রাগ করলে ?

না রাগ করি নি।

তুমি কি সত্যি সত্যি জয়দেবপুর যেতে চাও ?
হু।
হু না স্পষ্ট করে বলো ।
যেতে চাই ।
মেয়েটাকে মরণের মুখোমুখি ফেলে রেখো তোমার সঙ্গে জোছনা দেখতে যাব ?
হ্যাঁ। কারণ তুমি এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না। তুমি ডাক্তার নও। তুমি যা করার করেছ। তারচেয়েও বড় কথা— মেয়েটা বেঁচে যাবে।
তোমার সেই বিখ্যাত ইনটুযশন বলছে মেয়েটা বেঁচে যাবে ?
হু ।
নিজেকে কী ভাবো তুমি ? মহাপুরুষ ?
আমি হাসলাম। রূপা ভুরু কুঁচকে বলল, তোমার বিখ্যাত ইনটুযশন আর কী বলছে ?
আমার বিখ্যাত ইনট্যুশন বলছে– তুমি আমার সঙ্গে আজ জোছনা দেখতে যাবে। চল আর দেরি করা ঠিক হবে না।
আমাকে বাসা হয়ে যেতে হবে । বাসায় বলতে হবে । কাপড় বদলাতে হবে। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি সুন্দর একটা কাপড় পরব না ?
যা তুমি পরে আছ তারচে’ সুন্দর আর কোনো পোশাক এ পৃথিবীতে তৈরি হয় নি। তাছাড়া— পথে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে থামব।
রূপা বিক্ষিত হয়ে বলল, পথে থামৰ মানে ? পথে কোথায় থামব ?
মিনিট দশেকের জন্যে থামব !
তুমি তাহলে সত্যি সত্যি যাচ্ছ আমার সঙ্গে ? আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ।
রূপা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মনে হয় সে কেঁদে ফেলেছে।

এগার

ইয়াকুব সাহেবের অবস্থা শোচনীয়। তার চোখ বন্ধ। হাত থরথর করে কপিছে। ঠোঁটে ফেনা জমছে। একজন নার্স ভেজা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিচ্ছে। নার্স মেয়েটি খুব ভয় পেয়েছে। তবে যে দুজন ডাক্তার উনার দুপাশে দাঁড়িয়ে তারা শান্ত। তাদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ নেই।
মিতু বাবার হাত ধরে বসে আছে। কী শান্ত, কী পবিত্র দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! আজ তার মাথায় উইগ নেই। এই প্রথম দেখলাম তার মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা। ছোট চুলের জন্য মিতুর চেহারায় কিশোর কিশোর ভাব চলে এসেছে। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। কোমল গলায় বলল, বাবা, হিমু এসেছেন। তাকাও, তাকিয়ে দেখ।
ইয়াকুব সাহেব অনেক কষ্টে তাকালেন। অস্পষ্ট গলায় বললেন, এনেছ ?
জি স্যার ।
তুমি নিশ্চিত যাকে এনেছ সে কোনো পাপ করে নি ?
জি নিশ্চিত ।

কোথায় সে ?
গাড়িতে বসে আছে।
গাড়িতে কেন ? নিয়ে আসো।
নিয়ে আসা যাবে না। নিয়ে আসার আগে আপনার সঙ্গে টার্মস এন্ড কন্ডিশানস সেটল করতে হবে ।
ইয়াকুব সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কিসের কথা বলছ ?
আমি শান্তস্বরে বললাম, স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে কী পবিত্র রক্ত যে পাত্রে ধারণ করবেন সেই পাত্রটাও পবিত্র হতে হবে। নয়তো এই রক্ত কাজ করবে না ।
আমাকে কী করতে হবে ?
আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, এই জীবনে আপনি যা কিছু সঞ্চয় করেছেন— বাড়ি-গাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সব দান করে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে। পৃথিবীতে আসার সময় যেমন নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলেন ঠিক সে রকম নিঃস্ব হবার পরই পবিত্র রক্ত আপনার শরীরে কাজ করবে। তার আগে নয়।
এসব তুমি কী বলছ ?
যা সত্যি তাই বলছি। স্যার আপনাকে চিন্তা করার সময় দিচ্ছি। আজ সারারাত ভাবুন। যদি মনে করেন হ্যা রক্ত আপনি নেবেন তাহলে উকিল ব্যারিস্টার ডেকে দলিল তৈরি করে আমাকে খবর দেবেন। আমি জয়দেবপুরে আপনার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করব। আমি ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।
ইয়াকুব সাহেব স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন । আমি তাকে অভয় দেয়ার মতো করে হাসলাম। শান্তস্বরে বললাম, আপনার জন্যে কঠিন কাজটা করা হয়েছে। পবিত্র মানুষ যোগাড় হয়েছে। আমার ধারণা বাকি কাজটা খুব সহজ ।
ইয়াকুব সাহেব এখনো আগের ভঙ্গিতেই তাকিয়ে আছেন। তার চোখে পলক পড়ছে না। অবিকল পলকহীন পাখিদের চোখ ।
স্যার, এখন আমি যাই ?
ইয়াকুব সাহেব কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে তার চিন্তার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মিতু বলল, আপনি যাবেন না। আপনি এখানে অপেক্ষা করবেন। আমি উকিল আনাচ্ছি। দলিল তৈরি হবে।
ইয়াকুব সাহেব বললেন, না। দরকার নেই।
মিতু বলল, তুমি চুপ করে থাক বাবা। যে খেলা তুমি শুরু করেছ, তোমাকেই তা শেষ করতে হবে । পবিত্র রক্তের ক্ষমতা আমি পরীক্ষা করব ।
না মিতু, না। আমি সবকিছু বিলিয়ে দেব ? এটা কোনো কথা হলো ?
আমার জন্যে তুমি কিছু চিন্তা করবে না। এই পৃথিবীতে আমার কোনো কিছুই চাইবার নেই। ডাক্তার সাহেব, আপনারা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ব্লাড ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করুন।
গাড়ি ছুটে চলেছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। রূপা জানালা খুলে রেখেছে। হু-হু করে গাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। রূপা গাড়ির জানালায় মুখ রেখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে ।
আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো— সে বোধহয় কাঁদছে।
আমি বললাম, রূপা তুমি কাঁদছ নাকি ?
রূপা বলল, হ্যাঁ।

কাঁদছ কেন ?

রূপা ফোপাতে ফুপাতে বলল, জানি না কেন কাঁদছি।

গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো জোছনা এসে পড়েছে রূপার কোলে। মনে হচ্ছে শাড়ির আঁচলে জোছনা বেঁধে রূপা যেন অনেক দূরের কোনো দেশে যাচ্ছে। এই সময় আমার মধ্যে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হলো- আমার মনে হলো রূপা নয়, আমার পাশে মিভূ বসে আছে। রূপা কাঁদছে না, কাঁদছে মিতু। জোছনার এই হলো সমস্যা— শুধু বিভ্রম তৈরি করে। কিংবা কে জানে এটা হয়তো বিভ্রম নয়। এটাই সত্যি। পৃথিবীর সব নারীই রূপা এবং সব
পুরুষই হিমু।

(সমাপ্ত)

একটি শুভম ক্রিয়েশন

এবং হিমু

হুমায়ূন আহমেদ

এবং হিমু ...
SUVOM
হুমায়ূন আহমেদ
SUVOM

এবং হিমু ...
SUVOM
হুমায়ূন আহমেদ
SUVOM

১

রাত একটা।

আমার জন্যে এমন কোনো রাত না- বলা যেতে পারে রজনীর শুরু। The night has only started. কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষগুলি আমার মতো না। রাত একটা তাদের কাছে অনেক রাত। বেশির ভাগ মানুষই শুয়ে পড়েছে। যাদের সামনে SSC, HSC বা এজাতীয় পরীক্ষা তারা বই সামনে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। নববিবাহিতদের কথা আলাদা- তারা জেগে আছে। একে অন্যকে নানান ভঙ্গিমায় অভিভূত করার চেষ্টা করছে।

আমি হাঁটছি। বলা যেতে পারে হনহন করে হাঁটছি। নিশিরাতে সবাই দ্রুত হাঁটে। শুধু পশুরা হাঁটে মন্থর পায়ে। তবে আমার হনহন করে হাঁটার পেছনে একটা কারণ আছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছু হোটেল-রেস্টুরেন্ট এখন খোলা। কড়কড়া ভাত, টকহয়ে-যাওয়া বিরিয়ানি হয়তো-বা পাওয়া যাবে। তবে খেতে হবে নগদ পয়সায় । নিশিরাতের খদ্দেরকে কোনো হোটেলওয়ালা বিনা পয়সায় খাওয়ায় না। আমার সমস্যা হচ্ছে, আমার গায়ে যে-পাঞ্জাবি তাতে কোনো পকেট নেই। পকেট নেই বলেই মানিব্যাগও নেই। পকেটহীন এই পাঞ্জাবি আমাকে রূপা কিনে দিয়েছে। খুব বাহারী জিনিশ। পিওর সিল্ক। খোলা গলা, গলার কাছে সূক্ষ্ম সূতার কাজ। সমস্যা একটাই – পকেট নেই। পাঞ্জাবির এই বিরাট ত্রুটির দিকে রূপার দৃষ্টি ফেরাতেই সে বলল, পকেটের তোমার দরকার কি!

রূপবতী মেয়েদের সব যুক্তিই আমার কাছে খুব কঠিন যুক্তি বলে মনে হয়। কাজেই আমিও বললাম, তাই তো, পকেটের দরকার কি!

রূপা বলল তুমি নিজেকে মহাপুরুষ টাইপের একজন ভাব। মহাপুরুষদের পোশাক হবে বাহুল্য বর্জিত। পকেট বাহুল্য ছাড়া কিছু না। আমি আবারো রূপার যুক্তি মেনে নিয়ে হাসিমুখে নতুন পাঞ্জাবি পরে বের হয়েছি – তারপর থেকে না খেয়ে আছি। যখন পকেটে টাকা থাকে তখন নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়। তারা চা খাওয়াতে চায়, সিঙ্গাড়া খাওয়াতে চায়। আজ যেহেতু পকেটই নেই, কাজেই এখন পর্যন্ত পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার শেষ ভরসা বড় ফুপার বাসা। রাত দেড়টার দিকে কলিংবেল টিপে তাদের ঘুম ভাঙালে কি নাটক হবে তা আগে-ভাগে বলা মুশকিল। বড় ফুপা তার বাড়িতে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হবেন এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। সম্ভাবনা শতকরা ষাট ভাগ যে, তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রীল খুলবেন না। গ্রীলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন — গেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের ভেতর ক্লিয়ার আউট হয়ে যাও, নয়ত বন্দুক বের করব।

বন্দুক বের করা তার কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তার বন্ধুমানুষ। তাকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং আঠারো হাজার টাকা দিয়ে টুটু বোরের রাইফেল কিনেছেন। সেই রাইফেল তার এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

বাকি থাকেন সুরমা ফুপু। সূর্যের চেয়ে বালি গরমের মত, বড় ফুপুর চেয়ে তিনি

বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা মেশিনগানের লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন।

তবে ভরসার কথা – আজ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারে বড় ফুপা খানিক মদ্যপান করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন, কিন্তু তার পাকস্থলী ইসলামীভাবাপন্ন বলে মদ সহ্য করে না। কিছুক্ষণ পর পর তার বমি হতে থাকে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি বলেন – I am a dead man. I am a dead man. E: ফুপু তাকে নিয়ে প্রায় সারারাতই ব্যস্ত থাকেন। এই অবস্থায় কলিংবেলের শব্দ শুনলে তারা কেউ দরজা খুলতে আসবেন না, আসবে বাদল। এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আর কোন সমস্যা হবার কথা না।

বড় ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসে টহল পুলিশের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তারা দলে চারজন। আগে দুজন দুজন করে টহলে বেরুত। ইদানীং বোধহয় দুজন করে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, চারজন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচে' বড় ক্রিমিন্যালকে পাওয়া গেছে। দলের একজন (সম্ভবত সবচে ভীতুজন, কারণ ভীতুরাই বেশি কথা বলে) চেঁচিয়ে বলল,

"কে যায়? পরিচয় ?"

আমি দাড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমি হিমু। আপনার কেমন আছেন, ভাল ?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষদের সমস্যা হচ্ছে, কুশল জিজ্ঞেস করলে এরা ভড়কে যায়। যে কোন ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কি ?

আমি আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললাম, আমার পকেটই নেই।

'ফাজলামি করছিস ? হারামজাদা! থাবড়া দিয়ে দাত ফেলে দেব।'

'দাঁত ফেলতে চান ফেলবেন। পুলিশ এবং ডেনটিস্ট এর দাঁত ফেলবে না তো কে ফেলবে। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন, সত্যিই পকেট নেই।

একজন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতাপিতা করে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গীদের একজনকে বলল, ওস্তাদ, আসলেই পকেট নাই।

যাকে ওস্তাদ বলা হয়েছে সে সম্ভবত দলের প্রধান এবং সবচে' জ্ঞানী। সে বলল, মেয়েছেলের পাঞ্জাবি। এই হারামজাদা মেয়েছেলের পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। মেয়েছেলের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, জ্বি চলুন। আপনারা কোন থানার আন্ডারে? রমনা থানা ?

পুলিশের দলটা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মত আগ্রহী কোন আসামী তারা বোধহয় খুব বেশি পায় না।

'কি নাম বললি ?'

'হিমু'।

'যাস কই ?'

'ভাত খেতে যাই।'

‘রাত দেড়টায় ভাত খেতে যাস ?’

‘ভাত সব সময় খাওয়া যায়।’

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। ড্রাগ-ফাগ খায় আর কি। দুটা থাবড়া দিয়ে চলে আসেন।

ওস্তাদেরও মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। বলে কিক মারার আনন্দ এবং গালে থাবড়া মারার আনন্দ প্রায় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে কেন ?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অন্ধকার দেখার মত থাবড়া। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। ওরে খাইছেরে বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, নয়ত খালে পড়ব। খালে পড়লে উপায় নাই, সাঁতার জানি না।

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চলে আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছেন ‘ওস্তাদ’। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবেন এটা কেমন কথা?

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে, যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই নিয়ম। পুলিশের দল যেন কিছু হয়নি এই ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছি। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্ত ক্রস করল। আমিও রাস্ত ক্রস করলাম।

‘এই, তুই চাস কি?’

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে দিন, বাসায় চলে যাই।

পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের অনুসরণ করছি। মানুষের ভয় চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে, এদেরও বাড়ছে। চারজন পুলিশ, দুজনের হাতে রাইফেল অথচ ওরা এখন আতংকে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি শিষ বাজানোর চেষ্টা করলাম – হচ্ছে না। ক্ষুধাত অবস্থায় শিষ বাজে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গান গাওয়া যায়, শিষ বাজানো যায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি – হিন্দী গানের একটা লাইন শিষে আমি ভালই আনতে পারি — হায় আপনা দিল তো আওয়ারা . . . আমার হৃদয় র্যাকুল হয়ে আছে . . .

শিষ দেবার কারণে ক্ষুধা একটু কম কম লাগছে। বড় ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফির মিলেঙ্গে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দুটির মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজকের রাতের টহল তাদের ভাল হবে না। আজ তারা ছায়া দেখে ভয় পাবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল – ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। কোন একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলব — ‘ভাত খাব’। সেই বলাটাও সমস্যা। আজ বোধহয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপ্পড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। বড় ফুপা তার ফর্সা ছোটখাট মুখ বের করে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আরে তুই ? হিমু? আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোন, হিমু এসেছে, হিমু।

সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই এক সঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি। গ্রীলের দরজা খুলতে খুলতে বড় ফুপা বললেন, কেমন আছিস রে হিমু?

'ভাল আছি।'

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো-উনিশ বছরের একজন তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তরুণী এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে মালিবাগে চলে এসেছি। ফুপ বললেন, হেন জায়গা নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নির্বিকার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামথিং ইজ রং, ভেরি রং । বাদল আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোন খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, যদি আমি কোন সন্ধান বের করে দিই – এই হবে। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার দ্বিতীয় কোন কারণ হতে পারে না। আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। শুধু আমি নিষিদ্ধ নই, আমার ছায়াও নিষিদ্ধ ।

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল কোথায়? বাদলকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে?

ফুপা-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

'অসুক-বিসুক?'

'না। হিমু তুই বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা খাবি?'

'চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে রান্না কি করেছেন ? লেফট ওভার নিশ্চয় ডীপ ফ্রীজে রেখে দিয়েছেন?'

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, আর রান্না-বান্না! দুদিন ধরে ঘরে হাড়ি চড়ছে না।

'ব্যাপারটা কি ?'

ফুপা গলা পরিস্কার করছেন। যেন অস্বস্তির কোন কথা বলতে যাচ্ছেন। ব্যাটারী চার্জ করে নিতে হচ্ছে।

'বুঝলি হিমু, আমাদের উপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কি, বাদল তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। ঐ বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে — গলায় কাঁটা ফুটেছে'।

'খাসির রেজালা খেয়ে গলায় কাঁটা ফুটবে কি? গলায় হার ফুটতে পারে'।

'কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙালী বিয়ের আয়োজন করেছে — মাছ ভাত, ডাল দৈ . . . ফাজিল আর কি, বেশি বেশি বাঙালী।'

'বাদলের গলার সেই কাঁটা এখন আর বেরুচ্ছে না ?'

'না'।

'ডাক্তার দেখাননি?'

'ডাক্তার দেখাব না! বলিস কি? হেন ডাক্তার নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম — হাঁ করিয়ে, চিমটা ঢুকিয়ে নানা কসরত করেছে। কাঁটা অনেক নিচে, চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দুদিন ধরে বাদল খাচ্ছে না, ঘুমুচ্ছে না। কি যে বিপদে পড়েছি!'

'বিপদ তো বটেই'।

‘কাঁটা তোলার একটা দোয়া আছে ‘নিয়ামুল কোরানে, ঐ দোয়াও তোর ফুপু এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়েছে। কিছুই বাদ নেই’।

‘বিড়ালের পায়ে ধরানো হয়েছে?’

তরুণী মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই শাড়ির আঁচল মুখে চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসবে না। গ্রামবাংলার মানুষ গত পাঁচশ বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছেই। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি একটা অবিচার করছি, সেই জন্যে বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা।

ফুপা থমথমে গলায় বললেন, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সেও এক কেলেংকারি। বিড়াল খামচি দিয়ে রক্ত-টক্ত বের করে বিশ্রী কাণ্ড করেছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

‘আমি ?’

‘হু। বাদলের ধারণা একমাত্র তুই-ই পারবি, আর কেউ পারবে না। তোর ফুপা ওকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জায়গা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দুটা দিন গেছে – ছেলে একটা-কিছু মুখে দেয়নি। আরো কয়েকদিন এরকম গেলে তো — মরে যাবে।’

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই বাদল ঘরে ঢুকল। চুল উসকু-খুসকু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কি রে?

বাদল ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম — ‘করুণ হাস্য’।

আমি বললাম, ‘কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত ?’

বাদল তার মুখ আরো করুণ করে ফেলল। আমি বললাম, বসে থাক, ব্যবস্থা করছি। গোসল-টোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নেই, তারপর তোর প্রবলেম ট্যাকল করছি।

বাদলের মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। তরুণী মেয়েটির ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। এ রকম অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই অন্যায় হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথরুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না?

‘গীজার নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, পানি গরম করে দিচ্ছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো?’

‘হু।'

‘তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দেই।’

‘ঘরে কি পোলাওয়ের চাল আছে?’

‘আছে।’

তাহলে চট করে পোলাওয়ের কিছু চাল চড়িয়ে দিন। আলু ভাজা করুন। কুচি কুচি করে আলু কেটে ডুবা-তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলু ভাজার সঙ্গে

এক চামচ গাওয়া ঘি — খেতে একসেলেন্ট হবে। গাওয়া ঘি আছে তো ?’

‘ঘি নেই।”

‘মাখন আছে?’

‘হু’।

অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে ফেলে দেবেন — এক্কেবারে এক নম্বর পাতে খাওয়া ঘি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনা মরিচ ভাজবেন — ঘিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।

‘বাদলের কাঁটাটার কিছু করা যায় কি-না দেখ’।

‘দেখব। সে দুদিন যখন অপেক্ষা করেছে আরো ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি না বাদল ?’

বাদল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছে কথা বলার মত অবস্থাও তার না।

আমি আরেকবার শিষ দিয়ে বাজালাম — হায় আপনা দিল......। তরুণী মেয়েটি আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন? ভাল না। সেই দৃষ্টিতে কৌতুহল আছে। শুদ্ধ কৌতুহল না, অশুদ্ধ কৌতুহল। মেয়েটি একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে – সে দৃশ্য হচ্ছে অতি চালাক একজন মানুষের গলায় দড়ি পড়ার মজাদার দৃশ্য । পুলিশদের মত এই মেয়েটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভাল লাগত, পারছি না। মেয়েরা পুলিশের মত এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি ?

‘ইরা।’

‘শোন ইরা, তোমার যদি কোন কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হৃদয়ে কাঁটা তাহলে আমাকে বল, তোমার কাঁটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।'

ইরা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

‘এত তাড়াতাড়ি তো পানি গরম হওয়ার কথা না।’

‘খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে। ঐ পানিই দেয়া হয়েছে’।

‘মেনি থ্যাংকস’।

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই বাদলকে ডাকলাম, বাদল খেতে আয় । বাদলের জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপা বললেন, ও তো ঢোঁকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কি? তুই তো ওর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম – বাদল আয়।

বাদল উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা সবার পক্ষেই সম্ভব। বাদলের পক্ষে না। আমি অন্য সবাইকে সরে যেতে বললাম। খাওয়ার সময় একগাদা লোক তাকিয়ে থাকলে খেয়ে আরাম পাই না। নিজেকে জামাই জামাই মনে হয়।

‘বাদল শোন, তোর পেটে খিদে, তুই খেয়ে যাবি। গলায় ব্যথা করবে – করুক। কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাত্তা দিবি না। কাঁটা থাকুক কাঁটার মত, তুই থাকবি তোর মত। বুঝতে পারছিস ?’

‘হু’।

‘আরাম করে তুই আমার সঙ্গে ভাত খাবি। ভাত খাওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। তারপর তোর কাঁটা নামানোর ব্যবস্থা করব।’

‘হিমু ভাই, আগে করলে হয় না!’

‘হয়। আগে করলেও হয় – তাতে কাঁটাটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে গুরুত্ব দেব – কাঁটাকে না। ঠিক না?’

‘ঠিক ?’

‘আয়, খাওয়া শুরু করা যাক’।

বাদল ভাত মাখছে। আমি বললাম, শুকনা মরিচ ভাল করে ডলে নে — ঝালের চোটে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে পানি বেরুবে, তবেই না খেয়ে আরাম। শুরু করা যাক – রেডি সেট গো . . .

বাদল খাওয়া শুরু করল। কয়েক নলা খেয়েই হতভম্ব গলায় বলল, হিমু ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে !

‘চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কি আছে? খাওয়া শেষ কর।’

‘ওদের খবরটা দিয়ে আসি ?’

‘এটা এমন কোন বড় খবর না যে মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলু ভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না?’

‘অমৃত ভাজির মত লাগছে’।

‘ঘি দিয়ে চপচপ করে খা, ভাল লাগবে।’

‘আজ তুমি না এলে মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি, হিমু ভাই-ই কেবল পারে এই কাটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না’।

‘মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তোর নিজের বিশ্বাসটাই প্রধান’।

‘ইরা তো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল।’

‘তাই না-কি?’

‘হ্যাঁ। আমি যখন বললাম, হিমু ভাই হচ্ছে মহাপুরুষ, তখন হাসতে হাসতে সে প্রায় বিষম খায়। আজ তার একটা শিক্ষা হবে।’

বাদলের চোখে পানি এসে গেছে। ঝালের কারণে চোখের পানি, না আনন্দের পানি সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

একেক ধরনের চোখের পানি একেক রকম হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের চোখের পানি হবে এক রকম, আনন্দের পানি অন্য রকম, আবার ঝালের অশ্রু আরেক রকম। প্রকৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগের ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু সব আবেগের প্রকাশ চোখের পানি দিয়ে সেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কি ঠিক হল?

দুঃখের চোখের পানি হবে নীল। দুঃখ যত বেশি হবে নীল রং হবে তত গাঢ়। রাগ এবং ক্রোধের অশ্রু হবে লাল। দুঃখ এবং রাগের মিলিত কারণে যে চোখের পানি তার রঙ হবে খয়েরি। নীল এবং লাল মিশে খয়েরি রঙই তো হয় ?

কাঁটা মুক্তির যে আনন্দ এ বাড়িতে শুরু হল তার কাছে বিয়েবাড়ির আনন্দ কিছু না। ফুপু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মরাকান্না শুরু করলেন। বাদল যতই বলে, কি যন্ত্রণা! মা, আমাকে ছাড় তো। তিনি ততই শক্ত করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফুপা আনন্দের চোটে তার হুইস্কির বোতল খুলেছেন। আজ বৃহস্পতিবার। এমিতেই তার মদ্যপান দিবস। ছেলের সমস্যার জন্যে খেতে পারছিলেন না। এখন ডবল চড়াবেন। ফুপা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সংস্কৃত কবিরা সেই দৃষ্টিকে বলেন “প্রেম-নয়ন”।

শুধু ইরার চোখ কঠিন। পাথরের চোখেও সামান্য তরল ভাব থাকে। তার চোখে

তাও নেই।

রাতে ফুপার বাড়িতে থেকে গেলাম। আজ আমার থাকার জায়গা হল গেস্ট রুমে। এই বাড়ির গেস্ট রুম তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গেস্ট এলেই শুধু তালা খোলা হয়। আজ আমি বিশেষ শ্রেণীর একজন গেস্ট। ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার জন্যে কফি চলে এল। এটিও বিশেষ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। কফি নিয়ে এল ইরা। ইরা সম্পর্কে এ পর্যন্ত তথ্য যা সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে – মেয়েটা শামসুন্নাহর হলে থেকে পড়ে। তার অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা। হলে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে, তাই এ বাড়িতে চলে এসেছে।

ফুপার খালাতে ভাইয়ের বড় মেয়ে। দারুণ নাকি ব্রিলিয়ান্ট। না পড়লেও না-কি ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হবে। তারপরেও পড়ছে, কারণ রেকর্ড মার্ক পেতে চায়।

ইরা কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ধারণা, আজ আপনি আপনার বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন ?

আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তোমার সে রকম ধারণা না?

'অবশ্যই না। বাদলের আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। আপনাকে দেখে সে রিলাক্সড বোধ করেছে। সহজ হয়েছে। ভয়ে-আতংকে তার গলার মাংসপেশী শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবও দূর হয়েছে। তারপর আপনি তাকে ভাত খাওয়ালেন। সহজেই কীটা বের হয়ে এল, আমি কি ভুল বলছি?'

'না, ভুল হবে কেন ?'

'নিতান্তই লৌকিক একটা ব্যাপার করে আপনি তাতে একটা অলৌকিক ফ্লেবার দিয়ে ফেলেছেন — এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমি কোন ফ্লেবার দেইনি ইরা, এটা তুমি কল্পনা করছ'।

'আপনি না দিলেও অন্যরা দিচ্ছে। বাদল দিচ্ছে। আপনার ফুপা-ফুপু দিচ্ছেন'।

'তাতে ক্ষতি তো হচ্ছে না। তোমার মত যারা বুদ্ধিমান তারা ঠিকই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছে।'

ইরা কঠিন গলায় বলল, আমাদের সমাজে কিছু কিছু প্রতারক আছে, যারা হাত দেখে, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে, পাথর দেয়, মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে – আপনি কি তাদের চেয়ে আলাদা? আপনি আলাদা না, আপনি তাদের মতই একজন।

'হতে পারে। কিন্তু তুমি আমার উপর এত রেগে আছ কেন?'

'আপনি যে শুরু থেকেই আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন – সেটাও আমার খারাপ লাগছে। আমি তো স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে না। আপনি আমাকে চেনেনও না। প্রথম দেখাতেই আপনি আমাকে তুমি বলবেন কেন?'

'ভুল হয়েছে। একবার যখন বলে ফেলেছি সেটাই বহাল রাখি। মানুষ আপনি থেকে তুমিতে যায়। তুমি থেকে আপনিতে যায় না। নিয়ম ভাঙা কি ঠিক হবে?'

'আমার বেলায় নিয়মটা ভাঙলেই আমি খুশি হব।'

'এখন থেকে আপনি করে বলব।'

'ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ কি দয়া করে করবেন ?'

'অবশ্যই করব। বলুন।'

'বাদলকে ডেকে একটু কি বুঝিয়ে বলবেন তার গলার কাঁটাটা কি ভাবে গেল? ওর মন থেকে আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি দূর করা দরকার। আপনি বুঝিয়ে বলে দিন। আমার বলায় সে কনভিনসড হবে না। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি।'

‘জ্বি আচ্ছা, নিয়ে আসুন।’

ইরা বাদলকে নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, বাদল, তুই স্থির হয়ে আমার সামনের চেয়ারটায় বোস। মিস ইরা, আপনিও বসুন। তবে আপনাকে স্থির হয়ে না বসলেও চলবে। আপনি ইচ্ছা করলে নড়াচড়া করতে পারেন।

ইরা তাকাচ্ছে তীব্র চোখে। আমি তার সেই চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল শোন, তুই যদি ভেবে থাকিস আমি আমার মহা ক্ষমতাবলে তোর গলার কাঁটা গলিয়ে ফেলেছি, তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। কি ভাবে সেই ঘটনা ঘটল তা ইরা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেবে। ব্যাখ্যা শুনে তারপর ঘুমুতে যাবি। তার আগে না। মনে থাকবে?

‘থাকবে।’

‘যা ভাগ।’

বাদল হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইরা এখনো তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে খুব অপমানিত বোধ করছে। মেয়েটা সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা মেয়ে ফিজিক্স পড়ছে কেন? ফিজিক্স পড়বে শুকনা রস কষহীন মেয়েগুলি। ইরার পড়া উচিত ইংরেজি কিংবা বাংলা সাহিত্য।

আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফোম বিছানো গদি – আরামের বিছানা। এত আরামের বিছানায় কি ঘুম আসবে?

‘হিমু জেগে আছিস ?’

ফুপার জড়ানো গলা। ইতিমধ্যেই তিনি উঁচু তারে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। ফুপাকে ঘরে ঢোকানো এখন বিপদজনক হবে। তিনি উঁচু থেকে উঁচুতে চড়তে থাকবেন, তারপর সেখান থেকে ধপাস করে নিচে নামবেন, বমি করে ঘর ভাসাবেন।

‘হিমু, হিমু !’

‘জ্বি !’

‘তোর সঙ্গে কিছু গল্প গুজব করা যাক – ম্যান টু ম্যান টক। তুই আজ ভালই ভেল্কি দেখালি। দরজা খোল। হিমু, হিমু।’

মাতাল দরজা খোলাতে চাইলে খুলিয়ে ছাড়বে। ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবে। কাজেই দরজা খুললাম। বড় ফুপা গ্লাস এবং বোতল হাতে ঢুকে পড়লেন।

‘তোর ফুপু ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব টেনশনে গেছে তো, এখন আরামে ঘুমুচ্ছে। আমি ভাবলাম 'কন্টক-মুক্তিটা' সেলিব্রেট করা যাক। কন্টকমুক্তি শব্দটা কেমন লাগছে?’

‘ভাল লাগছে।’

‘কন্টক মুক্তির ইংরেজী কি হবে? “Freedom from thorn?’

‘ফুপা আপনি দ্রুত চালাচ্ছেন। আমার মনে হয় এখন উচিত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া।’

‘তোর সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। গল্প করতে ভাল লাগছে। আমার ধারণা তোর উপর ইনজাসটিস করা হয়েছে। তোকে যে আমি বা তোর ফুপু দেখতে পারি না এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তোর অপরাধ কি ? আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভেবেছি। তোর নেগেটিভ দিকগুলি কি —

এক, তোর চাকরি বাকরি নেই। এটা কোন ব্যাপার না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক

আছে যাদের চাকরি নেই।

দুই, তুই পথে পথে ঘুরিস। এটা কোন অপরাধ হতে পারে না। এটা আপরাধ হলে পৃথিবীর সব পর্যটকরাই অপরাধী।

‘আর খাবেন না ফুপা।’

‘কথার মাঝখানে কথা বলিস না হিমু। আমি কি যেন বলছিলাম?’

‘পর্যটকদের সম্পকে কি যেন বলছিলেন।’

‘কোন পর্যটক ? হিউয়েন সাং ? হিউয়েন সাং এর কথা খামাখা বলব কেন?’

'আর না খেলে হয় না ফুপা ?’

‘হয়। হবে না কেন ? তবে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। হিউয়েন সাং-এর কথা কি বলছিলাম ?”

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।’

‘শোন হিমু, তুই লোক খারাপ না। এবং তোর ক্ষমতা আছে। বাদল যে তোর নাম বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, বাদলের কোন দোষ নেই। I Like You Himu.’

‘থ্যংক ইউ ফুপা।’

‘তোর একটাই অপরাধ তুই শুধু হাঁটিস। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়। হিউয়েন সাংওতো হেঁটেছে। এই দেখ আবার হিউয়েন সাং-এর কথা চলে এসেছে। বারবার এই নাক চ্যাপ্টা চাইনীজটার কথা কেন বলছি কিছুই বুঝতে পারছি না।’

ফুপা চোখ মুখ উল্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর হড়হড় শব্দ হতে লাগল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। ফুপা বিছানাতে বসেছিলেন। বিছানা এবং আমার শরীরের এক অংশ তিনি ভাসিয়ে ফেলেছেন। বিড় বিড় করে বলছেন, “I am a dead man, I am a dead man.”

২

বদরুল সাহেব আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন এতদিন ?

তার গলা মোটা, শরীর মোটা, বুদ্ধিও মোটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রশস্ত মানুষের অন্তরও প্রশস্ত হয়। বদরুল সাহেবের অন্তর প্রশস্ত, মনে মায়াভাব প্রবল। আমি ছ-সাত দিন ধরে মেসে আসছি না। কেউ হয়ত ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। আমাকে দেখে তিনি যে উল্লাসের ভঙ্গি করলেন সেই উল্লাসে কোন খাদ নেই।

'কোথায় ছিলেন রে ভাই ?’

আমি হাসলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি ইদানীং হেসে দেবার চেষ্টা করছি। একেক ধরনের প্রশ্নের উত্তরে একেক ধরনের হাসি। এখন যে হাসি হাসলাম তার অর্থ হচ্ছে — আশেপাশেই ছিলাম।

বদরুল সাহেব বললেন, গত বৃহস্পতিবারে মেসে ফিস্ট হল। বিরাট খাওয়াদাওয়া। পোলাও, খাসির রেজালা সালাদ। খাসির মাংস আমি নিজে কিনে এনেছিলাম। একটা আস্ত খাসি দেখিয়ে বললাম, হাফ আমাকে দাও, নো হাংকি-

পাংকি ।
'হাফ দিয়েছিল ?'
'দিবে না মানে ? মাংস কেটে আমার সামনে পিস করতে চায়। আমি বললাম, খবদার, আগে ওজন করে তারপর পিস করবে।'
'আগে পিস করলে অসুবিধা কি ?'
'আগে পিস করতে দিলে উপায় আছে ? ফস করে বাজে গোসত মিক্স করে ফেলবে। কিছু বুঝতেই পারবেন না। ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। খাসির গোশত কিনে নিয়ে রান্না করার পর খেতে গিয়ে বুঝবেন পাঠার গোশত। মিস্টার পাঁঠা।'
বদরুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা মেসের সিঁড়িতে, তিনি বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে আমার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢুকলেন। ফিস্টের ব্যাপারটা না বলে তিনি শান্তি পাবেন না। গোশত কেনা থেকে যে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্প শেষ হবে খাওয়া কিভাবে হল সেখানে। আমি ধৈর্য নিয়ে গম্প শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার যে কোন গল্পে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ। এত আনন্দের সঙ্গে তিনি খাওয়ার গলপ করেন যেন এই পৃথিবী সৃষ্টিই হয়েছে খাওয়ার জন্যে। খাওয়া ছাড়াও যে গল্প করার আরো বিষয় থাকতে পারে ভদ্রলোক তা জানেন না।
'খুব চর্বি হয়েছিল। গোশতের ভাজে ভজে চবি।'
'বাহ, ভাল তো।'
চর্বিদার গোশত রান্না করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। বাবুর্চি করে কি – যেহেতু চর্বি বেশি, তেল দেয় কম। এটা খুব ভুল। চর্বিদার গোশতে তেল লাগে বেশি।'
'জানতাম না তো !'
'অনেক ভাল ভাল বাবুর্চিই ব্যাপারটা জানে না। রান্না তো খুব সহজ ব্যাপার না। আমি নিজে বাবুর্চির পাশে বসে রান্না দেখিয়ে দিলাম।'
'খেতে কেমন হয়েছিল ?'
'আমি নিজের মুখে কি বলব – আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। চেখে দেখবেন।'
'রেখে দিয়েছেন মানে? বৃহস্পতিবার ফিস্ট হয়েছে, আজ হল শনিবার।'
'দুই বেলা গরম করেছি। নিজের হাতেই করেছি। অন্যের কাছে এইসব দিয়ে ভরসা পাওয়া যায় না। ঠিকমত জ্বাল দেবে না। মাংস টক হয়ে যাবে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।'
তিনি আনন্দিত মুখে গোশত আনতে গেলেন। আজ দিনটা মনে হয় ভালই যাবে। সকালে ভরপেট খেয়ে নিলে সারাদিন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বড় ফুপার বাসা থেকে ভোরবেলা বের হয়েছি। সবাই তখনো ঘুমে। কাজের মেয়েটা জেগে ছিল। সেই দরজা খুলে দিল। বেরিয়ে আসার সময় টুক করে এক কদমবুসি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি ?
সে নিচু স্বরে বলল, খাস দিলে আফনে এট্টু দোয়া করবেন ভাইজান। আমার মাইয়াটা বহুত দিন হইছে নিখোঁজ।
'বল কি ? কতদিন হয়েছে নিখোজ।'
'তা ধরেন গিয়া দুই বছর হইছে। এক বাড়িত কাম করত। এরা মাইর-ধইর করতো – একদিন বাড়ি থাইক্যা পালাইয়া গেছে। আর কোন খুঁইজ নাই।'
সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যাদের বাস তাদের আবেগ-টাবেগ বোধহয় কম থাকে। দুবছর ধরে মেয়ে নিখোঁজ এই সংবাদ সে দিচ্ছে সহজ গলায়। যেন তেমন কোন

বড় ব্যাপার না।

'নাম কি তোমার মেয়ের ?'

'লুৎফুন্নেসা। লুৎফা ডাকি।'

'বয়স কত ?'

'ছোট মাইয়া, সাত-আট বছর। ভাইজান, আফনে এট্টু চেষ্টা নিলে মেয়েটারে ফিরত পাই। মেয়ে ঢাকা শহরেই আছে।'

'জান কি করে ঢাকা শহরে আছে?'

'আয়না পড়া দিয়া জানছি। ধনখালির পীর সাব আয়না পড়া দিয়া পাইছে। অখন আফনে একটু চেষ্টা নিলে . . . '

'আচ্ছা দেখি।'

সে আবার একটা কদমবুসি করে ফেলল।

সকালের শুরুটা হল কদমবুসির মাধ্যমে। শুরু হিসেবে মন্দ না। সাধু-সন্ন্যাসীর স্তরে পৌঁছে যাচ্ছি কি-না বুঝতে পারছি না। সাধু-সন্ন্যাসীরা পায়ের পবিত্র ধূলি বিতরণের মাধ্যমে সকাল শুরু করেন। তারপরের অংশে ভুরি ভোজন, ঘি, হালুয়া, পরোটা মাংস।

বদরুল সাহেব তার বিখ্যাত খাসির গোশতের বাটি নিয়ে এসেছেন। গোশত বলে সেখানে কিছু নেই। জ্বালের চোটে সব গোশত গলে কালো রঙের ঘন সুপের মত একটা বস্তু তৈরি হয়েছে। চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। তবে বদরুল সাহেবের বিবেচনা আছে। তিনি সঙ্গে চায়ের চামচ এনেছেন। আমি সেই চামচে তরল খাসির মাংস এক চুমুক মুখে দিয়ে বললাম, অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কাছাকাছি।

বদরুল সাহেব উজ্জ্বল মুখ করে বললেন, বাসি হওয়ায় টেস্ট আরো খুলেছে, তাই না? গোছতের ঐ মজা যত বাসি তত মজা। টেস্ট খুলেছে না?

'খুলেছে বললে কম বলা হয়। একেবারে ডানা মেলে দিয়েছে।'

'গরম গরম পরোটা দিয়ে খেলে আরো আরাম পেতেন। আপনি একটু ওয়েট করুন, আমি দৌড় দিয়ে দুটা পরোটা নিয়ে আসি। সাড়ে ছটা বাজে, মোবারকের স্টলে পরোটা ভাজা শুরু করেছে।'

'পরোটা আনার কোন দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন তো। বরং এক কাজ করুন, আরেকটা চামচ নিয়ে আসুন, দু'জনে মিলে মজা করে খাই।'

'না না, অল্পই আছে।'

'নিয়ে আসুন তো চামচ। ভাল জিনিস একা খেয়ে আরাম নেই।'

'এটা একটা সত্য কথা বলেছেন।'

বদরুল সাহেব চামচ আনতে গেলেন। ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া লাগছে। গত দুমাস ধরে তার কোন চাকরি নেই। ইনসুরেন্স কোম্পানীতে ভাল চাকরি করতেন। ইন্সপেক্টর জাতীয় কিছু। কোম্পানী তারা তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এই বয়সের একজন মানুষের চাকরি চলে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করা কঠিন। ভদ্রলোক কিছু জোগাড় করতে পারছেন না। মেসের ভাড়া তিন মাস বাকি পড়েছে। যতদূর জানি, মেসের খাওয়াও তার বন্ধ। ফিস্টে তার নাম থাকার কথা না, বাজার-টাজার করে দিয়েছেন, রান্নার সময় কাছে থেকেছেন এই বিশেষ কারণে হয়ত তার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

চামচ নিয়ে এসে বদরুল সাহেব আরাম করে খাচ্ছেন। তাকে দেখে এই মুহূর্তে মনে করার কোন কারণ নেই যে, পৃথিবীতে নানান ধরনের দুঃখ-কষ্ট আছে। যুদ্ধ চলছে বসনিয়ায়। রুয়ান্ডায় অকারণে একজন আরেকজনকে মারছে। তার নিজের সমস্যাও নিশ্চয়ই অনেক। দু'মাস বাড়িতে মনিঅর্ডার যায়নি। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আতংকে অস্থির হচ্ছে। ভদ্রলোক নির্বিকার।'

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'হাড়গুলি চুষে চুষে খান, মজা পাবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Nearer the bone, sweeter is the meat.'

আমি একটা হাড় মুখে ফেলে চুষতে লাগলাম।

তিনিও একটা মুখে নিলেন। আনন্দে তার চোখ প্রায় বন্ধ।

'বদরুল সাহেব ?'

'জ্বি।'

চাকরি-বাকরির কিছু হল?'

'এখনো হয়নি, তবে ইনশাআল্লাহ হবে। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। এদের বলেছি — এরা আশা দিয়েছে।'

'শুধু আশার উপর ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

আমার খুব ক্লোজ একজনকে বলেছি। ইস্টার্ন গার্মেন্টস-এর মালিক। ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। এখন রমরমা অবস্থা। গাড়ি-টাড়ি কিনে হুলস্থূল। বাড়ি করেছে গুলশানে।'

'তিনি কি আশা দিয়েছেন?'

'পরে যোগাযোগ করতে বলেছে। সেদিনই সে হংকং যাচ্ছিল। দারুণ ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। এর মধ্যেই সে পেস্ট্রি কোক খাইয়েছে। পূর্বাণীর পেস্ট্রি, স্বাদই অন্য রকম। মাখনের মত মোলায়েম। মুখের মধ্যেই গলে যায়। চাবাতে হয় না।'

'আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?'

'বললাম না স্কুল-জীবনের বন্ধু। নাম হল গিয়ে আপনার ইয়াকুব। স্কুলে সবাই ডাকত – বেকুব।'

'আসলেই বেকুব?'

'তখন তো বেকুবের মতই ছিল। তবে স্কুল-জীবনের স্বভাব-চরিত্র দেখে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের ফাস্ট বয় ছিল রশিদ। আরে সর্বনাশ, কি ছাত্র ! অংকে কোন দিন ১০০-র নিচে পায় নাই। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় এক্সট্রা ভুল করেছে। সাত নাম্বার কাটা গেছে। কাঁদতে কাদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। সেই রশিদের সঙ্গে একুশ বছর পর দেখা। গাল-টাল ভেঙে, চুল পেকে কি অবস্থা ! চশমার একটা ডাণ্ডা ভাঙা, সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বেধে রেখেছে। দেখে মনটা খারাপ হল।'

'অংকে একশ পাওয়া ছেলের এই অবস্থা, মন খারাপ হবারই কথা। অংকে টেনে টুনে পাশ করলে কানে সূতা বেঁধে চশমা পরতে হত না।'

'কারেক্ট বলেছেন। একুশ বছর পর দেখা — কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবে, ছেলেমেয়ে কতবড় এইসব জিজ্ঞেস করবে – তা না, ফট করে একশ' টাকা ধার চাইল।'

'ধার দিয়েছেন ?'

'কুড়ি টাকা পকেটে ছিল, তা-ই দিলাম। খুশি হয়ে নিয়েছে।'

'মেসের ঠিকানা দেননি তো? মেসের ঠিকানা দিয়ে থাকলে মহা বিপদে পড়বেন। দুদিন পরে পরে টাকার জন্যে বসে থাকবে। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে।'

বদরুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, স্কুল-জীবনের বন্ধু তো – দুরবস্থা দেখে মনটা এত খারাপ হয়েছে, আমার নিজের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সুতা দিয়ে কানের সাথে চশমা বাধা —

বদরুল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তার নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে বন্ধুর ভবিষ্যতের চিন্তায় তাকে বেশি কাতর বলে মনে হল।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ভাল একটা নাশতা হয়ে গেল, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যে কষ্ট করে আমার অংশটা জমা করে রেখেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আরে ছিঃ ছিঃ ! এটা একটা ধন্যবাদের বিষয় হল? এতদিন পর ফিস্ট হচ্ছে আপনি বাদ পড়বেন এটা কেমন কথা? তাছাড়া আপনি যেদিন মেসে খান না সেদিনের খাওয়াটা আমি খেয়ে ফেলি।'

'ভাল করেন। অবশ্যই খেয়ে ফেলবেন। দেশে টাকা পাঠিয়েছেন?'

'গত মাসে পাঠিয়েছি। এই মাস বাদ পড়ে গেল। তবে সমস্যা হবে না, আমার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা — সে ব্যবস্থা করে ফেলবে।'

'আপনার চাকরি যে নেই সেই খবর স্ত্রীকে জানিয়েছেন?'

'জ্বি-না। আপনার ভাবী মনটা খারাপ করবে। কি দরকার! চাকরি তো পাচ্ছিই, মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে টেনশনে ফেলে লাভ কি? আজই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করব। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না – "শুভস্য শীঘ্রম"। চা খাবেন হিমু ভাই?'

'জ্বি-না। দরজা-টরজা বন্ধ করে লম্বা ঘুম দেব। আমার স্বভাব হয়ে গেছে বাদুরের মত। দিনে ঘুমাই রাতে জেগে থাকি।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভাই সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর নষ্ট হলে – মন নষ্ট হয়। আমার শরীরটা ঠিক আছে বলেই এত বিপদে-আপদেও মনটা ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক রাখবেন।'

'আমার আবার উল্টা নিয়ম। মনটাকে ঠিক রাখি যাতে শরীর ঠিক থাকে।'

বদরুল সাহেব বাটি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাড়ালেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন হিমু ভাই !

'জ্বি, বলুন।'

'মেসের ম্যানেজার আমাকে বলেছে সোমবারের মধ্যে মেস ছেড়ে দিতে। আজেবাজে সব কথা। গালাগালি। আপনি যদি একটু বলে দেন! ও আপনাকে মানে!'

'আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।'

'তাকে বললাম যে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুবকে বলেছি। এত বড় গার্মেন্টস-এর মালিক। চাকরি তার কাছে কিছুই না। সে একটা নিঃশ্বাস ফেললে দশটা লোকের এমপ্লয়মেন্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস করে না। আপনি বললে বিশ্বাস করবে।'

আমাদের ম্যানাজারের নাম হায়দার আলি খাঁ। নামের সঙ্গে তার চেহারার কোন

সঙ্গতি নেই। রোগা, বেটে একজন মানুষ। বেটেরা সচরাচর কুঁজো হয় না। তিনি খানিকটা কুঁজো। ব্যক্তিবিশেষের সামনে তার কুঁজোভাব প্রবল হয়। আমি সেই ব্যক্তিবিশেষের একজন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই আমাকে ভয় পান।

হায়দার আলি খাঁ চেয়ারে গুটিমুটি মেরে বসে আছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে। ঐ লোককে আমি কখনো চায়ের কাপে করে চা খেতে দেখিনি। আমি কাছে এসে হাসিমুখে বললাম, ভাই সাহেব, খবর কি?

ভদ্রলোক যেভাবে চমকালেন তাতে মনে হল, সাত রেক্টার স্কেলের একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পিরিচের সব চা তার জামায় পড়ে গেল। আমি বললাম, করছেন কি ?

'চা খাচ্ছি স্যার।'

'খুব ভাল। বেশি বেশি করে চা খান। রিসার্চ করে নতুন বের করেছে – দৈনিক যে সাত কাপ চা খায় তার হার্টের আর্টারি কখনো ব্লক হয় না।'

'থ্যাংক যু, স্যার।'

যেভাবে তিনি থ্যাংক য়ু বললেন তাতে ধারণ হতে পারে হার্টের আর্টারি সংক্রান্ত রিসার্চটা আমার করা। আমি অবসর সময়ে মেসের ঘরের দরজা বন্ধ করে রিসার্চ করেছি।

'বদরুল সাহেবকে নাকি নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন – কথা কি সত্যি ?'

'জ্বি। তিন মাসের রেন্ট বাকি। আর নানান যন্ত্রণা করে। বোর্ডাররা নালিশ করেছে।'

'কি যন্ত্রণা করেছে?'

'রান্নার সময় বাবুর্চির পাশে বসে থাকে। ফিস্ট হয়েছে, ত্রিশ টাকা করে চাদা। একটা পয়সা দেয় নাই – ফিস্ট খেয়ে বসে আছে।'

'চাদা না দিলেও খাটাখাটনি তো করেছে। গোশত কিনে আনা, খাসির গোশত যেকেউ কিনতে পারে না। খুবই জটিল ব্যাপার। খাসি ভেবে কিনে এনে রান্নার পর প্রকাশ পায় পাঁঠা।'

হায়দার আলি খাঁ তাকাচ্ছেন। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারছেন না। কি বলবেন তাও গুছিয়ে উঠতে পারছেন না।

'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'বদরুল সাহেবকে আর কিছু বলবেন না।'

'তিন মাসের রেন্ট বাকি পড়ে গেছে। অন্য পার্টিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। মানুষের কথার একটা দাম আছে। ঠিক না স্যার?'

'ঠিক তো বটেই। কথার দাম আগে যা ছিল মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই দাম আরো বেড়েছে। তবু একটা ব্যবস্থা করুন। এক মাসের মধ্যে সব পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'কিভাবে হবে? শুনেছি উনি ছাঁটাই হয়ে গেছেন। অফিসের পাওনা টাকাপয়সাও দিচ্ছে না। টাকাপয়সার কি ন-কি গণ্ডগোল আছে।'

'গণ্ডগোল তো থাকবেই। পৃথিবীতে বাস করবেন আর গণ্ডগোলে পড়বেন না, তা তে হয় না। এই গণ্ডগোল নিয়েই বাস করতে হবে। উপায় কি ? মনে থাকবে তো কি বললাম?'

'জি স্যার।'

আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ম্যানেজার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জ্বি স্যার বলেছে বলেই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। বিনয়ের বাড়াবাড়িটাই সন্দেহজনক। আমার নিজের ধারণা বিনয় ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি উঠে গেলে পৃথিবীতে বাস করা সহজ হত। বিনয়ের কারণে সত্য-মিথ্যা প্রভেদ করা সমস্যা হয়। মিথ্যার সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে দিলে সেই মিথ্যা ধরার কারো সাধ্য থাকে না।

ঘুমের চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। বেশ কয়েকদিন থেকে নিদ্রা এবং জাগরণের সাইকেলটা বদলাবার চেষ্টা করছি। রাত ঘুমের জন্যে এবং দিন জেগে থাকার জন্যে, এই নিয়ম ভাঙা দরকার। মানুষ ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সূর্য নিয়ন্ত্রণ করবে না। সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। মানুষের মত অসাধারণ মেধার প্রাণীগোষ্ঠিকে নিয়ন্ত্রণ করার তার কোন অধিকার নেই।

টানা ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়। এই সময় মেসটা ফাকা ফাঁকা থাকে। বেশির ভাগই চা-নাশতা খেতে বাইরে যায়। মেসে শুধু একবেলা খাবার ব্যবস্থা, রাতে। এক কাপ চ খেতে হলেও রাস্ত পার হয়ে স্টলে যেতে হবে। ইদানীং অবশ্যি নতুন এক চাওয়ালা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এরা বিশাল ফ্লাস্কে করে চা ফেরি করে। চায়ের দাম ফিক্সড – এক টাকা কাপ। চিনি বা দুধের দাম বাড়লে কাপের সাইজ ছোট হয় কিন্তু চায়ের দামের হের-ফের হয় না। আমাদের এখানে যে ছেলে চা বিক্রি করে তার নাম মতি। দেখতে রাজপুত্রের মত, আসলে ভিখিরিপুত্র।

বারাদায় এসে মতিকে খুঁজলাম। মতি এখনো আসেনি, তবে অপরিচিতি এক ভদ্রলোক এসেছেন। শুকনো মুখে টুলে বসে আছেন। ভদ্রলোক অপরিচিত হলেও দেখামাত্র চিনলাম – কারণ তার চশমার একটা ডাঁট ভাঙা সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাধা। ভদ্রলোক সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, কি ভাই, ভাল আছেন ?

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

'বদরুল সাহেবের কাছে এসেছেন, তাই তো ?'

'জ্বি স্যার ?'

'টাকা ধারের জন্যে ?'

ভদ্রলোকে খানিকট বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। চট করে কিছু বলতে পারছেন না। আবার খুব চেষ্টা করছেন কিছু বলতে।

আমি বললাম, বদরুল সাহেব আমাকে আপনার কথা বলেছেন। খুবই প্রশংসা করছিলেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা এক্সট্রা না-কি ভুল হয়েছিল। তাড়াহুড়া করেছিলেন নিশ্চয়ই। অনেক সময় ওভার কনফিডেন্সেও সমস্যা হয়। যাই হোক, কেমন আছেন বলুন।

'জ্বি ভাল। বদরুল কখন আসবে?'

'উনি আসবেন কোত্থেকে ?'

'এখানে থাকেন না ?'

'আগে থাকতেন। মেসে অনেক বাকি পড়ে গেছে। চারদিকে ধার-দেনা। পালিয়ে গেছেন।'

'নিচের ম্যানেজার সাহেব আমাকে বললেন, মেসেই থাকে।'

'ম্যানেজার তাই বলেছে? সে রকমই বলার কথা। সেও জানে না। জানলে

জিনিসপত্র ক্রোক করে রেখে দিত। চুপি চুপি পালিয়েছে। শুধু আমি জানি। আপনাকে বললাম, কারণ আপনি তার ক্লোজ ফ্রেন্ড। ছাত্র জীবনের বন্ধু। অংকে সব সময় হাই মার্ক পেয়েছেন।'

'বদরুল থাকে কোথায় ?'

'সেটাও বলা নিষেধ। যাই হোক, আপনাকে বলছি। দয়া করে খবরটা গোপন রাখবেন । উনি টেকনাফের দিকে চলে গেছেন।'

'কোন দিকে গেছে বললেন?'

'টেকনাফের দিকে। চিটাগাং হিল ট্রেক্ট। তার দূর সম্পর্কের এক মামা আছেন, বন বিভাগে চাকরি করেন, তার কাছে গেছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা যেন কি?'

'আবদুর রশীদ।'

'শুনুন আবদুর রশীদ সাহেব। উনার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখানে উনার খোঁজে আসাও অর্থহীন। চলে যান।'

'চলে যাব?'

'আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি, শুধু চা। খাবেন?'

আবদুর রশীদ হ্যা-না কিছুই বলল না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি আশাহত। আমি ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। চা খাওয়ালাম, সিঙ্গাড়া খাওয়ালাম। এইখানেই শেষ করলাম না, রাস্তার পাশে ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে চশমার ডাঁট লাগিয়ে দিলাম। আমার সর্বমোট ১৩ টাকা খরচ হল।

ভদ্রলোক বললেন, ভাই সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন। আপন ভেবে বলছি।

'বলুন, কিছু মনে করব না।'

'কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি অতি মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তি। আপনাকে বিব্রত করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে . . . '

'মাথা কাটা যাওয়ার কিছু নেই, আপনি বলুন।'

‘দারুণ এক সংকটে পড়েছি ভাই সাহেব। আত্মহত্যা ছাড়া এখন আর পথ দেখছি না।’

‘ছেলে অসুস্থ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না?’

‘ধরেছেন ঠিকই। তবে ছেলে না, মেয়ে। কনিষ্ঠা কন্যা। সকাল থেকে হাঁপানির মত হচ্ছে। ডাক্তার ইনজেকশনের কথা বলল —’

‘দাম কত ইনজেকশনের ?’

‘শখানেক টাকা হলে হয়। ইনজেকশন, সেই সঙ্গে কি ট্যাবলেট যেন দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, চিকিৎসা করার টাকা কোথায়? তুমি বরং গলা টিপে মেরে ফেল।’

‘উনি গলা টিপে মারতে রাজি হচ্ছেন না ?’

আবদুর রশীদ আমার এই কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, এইসব কঠিন কাজ স্ত্রীলোক দিয়ে হবে না। এইসব হল পুরুষের কাজ। গলা টিপে মারতে হলে আপনাকেই মারতে হবে।

‘ভাই সাহেব, ঠাট্টা করছেন ?’

'না, ঠাট্টা করছি না। মৃত্যু কোন ঠাট্ট্রা-তামাশার বিষয় না। আমি আপনাকে একশ' টাকা দেব।’

‘দিবেন? সত্যি দিবেন ?’

‘অবশ্যই দেব। স্কুল-জীবনে আপনি অংকে খুব ভাল ছিলেন, তাই না? কেমন ভাল ছিলেন প্রমাণ দিন দেখি। সহজ একটা অংক জিজ্ঞেস করব। কারেক্ট উত্তর দেবেন — একশ' টাকা নিয়ে চলে যাবেন।’

আবদুর রশীদ ক্ষীণ স্বরে বলল, কি অংক ?

‘একটা বাড়িতে চারটা হারিকেন জ্বলছিল। গভীর রাতে কথা নেই বার্তা নেই শুরু হল ঝড়। একটা হারিকেন গেল নিভে। এখন আপনি বলুন ঐ বাড়িতে হারিকেন এখন কয়টা ?’

‘তিনটা।’

‘আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হয়নি। একটা হারিকেন নিভে গেছে ঠিকই। হারিকেনের সংখ্যা তো কমেনি। হারিকেন চারটাই আছে। আপনি তো ভাই অংক শিখতে পারেননি। টাকাটা দিতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।’

‘আবদুর রশীদ দাড়িয়ে আছে — আমি হাঁটা ধরেছি। মেসে ফিরে যাব। সারাদিন কিছু না খাওয়াতে খিদেয় নাড়িভূড়ি পাক দিচ্ছে। মেসে রান্না হয়েছে কি-না খোঁজ নিতে হবে। মেসের ভাত সকাল সকাল নেমে যায়। ভাত নেমে গেলে একটা ডিম ভেজে দিতে বলব। আগুন-গরম ভাত ডিমভাজা দিয়ে খেতে অতি উপাদেয়। তবে খেতে হয় চুলা থেকে ভাত নামার সঙ্গে সঙ্গে, দেরি করা যায় না।

ঘর থেকে বেরুবার জন্যে রাত বারোটা খুব ভাল সময়। জিরো-আওয়ার। কাউন্ট আপ শুরু হয় জিরো আওয়ার থেকে — 0, 1, 2, 3 . . . ঠিক রাত বারোটায় কি বার হবে ? শনিবার নয়, রবিবারও নয়। জিরো আওয়ারে বার থেমে থাকে।

দরজা তালাবন্ধ করে বেরুচ্ছি, দেখি বদরুল সাহেব। কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরছেন। মুখ ভেজা, কাধে গামছা। রাত বারোটায় আমার মন-টন খুব ভাল থাকে। কাজেই আমি উল্লাসের সঙ্গেই বললাম, কি খবর বদরুল সাহেব !

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

‘কোথায় ছিলেন আজ সারাদিন ?’
তিনি আবার হাসলেন। আমি বললাম, গিয়েছিলেন নাকি ইয়াকুব আলির কাছে?
‘জ্বি ।’
‘দেখা হয়নি?’
'দেখা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত।’
‘কথা হয়নি?’
‘হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা বললাম।’
‘আগেও তো বলেছিলেন। আবার কেন?’
‘ভুলে গিয়েছে। নানান কাজকর্ম নিয়ে থাকে তো। আজকে তার আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তার মনটা ছিল খারাপ।’
‘কি দুর্ঘটনা?’
‘একুশ লাখ টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ির হেডলাইট ভেঙে ফেলেছে। কেয়ারলেস ড্রাইভার। ঐ নিয়ে নানান হৈ-চৈ, ধমকাধমকি চলছে, তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম।’
‘আপনি ধমক খেয়েছেন ?’
‘জি-না, আমি ধমক খাব কেন? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড। গাড়ির হেডলাইট ভাঙার কারণে ইয়াকুবের মন খারাপ দেখে আমারো মন খারাপ হল। এর মধ্যে চাকরির কথাটা তুলে ভুল করেছি।’
‘ইয়াকুব সাহেব রেগে গেছেন?’
‘তা ঠিক না। বলল বায়োডটা তার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যেতে। দুটা পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ বায়োডাটা, সে দেখবে।’
‘দেখবে বলেছে?’
‘দেখবে তো বটেই। স্কুল-জীবনের বন্ধু, ফেলবে কি করে? বায়োডাটা নিয়েই সারাদিন ছোটাছুটি করলাম। একদিনের মধ্যে ছবি তুলে, বায়োডটা টাইপ করে, পাঁচটার সময় একেবারে ইয়াকুবের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি।
‘ইয়াকুব সাহেব আপনার কর্মতৎপরতা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন।’
বদরুল চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, খুশি হননি?
‘জ্বি-না। একটু মনে হয় বেজার হয়েছে; সেক্রেটারির হাতে দিতে বলেছে, আমি তা না করে তার হাতেই দিলাম — এতে সামান্য বিরক্ত। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন চালায়। তার তো একটা সিস্টেম আছে। হুট করে হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলে হবে না। ভুলটা আমার।’
‘বদরুল সাহেব, আপনার কি ধারণা ইয়াকুব আলি আপনাকে চাকরি দেবেন?’
‘অবশ্যই। আমার সামনেই সেক্রেটারিকে ডেকে বায়োডাটা দিয়ে দিল। বলল উপরে আর্জেন্ট লিখে ফাইলে রাখতে।’
‘কবে নাগাদ চাকরি হবে বলে মনে করছেন?’
‘খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। ইয়াকুব আমাকে এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিতে বলেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। স্বপ্নেও তা-ই দেখলাম।’
‘এর মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন?’
‘জ্বি। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, একটু রেস্ট নেই। ইয়াকুবের পি. এ. বলল, বসুন, চা খান। চা খাওয়ার

জন্যে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনির মত এসে গেল। তখন স্বপ্নটা দেখেছি। দেখলাম কি — ইয়াকুব এসেছে। তার হাতে বিরাট এক মৃগেল মাছ। এইমাত্র ধরা হয়েছে। ছটফট করছে। ইয়াকুব বলল, নিজের পুকুরের মাছ। তোর জন্যে আনলাম। নিয়ে যা। মাছ স্বপ্নে দেখা খুবই ভাল। হিমু ভাই, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'হাঁটতে যাচ্ছি।'

'রাতদুপুরে কেউ হাঁটতে যায়? আশ্চর্য! দুপুর রাতে হাঁটার মধ্যে আছে কি?'

'চলুন, আমার সঙ্গে হেঁটে দেখুন।'

'যেতে বলছেন ?'

'এক রাতে একটু অনিয়ম করলে কিছু হবে না।'

'খুবই টায়ার্ড লাগছে হিমু ভাই। ভাবছি ঘুমুব।'

'ঘুম তো আপনার আসবে না। খিদে পেটে শুয়ে ছটফট করবেন। এরচে' চলুন কোথাও নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাইয়ে আনি। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাননি।'

'সারাদিন খাইনি কি করে বুঝলেন?'

'বোঝা যায়। মানুষের সব খবর তার চোখে লেখা থাকে। ইচ্ছে করলেই সেই লেখা পড়া যায়। কেউ ইচ্ছে করে না বলে পড়তে পারে না।'

'আপনি পারেন ?'

'মাঝে মাঝে পারি। সব সময় পারি না। আপনি যে সারাদিন খাননি এটা আপনার চোখে পড়তে পারছি। এই সঙ্গে আরেকটা জিনিশ পড়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আজ দিনটা আপনার জন্যে খুব আনন্দের।'

বদরুল সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। হতভম্ব ভাব কাটার পর বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ আমার বিবাহ বার্ষিকী। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মনে হয়েছে — আরে আজ তো ২৫শে এপ্রিল।

'চলুন, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিয়ের দিনের গল্প করবেন। অনেকদিন কারো বিয়ের গল্প শুনি না।'

বদরুল সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, কলার মত কোন গল্প না।

'সব গল্পই বলার মত।'

রাস্তায় নেমেই বদরুল সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, হাঁটতে তো ভালই লাগছে। রাস্তাগুলি অন্য রকম লাগছে। আশ্চর্য তো ! ব্যাপারটা কি ?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করলাম না। রাতের বেলা রাস্তার চরিত্র বদলে যায় কেন সেই ব্যাখ্যা একেক জনের কাছে একেক রকম। আমার ব্যাখ্যা আমার কাছেই থাকুক।

বদরুল সাহেব বললেন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা কোথায় যাব?

আমি বললাম, মাথায় কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে হাঁটার কোন আরাম থাকে না। হাঁটতে হবে এলোমেলোভাবে। বলুন কিভাবে আপনাদের বিয়ে হল।

মুন্সিগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার শ্বশুরবাড়িতে। ওদের একান্নবর্তী পরিবার। লোকজন গিজ গিজ করছে। কে কখন খায় কোন ঠিক নেই। খাওয়া-দাওয়ার ভেতরে কোন যত্ন নেই। খেলে খাও, না খেলে খেও না ওই রকম ভাব। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন? ভাল একটা পদ হয়ত রান্না হচ্ছে, এদিকে বেশির ভাগ মানুষ খেয়ে উঠে গেছে। কেউ জানেই না – মূল পদ এখনো রান্না হয় নি . . .

বদরুল সাহেব তার বিয়ের গল্পের জায়গায় খাওয়ার গল্প ফেঁদে বসেছেন। এই

খাওয়া-দাওয়ার ভেতর থেকে বিয়ের গল্প হয়ত শুরু হবে, কখন হবে কে জানে। ভদ্রলোকের সম্ভবত খিদেও পেয়েছে। খিদের সময় শুধু খাবার কথাই মনে পড়ে। তাকে খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না। আবারে পকেটবিহীন পাঞ্জাবি নিয়ে বের হয়েছি। এই পাঞ্জাবি মনে হয় আর ব্যবহার করা যাবে না। বদরুল সাহেব গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন – সেদিন কি হয়েছে শুনুন। পাবদা মাছ এসেছে। এক খলুই মাছ, প্রত্যেকটা দেড় বিঘৎ সাইজ। এ বাড়িতে আবার অল্প কিছু আসে না। যা আসে ঝুড়ি ভর্তি আসে......

আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকলাম। বদরুল সাহেবের গল্পে বাধা পড়ল। আমরা টহল পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। খাকি পোশাকের কারণে সব পুলিশ একরকম মনে হলেও এটি যে গতকালেরই দল এতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, কি খবর?

টহল পুলিশের দল থমকে দাঁড়াল।

'আজ আপনাদের পাহারা কেমন চলছে?'

এই প্রশ্নেরও জবাব নেই। বদরুল সাহেব হকচকিয়ে গেছেন। কথাবার্তার ধরন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কালকের ওস্তাদজি আজও প্রথম কথা বললেন, তবে তুই-তোকারি না, ভদ্র ভাষা।

'আপনারা কোথায় যান?'

'ভাত খেতে যাই। আজ অবশ্যি আমি খাব না। এই ভদ্রলোক খাবেন। উনার নাম বদরুল আলম। উনাকে থাপ্পড় দিতে চাইলে দিতে পারেন। উনিও কিছু বলবেন না। উনিও আমার মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

বদরুল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কি সমস্যা?

'কোন সমস্যা না। জনগণের সেবক পুলিশ ভাইরা এখন আপনার রাতের খাবার ব্যবস্থা করবেন।'

পুলিশ দলের একজন বলল, কালকের ব্যাপারটা মনে রাখবেন না। নানা কিসিমের বদলোক রাস্তায় ঘুরে, নেশা করে। আমরা বুঝতে পারি নাই। একটা মিসটেক হয়েছে।

'আমি কিছু মনে করিনি। মনের ভেতর অতি সামান্য খচখচানি আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে – যদি আপনারা বদরুল সাহেবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।'

'এত রাতে ?'

'আপনাদের কারবারই তো রাতে। আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দি – কোন একটা বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপুন। বাড়িওয়ালা দরজা খুলে এতগুলি পুলিশ দেখে যাবে ভড়কে। তখন আপনাদের যে ওস্তাদ তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, স্যার, এত রাতে ডিসটর্ব করার জন্যে খুবই দুঃখিত। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সারাদিন না খেয়ে আছেন। যদি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন । দেখবেন তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা হবে। মধ্যরাতের পুলিশ ভয়াবহ জিনিশ।'

বদরুল সাহেবের হতভম্ব ভাব কাটছে না। তার ক্ষুধ-তৃষ্ণাও সম্ভবত মাথায় উঠে গেছে। পুলিশ দলের একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট টক আছে।

আমি প্রাইভেট টক শোনার জন্যে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নামলাম। সে কানের কাছে গুন গুন করে বলল, স্যার, বিরাট মিসটেক হয়েছে। রাস্তায় কত লোক হাঁটে, কে সাধু, কে শয়তান বুঝব কি ভাবে ।

আমিও তার মতই নিচু গলায় বললাম, না বোঝারই কথা।

ওস্তাদজী একটা ভুল করেছে। চড় দিয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে উনার হাত ফুলে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমাতে পারেননি।

'বেকায়দায় চড় দিয়েছে। রগে টান পড়েছে। কিংবা হাতের মাসলে কিছু হয়েছে।'

'কি যে ব্যাপার সেটা স্যার আমরা বুঝে গেছি। এখন স্যার আমাদের ক্ষমা দিতে হবে। এটা স্যার আমাদের একটা আবদার।'

'আচ্ছা যান, ক্ষমা দিলাম।'

'ওস্তাদজী আজ ছুটি নিয়েছে। সারাদিন শুয়েছিল, রাতে বের হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'ভালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি স্যার আমাদের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।'

'অবশ্যই রাখব।'

'উনার খাবার ব্যাপারে স্যার কোন চিন্তা করবেন না।'

আমি বদরুল সাহেবকে বললাম, আপনি এদের সঙ্গে যান। খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর মেসে চলে যাবেন। আমি ভোরবেলা ফিরব ।

তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। কিছুতেই যাবেন না। পুলিশরা বলতে গেলে তাকে গ্রেফতার করেই নিয়ে গেল। বেচারার হতাশ দৃষ্টি দেখে মায়া লাগছে। মায়া ভাল জিনিশ না। অনিত্য এই সংসারে মায়া বিসর্জন দেয়া শিখতে হয়। আমি শেখার চেষ্টা করছি।

বাদুর-স্বভাব আয়ত্ত করার চেষ্টা সফল হচ্ছে না। বাদুর-ভাব কয়েকদিন থাকে তারপর ভেতর থেকে মানুষ-ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাতে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। দিনে হাজার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারি না। এখন আমার মানুষ ফেজ চলছে। রাতে ঘুমুচ্ছি, দিনে জেগে আছি। রাস্তায় যাচ্ছি। হাঁটাহাঁটি করছি। দিনে হাঁটাহাঁটি করার মধ্যেও কিছু থ্রিল আছে। হঠাৎ হঠাৎ খুব বিপদজনক কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যার সঙ্গে নিশি রাতে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাত তিনটার সময় নিশ্চয়ই রেশমা খালার সঙ্গে নিউমার্কেটের কাছে দেখা হবে না। প্রায় দুবছর পর রেশমা

খালার সঙ্গে দেখা। পাজেরো নামের অভদ্র গাড়ির ভেতর ড্রাইভারের সিটের পাশে তিনি বসে আছেন। তার মত মহিলা ড্রাইভারের পাশে বসবেন ভাবাই যায় না। তবে শুনেছি পাজেরো গাড়িগুলি এমন যে ড্রাইভারের সীটের পাশে বসা যায়। এতে সম্মান হানি হয় না।

রেশমা খালা হাত উচিয়ে ডাকলেন, এই হিমু, এই . . .। ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিতে লাগল। আমার উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। কোন গলিটলির ভেতর ঢুকে পড়া। গলি না থাকলে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে তার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া। কিছু কিছু ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রেশম খালা সেই ট্রাকের চেয়েও ভয়াবহ। আশে পাশে গলি বা ম্যানহোল নেই। কাজেই আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। রাস্ত পার হবার আগেই খালা চেচিয়ে বললেন, হিমু, তুই নাকি গলার কাঁটা নামাতে পারিস?

রেশমা খালা আমার কেমন খালা জানি না। লতায়—পাতায় খালা। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পার হলেও এই মুহুর্তে খুকি সেজে আছেন। মাথা ভর্তি ঢেউ-খেলানো ঘন কাল চুল। এই চুল হংকং থেকে আনানো। ঠোঁট লাল টুক টুক করছে। জামদানী শাড়ি পরেছেন। গলায় মাটির মালা। কানে মাটির দুল। এটাই লেটেস্ট ফ্যাশান। শান্তিনিকেতন থেকে আমদানী হয়েছে।

আমি গাড়ির কাছে চলে এলাম। রেশমা খালা চোখ বড় বড় করে বললেন – বাদলের মা'র কাছে ঘটনা শুনলাম। বড় বড় সার্জন কাত হয়ে গেছে – তুই গিয়েই মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে কাঁটা নামিয়ে ফেললি। কি রে, সত্যি ?

'হ্যাঁ সত্যি। তোমার কাঁটা লাগলে খবর দিও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তোকে খবর দেব কি ভাবে ? তোর ঠিকানা কি ? তোর কোন কার্ড আছে ?'

'ঠিকানাই নাই – আবার কার্ড !'

'তুই এক কাজ কর না। আমার বাড়িতে চলে আয়। একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। একটা ঘরে থাকবি। আমার সঙ্গে খাবি। ফ্রী থাকা-খাওয়া।'

'দেখি, চলে আসতে পারি।'

'আসতে পারি-টারি না। চলে আয়। তুই কাঁটা নামানো ছাড়া আর কি পারিস ?'

'আপাতত আর কিছু পারি না।'

'কে যেন সেদিন বলল, তুই ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারিস। তোর সিক্সথ সেন্স নাকি খুব ডেভেলপড়।'

আমি হাসলাম। আমার সেই বিশেষ ধরনের হাসি। হাসি দেখে রেশমা খালা আরো অভিভূত হলেন।

'এই হিমু, গাড়িতে উঠে আয়।'

'যাচ্ছেন কোথায় ?'

'কোথাও যাচ্ছি না। খালি বাড়িতে থাকতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে ! এই জন্যেই গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বের হই।'

'বাড়ি খালি না-কি ?'

'ও আল্লা, তুই কি কিছুই জানিস না? তোর খালুর ইন্তেকালের পর বাড়ি খালি না? এত বড় বাড়িতে একা থাকি, অবস্থাটা চিন্তা করতে পারিস।'

'দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এরা তো আছে।'

'খালি বাড়ি কি দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এইসবে ভরে ? তুই চলে আয়। তোর

কাটা নামানোর ক্ষমতার কথা শুনে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গাড়িতে উঠ।'

'আজ তো খালা যেতে পারব না। জরুরি কাজ।'

'তোর আবার কিসের জরুরি কাজ ? হাঁটা ছাড়া তোর আবার কাজ কি ?'

'আরেকজনের কাঁটা নামাতে হবে। চিতলমাছের কাঁটা গলায় বিঁধিয়ে বসে আছে। কোঁ কোঁ করছে। সেই কাঁটা তুলতে হবে।'

'আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখি ব্যাপারটা কি ?'

'আপনাকে নেয়া যাবে না খালা। মন্ত্র—তন্ত্রের ব্যাপার তো। মেয়েদের সামনে মন্ত্র কাজ করে না।'

'মেয়েরা কি দোষ করেছে?'

'মেয়েরা কোনই দোষ করেনি। দোষ করেছে মন্ত্রে। এই মন্ত্র নারী বিদ্বেষী।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে না নিতে চাইলে না নিবি। গাড়িতে উঠ, তোকে কিছুদূর এগিয়ে দি রোদের মধ্যে হাঁটছিস দেখে মায়া লাগছে।'

কেউ গাড়িতে উঠার জন্যে বেশি রকম পিড়াপিড়ি করলে ধরে নিতে হবে গাড়ি নতুন কেনা হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, গাড়ি নতুন কিনলে?

'নতুন কোথায়, ছয় মাস হয়ে গেলো না।'

'ছয় মাসে স্বামী পুরাতন হয় — গাড়ি হয় না।'

'দারুণ গাড়ি।'

'তোর পছন্দ হয়েছে ?'

'পছন্দ মানে! এরোপ্লেনের মত গাড়ি।'

'এই গাড়ির সবচে বড় সুবিধা কি জানিস? সামন-সামনি কলিশন হলে গাড়ির কিছু হবে না, কিন্তু অন্য গাড়ি ভর্তা হয়ে যাবে।'

'বাহ, দারুণ তো।'

'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে হিমু চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?'

'আপনার হাতে চাকরি আছে?'

'না। তোর খালুর মৃত্যুর পর মিল-টিল সব বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করে ফেলেছি। ব্যাঙ্কে জমা করেছি। আমি একা মানুষ – মিল-টিল চালানো তো সম্ভব না। সবাই লুটি-পুটে খাবে। দরকার কি ?'

'কোন দরকার নেই।'

গাড়ি চলছে। কোন বিশেষ দিকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রাইভার তার ইচ্ছামত চালাচ্ছে। মীরপুর রোড ধরে চলতে চলতে ফট করে ধানমণ্ডি চার নাম্বারে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ পর মীরপুর রোডে চলে এল।

'হিমু।'

'জ্বি খালা।'

'তোর খালুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করতে চাই। কর্মযোগী পুরুষ ছিল। পথের ফকির থেকে কলকারখানা, গার্মেন্টস, করেনি এমন জিনিস নেই। স্ত্রী হিসেবে তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে আমার তো কিছু করা দরকার।'

'করলে ভাল। না করলেও চলে।'

'না না, করা দরকার। ভাল কিছু করা দরকার। উনার নামে একটা আর্ট মিউজিয়াম করলে কেমন হয়।'

‘ভাল হয়। তবে খালু সাহেবের নামে করা যাবে না। মানাবে না।’

‘মানাবে না কেন ?’

“গনি মিয়া মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট” শুনতে ভাল লাগছে না। খালু সাহেবের নামটা গনি মিয়া না হয়ে আরেকটু সফেসটিকেটেড হলে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট দেয়া যেত। তোমার নিজের নামে দাও না কেন ? “রেশমা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট” শুনতে তো খারাপ লাগছে না।’

গাড়ি মীরপুর রোড থেকে আবার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বরে ঢুকে পড়েছে। আবারো মনে হয় মীরপুরে আসবে। ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল!

‘খালা, আমার তো এখন যাওয়া দরকার। চিতল মাছের কাটা নামানো খুব সহজ না।’

‘আহা বোস না। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। কথা বলার মানুষ পাই না। কেউ আমার বাড়িতে আসে না। এটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড। তোর খালুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কার্ড ছাপিয়ে পাঁচশ লোককে দাওয়াত দিয়েছি। তিনটা দৈনিক পত্রিকায় কোয়ার্টার পেইজ বিজ্ঞাপন দিলাম। লোক কত হয়েছে বল তো?”

‘একশ ?’

‘আরে না – আঠারো জন। এর মধ্যে আমার নিজের লোকই সাতজন। ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান, কাজের দুটা মেয়ে।’

‘আমাকে খবর দিলে চলে আসতাম।’

‘তোকে খবর দেব কি ভাবে ? তোর কি কোন স্থায়ী ঠিকানা আছে? ঠিকানা নেই। রাস্তায় যে ফকিরগুলি আছে তাদেরও ঠিকানা আছে। রাতে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমায়। আজীজ মার্কেটের বারান্দায় যে ঘুমুবে সে সেখানেই ঘুমুবে। সে কমলাপুর রেল স্টেশনে ঘুমুবে না। আর তুই তো আজ এই মেসে, কাল ঐ মেসে। হিমু, তুই চলে আয় তো আমার কাছে। গুলশানের বাড়ি নতুন করে রিনোভেট করেছি। টাকাপয়সা করচ করে হুলুস্কুল করেছি। তোর ভাল লাগবে। আসবি?’

‘ভেবে দেখি।’

‘ভাবতে হবে না। তুই চলে আয়। থাকা-খাওয়ার খরচার হাত থেকে তো বেঁচে গেলি। মাসে মাসে না হয় কিছু হাতখরচও নিবি।’

‘কত দেবে হাতখরচ ?’

‘বিড়ি—সিগেরেটের খরচ – আর কি ! কি, থাকবি? তুই থাকলে একটা ভরসা হয়। দিনকালের যে অবস্থা চাকর-দারোয়ান এরাই বটি দিয়ে কুপিয়ে কোনদিন না মেরে ফেলে। এমন ভয়ে ভয়ে থাকি ! চলে আয় হিমু। আজই চলে আয়। বাড়ি তো চিনিসই। চিনিস না ?’

‘হু।’

‘তোকে দেখে আরেকটা কথা ভাবছি — বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে প্যারা নরমাল পাওয়ার যাদের, এদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়? এসট্রলজার, পামিস্ট, বুঝতে পারছিস কি বলছি ?’

‘পারছি — ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ টাইপ।’

‘ঠিক বলেছিস। বাংলাদেশে তো এরকম আগে হয় নি। না-কি হয়েছে?’

‘না হয়নি। করতে পার। নাম কি দেবে ? “গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ ?”

'নামটা কেমন শুনাচ্ছে?'

'মিয়াটা বাদ দিলে খারাপ লাগবে না — গনি ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ। খালা, এইখানে আমি নামব। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও । গাড়ি না থামালে আমি জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব।'

ড্রাইভার গাড়ি থামালো। রেশম খালা বলল, কি ঠিক হল? তুই আসছিস?

'হু। আমার এ মাসের হাতখরচের টাকা দিয়ে দাও।'

'থাকাই শুরু করলি না – হাতখরচ কি ?'

'আমি তো খালা চাকরি করছি না যে মাসের শেষে বেতন। এটা হল হাত খরচ।'

'তুই আগে বিছান-বালিশ নিয়ে উঠে আয়, তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম। উদ্ধার পাওয়া গেছে এখন চেষ্টা করা উচিত যত দূরে সরে পড়া যায়। সম্ভাবনা খুব বেশি যে খালা তার গাড়ি নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমার উচিত ছোট কোন গলিতে ঢুকে পড়া, যেখানে পাজেরো টাইপ গাড়ি ঢুকতে পারে না।

'এই হিমু, এই এক সেকেন্ড শুনে যা। এই, এই।'

বধির হয়ে যাবার ভান করে আমি গলি খুঁজছি। গাড়ির ড্রাইভার ক্রমাগত হন দিচ্ছে। না ফিরলে চারদিকে লোক জমে যাবে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম।

'নে, হাতখরচ নে। না দিলে আবার হাত খরচ দেয়া হয় নি এই অজুহাতে আসবি না।'

রেশমা খালা একটা চকচকে পাঁচশ টাকার নোট জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

'তুই সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসিস। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বাসায় থাকি। নানান সমস্যা আছে, বুঝলি? ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে। কাউকে বলা দরকার। রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না।'

'চলে আসব।'

'টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পকেটে রাখ। হারিয়ে ফেলবি তো।'

'খালা, আমার পকেট নেই। যাবতীয় টাকাপয়সা আমাকে হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়।'

'বলিস কি ?'

'খালা, যাই?

যাই বলে দেরী করলাম না, প্রায় দৌড়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম।

টাকা কি কেউ হাতে নিয়ে ঘুরে? বাসের কন্ডাক্টাররা টাকা হাতে রাখে। আর কেউ? পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে রাখতে বেশ ভালই লাগছে। নোটটা এতই নতুন যে ভাজ করতে ইচ্ছা করছে না। চনমনে রোদ ওঠায় গরম লাগছে। নোটের সাইজ আরেকটু বড় হলে টাকা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে যাওয়া যেত।

খালার হাত থকে উদ্ধার পেয়েছি শ্যামলীতে। সেখান থেকে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। হেঁটে হেঁটে আবার নিউ মার্কেটের কাছে চলে আসা যায়। ইচ্ছা করলে রিকশা নিতে পারি, ভাড়া দেয়া সমস্যা হবে না। বুড়ো অথর্ব টাইপ রিকশাওয়ালা যাদের রিকশায় কেউ চড়ে না, এমন কেউ যে রিকশা ঠিকমত টানতেও পারে না, বয়সের ভারে কানেও ঠিক শুনে না, গাড়ির সামনে হঠাৎ রিকশা নিয়ে উপস্থিত হয় — এইসব রিকশায় চড়া মানে পদে পদে বিপদের মধ্যে পড়া।

যেহেতু রেশম খালার বাড়িতে আমি থাকতে যাব না, সেহেতু এই পাঁচশ টাকা

কোন এক সৎকর্মে ব্যয় করতে হবে।

অনেকদিন কোন সৎকর্ম করা হয় না। ভাড়া হিসেবে পুরো নোটটা দিয়ে দিলে সাধারণ মানের একটা সৎকর্ম করা হবে।

পছন্দসই কোন রিকশাওয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। একজনেক বেশ পছন্দ হল, তবে তার বয়স অল্প। বুড়ো রিকশাওয়ালা কেউই নেই। বুড়োরা আজ কেউই রিকশা বের করেনি। আসাদ গেটে এসে একজনকে পাওয়া গেল। চলনসই ধরনের বুড়ো। রিকশার সীটে বসে চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে। সকালের ব্রেকফাস্ট বোধ হয় না, বারোটার মত বাজে। লাঞ্চ হবারও সম্ভাবনা কম। সম্ভবত প্রি-লাঞ্চ ।

'রিকশা, ভাড়া যাবেন?'

বুড়ে প্রায় ধমকে উঠলো – না। খাওয়ার মাঝখানে বিরক্ত করায় সে সম্ভবত ক্ষেপে গেছে।

'কাছেই যাব। বেশি দূর না – নিউ মাকেটে।'

'ঐ দিকে যামু না।'

'ফার্ম গেট যাবেন? ফার্মগেট গেলেও আমার চলে।'

'যামু না।'

'যাবেন না কেন ?'

'ইচ্ছা করতাছে না।'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি। আপনি চা শেষ করেন, তারপর যাব। ফার্মগেট যেতে না চান তাও সই। অন্য যেখানে যেতে চান যাবেন। আমাকে কোন এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

'মনে হল আমার প্রস্তাবে সে রাজি হয়েছে। কিছু না বলে চা-পাউরুটি শেষ করল। লুঙ্গির ভাজ থেকে বিড়ি বের করে আয়েশ করে বিড়ি টানতে লাগল। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। কাউকে দান করতে যাওয়াও সমস্যা। দান করতেও ধৈর্য লাগে। হুট করে দান করা যায় না। বুড়ে বিড়ি টানা শেষ করে রিকশার সীট থেকে নামল। আমি উঠতে যাচ্ছি সে গম্ভীর গলায় বলল, কইছি না, যামু না। ত্যক্ত করেন ক্যান ?'

সে খালি রিকশা টেনে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়ে দুজন যাত্রীও নিল। যে কোন কারণেই হোক আমাকে তার পছন্দ হয় নি। পাঁচশ টাকার চকচকে নোটটা তাকে দেয় গেলো না।

আমি ফার্মগেটের দিকে রওনা হলাম। নানান কিসিমের অভাবী মানুষ ঐ জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষার বিচিত্র টেকনিক দেখতে হলে ফার্মগেটের চেয়ে ভাল কোন জায়গা হতে পারে না। একবার একজনকে পেয়েছিলাম ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন।

'Sir, I am a needy man, sir.'

'Three school going daughters.'

'Lost my job, presently pennyless.'

আমি বললাম, ইংরেজিতে ভিক্ষা করছেন কেন? বাংলা ভাষার জন্যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি সে কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করার জন্যে ? ভিক্ষার জন্যে বাংলার চেয়ে ভাল ভাষা হতেই পারে না।

ইংরেজি ভাষার ভিক্ষুক চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল। আমি বললাম, ফেব্রুয়ারি মাসেও কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন? না-কি তখন বাংলা ভাষা?

আরেকজন আছেন, ভদ্র চেহারা। ভদ্র পোশাক। তিনি এসে খুবই আদবের সঙ্গে বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না – কয়টা বাজে ! আমার ঘড়িটা বন্ধ।

যাকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ভদ্রলোকের ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে যান – ঘড়ি দেখে সময় বলেন ।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকাল মানুষ এমন হয়েছে সময় জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়।

'না না, ঠিক আছে।'

তখন ভদ্রলোক গলা নিচু করে বলেন – ভাই সাহেব, একটা মিনিট সময় হবে? দুটা কথা বলতাম।

যে সময় দিয়েছে সেই মরেছে। তার বিশ পঁচিশ টাকা খসবেই।

আরেক ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবি পরা। মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল, হাতে বেনসনের প্যাকেট। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পকেটে সম্রাট আকবরের সময়কার একটা মোহর। দেড় ভরির মত ওজন। তার গল্প হচ্ছে — তিনি এরকম মুদ্র ভর্তি একটা ঘটি পেয়েছেন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। জানলে সরকার সীজ করে নিয়ে যাবে। তিনি গোপনে মুদ্রগুলি বিক্রি করতে চান। তাই বলে সস্তায় না। সোনার যা দাম সেই হিসেবে কিনতে হবে। কারণ খাটি সোনার মোহর। ভদ্রলোকের মূল ব্যবসার জায়গা ফার্মগেট না। ফার্মগেটে তিনি অন্য উদ্দেশ্যে আসেন। উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার না।

পরিচিত ভিক্ষুকের কাউকেই পেলাম না তবে আশ্চর্যজনকভাবে আবদুর রশীদকে পেয়ে গেলাম। চশমা দেখে চিনলাম। চশমার ডাঁট নেই, সূতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাধা। হাতে এক তাড়া কাগজ নিয়ে এর-তার কাছে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান। হলুদ রঙের বড় একটা খামও আছে। নির্বাৎ এক্সরে প্লেট।

'রশীদ সাহেব না? কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক চশমার আড়াল থেকে পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। চিনতে পারছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

'চশমার ডাঁট আবার ফেলে দিয়ে সূতা লাগিয়েছেন? এতে কি ভিক্ষার সুবিধা হয়?'

'আপনাকে চিনতে পারছি না।'

'চিনবেন না কেন? আমি বদরুল সাহেবের বন্ধু। আপনার হাতে কি? প্রেসক্রিপশান? এতো পুরানো টেকনিকে গেলেন কেন?'

আবদুর রশীদ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ছেলে মরণাপন্ন। লাংসে পানি জমেছে। প্লুরিসি। প্রফেসর রহমান ট্রিটমেন্ট করছেন। বিশ্বাস না হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২ নং ওয়ার্ডে যেতে পারেন। অবস্থা খারাপ ?

'অবস্থা খারাপ?'

আবদুর রশীদ জবাব দিলেন না। ক্রুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করতে পেরেছেন?

'তা দিয়ে আপনার দরকার কি ?'

'দরকার আছে। আমি এককাপ চা খাব। চা এবং একটা সিগারেট। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। হাতে একদম পয়সা নেই।'

'পাঁচশ টাকার একটা নোট তো আছে।'

'নোটটা আমার না। বুড়ো এক রিকশাওয়ালার নোট তাকে ফিরত দিতে হবে। খাওয়াবেন এক কাপ চা? আপনার কাছে আমার চা পাওনা আছে। ঐদিন আপনাকে চ-সিঙ্গাড়া খাইয়ে ছিলাম।'

আবদুর রশীদ চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

'সিঙ্গাড়া খাওয়ান। তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে। আপনিও আমার কাছে ঋণী থাকবেন না। আমিও ঋণী থাকবো না।'

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়াও এল। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, রশীদ সাহেব, ভিক্ষার একটা ভাল টেকনিক আপনাকে শিখিয়ে দেই। কিছুদিন ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এক জায়গায় একবারের বেশি দুবার করা যাবে না। জায়গা বদল করতে হবে। বলব ?

রশীদ সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তার চোখ-মুখ কঠিন। আমি খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, ময়লা একটা গামছা শুধু পরবেন। সারা শরীরে আর কিছু থাকবে না। চোখে চশমা থাকতে পারে। আপনি করবেন কি — মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত টাইপের লোকদের কাছে যাবেন। গিয়ে নিচু গলায় বলবেন – আমার কোন সাহায্য লাগবে না, কিছু লাগবে না, দোকান থেকে আমাকে শুধু একটা লুঙ্গি কিনে দেন। কেউ টাকা দিতে চাইলেও নিবেন না। দেখবেন দশ মিনিটের ভেতর আপনাকে লুঙ্গি কিনে দেবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন – বড় লোকের কাছে কিছু চাইবেন না। আপনি গামছা পরে আছেন, না নেংটো আছেন তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু যারা নিম্নবিত্ত তারা আপনাকে দেখে আতংকগ্রস্ত হবে। ওদের মনে হবে একদিন আপনার মত অবস্থা তাদেরও হতে পারে। তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে লুঙ্গি কিনে দিতে। সেই লুঙ্গি আপনি বিক্রি করে দেবেন। আবার আরেকটার ব্যবস্থা করবেন। বুঝতে পারছেন? মন দিয়ে কাজ করলে দৈনিক পাঁচ থেকে ছটা লুঙ্গির ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে।

আবদুর রশীদ কঠিন চোখে তাকালেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাল বুদ্ধি দিয়েছি, এখন একটা সিগারেট খাওয়ান।

আবদুর রশীদ সিগারেট খাওয়ালেন না। চা-সিঙ্গাড়ার দাম দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বুড়ো রিকশাওয়ালা একজন পাওয়া গেল। বুড়ো হলেও তার গায়ে শক্তি সামর্থ ভালই। টেনে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। গল্প জমাবার চেষ্টা করলাম। গল্প জমল না। শুধু জানালো তার আদি বাড়ি ফরিদপুর।

সাতটাকা ভাড়ার জায়গায় পাঁচশ টাকা ভাড়া পেয়ে তার চেহারার কোন পরিবর্তন হল না। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে টাকাটা রেখে দিল। গামছা দিয়ে মুখ মুছল। মনে হয় তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যানেজার হায়দার আলি খাঁ আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, সকাল থেকে আপনার জন্যে একটা মেয়ে বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, শেষে আমি আপনার ঘর খুলে দিলাম।

'ঘর খুলে দিলেন কেন?'

'মেয়েছেলে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'নাম কি মেয়ের ?'

‘নাম জিজ্ঞেস করি নাই। নাম জিজ্ঞেস করলে বেয়াদবী হয়। সুন্দর মত মেয়ে।’

রূপা না-কি ? রূপা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সে এসে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না। গাড়ি থেকেই তার নামার কথা না। সে গাড়িতে বসে থাকবে – ড্রাইভারকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। তাহলে কে হতে পারে?

ঘরে ঢুকে দেখি বাদলদের বাসায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম – সে। পদার্থবিদ্যার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। মীরা কিংবা ইরা নাম।

আমি খুব সহজ ভাবে ঘরে ঢুকে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, কি খবর ইরা, ভাল ?

ইরা বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। তার মুখ কঠিন। ভুরু কুঁচকে আছে। বড় ধরনের ঝগড়া শুরুর আগে মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়ে যায়।

‘আমার এখানে কি মনে করে? গলায় কাঁটা?’

‘আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি সেই সকাল এগারোটা থেকে বসে আছি।’

‘বোস। তারপর বল কি কথা।’

আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল যে আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন।’

‘আমার একদম মনে থাকে না। কোন কোন মানুষকে প্রথম দেখা থেকেই এত আপন মনে হয় যে শুধু তুমি বলতে ইচ্ছে করে।’

‘দয়া করে মেয়েভুলানো কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতীয় কথা আমি আগেও শুনেছি।’

‘পাত্তা দেননি?’

‘পাত্তা দেয়ার কোন কারণ আছে কি ?’

‘আছে। ছেলেরা নিতান্ত অপারগ হয়ে এইসব কথা বলে। প্রথম দেখাতে তো সে বলতে পারে না – “আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।” বলতে লজ্জা লাগে। যে শোনে তারো খারাপ লাগে। কাজেই ঘুরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়।’

‘প্রেম বিষয়ক তত্ত্বকথা আমি শুনতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। আমি কথাগুলি বলে চলে যাব।’

‘অবশ্যই। একটু বসুন। ঠাণ্ডা হোন। ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বলুন।’

ইরা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ-মুখ যতটা কঠিন ছিল তারচেয়েও কঠিন হয়ে গেলো।

কথাটা হচ্ছে বাদলদের বাড়িতে যে কাজের বুয়া আছে – তার একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।’

‘ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লুৎফা নাম।’

‘সে না-কি আপনাকে বলেছিল তার মেয়েকে খুঁজে দিতে।’

‘হ্যাঁ, বলেছিল। এখনো খোঁজা শুরু করিনি। আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি বলায় মনে পড়ল।’

‘আপনাকে খুঁজতে হবে না। মেয়ে পাওয়া গেছে।’

‘বাঁচা গেল। তিরিশ লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে লুৎফাকে খুঁজে পাওয়া সমস্যা হত।’

আপনাকে সে যেদিন বলল, সেদিন দুপুরেই মেয়ে উপস্থিত। ব্যাপারটা যে

পুরোপুরি কাকতালীয় তাতে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে?’

‘কোন সন্দেহ নেই।’

‘আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন?’

‘পাগল হয়েছেন ?’

‘বুয়ার ধারণা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। বাদলেরও তাই ধারণা।’

‘কার কি ধারণা তাতে কি যায় আসে? মেয়েটাকে পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।’

ইরা কঠিন গলায় বলল, কে কি ভাবছে তাতে অনেক কিছুই যায় আসে। এই ভাবেই সমাজে বুজরুক তৈরি হয়। আপনার মত মানুষরাই সোসাইটির ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট করেন। বাদলের মাথা তো আপনি আগেই খারাপ করেছিলেন, এখন বুয়ার মাথাও খারাপ করলেন ।

‘তাই না-কি ?’

‘হ্যাঁ তাই। বাদলের মাথা যে আপনি কি পরিমাণ খারাপ করেছেন সেটা কি আপনি জানেন ?’

'না, জানি না।’

‘দু-একদিনের ভেতর একবার এসে দেখে যান। ব্রাইট একটা ছেলে। বাবা-মা'র কত আশা ছেলেটাকে নিয়ে . . . আপনি তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছেন। ফালতু বুজরুকি। উদ্ভট উদ্ভট কথা। মহাপুরুষ মহাপুরুষ খেলা। রাতদুপুরে রাস্তায় হাঁটিলেই মানুষ মহাপুরুষ হয়ে যায়?’

ইরা রাগে কাঁপছে। মেয়েটা এতটা রেগেছে কেন বুঝতে পারছি না। এত রাগার তো কিছু নেই। আমার বুজরুকিতে তার কি যায় আসে?

ইরা বলল, আমি এখন যাব।

‘চা-টা কিছু খাবেন না?’

‘না। আপনি দয়া করে বাদলকে একটু দেখে যাবেন। ওর অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আসলে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। কঠিন শাস্তি।’

ইরা গট গট করে বের হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ সুন্দর। রেগে যাওয়ায় আরো সুন্দর লাগছে। যে রাগের সঙ্গে ঘৃণা মেশানো থাকে সেই রাগের সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় না। যে রাগের সঙ্গে সামান্যতম হলেও ভালবাসা মেশানো থাকে সেই রাগ মেয়েদের রূপ বাড়িয়ে দেয়। ইরা কি সামান্য ভালবাসা আমার জন্যে বোধ করা শুরু করেছে? এটা আশংকার কথা। ভালবাসা বটগাছের মত। ক্ষুদ্র বীজ থেকে শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ডালপালা মেলে দেয়, ঝুড়ি নামিয়ে দেয়।

ইরার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। বাদলদের বাড়িতে ভুলেও যাওয়া যাবে না। ইরা মেসের ঠিকানা বের করে চলে এসেছে কি ভাবে সেটাও এক রহস্য। ঠিকানা তার জানার কথা না। ঐ বাড়ির কেউ জানে না।

রাতে খেতে গিয়ে শুনি বদরুল সাহেব আমার খাওয়া খেয়ে চলে গেছেন। মেসের বাবুর্চি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করল।

‘রোজ এই কাম করে। আফনের খাওন খায়।’

‘ঠিকই করেন। আমি তাকে বলে দিয়েছি। এখন থেকে তিনিই খাবেন।’

'আপনি খাবেন না ?'
'আমি কয়েকদিন বাইরে থাকব।'

'ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পাবার উপায় হচ্ছে — পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যাওয়া। পেট ভর্তি পানির কারণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক – নেশার মত হয়। ঝিমুনি আসে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমের সময়ের স্বপ্নগুলি হয় অন্যরকম। তবে আজ তা হবে না। রাতে না খেলেও দিনে খেয়েছি। ক্ষুধার্ত ঘুমের স্বরূপ বুঝতে হলে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যেতে হয়। নেশার ভাবটা হয় তখন।
বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। বদরুল সাহেব মিহি গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই। হিমু ভাই। আমি উঠে দরজা খুললাম।
বদরুল সাহেব লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে এক ঠোঙ্গা মুড়ি, খানিকটা গুড়। আমি বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?
'শুনলাম আপনি খেতে গিয়েছিলেন। এদিকে আমি ভেবেছি আপনি আসবেন না . . . '
'ও, এই ব্যাপার !'
'খুব লজ্জায় পড়েছি হিমু ভাই। আপনার জন্যে মুড়ি এনেছি।'
'ভাল করেছেন। আজ রাতটা উপোস দেব বলে ঠিক করেছি। মাঝে মাঝে আমি উপোস দেই। আপনি গুড়-মুড়ি খান। আমি মুড়ি খাওয়ার শব্দ শুনি।'
কিছু খাবেন না হিমু ভাই?'
'না। তারপর ঐ দিন কি হল বলুন – পুলিশরা যত্ন করে খাইয়েছিল?'
'যত্ন বলে যত্ন। এক হোটেলে নিয়ে গেছে। পোলাও, খাসির রেজালা, হাসের মাংস, সব শেষে দৈ মিষ্টি। এলাহী ব্যাপার। খুবই যত্ন করেছে। হাঁসের মাংসটা অসাধারণ ছিল। এত ভাল হাঁসের মাংস আমি আমার জীবনে খাইনি। বেশি করে রসুন দিয়ে ভূনা ভূনা করেছে। এই সময়ের হাঁসের মাংসে স্বাদ হয় না। হাঁসের মাংস শীতের সময় খেতে হয়। তখন নতুন ধান ওঠে। ধান খেয়ে খেয়ে হাঁসের গায়ে চর্বি হয়। আপনার ভাবীও খুব ভাল হাঁস রাঁধতে পারে। নতুন আলু দিয়ে রাঁধে। আপনাকে একবার নিয়ে যাব। আপনার ভাবীর হাতের হাঁস খেয়ে আসবেন।
'কবে নিয়ে যাবেন?'
'এই শীতেই নিয়ে যাব। আপনার ভাবীকে চিঠিতে আপনার কথা প্রায়ই লিখি তো। তারও খুব শখ আপনাকে দেখার। একবার আপনার অসুখ হল – আপনার ভাবীকে বলেছিলাম দোয়া করতে। সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। কোরান খতম দিয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষ তো, অল্পতে অস্থির হয়।'
'আপনার চাকরির কি হল? শনিবারে হবার কথা ছিল না ? গিয়েছিলেন ?'
বদরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, যাননি?
'জ্বি, গিয়েছিলাম। ইয়াকুব ভুলে গিয়েছিল।'
'ভুলে গিয়েছিল?'
'হ্যাঁ। সে তো একটা কাজ নিয়ে থাকে না। অসংখ্য কাজ করতে হয়। তার পি-এ সে ফাইল দেয়নি। কাজেই ভুলে গেছে।'
'এখন কি ফাইল দিয়েছে ?'

'এখন তো দেবেই। পি-এ-কে ডেকে খুব ধমকাধমকি করল। আমার সামনেই করল। বেচারার জন্যও মায়া লাগছিল। সে তো আর শত্রুতা করে আমার ফাইল আটকে রাখেনি। ভুলে গেছে। মানুষ মাত্রেরই তো ভুল হয়।'

'ইয়াকুব সাহেব এখন কি বলছেন? কবে নাগাদ হবে?'

'তারিখ-টারিখ বলেনি। আরেকটা বায়োডাটা জমা দিতে বলেছে।'

'দিয়েছেন?'

'হু।'

'এবারো কি ফাইলের উপর আর্জেন্ট লিখে দিয়েছেন ?'

'হু।'

'আবার কবে খোঁজ নিতে বলেছেন।'

'বলেছে বার বার এসে খোঁজ নেবার দরকার নেই। ওপেনিং হলেই চিঠি চলে আসবে।'

'সেই চিঠি কবে নাগাদ আসবে তা কি বলেছে ?'

'খুব তাড়াতাড়িই আসবে। আমি আমার অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে বলেছি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে অন্যের খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। শুনে সে খুবই মন খারাপ করল।'

'বুঝলেন কি করে যে মন খারাপ করেছে? মুখে কিছু বলেছে?'

'কিছু বলেনি। চেহারা দেখে বুঝেছি।'

'আমার কি মনে হয় জানেন বদরুল সাহেব, আপনার অন্যান্য জায়গাতেও চাকরির চেষ্টা করা উচিত। ইয়াকুব সাহেবের উপর আমার তেমন ভরসা হচ্ছে না।'

'ভরসা না হবার কিছু নেই হিমু ভাই। স্কুল জীবনের বন্ধু। আমার সমস্যা সবটাই জানে। আমার ধারণা এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি পাব।'

'যদি না পান ?'

'না পেলে অফিসে গিয়ে দেখা করব। বার বার যেতে লজ্জাও লাগে। নানান কাজ নিয়ে থাকে। কাজে ডিস্টার্ব হয়।'

ঘর অন্ধকার। কচ কচ শব্দ হচ্ছে। বদরুল সাহেব মুড়ি খাচ্ছেন।

'হিমু ভাই !'

'জ্বি।'

'ফ্রেস মুড়ি। খেয়ে দেখবেন?'

'আপনি খান।'

'মুড়ির আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকালে। আপনার ভাবী আবার মুড়ি দিয়ে মোয়া বানাতে পারে। কি জিনিস তা না খেলে বুঝবেন না।'

'একবার খেয়ে আসব।'

'অবশ্যই খেয়ে আসবেন।'

'বদরুল সাহেব !'

'জ্বি।'

'আমি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। কেউ আমার খোঁজে এলে বলে দেবেন মেস ছেড়ে দিয়েছি। মিথ্যা কথা বলতে পারেন তো?'

'আপনি বললে – মিথ্যা বলব। আপনার জন্যে করব না এমন কাজ নাই। শুধু মানুষ খুনটা পারব না।'

'মানুষ খুন করতে হবে না শুধু একটু মিথ্যা বলবেন। ইরা নামের একটা মেয়ে আমার খোঁজে আসতে পারে, তাকে বলবেন আমি সুন্দরবনে চলে গেছি। মাসখানিক থাকব। তবে রূপা এলে আমি কোথায় আছি সেই ঠিকানা দিয়ে দেবেন।'

'ঠিকানাটা কি ?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের খালা আছে। রেশমা। গুলশানে থাকে। গুলশান দুই নম্বর। বাড়ির নাম গনি প্যালেস। ঐ প্যালেসে সপ্তাহখানিক লুকিয়ে থাকব। না থাক, ওকেও সুদরবনের কথাই বলবেন।'

৪

গুলশান এলাকায় সবচে' বড়, সবচে' কুৎসিত বাড়িটা রেশমা খালার। খালু সাহেব গনি মিয়ার সিক্সথ সেন্স ছিল অকল্পনীয়। তিনি সস্তা গণ্ডার সময়ে গুলশানে দুবিঘা জমি কিনে ফেলে রেখেছিলেন। তার বেকুবর উদাহরণ হিসেবে তখন এই ঘটনার উল্লেখ করা হত। যার সঙ্গেই দেখা হত রেশম খালা বলতেন, বেকুবটার কাণ্ড শুনেছ? জঙ্গল কিনে বসে আছে।

খালু সাহেবের চেহারা বেকুবের মতই ছিল। অন্যের কথা শোনার সময় আপনাআপনি মুখ হা হয়ে যেত। ব্যবসা বিষয়ে যেসব কথা বলতেন সবই হাস্যকর বলে মনে হত। যে বছর দেশে পেয়াজের প্রচুর ফলন হল এবং পেয়াজের দাম পড়ে গেল সে বছরই তিনি পেয়াজের ব্যবসায় চলে এলেন। ইণ্ডিয়া থেকে পেয়াজ আনার জন্য এলসি খুললেন। অন্য ব্যবসায়ীরা হাসল। হাসারই কথা। রেশম খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি না-কি বেকুবের মত পিয়াজের ব্যবসায় নামছ? যত দিন যাচ্ছে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি তো ততই চলে যাচ্ছে। আগে মাঝে মধ্যে হা করে থাকতে, এখন দেখি সারাক্ষণই হা করে থাক। পেয়াজের ব্যবসার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

'কেউ দেয় নাই। নিজেরই বুদ্ধি। পেয়াজের ফলন খুব বেশি হয়েছে তো, চাষী ভাল দাম পায় নাই। এই জন্য আগামী বছর পেয়াজের চাষ হবে কম। পেয়াজের দাম হবে আকাশছোয়া।'

'তোমার মাথা!'

'দেখ না কি হয়।'

গনি সাহেব যা বললেন তাই হল। পরের বছর পেয়াজ দেশে প্রায় হলই না।

রেশমা খালা হতভম্ব। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, বেকুব মানুষ তো। বেকুব মানুষের উপর আল্লাহর রহমত থাকে। যে ব্যবসা-ই করে দুহাতে টাকা আনে। টাকা ব্যাংকে রাখার জায়গা নেই, এমন অবস্থা।

রেশম খালার আফসোসের সীমা নেই – বেকুব স্বামী টাকা রোজগার করাই শিখেছে, খরচ করা শিখেনি। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, টাকা খরচ করতে তো বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি কোথায় যে খরচ করবে? খালি জমাবে।

গনি সাহেব মাছ-গোশত এক সঙ্গে খান না। ছোটবেলায় তার মা বলেছেন, মাছ-গোশত এক সঙ্গে খেলে পেটের গণ্ডগোল হয়। সেটাই মাথায় রয়ে গেছে। গাড়িতে চড়তে পারেন না, বেবী টেক্সিতেও না। পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হয় না। বমি হয়ে যায়।

লোকজনের গাড়ি থাকে। গনি সাহেবের আছে রিক্সা। সেই রিকশার সামনে-পেছনে ইংরেজিতে লেখা “Private.”

সেই রিকশায় কোথাও যেতে হলে রেশমা খালার মাথা কাটা যায়। সাধারণ রিকশায় চড়া যায়, কিন্তু ‘প্রাইভেট লেখা রিকশায় কি চড়া যায়? লোকজন কেমন কেমন চোখে তাকায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেশমা খালা গাড়ি কিনলেন। খালু সাহেব নাকে অডিকোলন ভেজানো রুমাল চাপা দিয়ে কয়েকবার সেই গাড়িতে চড়লেনও, তারপর আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট রিকশায়। তাতে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন অসুবিধা হল না। ব্যবসা-বাণিজ্য হু-হু করে বাড়তে লাগল। কাপড়ের কল দিলেন, গামেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করলেন।

রেশমা খালার শুধু আফসোস — খালি টাকা, আর টাকা। কি হবে টাকা দিয়ে? একবার দেশের বাইরে যেতে পারলাম না। এমন এক বেকুব লোকের হতে পড়েছি, আকাশে প্লেইন দেখলে তার বুক ধড়ফড় করে। এই লোককে নিয়ে জীবনে কোনদিন কি বাইরে যেতে পারব? কোন দিন পারব না। লোকে ঈদের শপিং করতে সিঙ্গাপুর যায়, ব্যাংকক যায়। আর আমি কোটিপতির বউ, আমি যাই গাউছিয়ায়।

খালু সাহেবের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যে কি পরিমাণ হয়েছে সেটা তার বাড়িতে ঢুকে দেখলাম।

পুরোন বাড়ি ভেঙে কি হুলুস্থূল করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। ময়লা জুতা পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় লাগে। ঘরে ঘরে ঝাড়বাতি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমি হতভম্ব গলায় বললাম, সর্বনাশ! রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, বাড়ি রিনোভেশনের পর তুই আর আসিসনি, তাই না?

‘না। তুমি তো ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ।’

‘আর্কিটেক্টটা ভাল পেয়েছিলাম। টাকা অনেক নিয়েছে। ব্যাটা কাজ জানে, টাকা তো নিবেই। ভেতরের সব কাজ দিয়েছি ইন্টারনাল ডিজাইনারকে। আমেরিকা থেকে পাশ করা ডিজাইনার। ফার্নির্চার-টার্নির্চার সব তার ডিজাইন। দেয়ালে যে পেইনটিংগুলি দেখছিস সেগুলিও কোনটা কোথায় বসবে সে-ই ঠিক করে দিয়েছে।

‘এই বাড়িতে তো খালা আমি থাকতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এখনি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।’

রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর ঘর দেখিয়ে দি । ঘর দেখলে তুই আর যেতে চাইবি না। গেস্টরুম আছে দুটা। তোর যেটা পছন্দ সেটাতে থাকবি। একটায় ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার, অন্যটায় মডার্ন। তোর কোন ধরনের ফার্নিচার পছন্দ? দুটা ঘরই দেখ। যেটা ভাল লাগে। দুটাতেই এ্যাটাচড বাথ। দুটাতেই এসি।

‘এত বড় একটা বাড়িতে একা থাকো ?’

‘একা তো থাকতেই হবে, উপায় কি ? গোষ্ঠির আত্মীয়স্বজন এনে ঢুকাব? শেষে ঘুমের মধ্যে মেরে রেখে যাবে। সবাই আছে টাকার ধান্ধায়। মানুষ দেখলেই আমার ভয় লাগে।’

‘আমাকে ভয় লাগছে না ?’

‘না, তোকে ভয় লাগছে না। তোকে ভয় লাগবে কেন? শোন, কোন বেলা কি খেতে চাস বাবুর্চিকে বলবি। রেঁধে দেবে। দুজন বাবুর্চি আছে। ইংলিশ ফুডের জন্যে একজন, বাঙালী ফুডের জন্যে একজন।’

‘চাইনীজ ফুড কে রাঁধে ?’

‘ইংলিশ বাবুর্চিই রাধে। ও চাইনীজ ফুডের কোর্সও করেছে। রাতে কি খাবি – চাইনীজ ?’

‘তুমি যা খাও তাই খাব।’

‘তোর যখন চাইনীজ ইচ্ছা হয়েছে তখন চাইনীজই খাব। দাঁড়া, বাবুর্চিকে বলে দি। এই বাড়ির মজা কি জানিস – কথা বলার জন্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হবে না। ইন্টারকম আছে। বোতাম টিপলেই হল। আয়, তোকে ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখিয়ে দি।’

ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখলাম। বাথরুমের গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা শিখলাম। এসি চালানো শিখলাম। রিমোট কনট্রোল এসি। বিছানায় শুয়ে শুয়েও বোতাম টিপে এসি অন করা যায়। ঘর আপনাআপনি ঠাণ্ডা-গরম হয়।

‘তোর গান-বাজনার শখ আছে? একটা মিউজিক রুম রয়েছে, ক্যাসেট ডেক, সিডি প্লেয়ার সব আছে।’

‘আর কি আছে ?’

‘প্রেয়ার রুম আছে।’

‘সেটা কি ?’

‘প্রার্থনা ঘর। নামাজ পড়তে ইচ্ছা হলে নামাজ পড়বি। দেখবি ? দেখতে হলে অজু করে ফেল। অজু ছাড়া নামাজ ঘরে ঢোকা নিষেধ।’

‘নামাজঘরে কি আছে? জায়নামাজ, টুপি?’

'আরে না। জায়নামাজের দরকার নেই। মেঝে সবুজ মার্বেলের। রোজ একবার সাধারণ পানি দিয়ে মোছা হয়, তারপর গোলাপ জল মেশানো পানি দিয়ে মোছা হয়। চারদিকে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত ফ্রেমে বাধিয়ে রেখেছি। ইসলামিক আর্চ ডিজাইন। এই ডিজাইন আবার অন্য একজনকে দিয়ে করিয়েছি।’

‘নামাজ পড়ছ?’

‘শুরু করব। ছোটবেলায় কোরান শরীফ পড়া শিখেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। কথায় বলে না – অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ। ঐ হয়েছে। একজন মওলানা রেখে কোরান শরীফ পড়া শিখে তারপর নামাজ ধরব। আয়, নামাজঘর দেখে যা। বাংলাদেশে এই জিনিস আর কারো ঘরে নাই। এখন আবার অনেকেই আমার ডিজাইন নকল করছে। প্রেয়ার রুম বানাচ্ছে। নকলবাজের দেশ। ভাল কিছু করলেই নকল করে ফেলে।’

‘তোমার বাড়িতে বার নেই খালা ?’

‘আছে, থাকবে না কেন? বার ছাড়া কোন মডার্ন বাড়ির ডিজাইন হয় ? ছাদের চিলেকোঠায় বার। তোর আবার ঐসব বদ অভ্যাস আছে নাকি? থাকলে ভুলে যা। আমার বাড়িতে বেলেল্লাপনা চলবে না। যা, অজু করে আয়, তোকে নামাজ ঘর দেখিয়ে আনি।’

‘অজু করে নামাজঘর দেখতে গেলাম। খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, ঘরে কোন বাঘ বা টিউব লাইট দেখছিস ?’

‘না।’

‘তারপরেও ঘর আলো হয়ে আছে না ?’

‘হু।’

‘এর নাম কনসিলড লাইটিং। বঁদিকের দেয়ালে দেখ একটা সুইচ, টিপে দে।’

‘টিপলে কি হবে?’

‘টিপে দেখ না। বিসমিল্লাহ বলে টিপবি।’

‘আমি বিসমিল্লাহ বলে সুইচ টিপে আতংক নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, সুইচ টেপামাত্র নামাজঘর পরোপুরি পশ্চিম দিকে ঘুরবে। তা হল না। যা হল সেটাও কম বিস্ময়কর না। কোরান তেলাওয়াত হতে লাগল।

রেশম খালা বললেন, পুরো কোরান শরীফ রেকর্ড করা আছে। একবার বোতাম টিপে দিলে অটোমেটিক কোরান খতম হয়ে যায়।

‘সেই কোরান খতমের সোয়াব তো তুমি পাও না, সোয়াব পায় তোমার ক্যাসেট রেকর্ডার। এই ক্যাসেট রেকর্ডারের বেহেশতে যাবার খুবই উচু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।’

খবরদার, নামাজঘরে কোন ঠাট্টা-ফাজলামি করবি না।’

নামাজঘরে কোরান পাঠ চলতে লাগল। খালা আমাকে ছাদের চিলেকোঠায় বার দেখাতে নিয়ে গেলেন। শ্বেত পাথরের কাউন্টার টেবিল। পেছনে আলমারী ভর্তি নানা আকারের এবং নানা রঙের বোতল ঝিকমিক করছে।

'কালেকশান কেমন, দেখেছিস ?”’

‘হু। আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। শুধু আক্কেল গুড়ুম না, একই সঙ্গে বে-আক্কেল গুড়ুম।’

‘বে-আক্কেল গুড়ুম আবার কি?’

‘কথার কথা আর কি ! করেছ কি তুমি? দুনিয়ার বোতল জোগাড় করে ফেলেছ!’

‘খাওয়ার লোক নেই তো। শুধু জমছে।’

‘তোমার এখানে সবচে' দামী বোতল কোনটা খালা ?’

‘পেটমোটা বোতলটা — ঐ যে দেখে মনে হচ্ছে মাটির বোতল। পঞ্চাশ বছরের পুরানো রেড ওয়াইন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই জিনিস খাওয়া হয়।’

‘দাম কত তা তো বললে না।’

‘দাম শোনার দরকার নেই। দাম শুনলে তুই ভিরমি খাবি।’

‘এম্নিতেই ভিরমি খাচ্ছি। আজ আর আমার ভাত খেতে হবে না। ভিরমি খেয়ে পেট ভরে গেছে।’

আনন্দে খালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমার মুখ হয়ে গেল অন্ধকার। এক সপ্তাহ এ বাড়িতে থাকা যাবে না। আজই পালাতে হবে। রাতটা কোনমতে পার করে সকালে সূর্য ওঠার আগেই ‘হ্যাপিশ’।

‘আয়, লাইব্রেরি ঘর দেখি।’

‘আবার লাইব্রেরি ঘরও আছে?’

‘বলিস কি ! লাইব্রেরি ঘর থাকবে না? লাইব্রেরি ঘর পুরোটা কাঠের করেছি। মেঝেও কাঠের। সব রকম বইপত্র আছে; ঘন্টার পর ঘণ্টা তুই বই পড়ে কাটাতে পারবি। নিউ মার্কেটের এক দোকানের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে রেখেছি — ভাল ভাল বই এলেই পাঠিয়ে দেয়। লাইব্রেরি ঘরে কম্পিউটার বসিয়েছি। তুই কম্পিউটার চালাতে জানিস ?’

'না।’

‘আমিও জানি না। যাদের কাছ থেকে কিনেছি ওদের বলা আছে, অবসর পেলেই

খবর দেব, ওরা এসে শিখিয়ে দেবে।’

‘অবসর পাচ্ছ না?’

‘অবসর পাব কোথায়? সকালটায় একটু অবসর থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমুতে যাই – সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাই। সারারাত জেগে থাকি – দুপুরে না ঘুমালে চলবে কেন ?’

‘সারারাত জেগে থাক কেন?’

‘ঘুম না হলে জেগে না থেকে করব কি?’

‘ঘুম হয় না?’

‘না।’

‘ডাক্তার দেখিয়েছ?’

‘ডাক্তারের পেছনে জলের মত টাকা খরচ করেছি। এখনো করছি। এখনো চিকিৎসা চলছে। সাইকিয়াট্রিস্ট চিকিৎসা করছেন।’

‘তারা কিছু পাচ্ছে না?’

‘পাচ্ছে কি পাচ্ছে না ওরাই জানে। ওদের চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না। এখন তুই হলি ভরসা।’

‘আমি ভরসা মানে ? আমি কি ডাক্তার না-কি ?’

‘ডাক্তার না হলেও তোর নাকি অনেক ক্ষমতা। সবাই বলে। তুই আমাকে রাতে ঘুমের ব্যবস্থা দে। তুই যা চাইবি তা-ই পাবি। ওয়াইনের ঐ বোতলটা তোকে না হয় দিয়ে দেব ?’

পঞ্চাশ বছরের পুরানো মদের বোতল পাব এই আনন্দ আমাকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। আমার ভয় হল এই ভেবে যে রেশম খালা আমার উপর ভর করেছেন। সিন্দাবাদের ভূত সিন্দাবাদের উপর একা চেপেছিল। রেশম খালা আমার উপর এক চাপেন নি, তাঁর পুরো বাড়ি নিয়ে চোপছেন। একদিনেই আমার চ্যাপ্টা হয়ে যাবার কথা। চ্যাপ্টা হওয়া শুরু করেছি।

‘হিমু!’

‘জ্বি।’

‘আমার ব্যাপারটা কখন শুনবি?’

‘তোমার কোন ব্যাপার?’

‘ওমা, এতক্ষণ কি বললাম – রাতে ঘুম না হওয়ার ব্যাপারটা।’

‘একসময় শুনলেই হবে। তাড়াতো কিছু নেই।’

‘এখন তুই কি করবি?’

‘বুঝতে পারছি না। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব বলে ভাবছি। যে বিছানা বানিয়েছ শুতে সাহসও হচ্ছে না।’

‘রেশমা খালা বললেন, বিছানা এমন কিছু না। সাধারণ ফোমের তোষক। তবে বালিশ হচ্ছে পাখির পালকের।’

‘বল কি ?’

‘খুব এক্সপেনসিভ বালিশ। জ্যান্ত পাখির পাখা থেকে এইসব বালিশ তৈরি হয়। মরা পাখির পালকে বালিশ হয় না।’

‘একটা পালকের বালিশের জন্যে কটা পাখির পালক লাগে?’

‘কি করে বলব কটা — কুড়ি পঁচিশটা নিশ্চয়ই লাগে।’

‘একটা বালিশের জন্যে তাহলে পঁচিশটা পাখির আকাশে ওড়া বন্ধ হয়ে গেলো?’

‘আধ্যাত্মিক ধরনের কথা বলবি না তো হিমু এইসব কথা আমার কাছে ফাজলামীর মত লাগ।’

‘ফাজলামীর মত লাগলে আর বলব না।’

‘যা, তুই রেস্ট নে। চা কফি কিছু খেতে চাইলে ইন্টারকমে বলে দিবি।’

‘তুমি কি বেরুচ্ছ?’

‘হু। বললাম না সকালে আমি একটু বের হই। দিন রাত ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তুই তো এখন আর বের হবি না?’

‘না।’

‘তাহলে তালা দিয়ে যাই।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, তালা দিয়ে যাবে মানে?

খালা আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, তুই আমার মূল বাড়িতে থাকবি তোকে তালা দিয়ে যাব না? লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস চারদিকে।

‘ঘরে যদি আগুন টাগুন লেগে যায় তখন কি হবে?’

‘খামাখা আগুন লাগবে কেন? আর যদি লাগে প্রতি ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইসার আছে।’

‘তালা দেয়া অবস্থায় কতক্ষণ থাকব।’

‘আমি না আসা পর্যন্ত থাকবি। আমি তো আর সারাজীবনের জন্যে চলে যাচ্ছি না। ঘন্টাখানিক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। সামান্য কিছুক্ষণ তালাবন্ধ থাকবি এতেই মুখ চোখ শুকিয়ে কি করে ফেলেছিস ।’

‘খালা, আমি হচ্ছি মুক্ত মানুষ। এটাই সমস্যা।’

‘বিছানায় শুয়ে বইটই পড়, টিভি দেখ। আমি তোকে কফি দিতে বলে যাচ্ছি।’

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঘটং ঘটাং শব্দে তালা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। এ বাড়ির সব কিছু আধুনিক হলেও তালাগুলি সম্ভবত মান্ধতার আমলের। বড় শব্দ হয়।

পালকের বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমাকে কফি দিয়ে গেছে। চাইনীজ খাবার কি খাব বাবুর্চি জানতে এসেছিল, হাতে নোট-বুক, পেন্সিল। আমি গম্ভীর গলায় বলেছি আরশোলা দিয়ে হট এন্ড সাওয়ার করে একটা সুপ খাব। চাইনীজরা শুনেছি আরশোলার সুপ খুব সখ করে খায়। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি।

বাবুর্চি হতভম্ব গলায় বলল, স্যারের কথা বুঝতে পারলাম না। কিসের স্যুপ?

‘ককরোচ স্যুপ। সঙ্গে মাশরুম দিতে পারেন, বেবী কর্ণ দিবেন। সয়াসস অলপ দেবেন। আরশোলার গন্ধ মারার জন্যে যতটুক দরকার ঠিক ততটুক, বেশিও না কমও না।’

‘আমি স্যার আসলেই আপনার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘বুঝতে না পারলে বিদায় হয়ে যান।’

‘জ্বি আচ্ছ, স্যার।’

তালাবন্ধ বাড়িতে পড়ে আছি। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি কাজ করতে শুরু করেছে। সময় থেমে গেছে। টাইম ডাইলেশন। তালাবন্ধ অবস্থায় যে এর আগে থাকিনি তা না। হাজতে কাটানো রাতের সংখ্যা কম না। তবে হাজত তালাবন্ধ থাকবে এটা স্বীকৃত সত্য বলে খারাপ লাগে না। তালা খোলা অবস্থায় হাজতে বসে থাকাটা বরং অস্বস্তিকর। কিন্তু স্বর্গপুরীতে তালাবন্ধ অসহনীয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেহেশত কেমন হবে? সেখানেও কি এ রকম তালা সিস্টেম থাকবে। ন-কি বেহেশতবাসীরা মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। কারো ইচ্ছ হল সে দোজখে তার কোন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এল। বেহেশতের বর্ণনা ভাল মত জেনে নিতে হবে। খালার নামাজ ঘরে প্রচুর ধর্মের বই-টই আছে। সেখানে বেহেশত সম্পর্কে কি লেখা আছে পড়তে হবে।

কফি খাচ্ছি, কফিতে কোন স্বাদ পাচ্ছি না। স্বাদ যেমন নেই, গন্ধও নেই। একটু পর পর চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ঘড়ি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার বিখ্যাত বাবা আমাকে বন্দি থাকার ট্রনিং অতি শৈশবে দিয়ে দিয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল মহাপুরুষ বানানোর জন্যে এই ট্রেনিং অতি জরুরি। বদি না থাকলে 'মুক্তি'র স্বরূপ বোঝা যায় না। কাজেই একদিন আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলেন – তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা হলাম না। বাবার পাগলামীর সঙ্গে ততদিনে পরিচিত হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা সন্ধ্যা নাগাদ তালা খোলা হবে। আতংকে অস্থির হয়ে লক্ষ্য করলাম সন্ধ্যার পর পর বাবা বাড়ি ছেড়েই চলে গেলেন। যাবার সময় মেইন সুইচ অফ করে দিলেন। একেবারে কবরের অন্ধকার। ঐটা ছিল আমার বাবার ভয় জয় করা ট্রেনিং-এর প্রাথমিক অংশ। তার ডায়েরীতে তিনি লিখেছিলেন –

> 'অদ্য রজনীতে হিমালয়কে ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। মানুষের প্রধান ভয় অন্ধকারকে। যে অন্ধকারের স্মৃতি সে অন্য কোন ভুবন হইতে লইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারকে জয় করার অর্থ সমস্ত ভয় জয় করা। অদ্যকার অন্ধকার জয় করা বিষয়ক প্রাথমিক ট্রেনিং হিমালয় কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে পারিতেছি না। এই শক গ্রহণ করিবার মানসিক শক্তি কি তাহার আছে? বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকেও বাহির হইতে দেখিয়া তাহার মানসিক শক্তি সম্পকে ধারণা করা যায় না। সেই দিব্য দৃষ্টি প্রকৃতি মানব সম্প্রদায়কে দেয় নাই . . . '

আমি ইন্টারকম টিপে বাবুর্চিকে ডাকলাম। ইন্টারভু নেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, কি নাম ?

'ইদ্রিস!'

শুরুতে তাকে আপনি করে বলেছিলাম, এখন তুমি।

'শোন ইদ্রিস ! এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে? বাথরুম থেকে পাইপ বেয়ে নেমে পড়া বা এ জাতীয় কিছু?'

'জ্বি না।'

'ছাদে উঠে, ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে যাওয়া যায় না?'

'জ্বি-না।'

'টেলিফোন নিয়ে আস। দমকল অফিসে টেলিফোন করে দি। ওরা তালা খুলে উদ্ধার করবে।'

'টেলিফোন নাই স্যার।'

'টেলিফোন নাই মানে ?'

'এই বাড়িতে সব আছে টেলিফোন নাই। টেলিফোনে লোকজন বিরক্ত করে। ম্যাডামের ভাল লাগে না।'

'ও, আচ্ছা।'

'স্যার, আরেক কাপ কফি এনে দেই। চিন্তার কিছু নাই ম্যাডাম চলে আসবেন। উনি বেশীক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন না। চলে আসেন। কফি দিব স্যার ?'

'দাও!'

বাবুর্চি কফি এনে দিল। আমি কফি খেয়ে রেশমা খালার অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি রাত হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

'কিরে, ঘুম ভেঙেছে?'

রেশমা খালা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। তিনি মাথার নকল চুল খুলে ফেলেছেন। তাকে মোটামুটি বীভৎস দেখাচ্ছে। তার মাথার আদি চুলের এই অবস্থা কে জানত। কিছু আছে কিছু নেই। যেখানটায় নেই সেখানটার মাথার হলুদ চামড়া চকচক করছে।

'ঘরে ফিরে দেখি তুই মরার মত ঘুমুচ্ছিস। তাই আর ঘুম ভাঙালাম না। ঘুমের মূল্য কি তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। এতক্ষণ ধরে কেউ ঘুমুতে পারে তাও জানতাম না। তোর কোন অসুখ বিসুখ নেই তো?'

'কটা বাজে খালা?'

'নটার কাছাকাছি। তুই এক নাগাড়ে প্রায় দশঘন্টা ঘুমুলি। ক্ষিধে লেগেছে নিশ্চয়ই। হাত-মুখ ধুয়ে আয় ভাত খাই।'

আমি উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, ভাত খেয়েই আমি একটু বেরুব খালা।

'বের হতে চাইলে বের হবি। আমি কি তোকে আটকে রেখেছি না-কি? বাবুর্চি বলছিল তালা দিয়ে যাওয়ায় তুই নাকি অস্থির হয়ে পড়েছিলি। আশ্চর্য। তুই কি ছেলেমানুষ না-কি? তুই আবার তাকে বলেছিস তেলাপোকার সুপ খেতে চাস। হি হি হি। বাবুর্চিটা বোকা টাইপের, ও সত্যি ভেবে বসে আছে। ঠাট্টা বুঝতে পারেনি।'

'তেলাপোকার সুপ তৈরি করেছে? আমি ঠাট্টা করিনি। আসলেই খেতে চেয়েছিলাম।'

'তুই দেখি আচ্ছা পাগল। আয় খেতে আয়। খেতে খেতে আমার ভয়ংকর গল্পটা বলব। তুই আবার চারদিকে বলে বেড়াবি না।

ডাইনিং রুম ছাড়াও ছোট একটা খাবার জায়গা আছে। শ্বেত পাথরের টেবিলে দুটা মাত্র চেয়ার। মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। টেবিলে নানান ধরনের পদ সাজানে।

বাবুর্চি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খালা বললেন, 'তুমি চলে যাও, তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে ঘন্টা বাজাব তখন সব পরিস্কার করবে।'

'ঘন্টার ব্যবস্থাও আছে?'

'আছে, সব ব্যবস্থাই আছে। খাওয়া শুরু কর। বাবুর্চির রান্না কেমন বলবি। রান্না পছন্দ না হলে ব্যাটাকে বিদেয় করে দেব। ব্যাটার চোখের চাউনি ভাল না। সুপটা কেমন?'

'ভাল। খুব ভাল।'

'তুই তো এখনো মুখেই দিস নি। মুখে না নিয়েই বলে ফেললি ভাল?'

'গন্ধে গন্ধে বলে ফেলেছি। চায়নীজ খাবারের আসল স্বাদ গন্ধে। গন্ধ ঠিক

আছে। রেখে দাও।'

'চোখের চাউনিটা যে খারাপ। মাঝে মাঝে ভয়ংকর করে তাকায়।'

'ওকে বলবে সব সময় যেন সানগ্লাস পরে থাকে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না। ভাল বলেছিস হিমু এটা আমার মাথায় আসেনি। কথায় আছে। না এক মাথার থেকে দুমাথা ভাল – আসলেই তাই। এখন আমার সমস্যাটা শোন। খুব মন দিয়ে শুনবি।'

'খাওয়া শেষ হোক তারপর শুনি . . . '

'খেতে খেতেই শোন। আমি আবার চুপচাপ খেতে পারি না। ব্যাপারটা কি হয়েছে শোন। তোর খালু মারা যাবার পর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল ফালতু লোকে। অমুক আত্মীয় তমুক আত্মীয়। এক্কেবারে খুঁটি গেড়ে বসেছে। মতলব আর কিছু না – টাকা পয়সা হাতানো। টাটকা মধু পড়ে আছে – পিঁপড়ার দল চারদিক থেকে এসে পড়েছে। আমি একে একে ঝেটিয়ে সব বিদেয় করলাম। বাড়ি খালি করে ফেললাম। চব্বিশঘণ্টা গেটে তালার ব্যবস্থা করলাম। একজনের জায়গায় দুজন দারোয়ান রাখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। কাউকে ঢুকতে দেবে না। কেউ যদি ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট। আমার যদি কারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হয় আমি নিজেই দেখা করতে যাব। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। লোকজন টেলিফোনে বিরক্ত করে। দিলাম টেলিফোন লাইন কেটে।

এত বড় বাড়িতে আমি থাকি একা। একটু যে ভয় ভয় লাগে না, তা না। লাগে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের যন্ত্রণার চেয়ে ভয় পাওয়া ভাল। লক্ষ গুণ ভাল।

তারপর একদিন কি হয়েছে শোন। রাত এগারেটার মত বাজে। খুব দেখি মশা কামড়াচ্ছে। দরজায়, জানালায় নেট আছে তারপরেও এত মশা ঢুকল কি ভাবে? আমার মেজাজ হয়েছে খারাপ। কারণ আমি আবার মশারির ভেতর ঘুমুতে পারি না। আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল রেবা। ওকে বললাম মশারি খাটিয়ে দিতে। ও মশারি খাটিয়ে দিল। মেজাজ টেজাজ খারাপ করে ঘুমুতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির কাছে গেলাম, মশারি তুলে দেখি মশারীর ভিতর ও বসে আছে। তোর খালু। নেংটো হয়ে বসে আছে। গুটিসুটি মেরে বসা। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান। সেই থেকে শুরু। কখনো তাকে দেখি খাটের নিচে। কখনো বাথরুমের বাথটাবে। একদিন পেলাম ডীপ ফ্রীজে।'

'কোথায়, ডীপ ফ্রীজে ?'

'হ্যাঁ। ডীপ ফ্রীজ সব সময় বাবুর্চি খোলে। সেদিন ফ্রীজে জিনিসপত্র কি আছে দেখার জন্যে ডালটা তুললাম – দেখি একেবারে খালি ফ্রীজ, সেখানে ও বসে ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে। এই হল ব্যাপার, বুঝলি। এরপর থেকে রাতে ঘুমুতে পারি না।'

'রোজই দেখ?'

'প্রায় রোজই দেখি।'

'আজ দেখেছ?'

'এখনো দেখিনি। তবে দেখব তো বটেই। এর মানেটা কি বল তো হিমু? এই অত্যাচারের কারণ কি? ভূত প্রেত বলে সত্যি কিছু আছে? মানুষ মরলে ভূত হয়?'

আমি দেখলাম রেশম খালা আর কিছু খেতে পারছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে।

হাত কাঁপছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হিমু কথা বলছিস না কেন?

‘তুমি একাই উনাকে দেখ না আরো অনেকেই দেখে?’

‘সবাই দেখে। রেবা দেখেছে। দেখে চাকরি-টাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমার সাথে যারা আছে তারাও দেখেছে। এরা কেউ রাতে দোতলায় ওঠে না। তুই রাতটা আমার সঙ্গে থাক। তুইও দেখবি।’

আমি খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম বেচারীর জন্যে মায়া লাগছে।

৫

রেশমা খালার 'প্যালেসে' এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। সমস্যামুক্ত জীবন যাপন। আহার, বাসস্থান নামক দুটি প্রধান মৌলিক দাবি মিটে গেছে। এই দুটি দাবি মিটলেই বিনোদনের দাবি ওঠে। খালার এখানে বিনোদনের ব্যবস্থাও প্রচুর আছে। আমার ভালই লাগছে।

ট্রাক দেখলে লোকে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেই খোলা ট্রাকে করে ভ্রমণের আনন্দ অন্য রকম। আমার অবস্থা হয়েছে এরকমই। রেশমা খালার সঙ্গে গল্পগুজব করতে এখন ভালই লাগে। শুধু রাতে একটু সমস্যা হয়। রেশম খালা আমার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেন, আয় আয়, দেখে যা, নিজের চোখে দেখে যা। বসে আছে, খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, থাকুক বসে। তুমিও তার পাশে বসে পা নাচাতে থাকো। এ ছাড়া আর করার কি আছে ?

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, নিঝঞ্ঝাট জীবন যাপন সম্ভব না। সব জীবনেই কিছু ঝামেলা থাকবে। কাবাব যতই ভালই হোক, কাবাবের এক কোনায় ছোট হাড্ডির টুকরো থাকবেই।

রাতে রেশমা খালার হৈ-চৈ, ছোটাছুট, চিৎকার অগ্রাহ্য করতে পারলে গনি প্যালেসে মাসের পর মাস থাকা যায়। তাছাড়া ঐ বাড়ির বাবুর্চির সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়েছে। নাপিত সম্প্রদায়ের মানুষ খুব বুদ্ধিমান হয় বলে জনশ্রুতি -- আমাদের বাবুর্চি সব নাপিতের কান কেটে নেয়ার বুদ্ধি রাখে। বোকার ভান করে সে দিব্য আছে।

এক সকালে সে আমার জন্যে বিরাট এক বাটি স্যুপ বানিয়ে এনে বলল, আপনি একবার আরশোলার স্যুপ চেয়েছিলেন, বানাতে পারিনি। আজ বানিয়েছি। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনার পছন্দ হবে। সঙ্গে মাশরুম আর ব্রকোলি দিয়েছি।

বাটির ঢাকনা খুলে আমার নাড়িভুড়ি পাক দিয়ে উঠলো। সাদা রঙের সুপ, তিনচারটা তেলাপোকা ভাসছে। একটা আবার উল্টো হয়ে আছে। তার কিলবিলে পা দেখা যাচ্ছে।

বাবুর্চি শান্ত স্বরে বলল, সস-টস কিছু লাগবে স্যার?

আমি বললাম, কিছুই লাগবে না। তাকে পুরোপুরি হতভম্ব করে এক চামচ মুখে দিয়ে বললাম, সুপটা মন্দ হয়নি। তবে আরশোলার পরিমাণ কম হয়েছে।

আমি কোন চীজ সে ধরতে পারেনি। ধরতে পারলে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে যেত না। আমি তাকে সামনে দাঁড়া করিয়েই পুরো বাটি স্যুপ খেয়ে বললাম – বেশ ভাল হয়েছে। পরেরবার আরশোলার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এটা যেন মনে থাকে।

বাবুর্চি বিড় বিড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা, স্যার।

রেশমা খালা আমার প্রতি যথেষ্ট মমতা প্রদর্শন করছেন। সেই মমতার নিদর্শন হচ্ছে আমাকে বলেছেন ও হিমু, তোর তো ভিক্ষুকের মত হাঁটাহাঁটির স্বভাব। হাঁটাহাঁটি না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। এখন থেকে গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করবি।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

‘পাজেরো নিয়ে বের হবি। যেখানে যেখানে হাঁটতে ইচ্ছা করবে ড্রাইভারকে বলবি, গাড়ি নিয়ে যাবে।’

‘এটা মন্দ না। গাড়িতে চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।’

কিছুদিন থেকে আমি পাজেরো নিয়ে হাঁটছি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি এই গাড়িতে বসলেই ছোট ছোট গাড়ি বা রিকশাকে চাপা দেয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়। ট্রাক ড্রাইভার কেন অকারণে টেম্পো বা বেবীটেক্সির উপর ট্রাক তুলে দেয় আগে কখনো বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি। এখন মনে হচ্ছে দোষটা সর্বাংশে ট্রাক ড্রাইভারদের নয়, দোষটা ট্রাকের।

যে বড় সে ছোটকে পিষে ফেলতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম। ডারউইন সাহেবের ধারণা ‘সারভাইভেল ফর দি ফিটেস্ট’ শুধু জীবজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে, বস্তুজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে না, তা হয় না।

পাজেরো নিয়ে হাঁটতে বেরুবার একটাই সমস্যা — গলিপথে হাঁটা যায় না। রাজপথে হাঁটতে হয়। এরকম রাজপথে হাঁটতে বের হয়েই একদিন ইরার সঙ্গে দেখা। সে বেশ হাত নেড়ে গল্প করতে করতে একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। দূর থেকে দুজনকে প্রেমিক-প্রেমিকার মত লাগছে। ছেলেটে সুদর্শন। লম্বা, ফর্সা, কোকড়ানো চুল। কফি কালারের সার্টে সুন্দর মানিয়েছে। তার চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য। সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাঁটলেই আপনাআপনি ছেলেদের চেহারায় কিছু গাম্ভীর্য চলে আসে। তার একটু বেশি এসেছে।

আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, ঐ যে ছেলেমেয়ে দুটি যাচ্ছে, ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে বিকট হর্ন দিন। যেন দুজন ছিটকে দুদিকে পড়ে যায়।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, তারা যাচ্ছে ফুটপাতে। ফুটপাতে গাড়ি নিয়ে উঠব কিভাবে ?

‘তাহলে তাদের সাইডে নিয়ে গিয়েই হর্ন দিন। চেষ্টা করবেন হনটা যথাসম্ভব বিকট করার জন্যে ।’

তাই করা হল। হর্ন শুনে ছেলেটার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। ইরা ছেলেটার মত চমকালো না। মেয়েদের স্নায়ু ছেলেদের চেয়ে শক্ত হয়। আমি গলা বাড়িয়ে বললাম, এই ইরা, এই ? যাচ্ছ কোথায় ?

ইরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সঙ্গী ছেলেটা হতভম্ব।

আমি প্রায় অভিমানের মত গলায় বললাম, ঐ যে তুমি মেসে এসে একবার গল্পগুজব করে গেলে, তারপর তোমার আর কোন খোঁজ নেই। ব্যাপার কি বল তো? আমি এমন কি অন্যায় করেছি ?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার চোখ-মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার প্রেমিকা অন্য একজনের মেসে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে এটা সহ্য করা মুশকিল। কোন প্রেমিকই করে না।

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, উঠে এসো ইরা। উঠে এসো। তোমার সঙ্গে এক লক্ষ কথা আছে। আজ সারাদিন গাড়ি করে ঘুরব আর গল্প করব।

ইরা কঠিন মুখ করে এগিয়ে এল। গাড়ির জানালার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনি এইভাবে কথা বলছেন-কেন ?

‘কোনভাবে বলছি ?’

‘এমনভাবে বলছেন যেন আপনি আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। ব্যাপার সে রকম

নয়। মুহিব না জানি কি ভাবছে।'
'মুহিবটা কে ? ঐ ক্যাবলা?'
'ক্যাবলা বলবেন না, কোনদিন না। কখনো না।'
'তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড?'
'হ্যাঁ।'
'তার ফ্রেন্ডশীপ কতটা গাঢ় সেটা আজ আমরা একটু পরীক্ষা করি। তুমি এক কাজ কর – মুহিবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠে এসো। ওর প্রেমের দেড়টা পরীক্ষা করা যাক। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকবে, রাগে থরথর করে কাঁপবে। সেটা দেখতে ইন্টারেস্টিং হবে।'
'সবার সঙ্গেই আপনি এক ধরনের খেলা খেলেন। আমার সঙ্গে খেলবেন না। এবং আপনি আমাকে আবার তুমি করে বলছেন। এ রকম কথা ছিল না।'
'আপনি তাহলে গাড়িতে উঠবেন না?'
'অবশ্যই না। আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? পাপেট? সূতা দিয়ে বাঁধা পাপেট ?'
'গাড়িতে না উঠলে চলে যাই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া মুহিব ছেলেটি কেমন ক্যাবলার মত হা করে আছে। দেখতে খারাপ লাগছে। আপনি বরং ওর কাছে চলে যান। ওকে বলুন হা করে তাকিয়ে না থাকতে। মুখে মাছি ঢুকে যেতে পারে।'
'এ রকম অশালীন ভঙ্গিতেও আর কোন দিন কথা বলবেন না।'
'আর কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। কথা বলার তো প্রশ্ন আসছে না।'
'দেখা হবে না মানে কি ?'
'দেখা হবে না মানে, দেখা হবে না। মাসখানিকের জন্যে আমি অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি।'
'কোথায় ?'
'হয় টেকনাফে, নয় তেতুলিয়ায়।'
'বাদলদের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলেছিলাম, আপনি যাননি। ঐ বাড়িতে আপনাকে ভয়ংকর দরকার।'
'দরকার হলেও কিছু করার নেই। আচ্ছ ইরা, আমি বিদেয় হচ্ছি – তুমি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাও।'
ইরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এখন চলে গেলে আর আপনার দেখা পাব না। বাদলের আপনাকে ভয়ংকর দরকার।
'তাহলে দেরি করে লাভ নেই, উঠে এসো।'
'এই গাড়িটা কার?'
'কার আবার? আমার। তুমি দেরি করছ ইরা।'
আপনি আসলে চেষ্টা করছেন মুহিবের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কেন বলুন তো? '
'ঈর্ষা ?'
'ঈর্ষা মানে ? আপনি কি আমার প্রেমে পড়েছেন যে ঈর্ষা ?'
মুহিব আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। তার মুখে বিরক্তির গাঢ় রেখা। সে কর্কশ গলায় ডাকল – ইরা, শুনে যাও।
আমি বললাম, যাও, শ্রীকৃষ্ণের বাশি বেজে উঠেছে।

ইরা দোটানায় পড়ে গেলো। আমি ড্রাইভারকে বললাম, চল, যাওয়া যাক।

ড্রাইভার হুস করে বের হয়ে গেলো। যতটা স্পীড়ে তার বের হওয়া উচিত তারচেয়েও বেশি স্পীডে বের হল। মনে হচ্ছে সেও খানিকটা অপমানিত বোধ করছে। পাজেরোর মত বিশাল গাড়ি অগ্রাহ্য করার দুঃসাহসকে সেই গাড়ির ড্রাইভার ক্ষমা করে দেবে, তা হয় না।

'এখন কোন দিকে যামু স্যার?'

'দিক টিক না – চলতে থাক।'

দুপুরের দিকে আমি আমার পুরানো মেসে গেলাম। বদরুল সাহেবের খোঁজ নেয়া দরকার। চাকরির কিছু হয়েছে কি-না। হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না, তবে বদরুল সাহেবের বিশ্বাস থেকে মনে হচ্ছে, হয়ে যেতেও পারে। মানুষের সবচে' বড় শক্তি তার বিশ্বাস।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বদরুল সাহেব দরজা খুললেন। তার হাসি-খুশি ভাব আর নেই। চোখ বসে গেছে। এই দুদিনেই মনে হয় শরীর ভেঙে পড়েছে। তার গোলগাল মুখ কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে।

'বদরুল সাহেবের খবর কি ?'

'খবর বেশি ভাল না, হিমু ভাই।'

'কেন বলুন তো?'

'আমার স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ। ছোট মেয়ের চিঠি গত পরশু পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পর থেকে খেতেও পারছি না, ঘুমুতেও পারছি না।'

'ঢাকায় পড়ে আছেন কেন? আপনার চলে যাওয়া উচিত না?'

'ইয়াকুব আগামীকাল বিকেলে দেখা করতে বলেছে, এই জন্যেই যেতে পারছি না।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনাকে চাকরি দিচ্ছে ?'

'জ্বি। চাকরিটাও তো খুব বেশি দরকার। চাকরি না পেলে সবাই না খেয়ে মরব। আমি খুবই গরিব মানুষ, হিমু ভাই। কত শখ ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একসঙ্গে থাকব। অর্থের অভাবে সম্ভব হয় নাই। একবার মালীবাগে একটা বাসা প্রায় ভাড়া করে ফেলেছিলাম। দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট। বরাদা আছে। রান্নার একটা জায়গা আছে। সামনে বড় আমগাছ। ডালে দোলনা বাধা। এত পছন্দ হয়েছিল। ভেবেছিলাম কষ্ট করে কোনমতে থাকব। এরা ছয় মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স চাইল। কোথায় পাব ছয় মাসের এ্যাডভান্স, বলুন দেখি!'

'তা তো বটেই।'

'হিমু ভাই, ছোট মেয়ের চিঠিটা একটু পড়ে দেখেন।'

'মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ে। কিন্তু ভাই চিঠি পড়লে মনে হয় না। মনে হয় কলেজে পড়া মেয়ের চিঠি। দুটা বানান অবশ্য ভুল করেছে।'

চিঠি পড়লাম।

আমার অতি প্রিয় বাবা,

বাবা, মার খুব অসুখ করেছে। প্রথমে বাসায় ছিল, তারপর পাশের বাড়ির মজনু ভাইয়া মা'কে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ডাক্তাররা বলেছে ঢাকায় নিয়ে যেতে। বাসায় সবাই কান্নাকাটি করছে।

তুমি কোন টাকা পাঠাও নাই কেন বাবা? মা প্রথম ভেবেছিল পোস্টাপিসে টাকা

আসেনি। রোজ পোস্টাপিসে খোজ নিতে যায়। তারপর মা কোথেকে যেন শুনল তোমার চাকরি চলে গেছে।

বাবা, সত্যি কি তোমার চাকরি চলে গেছে? সবার চাকরি থাকে, তোমারটা চলে গেলো কেন ? তোমার চাকরি চলে যাবার খবর শুনে মা বেশি কান্নাকাটি করেনি, কিন্তু বড় আপা এমন কান্না কেঁদেছে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। বড় আপা কাঁদে আর বলে – "আমার এত ভাল বাবা ! আমার এত ভাল বাবা " আমি বেশি কাঁদিনি, কারণ আমি জানি, তুমি খুব একটা ভাল চাকরি পাবে। কারণ আমি নামাজ পড়ে দোয়া করেছি। বাবা, আমি নামাজ পড়া শিখছি। ছোট আপা বলেছে আত্তাহিয়াতু ছাড়া নামাজ হয় না। ঐ দোয়াটা এখনো মূখস্থ হয় নাই। এখন মূখস্থ করছি। মূখস্থ হলে আবার তোমার চাকরির জন্যে দোয়া করব।

বাবা, মার শরীর খুব খারাপ। এত খারাপ যে তুমি যদি মাকে দেখ চিনতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাবা।

ইতি তোমার অতি আদরের ছোট মেয়ে
জাহেদা বেগম
ক্লাস সিক্স
রোল নং ১

'চিঠি পড়েছেন হিমু ভাই?'

'জ্বি।'

'মেয়েটা পাগলী আছে। চিঠির শেষে সব সময় কোন ক্লাস, রোল নং কত লিখে দেয়। ফাস্ট হয় তো, এই জন্য বোধহয় লিখতে ভাল লাগে।'

'ভাল লাগারই কথা।'

'দুটা বানান ভুল করেছে লক্ষ্য করেছেন? খোজ আর মুখস্থ। মুখস্থ দীর্ঘ উকার দিয়ে লিখেছে। কাছে থাকি না, কাছে থাকলে যত্ন করে পড়াতাম। সন্ধ্যাবেলা নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসার আনন্দের কি কোন তুলনা আছে? তুলনা নেই। সবই কপাল ।'

বদরুল সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছছেন। যতই মুছছেন ততই তাঁর চোখে পানি আসছে।

'বদরুল সাহেব !'

'জ্বি, হিমু ভাই।'

'আগামীকাল পাঁচটার সময় আপনার ইয়াকুব সাহেবের কাছে যাবার কথা না?'

'জ্বি।'

'আমি ঠিক চারটা চল্লিশ মিনিটে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধু আবার আমাকে দেখে রাগ করবে না তো?'

'জ্বি না, রাগ করবে না। রাগ করার কি আছে। সে যেমন আমার বন্ধু, আপনিও সে রকম আমার বন্ধু। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। চাকরির সংবাদ একসঙ্গে পাব। দুঃখ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে না ভাই সাহেব, কিন্তু আনন্দ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে।'

'ঠিক বলেছেন। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?'

'জ্বি না।'

'আসুন, ভাত খেয়ে আসি।'

‘কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, হিমু ভাই। এমিতেই মেয়ের চিঠি পড়ে মনটা খারাপ, তার উপরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে — মনটা ভেঙে গেছে।’

‘কি ঘটনা?’

‘বলতে লজ্জা পাচ্ছি, হিমু ভাই।’

‘লজ্জা পেলে বলার দরকার নেই।’

‘না, আপনার কাছে কোন লজ্জা নেই। আপনি শুনুন – ফার্মগেটে গিয়েছি – হঠাৎ দেখি রশীদ। আবদুর রশীদ। নগ্ন। শুধু কোমরে একটা গামছা। এর-তার কাছে যাচ্ছে আর বলছে – একটা লুঙ্গি কিনে দিতে।’

‘আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?’

‘জ্বি না। ও যেন আমাকে দেখতে না পায় এই জন্যে পালিয়ে চলে এসেছি। তারপর নিজের একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট নিয়ে আবার গেলাম। তাকে পাইনি। মানুষের কি অবস্থা দেখেছেন হিমু ভাই?’

‘জ্বি দেখলাম।’

‘ইয়াকুবের কাছে ওর চাকরির কথা বলব বলে ভাবছি।’

‘আগে নিজেরটা হোক তারপর বলবেন।’

‘রশীদকে দেখে এত মনটা খারাপ হয়েছে।’

‘আপনি তাহলে দুপুরে কিছু খাবেন না?’

‘জ্বি না।’

‘তাহলে আমি উঠি। আগামী কাল চাকরির খবরটা নিয়ে আমরা এক কাজ করব। সরাসরি আপনার দেশের বাড়িতে চলে যাব।’

‘সত্যি যাবেন হিমু ভাই?’

‘যাব।’

‘আপনার ভাবীর শরীরটা খারাপ, আপনাকে যে চারটা ভাল-মন্দ রেখে খাওয়াবে সে উপায় নেই।’

‘শরীর ঠিক করিয়ে ভাল-মন্দ রাঁধিয়ে খেয়ে তারপর আসব। ভাবী সবচে’ ভাল রাঁধে কোন জিনিসটা বলুন তো?’

‘গরুর গোশতের একটা রান্না সে জানে। অপূর্ব! মেথিবাটা দিয়ে রাঁধে। পুরো একদিন সিরক-আদা-রসুনের রসে মাংস ডুবিয়ে রাখে, তারপর খুব অল্প আঁচে সারাদিন ধরে জ্বাল হয়। বাইরে থেকে এক ফোঁটা পানি দেয়া হয় না . . . কি যে অপূর্ব জিনিস ভাই সাহেব !’

‘ঐ মেথির রান্নাটা ভাবীকে দিয়ে রাঁধাতে হবে।’

‘অবশ্যই অবশ্যই। পোনা মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে এমন এক জিনিস খাওয়াবো, এই জীবনে ভুলবেন না। কচি সজনে পাতা বেটে পোনা মাছের সঙ্গে রাঁধতে হয়। কোন মসলা না, কিছু না, দুটা কাঁচামরিচ, এক কোয়া রসুন, একটু পেঁয়াজ। এই দেখুন বলতে বলতে জিবে পানি এসে গেলো।’

‘জিবে পানি যখন এসে গেছে চলুন, খেয়ে আসি।’

‘জ্বি আচ্ছা, চলুন। আপনি দেশে যাবেন ভাবতেই এত ভাল লাগছে!’

মেস থেকে বেরুবার মুখে ম্যানেজার হায়দার আলী খাঁ বললেন, স্যার, আপনি মেসে ছিলেন না, আপনার কাছে ঐ মেয়েটা দুবার এসেছিল।

‘ইরা?’

'জ্বী, ইরা। উনার বাসায় যেতে বলেছে। খুব দরকার।'

'জানি। আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের দেখা হয়েছে। ঐ মেয়ে যদি আবার আসে বলবেন, Get lost.'

'স্যার, কি বলব ?'

'বলবেন Get lost, কঠিন গলায় বলবেন।'

'জি, আচ্ছা।'

হায়দার আলী খাঁ পিরিচে চা খাচ্ছিল ! আবারো সারা শরীরে চা ফেলে দিল। এই মানুষটা আমাকে এত ভয় পায় কেন কে জানে।

রাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, দুঃশ্চিন্তা ও আতংক ভোরবেলা একটা 'হট শাওয়ার' দিয়ে রেশমা খালা দূর করে দেন। গোসলের পর তিনি পরচুলাটা মাথায় দেন। খানিকটা সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে বললেন, কি রে হিমু, জেগেছিস? গুড মর্নিং।

আমিও বলি, গুড মনিং খালা।

'চা দিতে বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

'তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে। কপালে টিপ দিয়ে বয়স দশ বছর কমিয়ে ফেলেছ। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স বাহান্ন।'

খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার বয়স তো আসলেই বাহান্ন।

'ও সরি!'

'হিমু, তোর ঠাট্টা-ফাজলামি আমার ভাল লাগে না। সাজগোজ সামান্য করি – তাতে কি? দুদিন পরে তো মরেই যাব। কবরে গিয়ে তো সাজতে পারব না। কবরে তোরা তো আর ক্রীম, লিপস্টিক দিয়ে আসবি না।'

'সেটা খাটি কথা।'

'বয়সকালে সাজতে পারিনি। এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলাম যার কাছে সাজা না-সাজা এক। তাকে একবার ভাল একটা ক্রীম আনতে বলেছিলাম, সে দেশী তিব্বত ক্রিম নিয়ে চলে এসেছে। তারপরেও আফসোস — এত নাকি দাম।'

'এখন তো পুষিয়ে নিচ্ছ।'

'তা নিচ্ছি। আয়, চা খাবি। আজ ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।'

'চমৎকার!'

চায়ের টেবিলে রেশমা খালাকে বললাম, খালা, অদ্য শেষ সকাল।

খালা বললেন, তার মানে কি ?

'তার মানে হচ্ছে নাশতা খেয়েই আমি ফুটছি।'

'ফুটছি মানে কি?'

'ফুটছি মানে বিদেয় হচ্ছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগারপার।'

'আশ্চর্য কথা ! চলে যাবি কেন? এখানে কি তোর কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। বরং সুবিধা হচ্ছে। আমার ভূড়ি গজিয়ে গেছে।'
'মেদ-ভূড়ি কি করি"-ওয়ালাদের খুঁজে বের করতে হবে।'
'ঠাট্টা করবি না হিমু। খবর্দার, ঠাট্টা না।'
'আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না খালা। চা খেয়েই আমি ফুটব।'
খালা বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আমার এই ভয়ংকর অবস্থা দেখেও তোর দয়া হচ্ছে না? রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না। ঐ বদমায়েশ লোকটার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে। আর তুই চলে যাবি?
আমি অবাক হয়ে বললাম, খালু সাহেব কি কালও এসেছিল? গতকাল তো তার আসার কথা না।
'গতকাল তার আসার কথা না মানে? তুই জানলি কি করে তার আসার কথা না?'
'আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'
খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে?
'হু।'
'হু-হ্যাঁ করিস না, ঠিকমত বল। তুই দেখেছিস?'
'হু।'
'আবার হু? আরেকবার হু বললে কেতলির সব চা মাথায় ঢেলে দেব। কখন দেখা হল ?'
'কাল রাত নটার দিকে।'
'বলিস কি ?'
'তুমি রাতে খাওয়ার জন্যে ডাকলে। আমি ঘর থেকে বেরুব। স্যান্ডেল খোঁজার জন্যে নিচু হয়ে দেখি, উনি ঘাপটি মেরে খাটের নিচে বসে আছেন।'
'তোর খাটের নিচে ও বসবে কিভাবে ? তোর খাটটা হল বক্স খাট। বক্স খাটের আবার নিচ কি ?'
'ঠিক নিচ না, বলতে ভুল করেছি। খাটের সাইডে।'
'গায়ে কাপড়-চোপড় ছিল ?'
'উহু।'
'তুই দেখে ভয় পেলি না?'
'ভয় পাব কেন ? জীবিত অবস্থায় উনার সঙ্গে আমার ভাল খাতির ছিল। একবার হেঁটে হেঁটে সদরঘাটের দিকে যাচ্ছি। তিনি তার প্রাইভেট রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে রিকশা থামিয়ে তুলে নিলেন। পথে এক জায়গায় আখের সরবত বিক্রি হচ্ছিল। রিকশা থামিয়ে আমরা আখের সরবত খেলাম। আরেকটু এগিয়ে দেখি ডাব বিক্রি করছে – রিকশা থামিয়ে দুজন ডাব খেলাম। তারপর খালু সাহেব আইসক্রীম কিনলেন। খেতে খেতে আমরা তিনজন যাচ্ছিলাম।'
'তিনজন হল কিভাবে ?'
রিকশাওয়ালাও খাচ্ছিল। তিনজন মিলে রীতিমত এক উৎসব। বুঝলে খালা, তখনই বুঝলাম উনি একজন অসাধারণ মানুষ। প্রায় মহাপুরুষ পর্যায়ের। ব্যবসায়ীরাও মহাপুরুষ হতে পারে কোনদিন ভাবিনি।'
'তুই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছিস। আসল কথা বল। খাটের নিচে ও বসেছিল ?'

'খাটের নিচে না, সাইডে।'

'তারপর ?'

আমি বললাম, খালু সাহেব, কেমন আছেন?

'সে কি বলল ?'

'কিছু বললেন না। মনে হল লজ্জা পেলেন। তখন আমি বেশ রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম – আপনার মত একটা ভদ্রলোক . . . মেয়েছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন। এটা কি ঠিক হচ্ছে? ভয় দেখানোর মধ্যেও তো শালীনতা, ভদ্রতা আছে। নেংটো হয়ে ভয় দেখানো। তাও নিজের স্ত্রীকে ! ছিঃ ছিঃ !'

'তুই কি সত্যি এইসব বলেছিস?'

'হ্যাঁ বললাম। উনি আমার কথায় লজ্জা পেলেন খুব। মাথা নিচু করে ফেললেন। আমার তখন মনটা একটু খারাপ হল। আমি বললাম, এসব করছেন কেন?'

'সে কি বলল ?'

'কথাবার্তা তার খুব পরিষ্কার না। অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তবু যা বুঝেছি, উনি বললেন – তোর খালাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এইসব করছি। শিক্ষা হয়ে গেলে আর করব না।'

রেশমা খালা ফস করে বললেন, শিক্ষা ? কিসের শিক্ষা? আমি কি করেছি যে সে আমাকে শিক্ষা দেবে? সারাজীবন যন্ত্রণা করেছে। মরার পরেও যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর কিছু না। লোকটা ছিল হাড় বদমাশ।

আমিও খালু সাহেবকে এই কথাই বললাম। শুধু বদমাশটা বললাম না। তখন খালু সাহেব বললেন, তুমি আসল ঘটনা জান না। তোমার খালা আমাকে বিষ খাইয়েছিল।

'এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে ? এত সাহস ? ব্যথায় তখন ওর দম যায়-যায় অবস্থা। আমার মাথার নেই ঠিক – দৌড়ে অষুধ নিয়ে এনে খাওয়ালাম . . .'

খালু বললেন, যেটা খাওয়ানোর কথা সেটা না খাইয়ে ভুলটা খাইয়েছে। পিঠে মালিশের অষুধ দুচামচ খাইয়ে দিয়েছে।

'ইচ্ছা করে তো খাওয়াইনি। ভয়ে আমার মাথা এলোমেলো।'

আমিও খালু সাহেবকে তাই বললাম। আমি বললাম – এটা অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল। রেশমা খালা মানুষ খুন করার মত মহিলাই না। অতি দয়া মহিলা।

'এটা শুনে কি বলল ?'

'খিক খিক করে অনেকক্ষণ হাসল। তারপর আমি বললাম, এখনো তোমার প্রতি খালার গভীর ভালবাসা। তোমার স্মৃতি রক্ষার্থে "গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব মডার্ন আর্টস" করবে।'

'শুনে কি বলল?'

'শুনে বলল, এইসব যদি করে তাহলে লাথি মেরে মাগীর কোমর ভেঙে ফেলব। ভূত হবার পর খালু সাহেবের ভাষার খুবই অবনতি হয়েছে। স্ত্রীকে মাগী বলা জীবিত অবস্থায় উনার জন্যে অকম্পনীয় ছিল।'

রেশম খালা এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আগের মত না – অন্যরকম। আমি খালু সাহেবকে বললাম, যা হবার হয়েছে। মাফ করে দেন। ক্ষমা যেমন মানবধর্ম, তেমনি ক্ষম হচ্ছে ভূতধর্ম। উনি এক শর্তে ক্ষমা করতে রাজি হয়েছেন।

'শর্তটা কি ?'

‘শর্তটা হচ্ছে – তুমি তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান-খয়রাত করবে। স্কুলকলেজে দিবে, এতিমখানা করবে, তার দরিদ্র সব আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করবে। তাহলেই তিনি আর তোমাকে বিরক্ত করবেন না।’

‘হিমু!’

‘জ্বি খালা।’

‘তুই অসম্ভব বুদ্ধিমান। তুই কিছুই দেখিসনি। কারো সঙ্গেই তোর কথা হয়নি। পুরোটা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলি – ঢিল লেগে গেছে। তোর খালু যেমন বোকা ছিল, আমিও ছিলাম বোকা। শুধু ছিলাম না – এখনো আছি। কথা দিয়ে তুই আমাকে প্যাচে ফেলেছিস। তোর ধারণা তোর কথা শুনে তার কোটি কোটি টাকা আমি দান-খয়রাত করে নষ্ট করব? রাতে ভূত হয়ে আমাকে ভয় দেখায়, তাতে কি হয়েছে? দেখাক যত ইচ্ছ। বদমায়েশের বদমায়েশ !’

‘এখন রাতে ভয় দেখাচ্ছেন, তারপর দিনেও দেখাবেন। আমাকে সে রকমই হিন্টস দিলেন।’

‘বেশি চালাকি করতে যাস না হিমু। তোর চালাকির আমি পরোয়া করি না। খবর্দার, তোকে যেন আর কোনদিন এই বাড়ির আশেপাশে না দেখি।’

‘আর দেখবে না খালা। এই যে আমি ফুটব, জন্মের মতই ফুটব। খালা শোন, খালু সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তার যে বর্ণনা আমি দিলাম তার পুরোটাই বানানো, তবে উনাকে আমি কিন্তু দেখেছি।’

‘চুপ থাক হারামজাদা!’

‘বিশ্বাস করুন উনাকে দেখেছি, এবং আপনি যে উনাকে মেরে ফেলেছেন এটা উনি ইশারায় আমাকে বোঝালেন। উনি কোন কথা বলেননি। ভূতদের সম্ভবত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না।’

‘চুপ হারামজাদা – শুওরের বাচ্চা। চুপ !’

রেশম খালা ভয়ানক হৈ-চৈ শুরু করলেন। বাবুর্চি, দারোয়ান, মালী সবাই ছুটে এল। রেশমা খালা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই চোরটাকে লাথি মেরে বের করে দাও ।

রেশমা খালার কর্মচারীরা ম্যাডামের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। শুধু লাথিটা দিল না। লাথির বদলে এমন গলাধাক্কা দিল যে রাস্তায় উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রক্ষা পেলাম। খালার বাড়িতে আমার রেক্সিনের একটা ব্যাগ রয়ে গেল। ব্যাগের ভেতর আমার ইহজাগতিক যাবতীয় সম্পদ। দুটা শার্ট, একটা খুব ভাল কাশ্মিরী শাল। শালটা রূপা আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। আমি হতদরিদ্র মানুষ হলেও বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি — ঢাকা শহরে এমন দামী শাল আর কারোরই নেই।

গলাধাক্কার ভেতর যে দিন শুরু হয়েছে সেই দিনের শেষটা কেমন হবে ভাবতেই আতংক লাগে। বিকেলে বদরুল সাহেবকে নিয়ে ইয়াকুব নামক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে যাবার কথা। সেখানে কোন নাটক হবে কে জানে।

রূপার সঙ্গে আজ সকালের মধ্যেই আমার দেখা করা দরকার। একমাত্র সেই পারে একদিনের নোটিশে বদরুল সাহেবের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে। টেলিফোনে রূপার সঙ্গে কথা বলব – না সরাসরি তার বাড়িতে উপস্থিত হব, বুঝতে পারছি না। বাদলদের বাড়িতেও একবার যাওয়া দরকার। বাদল এমন কি করছে যে

ইরাকে বার বার আমার খোঁজে যেতে হচ্ছে? রূপাকে বাদলদের বাসা থেকেও টেলিফোন করা যায়।

দরজা খুলে দিল ইরা। আমি অসম্ভব ভদ্র গলায় বললাম, কেমন আছেন?

ইরা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। দিন শুরু হয়েছে গলাধাক্কায়, কাজেই যার সঙ্গেই দেখা হবে সেই কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? আমাকে যে লাঠি দিয়ে মারছে না এই আমার তিনপুরুষের ভাগ্য।

'বাদল আছে না-কি ?'

'আছে।'

'ফুপা-ফুপু আছেন?'

'সবাই আছেন। আপনি বসুন।'

ইরা কঠিন মুখে ভেতরে চলে গেল।

এমনভাবে গেল যেন বন্দুক আনতে গেছে। ফুপা অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, প্যান্ট পরেছেন, বোতাম লাগানো হয়নি, প্যান্টের বেল্ট লাগানো হয়নি। এই অবস্থাতেই চলে এলেন। আগুন আগুন চোখে তাকালেন। স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রী। তার চোখেও আগুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, তারপর, খবর কি আপনাদের? সব ভাল?

ফুপা ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন। গর্জন শুনেই মনে হচ্ছে খবর ভাল না।

'আপনাদের আর কারো গলায় কাঁটা-ট্যাঁটা বিঁধেছে?'

ফুপা এবারে হুংকার দিলেন, ইয়ারকি করছিস? দাঁত বের করে ইয়ারকি ?

আমার অপরাধ কি বুঝতে পারছি না। তবে গুরুতর কোন অপরাধ যে করে ফেলেছি তা বোঝা যাচ্ছে। ইরাও এসেছে। তার চোখে আগে চশমা দেখিনি, এখন দেখি চশমা পরা।

ফুপু বললেন, তোকে যে এতবার খবর দেয়া হচ্ছে আসার জন্যে গায়ে লাগছে না? তোকে কি হাতি পাঠিয়ে আনাতে হবে ?

'এলাম তো।'

'এসে তো উদ্ধার করে ফেলেছিস।'

'ব্যাপারটা কি খোলাসা করে বলুন।'

কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এরকম – আমি বলব না। অন্য কেউ বলুক। আমি ইরার দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললাম, ইরা, চা খাব।

ইরা এমন ভাব করল যেন অত্যন্ত অপমানসূচক কোন কথা তাকে বলা হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যদি চা বানাতে না পার তাহলে লুৎফার মাকে বল। ভাল কথা, লুৎফা মেয়েটা কোথায়?

এবারো জবাব নেই। ফুপা পেন্টের বোতাম লাগাচ্ছেন বলে অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকে বোতামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে, তবে ফুপু তার দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর অভাব পূরণ করে দিচ্ছেন। তার চোখে ডাবল আগুন। কথা বলল ইরা। কাটা কাটা ধরনের কথা। তার কাছ থেকেই জানা গেল লুৎফা মেয়েটা চোরের হদ্দ। এসেই চুরি শুরু করেছে। বিছানার তল থেকে টাকা নিচ্ছে, মানিব্যাগ খুলে নিচ্ছে, সবশেষে যা করেছে তা অবিশ্বাস্য। ফুপুর কানের দুল চুরি করে নিজের পায়জামার ভাজে লুকিয়ে রেখেছে। লাফালাফি করছিল, হঠাৎ পায়জামার ভাজ থেকে দুল বের হয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ মা-মেয়ে দুজনকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।

কাজেই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোন কাজের মেয়ে নেই। আগের মত চাইলেই চা পাওয়া যাবে না।

বাদলের প্রসঙ্গে যা জানা গেল তা কানের দুলের চেয়েও ভয়াবহ। সে গত দশদিন হল ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে ধ্যান করছে।

আমি মধুর ভঙ্গিতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, ধ্যান করা তো গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আপনারা এত আপসেট কেন?

ফুপা বললেন, মুগুড় দিয়ে এমন বাড়ি দেব যে সব কটা দাঁত খুলে চলে আসবে। ধ্যান করা শেখায়। সাহস কতবড় ! যা, ধ্যান কিভাবে করছে নিজের চোখে দেখে আয়।

'কিভাবে ধ্যান করছে?'

'কাপড়-জামা খুলে ধ্যান করছে। হারামজাদা! দশ দিন ধরে বিছানার উপর নেংটো হয়ে বসে আছে।'

'সে কি !'

'আবার বলে সে-কি? তুই-ই না-কি বলেছিস নেংটো হয়ে ধ্যান করতে হয়। ধ্যান করা কাকে বলে তোকে আমি শেখাব। বন্দুক দিয়ে আজ তোকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। গুরুদেব এসেছে – ধ্যান শেখায় ?'

ফুপু বললেন, তুমি এত হৈ-চৈ করো না। তোমার প্রেসারের সমস্যা আছে। তুমি অফিসে চলে যাও। যা বলার আমি বলছি।

অফিস চুলায় যাক। আমি হিমুকে সত্যি সত্যি গুলি করে মেরে তারপর অফিসে যাব। গুরুদেবগিরি বের করে দেব।

ইরা বলল, হৈ-চৈ করে তো লাভ কিছু হবে না। ব্যাপারটা ভাল মীমাংসা হওয়া দরকার। উনি বাদলকে বুঝিয়ে বলবেন যেন সে এসব না করে। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। এবং বাদলের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবেন না।

ফুপা তীব্র গলায় বললেন, যোগাযোগ রাখবে কিভাবে? হারামজাদাকে আমি দেশছাড়া করবো না ! এ ক্রিমিন্যাল! এ পেস্ট !

পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে আধ ঘণ্টার মত লাগল। এর মধ্যে ইরা চা বানিয়ে আনল। ফুপার অফিসের গাড়ি এসেছিল – তিনি আমাকে গুলি করা আপাতত স্থগিত রেখে অফিসে চলে গেলেন। ফুপু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে বসলেন। ফোঁসফোসানির মাঝখানে যা বললেন তা হচ্ছে — এত বড় ধামড়া ছেলে নেংটা হয়ে বসে আছে! কি লজ্জার কথা ! তাকে তার ঘরে খাবার দিয়ে আসতে হয়। ভাগ্যিস বেশি লোকজন জানে না। জানলে নির্ঘাত পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসতো।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই বলল, আপনি চা খেয়ে দয়া করে বাদলের কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে বাস্তব এবং কল্পনা গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে বাদলের ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম। বাদল আনন্দিত গলায় বলল, হিমু ভাই?

'হু।'

'আমি টোকা শুনেই টের পেয়েছি। তুমি ছাড়া এরকম করে কেউ টোকা দেয় না।'

‘তুই ধ্যান করছিস না-কি?’

‘হু। হচ্ছে না।’

‘দরজা খোল দেখি।’

বাদল দরজা খুলল। সে যে নগ্ন হয়েই বসেছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার কোমরে তোয়ালে জড়ানো। মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

‘তোমাকে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে হিমু ভাই। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলব।’

‘তুই মনে হচ্ছে নাগা সন্ন্যাসীর পথ ধরে ফেলেছিস।’

‘তুমি একবার বলেছিলে না – সব ত্যাগ করতে হবে। আসল জিনিস পেতে হলে সর্বত্যাগী হতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদও ত্যাগ করতে হবে।’

‘বলেছিলাম না-কি ?’

‘হ্যাঁ বলেছিলে।’

‘ঐ স্টেজে তো ঝপ করে যাওয়া যায় না। ধাপে ধাপে উঠতে হয়। ব্যাপারটা হল সিঁড়ির মত। লম্বা সিঁড়ি। সিঁড়ির একেকটা ধাপ পার হয়ে উঠতে হয়। ফস করে জামাকাপড় খুলে নেংটা হওয়াটা কোন কাজের ব্যাপার না।’

‘শার্ট-প্যান্ট পরে ফেলব ?’

‘‘‘অবশ্যই পরে ফেলবি। ইউনিভার্সিটি খোলা না ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজ ক্লাস আছে?’

‘আছে।’

‘জাম-কাপড় পরে ক্লাসে যা । সাধনার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেব। আস্ত আস্তে উপরে উঠতে হবে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তুই নেংটা হয়ে বসে আছিস — আর এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এইভাবে সাধনা হয় ?’

‘ঠিকই বলেছ। ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলছ ?’

‘অবশ্যই।’

‘আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করে না।’

‘কি ইচ্ছা করে?’

‘সারাক্ষণ ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। তোমার সঙ্গে পথে পথে হাঁটি।’

‘পাশাপাশি দু’ভাবে থাকা যায়। স্থূলভাবে থাকা যায়। এই যেমন তুই আর আমি এখন পাশাপাশি বসে আছি। আবার সূক্ষ্মভাবে – চেতনার ভেতরও থাকা যায়। তুই যেই ভাববি আমার সঙ্গে আছিস, অম্নি তুই আমার পাশে চলে এসেছিস। সাধারণ মানুষ স্থূল অর্থেই জীবনকে দেখে। এতেই তারা সন্তুষ্ট। তুই নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হতে চাস না ?’

‘না।’

‘ভেরী গুড। যা, ইউনিভার্সিটিতে চলে যা।’

‘আচ্ছা যাচ্ছি। হিমু ভাই, তুমি কি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে? জাস্ট ওয়ান ?’

‘তোর একটা না, এক লক্ষ রিকোয়েস্ট রাখব। বলে ফেল।’

‘ইরা মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেবে ? কঠিন একটা শিক্ষা !’

‘সে কি করেছে ?’

‘তোমাকে নিয়ে শুধু হাসাহাসি করে। রাগে আমার গা জ্বলে যায়।’

'সামান্য ব্যাপারে গা জ্বললে হবে কেন ?'

'আমার কাছে সামান্য না। কেউ তোমাকে কিছু বললে আমার মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। হিমু ভাই, তুমি ইরাকে একটা শিক্ষা দাও। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে।'

'কি শিক্ষা দেব ?'

'ওকেও তুমি হিমু বানিয়ে দাও। মহিলা হিমু, যেন সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় রাস্তায় হাটে ।'

'মেয়েমানুষ হয়ে রাত-বিরাতে রাস্তায় হাঁটবে। এটা ঠিক হবে না। তাছাড়া এমন একজন ভাল ছাত্রী !'

'বেশ, তাহলে তুমি তাকে এক রাতের জন্যে হিমু বানিয়ে দাও। জাস্ট ফর ওয়ান নাইট।'

'দেখি।'

'না, দেখাদেখি না। তোমাকে বানাতেই হবে। তুমি ইচ্ছা করলেই হবে।'

ফুপু এবং ইরার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে বাদল কাপড়-চোপড় পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে এ বাড়িতে আর আসবেন না।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা। শুধু একটা টেলিফোন করব। টেলিফোন করে জন্মের মত চলে যাব !

ইরা বলল, যদি সম্ভব হয় আপনি দয়া করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে আমি কোন উপদেশ দিতে চাই না। অপাত্রে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই। তার পরেও একটা কথা না বলে পারছি না –হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় হাঁটলেই প্রকৃতিকে জানা যায় না। প্রকৃতিকে জানার পথ হল বিজ্ঞান। বুঝতে পারছেন?

'পারছি।'

'পারলে ভাল। না পারলেও ক্ষতি নেই।'

ফুপু বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলিস না ইরা। টেলিফোনটা এনে দে। টেলিফোন করে বিদেয় হোক ।

ইরা টেলিফোন এনে দিল ।

'হ্যালো রূপা। আমি হিমু।'

'বুঝতে পারছি।'

'কেমন আছ, রূপা ?'

'আমি কেমন আছি সেটা জানার জন্যে তুমি আমাকে টেলিফোন করেনি। তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা বলে ফেল।'

'রাগ করছ কেন ?'

'রাগ করছি না। তোমার উপর রাগ করা অর্থহীন। যে রাগ বোঝে না তার উপর রাগ করে লাভ কি ?'

'রাগ হচ্ছে মানব চরিত্রের অন্ধকার বিষয়ের একটি। রাগ না বোঝাটা তো ভাল।'

'যে অন্ধকার বোঝে না, সে আলোও ধরতে পারে না।'

'রূপা, তোমার লজিকের কাছে সারেন্ডার করছি।'

'কি জন্যে টেলিফোন করছ বল।'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও রূপা। এমন একটা চাকরি যেন ভদ্রভাবে খেয়ে-পরে ঢাকা শহরে ছোটখাট একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়। জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'এমন কি কখনো হয়েছে যে তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ আর আমি বলেছি – না ?'

'হয়নি।'

'এবারো হবে না।'

'সেটা কি করে সম্ভব ?'

'তোমার জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব না।'

'চাকরিটা কার জন্যে ?'

'আমার এক বন্ধুর জন্যে। অতি প্রিয় একজনের জন্যে।'

'নাম বল। এপয়েন্টমেন্ট লেটারে তার নাম তো লাগবে।'

'লিখো — বদরুল আলম। চাকরিটা কিন্তু আজকের মধ্যেই জোগাড় করতে হবে।'

'চেষ্টা করব। এপয়েন্টমেন্ট লেটার কি তুমি এসে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, আমি এসে নিয়ে যাব।'

'তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করছ? যদি বলতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

আমি বাদলদের বাসা থেকে টেলিফোন করছি। এই নাম্বার তোমার কাছে আছে। এই নাম্বারে টেলিফোন করে আমাকে পাবে না। তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'সবাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ?'

'হ্যাঁ দেয়। এই ভয়েই আমি তোমার কাছে যাই না। কাছে গেলে তুমিও হয়ত বের করে দেবে। রূপা, আমি টেলিফোন রাখি ?'

'না, আরেকটু কথা বল। প্লীজ, প্লীজ।'

'কি বলব ?'

'যা ইচ্ছা বল। এমন কিছু বল যেন . . .'

'যেন কি ?'

'না, থাক।'

আমার আগেই রূপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি ফুপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরা বলল, আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি — আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে করিনি। আমি নানানভাবে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

আমার ক্ষীণ আশা ছিল, মেয়েটা হয়ত বাড়ির গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেবে। সে এল না। আশ্চর্য কঠিন এক মেয়ে !

আমি এবং বদরুল সাহেব পাশাপাশি বসে আছি। ইয়াকুব আলি আমাদের সামনেই আছেন। আমাদের মাঝখানে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে দুটা টেলিফোন। একটা শাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আলি সাহেব রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। আমরা বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটা

টেলিফোন করলেন। তার টেলিফোন করার ধরনটা বেশ মজার। স্থির হয়ে কথা বলতে পারেন না। রিভলভিং চেয়ারে পাক খেতে খেতে কথা বলেন। বদরুল সাহেব খুব উসখুস করছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। ইয়াকুব আলি এক ফাঁকে আমাদের দিকে একটু তাকাতেই বদরুল সাহেব বললেন, ইয়াকুব, ইনি হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, হিমু সাহেব,উনাকে সাথে করে এনেছি।

ইয়াকুব আলি আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, চা চলবে? বলেই ইন্টারকমে কাকে খুব ধমকাতে লাগলেন।

আমরা ধমকপর্ব শেষ হবার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লগলাম। এক সময় ধমকপর্ব শেষ হল। ইয়াকুব আলি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ কি, এখনো চা দেয়নি? বলেই কর্কশ শব্দে বেল বাজাতে লাগলেন। কিংবা কে জানে বেল হয়ত মধুর শব্দেই বাজল, তবে আমার কানে কর্কশ লাগলো।

বদরুল সাহেব বললেন, চা লাগবে না ইয়াকুব।

'অবশ্যই চা লাগবে। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে এসেছ। ফাস্ট মিটিং, চা লাগবে না মানে ? তারপর বল কি ব্যাপার?'

বদরুল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি আজ আসতে বলেছিলে।

'ও আচ্ছ, আজকে আসতে বলেছিলাম?'

'আমার একটা চাকরির ব্যাপারে। তুমি বলেছিলে ব্যবস্থা করবে।'

ইয়াকুব আলি হাসিমুখে বলল, বলেছি যখন তখন অবশ্যই করব। স্কুল-জীবনের বন্ধুর সামান্য উপকার করব না তা তো হয় না। বায়োডাটা তো দিয়ে গিয়েছ?

'হ্যাঁ। দুবার দিয়েছি।'

'আমি দেখেছি। দেখ বদরুল, আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। নো অপেনিং। যে সব অপেনিং আছে তোমাকে তা দেয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই পিয়নের চাকরি করবে না। হা হা হা।'

বদরুল সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি আজকের কথা বলেছিলে। আমার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইয়াকুব দার্শনিক ভাব ধরে ফেলে বলল, অবস্থা তো শুধু তোমার একার ভয়াবহ না, পুরো জাতির অবস্থাই ভয়াবহ। বিজনেস বলতে কিছু নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লসে রান করছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

'ইয়াকুব, আমি তোমার উপর ভরসা করে এসেছিলাম . . . '

'ভরসা নিশ্চয়ই করবে। ভরসা করবে না কেন? আমি কি করব তোমাকে বলি – আমি আমার বিজনেস কসমেটিক্স লাইনে এক্সপাণ্ড করছি। আমি মনে মনে ডিসাইড করে রেখেছি – তোমাকে সেখানে ম্যানেজারিয়েল একটা পোস্ট দেব।'

'সেটা কবে ?'

'একটু সময় নেবে। মাত্র জমি কেন হয়েছে। লোনের জন্যে এপ্লাই করেছি। বিদেশী কোন ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে যাব । ফ্যাক্টরী তৈরি হবে — তারপর কাজ। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা মনে রাখবে।'

বদরুল সাহেবের হতভম্ব মুখ দেখে আমার নিজেরই মায়া লাগছে। আহা বেচারা ! সে বোধহয় জীবনে এত অবাক হয়নি। এসি বসানো ঠাণ্ডা ঘরেও ঘামছে।

চা চলে এসেছে। ইয়াকুব সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সিগারেট কি চলে নাকি ভাই? তিনি আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। আমি

সিগারেট নিতে নিতে বললাম, বদরুল সাহেবকে চাকরিটার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ?

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন – এগজ্যাক্ট বলা মুশকিল। তিন-চার বছর তো বটেই। বেশিও লাগতে পারে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। হাসিমুখে বললাম, ভাই শুনুন, চাকরি আপনার পক্ষে দেয়া সম্ভব না এই কথাটা সরাসরি আপনার বন্ধুকে বলে দিচ্ছেন না কেন? বলতে অসুবিধা কি? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে? আপনার মত মানুষের তো চক্ষুলজ্জা থাকার কথা না।

ইয়াকুব আলি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের একটা চেষ্টাও আছে।

বদরুল সাহেব বললেন, হিমু ভাই, চলুন যাই।

আমি বললাম, চা-টা ভাল হয়েছে, শেষ করে তারপর যাই।

ইয়াকুব আলি এখনো তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাত টেলিফোনের উপর। আমি তার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিরীহ একজন মানুষ। আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে — আপনার মুখে থু-থু ফেলতে পারি। এতে আপনার কিছু হবে না। কারণ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আপনার মুখে অদৃশ্য থু-থু ফেলছে। আপনি এতে অভ্যস্ত। থু-থু না ফেললেই বরং আপনি অবাক হবেন।

বদরুল সাহেব হাত ধরে আমাকে টেনে তুলে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, হিমু ভাই, কি পাগলামি করছেন ?

ইয়াকুব সাহেব তাকিয়ে আছেন। রাগে তার হাত কাঁপছে। সম্ভবত কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি তার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, ভাই, আপনি আমাকে ভাল করে চিনে রাখুন। আমার নাম হিমু। আমি কাউকে সহজে ছেড়ে দেই না। আপনাকেও ছাড়ব না।

বদরুল সাহেব আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করে ফেললেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি বললাম, বদরুল সাহেব, আপনি মেসে চলে যান। আমি একটা কাজ সেরে মেসে আসছি। তারপর দুজন একসঙ্গে আপনার দেশে রওনা হয়ে যাব।

‘আমার সঙ্গে তো টাকাপয়সা কিছুই নাই।’

‘একটা ব্যবস্থা হবেই। আপনার কি মেসে ফিরে যাবার মত রিকশা ভাড়া আছে?’

‘জ্বি না।’

‘আমার কাছেও নেই। পকেট-নেই পাঞ্জাবি আজও পরে চলে এসেছি। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান। চিটাগাংয়ের রাতের ট্রেন কটায় ?’

‘সাড়ে দশটায়।’

‘রাত দশটার আগে আমি অবশ্যই পৌছে যাব।’

বদরুল সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কি ইচ্ছা করছে জানেন হিমু ভাই? ইচ্ছা করছে একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে যাই ।

‘ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়তে হবে না। আপনি মেসে চলে যান, আমি আসছি।’

হিমু ভাই, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।’

আমি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক সত্যি হাঁটতে পারছেন না। পা কাঁপছে। মাতালের মত পা ফেলছেন।

আমি বললাম, চলুন আপনাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে তারপর যাই, আমার কাজটা সেরে আসি। হাত ধরুন তো দেখি।

'দেশে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে কি বলব? মেয়েগুলিকে কি বলব?'

'কিছু বলতে হবে না। এদের জড়িয়ে ধরবেন। এতেই তারা খুশি হবে। ভাই, চোখ মুছুন তো।'

আমি বদরুল সাহেবকে মেসে নামিয়ে দিয়ে গেলাম রূপার কাছে। আমি নিশ্চিত সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি তার হাত থেকে এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নেব। হাজারখানিক টাকা নেব। কিছু মিষ্টি কিনব। বদরুল সাহেবের ছোট মেয়েটার জন্যে একটা বাংলা ডিকশনারি কিনব। মেয়েটা বড় বানান ভুল করে। মুখস্থ-র মত সহজ বানান ভুল করলে চলবে কেন? এইসব উপহার নিয়ে রাতের ট্রেনে রওনা হব বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু-পত্নীর মেথি দিয়ে রাঁধা মাংস খেতে হবে। মাছের পোনা পাওয়া গেলে সজনে পাতা এবং পোনার বিশেষ প্রিপারেশন।

রূপাকে বাড়িতে পেলাম না। সে কোথায় কেউ বলতে পারল না। কখন ফিরবে তাও কেউ জানে না। দুপুরে বেরিয়েছে, আর আসেনি। রাত নটা পর্যন্ত আমি রূপাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বদরুল সাহেব অপেক্ষা করে থাকবেন। তার স্ত্রীর কাছে তাকে পৌঁছানো দরকার। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। ফিরে গেলাম মেসে। কোন একটা ব্যবস্থা কি হবে না?

মেসের ম্যানেজার আমাকে আসতে দেখে ছুটে এল। তার ছুটে আসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সেই বিশেষ কিছুটা কি ? দুঃসংবাদ না সুসংবাদ? রূপা কি মেসে আমার জন্যে এপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে অপেক্ষা করছে, না-কি বদরুল আলম ভয়ংকর কোন কাণ্ড করে বসেছেন? সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ছেন?

ম্যানেজার হড়বড় করে বলল, স্যার, আপনি মেডিকেল কলেজে চলে যান !

'কেন ?'

'বদরুল সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ।'

'কি হয়েছে?'

'চুপচাপ বসেছিলেন। তারপর খুব ঘামা শুরু করলেন। কয়েকবার আপনার নাম ধরে ডাকলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। আমরা দৌড়াদৌড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এম্বুলেন্স পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া যায় না। রিকশায় করে নিতে হয়েছে হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা।

আমি হাসপাতালের সিঁড়িতে চুপচাপ বসে আছি। রূপা তার কথা রেখেছে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়েছে। আমাকে না পেয়ে ইরার হাতে দিয়ে এসেছে। ইরা সেই চিঠি নিয়ে প্রথমে গেছে আমার মেসে। সেখানে সব খবর শুনে একাই রাত এগারটার দিকে এসেছে হাসপাতালে।

বদরুল সাহেবের জন্যে খুব ভাল একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে রূপা। আট হাজার টাকার মত বেতন। কোয়ার্টার আছে। বেতনের সাত পার্সেন্ট কেটে রাখবে কোয়ার্টারের জন্যে। রাত বারটার দিকে বদরুল সাহেবের অবস্থা কি খোঁজ নিতে গেলাম। ইরাও এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার সাহেব বললেন, অবস্থা ভাল না।

জ্ঞান ফিরেনি।

'জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে?'

'ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, এটা একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটার। আপনার কাছে রাখুন। যদি জ্ঞান ফিরে উনার হাতে দেবেন। যদি জ্ঞান না ফিরে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলবেন ।

আমি হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছি। এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা – জিরো আওয়ার। আমার রাস্তায় নেমে পড়ার সময় । ইরা বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, কোথাও না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবো। আপনার বন্ধুর পাশে থাকবেন না?

'না।'

ইরা নিচু গলায় বলল, হিমু ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে হাঁটতে পারি? শুধু একটা রাতের জন্যে ?

আমি বললাম, অবশ্যই পার।

ইরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনাকে যদি বলি আমার হাত ধরতে, আপনি রাগ করবেন ?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি রাগ করব না। কিন্তু ইরা, আমি তোমার হাত ধরব না।

হিমুরা কখনো কারো হাত ধরে না।

(সমাপ্ত)

একটি শুভম ক্রিয়েশন

হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
হুমায়ূন আহমেদ
হিমুর
হাতে
কয়েকটি
নীলপদ্ম
SUVO

###

আজকের দিনটা এত সুন্দর কেন?

সকাল বেলা জানালা খুলে আমি হতভম্ব। এ কি! আকাশ এত নীল ?আকাশের তো এত নীল হবার কথা না। ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ হলেও একটা কথা ছিল। এ হচ্ছে খাঁটি বঙ্গদেশীয় আকাশ, বেশিরভাগ সময় ঘোলা থাকার কথা। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জানালার ওপাশে একটা কাক এসে বসল। কি আশ্চর্য। কাকটাকেও তো সুন্দর লাগছে। কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে। কলেজে ভর্তি হবার পরদিন যে ভঙ্গিতে কিশোরী মেয়েরা হাঁটে অবিকল সেই — "বড় হয়ে গেছি" ভঙ্গি। আমি মুগ্ধ হয়ে কাকটাকে দেখলাম। কাকের চোখ এত কাল হয়? কবি-সাহিত্যিকরা কি এই কারণেই বলেন কাকচক্ষু জল? আচ্ছা, আজ সব সুন্দর সুন্দর জিনিস চোখে পড়ছে কেন? আজকের তারিখটা কত? দিন-তারিখের হিসাব রাখি না, কাজেই তারিখ কত বলতে পারছি না। একটা খবরের কাগজ কিনে তারিখটা দেখতে হবে। মনে হচ্ছে আজ একটা বিশেষ দিন। আজকের দিনটার কিছু একটা হয়েছে। এই দিনে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে। পৃথিবী তার রূপের দরজা আজকের দিনটার জন্যে খুলে দেবে। কাজেই আজ সকাল থেকে জীবনানন্দ দাশ মার্কা হাঁটা দিতে হবে – "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" মার্কা হাঁটা। আমি ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামলাম। নষ্ট করার মত সময় নেই। কাকটা বিস্মিত গলায় ডাকল – কা কা। আমার ব্যস্ততা মনে হয় তার ভাল লাগছে না। পাখিরা নিজের খুব ব্যস্ত থাকে কিন্তু অন্যদের ব্যস্ততা পছন্দ করে না।

মাথার উপর ঝাঁঝালো রোদ, লু হওয়ার মত গরম হওয়া বইছে। গায়ের হলুদ পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে একাকার। পাঞ্জাবি থেকে ঘামের বিকট গন্ধে নিজেরই নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে, তারপরেও আজকের দিনটার সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। হঠাৎ কোন বড় সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। সকাল থেকেই আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আছে। এখন তা আরো বাড়ল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সৌন্দর্যের কথাটা চিৎকার করে সবাইকে জানাতে ইচ্ছা করছে। মাইক ভাড়া করে রিকশা নিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে পারলে চমৎকার হত।

> হে ঢাকা নগরবাসী। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ ৯ই চৈত্র, ১৪০২ সাল। দয়া করে লক্ষ্য করুন। আজ অপূর্ব একটি দিন। হে ঢাকা নগরবাসী। হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর। আজ ৯ই চৈত্র ১৪০২ সাল . . .

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি রাস্তার ঠিক মাঝখানে। বিজয় সরণীর বিশাল রাস্তা — মাঝখানে দাঁড়ালে কোন অসুবিধা হয় না। রিকশা গাড়ি সব পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। তারপরেও লক্ষ্য করলাম কিছু কিছু গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বিড়বিড় করছে – নির্ঘাৎ গালাগালি। গাড়ির মানুষেরা মনে করে পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে শুধুই তাদের জন্যে। পথচারীরা হাঁটবে ঘাসের উপর দিয়ে, পাকা রাস্তায় পা ফেলবে না।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বেশ চমৎকার লাগছে। নিজেকে ট্রাফিক

পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে পাজেরো টাইপ দামী কোন গাড়ি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলি – দেখি লাইসেন্সটা। ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র আছে? ফিটনেস সার্টিফিকেট? এক্সহস্ট দিয়ে ভক ভক করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নামুন গাড়ি থেকে।

আজকের দিনটা এমন যে মনের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হল। একটা পাজেরো গাড়ি আমার গা ঘেঁষে হুড়মুড় করে থামল। লম্বাটে চেহারার এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, হ্যালো ব্রাদার, সামনে কি কোন গণ্ডগোল হচ্ছে?

আমি বললাম, কি গণ্ডগোল ?

'গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে নাকি?'

'জি না।'

পাজেরো হুস করে বের হয়ে গেল। পাজেরো হচ্ছে রাজপথের রাজা। এরা বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কেমন গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে। দেখতে ভাল লাগে। মনে হয় "আহা, এরা কি সুখেই না আছে।"পরজন্মে মানুষের যদি গাড়ি হয়ে জন্মানোর সুযোগ থাকতো – আমি পাজেরো হয়ে জন্মাতাম।

পাজেরোর ভদ্রলোক গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে কি-না কেন জানতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। আজ হরতাল, অসহযোগ এইসব কিছু নেই। দুদিনের ছাড় পাওয়া গেছে। তৃতীয় দিন থেকে আবার শুরু হবে। আজ আনন্দময় একটা দিন। হরতালের বিপরীত শব্দ কি ? 'আনন্দতাল ?'সরকার এবং বিরোধী দল সবাই মিলে একটা বিশেষ দিনকে আনন্দতাল ঘোষণা দিলে চমৎকার হত। সকাল-সন্ধ্যা আনন্দতাল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব খুলে যাবে – সবাই সবার গাড়ি নিয়ে হর্ণ বাজাতে বাজাতে রাস্তায় নামবে। রাস্তার মোড়ে পুলিশ এবং বিডিআর থাকবে না। থাকবে তাদের ব্যান্ডপার্টি। এরা সারাক্ষণ ব্যান্ড বাজাবে। তাদের দিকে পেট্রোল বোমার বদলে গোলাপের তোড়া ছুঁড়ে দেয়া হবে. . . .

'হিমু ভাই না?'

আমি চমকে তাকালাম। গাঢ় মেরুন রঙের একটা গাড়ি আমার পাশে থেমেছে। গাড়ির চালকের সীটে যে বসে আছে তাকে দেখাচ্ছে পদ্মিনী গোত্রের কোন তরুণীর মত। কুইন অব সেবা, হার রয়েল হাইনেস বিলকিস হয়তো আঠারো-উনিশ বছর বয়সে এই মেয়ের মতই ছিল। কিং সোলায়মান বিলকিসকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আমারও অভিভূত হওয়া উচিত। অভিভূত হতে পারছি না – কারণ মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। চেনা চেনাও মনে হচ্ছে না। এ কে ?

'হিমু ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'এখনো পারছি না, তবে চিনে ফেলব।'

'আমি মারিয়া।'

'ও আচ্ছা, মারিয়া। কেমন আছেন ?'

'আপনি চিনতে পারেননি। চিনতে পারলে আপনি করে বলতেন না।'

'ও চিনেছি – তুই ?এত বড় হয়েছিস! আশ্চর্য! যাকে বলে পারফেক্ট লেডি। ঠোঁটে লিপস্টিক- দিয়ে তো দেখি বেড়াছেড়া করে ফেলেছিস।'

'আপনি এখনো চেনেননি। চিনলে তুই তুই করে বলতেন না। তুই বলার মত ঘনিষ্ঠতা আপনার সঙ্গে আমার ছিল না।'

'ছিল না বলেই যে ভবিষ্যতেও হবে না তা তো না। ভবিষ্যতে হবে ভেবে তুই

বললাম।'
'আপনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'
'কিছু করছি না।'
'অবশ্যই কিছু করছেন। দূর থেকে মনে হল হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাগল-টাগল হয়ে যাননি তো? শুনেছি পাগলরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়, ট্রাফিক কন্ট্রোল করে।'
'এখনো পাগল হইনি। তবে মনে হচ্ছে শিগগিরই হব। তুই নিজেও গাড়ি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস। লোকে তোকেও মহিলাপাগল ভাবছে।'
'তুই তুই করবেন না। কেউ তুই তুই করলে আমার ভাল লাগে না। আপনি কি আসলেই আমাকে চিনতে পারছেন না ?'
'না।'
'কেউ আমাকে চিনতে না পারলেও আমার ভাল লাগে না। যাই হোক, সামনে কি গণ্ডগোল হচ্ছে? গাড়ি-টাড়ি ভাঙা হচ্ছে ?'
'না। পাজেরোর মালিকরা অতি সাবধানী হয়। গণ্ডগোলের ত্রিসীমানায় তারা থাকে না। পাজেরো যখন গিয়েছে তখন তোমার গাড়িও যেতে পারবে।'
'গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই বলে আপনি এ রকম কথা বলতেপারলেন। আমার গাড়িটা পাজেরোর চেয়ে অনেক দামী। এটা একটা রেসিং কার।'
'চড়তে কি খুব আরাম?'
'চড়তে চান?'
'হু চাই।'
'তাহলে উঠে আসুন।'
আমি গাড়ির পেছনের দিকে উঠতে যাচ্ছিলাম – অবাক হয়ে দেখলাম, এই গাড়ির দুটা মাত্র সীট। হাত-পা এলিয়ে পিছনের সীটে বসার কোন উপায় নেই। বসতে হবে ড্রাইভারের পাশে। মারিয়া বলল, সীটবেল্ট বাঁধুন।
আমি বললাম, সীটবেল্ট বাঁধতে পারব না। দড়ি দিয়ে বাঁধা-ছাদা হয়ে গাড়িতে বসতে ইচ্ছা করে না। গাড়িতে যাব আরাম করে। আমি কি গরু-ছাগল যে আমাকে বেঁধে রাখতে হবে ?
'কথা বাড়াবেন না হিমু ভাই, সীটবেল্ট বাঁধুন। আমি খুব দ্রুত গাড়ি চালাই। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ।'
'এই রকম গিজগিজ ভিড়ে তুমি দ্রুত গড়ি চালাবে কি করে?'
'শহরের ভেতরে ভিড় — বাইরে তো ভিড় না। আমি ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে চলে যাব। দুশ কিলোমিটার স্পীড দিয়ে গাড়িটা কেমন পরীক্ষা করব। কেনার পর থেকে আমি গাড়ির স্পীড পরীক্ষা করতে পারিনি।'
আমি শুকনো গলায় বললাম, ও আচ্ছা।
মারিয়া গাড়ি চালানোয় খুব ওস্তাদ আমার এ রকম মনে হচ্ছে না। হুটহাট করে ব্রেক কষছে। সাজগোজের দিকে যে মেয়ের এত নজর অন্যদিকে তার নজর কম থাকার কথা। পরনে লালপাড় হালকা রঙের শাড়ি। (শাড়ি পরে গাড়ি চালাচ্ছে কি করে এক্সিলেটরে চাপ না পড়ে শাড়িতে পা বেঁধে যাবার কথা।) গলায় লাল রঙের পাথরের লকেট। সবচে বড় পাথরটা পায়রার ডিমের সাইজ। কি পাথর এটা ?

পাথরের নাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মারিয়া এমনভাবে ব্রেক কষল যে উইন্ড শিল্ডে আমার মাথা লেগে গেল। মারিয়া বলল, সীটবেল্ট থাকায় বেঁচে গেলেন। সীটবেল্টবাঁধা না থাকলে মাথার ঘিলু বেরিয়ে যেত।

'মারিয়া?'

'জ্বি।'

'তুমি কত স্পীডে গাড়ি চালাবে বললে? দুশ কিলোমিটার – একশ পঁচিশ মাইল পার আওয়ার। আমার এখন মনে পড়ল – আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। খুব জরুরী একটা কাজ আছে জিপিওতে। আসগর নামে এক লোক আছে — জিপিওর সামনে বসে থাকে, লোকজনদের চিঠি লিখে দেয়। সে খবর পাঠিয়েছে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। আমার খুব বন্ধুমানুষ।'

'আমি দুশ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালাব এটা শুনেই আপনি আসলে আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

'খানিকটা তাই। ভয় পাওয়াটা তো দোষের না – তোমার মত একজন আনাড়ি ড্রাইভার যদি দুশ কিলোমিটার স্পীড দেয়, তাহলে আমার ধারণা গাড়ি রাস্তা ছেড়ে আকাশে উঠে যাবে।'

মারিয়া বলল, সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা না।

'আমাকে নামিয়ে দাও। আসগর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা না করলেই না।'

'আপনাকে আমি নামিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এই অপরাধের শাস্তি হিসেবেই আমি নামাব না।'

'যদি চিনে ফেলতে পারি তাহলে নামিয়ে দেবে ?'

'হ্যাঁ, নামিয়ে দেব।'

'তোমার মা'র নাম কি ?'

'মার নাম, বাবার নাম কারোর নামই বলব না। মা-বাবাকে দিয়ে আমাকে চিনলে হবে না। আপনি আমাকে দিয়ে ওদের চিনবেন।'

'তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কবে হয়েছিল ?'

'পাঁচ বছর আগে।'

'এখন তোমার বয়স কত ?'

'কুড়ি।'

'পাঁচ বছর আগে বয়স ছিল পনেরো।'

'অংকশাস্ত্র তাই বলে।'

'এই জন্যেই চিনতে পারছি না। পনেরো বছরের কিশোরী পাঁচ বছরে অনেকখানি বদলে যায়। শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার ব্যাপারটা এর মধ্যেই ঘটে।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন, আমি কখনোই শুয়োপোকা ছিলাম না। জন্ম থেকেই আমি প্রজাপতি।'

'তোমাদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম?'

'একসময় যেতেন। গত পাঁচ বছরে যাননি।'

'কেন যেতাম?'

'আমার এক সময় ধারণা ছিল আমাকে দেখার জন্যে যেতেন। এখন সেই ভুল ভেঙেছে।'

'ও, তুমি আসাদুল্লাহসাহেবের মেয়ে — মরিয়ম।'

‘মরিয়ম না, মারিয়া। আপনি মরিয়ম ডাকতেন, রাগে গা জ্বলে যেত। এখনওজ্বলে যাচ্ছে।’

খ্যাচ করে শব্দ হলো। গাড়ি রাস্তার উপর থেমে গেল। মরিয়ম বলল, নেমে যান।

আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, কাজেই পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নামিয়ে দিচ্ছি।

‘না, নামাতে হবে না, শুরুতে তোমাকে যতটা আনাড়ি ড্রাইভার মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না।’

‘লং ড্রাইভের সঙ্গী হিসেবে আপনাকে আমার মনে ধরছে না। ঘামের গন্ধে আমার দম আটকে আসছে।’

‘তোমার বাবা কেমন আছেন?’

‘ভালো না। বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনার কোনো ঠিকানা আমাদের জানা নেই বলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।’

‘ঠিকানা দিচ্ছি, ঠিকানা লিখে রাখো।’

‘কোনো দরকার নেই। আপনি কখনো এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকেন না। আমাকে ঠিকানা দিয়েই আপনি বাসা বদল করে ফেলবেন।’

‘তা হলে তোমাদের টেলিফোন নাম্বারটা দাও। আমি টেলিফোনে খোঁজ নেব।’

‘টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিয়েছি। নাম্বারা যেন ভুলে না যান সেই ব্যবস্থাও আমি করেছিলাম। একটু চিন্তা করলেই নাম্বার মনে পড়বে। আরেকটা কথা- আমার ধারণা, আপনি প্রথম দেখাতেই আমাকে চিনেছিলেন। তার পরও না-চেনার ভান করেছেন। আপনি একটা অন্যায় করেছেন। বলুন সরি।’

‘সরি।’

‘কিশোরী বয়সে গভীর আবেগ নিয়ে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম- আপনি চিঠির জবাব দেননি।’

‘সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠি। পাঠোদ্ধার করতে পারিনি।’

‘আবারও একটা মিথ্যা কথা বললেন। পাঠোদ্ধার আপনি ঠিকই করেছিলেন। পাঠোদ্ধার করেই আপনি গেছেন ঘাবড়ে। আর আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসেননি।’

‘তা না, নানান ঝামেলা গেল— আমার দূর সম্পর্কের এক বোন মারা গেল... কিডনিফেইলিওর।’

‘হিমু ভাই, আপনি কি সবসময় মিথ্যা কথা বলেন?’

‘তা বলি।’

‘আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি আমার কুড়ি বছর জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলিনি।’

‘কষ্ট করে আর পাঁচ বছর যদি মিথ্যা না বলে থাকতে পার তা হলে মহিলামহাপুরুষ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই ২৫ বছর মিথ্যা না বলে থাকতে পারেন।’

মারিয়া শুকনো গলায় বলল, মহাপুরুষ-বিষয়ক এই তথ্য জানতাম না। শিখে রাখলাম ।

আমি বললাম, আবার ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলাও মহাপুরুষদের লক্ষণ। সাধারণ মানুষ কখনো ক্রমাগত মিথ্যা বলতে পারে না- এটাও শিখে রাখো।

'হিমু ভাই, আমি যাচ্ছি-'

মারিয়া গাড়ি নিয়ে হুশ করে বের হয়ে গেল। মাথায় এখন আর রোদ লাগছে না। অল্প সময়ের ভেতরে কোত্থেকে মেঘ এসে জমা হওয়া শুরু হয়েছে। আমি আকাশের মেঘের দিকে তাকালাম— আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম রাস্তায়। ফাঁকা-ফাঁকা রাস্তা। রিকশা চলছে, গাড়ি খুব কম। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুই আপোসহীন নেত্রীর চাপে পড়ে বেচারা গাড়িগুলি পড়েছে বিপদে। যেখানে-সেখানে গাড়ি ভাঙা হচ্ছে। এখনও বোধহয় কোথাও শুরু হয়েছে। এইসব খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাবধানি গাড়ি-মালিকরা তাঁদের গাড়ি দ্রুত সরিয়ে ফেলেন। আমি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম বোমার আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। পাওয়া যাচ্ছে না। সময়টা এমন যেবোমার আওয়াজ পাওয়া না গেলে অস্বস্তি লাগে । মনে হয়- ব্যাপারটা কী? সমস্যা কি গুরুতর? বোমার আওয়াজ পাওয়া গেলে মনে হয়- সব ঠিক আছে। সমস্যা তেমন গুরুতর না ।

আমি হাঁটতে হাঁটতে জিপিওর দিকে যাচ্ছি। মারিয়ার কথা এই মুহূর্তে আর ভাবছি না। মস্তিস্কের যে-অংশে মারিয়ার স্মৃতি জমা করা ঐ অংশের সুইচ অফ করে দিয়েছি। এখন ভাবছি আসগর সাহেবের কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। আজ এই চমৎকার দিনে দেখা করে আসা যাক । ওনার সঙ্গে দেখা করার সমস্যা একটাই। ফেরার সময় উনি নিচুগলায় বলবেন- রাতের বেলা গরিবখানায় চারটা ডাল-ভাত খেয়ে যান।

কিছু-কিছু নিমন্ত্রণ এমনভাবে করা হয় যে 'না' করা যায় না।

রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে পরপর দুটা পুলিশের জিপ চলে গেল। তার পেছনে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এক অ্যাম্বুলেন্স। বোঝাই যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী নেই। পেছনের সিটে কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে গল্প করছেন। একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে ধোঁয়া ছাড়ছেন। অথচ অ্যাম্বুলেন্সে সাইরেন যেভাবে বাজছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ভালামন্দ কিছু ঘটে যাবে।

'ভাইসাহেব, শুনুন!'

অপরিচিত গোলগাল মুখের এক লোক গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি অ্যাম্বুলেন্সের দিক থেকে চোখ সরিয়ে গোলগাল মুখের এই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। উনি বাজার করে ফিরছেন। বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে । চৈত্রমাসের লাউ খেতে কেমন কে জানে!

'হ্যালো ব্রাদার!'

'আমাকে বলছেন?'

'জি। একটা গুজব শুনলাম, শহরে আর্মি নেমেছে- সত্যি নাকি?'

'জানি না।'

'খুবই অথেন্টিক গুজব। আর্মি নেমেছে- হেভি পিটুনি শুরু করেছে।'

‘যাকে পাচ্ছে তাকেই পেটাচ্ছে?’

‘প্রায় সেরকমই।’

লাউ-হাতে ভদ্রলোককে খুবই আনন্দিত মনে হলো। আর্মি যাকে পাচ্ছে তাকে পেটাচ্ছে এতে এত আনন্দিত হবার কী আছে কে জানে। ভদ্রলোক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, গর্ত থেকে সাপ টেনে বের করলে সাপ কি ছেড়ে দেবে?

আমি বললাম, আর্মিকে সাপ বলছেন আমি জানতে পারলে আপনার লাউ নিয়ে যাবে। এবং আপনাকেও হেভি পিটুনি দেবে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমি বুঝতে পারছি ভদ্রলোক এখন মনে মনে নিজেকেই গালি দিচ্ছেন- ‘কেন গায়ে পড়ে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম!’

হাতে ঘড়ি নেই – তিনটা থেকে সাড়ে তিনটায় জিপিওতে ঢুকলাম।মূল গেট তালাবন্ধ। দেয়াল টপকে ঢুকতে হল। বাইরে সিরিয়াস গণ্ডগোল। চলন্ত বাসে আগুন-বোমা ছোঁরা হয়েছে। বাসের ভেতরটা ঝলসে গেছে। পুলিশ, বিডিআর চলে এসেছে। টিয়ার গ্যাস মারা হচ্ছে। রাস্তায় কিছু কাপড়ের দোকান ছিল। সেগুলি লুট হচ্ছে। ভদ্র-টাইপের লোকজনদের দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচটা শার্ট বগলে নিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে হয়ত বলবে- ‘খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। আন্দোলনে একটা লাভ হয়েছে — চাল-ডালের দাম বাড়লেও গার্মেন্টসের কাপড়-চোপড় জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। চারটা শার্ট দাম পড়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ভাবা যায়?’

চূড়ান্ত রকমের গণ্ডগোলের ভেতরও আসগর সাহেবকে পাওয়া গেল নির্বিকার অবস্থায়। তিনি টুল-বাক্স নিয়ে বসে আছেন। টুল-বাক্সের গায়ে লেখা –

আলী আসগর
পত্রলেখক।
পোস্ট কার্ড ১ টাকা
খাম ২ টাকা
রেজিস্ট্রি ৫ টাকা
পার্সেল ২৫ টাকা (দেশী)
পার্সেল ৫০ টাকা (বিদেশী)।

আসগর সাহেবের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ। দেখে মনে হয় কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে জীবনযাপন করেন। চিঠি লেখা তেমন কোন শ্রমের কাজ না, তারপরেও ভদ্রলোকের চেহারায় পরিশ্রমের এমন প্রবল চাপের কারণ কি — কে বলবে। আসগর সাহেব একজনকে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। আমি আসগর সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি একবার তাকালেন – আবার চিঠি লেখা শুরু করলেন। ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তার মত। দেখতেও ভাল লাগে। আমার চিঠি লেখার কেউ থাকলে ওনাকে দিয়ে লেখাতাম। কে জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে পরিচয় হলে মারিয়ার চিঠির জবাব হয়ত দিতাম। তাকে দিয়েই লেখাতাম – প্রিয় মারিয়া, তোমার সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠির মর্ম উদ্ধার করার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। . . . কি সর্বনাশ। মারিয়ার কথা ভাবা শুরু করেছি। সুইচ অফ করা ছিল — কখন আবার অন হল? ব্রেইন কি অটো সিস্টেমে চলে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলালাম। যে চিঠি লেখাচ্ছে তার দিকে তাকালাম।

যে চিঠি লেখাচ্ছে তাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। খালি পা। লুঙ্গি পরা। গায়ে নীল রঙের একটা গেঞ্জি। বেচারার হয়ত জ্বর এসেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। যে ভাবে সে গড় গড় করে চিঠির বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সে দীর্ঘদিন ধরে অন্যকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে।

> প্রিয় ফাতেমা,
> দোয়াগো। পর সমাচার এই যে, আমি আল্লাহপাকের অসীম রহমতে মঙ্গলমত আছি। তোমাদের জন্যে সর্বদা বিশেষ চিন্তাযুক্ত থাকি. . . .

আসগর সাহেব চিঠি লেখা বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইসব, রাতে আমার সাথে চারটা খানা খান।

আমি বললাম, আজ না খেলে হয় না ?

'কাজকর্ম থাকলে রাত করে আসেন। কোন অসুবিধা নাই। আজ বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের বাজার করব, আপনাকে নিয়ে চারটা ভাল-মন্দ খাব। অনেক দিন ভালমন্দ খাই না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন কি একটু চা খাবেন?'

'খেতে পারি এক কাপ চা।'

আসগর সাহেব হাত উচিয়ে চা-ওয়ালাকে চা দিতে ইশারা করে আবার চিঠি লেখায় মন দিলেন। আমি চা খেয়ে জিপিওর বাইরে এসেই পুলিশের হাতে ধরা খেলাম।

পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার ব্যাপারে সব সময় খানিকটা নাটকীয়তা থাকে। — এখানে তেমন নাটকীয়তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বাসপোড়া দেখছি। বাসের সব ক'টা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে - পট পট পট পট শব্দ হচ্ছে। কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে না, বা বাসের চারদিকে ছোটাছুটিও করছে না। আমি অপেক্ষা করছি কখন ধোঁয়া বের হওয়া শেষ হয়ে সত্যিকার আগুন জ্বলবে। মোটামুটি রকমের আগুন জ্বললে সেই আগুনে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে রওনা হওয়া যেতে পারে। বাসপোড়া আগুনে সিগারেট ধরানো একটা ইন্টারেন্টিং অভিজ্ঞতা হবার কথা। আমি সিগারেট হাতে অপেক্ষা করছি।

এমন সময় শার্ট-প্যান্ট পরা এক লোক এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। ভদ্র চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্র। আমাকে বললেন, আপনার ব্যাগে কি ?

আমার কাঁধে চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগে কয়েকটা টাকা এবং কিছু খুচরা পয়সা। আমার পাঞ্জাবির কোন পকেট নেই। জরুরী জিনিসপত্রের জন্যে পুরানো আমলের কবিদের মত কাঁধ ব্যাগ ঝুলাতে হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাগ খালি।

ভদ্রলোক এবার গলার স্বর কঠিন করে বললেন, খালি কেন? মাল ডেলিভারি দিয়ে ফেলেছেন?

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কোন মালের কথা বলছেন?'

'ব্যাগে জর্দার কৌটা ছিল না?'

'জি না, আমি তো পান খাই না।'

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আপনার পান খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বলেই খপ করে আমার হাত ধরলেন। এর নাম বজ্র আঁটুনি। হাতের দুটা হাড় — রেডিও এবং আলনা মট মট করতে লাগল। যে কোন সময় ভেঙে যাবার কথা। এই ভদ্রলোক হাত ধরার ট্রেনিং কোথায় নিয়েছেন? সারদা পুলিশ একাডেমীতে?

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। নতুন পরিস্থিতির কারণে দিনের সৌন্দর্য কি কমে গেছে? দেখলাম, কমেনি। চারদিক এখনো অপূর্ব লাগছে। দিনের শেষের রোদে নগরী ঝলমল করছে। রোদের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। তেজী চনমনে গন্ধ। আমি অনেকদিন পর রোদের গন্ধ পেলাম। যে পুলিশ অফিসার আমার হাত ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন তাঁকেও ক্ষমা করে দিলাম। এমন সুন্দর দিনে কারো উপর রাগ রাখতে নেই।

###

'আপনার নাম কি ?'

আমি ইতস্তত করছি, নাম বলব কি বলব না ভাবছি। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা সাধারণত খুব আগ্রহের সঙ্গে নাম বলি। জিজ্ঞেস না করলেও বলি। হয়ত বাসে করে যাচ্ছি--- পাশে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। দু-একটা টুকটাক কথার পরই হাসিমুখে বলি, ভাই সাহেব, আমার নাম হচ্ছে এই . . . আপনার নামটা?

মানুষ তার এক জীবনে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি শোনে তা হচ্ছে তার নিজের নাম। যতবারই শোনে ততবারই তার ভাল লাগে। পৃথিবীর মধুরতম শব্দ হচ্ছে নিজের নাম। পৃথিবীর দ্বিতীয় মধুরতম শব্দ খুব সম্ভব "ভালবাসি"।

'কি ব্যাপার, নাম বলছেন না কেন? প্রশ্ন কানে যাচ্ছে না?'

'স্যার যাচ্ছে।'

'তাহলে জবাব দিচ্ছেন না কেন ?'

আমি খুক খুক করে কাশলাম। অস্পষ্ট ধরনের কাশি। নার্ভাসনেস কাটানোর জন্যে এ কাশি পৃথিবীর আদিমানব বাবা আদমও আড়চোখে বিবি হাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেশেছিলেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা — এই সাড়ে সাত ঘণ্টা আমি রমনা থানার এক বেঞ্চে বসে ছিলাম। আমি একা না, আমার সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। তারাও আমার মত ধরা খেয়েছে। এক এক করে তারা ওসি সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভু দিয়েছে। কেউ ছাড়া পেয়েছে, কেউ হাজতে ঢুকে গেছে। আমার ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমি বসে আছি ওসি সাহেবের সামনে। জেরা করতে করতে ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে ক্লান্ত। ঘন ঘন হাই তুলছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষদের হাই তোলার দৃশ্য অতি কুৎসিত। দেখতে ভাল লাগে না। এরা সব সময় স্মার্ট হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবেন — ভদ্রলোক বসেছেন বাঁকা হয়ে । বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় গত সপ্তাহে পাইলসের অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের ঘা শুকায়নি। ওসি সাহেবের চেহারায় রসকষ নেই, মিশরের মমির মত শুকনো মুখ। সেই মুখও খানিকটা কুঁচকে আছে। মনে হচ্ছে পাইলস ছাড়াও ওসি সাহেবের তলপেটে ক্রনিক ব্যথা আছে। এখন সেই ব্যথা

হচ্ছে। তিনি ব্যথা সামাল দিতে গিয়ে মুখ কুঁচকে আছেন। খাকি পোশাক না পরেপায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে তাকে কেমন লাগত তাই ভাবছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন এক ঈদের দিনে এসে উনাকে দেখে যেতে হবে। সুযোগ-সুবিধা থাকলে কোলাকুলিও করব। পুলিশের সঙ্গে কোলাকুলির সৌভাগ্য এখনো হয়নি।
‘বলুন, নাম বলুন। মুখ সেলাই করে বসে থাকবেন না।'

আবারও কাশলাম। খাকি পোশাক পরা কাউকে আসল নাম বলতে নেই।তাদের বলতে হয় নকল নাম। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ভুল-ভাল ঠিকানা দিতে হয়। বাসা যদি হয় মালিবাগ তাহলে বলতে হয় তল্লাবাগ। হিমু নামের বদলে তাকে ঝিমু বললে কেমন হয়? অনেকক্ষণ ঝিম ধরে আছি, কাজেই ঝিমু। সবচে ভাল হয় শত্রুটাইপ কারোর নাম-ঠিকানা দিয়ে দেয়া। তেমন কারে নাম মনে পড়ছে না।

নাম শোনার জন্যে ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এবার তার ধৈর্যচ্যুতি হল। খাকি পোশাক পরা মানুষের ধৈর্য কম থাকে। উনি তাও মোটামুটি ভালই ধৈর্য দেখিয়েছেন।

‘নাম বলছেন না কেন? নাম বলতে অসুবিধা আছে?’

‘জি না স্যার।'

‘অসুবিধা না থাকলে বলুন – ঝেড়ে কাশুন।'

আমি ঝেড়ে কাশলাম, বললাম – হিমু।

‘আপনার নাম হিমু?’

‘ইয়েস স্যার।'

‘আগে-পিছে কিছু আছে, না শুধুই হিমু?’

‘শুধুই হিমু। বাবা হিমালয় নাম রাখতে চেয়েছিলেন, শর্ট করে হিমু রেখেছেন।'
‘শর্ট যখন করলেনই আরো শর্ট করলেন না কেন? শুধু "হি" রেখে দিতেন।'

‘কেন যে “হি” রাখলেন না আমি তো স্যার বলতে পারছি না। উনি কাছে—ধারে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম।’

‘উনি কোথায়?’

‘নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোথায়। খুব সম্ভব সাতটা দোজখের যে কোন একটায় তার স্থান হয়েছে।'

ওসি সাহেবের কুঁচকানো মুখ আরো কুঁচকে গেল। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষকে কখনো রাগাতে নেই।

‘আপনার ধারণা আপনার বাবা দোজখে আছেন ?’

‘জি স্যার। ভয়ংকর পাপী মানুষ ছিলেন। দোজখ-নসিব হবারই কথা। উনি ঠাণ্ডা মাথায় আমার মাকে খুন করেছিলেন। ৩০২ ধারায় কেইস হবার কথা। হয়নি। আমার তখন বয়স ছিল অল্প। তাছাড়া বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ করতাম।’

‘আপনার ঠিকানা কি ?স্থায়ী ঠিকানা।’

‘স্যার, আমার স্থায়ী ঠিকানা হল পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ।'

ওসি সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মত একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। তার মুখ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মনে হয় তলপেটের ক্রনিক ব্যথাটা তার হঠাৎ বেড়ে গেছে। তিনি থমথমে গলায় বললেন, ত্যাদড়ামি করছ? রোলারের এক ডলা খেলে ত্যাদড়ামি বের হয়ে যাবে। রোলার চেন?

'জি স্যার, চিনি।'

'আমার মনে হয় ভাল করে চেন না।'

পুলিশের লোকেরা যেমন অতি দ্রুত তুমি থেকে আপনি-তে চলে যেতে পারেতেমনি অতি দ্রুতই আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই-এ নেমে যেতে পারে। এই বেশ খাতির করে সিগারেট দিচ্ছে, লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে তুমি শুরু করল, তারপরই গালে প্রচণ্ড থাবড়া দিয়ে শুরু করল তুই। তখন চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া গতি নেই।

আমি শংকিত বোধ করছি। ওসি সাহেব হঠাৎ করে আপনি থেকে তুমি-তে চলে এসেছে – লক্ষণ শুভ নয়। গালে থাবড়া পড়বে কি-না কে জানে। আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

'তোমার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ?'

'ইয়েস স্যার।'

'বোমা কিভাবে বানায় তুই জানিস?'

আমি আঁতকে উঠলাম – তুমি থেকে তুই-এ ডিমোশন হয়েছে। লক্ষণ খুব খারাপ। চার নম্বর বিপদ সংকেত। ঘূর্ণিঝড় কাছেই কোথাও তৈরি হয়ে গেছে। এইদিকে চলে আসতে পারে। সমুদ্রগামী সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হচ্ছে।'

'কি, কথা আটকে গেছে যে? বোমা বানাবার পদ্ধতি জানিস? বোমা বানাতে কি লাগে?'

'নির্ভর করছে কি ধরনের বোমা বানাবেন তার উপর। অ্যাটম বোমা বানাতে লাগে ক্রিটিকাল মাসের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম টু থাটি ফাইভ। ফ্রি নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয় . . . .'

'জর্দার কোটা কিভাবে বানায় ?'

'জর্দার কোটা টাইপ বোমা বানাতে লাগে – পটাশিয়াম ক্লোরেট, সালফার, কার্বন এবং কিছু পটাশিয়াম নাইট্রেট। ক্ষেত্রবিশেষে ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যবহার না করলেই ভাল। ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করলে আপন-আপনি বোমা ফেটে যাবার আশংকা থাকে। মনে করুন, আপনি জর্দার কোটা পকেটে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ সম্পূর্ণ বিনা কারণে পকেটের বোমা ফেটে যাবে। ভয় পেয়ে আপনি দৌড়ে থানায় এসে দেখবেন, আপনার একটা পা উড়ে চলে গেছে।প্রচণ্ড টেনশনের জন্যে আপনি এক পায়েই দৌড়ে চলে এসেছেন। বুঝতে পারেননি?'

ওসি সাহেব হুংকার দিলেন, রসিকতা করবি না তঁ্যাদড়ের বাচ্চা, লেবু কচলে যেমন রস বের করে – মানুষ কচলেও আমরা রস বের করি।

এইটুকু বলেই তিনি পেছন দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, আকবর, আকবর !

আকবর কে, কে জানে ? আমি ঝিম ধরে আকবরের জন্যে অপেক্ষা করছি। সাধারণত রাজা-বাদশার নাম বয়-বাবুর্টির মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাকর-বাকর, বয়-বাবুর্চিদের নামের সত্তুর ভাগ জুড়ে আছে- আকবর, শাহজাহান, জাহাঙ্গীর সিরাজ।

আমার অনুমান সত্যি হল। আকবর বাদশা বের হয়ে এলেন। তার বয়স বারো-তেরো। পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে হলুদ গেঞ্জি। আকবর বাদশা সম্ভবত ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুম এখনো কাটেনি। ওসি সাহেব হুংকার দিলেন, হেলে পড়ে যাচ্ছিস কেন? সোজা

হয়ে দাঁড়া।

আকবর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিট পিট করে চারদিক দেখতে লাগল। ওসি সাহেব বললেন, চা বানিয়ে আন। হিমু সাহেবকে ফাস ক্লাস করে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া।

আকবর মাথা অনেকখানি হেলিয়ে সায় দিল। কয়েকবার চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে বিকট হাই তুলল। সে যেভাবে হেলতে দুলতে যাচ্ছে তাতে মনে হয় পথেই ঘুমিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

ওসি সাহেব আমার দিকে ফিরলেন। তিনিও অবিকল আকবরের মত হাই তুলতে তুলতে বললেন, হিমু সাহেব, আপনি চা খান। চা খেয়ে ফুটন। ফুটেন শব্দের মানে জানেন তো ?

'জানি স্যার। ফুটেন হচ্ছে পগারপার হওয়া।'

'দ্যাটস রাইট। চা খেয়ে পগারপার হন। আর ত্যাঁদড়ামি করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ওসি সাহেব আপনি থেকে তুমি-তে নেমে আবার আপনি-তে ফিরে গেছেন। চা-টা খাওয়াচ্ছেন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এত বোঝাবুঝির কিছু নেই। চা খেয়ে দ্রুত বিদেয় হয়ে যাওয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই জগতের অদ্ভূত কাণ্ডকারখানা বোঝার চেষ্টা খুব বেশি করতে নেই। জগৎ চলছে, সূর্য উঠছে-ডুবছে, পূর্ণিম-অমাবস্যা হচ্ছে, তেমনি অদ্ভূত কাণ্ডকারখানাও ঘটছে। ঘটতে থাকুক না। সব বোঝার দরকার কি? বরফ জলে ভাসে। বরফও পানি, জলও পানি। তারপরেও একজন আরেকজনের উপর দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে ভেসে বেড়ানোটা ইন্টারেস্টিং। তার পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা তেমন ইন্টারেস্টিং না।

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে কিন্তু কোন বাতাস লাগছে না। থানার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা। এক কোনায় টেবিলেঝুঁকে বুড়োমত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশ নির্বিকার ভঙ্গি। পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। এই যে ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার এত কথা হল, তিনি একবারও ফিরে তাকাননি। থানার বাইরের বারদায় লম্বা বেঞ্চি পাতা। সেখানে কয়েকজন পুলিশ বসে আছে। তাদের গল্পগুজব, হাসাহসি কানে আসছে। থানার লকারে মুসল্লি-টাইপ কোন ক্রিমিন্যালকে রাখা হয়েছে। সে বেশ উচ্চস্বরে নানান দোয়া-দরুদ পড়ছে। তার গলা বেশ মিষ্টি।

আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি এবং “ত্যাদড়” শব্দের মানে কি তা ভেবে বের করার চেষ্টা করছি। ত্যাঁদড়ের বাচ্চা বলে গালি যেহেতু প্রচলিত, কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে ত্যাঁদড় কোন একটা প্রাণীর নাম। বাঁদর জাতীয় প্রাণী কি ? বাঁদর যেমন বাদরামি করে, ত্যাদড় করে ত্যাঁদড়ামি। ওসি সাহেবকে ত্যাঁদড় শব্দের মানে কি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে ?উনি রেগে গিয়ে আবার আপনি থেকে তুই-এ নেমে যাবেন না তো ? এই রিস্ক নেয়া কি ঠিক হবে ? ঠিক হবে না। তারচে বরং বাংলা ভাল জানে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। মারিয়ার তা-ই ধারণা।

আকবর বাদশা চা নিয়ে এসেছে। যেসব জায়গার নামের শেষে স্টেশন যুক্ত থাকে সে সব জায়গার চা কুৎসিত হয় — যেমন বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, পুলিশ

স্টেশন। অদ্ভুত কাণ্ড – আকবর বাদশার চা হয়েছে অসাধারণ। এক চুমুক মনে হল — গত পাঁচ বছরে এত ভাল চা খাইনি। কড়া লিকারে পরিমাণমত দুধ দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। চিনি যতটুকু দরকার তারচে সামান্য বেশি দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই বেশির দরকার ছিল। গন্ধটাও কি সুদর! চায়ে যে আলাদা গন্ধ থাকে তা শুধু রূপাদের বাড়িতে গেলে বোঝা যায়। তবে রূপাদের বাড়ির চায়ে লিকার থাকে না। খেলে মনে হয় পীর সাহেবের পানিপড়া খাচ্ছি। আমি আকবর বাদশাহর চায়ে গভীর আগ্রহে চুমুক দিচ্ছি। আকবর বাদশা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাই তুলে যাচ্ছে। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় চা শেষ হবার পর কাপ হাতে নিয়ে বিদেয় হবে। যদিও এমন কোন মূল্যবান চায়ের কাপ না। বদখত ধরনের কাপ। খানিকটা ফাটা। ফটা কাপে চ খেলে আয়ু কমে — খুব সুন্দর কাপে চা খেলে নিশ্চয়ই আয়ু বাড়ে। রূপাদের বাড়িতে চা খেয়ে আয়ু বাড়াতে হবে। ওদের বাড়িতেই পৃথিবীর সবচে সুন্দর কাপে চা দেয়া হয়।

ওসি সাহেব বললেন, চা-টা কেমন লাগল ?

আমি বললাম, স্যার ভাল।

'কেমন ভাল ?'

'খুব ভাল। অসাধারণ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মত।'

'কোন কবিতা ?'

আমি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলাম :

এইসব ভাল লাগে : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালী রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ স্নান
চুল-
এই নিয়ে খেলা করে জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,

ওসি সাহেব বললেন, আরেক কাপ খাবেন?

'জ্বি না।'

'কবিতার মত চা যখন – গোটা পাঁচ-ছয় কাপ খান।'

'পরের কাপটা হয়ত ভাল হবে না। আমার ধারণা চা এখানে ভাল হয় না। আজ হঠাৎ করে হয়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর পড়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটি বলে, এক লক্ষ কাপ চা যদি বানানো হয় তা হলে এক লক্ষ কাপ চায়ের ভেতর এক কাপ চা হবে অসাধারণ।'

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সায়েন্স কপচাবি না। সায়েন্স গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জি আচ্ছা, স্যার।

'এখন বল, তোদের বোমা বানাবার কারখানাটা কোথায়? সাঙ্গপাঙ্গদের নাম বল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝেড়ে কাশবি, নয়ত ঠেলার চোটে চা যে খেয়েছিস, সেই চা নাক-মুখ দিয়ে বের হবে। শুরু কর।'

কি সর্বনাশের কথা – আমার ব্রহ্মতালু শুকিয়ে ওঠার উপক্রম হল। এ কি সমস্যায় পড়া গেল । ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, নিজ থেকে কথা বলতে চাইলে ভাল কথা, নয়তো রোলারের গুতা দিয়ে সব বের করব। নাভির এক ইঞ্চি উপরে একটা খুঁতা দিলে আর কিছু দেখতে হবে না। গত জন্মের কথাও

বের হয়ে আসবে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, স্যার, একটা টেলিফোন করতে পারি?

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কাকে টেলিফোন করবি? কোন মন্ত্রীকে পুলিশের আইজিকে? আর্মির কোন জেনারেলকে? টেলিফোন এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান – তোকে অ্যারেস্ট করার জন্য ধমক খেতে খেতে আমার অবস্থা কাহিল হবে — বদলি করে দেবে চিটাগাং হিলট্র্যাক্টে ? শান্তিবাহিনীর বোমা খেয়েচিৎ হয়ে পড়ে থাকব ?

'স্যার, আমি খুবই লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রায় শিম্পাঞ্জীদের কাছাকাছি। হাইয়ার লেভেলের কাউকে চিনি না।'

'তাহলে কাকে টেলিফোন করতে চাচ্ছিস ?'

'এমন কাউকে টেলিফোন করব যে আমার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেবে-'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট?'

'জ্বি।'

'তোর টেলিফোনের পর হোম মিনিস্টার আমাকে ধমকাধমকি করবে না?'

'জি না, স্যার। সম্ভাবনা হচ্ছে, একটা মেয়ে খুব মিষ্টি গলায় আপনাকে আমার সম্পর্কে দু-একটা ভাল কথা বলবে।'

'মেয়েটি কে ?প্রেমিকা ?'

'জ্বি না – আমি লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রেম করার যোগ্যতা আমার নেই। প্রেম অতি উচ্চস্তরের ব্যাপার।'

'তোর যোগ্যতা কি ?'

'আমার একমাত্র যোগ্যতা আমি হাঁটতে পারি। কেউ চাইলে ছায়ার মত পাশে থাকি। আমি হচ্ছি স্যার ছায়া-সঙ্গী।'

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। থানার ঘড়িতে রাত একটা বাজে। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। রূপাকে করা যায়। এত রাতে টেলিফোন করলে রূপা ধরবে না। রূপার বাবা ধরবেন এবং আমার নাম শুনেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন। ফুপুর বাসায় করা যায়। ফুপু টেলিফোন ধরবেন। ঘুম-ঘুম স্বরে বলবেন, কে, হিমু? কি ব্যাপার?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করার পর তিনি হাই তুলতে তুলতে বলবেন, তোকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এটা তো নতুন কিছু না। প্রায়ই ধরে। রাতদুপুরে টেলিফোন করে বিরক্ত করছিস কেন ?

এই দুইজন ছাড়া আর কাউকে টেলিফোন করা সম্ভব না, কারণ আর কারো টেলিফোন নাম্বার আমি জানি না। মারিয়াকে করব? এমিতেও ওর খোঁজ নেয়া দরকার। দুশ কিলোমিটার স্পডে চলার পর কি হল? পৌছতে পেরেছে তো ঢাকায় ? পথে কোন বোমা-টোমা খায়নি? মারিয়ার টেলিফোন নাম্বারটা মনে করতে হবে। পাঁচ বছর আগে একটা পদ্ধতি শিখিয়েছিল। এসোসিয়েশন অব আইডিয়া পদ্ধতি। নাম্বারটা হচ্ছে প্রথমে আট তারপর আমি, তুমি, আমি, তুমি, আমরা। আমি হচ্ছে ১, তুমি হচ্ছে ২, আমরা হচ্ছে ৩ ; তাহলে নাম্বারটা হল ৮ ১২ ১২৩.

ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে মারিয়া ধরল। আমি খুশি খুশি গলায় বললাম, কেমন আছিস ?

মারিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, কেমন আছিস মানে ? আপনি কে ? হু আর ইউ ?

'আমি হিমু।'

'রাত একটার সময় টেলিফোন করেছেন কেন ?'

'খোঁজ নেবার জন্যে — তোর দুশ কিলোমিটার স্পীড়ে ভ্রমণ কেমন হল?'

'রাত একটার সময় সেটা টেলিফোন করে জানতে হবে ?'

'তোর টেলিফোন নাম্বারটা মনে আছে কি-না সেটাও ট্রাই করলাম। এক কাজে দু কাজ।'

'এখনো তুই তুই করছেন?'

'আচ্ছা, আর করব না।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছেন ?'

'রমনা থানা থেকে। পুলিশের ধারণা আমি বোমা-টোমা বানাই। ধরে নিয়ে এসেছে। এখন জেরা করছে।'

'ধোলাই দিয়েছে ?'

'এখনো দেয়নি। মনে হয় দেবে। তুই কি একটা কাজ করতে পারবি? ওসি সাহেবকে মিষ্টি গলায় বলবি যে বোমা-টোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি অতি সাধারন, অতি নিরীহ হিমু। একটুর জন্য মহাপুরুষ হতে গিয়ে পারিনি।'

'আপনি তো সারাজীবন নানান ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছেন — পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তো ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?'

'এক জায়গায় একটা দাওয়াত ছিল। বলেছিলাম রাত করে যাব। ভদ্রলোক না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা দিন। টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি আপনি পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। আসতে পারবেন না।'

'তোর কি ধারণা বাংলাদেশের সবার ঘরেই টেলিফোন আছে?'

'হিমু ভাই, আপনি এখনো কিন্তু তুই তুই করছেন। কেন করছেন তাও আমি জানি। মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি আনন্দ পান। কখনো তুমি, কখনো তুই বলে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এক সময় আমি নিতান্তই একটা কিশোরী ছিলাম। বিভ্রান্ত হয়েছি। বিভ্রান্ত হবার স্টেজ আমি পার হয়ে এসেছি। অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। রাখি ?'

'আচ্ছা -- তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে কি করছিলি?'

'গান শুনছিলাম।'

'কার গান ?'

'নীল ডায়মন্ড। গানের কথা শুনতে চান?'

'বল।'

"What a beautiful noise
coming out from the street
got a beautiful sound
its got a beautiful beat
its a beautiful noise."

'কথা তো শুনলেন। এখন তাহলে রাখি ?'

‘আচ্ছা।’

খট শব্দ করে মারিয়া টেলিফোন রেখে দিল।

ওসি সাহেব বললেন, টেলিফোনে কোন মন্ত্রী-মিনিস্টার পাওয়া গেল ?

‘জ্বি না।’

‘আপনার ক্যারেক্টার সাটিফিকেট দেবে এমন কাউকেও পাওয়া গেল না ?’ ওসি সাহেব আবার তুই থেকে আপনি-তে চলে এসেছেন। জোয়ার-ভাটার খেলা চলছে। খেলার শেষটা কি কে জানে। ওসি সাহেব বললেন, কি, কথা বলুন, সুপারিশের লোক পাওয়া গেল না?

‘একজনকে পেয়েছিলাম, সে সুপারিশ করতে রাজি হল না।'

‘খুবই দুঃসংবাদ।'

‘জি, দুঃসংবাদ।'

‘আমাদের থানার রেকর্ড অফিসার বলল, আপনাকে এর আগেও কয়েকবার ধরা হয়েছে।'

‘উনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিশাচর প্রকৃতির মানুষ তো – রাতে হাঁটি। রাতে যারা হাঁটে পুলিশ তাদের পছন্দ করে না। পুলিশের ধারণা রাতে হাঁটার অধিকার শুধু তাদেরই আছে।'

‘বিটের কনস্টেবলরা বলছিল আপনার না-কি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সত্যি আছে না-কি ?’

‘নেই স্যার। হাঁটার ক্ষমতা ছাড়া আমার অন্য কোন ক্ষমতা নেই।’

‘রোলারের দুই গুঁতা জায়গামত পড়লে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বের হয়ে যায়।'

‘যথার্থ বলেছেন স্যার।’

‘আপনার প্রতি আমি সামান্য মমতা অনুভব করছি। কেন বলুন তো?’

‘আমার কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই – থাকলে সেই ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করে আমার মত অভাজনের প্রতি আপনার মমতার কারণ বলে দিতে পারতাম।’

‘আপনার প্রতি মমতা বোধ করছি, কারণ আমার জানামতে আপনি হচ্ছেনথানায় ধরে আনা প্রথম ব্যক্তি, যার পক্ষে কথা বলার জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এমন এক দেশ, যে দেশে পুলিশের হাতে কেউ ধরা পড়লেই মন্ত্রীমিনিস্টার, সেক্রেটারি, মিলিটারি জেনারেলের একটা সাড়া পড়ে যায়। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে থাকে। শুনুন হিমু সাহেব, চলে যান। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।’

‘থ্যাংক য়্যু স্যার।’

‘যাবেন কি ভাবে? গাড়ি-রিকশা সবই তো বন্ধ।’

‘হেঁটে হেঁটে চলে যাব। কোন সমস্যা নেই।’

‘আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। পুলিশের জীপ দিচ্ছি, আপনি যেখানে যেতে চান নামিয়ে দেবে। যাবেন কোথায় ?’

‘কাওরান বাজার। আসগর নামের এক ভদ্রলোকের বাসায় আমার দাওয়াত।’

‘যান, দাওয়াত খেয়ে আসুন।’

‘আমি পুলিশের জীপে উঠে বসলাম। সেন্ট্রি পুলিশ আমাকে তালেবর সাইজের কেউ ভেবে স্যালুট দিয়ে বসল। রোলারের গুঁতার বদলে স্যালুট! বড়ই রহস্যময় দুনিয়া!

###

পুলিশের গাড়ি আমাকে কাওরান বাজার নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারের গায়েও খাকি পোশাক। সে বেশ আদবের সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে সাহায্য করল। তারপরই এক স্যালুট। আমি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালাম – কেউ দেখে ফেলছে না তো? পুলিশ আদবের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে, স্যালুট দিচ্ছে — খুবই সন্দেহজনক। রাত প্রায় দুটা — কারো জেগে থাকার কথা না। আন্দোলনের সময় সারাদিন লোকজন ব্যস্ত থাকে। টেনশানঘটিত ব্যস্ততা। রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনার পর সবার মধ্যে খানিকটা ঝিম ঝিম ভাব চলে আসে। আন্দোলনের খবর যত ভয়াবহই হোক, সবাই খুব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে চলে যায়। দেশে কোন আন্দোলন চলছে কি-না তা বোঝার উপায় হল রাত বারোটার পর পথে বের হওয়া। যদি দেখা যায় সব খা খা করছে, তাহলে বুঝতে হবে কোন আন্দোলন চলছে। পানের দোকানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভিড় জমে থাকলেও আন্দোলন হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। বিবিসি-র দিকে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে লোকজন কান পেতে থাকে। আমার নিজের ধারণা, কোন এক এপ্রিল-ফুলের রাতে বিবিসি যদি মজা করে বলে — বাংলাদেশে সরকার পতন হয়েছে, তাহলে সরকারের পতন হয়ে যাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারী বাড়ি ছেড়ে অতি দ্রুত কোন আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন। কেউ কোন উচ্চবাচ্য করবে না। বাংলাদেশ টিভি থেকে বলা হবে – বিবিসির খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতায় কে আছেন তা তারা বলেননি বলে এই বিষয়ে আমরাও কিছু বলতে পারছি না।

আমার চারপাশে কেউ ছিল না। একটা কুকুর ছিল, সে পুলিশের গাড়ি দেখে দ্রুত ডাস্টবিনের আড়ালে চলে গেল। যতক্ষণ গাড়ি থেমে রইল ততক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। গাড়ি চলে যাবার পরই সে মাথা বের করে আমাকে দেখল। আমি বললাম, এই আয়। সে কিছু সন্দেহ, কিছু শংকা নিয়ে বের হয়ে এল। লেজ নাড়ছে না – এর অর্থ হচ্ছে আমার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। পুলিশের গাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায় তার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষেও সম্ভব না। কুকুরের সঙ্গে আমি কিছু কথাবার্তা চালালাম।

'কি রে, তোর খবর কি ?রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে ?'

(কুকুর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। ভাবছে।)

'তুই কি এই দিকেরই রাতে ঘুমাস কোথায়?'

(এখন লেজ একটু নড়ল।)

'আমি গলির ভেতর ঢুকব। এক ভয় ভয় লাগছে। তুই আমাকে একটু এগিয়ে দে।'

(লেজ ভালমত নড়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে সে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে।)

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছস কেন? তোর পায়ে কি হয়েছে?'

(প্রবল লেজ নাড়ার সঙ্গে এইবার সে কুঁই কুঁই করল। অর্থাৎ পায়ে কি সমস্যা সেটা বলল। কুকুরের ভাষা জানা নেই বলে বুঝতে পারলাম না।)

মনে হয় তার পায়ে কেউ গরম ভাতের মাড় ঢেলে দিয়েছে। গরম মাড় কিংবা গরম পানি কুকুরের গায়ে ফেলে আমরা বড় আনন্দ পাই। ব্যথা-যন্ত্রণায় সে ছটফট করে – দেখে আমাদের বড়ই ভাল লাগে। মানুষ হিসেবে সমগ্র পশুজগতে আমরা শ্রেষ্ঠ, সেটা আবারও প্রমাণিত হয়।

আমার ধারণা, নিম্নশ্রেণীর পশু বলে আমরা যাদের আলাদা করছি, তাদের আলাদা করা ঠিক হচ্ছে না। মানুষ হিসেবে আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই। আমাদের বুদ্ধি বেশি বলে আমরা অহংকার করি – ওদের যে বুদ্ধি কম সেটা কে বলল ? "আমাদের লজিক আছে, ওদের নেই?" – এটাও কি নিতান্তই একটা বাজে কথা না? আমরা কি কখনো ওদের মাথার ভেতর ঢুকতে পেরেছি যে বলব — ওদের লজিক নেই? "আমাদের ভাষা আছে, ওদের নেই?" – আরেকটি নিতান্তই হাস্যকর কথা। ওদের ভাষা অবশ্যই আছে। একটা কুকুর অন্য এ কুকুরের সাথে নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে। আমরা যখন শুনি তখন মনে হয় শুধুই ঘেউঘেউ করছে। দুজন চাইনীজ কিংবা জাপানীজকে যখন কথা বলতে শুনি তখন মনে হয় এরা কিছুই বলছে না, শুধু 'চেং বেং' টাইপ শব্দ করছে। ওদের চেং বেংএর সঙ্গে ঘেউ ঘেউ-এর তফাৎটা কোথায়?

পশুদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, চিন্তাশক্তি আছে। সব জেনেও এদের আমরা অস্বীকার করি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। অস্বীকার না করলে এদের হত্যা করে আমরা খেতে পারতাম না। আমাদের লজ্জা করত।

খোঁড়া কুকুরটা আমার আগে আগে যাচ্ছে। মনে হয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত সে আগেও আমাকে এ অঞ্চলে আসতে দেখেছে। সে মনে করে রেখেছে। সে জানে আমি কোথায় যাব, তাই আগে আগে নিয়ে যাচ্ছে। নয়ত পেছনে পেছনে আসত। পথে আরো কয়েকটা কুকুর পাওয়া গেল। তারা ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই আমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করল। হয়ত বলল, "ঝামেলা করিস না, আমারচেনা লোক"।

তারাও ঝামেলা করল না। মাথা উচু করে আমাকে দেখে আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমার কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করল। এর অর্থ সম্ভবত – "রাতদুপুরে এভাবে হাঁটাহাঁটি করবে না। দেশের অবস্থা ভাল না। আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। বড় আফসোস। সরকার আর বিরোধী দলে কবে যে মিটমাট হবে।"

আমি কুকুরের পেছনে পেছনে আসগর সাহেব যে গলিতে থাকেন সেই গলি বের করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা জটিল। শাখা নদীর উপশাখা থাকে — সেই উপশাখা থেকেও শাখা বের হয়, যাকে বলা চলে উপ-উপশাখা। আসগর সাহেবের গলিও তেমনি উপ-উপগলি। ঢাকা শহরের সবচে সরু এবং সবচে দীর্ঘ গলি। শুধু যে দীর্ঘ গলি তা না, সবচে দীর্ঘ ডাস্টবিনও। গলির দুপাশের বাসিন্দারা তাদের যাবতীয় আবর্জন কষ্ট করে দূরে নিয়ে ফেলে না, গলিতেই ঢেলে দেয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাতে কিছু মনে করে না। সম্ভবত তাদের খাতায় গলিটির নাম নেই। নাম না থাকাটাও আশ্চর্যের কিছু না। কারণ গলিটার আসলেই কোন নাম

নেই। কোন একদিন এই গলিতে বিখ্যাত কেউ জন্মাবে, তখন হয়তো নাম হবে। কুখ্যাতদের গলির নাম হলে অবশ্যি এখনই এই গলির নাম রাখা যায় – "কানা কুদ্দুস লেন"। কানা কুদ্দুস কাওরান বাজার এলাকার ত্রাস। মানুষ-খুনকে সে মোটামুটি একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার মোটামুটি ভাব আছে। দিনের বেলা সে বেঙ্গল মোটর নামে মোটর পার্টসের দোকানে বসে থাকে। সে অতি বিনয়ী, আচার-ব্যবহার বড়ই মধুর। দেখা হলেই সে আমাকে প্রায় জোর করে চা, মোগলাই পরোটা খাওয়ায়।

গলিটা আমার খুব প্রিয়, কারণ এই গলিতে রিকশা ঢুকতে পারে না। এখানে সব সময়ই হরতাল। শিশুরা প্রায়ই ইটের স্টাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলে। এখানে এলেই আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের খেলা দেখি। একবার আমি তাদের আম্পায়ার হিসেবেও কাজ করেছি। পক্ষপাতদুষ্ট আম্পায়ারিং-এ একটা রেকর্ড সেবার করেছিলাম। বোল্ড আউট হয়ে গেছে, ইটের স্টাম্প বলের ধাক্কায় উড়ে চলে গেছে। দিকে। আমি তখন কঠিন মুখে বলেছি – নো বল হয়েছে, আউট হয়নি। শিশু ব্যাটসম্যানের চোখে গভীর আনন্দ। ফিল্ডাররা চেঁচামেচি করছে। আমি দিয়েছি ধমক – তোমরা বেশি জান ? আমি ঢাকা লীগের আম্পায়ার। আমার চোখের সামনে নো বল করে পার হয়ে যাবে, তা হবে না। স্টার্ট দ্য গেম। নো হাংকি পাংকি ।

এরা আমার হুকুম মেনে নিয়েছে। বয়স্ক একজন মানুষ তাদের খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে – এতেই তারা আনন্দিত। বয়স্ক মানুষদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দরচোখে দেখতে হয়। শিশুরা জানে বয়স্ক মানুষরা ভুল করে, জেনেশুনে ভুল করে। শিশুরাই শুধু জেনেশুনে কোন ভুল করে না।

আসগর সাহেবকে তার বাসায় পাওয়া গেল না। দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। এরকম হবার কথা না। আসগর সাহেব রুটিন-বাধা জীবনযাপন করেন। নটার আগেই জিপিওতে চলে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন। ঘর থেকে বের হন না। গত আঠারো বছরে এই রুটিনের ব্যতিক্রম হয়নি। তার নিজের কোন সংসার নেই। জীবনের একটা পর্যায়ে হয়ত বিয়ে করে সংসার করার কথা ভেবেছেন। এখন ভাবেন না। ভাবার কথাও না। এখন হয়ত মৃত্যুর কথা ভাবেন। একদিন মৃত্যু হবে, যেহেতু সৎ জীবনযাপন করেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর বেহেশত-নসিব হবেন। সেখানে সুখের সংসার পাতবেন। এই জীবনে যা করা হয়নি, পরের জীবনে তা করা হবে।

ভদ্রলোক যে অতি সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সত্যি। চিঠি লিখে সামান্য যা রোজগার করেছেন – তার সিংহভাগ দেশে পাঠিয়েছেন। একবেলা খাওয়া অভ্যাস করেছেন। এতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকুক বা না থাকুক, খরচ অবশ্যই বাঁচে। তিনি খরচ বাঁচিয়েছেন। খরচ বাঁচিয়েছেন বলেই ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করাতে পেরেছেন। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত।

এক ভাই সরকারী ডাক্তার। কুড়িগ্রাম সরকারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার। অন্য ভাই এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছোট ভাইরা এখন বড় ভাইয়ের পেশা নিয়ে লজ্জা বোধ করে। তাদের খুব ইচ্ছা বড়ভাই দেশের বাড়িতে গিয়ে স্থায়ী হোন। দেশের বাড়ি ভাইরা মিলে ঠিকঠাক করেছে। পুকুর কাটিয়ে মাছ ছেড়েছে। জমিজমাও কিছু কেন হয়েছে। আসগর সাহেব নিজেও চান গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। তার বয়স হয়েছে – শরীর নষ্ট হয়েছে, খুবই ক্লান্ত বোধ

করেন। বড় ধরনের অসুখ-বিসুখও হয়েছে হয়ত। ডাক্তার দেখান না বলে অসুখ ধরা পড়েনি। শরীরের এই অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে থাকাটা আসগর সাহেবের জন্যে আনন্দের ব্যাপার হবার কথা। ভাইবোনরা তাকে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা করে। এই মানুষটি তাদের বড় করার জন্যে বিয়ে-টিয়ে করেননি – সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, এই সত্য তারা সব সময় স্বীকার করে।

আলি আসগর দেশে যেতে পারছেন না। বিচিত্র এক ঝামেলায় তিনি ফেঁসে গেছেন। ঝামেলাটা হয়েছে সাত বৎসর আগে। দিন-তারিখ মনে নেই তবে বৃহস্পতিবার ছিল এটা তার মনে আছে। তিনি তার নিজের জায়গায় টুলবঙ্গ নিয়ে বসে আছেন, লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা এক লোক এসে সামনে উবু হয়ে বসল। সে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করতে চায়। টাকার পরিমাণ সাত হাজার এক টাকা। লোকটি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বিড় বিড় করে বলল, অনেক কষ্ট কইরা ট্যাকাগুলান জমাইছি ভাইসাব — পরিবাররে পাঠামু টাকা কেমনে পাঠায় জানি না। আপনে ব্যবস্থা কইরা দেন। আপনের পায়ে ধরি।

বলে সত্যি সত্যি সে তাঁর পা চেপে ধরল। আসগর সাহেব আঁতকে উঠেবললেন, করেন কি, করেন কি!

'গরীব মানুষ ভাইসব, টেকাগুলান সম্বল। বড় কষ্ট কইরা জমাইছি, কেমনে পাঠামু জানি না।'

'আপনার নাম কি?'

'মনসুর।'

'মনসুর, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোন সমস্যা না। ঠিকমত নাম-ঠিকানা বলেন। কার নামে পাঠাবেন?'

'পরিবারের নামে।'

'পরিবারের নাম কি?'

'জহুরা খাতুন।'

'গ্রাম, পোস্টাপিস সব বলেন . . . । আচ্ছা দাঁড়ান, মনিঅর্ডার ফরম আগে নিয়ে আসি।'

মনিঅর্ডার ফরম আনতে গিয়ে দেখা গেল বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। সব বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবারের আগে মনিঅর্ডার করা যাবে না। আসগর সাহেব বললেন, ভাই, আপনি শনিবার সকল দশটার মধ্যে চলে আসবেন। আমি মনিঅর্ডার করে দেব। কোন টাকা লাগবে না। বিনা টাকায় করব। চা খাবেন ? চা খান।

লোকটা চা খেল। তার মনে হয় কিছু সমস্যা আছে। চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কাঁদল। চলে যাবার সময় আসগর সাহেবকে অবাক করে দিয়ে বলল, ভাইজান, সাথে নিয়া যাব না। আমার অসুবিধা আছে। আপনের কাছে থাউক। আমি শনিবারে আসমু।

আসগর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার কাছে টাকা রেখে যাবেন ? এতগুলো টাকা?

লোকটা আগের মত অস্পষ্ট গলায় বিড় বিড় করে বলল, জ্বি ভাইজান। কোন উপায় নাই। গরীবের বহুত কষ্টের টাকা। আপনের হাতে দিয়া গেলাম ভাইজান — আমি শনিবারে আসমু।

লোকটি আর আসেনি। আসগর সাহেব সাত বৎসর টাকা নিয়ে অপেক্ষা

করছেন। লোকটা আসছে না বলে তিনি দায়মুক্ত হয়ে দেশের বাড়িতে যেতে পারছেন না। সম্পূর্ণ অকারণে তিনি অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের নিজেদের তেমন কোন সমস্যা থাকে না। তারা নিজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অদ্ভুত সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে কিছুতেই অন্যের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করেও না।

আসগর সাহেবের ঘর দোতলায়। একতলায় দর্জির একটা দোকান – দর্জির নাম বদরুল মিয়া। বদরুল মিয়া পরিবার নিয়ে দোতলায় থাকেন। তিনি তার একটা ঘর সাবলেট দিয়েছেন আলি আসগরকে। রাত আড়াইটা বাজে – এই সময়ে কি-না বুঝতে পারছি না। বদরুল মিয়া অবশ্যি এম্নিতে খুব মাইডিয়ার ধরনের লোক। বয়স পঞ্চাশের উপরে। ছোটখাট হাসিখুশি মানুষ। মাথায় টুপি পরে অনবরত ঘটাং ঘটাং করে পা-মেশিন চালান। বদরুল মিয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, মেয়েদের ব্লাউজ ছাড়া অন্য কিছু বানাতে পারেন না। কিংবা পারলেও বানান না। ব্লাউজ মনে হয় তিনি ভাল বানান। তার দোকানে মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। মেয়েরাও তাকে খুব পছন্দ করে। তাকে বদরুল চাচা না ডেকে নূর চাচা ডাকে। কারণ বদরুল মিয়ার চেহারা দেখতে অনেকটা আসাদুজ্জামান নূরের মত।

আমি বদরুল মিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম – নূর চাচা আছেন না-কি? সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বদরুল মিয়া বের হয়ে এলেন। মনে হয় জেগেই ছিলেন। গভীর রাতে ডেকে তোলার জন্যে তাকে মোটেই বিরক্ত মনে হল না। বরং মনে হল তিনি আমাকে দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছেন। মেয়েদের ব্লাউজের কারিগররা হয়ত আনন্দময় ভুবনে বাস করেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, ব্যাপার কি হিমু ভাই?

'আসগর সাহেবের খোঁজে এসেছিলাম। ঘর তালাবন্ধ। খবর জানেন কিছু?'

'জ্বি না, কিছুই জানি না। আজ দোকান বন্ধ করেছি বারটার সময়। তখনো দেখি আসেন নাই। এ রকম কখনো হয় না। উনি সন্ধ্যার সময় চলে আসেন। আমি নিজেও চিন্তাযুক্ত। দেশের অবস্থা ভাল না। আবার দিয়েছে হরতাল।'

'বারটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন, আপনার কাজের চাপ মনে হয় খুব বেশি।'
বদরুল মিয়া আনন্দে হেসে ফেলে বললেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ব্যবসা মাশাল্লাহ ভাল হচ্ছে। আন্দোলন-টান্দোলনের সময় মেয়েছেলেরা কাপড় বেশি বানায় ।

'কাপড় না, ব্লাউজ মনে হয় বেশি বানায়।'
বদরুল মিয়া আবারো মিষ্টি করে হাসলেন। আমি বললাম, আচ্ছা নুর চাচা, আপনার এই অঞ্চলের সব মেয়েদের বুকের মাপ আপনি জানেন, তাই না?

'এইটা জানতেই হয় – মাপ লাগে।'

'এই অঞ্চলের সবচে বিশালবক্ষা তরুণীর নাম কি ?'
বদরুল মিয়া আবারো বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিছু বললেন না। গলা খাকারি দিয়ে হাসি বন্ধ করলেন। আমি বললাম, প্রফেশনাল এথিক্স। নাম বলবেন না। খুব ভাল। নূর চাচা, যাই?

'আসগর ভাইকে কিছু বলতে হবে?'

'জ্বি না, কিছু বলতে হবে না।'

'একটু সাবধানে যাবেন হিমু ভাই। সময় খারাপ — গত রাত তিনটার দিকে একটা মার্ডার হয়েছে। কানা কুদ্দুসের কাজ। মাথা কেটে নিয়ে গেছে। শুধু বডি ফেলে

গেছে।’

‘কানা কুদ্দুস আমাকে বোধহয় মার্ডার করবে না। যাই, কেমন? এত রাতে ঘুম ভাঙালাম – কিছু মনে করবেন না।’

‘জ্বি না, এটা কোন ব্যাপার না। জেগেই ছিলাম, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলাম। সময় তো ভাই হয়ে এসেছে — আল্লাহপাকের সামনে দাঁড়াব – কি বলব এই নিয়ে চিন্তাযুক্ত থাকি। তাহাজ্জুদেরনামাজ পড়ে ওনার দরবারে কান্নাকাটি করি।’

গলিতে নেমে দেখি, কুকুরটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে আমাকে নিয়ে এসেছে, কাজেই নিয়ে যাবার দায়িত্বও বোধ করছে। আমি কুকুরটাকে বললাম, চল যাই। যার খোঁজে এসেছিলাম তাকে পাওয়া গেল না।

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি হঁটছি, সে আসছে আমার পেছনে পেছনে – তার সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। বার বার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হচ্ছে।

‘আসগর সাহেবের জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে, কি করি বল তো?’

(কুকুরটা মাথা নাড়ল। আমার চিন্তা মনে হয় তাকেও স্পর্শ করেছে।)

‘আমার কি ধারণা জানিস? আমার ধারণা তিনিও আমার মত পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। জিরো পয়েন্ট জায়গাটা হচ্ছে গণ্ডগোলের আখড়া। বের হয়েছে আর পুলিশ ধরেছে। নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের খুঁতা খেয়ে পুলিশ হাজতে হাতপা এলিয়ে মনে হয় পড়ে আছেন। তোর কি মনে হয়?’

(ঘেউঘেউ উ উ উ। কুকুরের ভাষায় এই শব্দের কি মানে কে বলবে।)

‘আমার ইনটুইশান বলছে রমনা থানায় গেলে আসগর সাহেবের খোঁজ পাব। তবে যেতে ভয় লাগছে। প্রথমবার ভাগ্যগুণে ছাড়া পেয়েছি, আবার পাব কি-না কে জানে। অন্যের ব্যাপারে আমার ইনটুইশান কাজ করে। নিজের ব্যাপারে কাজ করে না। এই হচ্ছে সমস্যা – বুঝলি?’

কুকুরটা আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি তার গায়ে হাত দিয়েআদর করলাম। বললাম, আজ যাই, পরে একদিন তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসব। কাবাব হাউজের ভাল কাবাব। শিক কাবাব আর নান রুটি। তুই ভাল থাকিস। খোড়া পা নিয়ে এত হাঁটাহাঁটি করিস না। পা-টার রেস্ট দরকার।

আমি রওনা দিয়েছি রমনা থানার দিকে। কুকুরটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে থাকবে।

যেতে যেতে মারিয়ার কথা কি ভাবব ? অফ করা সুইচ অন করে দেব? একটা ইন্টারেস্টিং চিঠি মেয়েটা লিখেছিল। সাংকেতিক ভাষার চিঠি। কিছুতেই তার অর্থ বের করতে পারি না। দিনের পর দিন কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে বসে থাকি। শেষে এমন হল অক্ষরগুলি মাথায় গেঁথে গেল। মস্তিকের নিউরোন একটা স্পেশাল ফাইল খুলে সেই ফাইলে চিঠি জমা করে রাখল। ফাইল খুলে চিঠিটা কি দেখব ? দেখা যেতে পারে।

EFBS UNV WIBJ,
TPNFUUOH WFSZ TUSBOHF IBT
IBQQFOE UP NF. J BN JO
MPWF XJUI ZPV. QMFBTF IPME

NF JO ZPVS BSNT.
NBSJB

এই সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করে আমার ফুপাতো ভাই বাদল। তার সময় লাগে তিন মিনিটের মত। ঐ প্রসঙ্গে ভাবতে ইচ্ছা করছে না। আমি মাথার সব কটা সুইচ অফ করে দিলাম।

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। দুপুরে কি কিছু খেয়েছি? না, দুপুরে খাওয়া হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আমার এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। টাকা পয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে। বড় ফুপা (বাদলের বাবা) আগে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দিতেন। এই শর্তে দিতেন যে, আমি বাদলের সঙ্গে দেখা করব না। আমার প্রচণ্ড রকম দূষিত সম্মোহনী ক্ষমতা থেকে বাদল রক্ষা পাবে। আমি শর্ত মেনে দূরে দূরে আছি। মাস শেষে ফুপার অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসি। গত দুমাস হল ফুপ টাকা দেয়া বন্ধ করেছেন। শেষবার টাকা আনতে গেলাম, ফুপা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন — মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, তুমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছ, কাজটা কি ভাল হচ্ছে ?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই দেশের শতকরা ত্রিশ ভাগ লোক ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছে। কাজেই আমি খারাপ কিছু দেখছি না!

'তোমার শরীর ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, পড়াশোনা করেছ – তুমি যদি ভিক্ষা করেবেড়াও, সেটা দেশের জন্য খারাপ।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে মানথলি অ্যালাউন্স দেবেন না।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন – 'কয়েক মাস তোমাকে টাকা দিয়েছি ওম্নি তোমার ধারণা হয়ে গেছে টাকাটা তোমার প্রাপ্য? এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, টাকা কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। একজন মাটি-কাটা শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি কেটে কত পায় জান? মাত্র সত্তর টাকা। তুমি কি মাটি কাটছ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কি ?চা দিতে বলেন। চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।'

'বাদলের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। ও আছে কেমন? ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। কখন গেলে ওকে পাওয়া যায় ?'

ফুপা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। আমি তার দুই দফা হাসিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

'হিমু।'

'জি ফুপা।'

'আমার বাড়িতে আসার ব্যাপারে তোমার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখন তুলে নেয়া হল – তুমি যখন ইচ্ছা আসতে পার।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বাদল কি দেশে নেই?

ফুপা আবারো তার বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন – না। তাকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠিয়েছি। তোমার হাত থেকে ওকে বাঁচানোর একটাই পথ ছিল।

'ভাল করেছেন।'

'ভাল করেছি তো বটেই। এখন চা খাও — চা খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

'চায়ের সঙ্গে হালকা স্ন্যাকস কি পাওয়া যাবে ফুপা?'

'নো স্ন্যাকস। চা যে খেতে দিচ্ছি – এটাই কি যথেষ্ট না?'

'যথেষ্ট তো বটেই।'

আমি ফুপার অফিস থেকে চা খেয়ে চলে এসেছি। আমার বাধা রোজগার বন্ধ। তাতে খুব যে ঘাবড়ে গেছি তা না। বাংলাদেশ ভিক্ষাবৃত্তির দেশ। এই দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এখানে ভিক্ষা করে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হবার কথা না। এখন অবশ্যি কঠিন বলে মনে হচ্ছে। খিদেয় অস্থির বোধ করছি।

ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে মারিয়াদের বাড়িতে উপস্থিত হলে তাঁরা সকালের নাশতা অবশ্যই খাওয়াবে। ইংলিশ ব্রেকফাস্ট — প্রথমে আধা গ্রাস কমলার রস। খিদেটাকে চনমনে করার জন্য ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ কমলার রসের কোন তুলনা নেই। তারপর কি? তারপর অনেক কিছু আছে। সব টেবিলে সাজানো। যা ইচ্ছা তুলে নাও।

১। পাউরুটির স্লাইস

(পাশেই মাখনের বাটিতে মাখন। মাখন-কাটা ছুরি। মারমালেডের বোতল। অনেকে পাউরুটির স্লাইসে পুরু করে মাখন দিয়ে, তাঁর উপর হালকা মারমালেড ছড়িয়ে দেন।)

২। ডিম সিদ্ধ

(হাফ বয়েলড। ডিম সিদ্ধের সঙ্গে আছে গোলমরিচের খুঁড়া ও লবণ। ডিম ভাঙতেই ভেতর থেকে গরম ভাপ উঠবে – হলদে কুসুম গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে – তখন তার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে গোলমরিচ ও লবণ।)

৩। গোশত ভাজা

(ইংরেজি নামটা যেন কি? সসেজ ? ফ্রায়েড সসেজ ? আগুন-গরম সসেজ। খাবার নিয়ম হল একটুকরা গোশত ভাজা, এক চুমুক ব্ল্যাক কফি . . তাড়াহুড়া কিছু নেই। ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজ পড়া যেতে পারে। সব পড়ার দরকার নেই, শুধু হেড লাইন . . .)

আচ্ছা, এইসব কি? আমি কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি না একজন মহাপুরুষ টাইপ মানুষ? খাদ্যের মত অতি স্থুল একটা ব্যাপার আমাকে অভিভূত করে রাখবে, তা কি করে হয় ?

###

'হিরোস ওয়েলকাম' বলে একটি বাক্য আছে। মহান বীর যুদ্ধ জয়ের পর দেশে ফিরলে যা হয় – আনন্দ-উল্লাস, আতশবাজি পোড়ানো, গণসঙ্গীত। থানায় পা দেয়ামাত্র হিরোস ওয়েলকাম বাক্যটি আমার মাথায় এল। আমাকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেন্ট্রির সেপাই একটা বিকট চিৎকার দিল – 'আরে হিমু ভাইয়া।'আমি গেলাম হকচকিয়ে। থানার সবাই ছুটে এলেন। সেকেন্ড অফিসার একগাল হেসে বললেন,

‘স্যার, কেমন আছেন?’ওসি সাহেব আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাই সাহেব, আরাম করে বসুন তো। আপনি আমাদের যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন। কাওরান বাজারে যেখানে আপনাকে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে দুবার জীপ পাঠিয়েছি আপনার খোঁজে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, ব্যাপার কি ?

‘ব্যাপারটা যে কি সে তো আপনি বলবেন। আপনি যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা তো বুঝিনি। মানুষের কপালে তো লেখা থাকে না সে কে। লেখা থাকলে পুলিশের জন্যে ভাল হত। কপালের লেখা দেখে হাজতে ঢুকাতাম, লেখা দেখে চাকফি খাইয়ে স্যালুট করে বাসায় পৌঁছে দিতাম।’

‘ভাই, আমি অতি নগণ্য এক হিমু।’

‘আপনি নগণ্য হলে আমাদের এই অবস্থা!’

‘কি অবস্থা ?’

‘একেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা। দাঁড়ান সব বলছি। ভাই সাহেব, চা খাবেন — ঐ আকবর, হিমু ভাইয়ারে চা দে। তারপর ভাইসাহেব শোনেন কি ব্যাপার। আপনাকে তো ছেড়ে দিলাম, তারপরই মারিয়া নামের একটি মেয়ে টেলিফোন করল — আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি যতই বলি ছেড়ে দিয়েছি ততই চেপে ধরে। আমার কথা বিশ্বাস করে না, রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম, তারপর শুরু হল গজব।’

‘কি গজব ?’

‘একের পর এক টেলিফোন আসা শুরু হল, ডিআইজি, এআইজি, সবশেষে আইজি সাহেব নিজে। আমি স্যারদের বললাম – আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাঁরাবিশ্বাস করলেন। তারপর টেলিফোন করলেন হোম মিনিস্টার। রাত তখন তিনটা দশ। মন্ত্রীরা তো সহজে কিছু বোঝেন না। যতই বলি, স্যার, ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি — মন্ত্রী বলেন, দেখি লাইনে দিন, কথা বলি। আরে, যাকে ছেড়ে দিয়েছি তাকে লাইনে দেব কিভাবে? আমি কি যাদুকর জুয়েল আইচ ?’

উনি বললেন, হিমু সাহেবকে যেখান থেকে পারেন খুঁজে আনেন।

‘আমার কলজে গেল শুকিয়ে। হার্টে ড্রপ বিট শুরু হল। এখন আপনাকে দেখে কলিজায় পানি এসেছে। হার্টও নরমাল হয়েছে। ভাইয়া, আপনি যে এমন তালেবর ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারিনি। নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। পায়ের ধুলাও কিছু দিয়ে দেবেন, বোতলে ভরে থানার ফাইল ক্যাবিনেটে রেখে দেব। এখন হিমু ভাইয়া, আপনি টেলিফোনটা হাতে নিন। যাদের নাম বললাম এক এক করে তাদের সবাইকে টেলিফোন করে জানান যে আপনি আছেন। আপনার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়ে ওঁদের শান্ত করুন। ওনারা বড়ই অশান্ত।’

‘এদের কাউকেই আমি চিনি না।’

‘আপনি এঁদের চেনেন না আর এঁরা আমার জান পানি করে দেবে, তা তো হবে না ভাইয়া। নাচতে নেমেছেন, এখন আর ঘোমটা দিতে পারবেন না। আপনি মারিয়াকে টেলিফোন করুন। তার কাছ থেকে নাবার নিয়ে অন্যদের টেলিফোনে ধরুন।’

আকবর চা নিয়ে এসেছে। ওসি সাহেব আকবরের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। আকবরের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন,

'হারামজাদা, এক কাপ চা আনতে এতক্ষণ লাগে?' বলেই আচমকা এক চড় বসালেন। আকবর উল্টে পড়ে গেল। আবার স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।
ওসি সাহেব টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাম্বার বলুন আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। ডায়াল করতে আপনার কষ্ট হবে। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না।

'নাম্বার হচ্ছে আট-আমি-তুমি-আমি-তুমি-আমরা। এর মানে ৮ ১২ ১২৩।'

'ভাই, আপনার কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না। আপনি নিজেই টেলিফোন করুন। বুঝলেন হিমু ভাইয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন পুলিশে চাকরি করব ততদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে ধরব না। মার্ডার কেইসের আসামী হলেও না।'

মারিয়া জেগেই ছিল। আমি তাকে জানালাম যে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি ছাড়া পেয়েছি এবং ভাল আছি।

মারিয়া বলল, আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি কে বলল ? আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মেয়ে আমি না। বাবা দুশ্চিন্তাকরছেন। আমার কাছ থেকে আপনার গ্রেফতারের কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তারপর শুরু করলেন টেলিফোন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন। টেলিফোন রাখি?'

'তুই রেগে আছিস কেন?'

'আপনাকে অসংখ্যবার বলেছি - তুই তুই করবেন না।'

'আচ্ছা, করব না। তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

'হিমু ভাই, আপনি অকারণে কথা বলছেন?'

'তোমার বাবা কি জেগে আছেন?'

'হ্যাঁ, জেগে আছেন। বাবা রাতে ঘুমুতে পারেন না। আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'না।'

'বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত, আপনি তার সঙ্গে সামান্য কথা বলতেও আগ্রহী না?'

'মরিয়ম, ব্যাপারটা হল কি . . .'

'মরিয়ম বলছেন কেন ?আমার নাম কি মরিয়ম , , , ?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল তো হয়েছেই। আপনি একের পর এক ভুল করবেন – তারপর সেই ভুলটা শুদ্ধ হিসেবে দেখাবার একবার চেষ্টা করবেন। সেটা কি ঠিক ?'

'কি ভুল করলাম?'

'যখন আপনাকে আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয়েছিল তখন আপনি ঠিক করলেন – আমাদের বাসায় আর আসবেন না। বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন — তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আপনার কথা বলেন – কিন্তু আপনার খোঁজ নেই। যাতে আমরা আপনার খোজ না পাই তার জন্যে আগের ঠিকানা পর্যন্ত পাল্টে ফেললেন।'
'মারিয়া, তোমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা পাল্টাইনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে

দুদিন পর পর জায়গা বদল করা। মানুষ গাছের মত, এক জায়গায় কিছু দিন থাকলেই শিকড় গজিয়ে যায়। আমি চাই না আমার শিকড় গজাক।'

'হিমু ভাই, হাত জোড় করে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার সঙ্গে ফিলসফি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাদের বাসায় আসা বন্ধ করেছিলেন, কারণ আমি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল কম। পনেরো বছর। পনেরো বছরের একটি কিশোর তো ভুল করবেই। আমিও করেছি।'

'ভুল বলছ কেন? তখন যা করেছিলে হয়ত ঠিকই করেছিলে। এখন ভুল মনে হচ্ছে। আমি জানতাম একদিন তোমার এ রকম মনে হবে . . .'

'জানতেন বলেই আমার চিঠির জবাব দেননি?'

'মারিয়া, তোমাকে বলেছি – চিঠির পাঠোদ্ধার আমি করতে পারিনি।'

'আবার মিথ্যা বলছেন?'

'পুরোপুরি মিথ্যা না। পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা। আমি আবার একশ ভাগ মিথ্যা বলতে পারি না। সব সময় মিথ্যার সঙ্গে সত্যি মিশিয়ে দি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিথ্যা কতটুকু আর সত্যি কতটুকু?'

'আমি পাঠোদ্ধার করতে পারিনি এটা সত্যি, তবে বাদল পেরেছে।'

'বাদল কে ?'

'আমার ফুপাতো ভাই। আমার মহাভক্ত। আমার শিষ্য বলা যেতে পারে।'

'আপনি আমার চিঠি দুনিয়ার সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছেন?'

'সবাই না, শুধু বাদলকে দিয়েছিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বের করে ফেলল – তখন আর চিঠিটা পড়তে আমার ইচ্ছা করল না। কাজেই অর্থ বের করার পরেও আমি চিঠি পড়িনি।'

'আপনি চিঠি পড়েননি?'

'না।'

'কি লিখেছিলাম জানতে আগ্রহ হয়নি?'

'আগ্রহ চাপা দিয়েছি।'

'কেন ?'

'কারণটা হল . . . '

'থাক, কারণ শুনতে চাই না।'

মারিয়া হঠাৎ করে বলল, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি টেলিফোন রাখলাম। ভাল কথা, আপনার ঠিকানা বলুন। লিখে নেই। আর শুনুন, মা আপনাকে হাত দেখাতে চান। একদিন এসে মার হাতটা দেখে দিন।

আমি ঠিকানা বললাম। সে টেলিফোন রাখল। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি হাসলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ভাল কথা, আপনাদের হাজতে আলি আসগর বলে কি কেউ আছে ? বেচারার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ভাইয়াকে হাজতে নিয়ে যান। উনি নিজে দেখুন। আসগর-ফাসগর যাকেই পান নিয়ে বাড়ি চলে যান। আসগর সাহেব হাজতে ছিলেন। মনে হল নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের খুঁতা খেয়েছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আমি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলেএলাম।

পুলিশের জীপ থাকলে এবারও হয়ত জীপে করে আমাদের পৌছাতো। জীপ ছিল না। সকাল হয়ে আসছে। পিকেটাররা বের হবে। আগামী দিনের হরতাল জাম্পেশ করে করা হবে। পুলিশের ব্যস্ততা সীমাহীন।

আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আসগর সাহেব হাঁটতে পারছেন না। আমি বললাম, রোলারের খুঁতা খেয়েছেন? আসগর সাহেব কিছু বললেন না। বলবেন না, তাও জানি। কিছু মানুষ আছে অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে যায়, কিন্তু নিজের সমস্যা আড়াল করে রাখে।

'হিমু ভাই !'

'জ্বি।'

'একটু বসব।'

'শরীর খারাপ লাগছে ?'

'হু।'

আমি তাকে সাবধানে ফুটপাতের উপর বসালাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বমি করলেন। রক্তবমি।

'আসগর সাহেব !'

'জ্বি ?'

'আপনার অবস্থা তো সুবিধার না।'

'জ্বি।'

'চলুন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাসায় গিয়ে লাভ নেই।'

'নেবেন কি ভাবে ?উঠে দাঁড়াতে পারছি না।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আসুন বসে থাকি। নাকি শোবেন ?'

'জ্বি আচ্ছা।'

আমি তাকে ফুটপাতে শুইয়ে দিলাম। মাথার নীচে ইট জাতীয় কিছু দিতে পারলে ভাল হত। ইট দেখছি না।

'হিমু ভাই !'

'জ্বি।'

'রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিতে এত ভালবাসে কি জন্যে? তারা রাজনীতি করেন – আমরা কষ্ট পাই। এর কারণ কি ?'

'রাজনীতি হল রাজাদের ব্যাপার – বোধহয় এ জন্যেই। রাজনীতি বাদ দিয়ে তারা যখন জননীতি করবেন তখন আর আমাদের কষ্ট হবে না।'

'এ রকম কি কখনো হবে ?'

'বুঝতে পারছি না। হবার তো কথা। মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে।'

'সূর্য কি আছে?'

'সূর্য নিশ্চয়ই আছে। মেঘ সরে গেলেই দেখা যাবে।'

'মেঘ যদি অনেক বেশি সময় থাকে তাহলে কিন্তু এক সময় সূর্য ডুবে যায়। তখন মেঘ কেটে গেলেও সূর্যকে আর পাওয়া যায় না।'

আমি শংকিত বোধ করছি। ভয়াবহ ধরনের অসুস্থ মানুষেরা হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন ঘটিত সমস্যা দেখা দিতে থাকে। উচ্চস্তরের ফিলসফি আসলে মস্তিকে অক্সিজেন ঘাটতিজনিত সমস্যা।

আসগর সাহেবকে দ্রুত হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই দেখছি না।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল। মাটি-কাটা কুলি একজন পাওয়া গেল। সে কাঁধে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

আসগর সাহেব মানুষের কাঁধে চড়তে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি বললাম, লজ্জার কিছু নেই। হাসিমুখে কাঁধে চেপে বসুন। চিরকালই মানুষ মানুষের কাঁধে চেপেছে। একটা ঘোড়া আরেকটা ঘোড়াকে কাঁধে নিয়ে চলে না। মানুষ চলে। সৃষ্টির সেরা জীবদের কাণ্ডকারখানাও সেরা।

###

গল্প-উপন্যাসে পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটা প্রায় পাওয়া যায়। যারা ভোরবেলা পাখির ডাক শোনেন না তাদের কাছে 'পাখি-ডাকা ভোরের' রোমান্টিক আবেদন আছে। লেখকরা কিন্তু পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন – তারা পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটায় পাখির নাম বলেন না। ভোরবেলা যে পাখি ডাকে তার নাম কাক। 'কাক-ডাকা ভোর' লিখলে ভোরবেলার দৃশ্যটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যেত।

কাকের কা কা শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। খুব একটা খারাপ লাগল তা না। কা কা শব্দ যত কর্কশই হোক, শব্দটা আসছে পাখির গলা থেকেই। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু সৃষ্টি করে না – কাকের মধ্যেও সুন্দর কিছু নিশ্চয়ই আছে। সেই সুন্দরটা বের করতে হবে – এই ভাবতে ভাবতে থেকে নামলাম। তারপরই মনে হল – এত ভোরে বিছানা থেকে শুধু শুধু কেন নামছি? আমার সামনে কোন পরীক্ষা নেই যে হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসতে হবে। ভোরে ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে ছুটতে হবে না। চলছে অসহযোগের ছুটি। শুধু একবার ঢাকা মেডিকেল যেতে হবে। আসগর সাহেবের খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ না নিলেও চলবে। আমার তো করার নেই। আমি কোন চিকিৎসক না। আমি অতি সাধারণ হিমু। কাজেই আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। চৈত্র মাসের শুরুর ভোরবেলাগুলিতে হিম হিম ভাব থাকে। হাত-পা গুটিয়ে পাতলা চাদরে শরীর ঢেকে রাখলে মন্দ লাগে না।

অনেকে ভোর হওয়া দেখার জন্যে রাত কাটার আগেই জেগে ওঠেন। তাদের ধারণা, রাত কেটে ভোর হওয়া একটা অসাধারণ দৃশ্য। সেই দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা। তাদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার কাছে মনে হয় সব দৃশ্যই অসাধারণ। এই যে পাতলা একটা কাঁথা গায়ে মাথা ঢেকে শুয়ে আছি এই দৃশ্যেরই কি তুলনা আছে? কাঁথার ছেঁড়া ফুটো দিয়ে আলো আসছে। একটা মশাও সেই ফুটো দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে। বেচারা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে – কি করবে বুঝতে পারছে না। সূর্য উঠে যাবার পর মশাদের রক্ত খাবার নিয়ম নেই। সূর্য উঠে গেছে। বেচারার বুকে রক্তের তৃষ্ণা। চোখের সামনে খালি গায়ের এক লোক শুয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই তার গায়ের রক্ত খাওয়া যায় – কিন্তু দিনের আলোয় রক্ত খাওয়াটা কি ঠিক হবে? সে মহা চিন্তিত হয়ে হিমু নামক মানুষটার কানের কাছে ভন ভন করছে। মনে হচ্ছে অনুমতি প্রার্থনা করছে। মশাদের ভাষায় বলছে – স্যার, আপনার শরীর থেকে এক ফোঁটার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রক্ত কি খেতেপারি? আপনারা মুমূর্ষু

রোগীর জন্যে রক্ত দান করেন, ওদের প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের প্রাণও তো প্রাণ – ক্ষুদ্র হলেও প্রাণ। সেই প্রাণ রক্ষা করতে সামান্য রক্ত দিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন স্যার? কবি বলেছেন – "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

এইসব দৃশ্যও কি অসাধারণ না? তারপরেও আমরা আলাদা করে চিহ্নিত করি। এদের নাম দেই অসাধারণ মুহূর্ত। সাংবাদিকরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন – আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কি ? বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা বলেন (বেশিরভাগই বানোয়াট)।

সমগ্র জীবনটাই কি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে না? এই যে মশাটা কানের কাছে ভন ভন করতে করতে উড়ছে, আবহ সংগীত হিসেবে ভেসে আসছে কাকদের কাকা — এই ঘটনাও কি স্মরণীয় না? আমি হাই তুলতে তুলতে মশাটাকে বললাম — খা ব্যাটা, রক্ত খা। আমি কিছু বলব না। ভরপেট রক্ত খেয়ে ঘুমুতে যা — আমাকেও ঘুমুতে দে।

মশার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ল। সূর্য-ওঠা সকালে কে আসবে আমার কাছে ? মশাটার কথা বলা এবং বোঝার ক্ষমতা থাকলে বলতাম — যা ব্যাটা, দেখে আয় কে এসেছে। দেখে এসে আমাকে কানে কানে বলে যা। যেহেতু মশাদের সেই ক্ষমতা নেই সেহেতু আমাকে উঠতে হল। দরজা খুলতে হল। দরজা ধরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম মারিয়া। এই ভোরবেলায় কালো সানগ্লাসে তার চোখ ঢাকা। ঠোটে গাঢ় লিপস্টিক। চকলেট রঙের সিল্কের শাড়িতে কালে রঙের ফুল ফুটে আছে। কানে পাথর বসানো দুল – খুব সম্ভব চুণী। লাল রঙ ঝিকমিক করে চলছে। এরকম রূপবতী একজন তরুণীর সামনে ছেঁড়াকাঁথা গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে কোন সময় কাঁথা গা থেকে পিছলে নেমে আসবে বলে এক হাতে কাঁথা সামলাতে হচ্ছে, অন্য হাতে লুঙ্গি। তাড়াহুড়া করে বিছানা থেকে নেমেছি বলে লুঙ্গির গিঁট ভালমত দেয়া হয়নি। লুঙ্গি খুলে নিচে নেমে এলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আধুনিক ছোটগল্প। গল্পের শিরোনাম – নাঙ্গুবাবা ও রূপবতী মারিয়া।

আমি নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম, মরিয়ম, তোমার খবর কি ? ভোরবেলায় চোখে সানগ্লাস! চোখ উঠেছে?

'না চোখ ওঠেনি। আপনার খবর কি ?'

'খবর ভাল।'

'এত সকালে এলে কিভাবে ?হেঁটে?'

'যতটা সকাল আপনি ভাবছেন এখন তত সকাল না। সাড়ে দশটা বাজে।'

'বল কি!'

'হ্যাঁ।'

'এসেছ কি করে ?গাড়ি-টাড়ি তো চলছে না।'

'রিকশায় এসেছি।'

'গুড।'

'ভিখিরীদের এই কাঁথা কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার স্থাবর সম্পত্তি বলতে এই কাঁথা, বিছানা এবং মশারি।'

'কাঁথা জড়িয়ে আছেন কেন ?'

'খালি গা তো, এই জন্যে কাঁথা জড়িয়ে আছি।'

'আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?'

'না।'
'আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'
'বলে ফেল।'
'পরশু রাতে যখন টেলিফোনে কথা হল তখনই আমার বলা উচিত ছিল। বলতে পারিনি। বলতে না পারার যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এখন বলব। বলে চলে যাব।'
'চা খাবে? চা খাওয়াতে পারি।'
'এ রকম নোংরা জায়গায় বসে আমি চা খাব না।'
'জায়গাটা আমি বদলে ফেলতে পারি।'
'কিভাবে বদলাবেন ?'
'চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিন্তা করতে হবে – তুই বসে আছিস ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। শান্ত একটা নদী। তুই যে জায়গায় বসে আছিস সে জায়গাটা হচ্ছে বটগাছের একটা গুড়ি। নদীর ঠিক উপরে বটগাছ হয় না – তবু ধরা যাক, হয়েছে। গাছে পাখি ডাকছে।'
মারিয়া শীতল গলায় বলল, তুই তুই করছেন কেন?
'মনের ভুলে তুই তুই করছি। আর হবে না। তোর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় তখন তুই তুই করতাম তো – তাই।'
আপনি কখনোই আমার সঙ্গে তুই তুই করেননি। আপনার সঙ্গে আমার কখনো তেমন করে কথাও হয়নি। আপনি কথা বলতেন মা'র সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। আমি শুনতাম।
'ও আচ্ছা।'
'ও আচ্ছা বলবেন না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।'
'স্মৃতিশক্তি খুব ভাল তা বলা কি ঠিক হচ্ছে? যা বলতে এসেছিস তা বলতে ভুলে গেছিস।'
'ভুলিনি, চলে যাবার আগ মুহূর্তে বলব।'
'তাহলে ধরে নিতে পারি তুই কিছুক্ষণ আছিস ?'
'হ্যাঁ।'
'আমি তাহলে হাত-মুখ ধুয়ে আসি আর চট করে চা নিয়ে আসি। দু'জনে বেশ মজা করে ময়ূরাক্ষীর তীরে বসে চা খাওয়া যাবে।'
'যান, চা নিয়ে আসুন।'
'দু মিনিটের জন্যে তুই কি চোখ বন্ধ করবি ?'
'কেন ?'
'আমি কাঁথাটা ফেলে দিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিতাম ?'
'আপনার সেই হলুদ পাঞ্জাবি?'
'হ্যাঁ।'
'চোখ বন্ধ করতে হবে না। রাস্তা-ঘাট প্রচুর খালি গায়ের লোক আমি দেখি। এতে কিছু যায় আসে না। ভালো কথা, আপনি কি তুই তুই চালিয়ে যাবেন?'
'হ্যাঁ।'
আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, লুঙ্গি বদলে পায়জামা পরলাম। আমার তোষকের নীচে কুড়ি টাকার একটা নোট থাকার কথা। বদু'র চায়ের দোকান আগে বাকি দিত

— এখন দিচ্ছে না। চা আনতে হলে নগদ পয়সা লাগবে। আমরা সম্ভবত অতি দ্রুত 'ফেল কড়ি মাখ তেলে'র জগতে প্রবেশ করছি। কিছুদিন আগেও বেশিরভাগ দোকানে বাধানো ফ্রেমে লেখা থাকতো — "বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না"। সেই সব দোকানে বাকি চাওয়া হত। দোকানের মালিকরা লজ্জা পেতেন না। এখন সেই লেখাও নেই, বাকির সিস্টেমও নেই। তোষকের নীচে কিছু পাওয়া গেল না। বদুর কাছ থেকে চা আসার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গেল।

মরিয়ম খাটের কাছে গেল। খাটে বসার ইচ্ছা বোধহয় ছিল। খাটের নোংরা চাদর, তেল-চিটচিটে বালিশ মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি। চলে গেল ঘরের কোণে রাখা টেবিলে। সে বসল টেবিলে পা ঝুলিয়ে। আমি শংকিত বোধ করলাম। টেবিলটা নড়বড়ে — তিনটা মাত্র পা। চার নম্বর পায়ের অভাব মোচনের চেষ্টা হরা হয়েছে টেবিলটাকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে। মরিয়ম টেবিলে বসে যেভাবে নড়াচড়া করছে তাতে ব্যালেন্স গণ্ডগোল করে যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। মরিয়ম পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনার এই ঘর কখনো ঝাট দেয়া হয় না?

'একেবারেই যে হয় না তা না। মাঝে মাঝে হয়।'

'তোষকের নীচে কি খুঁজছেন?'

'টাকা। পাচ্ছি না। হাপিস হয়ে গেছে। তুই কি দশটা টাকা ধার দিবি?'

'না। আমি ধার দেই না। আপনার বিছানার উপর যে জিনিসটা ঝুলছে তার নাম কি মশারি ?'

'হু।'

'সারা মশারি জুড়েই তো বিশাল ফুটা — কি আশ্চর্য কাণ্ড!'

'তুই আমার মশারি দেখে রাগ করছিস — মশার খুব আনন্দিত হয়। মশারি যখন খাটাই মশারা হেসে ফেলে।'

'মশাদের হাসি আপনি দেখেছেন?'

'না দেখলেও অনুমান করতে পারি। তুই কি চোখ থেকে কালো চশমাটা নামাবি ? অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগছে কেন ?'

'আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন টিচার ছিলেন – সরোয়ার স্যার। ইংরেজি পড়াতেন। খুব ভাল পড়াতেন। হঠাৎ একদিন শুনি স্যার অন্ধ হয়ে গেছেন। মাস দু-এক পর স্যার স্কুলে এলেন। তার চোখে কালো সানগ্লাস। অন্ধ হবার পরও স্যার পড়াতেন। দপ্তরী হাত ধরে ধরে তাকে ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিত। চেয়ারে বসে বসে তিনি পড়াতেন। চোখে থাকতো সানগ্লাস। স্যারকে মনে হত পাথরের মূর্তি। এরপর থেকে সানগ্লাস পরা কাউকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

মরিয়ম সানগ্লাস খুলে ফেলল। আমি বললাম, তোর চোখ অসম্ভব সুন্দর। কালো চশমায় এ রকম সুন্দর চোখ ঢেকে রাখা খুব অন্যায়। আর কখনো চোখে সানগ্লাস দিবি না।

'আমি রোদ সহ্য করতে পারি না। চোখ জ্বালা করে।'

'জ্বালা করলে করুক। তোর চোখ থাকবে খোলা, সুন্দর চোখ সবাই দেখবে। সৌন্দর্য সবার জন্যে।'

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বুকও খুব সুন্দর। তাই বলে সবাইকে বুক দেখিয়ে বেড়াব ?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা বলে কি ? এই সময়ের মেয়েরা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যত সহজে যত অবলীলায় মরিয়ম এই কথাগুলি বলল, আজ থেকে দশ বছর আগে কি কোন তরুণী এ জাতীয় কথা বলতে পারত ?

মরিয়ম বলল, হিমু ভাই, আপনি মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন?

'কিছুটা ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এরচে অনেক ভয়ংকর কথা বলি। আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না।'

'তুই এমন ভয়ংকর ভঙ্গিতে পা দুলাবি না। টেবিলের অবস্থা সুবিধার না। আমি বাথরুমের দিকে রওনা হলাম। আমাদের এই নিউ আইডিয়াল মেসে মোট আঠারো জন বোর্ডার— একটাই বাথরুম সকালের দিকে বাথরুম খালি পাওয়া ঈদের আগে আন্তনগর ট্রেনের টিকেট পাওয়ার মত। খালি পেলেও সমস্যা — ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরপরই দরজায় টোকা পড়বে – 'ব্রাদার, একটুকুইক করবেন।'

আজ বাথরুম খালি ছিল। হাত-মুখ ধোয়া হল, দাড়ি শেভ করা হল না, দাঁত মাজা হল না। রেজার এবং ব্রাশ ঘর থেকে নিয়ে বের হওয়া হয়নি। পকেটে চিরুনি থাকলে ভাল হত। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ভদ্রস্থ হওয়া যেত। বেঁটে মানুষরা লম্বা কাউকে দেখলে বুক টান করে লম্বা হবার চেষ্টা করে। ফিটফট পোশাকের কাউকে দেখলে নিজেও একটু ফিটফট হতে চায় — ব্যাপারটা এরকম।

মরিয়মের জরুরী কথা জানা গেল – সে এসেছে আমাকে হাত দেখাতে। হাত দেখার আমি কিছুই জানি না। যারা দেখেন তারাও জানেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ বলার জন্যে হাত দেখা জানা জরুরী নয়। মন খুশি-করা জাতীয় কিছু কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই হল। সব ভাল ভাল কথা বলতে হবে। দু-একটা রেখা নিয়ে এমন ভাব করতে হবে যে, রেখার অর্থ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। অন্তত একবার ভাল কোন চিহ্ন দেখে লাফিয়ে উঠতে হবে। বিস্মিত গলায় বলতে হবে – কি আশ্চর্য, হাতে দেখি ত্রিশূল চিহ্ন। এক লক্ষ হাত দেখলে একটা এমন চিহ্ন পাওয়া যায়।

মানুষ সহজে প্রতারিত হয় এরকম কথাগুলির একটি হচ্ছে — 'আপনি বড়ই অভিমানী, নিজের কষ্ট প্রকাশ করেন না, লুকিয়ে রাখেন।'

যে সামান্য মাথাব্যথাতে অস্থির হয়ে বাড়ির সবাইকে জ্বালাতন করে সেও এই কথায় আবেগে অভিভূত হয়ে বলবে – ঠিক ধরেছেন। আমার মনের তীব্র কষ্টও আমার অতি নিকটজন জানে না। ভাই, আপনি হাত তো অসাধারণ দেখেন।

আমি মরিয়মের হাত ধরে ঝিম মেরে বসে আছি। এ রকম ভাব দেখাচ্ছি যেন গভীর সমুদ্রে পড়েছি – হাতের রেখার কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না। মরিয়ম বিরক্তির সঙ্গে বলল, কি হয়েছে ?

আমি বললাম, হাত দেখা তো কোন সহজ বিদ্যা না। অতি জটিল। চিন্তাভাবনার সময়টা দিতে হবে না?

মরিয়ম বলল, আমার হেড লাইন মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে গেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ক্রস। এর মানে কি ?

আমি বললাম — এর মানে অসাধারণ।

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, অসাধারণ?

'অবশ্যই অসাধারণ। তোর মাথা খুব পরিষ্কার। চন্দ্রের শুভ প্রভাবে তুই প্রভাবিত। চন্দ্র তোকে আগলে রাখছে পাখির মত। মুরগি যেমন তার বাচ্চাকে আগলে রাখে, চন্দ্র তোকে অবিকল সেভাবে আগলে রাখছে। ক্রস যেটা আছে — সেটা আরো শুভ একটা ব্যাপার। ক্রস হচ্ছে – তারকা। তারকা চিহ্নের কারণে সর্ববিষয়ে সাফল্য।'

মরিয়ম তার হাত টেনে নিয়ে মুখ কালো করে বলল, আপনি তো হাত দেখার কিছুই জানেন না। হেড লাইন যদি মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে যায়, এবং যদি সেখানে স্টার থাকে তাহলে ভয়াবহ ব্যাপার। এটা সুইসাইডের চিহ্ন।

'কে বলেছে?'

'কাউন্ট লুইস হ্যামন বলেছেন।'

'তিনি আবার কে ?'

'তার নিক নেম কিরো। কিরোর নামও শোনেননি – সমানে মানুষের হাত দেখে বেড়াচ্ছেন। এত ভাওতাবাজি শিখেছেন কোথায় ?'

বদু মিয়ার অ্যাসিসটেন্ট চা নিয়ে ঢুকেছে। কোকের বোতল ভর্তি এক বোতল চা। সঙ্গে দুটা খালি কাপ। সে বোতল এবং কাপ নামিয়ে চলে গেল। মরিয়ম শীতল গলায় বলল, এই নোংরা চা আমি মরে গেলেও খাব না। আপনি খান। আপনাকে হাতও দেখতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ চলে যাব। আপনার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বক বক করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। আপনি প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড।'

মরিয়ম উঠে দাঁড়াল। চোখে সানগ্লাস পরল। বোঝাই যাচ্ছে সে আহত হয়েছে।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'হাত দেখাবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি। হাত আমি নিজে খুব ভালই দেখতে পারি। আমি অন্য একটা কারণে এসেছিলাম। কারণটা জানতে চান?'

'চাই।'

'ঐ দিন আপনাকে দেখে শকের মত লাগল। হতভম্ব হয়ে ভেবেছি কি করে আপনার মত মানুষকে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটা লিখলাম। এত বড় ভুল কি করে করলাম?'

'ভুলটা কত বড় তা ভালমত জানার জন্যে আবার এসেছিস?'

'হ্যাঁ। আমার চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই। থাক, মাথা চুলকাতে হবে না। আপনি কোন এক সময় বাবাকে গিয়ে দেখে আসবেন। তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন সেটা তো আপনি জানেন? জানেন না ?'

'জানি। যাব, একবার গিয়ে দেখে আসব। চল তোকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আপনি না এলেই আমি খুশি হব। আপনি বরং কোকের বোতলের চা শেষ করে কথা গায়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মরিয়ম গট গট করে চলে গেল। আমি কোকের বোতলের চা সবটা শেষ করলাম। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চায়ে আফিং-টাফিং দেয় কি-না কে জানে। শুনেছি ঢাকার অনেক চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে সামান্য আফিং মেশায়। এতে চায়ের বিক্রি

ভাল হয়। মনে হয় বদুও তাই করে। পুরো এক বোতল চা খাওয়ায় ঝিমুনির মতো লাগছে। দ্বিতীয় দফা ঘুমের জন্যে বিছানায় উঠে পড়লাম। বিছানায়ওঠামাত্র হাই উঠল। হাই-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল – শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে – শরীর তাই জানান দিচ্ছে। আর অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে — আমার ঘুম পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

অনেকেই আছে একবার ঘুম চটে গেলে আর ঘুমুতে পারে না। আমার সেই সমস্যা নেই। যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি। মহাপুরুষদের ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা থাকে, আমার আছে ইচ্ছ-ঘুমের ক্ষমতা। যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতিতে ইচ্ছে করলেই ঘুমিয়ে পড়া — এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার নয়। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি, আমার আরেকটা ক্ষমতা আছে — ইচ্ছা-স্বপ্নের ক্ষমতা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখতে পারি। যেমন ধরা যাক সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে — বিছানায় গা এলিয়ে কল্পনায় সমুদ্রকে দেখতে হবে। কল্পনা করতে করতে ঘুম এসে যাবে। তখন আসবে স্বপ্নের সমুদ্র। তবে কল্পনার সমুদ্রের সঙ্গে স্বপ্নের সমুদ্রের আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য থাকবে।

সমুদ্র কল্পনা করতে করতে পাশ ফিরলাম। ঘুম আসি-আসি করছে। অনেকদিন স্বপ্নে সমুদ্র দেখা হয় না। আজ দেখা হবে ভেবে খানিকটা উৎফুল্লও বোধ করছি — আবার একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। আমার ইচ্ছা-স্বপ্নগুলি কেন জানি শেষের দিকে খানিকটা ভয়ংকর হয়ে পড়ে। শুরু হয় বেশ সহজভাবেই – শেষ হয় ভয়ংকরভাবে। কে বলবে এর মানে কি ? একজন কাউকে যদি পাওয়া যেত যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহলে চমৎকার হত। ছুটে যাওয়া যেত তার কাছে। এ রকম কেউ নেই – বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের কাছে খুঁজি। নিজে যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না সেই প্রশ্নগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দেই। পড়ে থাকে। আমরা ভাবি প্রশ্নগুলিও এক সময় পচে যাবে – মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। কে জানে নেয় কি-না।

আমি পাশ ফিরলাম। ঘুম আর স্বপ্ন দুটাই একসঙ্গে এসেছে।

আমার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারি যে স্বপ্ন দেখছি। এবং মাঝে মধ্যে স্বপ্ন বদলে ফেলতেও পারি। যেমন ধরা যাক, খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছি – অনেক উচু থেকে সাই সাই করে নিচে পড়ে যাচ্ছি। শরীর কাঁপছে। তখন হুট করে স্বপ্নটা বদলে অন্য স্বপ্র করে ফেলি। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাখ্যাও করতে পারি – স্বপ্নটা কেন দেখছি।

আজ দেখলাম মরিয়মের বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে। (তাকে দেখা খুব স্বাভাবিক। একটুক্ষণ আগেই মরিয়মের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল।) মরিয়ম তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি অন্ধ। এটা কেন দেখলাম বুঝতে পারছি না। আসাদুল্লাহ সাহেব অন্ধ না। আসাদুল্লাহ সাহেবকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল। তখন তার মুখটা হয়ে গেল পত্রলেখক আসগর সাহেবের মত (এটা কেন হল বোঝা গেল না। স্বপ্ন অতি দ্রুত জটিল হয়ে যায়। খুব জটিল হলে স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যায় – তখন আর তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করেছে।)

মরিয়ম তার বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল (যদিও ভদ্রলোককে এখন দেখাচ্ছে পুরোপুরি আসগর সাহেবের মত)। মরিয়ম বলল, আমার বাবা পৃথিবীর সব প্রশ্নের

জবাব জানেন। যার যা প্রশ্ন আছে, করুন। আমাদের হাতে সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যে কোন সময় রমনা থানার ওসি চলে আসবেন। তিনি আসার আগেই করতে হবে। কহক, কুইক। কে প্রথম প্রশ্ন করবেন? কে, কে ?

আমি বিঝতে পারছি। স্বপ্ন আমার নিয়ন্ত্রনে বাইরে চলে যাচ্ছে। সে এখনচলবে তার অদ্ভুত নিয়মে। আমি তারপরেও হাল ছেড়ে দিলাম না, হাত উঠালাম।

মরিয়ম বলল, আপনি প্রশ্ন করবেন?

'জ্বি।'

'আপনার নাম এবং পরিচয় দিন।'

‘আমার নাম হিমু। আমি একজন মহাপুরুষ।’

‘আপনার প্রশ্ন কি বলুন। আমার বাবা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবেন।’

‘মহাপুরুষ হবার প্রথম শর্ত কি?’

আসাদুল্লাহ সাহেবদাঁড়িয়েছেন। তিনি মহাপুরুষ হবার শর্ত বলা শুরু করেছেন। তাঁর গলা ভারী ও গম্ভীর। খানিকটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে কথা বলছেন –

একেক যুগের মহাপুরুষরা একেক রকম হন। মহাপুরুষদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। হজরত মুসা আলাইহেস সালামের সময় যুগটা ছিল যাদুবিদ্যার। বড় বড় যাদুকর তাদের অদ্ভুত সব যাদু দেখিয়ে বেড়াতেন। কাজেই সেই যুগে মহাপুরুষ পাঠানো হল যাদুকর হিসেবে। হজরত মুসার ছিল অসাধারণ যাদু-ক্ষমতা। তার হাতের লাঠি ফেলে দিলে সাপ হয়ে যেত। সে সাপ অন্য সাপ খেয়ে ফেলত।

হযরত ইউসুফের সময়টা ছিল সৌন্দর্যের। তখন রূপের খুব কদর ছিল। হযরত ইউসুফকে পাঠানো হল অসম্ভব রূপবান মানুষ হিসেবে।

হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের যুগ ছিল চিকিৎসার। নানান ধরনের ওষুধপত্র তখন বের হল। কাজেই হযরত ঈসাকে পাঠানো হল অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে। তিনি অন্ধত্ব সারাতে পারতেন। বোবাকে কথা বলার ক্ষমতা পারতেন।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ভণ্ডমির। কাজেই এই যুগে মহাপুরুষকে অবশ্যই ভণ্ড হতে হবে। হাততালি পড়ছে। হাততালির শব্দে মাথা ধরে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগছে না। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙছে না।

###

ফুপা টেলিগ্রামের ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন –

Emergency come sharp.

চিঠি নিয়ে এসেছে তার অফিসের পিওন। সে যাচ্ছে না, চিঠি হাতে দিয়ে চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার?

সে শুকনা গলায় বলল, বখশিশ।

‘বখশিশ কিসের? তুমি ভয়ংকর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। তোমাকে যে ধরে মার লাগাচ্ছি না এই যথেষ্ট। ভাল খবর আনলে বখশিশ পেতে। খুবই খারাপ সংবাদ।’

‘রিকশা ভাড়া দেন। যামু ক্যামনে?’

‘পায়দল চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবে। তাছাড়া রিকশা ভাড়া দিলেও লাভ হবে না – আজ রিকশা চলছে না। ভয়াবহ হরতাল ?’

‘রিকশাটুকটাক চলতাছে।’

‘টুকটাক যে সব রিকশা চলছে তাতে চললে বোমা খাবে। জেনে-শুনে কাউকে কি বোমা খাওয়ানো যায়? তুমি কোন দল কর!’

‘কোন দল করি না।’

‘বল কি ! আওয়ামী লীগ, বিএনপি কোনটা না?’

'জ্বে না।'
'ভোট কাকে দাও?'
'ভোট দেই না।'
'তুমি তাহলে দেখি নির্দলীয় সরকারের লোক। এ রকম তো সচরাচর পাওয়া যায় না। নাম কি তোমার ?'
'মোহাম্মদ আবদুল গফুর।'
'গফুর সাহেব, রিকশা ভাড়া তোমাকে দিচ্ছি। আমার কাছে একটা পয়সা নেই। ধার করে এনে দিতে হবে। ভাড়া কত ?'
'কুড়িটাকা।'
'বল কি ! এখান থেকে মতিঝিল কুড়ি টাকা?'
'হরতালের টাইমে রিকশা ভাড়া ডাবল।'
'তা তো বটেই। দাঁড়াও, আমি টাকা জোগাড় করে আনি। তবে একটা কথা বলিকুড়ি টাকা পকেটে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে। রিকশায় উঠলেই বোমা খাবে।'
গফুর রাগি রাগি চোখে তাকাল। আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম, আমি আসলে একজন মহাপুরুষ। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এই জন্যে সাবধান করে দিচ্ছি।
'জে আচ্ছা।'
মোহাম্মদ আবদুল গফুর মুখ বেজার করে বসে রইল। আমি মেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করলাম। মেস ম্যানেজারের মুখ বেজার হয়ে গেল। মোহাম্মদ আবদুল গফুরের মুখে হাসি ফুটল। এখন এই মেস ম্যানেজার তার বেজার ভাব অন্যজনের উপর ঢেলে দেবে। সে আবার আরেকজনকে দেবে। বেজার ভাব চেইন রিঅ্যাকশনের মত চলতে থাকবে। আনন্দ চেইন রিঅ্যাকশনে প্রবাহিত করা যায় না – নিরানন্দ করা যায়।
ফুপার চিঠি হাতে ঝিম ধরে খানিকক্ষণ বসে কাটালাম। ঘটনা কি আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাদল কি দেশে? ছুটি কাটাতে এসে বড় ধরনের কোন ঝামেলা বাঁধিয়েছে। এইটুকু অনুমান করা যায়। বাদল উদ্ভট কিছু করছে, কেউ তাকে সামলাতে পারছে না। ওঝা হিসেবে আমার ডাক পড়েছে। আমি মন্ত্র পড়লেই কাজ দেবে, কারণ বাদলের কাছে আমি হচ্ছি ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। আমি যদি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলি, এই ব্যাটা সূর্য, দীর্ঘদিন তো পূর্ব দিকে উঠলি— এবার একটু পশ্চিম দিকে ওঠ। পূর্ব দিকে তোর উদয় দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে- তাহলে সূর্য তৎক্ষণাৎ আমার কথা শুনে পশ্চিম দিকে উঠবে।
বাদল শুধু যে বুদ্ধিমান ছেলে তা না, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। মারিয়ার সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করতে তাঁর তিন মিনিট লেগেছে। এই ছেলে আমার সম্পর্কে এমনধারণা করে কি করে আমি জানি না। আমি যদি হিমু-ধর্ম নামে নতুন কোন ধর্মপ্রচার শুরু করি তাহলে অবশ্যই সে হবে আমার প্রথম শিষ্য। এবং এই ধর্মপ্রচারের জন্যে সে হবে প্রথম শহীদ। বাদল ছাড়াও কিছু শিষ্য পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। আসগর সাহেব শিষ্য হবেন। ধর্মে মুগ্ধ হয়ে হবেন তা না — ভদ্রলোক শিষ্য হবেন আমাকে খুশি করার জন্যে। কোন রকম কারণ ছাড়া তিনি আমার প্রতি অন্ধ একটা টান অনুভব করেন। আসগর সাহেব ছাড়া আর কেউ কি

শিষ্য হবে? কানা কুদুস কি হবে ? সম্ভাবনা আছে। সেও আমাকে পছন্দ করে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষ মারতে কেমন লাগে কুদ্দুস ?

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাল-মন্দ কোন রকম লাগে না।

'বটি দিয়ে লাউ কাটতে যেমন লাগে তেমন 'কচ' একটা শব্দ ?'

'ঠিক সেই রকম না, ভাইজান। মরণের সময় মানুষ চিল্লা-ফাল্লা কইরা বড়ত্যক্ত করে। লাউ তো আর চিল্লা-ফাল্লা করে না।'

'তা তো বটেই। চিল্লা-ফাল্লার জন্যে খারাপ লাগে?'

'জ্বি না, খারাপ লাগে না। চিল্লা-ফাল্লাটা করবই। মৃত্যু বলে কথা। মৃত্যু কোন সহজ ব্যাপার না। ঠিক বললাম না?'

'অবশ্যই ঠিক।'

কুদ্দুস মিয়া উদাস ভঙ্গিতে বলল, আপনেরে কেউ ডিস্টার্ব করলে নাম-ঠিকানা দিয়েন।

'নাম-ঠিকানা দিলে কি করবে ?কচ ট্রিটমেন্ট? কচ করে লাউ-এর মত কেটে ফেলবে ?'

'সেইটা আমার বিষয়, আমি দেখব। আফনের কাম নাম-ঠিকানা দেওন।'

'আচ্ছা, মনে থাকল।'

'আরেকটা ঠিকানা দিতেছি – ধরেন কোন বিপদে পড়ছেন। পুলিশ আফনেরে খুঁজতেছে। আশ্রয় দরকার। দানাপানি দরকার – এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া বলবেন, আমার নাম হিমু। ব্যবস্থা হবে। আমি এডভান্স আফনের কথা বইল্যা রাখছি। বলছি হিমু ভাই আমার ওস্তাদ।'

'আমি হিমুএই কথাটা কাকে বলতে হবে?'

'দরজায় তিনটা টোকা দিয়া একটু থামবেন আবার তিনটা টোকা দেবেন, আবার থামবেন, আবার তিন টোকা . . . এই হইল সিগনাল – তখন যে দরজা খুলব তারে বলবেন।'

'দরজা কে খুলবে?'

'আমার মেয়ে-মানুষ দরজা খুলব। নাম জয়গুন। চেহারা বড় বেশি বিউটি। মনে হবে সিনেমার নায়িকা।'

'খুব মোটাগাটা?'

'গিয়া একবার দেইখা আইসেন – এমন সুন্দর, দেখলে মনে হয় গলা টিপ্যা মাইরা ফেলি।'

'গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে কেন ?'

'এইসব মেয়েছেলে সবের সাথেই রং-ঢং করে। আফনে একটা বিশিষ্ট ভদ্রলোক — বিপদে পইড়া তার এইখানে আশ্রয় নিছেন। তা হারামি মেয়েছেলে করব কি জানেন? আফনের সাথে দুনিয়ার গফ করব। কাপড়-চোপড় থাকব আউলা। ইচ্ছা কইরা আউলা। ব্লাউজ যেটা পরব তার দুইটা বোতাম নাই। বোতাম ছিল – ইচ্ছা কইরা ছিঁড়ছে। এমন হারামি মেয়ে।'

নতুন হিমু-ধর্মে কুদ্দুসের সেই হারামি মেয়েটা কি ঢুকবে? তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয়নি। একদিন পরিচয় করে আসতে হবে। একটা ধর্ম শুরু করলে সেখানেরূপবতী মহিলা (যাদের ব্লাউজের দুটা বোতাম ইচ্ছা করে ছেঁড়া) না থাকলে

অন্যরাআকৃষ্ট হবে না।

'মারিয়াকে কি পাওয়া যাবে ?'

মনে হয় না। মারিয়া টাইপ মেয়েদের কখনোই আসলে পাওয়া যায় না। আবার ভুল করলাম – কোন মেয়েকেই আসলে পাওয়া যায় না। তারা অভিনয় করে সঙ্গে আছে এই পর্যন্তই। অভিনয় শুধু যে অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে করে তা না, নিজের সঙ্গেও করে। নিজেরা সেটা বুঝতে পারে না।

আমি ফুপার বাসার দিকে রওনা হলাম এমন সময়ে যেন দুপুরে ঠিক খাবার সময় উপস্থিত হতে পারি। দু'মাস খরচ দেয়া হয়নি বলে মেসে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। দুবেলা খাবার জন্যে নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকির বের করতে হচ্ছে। দুপুরের খাবারটা ফুপার ওখানে সেরে রাতে যাব মেডিকেল কলেজে আসগর সাহেবকে দেখতে। আসগর সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কিছুই খেতে পারেন না। তাকে দেয়া হাসপাতালের খাবারটা খেয়ে নিলে রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। খুব বেশি সমস্যা হলে কানা কুদুসের মেয়েছেলে দুটা বোতামবিহীন নায়িকা জয়গুন তো আছেই।

আজ বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। ফুপাদের বাসায় গিয়ে দেখি সবাই টেবিলে খেতে বসেছে। সবার সঙ্গে ফুপাও আছেন। তার মুখ সব সময় গম্ভীর থাকে। আজ আরো গম্ভীর। তার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি, তারপরেও তিনি এমন ভঙ্গি করলেন যেন আমাকে দেখে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে।

শুধু বাদল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার দিল, আরে হিমু দা, তুমি! তুমি কোথেকে?

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে আকাশ থেকে নেমে এসেছে। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিস কেন? বোস।

বাদল বসল না। ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে রইল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম — তারপর, সব খবর ভাল? মনে হচ্ছে তুই ছুটিতে দেশে এসে আটকা পড়েছিস?

'হ্যাঁ, হিমু দা।'

'সবাই এমন চুপচাপ কেন?'

কেউ কিছু বলল না, শুধু বাদল বলল, এত দিন পর তোমাকে দেখছি – কি যে ভাল লাগছে! তুমি হাত ধুয়ে খেতে বস। মা, হিমু দাকে প্লেট দাও। আর একটা ডিম ভেজে দাও। হিমুদা ডিমভাজা খুব পছন্দ করে। ফার্মের ডিম না, দেশি মুরগির ডিম।

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা কথা বলবি না বাদল। কথা বলে মাথাধরিয়ে দিচ্ছিস। ভাত খা। ঘরে পাঁচ-ছ পদ তরকারি, এর মধ্যে আবার ডিম ভাজতে হবে? কাজের লোক নেই, কিচ্ছু নেই।

বাদল বলল, আমি ভেজে নিয়ে আসছি। হিমুদা, তুমি হাত ধুয় টেবিলে বস।

আমি হাত ধুয়ে টেবিলে বসলাম। বাদল তার মা-বাবার অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে সত্যি সত্যি ডিম ভাজতে গেল।

কাপে ডিম ফেটছে। চামচের শব্দ আসছে।

আমি টেবিলে বসতে বসতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের সমস্যাটা কি? আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছেন, বাদলের জন্যেই তো দিয়েছেন। কি করছে সে ? চিকিৎসা করতে হলে রোগটা ভালমত জানা দরকার।

ফুপা বললেন, হারামজাদা দেশদরদী হয়েছে। অসহযোগের কারণে দেশ ধ্বংস হচ্ছে এই চিন্তায় হারামজাদার মাথা শট সার্কিট হয়ে গেছে। সে অনেক চিন্তাভাবনা

করে সমস্যা থেকে বাঁচার বুদ্ধি বের করেছে।

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, এটা তো ভাল। দেশের সব চিন্তাশীল মানুষই এই সময় দেশ ঠিক করার পদ্ধতি নিয়ে ভাবছেন। মানব বন্ধন-ফন্ধন কি সব যেন করছেন। হাত ধরাধরি করে শুকনা মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। বাদলের পদ্ধতিটা কি?

ফুপা বললেন, গাধার পদ্ধতি তো গাধার মতই।

'কি রকম সেটা? রাজপথে চার পায়ে হামাগুড়ি দেবে ? হামাগুড়ি দিতে দিতে সচিবালয়ের দিকে যাবে ?'

'সেটা করলেও তো ভাল ছিল — গাধাটা ঠিক করেছে জিরো পয়েন্টে গিয়ে রাজনীতিবিদদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'তাই না-কি ?'

'হ্যাঁ। বেকুবটা দুশ তেত্রিশ টাকা দিয়ে একটিন কেরোসিন কিনে এনেছে। তার ঘরে সাজানো আছে। তুই এখন এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যা।'

'কেরোসিন কেনা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে।'

'দেখি কি করা যায়।'

আমি খাওয়া শুরু করলাম। বাদল ডিম ভেজে হাসিমুখে উপস্থিত হল। আমি বললাম, কি রে, তুই নাকি গায়ে আগুন দিচ্ছিস ?

বাদল উজ্জ্বল মুখে বলল, হ্যাঁ, হিমু দা। আইডিয়াটা পেয়েছি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে। আত্মাহুতি। পত্রপত্রিকায় নিউজটা ছাপা হলে রাজনীতিবিদরা একটা ধাক্কা খাবেন। দুই নেত্রীই বুঝবেন — পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। তারা তখন আলোচনায় বসবেন।

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, দুই নেত্রীর বোঝার হলে আগেই বুঝত। এই পর্যন্ত তো মানুষ কম মরেনি। তুই তো প্রথম না।

আমি বললাম, এইখানে আপনি একটা ভুল করছেন ফুপা। বাদল প্রথম তোবটেই। এম্নিতেই মানুষ মরছে পুলিশের গুলিতে, বোমাবাজিতে কিন্তু আত্মাহুতি তো এখনো হয়নি। বাদলই প্রথম। পত্রিকায় ঠিকমতো জানিয়ে দিলে এরা ফটোগ্রাফার নিয়ে থাকবে। সিএনএন-কে খবর দিলে ক্যামেরা চলে আসবে। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা সবাই নিউজ কাভার করবে। এতে একটা চাপ তৈরি হবে তো বটেই।

ফুপা-ফুপু দুজনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাদের হতভম্ব দৃষ্টি উপক্ষো করে বাদলকে বললাম, বাদল, তোর আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

'সত্যি পছন্দ হয়েছে হিমু দা?'

'অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্যে জীবনদান সহজ ব্যাপার তো না। তবে শোন, কেরোসিন ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দিবি। কেরোসিন হচ্ছে ভলটাইল উদ্বায়ী। সঙ্গে সঙ্গে আগুন না দিলে উড়ে চলে যাবে – আগুন আর ধরবে না। আর একটা ব্যাপার বলা দরকার- শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আগুন ধরালে লাভ হবেনা। লোকজন থাবা-টাবা দিয়ে নিভিয়ে ফেলবে। তুই আলুপোড়া হনুমান হয়ে যাবি কিন্তু মরবি না। তোকে যা করতে হবে তা হল কেরোসিন ঢালার আগে দুটা গেঞ্জি, দুটা শার্ট পরতে হবে।'

বাদল কৃতজ্ঞ গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু হিমু দা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তো বিরাট ঝামেলায় পড়তাম।

‘এখন বল আত্মাহুতির তারিখ কবে ঠিক করেছিস ?’

‘আমি কিছু ঠিক করিনি। তুমি বলে দাও। তুমি যেদিন বলবে সেদিন।’

‘দেরি করা ঠিক হবে না। তুই দেরি করল আর দেশ অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে গেল, আর্মি এসে ক্ষমতা নিয়ে নিল – এটা কি ঠিক হবে ?’

‘না, ঠিক হবে না। হিমু দা, আগামী কাল বা পরশু?’

ফুপা-ফুপু দুজনেই খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফুপু যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন সেই দৃষ্টির নিক নেম হল অগ্নিদৃষ্টি। দুশ তেত্রিশ টাকা দামের কেরোসিন টিনের সবটুকু আগুন এখন তার দুই চোখে। আমি তার অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় বাদলকে বললাম, যা করার দু-একদিনের মধ্যেই করতে হবে। হাতে আমাদের সময় অল্প। এর মধ্যেই তোর নিজের কাজ সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।

‘আমার আবার কাজ কি ?’

‘আত্মীয়স্বজন সবার বাড়িতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া। পা ছুয়ে সালাম করা। সবার দোয়া নেয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েরা যা করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোয়া ভিক্ষা।’

‘এইসব ফরমালিটিজ আমার ভাল লাগে না হিমু দা।’

‘ভাল না লাগলেও করতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের একটা সাধ-আহ্লাদ তো আছে। তোর চিন্তার কারণ নেই। আমি সঙ্গে যাব।’

‘তুমি সঙ্গে গেলে যাব।’

আমি ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের জন্য অ্যাডভান্স কুলখানি করলে কেমন হয় ফুপা? সবাইকে খবর দিয়ে একটা কুলখানি করে ফেললাম। ওনলি ওয়ান আইটেম – কাচ্চি বিরিয়ানি। বাদল নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে খাওয়াল। নিজের কুলখানি নিজে খাওয়াও একটা আনন্দের ব্যাপার।

ফুপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভয়ংকর কিছু করে ফেলবেন কি-না কে জানে। কই মাছের ঝোলের বাটি আমার দিকে ছুঁড়ে ফেললে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি বাটি নিজের দিকে টেনে নিলাম।

বিকেলে বাদলকে নিয়েই বের হলাম। দু-একজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে আসগর সাহেবকে দেখতে যাব। বাদলকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বড় কিছু করতে পারার আনন্দ সে ঝলমল করছে।

‘বাদল।’

‘জ্বি।’

‘তোর কাছে টাকা আছে ?’

‘একশ বিয়াল্লিশ টাকা আছে।’

‘তাহলে চল আমাকে শিক কাবাব আর নানরুটি কিনে দে।’

‘কেন ?’

‘একজনকে শিক কাবাব আর নানরুটির দাওয়াত দিয়েছি। টাকার অভাবে কিনতে পারছি না।’

‘কাকে দাওয়াত দিয়েছ ?’

'একটা কুকুরকে। কাওরান বাজারে থাকে। পা খোঁড়া। আমার সঙ্গে খুব খাতির?' অন্য কেউ হলে আমার কথায় বিস্মিত হত। বাদল হল না। কীটপতঙ্গ এদের সঙ্গে আমার ভাব তো থাকবেই। আমি তো সাধারণ কেউ না।

'হিমু দা !'

'বল।'

'তোমার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। তুমি এটা নিয়ে নিও। মরে গেলে তুমি পাবে না।'

'আমার কি আছে তোর কাছে ?'

'ঐ যে পাঁচ বছর আগে একটা সাংকেতিক চিঠি দিয়েছিলে। মারিয়া নামের একটা মেয়ে তোমাকে লিখেছিল।'

'ঐ চিঠি এখনো রেখে দিয়েছিস ?'

'কি আশ্চর্য! তোমার একটা জিনিস তুমি আমার কাছে দিয়েছ আর আমি সেটা ফেলে দেব? তুমি আমাকে কি ভাব ?'

'সাংকেতিক চিঠি তুই এত চট করে ধরে ফেললি কি করে বল তো? এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না।'

বাদল আনন্দিত গলায় বলল, খুব সোজা। আমি তোমাকে বললাম, যে চিঠি দিয়েছে তার নাম কি? তুমি বললে – মারিয়া। কাজেই চিঠির শেষে তার নাম থাকবে। চিঠির শেষে লেখা ছিল NBSIB. (অর্থাৎ M-এর জায়গায় মেয়েটা লিখেছে N, A-র জায়গায় লিখেছেB, যেখানে R হবার কথা সেখানে লিখেছে S) মেয়েটা করেছে কি জান – যে অক্ষরটা লেখার কথা সেটা না লিখে তার পরেরটা লিখেছে। এখন বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'চিঠিতে সে কি লিখেছিল তুমি জানতে চাওনি। বলব কি লিখেছে?'

'না। বাদল, একটা কথা শোন, তোর এত বুদ্ধি কিন্তু তুই একটা সহজ জিনিস বুঝতে পারছিস না।'

'সহজ জিনিসটা কি ?'

'আজ থাক, আরেকদিন বলব।'

শিক কাবাব এবং নানরুটি কিনে এনেছি। কুকুরটাকে পাওয়া গেছে। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসেছে। বাদলের দিকে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম – তোর খাবার এনেছি, তুই আরাম করে খা। এ হচ্ছে বাদল। অসাধারণ বুদ্ধিমান একটা ছেলে।

কুকুরটা বাদলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে দুবার ঘেউ ঘেউ করে খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, মাংসটা আগে খা। নানরুটি খেয়ে পেট ভরালে পরে আর মাংস খেতে পারবি না।

কুকুরটা নানরুটি ফেলে মাংস খাওয়া শুরু করল। বাদল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ও কি তোমার কথা বোঝে ?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমার ধারণা নিম্নশ্রেণীর পশুপাখি মানুষের কথা বোঝে। অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষই শুধু একে অন্যের কথা বোঝে না। বেগম খালেদা জিয়া কি বলছেন তা শেখ হাসিনা বুঝতে পারছেন না। আবার শেখ

হাসিনা কি বলছেন তা বেগম খালেদা জিয়া বুঝতে পারছেন না। আমরা দেশের মানুষ কি বলছি সেটা আবার তারা বুঝতে পারছেন না। তারা কি বলছেন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার না।
বাদল বলল, কেন?

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এই প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। আসাদুল্লাহ সাহেব হয়ত জানেন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে?'

'যে মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখেছিল তার বাবা। আসাদুল্লাহ সাহেব পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

কুকুরটা খেয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একবার খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে লেজ নাড়ল। যেন বলল — এত খাবার তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমি সামান্য পথের নেড়ি কুকুর। আমাকে এতটা মমতা দেখানে কি ঠিক হচ্ছে? আমাদের পশু জগতের নিয়ম খুব কঠিন। ভালবাসা ফেরত দিতে হয়। মানুষ হয়ে তোমরা বেঁচে গেছ। তোমাদের ভালবাসা ফেরত দিতে হয় না।

আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল না। তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চলে আসছি, দরজার কাছের বেড থেকে একজন ক্ষীণ স্বরে ডাকল —ভাই সাহেব !

আমি ফিরলাম।

'আমারে চিনছেন ভাই সাহেব ?'

'না।'

'আমি মোহম্মদ আব্দুল গফুর। আপনের কাছে চিঠি নিয়ে গেছিলাম। কুড়ি টাকা বখশিশ দিলেন।'

'খবর কি গফুর সাহেব?'

'খবর ভাল না ভাই সাহেব। বোমা খাইছি। রিকশা কইরা ফিরতেছিলাম। বোমা মারছে।'

'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।'

'তা তো বটেই।'

'ঠ্যাং একটা কাইট্যা বাদ দিছে ভাই সাহেব।'

'একটা তো আছে। সেটাই কম কি ?নাই মামার চেয়ে কানা মামা।'

'ভাই সাহেব, আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন ভাই সাহেব।'

'দেখি সময় পেলে করব। একেবারেই সময় পাচ্ছি না। ইটাহাটি খুব বেশি হচ্ছে। গফুর সাহেব, যাই ?'

গফুর তাকিয়ে আছে। গফুরের বিছানায় যে মহিলা বসে আছেন তিনি বোধহয় গফুরের কন্যা। অসুস্থ বাবার পাশে কন্যার বসে থাকার দৃশ্যের চেয়ে মধুর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম – 'মা যাই?'
মেয়েটি চমকে উঠল। আমি তাকে মা ডাকব এটা বোধহয় সে ভাবেনি।

###

মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বলাকা সিনেমা হলের সামনের পুরানো বইয়ের দোকানে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে চামড়ার বাধানো মোটা একটা বই। তিনি খুবই অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন। যেন জনতার ভেতর কাউকে খুঁজছেন। ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। ফটোসেনসিটিভ গ্লাস বলেই দুপুরের কড়া রোদে সানগ্লাসের মত কাল হয়ে ভদ্রলোকের চোখ ঢেকে দিয়েছে। আমি ভদ্রলোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ, এমন সুপুরুষ আমি অনেকদিন দেখিনি। সুন্দর পুরুষদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। থাকলে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই এই ভদ্রলোককে পাঠানো যেত। চন্দ্রের কলংকের মত যাবতীয় সৌন্দর্যে খুঁত থাকে — আমি ভদ্রলোকের খুঁতটা কি বের করার জন্যে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে চমকে দিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

অপরিচিত কেউ কেমন আছেন বললে আমরা জবাব দেই না। হয় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, কিংবা বলি, আপনাকে চিনতে পারছি না। এই ভদ্রলোক তা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললেন, জ্বি ভাল।

কাছে এসেও ভদ্রলোকের চেহারায় খুঁত ধরতে পারা গেল না। পঞ্চাশের মত বয়স। মাথাভর্তি চুল। চুলে পাক ধরেছে – মাথার আধাআধি চুল পাকা। এই পাকা চুলেই তাঁকে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে – কুচকুচে কাল হলে তাকে মানাতো না।

অসম্ভব রূপবতীদের বেলাতেও আমি এই ব্যাপারটা দেখেছি। তারা যখন যেভাবে থাকে — সেভাবেই তাদের ভাল লাগে। কপালে টিপ পরলে মনে হয় — আহ, টিপটা কি সুন্দর লাগছে। টিপ না থাকলে মনে হয় – ভাগ্যিস, এই মেয়ে অন্য মেয়েগুলির মত কপালে টিপ দেয়নি। টিপ দিলে তাকে একেবারেই মানাতো না।

আমার ধারণা হল – ভদ্রলোকের চোখে হয়ত কোন সমস্যা আছে। হয়ত চোখ ট্যারা, কিংবা একটা চোখ নষ্ট। সেখানে পাথরের চোখ লাগানো। ফটোসেনসিটিভ সানগ্লাস চোখ থেকে না খোলা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। কাজেই আমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু সময় থাকতে হবে। এই সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই তার চোখে ধুলাবালি পড়বে। চোখ পরিষ্কার করার জন্যে চশমা খুলবেন। যদি দেখি ভদ্রলোকের চোখও সম্রাট অশোক-পুত্র কুনালের চোখের মত অপূর্ব তাহলে আমার অনেকদিনের একটা আশা পূর্ণ হবে। আমি অনেকদিন থেকেই নিখুঁত রূপবান পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিখুঁত রূপবতীর দেখা পেয়েছি –রূপবানের দেখা এখনো পাইনি।

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিচিত মানুষের মত হাসলাম। তিনিও হাসলেন – তবে ব্যাকুল ভঙ্গিতে চারদিক তাকানো দূর হল না। আমি বললাম, স্যার, কোন সমস্যা হয়েছে?

তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, একটা সমস্যা অবশ্যি হয়েছে। ভাল একটা পুরানো বই পেয়েছি – Holder-এর Interpretation of Conscience. অনেকদিন বইটা খুঁজছিলাম, হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

আমি বললাম, বইটা কিনতে পারছেন না? টাকা শর্ট পড়েছে ?

তিনি বললেন, জ্বি। কি করে বুঝলেন?

‘ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা জাচ্ছে। আমার কাছে একশ একুশ টাকা আছে- এতে কি হব্ব?’

‘একশ’ টাকা হলেই হবে।’

আমি একশ টাকার নেট বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক খুব সহজভাবে নিলেন। অপরিচিত একজন মানুষ তাকে একশ টাকা দিচ্ছে এই ঘটনা তাকে স্পর্শ করল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বই খুলে ভেতরের পাতায় আরেকবার চোখ বুলালেন – মনে হচ্ছে দেখে নিলেন মলাটে যে নাম লেখা ভেতরেও সেই নাম কিনা।

বই বগলে নিয়ে ভদ্রলোক এগুচ্ছেন। আমি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তার চোখ ভালমত না দেখে বিদেয় হওয়া যায় না। ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আপনার নাম কি ?

আমি বললাম, আমার নাম হিমালয়।

ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর নাম – হিমালয়। বললেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। হিমালয় নাম শুনে সবাই সামান্য হলেও কৌতুহল নিয়ে আমাকে দেখে, ইনি তাও দেখছেন না। যেন হিমালয় নামের অনেকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।

আমরা নিউ মার্কেটের কার পার্কিং এলাকায় গিয়ে পৌছঁলাম। তিনি শাদা রঙের বড় একটা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভেতরে যাব কেন ?

তিনি আমার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার বাড়িতে চলুন, আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। তারপর আমার ড্রাইভার আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌছে দেবে।

‘অসম্ভব। আমার এখন অনেক কাজ।’

‘বেশ, আপনার ঠিকানা বলুন। আমি টাকা পৌছে দেব।’

‘আমার কোন ঠিকানা নেই।’

‘সে কি ?’

‘স্যার, আপনি বরং আপনার টেলিফোন নাম্বার দিন। আমি টেলিফোন করে একদিন আপনাদের বাসায় চলে যাব।’

‘কার্ড দিচ্ছি, কার্ডে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সবই আছে।’

‘কার্ড না দেওয়াই ভাল। আমার পাঞ্জাবির কোন পকেট নেই। কার্ড হাতে নিয়ে ঘুরব, কিছুক্ষণ পর হাত থেকে ফেলে দেব। এরচে টেলিফোন নাম্বার বলুন, আমি মুখস্থ করে রেখে দি। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল। একবার যা মুখস্থ করি তা ভুলি না।

উনি টেলিফোন নাম্বার বললেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসলেন। তখনো তার হাতে বইটি ধরা। মনে হচ্ছে বই হাতে নিয়েই গাড়ি চালাবেন। আমি বললাম, স্যার, দয়া করে এক সেকেন্ডের জন্যে আপনি কি চোখ থেকে চশমাটা খুলবেন?

‘কেন?’

‘ব্যক্তিগত কৌতুহল মেটাব। অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে হচ্ছিল আপনার একটা চোখ পাথরের।’

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম মনে হবার কারণ কি ? বলতে বলতে তিনি চোখ থেকে চশমা খুললেন। আমি অবাক হয়ে তার চোখ দেখলাম।

পৃথিবীতে সবচে সুন্দর চোখ নিয়ে চারজন মানুষ জন্মেছিলেন — মিশরের রাণী

ক্লিওপেট্রা, ট্রয় নগরীর হেলেন, অশোকের পুত্র কুনাল এবং ইংরেজ কবি শেলী। আমার মনে হল – এই চারটি নামের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত করা যায়। ভদ্রলোকের কি নাম? আমি জানি না — ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার টেলিফোন নাম্বারও ইতিমধ্যে ভুলে গেছি। তাতে ক্ষতি নেই – প্রকৃতি তাকে কম করে হলেও আরো চারবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। এইসব ব্যাপারে প্রকৃতি খুব উদার – পছন্দের সব মানুষকে প্রকৃতি কমপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি করে দেয়। মুখোমুখি করে মজা দেখে।

কাজেই আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা আর করলাম না। আমি থাকি আমার মত – উনি থাকেন ওনার মত। আমি ঠিক করে রেখেছি – একদিন নিশ্চয়ই আবার তার সঙ্গে দেখা হবে। তখন তাঁর সম্পর্কে জানা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মনুষটা ইন্টারেস্টিং। বই-প্রেমিক। হাতে বইটা পাবার পর আশপাশের সবকিছু ভুলে গেছেন। আমাকে সাধারণ ভদ্রতার ধন্যবাদও দেননি। আমি নিশ্চিত, আবার যখন দেখা হবে তখন দেবেন।

পরের বছর চৈত্র মাসের কথা (আমার জীবনের বড় বড় ঘটনা চৈত্র মাসে ঘটে। কে বলবে রহস্যটা কি ?) বেলা একটার মত বাজে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠে গেছে। অনেকক্ষণ হেঁটেছি বলে শরীর ঘামে ভিজে গেছে। পাঞ্জাবির এমন অবস্থা যে দু'হাতে চিপে উঠোনের দড়িতে শুকোতে দেয়া যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে বড় মাপের একটা গ্লাস। গ্লাস ভর্তি পানি। তার উপর বরফের কুচি। কাঁচের পানির জগ হাতে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাস শেষ হওয়ামাত্র সে গ্লাস ভর্তি করে দেবে। জগ হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু হাত দেখা যাচ্ছে — ধবধবে ফর্সা হাত। হাত ভর্তি লাল আর সবুজ কাঁচের চুড়ি। জগে করে পানি ঢালার সময় চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ উঠছে।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। চৈত্র মাসের দুপুরে ঢাকার রাজপথে পানির জগ হাতে চুড়িপরা কোন হাত থাকে না। আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, কোনদিন যদি প্রচুর টাকা হয় তাহলে চৈত্র মাসে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় জলসত্র খুলে দেব। সেখানে হাসিখুশি তরুণীরা পথচারীদের বরফ-শীতল পানি খাওয়াবে। ট্যাপের পানি না — ফুটন্ত পানি। পানিবাহিত জীবাণু যে পানিকে দূষিত করেনি সেই পানি। তরুণীদের গায়ে থাকবে আকাশী রঙ-এর শাড়ি। হাত ভর্তি লাল-সবুজ চুড়ি। চুড়ির লাল রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ঠোঁটে থাকবে আগুন-রঙা লিপস্টিক। তাদের চোখ কেমন হবে ? তাদের চোখ এমন হবে যেন চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় —

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ ।"

প্রচণ্ড রোদের কারণেই বোধহয় মরীচিকা দেখার মত ব্যাপার ঘটল। আমি চোখের সামনে জলসত্রের মেয়েগুলিকে দেখতে পেলাম। একজন না, চার-পাচ জন। সবার হাতেই পানির জগ। হাত ভর্তি লাল-সবুজ চুড়ি। আর তখন আমার পেছনে একটা গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে মাথা বের করে জলসত্রের তরুণীদের একজন বলল, এই যে শুনুন। কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি হিমালয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।
‘গাড়িতে উঠে আসুন। আমার নাম – মারিয়া।’
মেয়েটার বয়স তের-চৌদ্দ, কিংবা হয়ত আরো কম। বাচ্চা মেয়েরা হঠাৎ শাড়ি পরলে অন্য এক ধরনের সৌন্দর্য তাদের জড়িয়ে ধরে। এই মেয়েটির বেলায়ও তাই হয়েছে। মেয়েটি জলসত্রের মেয়েদের নিয়মমত আকাশী রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়িপর মেয়েদের কখনো তুমি বলতে নেই, তবু আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, কেমন আছ মারিয়া ?
‘জ্বি ভাল আছি।’
‘তোমার হাতে লাল-সবুজ চুড়ি নেই কেন?’
মারিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। কিছু বলল না। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। তাতে কিছু যায় আসে না।
মারিয়া বলল, আপনি কি অসুস্থ ?
‘না।’
‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। আপনি তো আমাকে চেনেন না – আমি কে জানতে চাচ্ছেন না কেন ?’
‘তুমি কে?’
‘আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে।’
‘ও আচ্ছা।’
‘আসাদুল্লাহ সাহেব কে তাও তো আপনি জানেন না।’
‘না। উনি কে ?’
'উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে আপনি একবার একশ' টাকা ধার দিয়েছিলেন। মনে পড়েছে?’
‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে।’
‘যে ভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় এখনো মনে পড়েনি। আপনি বাবাকে বলেছিলেন – তার একটা চোখ পাথরের — এখন মনে পড়েছে?’
‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা কি এখন তার কাছে যাচ্ছি? তাকে ঋণমুক্ত করার পরিকল্পনা ?’
‘না — তিনি দেশে নেই। বছরে মাত্র তিনমাস তিনি দেশে থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার দুমাস পরই তিনি চলে যান। এই দুমাস আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে তিনি খুব আপসেট ছিলেন। তিনি চলে যাবার আগে আপনার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন যদি আপনাকে আমি বের করতে পারি তাহলে দারুণ একটা উপহার পাব। তারপর থেকে আমি পথে বের হলেই হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করি – আপনার নাম কি হিমালয়? ভাল কথা, আপনি আসলেই হিমালয় তো?’
‘হু – আমিই হিমালয়।’
‘প্রমাণ দিতে পারেন?’
‘পারি – আপনার বাবা যে বইটা কিনেছিলেন — তার নাম — “Interpretation of Conscicnce".’
বাবা বলেছিলেন – আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ। আমার কাছে অবশ্যি তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

'আমরা যাচ্ছি কোথায় ?'

'গুলশানের দিকে যাচ্ছি।'

গাড়ির ভেতরে এসি দেয়া – শরীর শীতল হয়ে আসছে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি জেগে থাকতে। ঘুম আনার জন্যে মানুষ ভেড়ার পাল গোনে। ঘুম না আসার জন্যে কিছু কি গোনার আছে? ভয়ংকর কোন প্রাণী গুনতে শুরু করলে ঘুম কেটে যাবার কথা। আমি মাকড়সা গুনতে শুরু করলাম।

একটা মাকড়সা, দুটা মাকড়সা, তিনটা — চারটা, পাঁচটা। সর্বনাশ। পঞ্চমটা আবার ব্লাক উইডো মাকড়সা – কামড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এত গোনাগুনি করেও লাভ হল না। মারিয়াদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন আমি গভীর ঘুমে অচেতন। মারিয়া এবং তাদের ড্রাইভার দুজন মিলে ডাকাডাকি করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারছে না।

মারিয়াদের পরিবারের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। মারিয়ার বয়স তখন পনেরো। সেদিনই সে প্রথম শাড়ি পরে। শাড়ির রঙ বলেছি কি ? ও হ্যাঁ, আগে একবার বলেছি। আচ্ছা আবারো বলি, শাড়ির রঙ জলসত্রের মেয়েদের শাড়ির মত আকাশী নীল।

ঘুম ভেঙে দেখি চোখের সামনে হুলস্থূল ধরনের বাড়ি। প্রথম দর্শনে মনে হল বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। বুকে একটা ছোটখাট ধাক্কার মত লাগল। পুরো বাড়ি বোগেনভিলিয়ার গাঢ় লাল রঙে ঢাকা। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ফুলের রঙকে আগুন বলে মনে হচ্ছিল।

মারিয়া বলল, বাড়ির নাম মনে করে রাখুন – চিত্রলেখা। চিত্রলেখা হচ্ছে আকাশের একটা তারার নাম।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

'আজ বাড়িতে কেউ নেই। মা গেছেন রাজশাহী।'

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

'আপনি কি টাকাটা নিয়ে চলে যাবেন, না একটু বসবেন?'

'টাকা নিয়ে চলে যাব।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না?

'না।'

'তাহলে এখানে দাঁড়ান।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা আগ্রহ করেই আমাকে এতদূর এনেছে কিন্তু আমাকে বাড়িতে ঢুকানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি তাতে তেমন অবাক হলাম না। আমি লক্ষ্য করেছি বেশিরভাগ মানুষই আমাকে বাড়িতে ঢোকাতে চায় না। দরজার ওপাশে রেখে আলাপ করে বিদায় করে দিতে চায়। রাস্তায় রাস্তায় দীর্ঘদিন হাঁটাহাটির ফলে আমার চেহারায় হয়ত রাস্তা-ভাব চলে এসেছে। রাস্তা— ভাবের লোকজনদের কেউ ঘরে ঢোকাতে চায় না। রাস্তা-ভাবের লোক রাস্তাতেই ভাল। কবিতা আছে না –

বন্যেরা বনে সুদর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

আমি সম্ভবত রাস্তাতেই সুন্দর।

'হিমালয় সাহেব!'

আমি তাকালাম। বাড়ির ভেতর থেকে মারিয়া ইন্সটিমেটিক ক্যামেরা হাতে বের হয়েছে। বের হতে অনেক সময় নিয়েছে, কারণ সে শাড়ি বদলেছে। এখন পরেছে স্কার্ট। স্কার্ট পরায় একটা লাভ হয়েছে। মেয়েটা যে অসম্ভব রূপবতী তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। শাড়িতে যেমন অপূর্ব লাগছিল স্কার্টেও তেমন লাগছে। দীর্ঘ সময় গেটের বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট মেয়েটাকে দেখে একটু যেন কমল।

'আপনি সূর্যকে সামনে রেখে একটু দাঁড়ান। মুখের উপর সানলাইট পড়ুক। আপনার ছবি তুলব। বাবাকে ছবির একটা কপি হবে। ছবি দেখলে বাবা বুঝবেন যে, আমি আসল লোকই পেয়েছিলাম।'

'হাসব ?'

'হ্যাঁ, হাসতে পারেন।'

'দাঁত বের করে হাসব ? না ঠোঁট টিপে ?'

'যে ভাবে হাসতে ভাল লাগে সে ভাবেই হাসুন। আর এই নিন টাকা।'

মারিয়া একশ টাকার দু'টা নোট এগিয়ে দিল। দুটাই চকচকে নোট। বড়লোকদের সবই সুন্দর। আমি অল্প যে কজন দারুণ বড়লোক দেখেছি তাদের কারো কাছেই কখনো ময়লা নোট দেখিনি। ময়লা নেটগুলি এরা কি ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে ইস্ত্রী করে ফেলে? না-কি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?

'আমি আপনার বাবাকে একশ' টাকা দিয়েছিলাম।'

'বাবা বলে দিয়েছেন যদি আপনার দেখা পাই তাহলে যেন দুশ টাকা দেই। কারণ – গ্রন্থ সাহেব বই-এ গুরু নানক বলেছেন –

দুগুনা দত্তার
চৌগুনা জুজার।

দুগুণ নিলে চারগুণ ফেরত দিতে হয়। বাবা সামনের মাসের ১৫ তারিখের পর আসবেন। আপনি তখন এলে বাবা খুব খুশি হবেন। আর বাবার সঙ্গে কথা বললে আপনার নিজেরও ভাল লাগবে।'

'আমার ভাল লাগবে সেটা কি করে বলছেন ?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বাবার সঙ্গে যে পাঁচ মিনিট কথা বলে সে বার বার ফিরে আসে।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলা কি আপনার মুদ্রা দোষ? একটু পর পর আপনি ও আচ্ছা বলছেন।'

'কিছু বলার পাচ্ছি না বলে "ও আচ্ছা" বলছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসবেন তো ?'

'আসব।'

'আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে – যে প্রশ্নের জবাব আপনি জানেন না – সেই প্রশ্ন বাবার জন্যে নিয়ে আসতে পারেন। আমার ধারণা, আমার বাবা এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

আমি যথাসম্ভব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম — 'ও আচ্ছা।' মারিয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দারোয়ান গেট বন্ধ করে মোটা মোটা দুই তালা লাগিয়ে দিয়ে জেলের সেন্ট্রির মত তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করতে লাগল। আমি হাতের মুঠোয় দুটা চকচকে নেট নিয়ে চৈত্রের ভয়াবহ রোদে রাস্তায় নামলাম। মারিয়া একবারও

বলল না – কোথায় যাবেন বলুন, গাড়ি আপনাকে পৌছে দেবে। বড়লোকদের ঠাণ্ডা গাড়ি মানুষের চরিত্র খারাপ করে দেয় – একবার চড়লে শুধুই চড়তে ইচ্ছা করে। আমি রাস্তায় হাঁটা মানুষ, অল্প কিছু সময় মারিয়াদের গাড়িতে চড়েছি, এতেই হেঁটে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না।

আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আষাঢ় মাসে। বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা হয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ভাগ্যক্রমে মারিয়া এসে পড়ল। বড়লোকরা বোধহয় কিছুতেই বিস্মিত হয় না। কাকভেজা অবস্থায় আমাকে দেখেও একবারও জিজ্ঞেস করল না — ব্যাপার কি ? সহজ ভঙ্গিতে সে আমাকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। বিশাল একটা ঘরে ভদ্রলোক খালি গায়ে বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। তার চোখ একটা খোলা বইয়ের দিকে। দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। আমরা দুজন যে ঢুকলাম তিনি বুঝতেও পারলেন না। মারিয়া বলল, বাবা, একটু তাকাবে ?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ তাকাব। বলার পরেও তাকালেন না। যে পাতাটা পড়ছিলেন সে পাতাটা পড়া শেষ করে বই উল্টে দিয়ে তারপর তাকালেন। তাকিয়ে হেসে ফেললেন। আমি চমকে গেলাম। মানুষের হাসি এত সুন্দর হয় । তৎক্ষণাৎ মনে হল – ভাগ্যিস, মেয়ে হয়ে জন্মাইনি ! মেয়ে হয়ে জন্মালে এই ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হত।

'হিমালয় সাহেব না ?'

'জি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি ভাল।'

'বোস। খাটের উপর বোস।'

'আমি কিন্তু স্যার ভিজে জবজবা।'

'কোন সমস্যা নেই। বোস। মাথা মুছবে?'

'জ্বি না স্যার। বৃষ্টির পানি আমি গায়ে শুকাই তোয়ালে দিয়ে বৃষ্টির পানি মুছলে বৃষ্টির অপমান হয়।'

আমি খাটে বসলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমার কাধ স্পর্শ করলেন।

'তুমি কেমন আছ হিমালয়?'

'জ্বি ভাল।'

'ঐ দিন তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে এসেছিলাম — ধন্যবাদ পর্যন্ত দেইনি। আসলে মাথার মধ্যে সব সময় ছিল কখন বইটা পড়ব। জগতের চারপাশে তখন কি ঘটছিল তা আমার মাথায় ছিল না। ভাল কোন বই হাতে পেলে আমার এ রকম হয়।'

'বইটা কি ভাল ছিল?'

'আমি যতটা ভাল আসা করেছিলাম তারচে ভাল ছিল। এ জাতীয় বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না। পথে-ঘাটে পাওয়া যায়। আমি একবার পুরানো খবরের কাগজ কেনে এ রকম ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটা বই জোগাড় করেছিলাম। বইটার নাম 'Dawn of Intelligence'. এইটিন নাইনটি টু-তে প্রকাশিত বই – অথর হচ্ছেন ম্যাক মাস্টার। রয়েল সোসাইটির ফেলো। চামড়া দিয়ে মানুষ বই বাঁধিয়ে রাখে — ঐ বইটা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মত।'

মারিয়া বলল, বইয়ের কচকচানি শুনতে ভাল লাগছে না বাবা – আমি যাচ্ছি। তোমাদের চা বা কফি কিছু লাগলে বল, আমি পাঠিয়ে দেব।

সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের চা দাও। আর শোন, হিমালয়, তুমি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাবে। তোমার কি আপত্তি আছে?

'জি না।'

'তোমাকে কি এক সেট শুকনো কাপড় দেব?'

'লাগবে না স্যার। শুকিয়ে যাবে।'

'তোমাকে দেখে এত ভাল লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। মারিয়া, তুই বল তো এই ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছে কেন ?'

'তোমার ভালো লাগছে কারণ তুমি ধরে নিয়েছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। সারাজীবন ঋণী হয়ে থাকবে। তুমি ঋণ শোধ করতে পেরেছ, এই জন্যেই ভাল লাগছে।'

'ভেরি গুড – যতই দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে।'

মারিয়া চা আনতে গেল। আমি আসাদুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আমি আসলে আপনাকে দেখতে আসিনি, প্রশ্নটা করতে এসেছি।

'কি প্রশ্ন?'

'এই মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী কি আছে যে আত্মহত্যা করতে পারে?'

'আছে। লেমিং বলে এক ধরনের প্রাণী আছে। ইঁদুর গোত্রীয়। স্ত্রী-লেমিংদের বছরে দুটা বাচ্চা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রতি চার বছর পর পর দুটার বদলে এদের বাচ্চা হয় দশটা করে। তখন ভয়ংকর সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব। এরা তখন করে কি – দল বেঁধে সমুদ্রের দিকে হাঁটা শুরু করে। এক সময় সমুদ্র গিয়ে পড়ে। মিনিট দশেক মনের আনন্দে সমুদ্রের পানিতে সাঁতরায়। তারপর সবাই দল বেঁধে আত্মহত্যা করে। মাস স্যুইসাইড।'

'বলেন কি ?'

'নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে মাস সুইসাইডের ব্যাপারটা আছে। সীল মাছ করে, নীল তিমিরা করে, হাতি করে। আবার এককভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারও আছে। একক আত্মহত্যার ব্যাপারটা দেখা যায় প্রধানত কুকুরের মধ্যে। প্রভুর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে এরা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে আত্মহত্যা করে। পশুদের আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছ কেন?'

'জানতে চাচ্ছি, কারণ – আপনার কন্যার ধারণা আপনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। সত্যি জানেন কি-না পরীক্ষা করলাম।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আবারও হাসছেন। আমার আবারও মনে হল, মানুষ এত সুন্দর করে হাসে কি ভাবে?

'মারিয়ার এরকম ধারণা অবশ্যি আছে, যদিও তার মার ধারণা, আমি পৃথিবীর কোন প্রশ্নেরই জবাব জানি না। ভাল কথা, হিমালয় নামটা ডাকার জন্যে একটু বড় হয়ে গেছে – হিমু ডাকলে কি রাগ করবে?'

'জ্বি না।'

'হিমু সাহেব !'

'জ্বি।'

'ব্যাপারটা কি তোমাকে বলি – আমার হল জাহাজের নাবিকের চাকরি।

সিঙ্গাপুরের গোল্ডেন হেড শিপিং করপোরেশনের সঙ্গে আছি। মাসের পর মাস থাকতে হয় সমুদ্রে। প্রচুর অবসর। আমার আছে বই পড়ার নেশা – ক্রমাগত পড়ি। স্মৃতিশক্তি ভাল, যা পড়ি মনে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চট করে জবাব দিতে পারি।

এনসাইক্লোপিডিয়া হিউমেনিকা ?'

'হা হা হা। তুমি তো মজা করে কথা বল। মোটেই এনসাইক্লোপিডিয়া না। আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দুবার পড়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানুষ কেনে সাজিয়ে রাখার জন্যে, পড়ার জন্যে না। আমার হাতে ছিল প্রচুর সময় – সময়টা কাজে লাগিয়েছি। পড়েছি।'

'পড়তে আপনার ভাল লাগে?'

'শুধু ভাল লাগে না, অসাধারণ ভাল লাগে। প্রায়ই কি ভাবি জান ? প্রায়ই ভাবি, মৃত্যুর পর আমাকে যদি বেহেশতে পাঠানো হয় তখন কি হবে? সেখানে কি লাইব্রেরি আছে? নানান ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে দেখেছি। স্বর্গে লাইব্রেরি আছে এ রকম কথা কোন ধর্মগ্রন্থে পাইনি। সুন্দরী হুরদের কথা আছে, খাদ্য-পানীয়ের কথা আছে, ফলমূলের কথা আছে, বাট নো লাইব্রেরি।'

'বেহেশতে আপনি নিজের ভুবন নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার হাতের কাছেই থাকবে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির মত প্রকাণ্ড লাইব্রেরি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, নিজের বেহেশত নিজের মত করা গেলে আমার বেহেশত কি রকম হবে তোমাক বলি – সুন্দর একটা বিছানা থাকবে, বিছানায় বেশ কয়েকটা বালিশ। চারপাশে আলমিরা ভর্তি বই, একদম হাতের কাছে, যেন বিছানা থেকে না নেমেই বই নিতে পারি। কলিংবেল থাকবে – বেল টিপলেই চা আসবে।

'গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে না?'

'ভাল কথা মনে করেছ। অবশ্যই গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে। সফট স্টেরিও মিউজিক সারাক্ষণ হবে। মিউজিক পছন্দ না হলে আপনাআপনি অন্য মিউজিক বাজা শুরু হবে। হাত দিয়ে বোতাম টিপে ক্যাসেট বদলাতে হবে না।'

'সারাক্ষশ ঘরে বন্দি থাকতে ভাল লাগবে ?'

'বন্দি বলছ কেন? বই খোলা মানে নতুন একটা জগৎ খুলে দেয়া।'

'তারপরেও আপনার হয়ত আকাশ দেখতে ইচ্ছা করবে।'

'এটাও মন্দ বলনি। হ্যাঁ থাকবে, বিশাল একটা জানালা আমার ঘরে থাকবে। তবে জানালায় মোটা পর্দা দেয়া থাকবে। যখন আকাশ দেখতে ইচ্ছে করবে – পর্দা সরিয়ে দেব।'

'এই হবে আপনার বেহেশত ?'

'হ্যাঁ, এই।'

'আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা এরা আপনার পাশে থাকবে না ?'

'থাকলে ভাল। না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।'

'ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনার বেহেশতে কিছু বাদ পড়ে যায়নি তো?'

'না, সব আছে।'

'খুব প্রিয় কিছু হয়ত বাদ পড়ে গেল।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এক্ষুণি বেহেশতটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি হাসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, ও, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। ভাল একটা আয়না লাগবে। এক সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এ রকম একটা আয়না। আমার একটা মেয়েলি স্বভাব আছে। আয়নায় নিজেকে দেখতে আমার ভাল লাগে।

'সবারই আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগে।'

আসাদুল্লাহ সাহেব চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি কি জান আয়নায় মানুষ যে ছবিটা দেখে সেটা আসলে ভুল ছবি? উল্টো ছবি। আয়নার ছবিটাকে বলে মিরর ইমেজ। আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না – উল্টোমানুষ দেখা যায়।

'এমন একটা আয়না কি বানানো যায় না যেখানে মানুষ যেমন তেমনই দেখা যাবে?'

'সেই চেষ্টা কেউ করে নি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমি বললাম, এত চিন্তিত হয়ে কি ভাবছেন?

'ভাবছি, বেহেশতের পরিকল্পনায় কিছু বাদ পড়ে গেল কি-না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর আগেই তার বেহেশত পেয়ে গেছেন। তার চারটা গাড়ি থাকে সত্ত্বেও এক মে মাসে ঢাকা শহরে রিকশা নিয়ে বের হলেন। গাড়িতে চড়লে আকাশ দেখা যায় না। রিকশায় চড়লে আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায় বলেই রিকশা নেয়া। আকাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন, একটা টেম্পো এসে রিকশাকে ধাক্কা দিল। এমন কিছু ভয়াবহ ধাক্কা না, তারপরেও তিনি রিকশা থেকে পড়ে গেলেন – মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেল। পেরোপ্লাজিয়া হয়ে গেল। সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার বাকি জীবনটা কাটবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। ডাক্তাররা সে রকমই বলেছেন।

আমি তাকে একদিন দেখতে গেলাম। যে ঘরে তিনি আছেন তার ঠিক মাঝখানে বড় একটা বিছানা। বিছানায় পাঁচ-ছটা বালিশ। তিন পাশে আলমিরা ভর্তি বই। হাতের কাছে স্টেরিও সিস্টেম। বিছানার মাথার কাছে বড় জানালা। জানালায় ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড। সবই আছে, শুধু কোন আয়না চোখে পড়ল না।

আমাকে দেখেই আসাদুল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন, খবর কি হিমু সাহেব?

আমি বললাম, জ্বি ভাল।

'তোমার কাজ তো শুনি রাস্তায় হাঁটাহাটি করা — হাঁটাহাটি ঠিকমত হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'কি খাবে বল, চা না কফি? একবার বেল টিপলে চা আসবে। দুবার টিপলে কফি। খুব ভাল ব্যবস্থা।'

'কফি খাব।'

আসাদুল্লাহ সাহেব দুবার বেল টিপলেন। আবারও হাসলেন। তার হাসি আগের মতই সুদর। তাকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে কিন্তু সৌন্দর্য হরণ করেনি। সেদিন বরং হাসিটা আরো বেশি সুন্দর লাগল।

'হিমু সাহেব !'

'জ্বি।'

'জীবিত অবস্থাতেই আমি আমার কল্পনার বেহেশত পেয়ে গেছি। আমার কি উচিত না গড অলমাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হওয়া ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কবিতা শুনবে?'

'আপনি শুনতে চাইলে শুনব।'

'আগে কবিতা ভাল লাগতো না। ইদানীং লাগছে — শোন . . .'

আসাদুল্লাহ সাহেব কবিতা আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোকের সব কিছুই আগের মত আছে। শুধু গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছেন –

"এখন বাতাস নেই – তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মত সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে।"

'বল দেখি কার কবিতা ?'

'বলতে পারছি না, আমি কবিতা পড়ি না।'

'কবিতা পড় না ?'

'জ্বি না। আমি কিছুই পড়ি না। দু-একটা জটিল কবিতা মুখস্থ করে রাখি মানুষকে ভড়কে দেবার জন্য। আমার কবিতা-প্রীতি বলতে এটুকুই।'

কফি চলে এসেছে। গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভাল কফি। আমি কফি খাচ্ছি। আসাদুল্লাহ সাহেব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তার হাতে কফির কাপ। তিনি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। সেই জানালায় ভারি পর্দা। আকাশ দেখার উপায় নেই। আসাদুল্লাহ সাহেবের এখন হয়ত আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে না।

###

'কেমন আছেন আসগর সাহেব ?'

'জ্বি ভাল।'

'কি রকম ভাল ?'

আসগর সাহেব হাসলেন। তার হাসি দেখে মনে হল না তিনি ভাল। মৃত্যুর ছায়া যাদের চোখে পড়ে তারা এক বিশেষ ধরনের হাসি হাসে। উনি সেই হাসি হাসছেন।

আমি একবার ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল জেলে এক ফাঁসির আসামী দেখতে গিয়েছিলাম। ফাঁসির আসামী কিভাবে হাসে সেটা আমার দেখার শখ। ফাঁসির আসামীর নাম হোসেন মোল্লা. তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হল। শুধু যক্ষ্মা রোগীর মত জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখও অস্থির, একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। বাংলাদেশে নাকি দুইভাই আছে যারা বিভিন্ন জেলখানায় ফাঁসি দিয়ে বেড়ায়। তারা

ডেট দিতে পারছে না। বা সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন গিয়েছি সেদিনই দুই ভাই চলে এসেছে। পরদিন ভোরে হোসেন মোল্লার সময় ধার্য হয়েছে। হোসেন মোল্লা আমাকে শান্ত গলায় বলল, "ভাই সাহেব, এখনো হাতে মেলা সময়। এই ধরেন, আইজ সারা দিন পইরা আছে, তার পরে আছে গোটা একটা রাইত। ঘটনা ঘটনের এখনো মেলা দেরি।" বলেই হোসেন হাসল। সেই হাসি দেখে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। প্রেতের হাসি।

আসগর সাহেবের হাসি দেখেও গায়ে কাঁটা দিল। কি ভয়ংকর হাসি ! আমি বললাম, ভাই, আপনার কি হয়েছে? ডাক্তার বলছে কি ?

'আলসার। সারাজীবন অনিয়ম করেছি — খাওয়া-দাওয়া সময়মত হয় নাই, সেখান থেকে আলসার ।'

'পেটে রোলারের গুতাও তো খেয়েছিলেন।'

'রোলারের গুঁতা না খেলেও যা হবার হত। সব কপালের লিখন, তাই না হিমু ভাই ?'

'তা তো বটেই।'

'দূরে বসে চিকন কলমে একজন কপাল ভর্তি লেখা লেখেন। সেই লেখার উপরে জীবন চলে।'

'হু। মাঝে মাঝে ওনার কলমের কালি শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু লেখেন না। মুখে বলে দেন – "যা ব্যাটা নিজের মত চড়ে খা" – এই বলে নতুন কলম নিয়ে অন্য একজনের কপালে লিখতে বসেন।'

'বড়ই রহস্য এই দুনিয়া।'

'রহস্য তো বটেই – এখন বলুন আপনার চিকিৎসার কি হচ্ছে?'

'অপারেশন হবার কথা।'

'হবার কথা, হচ্ছে না কেন ?'

'দেশে এমন সমস্যা। ডাক্তাররা ঠিকমত আসতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্যে অপারেশন থিয়েটার খোলে। আমার চেয়েও যারা সিরিয়াস তাদের অপারেশন হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো ভয়-ভীতি নাই হিমু ভাই।'

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

'ভালমত মরতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার।'

'আপনি শিগগিরই মারা যাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'মরে গেলে সাত হাজার টাকাটার কি হবে ?ঐ লোক যে কোনদিন চলে আসতে পারে।'

'ও আসবে না।'

'বুঝলেন কি করে আসবে না?'

'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'তার সঙ্গে কথা হয়েছে মানে? সে কি হাসপাতালে এসেছিল?'

'জি।'

'আসগর ভাই, ব্যাপারটা ভালমত বুঝিয়ে বলুন তো। আমি ঠিকমত বুঝতে পারছি না।'

আসগর সাহেব মৃদু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। বোঝা যাচ্ছে যা বলছেন — খুব আগ্রহ নিয়ে বলছেন।

'বুঝলেন হিমু ভাই — প্রচণ্ড ব্যথার জন্য রাতে ঘুমাতে পারি না। গত রাতে ডাক্তার সাহেব একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। রাত তিনটার দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি খুব পানির পিপাসা। হাতের কাছে টেবিলের উপর একটা পানির জগ আছে। জগে পানি নাই। জেগে আছি – নার্সদের কেউ এদিকে আসলে পানির কথা বলব। কেউ আসছে না। হঠাৎ কে যেন দুবার কাশল। আমার টেবিল উত্তর দিকে – কাশিটা আসল দক্ষিণ দিক থেকে। মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখি – মনসুর।'

'মনসর কে ?'

'যে আমাকে সাত হাজার এক টাকা দিয়ে গিয়েছিল – সে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি গেলাম রেগে। এই লোকটা আমাকে কি যন্ত্রণায় ফেলেছে ভেবে দেখুন দেখি। আমি বললাম – তোমার ব্যাপারটা কি? কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কি জন তুমি আমাকে কি যন্ত্রণায় ফেলেছ? মনসুর চুপ করে রইল। মাথাও তোলে না। আমি বললাম, কথা বল না কেন ? শেষে সে বলল, তাইজান, আমি আসব ক্যামনে ? আমার মৃত্যু হয়েছে। আপনে যেমন মনকষ্টে আছেন আমিও মনকষ্টে আছি। এত কষ্টের টাকা পরিবাররে পাঠাইতে পারি নাই।

আমি বললাম, তুমি ঠিকানা বল আমি পাঠিয়ে দিব। টাকার পরিমাণ আরো বেড়েছে। পোস্টাপিসের পাসবইয়ে টাকা রেখে দিয়েছিলাম। বেড়ে ডবলের বেশি হবার কথা। আমি খোঁজ নেই নাই। তুমি ঠিকানটা বল।

মনসুর আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমি বললাম, কথা বল। চুপ করে আছ কেন? মনসুর বলল – ঠিকানা মনে নাই স্যার। পরিবারের নামও মনে নাই। — বলেই কান্না শুরু করল। তখন একজন নার্স ঢুকল – তাকিয়ে দেখি মনসুর নাই। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার, পানি খাব। তিনি আমাকে পানি খাইয়ে চলে গেলেন। আমি সারারাত জেগে থাকলাম মনসুরের জন্যে। তার আর দেখা পেলাম না। এই হচ্ছে হিমু ভাই ঘটনা।'

'এটা কোন ঘটনা না – এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছেন।'

'জি না ভাই সাহেব, স্বপ্ন না। স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা। মনসুর আগের মতই আছে, তার কোন পরিবর্তন হয় নাই।'

'আসগর ভাই, মনসুর মরে ভূত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছে? আপনার কথা তার মনে আছে অথচ পরিবারের নাম-ঠিকানা ভুলে গেছে – এটা কি হয়? হয় না। এই ধরনের ঘটনা স্বপ্নে ঘটে। আপনাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে — আপনি তার মধ্যে স্বপ্নের মত দেখেছেন।'

'স্বপ্ন না হিমু ভাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান, স্বপ্ন না।'

'আমার মৃত্যুর পর আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে হিমু ভাই।'

'যা বলবেন করব।'

'কাজগুলি কি বলব?'

'আপনি নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছেন না। কিছু সময় তো হাতে আছে

?’

‘কি করে বলব ভাই সাহেব — হায়াত-মউত তো আমাদের হাতে না।’

‘কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মৃত্যু আপনার নিজের হাতে। শুনুন আসগর সাহেব, আপনাকে এখন মরলে চলবে না – আমাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে। আপনার মুক্তার মত হাতের লেখায় আপনি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখবেন।’

‘কাকে লিখব?’

‘একটা মেয়েকে লিখবেন। তার নাম মারিয়া। খুব দামী কাগজে খুব সুদর কালিতে চিঠিটা লিখতে হবে।’

‘অবশ্যই লিখব হিমু ভাই। আনন্দের সঙ্গে লিখব।’

‘সমস্যা হল কি জানেন? অসহযোগের জন্যে দোকানপাট সব বন্ধ। দামী কাগজ যে কিনব সেই উপায় নেই। কাজেই অসহযোগ না কাটা পর্যন্ত যেভাবেই হোক আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা মনে রাখবেন। আমাকে যদি চিঠিটা লিখে না দিয়ে যান তাহলে আমার একটা আফসোস থাকবে।’

‘আপনার চিঠি আমি অবশ্যই লিখে দেব হিমু ভাই।’

‘তাহলে আজ উঠি।’

‘আরেকটু বসেন।’

‘অসুস্থ মানুষের পাশে বসে থাকতে ভাল লাগে না।’

আসগর সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার শরীরটা অসুস্থ কিন্তু হিমু ভাই মনটা সুস্থ। আমার মনে কোন রোগ নাই।

আমি চমকে তাকালাম। মৃত্যু-লক্ষণ বলে একটা ব্যাপার আছে। মৃত্যুর আগে আগে এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানুষ হঠাৎ করে উচ্চস্তরের দার্শনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাদের চোখের জ্যোতি নিভে যায়। চোখে কোন প্রাণ থাকে না। শরীরের যে অংশ সবার আগে মারা যায় – তার নাম চোখ।

‘হিমু ভাই !’

‘জি।’

‘ডাক চলাচল কি আছে ?’

‘কিছুই চলছে না – ডাক চলবে কি ভাবে?’

‘আমার আত্মীয়স্বজনদের একটু খবর দেয়া দরকার। ওদের দেখার জন্য যে মনটা ব্যস্ত তা না – অসুস্থ ছিলাম এই খবরটা তারা না পেলে মনে কষ্ট পাবে।’

‘ডাক চলাচল শুরু হলেই খবর দিয়ে দেব।’

‘মানুষ খুব কষ্ট করছে, তাই না হিমু ভাই?’

‘বড় বড় নেতারা যদি ভুল করেন তাহলে সাধারণ মানুষ তো কষ্ট করবেই।’

আমরা যারা ছোট মানুষ আছি হিমু ভাই —আমরাও ভুল করি। মানুষের জন্মই হয়েছে ভুল করার জন্য। তবে হিমু ভাই, ছোট মানুষের ভুল ছোট ছোট। তাতে তার নিজের ক্ষতি, আর কারোর ক্ষতি হয় না। বড় মানুষের ভুলগুলোও বড় বড়। তাদের ভুলে সবার ক্ষতি হয়। আমরা ছোট মানুষরা নিজেদের মঙ্গল চাই। বড় মানুষরাও তাদের মঙ্গল চান। কিন্তু হিমু ভাই, তারা ভুলে যান, যেহেতু তারা বড় সেহেতু তাদের নিজেদের মঙ্গল দেখলে হবে না। তাদের দেখতে হবে সবার মঙ্গল। ঠিক বলেছি?’

‘ঠিক বলেছেন। আমাকে এই সব ঠিক কথা বলে লাভ কি ? যাদের বলা দরকার

তাদের বললে তো তাঁরা শুনবেন না।’

‘একটা কি ব্যবস্থা করা যায় হিমু ভাই — আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দুটা কথা বলব, শেখ হাসিনার সঙ্গে দুটা কথা বলব – এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তো কথা বলা যাবে না। উনি জেলে।’

‘কারো সঙ্গেই কথা বলা যাবে না – নেতারা সবাই আসলে জেলে। নিজেদের তৈরি জেলখানায় তারা আটকা পড়ে আছেন। সেই জেলখানা পাহারা দিচ্ছে তাদেরই প্রিয় লোকজন। তারা তা জানেন না। তারা মনে করেন তারা স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ . . .আসগর সাহেব !’

‘জি হিমু ভাই।’

‘উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনা করে কোন লাভ নেই। আপনি ঘুমবার চেষ্টা করেন।’

‘জি আচ্ছা। আপনাকে একটা কথা বলব হিমু ভাই, যদি মনে কিছু না করেন।’

‘জি না, মনে কিছু করব না।’

‘আপনি যে চিঠিটা আমাকে দিয়ে লেখাবেন সেই চিঠির কাগজটা আমি কিনব।’

‘সেটা হলে তো খুবই ভাল হয়। আমার হাত একেবারে খালি।’

বাংলাদেশের সবচে দামী কাগজটা আমি আপনার জন্যে কিনব হিমু ভাই।’

‘শুধু কাগজ কিনলে তো হবে না – কলমও লাগবে, কালিও লাগবে। সবচে দামী কাগজে দুটাকা দামের বল পয়েন্টে লিখবেন তা তো হয় না। দামী কাগজে লেখার জন্যে লাগে দামী কলম।’

‘খুবই খাঁটি কথা বলেছেন হিমু ভাই – কলম আর কালিও আমি কিনব। আমি যে আপনাকে কি পছন্দ করি আপনি জানেন না হিমু ভাই।’

‘জানব না কেন, জানি। ভালবাসা মুখ ফুটে বলতে হয় না। ভালবাসা টের পাওয়া যায়। আজ যাই আসগর সাহেব। দেশ স্বাভাবিক হোক। দোকানপাট খুলুক — আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কাগজ-কলম কিনে আনব।’

‘অবশ্যই। অবশ্যই।’

‘আর ইতিমধ্যে যদি মনসুর এসে আপনাকে বিরক্ত করে তাহলে কষে ধমক লাগাবেন। মানুষ হয়ে ভূতদের হাংকিপাংকি সহ্য করা কোন কাজের কথা না।’

আজ হরতালের কত দিন চলছে? মনে হচ্ছে সবাই দিন-তারিখের হিসেব রাখা ভুলে গেছে। নগরীর জন্ডিস হয়েছে। নগরী পড়ে আছে ঝিম মেরে। এই রোগের চিকিৎসা নেই- বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা। নগরী বিশ্রাম নিচ্ছে। আগের হরতালগুলিতে মোটামুটি আনন্দ ছিল। লোকজন ক্যাসেটের দোকান থেকে ক্যাসেট নিয়ে যেত। স্বামীরা দুপুরে স্ত্রীদের সঙ্গে ঘুমানের সুযোগ পেত। স্ত্রীরা আঁতকে উঠে বলত – এ কি দিনে-দুপুরে দরজা লাগাচ্ছ কেন? বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে। স্বামী উদাস গলায় বলতো, আজ হরতাল না?

এখনকার অবস্থা সে রকম না, এখন অন্য রকম পরিবেশ। জন্ডিসে আক্রান্ত নগরী রোগ সামলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারবে তো — এটাই সবার জিজ্ঞাসা। নাকি নগরীর মৃত্যু হবে ? মানুষের মত নগরীরও মৃত্যু হয়।

আমি হাঁটছি। আমার পাশে পাশে হাঁটছে বাদল। আমি বললাম — দীর্ঘ হরতালের কিছু কিছু উপকারিতা আছে। বল তো কি কি ?

‘রোড এক্সিডেন্ট হচ্ছে না।’

‘গুড। হয়েছে – আর কি?’

'পলিউশন কমেছে — গাড়ির ধোঁয়া, কার্বন মনক্সাইড কিচ্ছু নেই।'
'ভেরি গুড।'
'লোকজন বেশি হাঁটাহাটি করছে, তাদের স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কমছে।'
'হয়েছে — আর কি ?'
'আরবদের কাছ থেকে আমাদের পেট্রোল কিনতে হচ্ছে না। কিছু ফরেন কারেন্সি বেঁচে যাচ্ছে।'
'হু।'
'আমরা পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারছি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।'
'হু।'
'পলিটিক্স নিয়ে সবাই আলোচনা করছি — আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ নিয়ে সবাই ভাবছি।'
'আর কিছু আছে?'
'আর তো কিছু মনে পড়ছে না।'
'আরো অনেক আছে। ভেবে ভেবে সব পয়েন্ট বের কর, তারপর একটা লিফলেট ছাড়ব।'
'তাতে লাভ কি ?'
'আছে, লাভ আছে।'
'তোমার ভাবভঙ্গি আমি কিছুই বুঝি না। তুমি কোন দলের লোক বল তো? আওয়ামী লীগ, না বিএনপি ?'
'আওয়ামী লীগ যখন খারাপ কিছু করে তখন আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি। আর বিএনপি যখন খারাপ কিছু করে তখন বিএনপির সমর্থক।'
'এর মানে কি ?'
'ভাল কাজের সমর্থন সব সময়ই থাকে। খারাপ কাজগুলির সমর্থনের লোক পাওয়া যায় না। আমি সেই লোক। খারাপ কাজের জন্যেও সমর্থন লাগে। কারণ সব খারাপের মধ্যেও কিছু মঙ্গল থাকে।'
'আমরা যাচ্ছি কোথায় হিমু দা?'
'একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'
'কে ? মারিয়া ?'
'উহুঁ, তার নাম জয়গুন।'
'জয়গুন কে ?'
'তুই চিনবি না — খারাপ ধরনের মেয়ে।'
'ও আচ্ছা।'
বাদল চমকাল না বা বিস্মিত হল না। সে আমার আদর্শ ভক্ত। দলপতির কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু বলবে না। বিস্মিত হবে না, চমকাবে না। অন্ধের মত অনুসরণ করবে। একদল মানুষ কি শুধু অনুসরণ করার জন্যেই জন্মায়?

প্রথম তিনটা টোকা, তারপর একটা, তারপর আবার তিনটা। এরকম করতে থাকলে জয়গুন নামের অতি রূপবতী এক তরুণীর এসে দরজা খুলে দেবার কথা। যার শাড়ি থাকবে এলোমেলো। যার ব্লাউজের দুটা বোতাম নেই – ।

বেশ কয়েকবার মোর্স কোডের ভঙ্গিতে তিন এক তিন এক শব্দ করার পর দরজা সামান্য খুলল। সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না দরজা কে খুলেছে। কানা কুদুস বলে দিয়েছিল, দরজা খুলবে জয়গুন। সেই ভরসাতে আন্দাজের উপর বললাম – কেমন আছ জয়গুন ?

ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল – আপনে কে?

'আমার নাম হিমু।'

দরজা খুলে গেল। আমার সামনে জয়গুন দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি মোটেও এলোমেলো নয়। তার ব্লাউজের বোতামও ঠিক আছে। খুব রূপবতী মেয়ে দেখব বলে এসেছিলাম, দুধে আলতা রঙের একজনকে দেখছি – তাকে রূপবতী বলার কোন কারণ নেই। দাঁত উচু। যথেষ্ট মোটা। থপথপ করে হাঁটছে। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কুদ্দুসের কাছে জয়গুন হল- হেলেন অব ট্রয়। জয়গুন মধুর গলায় বলল, ও আল্লা, ভিতরে আসেন।

'আমি সঙ্গে করে আমার এক ফুপাতো ভাইকে নিয়ে এসেছি। ওর নাম বাদল।'

'অবশ্যই আনবেন। ছোট ভাই, আস।'

জয়গুন হাত ধরে বাদলকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাদল সংকুচিত হয়ে রইল। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জয়গুনের ঘর দেখছি। সাজানো-গোছানো ঘর। রঙিন টিভি আছে। ভিসিআর আছে। এই মুহুর্তে ভিসিআর-এ হিন্দী ছবি চলছে।

জয়গুন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, সময় কাটে না, এই জন্যে রোজ তিনটা-চাইরটা কইরা ছবি দেখি। আপনেরা আরাম কইরা বসেন। এসি ছাড়ি?

'এসি আছে?'

'জি আছে।'

'ঠাণ্ডা বাতাসে শইল্যে বাত হয়, এই জন্যে এসি ছাড়ি না। ফ্যান দিয়া কাম সারি।'

'আমাদের জন্যে এসি ছাড়বে – এতে তোমার আবার বাত হবে না তো।'

'কি যে কন হিমু ভাইজান ! অল্প সময়ে আর কি বাত হইব।'

'অল্প সময় তো না – আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। এসেছি যখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ভিসিআর-এ একটা ছবি দেখে যাই। অনেকদিন হিন্দী ছবি দেখা হয় না। তোমার অসুবিধা হবে ?'

'কি যে কন ভাইজান। আফনে সারাজীবন থাকলেও অসুবিধা নাই।'

'তুমি একা থাক?'

'হ, একাই থাকি।'

'রান্না-বান্না কে করে ?'

'কেউ করে না। হোটেল থাইক্যা খাওন আসে। কাজকামের লোক রাখন আমার পুষায় না। খালি ভ্যান ভ্যান করে। আমার হোটেলের সাথে কনটাক।'

'ভাল ব্যবস্থা তো।'

'কপি খাইবেন? — কপি বানানর জিনিস আছে।'

'হ্যাঁ 'কপি' খাওয়া যায়।'

জয়গুন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে কপি আনতে গেল। আমি জয়গুনের বিছানায় পা তুলে উঠে বসতে বসতে বললাম- বাদল আয়, কোলবালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে বোস। একটা হিন্দী ছবি দেখি। দুদিন পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরে যাবি — হিন্দী ছবি দেখে মনটা ঠিকঠাক কর।

‘তুমি কি সত্যি সত্যি ছবি দেখবে?’

‘অবশ্যই।’

‘এই মেয়েটাকে তুমি চেন কিভাবে?’

‘আমি চিনি না— কানা কুদ্দুস চেনে।’

‘কানা কুদ্দুস কে ?’

‘ভয়াবহ খুনী। মানুষ মারা তার কাছে কোন ব্যাপারই না। মশা মারার মতই সহজ।’

‘এই ভদ্রমহিলা কি ওনার স্ত্রী ?’

‘প্রায় সে রকমই। জয়গুন হচ্ছে কানা কুদ্দুসের বনলতা সেন।’

‘ভদ্রমহিলা কি সুন্দর দেখেছ হিমু দা?’

‘সুন্দর?’

‘আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।’

‘তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ, যতই দেখছি – ততই অবাক হচ্ছি।’
‘তোর মনে হচ্ছে না দাঁতগুলি বেশি উচু?’
‘তোমার দাতের দিকে তাকাবার দরকার কি ?’
‘তাও তো বটে। দাঁতের দিকে তাকাব কেন ? হাতি হলে দাঁতের দিকে তাকানোর একটা ব্যাপার চলে আসত। গজদন্ত বিরাট ব্যাপার। মানবদন্ত তেমন কোন ব্যাপার না। মানবদন্তের জন্ম হয় ডেনটিস্টের তুলে ফেলার জন্যে।’
‘তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।’
‘বোঝার দরকার আছে ?’
‘না, দরকার নেই।’
জয়মুন মগে করে কপি নিয়ে এসেছে। এক এক মগে এক এক পোয়া করে চিনি দিয়ে বাঁধানে ঘন এক সিরাপ জাতীয় বস্তু। আমি মুখে দিয়ে বললাম, অপূর্ব। আমি যা করি বাদলও তাই করে। কাজেই বাদলও চোখ বড় বড় করে বলল — অপূর্ব।
জয়গুনের সুন্দর মুখ আনন্দে ভরে গেল। সে বলল, ছবি দেখবেন ভাইজান ?
‘হ্যাঁ দেখব। ভাল একটা কিছু দাও।’
‘পুরানো ছবি দেখবেন? দিদার আছে – দিলীপ কুমারের ছবি।’
‘দিলীপ কুমারের ছবি দেখা যেতে পারে।’
‘বেলেক এন্ড হেয়াইট।’
‘শাদা-কালোর কোন অসুবিধা নেই – তারপর জয়গুন, কুদ্দুসের কোন খবর জান?’
‘জি না। মেলা দিন কোন খোঁজ নাই। ভাইজান, মানুষটার জন্যে অত অস্থির থাকি- হে বুঝে না। কোন দিন কোন বিপদে পড়ে। বিপদের কি কোন মা-বাপ আছে? সব কিছুর মা-বাপ আছে। বিপদের মা-বাপ নাই। তারে কে বুঝাইবে কন? আফনেরে খুব মানে। যখন আসে তখনই আফনের কথা কয়। ভাইজান!’
‘বল।’
‘আফনে তার জন্যে এটু দোয়া করবেন ভাইজান।’
'আমার দোয়াতে কোন লাভ হবে না জয়গুন। সে ভয়ংকর সব পাপ করে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের শাস্তি তো হবেই।’
‘মৃত্যুর পরে আল্লাহ পাক শাস্তি দিলে দিব। এই দুনিয়ায় শাস্তি হইব এটা কেমন বিচার ?’
‘এটা হচ্ছে জনতার বিচার। আল্লাহ পাক কিছু কিছু শাস্তি জনতাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মানুষ ভুল করে – জনতা ভুল করে না।’
জয়গুন ছবি চালিয়ে দিয়েছে। তার চোখ ভর্তি পানি। কানা কুদ্দুসের মত একটি ভয়াবহ পাপীর জন্যে জয়গুনের মত একটি রূপবতী মেয়ে চোখের পানি ফেলছে – কোন মানে হয় ? হয় নিশ্চয়ই — সেই মানে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।
ছবি চলছে। আমি, বাদল এবং জয়গুন ছবি দেখছি। জয়গুন ছবি দেখছে গভীর আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে। আশ্চর্য! বাদলও তাই করছে।
শামসাদ বেগমের কিন্নর কণ্ঠের গান শুরু হল – ‘বাচপানকে দিন ভুলনা দেনা।’
বাদলের চোখে পানি। দুদিন পর গায়ে আগুন লেগে যার মরার কথা সে ছবি দেখে ফুপিয়ে কাঁদছে – কোন মানে হয়?
‘বাদল ?’

‘জ্বি।’

‘তোর গায়ে কেরোসিন ঢালার ব্যাপারটা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। আর দেরি করা যায় না।’

‘কেন ?’

‘দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। যা করার তার আগেই করতে হবে।’

‘দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে কে বলল?’

‘মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।’

বাদল কিছু বলল না। আমার কথা সে শুনতে পায়নি। তার সমস্ত ইপ্রিয় এখন দিলীপ কুমারের কর্মকাণ্ডে নিবেদিত। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যেতে পারে। হিন্দী আমি বুঝি না। ছবির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাদল এবং জয়গুনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে — ছবি দেখার জন্যে হলেও হিন্দী লেখার দরকার ছিল। আমি শুনেছি হিন্দী খুব নাকি মিষ্টি ভাষা। আমার মনে হয় না। লেডিস টয়লেটের হিন্দী হচ্ছে — “দেবীও কি হাগন কুঠি” অর্থাৎ “দেবীদের হাগাঘর”। যে ভাষায় মেয়েদের বাথরুমের এত কুৎসিত নাম সেই ভাষা মিষ্টি হবার কোন কারণ নেই। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

###

অনেকদিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি খুব চিন্তিত মুখে আমার বিছানায় বসে আছেন। গায়ে খদ্দরের চাদর। হাত দুটা কোলের উপরে ফেলে রাখা। চোখে চশমা। চশমার মোটা কাচের ভেতর থেকে তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যাচ্ছে। আমি বাবাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

বাবা বললেন, কেমন আছিস হিমু?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খুব ভাল আছি বাবা।

বাবা নিচু গলায় বললেন, তুই তো সব গণ্ডগোল করে ফেলেছিস। এত শখ ছিল তুই মহাপুরুষ হবি। এত ট্রনিং দিলাম . . . -

‘ট্রেনিং দিয়ে কি আর মহাপুরুষ হওয়া যায় বাবা?’

‘ট্রেনিং দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে মহাপুরুষ হওয়া যাবে না কেন? অবশ্যই যায়। ট্রেনিং ঠিকমত দিতে পারলে . . .’

‘তাহলে মনে হয় তোমার ট্রেনিং-এ গণ্ডগোল ছিল।’

‘উঁহু, ট্রেনিং-এ কোন গণ্ডগোল নেই। তুই নিয়ম-কানুন মানছিস না। মহাপুরুষের প্রথম শর্ত হল – কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর মায়া করবি না। মায়া হবে সার্বজনীন। মায়াটাকে ছড়িয়ে দিবি।’

‘তাই তো করছি।’

‘মোটেই তা করছিস না। তুই জড়িয়ে পড়ছিস। মারিয়াটা কে?’

‘মারিয়া হচ্ছে মরিয়ম।’

‘তুই এই মেয়ের সঙ্গে এমন জড়ালি কেন?’

'জড়াইনি তো বাবা। আমি ওর সাংকেতিক চিঠির জবাব পর্যন্ত দেইনি। ও চিঠি দেবার পর ওর বাসায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।'

'এটাই কি প্রমাণ করে না তুই জড়িয়ে পড়েছিস। মেয়েটার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিস।'

'তুমি কি তার বাসায় যেতে বলছ?'

'অবশ্যই যাবি।'

'কিন্তু বাবা, একটা ব্যাপার কি জান ? আমার ধারণা, এই যে স্বপ্নটা দেখছি এটা আসলে দেখছি আমার অবচেতন মনের কারণে। আমার অবচেতন মন চাচ্ছে আমি মারিয়ার সঙ্গে দেখা করি। সেই চাওয়াটা প্রবল হয়েছে বলেই সে তোমাকে তৈরি করে স্বপ্নে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তুমি আমাকে মারিয়ার বাসায় যেতে বলছ। তুমি আমার অবচেতন মনেরই একটা ছায়া। এর বেশি কিছু না।

'তা হতে পারে।'

'আমার অবচেতন মন যা চাচ্ছে, তাই তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে।'

'হু। যুক্তির কথা।'

'মহাপুরুষরা কি যুক্তিবাদী হন বাবা?'

'তাঁদের ভেতর যুক্তি থাকে কিন্তু তাঁর যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হন না।'

'কেন ?'

'কারণ যুক্তি শেষ কথা না। শেষ কথা হচ্ছে চেতনা, Conscience.'

'চেতনা কি যুক্তির বাইরে?'

'যুক্তি চেতনার একটা অংশ কিন্তু খুব ক্ষুদ্র অংশ। ভাল কথা, মারিয়া মেয়েটা দেখতে কেমন ?'

'খুব সুদর। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।।'

'চুল কি কোঁকড়ানো, না প্লেইন?'

'চুল কোঁকড়ানো।'

'তোর মার চুলও ছিল কোঁকড়ানো। সে অবশ্যি দেখতে শ্যামলা ছিল। যাই হোক, মারিয়া মেয়েটা লম্বা কেমন?'

'গজ ফিতা দিয়ে তো মাপিনি তবে লম্বা আছে।'

'মুখের শেপ কেমন? গোল না লম্বাটে?'

'লম্বাটে।'

'চোখ কেমন?'

'চোখ খুব সুন্দর।'

'চোখ কি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিস? একটা মানুষের ভেতরটা দেখা যায় চোখের দিকে তাকিয়ে। তুই কি চোখ খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিস?'

'হু।'

'আচ্ছা হিমু শোন – মেয়েটার ডান চোখ কি বাঁ চোখের চেয়ে সামান্য বড়?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'তোর মা'র চোখ এই রকম ছিল। আমি যখন তাকে ব্যাপারটা বললাম — সে তো কেঁদে-কেটে অস্থির। আমাকে বলে কি, কাজল দিতে গিয়ে এ রকম দেখাচ্ছে। একটা চোখে কাজল বেশি পড়েছে – একটায় কম পড়েছে।'

'মা চোখে কাজল দিত ?'

‘হ্যাঁ। শ্যামলা মেয়েরা যখন চোখে কাজল দেয় তখন অপূর্ব লাগে।’

‘বাবা ?’

‘হু।’

‘এই যে মারিয়া সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ, কেন?’

‘তোর মা'র সঙ্গে মেয়েটার মিল আছে কি-না তা জানার জন্যে।’

‘বাবা শোন, তুমি এত সব জানতে চাচ্ছ কারণ মেয়েটার বিষয়ে আমার নিজের কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার অবচেতন মন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে।’

‘হতে পারে।’

‘হতে পারে না। এটাই হল ঘটনা। তুমি আমার নিজের তৈরি স্বপ্ন ছাড়া কিছু না।’

‘পুরো জগতটাই তো স্বপ্ন রে বোকা।’

‘তুমি সেই স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। আমি এখন আর স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি না। আরাম করে ঘুমাতে চাচ্ছি।’

‘চলে যেতে বলছিস ?’

‘হ্যাঁ, চলে যাও।’

‘তুই ঘুমা, আমি পাশে বসে থাকি।’

‘কোন দরকার নেই বাবা। তুমি বিদেয় হও।’

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বিষণ্ণ মুখে চলে গেলেন। তার পরপরই আমার ঘুম ভাঙল। মনটা একটু খারাপই হল। বাবা আরো কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকলে তেমন কোন ক্ষতি হত না।

আমার বাবা তাঁর পুত্রের জন্যে কিছু উপদেশবাণী রেখে গিয়েছিলেন। ব্রাউন প্যাকেটে মোড়া সেইসব উপদেশবাণীর উপর লেখা আছে কত বয়সে পড়তে হবে। আঠারো বছর হবার পর যে উপদেশবাণী পড়তে বলেছিলেন — তা হল।

হিমালয়

তুমি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছ। আমার অভিনন্দন। অষ্টাদশ বর্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই বয়সে নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহদের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফল শুভ যেমন হয় – মাঝে মাঝে অশুভও হয়।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে আজ আমি তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল বলিতে চাই। মন দিয়া পাঠ কর। তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের সমগ্র বিষয়টাই পুরাপুরি জৈবিক। ইহা পশু-ধর্ম। এই আকর্ষণের ব্যাপারটিকে আমরা নানানভাবে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রেম নিয়া কবি, সাহিত্যিক মাতামাতি করিয়াছেন। চিত্রকররা প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অংকন করিয়াছেন। গীতিকাররা গান রচনা করিয়াছেন। গায়করা সেই গান নানান ভঙ্গিমায় গাহিয়াছেন।

প্রিয় পুত্র, প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নাই। ইহা

শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ তৈরি করিয়াছেন যাহাতে তাহার সৃষ্টি বজায় থাকে। নর-নারীর মিলনে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। প্রকৃতির সৃষ্টি বজায় থাকিবে।

একই আকর্ষণ প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত জীবজগতে তৈরি করিয়াছেন। আশ্বিন মাসে কুকুরীর শরীর দুই দিনের জন্য উত্তপ্ত হয়। সে তখন কুকুরের সঙ্গের জন্যে প্রায় উন্মত্ত আচরণ করে। ইহাকে আমরা কি প্রেম বলিব?

প্রিয় পুত্র, মানুষ ভান করিতে জানে, পশু জানে না — এই একটি বিষয় ছাড়া মানুষের সঙ্গে পশুর কোন তফাৎ নাই। যদি কখনো কোনো তরুণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ কর, তখন অবশ্যই তুমি সেই আকর্ষণের স্বরূপ অনুসন্ধান করবে। দেখিবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তুচ্ছ শরীর। যেহেতু শরীর নশ্বর সেহেতু প্রেমও নশ্বর।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে অনেকদূর যাইতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইও। প্রকৃতি তোমার সহায় হউক — এই শুভ কামনা।

আমার বাবা কি আসলেই অপ্রকৃতিস্থ? কাদের আমরা প্রকৃতিস্থ বলব? যাদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক পথে চলে তাদের। যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে তাদের আমরা আলাদা করে ফেলি। তা কি ঠিক ? আমার বাবা তার পুত্রকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার কথা শোনামাত্রই আমরা তাঁকে উন্মাদ হিসেবে আলাদা করে ফেলেছি। কোন বাবা যদি বলেন, আমি আমার ছেলেকে বড় ডাক্তার বানাব তখন আমরা হাসি না, কারণ তিনি চেনা পথে হাঁটছেন। আমার বাবা তাঁর সমগ্র জীবনে হেঁটেছেন অচেনা পথে। আমি সেই পথ কখনো অস্বীকার করিনি।

স্বপ্ন আমাকে কাবু করে ফেলেছে। সকাল বেলাতেই বিষণ্ণ বোধ করছি। বিষন্নতা কাটানোর জন্যে কি করা যায়? মন আরো বিষন্ন হয় এমন কিছু করা। যেমন রূপার সঙ্গে কথা বলা। অনেকদিন তার সঙ্গে কথা হয় না।

মন এখন বিষণ্ণ, রূপার সঙ্গে কথা বলার পর মন নতুন করে বিষন্ন হবে। পুরানো বিষন্নতা এবং নতুন বিষণ্ণতায় কাটাকাটি হয়ে আমি স্বাভাবিক হব। তারপর যাব আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর কি ? চিত্রলেখা নামের ঐ বাড়িতে কি যাব ? দেখে আসব মারিয়াকে ?

অনেকবার টেলিফোন করলাম রূপাদের বাসায়। টেলিফোন যাচ্ছে, রূপাই টেলিফোন ধরছে, কিন্তু সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যাচ্ছে। প্রকৃতি চাচ্ছে না আমি রূপার সঙ্গে কথা বলি।

###

ফুপার বাড়িতে আজ উৎসব।

বাদল তার কেরোসিন টিন ব্যবহার করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ হয়েছে। খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। দুই দলের মর্যাদা বহাল আছে। দু'দলই দাবি করছে তারা জিতেছে। দুদলই বিজয় মিছিল বের করেছে। সব খেলায় একজন জয়ী হন, অন্যজন পরাজিত হন। রাজনীতির খেলাতেই শুধুমাত্র দুটি দল একসঙ্গে জয়ী হতে পারে অথবা এক সঙ্গে পরাজিত হয়। রাজনীতির খেলা বড়ই মজাদার খেলা। এই খেলায় অংশগ্রহণ তেমন আনন্দের না, দূর থেকে দেখার আনন্দ আছে।

আমি গভীর আনন্দ নিয়ে খেলাটা দেখছি। শেষের দিকে খেলাটায় উৎসব ভাব এসে গেছে। ঢাকার মেয়র হানিফ সাহেব করেছেন জনতার মঞ্চ। সেখানে বক্তৃতার সঙ্গে 'গান-বাজনা' চলছে।

খালেদা জিয়া তৈরি করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চ। সেখানে গান-বাজনা একটু কম, কারণ বেশিরভাগ শিল্পীই জনতার মঞ্চে। তাঁরা গান-বাজনার অভাব বক্তৃতায় পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। গণতন্ত্র মঞ্চ একটু বেকায়দা অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। তেমন জমছে না। উদ্যোক্তারা একটু যেন বিমর্ষ।

দু'টি মঞ্চ থেকেই দাবি করা হচ্ছে — আমরা ভারত বিরোধী। ভারত বিরোধিতা আমাদের রাজনীতির একটা চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল, এই কারণে কি আমরা কোন হীনমন্যতায় ভুগছি?

শুধুমাত্র হীনমন্যতায় ভুগলেই এইসব জটিলতা দেখা দেয়। এই হীনমন্যতা কাটানোর প্রধান উপায় জাতি হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়ানো। সবাই মিলে সেই চেষ্টাটা কি করা যায় না ?

আমাদের সারাদেশে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে – যে সব ভারতীয় সৈন্য স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিনি। কেন করিনি? করলে কি জাতি হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাব ?

আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা নিয়ে কত চমৎকার সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখলেন — সেখানে কোথাও বাংলাদেশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানের কোন উল্লেখ নেই। উল্লেখ করলে ভারতীয় দালাল আখ্যা পাবার আশংকা। বাংলাদেশে এই রিস্ক নেয়া যায় না। অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওঁরা প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর কাছে অন্য দেশের স্বাধীনতা কোন ব্যাপার না। স্বামীহারা স্ত্রী, পিতাহারা সন্তানদের অশ্রুর মূল্য আমরা দেব না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ ?

বাংলাদেশের আদর্শ নাগরিক কি করবে ? ভারতীয় কাপড় পরবে। ভারতীয় বই পড়বে, ভারতীয় ছবি দেখবে। ভারতীয় গান শুনবে, ছেলে-মেয়েদের পড়াতে পাঠাবে ভারতীয় স্কুল-কলেজে। চিকিৎসার জন্যে যাবে বোম্বাই, ভ্যালোর এবং ভারতীয় গরু খেতে খেতে চোখ-মুখ কুঁচকে বলবে – শালার ইন্ডিয়া । দেশটাকে শেষ করে দিল। দেশটাকে ভারতের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বিজ বিজ করে বললেন, বুঝলি হিমু, দেশটাকে ভারতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা হচ্ছে রাইট টাইম।

আমি বললাম, অবশ্যই।

‘ইণ্ডিয়ান দালাল দেশে যে কটা আছে, সব কটাকে জুতাপেটা করা দরকার।’

আমি বললাম, অবশ্যই।

‘দালালদের নিয়ে মিছিল করতে হবে। সবার গলায় থাকবে জুতার মালা।’

‘এত জুতা পাবেন কোথায়?’

‘জুতা পাওয়া যাবে। জুতা কোন সমস্যা না।’

‘অবশ্যই।’

ফুপ অল্প সময়ে যে পরিমাণ মদ্যপান করেছেন তা তাঁর জন্যে বিপজ্জনক। তাঁর আশে-পাশে যারা আছে তাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এই অবস্থায় ফুপার প্রতিটি কথায় অবশ্যই বলা ছাড়া উপায় নেই।

আমরা বসেছি ছাদে। বাদল আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে না এই আনন্দ সেলিব্রেট করা হচ্ছে। ফুপা মদ্যপানের অনুমতি পেয়েছেন। ফুপু কঠিন গলায় বলে দিয়েছেন — শুধু দুই পেগ খাবে। এর এক ফোঁটাও না। খবদার। হিমু, তোর উপর দায়িত্ব, তুই চোখে চোখে রাখবি।

আমি চোখে চোখে রাখার পরেও — ফুপার এখন সপ্তম পেগ যাচ্ছে। তাঁর কথাবার্তা সবই এলোমেলো। একটু হিক্কার মতোও উঠছে। বমিপর্ব শুরু হতে বেশি দেরি হবে না।

‘হিমু।’

‘জি ফুপা।’

‘দেশটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে হিমু।’

‘অবশ্যই।’

‘দেশমাতৃকা অনেক বড় ব্যাপার।’

‘জ্বি, ঠিকই বলেছেন। দেশপিতৃকা হলে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না।’

‘দেশপিতৃকা আবার কি?’

‘ফাদারল্যান্ডের বাংলা অনুবাদ করলাম।’

‘ফাদারল্যান্ড কেন বলছিস। জন্মভূমি হল জননী। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী।’

‘ফুপা, আর মদ্যপান করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।’

‘খুব ঠিক হচ্ছে। তোর চেখে দেখার ইচ্ছা থাকলে চেখে দেখ। আমি কিছুই মনে করব না। এইসব ব্যাপারে আমি খুবই লিবারেল।’

‘আমার ইচ্ছা করছে না ফুপা।’

‘ইচ্ছা না করলে থাক। খেতে হয় নিজের রুচিতে, পরতে হয় অন্যের রুচিতে। ঠিক না ?’

‘অবশ্যই ঠিক।’

‘বুঝলি হিমু, দেশ নিয়ে নতুন করে এখন চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। ভারতের আগ্রাসন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।’

‘আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জাতীয় পরিষদে আইন পাস করতে হবে যে, কেউ

তাদের ছেলেমেয়েদের ভারতে পড়তে পাঠাতে পারবে না। কারণ ভারতীয়রা আমাদের সন্তানদের ব্রেইন ওয়াশ করে দিচ্ছে, তাই না ফুপা ?'

ফুপা মদের গ্লাস মুখের কাছে নিয়েও নামিয়ে নিলেন। কঠিন কোন কথা বলতে গিয়েও বললেন না – কারণ তিনি তাঁর পুত্র বাদলকে ভর্তি করেছেন দার্জিলিং-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'হিমু।'

'জি ফুপা।'

'রাজনীতি বাদ দিয়ে চল অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি।'

'জি আচ্ছা। কি নিয়ে আলাপ করতে চান ? আবহাওয়া নিয়ে কথা বলবেন?'

'না।'

'সাহিত্য নিয়ে কথা বলবেন ফুপা ? গল্প-উপন্যাস?'

'আরে ধ্যুৎ, সাহিত্য। সাহিত্যের লোকগুলিও বদ। এরা আরো বেশি বদ।'

'তাহলে কি নিয়ে কথা বলা যায় ? একটা কোন টপিক বের করুন।'

ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে টপিক চিন্তা করতে লাগলেন। আমি ছাদে শুয়ে পড়লাম। আকাশে না-কি নতুন কি একটা ধূমকেতু এসেছে – 'হায়াকুতাকা, বেচারাকে দেখা যায় কি-না। নয় হাজার বছর আগে সে একবার পৃথিবীকে দেখতে এসেছিল। এখন আবার দেখছে। আবারও আসবে নয় হাজার বছর পর। নয় হাজার বছর পর বাংলাদেশকে সে কেমন দেখবে কে জানে।

ধূমকেতু খুঁজে পাচ্ছি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নীচেই তার থাকার কথা। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল পাওয়া গেল। এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষি।

ফুপা জড়ানো গলায় বললেন, কি খুঁজছিস হিমু?

'হায়াকুতাকাকে খুঁজছি।'

'সে কে ?'

'ধুমকেতু।'

'চাইনিজ ধূমকেতু ন-কি ? হায়াকুতাকা— নামটা তো মনে হয় চাইনিজ।'

'জাপানিজ নাম।'

'ও আচ্ছা, জাপানিজ . . . একটা দেশ কোথায় ছিল, এখন কোথায় উঠে গেছে দেখ , , , ধূমকেত-ফেতু সব নিয়ে নিচ্ছে — আমরা কিছুই নিতে পারছি না। বঙ্গোপসাগরে তালপট্টি সেটাও চলে গেল। চলে গেল কি-না তুই বল হিমু?'

'জ্বি, চলে গেছে।'

'বেঁচে থেকে তাহলে লাভ কি ?'

'বেঁচে থাকলে আনন্দ করা যায়। মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা যায় . . .'

'এতে লিভারের ক্ষতি হয়।'

'তা হয়।'

'পরিমিত খেলে হয় না। পরিমিত খেলে লিভার ভাল থাকে।'

ফুপার কথা আমি এখন আর শুনছি না। আমি ধূমকেতু খুঁজছি। ধূমকেতুও আমার মতই পরিব্রাজক — সেও শুধুই হেঁটে বেড়ায়. . . . ।

###

'আসগর সাহেব কেমন আছেন ?'

আসগর সাহেব চোখ মেলে তাকালেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারছেন বলে মনে হল না।

'দেশ তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আপনার অপারেশন কবে হবে ?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

'ভাল, খুব ভাল।'

'হিমু ভাই ?'

'বলুন।'

'আপনার চিঠির জন্যে কাগজ কিনিয়েছি – কলম কিনিয়েছি। রেডিও বন্ড কাগজ, পার্কার কলম।'

'কে কিনে দিল ?'

'একজন নার্স আছেন, সোমা নাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁকে বলেছিলাম, তিনি কিনেছেন।'

'খুব ভাল হয়েছে। অপারেশন শেষ হোক, তারপর চিঠি লেখালেখি হবে।'

'জ্বি না।'

'জি না মানে ?'

'আমি বাঁচব না হিমু ভাই, যা লেখার আজই লিখতে হবে।'

'আপনার যে অবস্থা আপনি লিখবেন কিভাবে ? আপনি তো কথাই বলতে পারছেন না।'

আসগর সাহেব যন্ত্রের মত বললেন, যা লেখার আজই লিখতে হবে।

তিনি মনে হল একশ' ভাগ নিশ্চিত, অপারেশনের পরে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। বিদায়ের ঘণ্টা তিনি মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন।

'হিমু ভাই।'

'বলুন, শুনছি।'

'আপনার জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। চিঠিটাও যদি লিখতে না পারি তাহলে মনে কষ্ট নিয়ে মারা যাব।'

'মনে কষ্ট নিয়ে মরার দরকার নেই – নিন, চিঠি লিখুন। কলমে কালি আছে?'

'জ্বি, সব ঠিকঠাক করা আছে। হাতটা কাঁপে হিমু ভাই – লেখা ভাল হবে না। আমাকে একটু উঠিয়ে বসান।'

'উঠে বসার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারবেন। খুব সহজ চিঠি। একটা তারা আঁকুন, আবার একটু গ্যাপ দিয়ে চারটা তারা, আবার তিনটা তারা। এই রকম — দেখুন আমি লিখে দেখাচ্ছি –

*   ****   ***

আসগর সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, এইসব কি ?

আমি হাসিমুখে বললাম, এটা একটা সাংকেতিক চিঠি। আমি মেয়েটার কাছ থেকে একটা সাংকেতিক চিঠি পেয়েছিলাম। কাজেই সাংকেতিক ভাষায় চিঠির

জবাব।
'তারাগুলির অর্থ কি ?'
'এর অর্থটা মজার – কেউ ইচ্ছা করলে এর অর্থ করবে I love you. একটা তারা I, চারটা তারা হল Love, তিনটা তারা হল You. আবার কেউ ইচ্ছা করলে অর্থ করতে পারে — I hate you.'
আসগর সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে স্টার এঁকে দিলেন। আমি সেই তারকাচিহ্নের চিঠি পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম – আসগর সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে তাহলে আর দেখা হচ্ছে না।
'জ্বি না।'
'মৃত্যু কখন হবে বলে আপনার ধারণা? আসগর সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, রাতে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাব। মরে গেলে তো চলেই গেলেন। বেঁচে থাকলে কথা হবে।'
'জ্বি আচ্ছা।'
'আর কি কিছু বলবেন? মৃত্যুর পড় আত্মীয়স্বজনকে কিছু বলা কি কিংবা . . .'
'মনসুরের পরিবারকে টাকাটা পাথিয়ে দেবেন ভাই সাহেব। মনসুর এসে পরিবারের ঠিকানা দিয়ে গেছে।'
'ঠিকানা কি ?'
'কাগজে লিখে রেখেছি – পোস্টাপিসের কিছু কাগজ, পাসবই সব একটা বড় প্যাকেটে ভরে রেখে দিয়েছি। আপনার নামে অথরাইজেশন চিঠিও আছে।'
'ও আচ্ছা, কাজকর্ম গুছিয়ে রেখেছেন?'
'জ্বি — যতদূর পেরেছি।'
'অনেকদূর পেরেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে – ফ্যাকরা বাঁধিয়েছে মনসুর — সে যদি ভূত হয়ে সত্যি সত্যি তাঁর পরিবারের ঠিকানা বলে দিয়ে যায় তাহলে বিপদের কথা।'
'কিসের বিপদ হিমু ভাই?'
'তাহলে তো ভূত করতে হয়। রাত-বিরাতে হাঁটি, কখন ভূতের খপ্পরে পড়ব।'
'জগৎ বড় রহস্যময় হিমু ভাই।'
'জগৎ মোটেই রহস্যময় না। মানুষের মাথাটা রহস্যময়। যা ঘটে মানুষের মাথার মধ্যে ঘটে। মনসুর এসেছিল আপনার মাথার ভেতর। আমার ধারণা, সে তার পরিবারের ঠিকানা ঠিকই দিয়েছে। আপনার মাথা কিভাবে কিভাবে এই ঠিকানা বের করে ফেলেছে।'
'আপনার কথা বুঝতে পারছি না হিমু ভাই।'
'বুঝতে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। আমি নিজেও আমার সব কথা বুঝতে পারি না।'
আমি আসগর সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গফুরের মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বলার ইচ্ছা ছিল। মেয়েটাকে দেখলাম না। গফুর তার বিছানায় হা করে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের উপর একটা মাছি ভন ভন করছে ; সেই মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছেন বয়স্ক এক মহিলা। সম্ভবত গফুরের স্ত্রী। স্বামীকে তিনি নির্বিঘ্নে ঘুমুতে দিতে চান।

রিকশা নিয়ে নিলাম। মারিয়ার বাবাকে দেখতে যাব। পাঁচ বছর পর ভদ্রলোককে

দেখতে যাচ্ছি। এই পাঁচ বছরে তিনি আমার কথা মনে করেছেন। আমি গ্রেফতার হয়েছি শুনে চিন্তিত হয়ে চারদিকে টেলিফোন করেছেন। আমি তাঁর কথা মনে করিনি। আমি আমার বাবার কঠিন উপদেশ মনে রেখেছি –

প্রিয় পুত্র,

মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ হওয়াই তাহার নিয়তি। তোমাকে আমি মায়ামুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বড় করিয়াছি। তারপরেও আমার ভয় – একদিন ভয়ঙ্কর কোন মায়ায় তোমার সমস্ত বোধ, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইবে। মায়া কূপবিশেষ, সে কুপের গভীরতা মায়ায় যে আবদ্ধ হইবে তাহার মনের গভীরতার উপর নির্ভরশীল। আমি তোমার মনের গভীরতা সম্পর্কে জানি – কাজেই ভয় পাইতেছি – কখন না তুমি মায়া নামক অর্থহীন কূপে আটকা পড়িয়া যাও। যখনই এইরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিবে তখনই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবে। মায়া নামক রঙিন কূপে পড়িয়া জীবন কাটানোর জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিও না। . . .

আমি আমার অপ্রকৃতিস্থ পিতার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিনি। আমি যখনই মায়ার কূপ দেখেছি তখনি দূরে সরে গেছি। দূরে সরার প্রক্রিয়াটি কত যে কঠিন তা কি আমার অপ্রকৃতিস্থ দার্শনিক পিতা জানতেন? মনে হয় জানতেন না। জানলে মায়ামুক্তির কঠিন বিধান রাখতেন না।

আসাদুল্লাহ সাহেব আজ এতদিন পরে আমাকে দেখে কি করবেন? খুব কি উল্লাস প্রকাশ করবেন? না, তা করবেন না। যে সব মানুষ সীমাহীন আবেগ নিয়ে জন্মেছেন তাঁরা কখনো তাদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁদের আচার-আচরণ রোবটধর্মী। যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন মধ্যম শ্রেণীর আবেগ নিয়ে, তাঁদের আবেগের প্রকাশ অতি তীব্র। এঁরা প্রিয়জনদের দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেন।

আমার ধারণা, সাহেব আমাকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবেন, তারপর কি খবর হিমু সাহেব ?

এই যে দীর্ঘ পাঁচ বছর দেখা হল না সে প্রসঙ্গে একটা কথাও বলবেন না। পুলিশের হাতে কিভাবে ধরা পড়েছি, কিভাবে ছাড়া পেয়েছি সেই প্রসঙ্গেও কোন কথা হবে না। দেশ নিয়েও কোন কথা বলবেন না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডকে তিনি দেশ ভাবেন না। তাঁর দেশ হচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। তিনি নিজেকে অনন্ত নক্ষত্রবীথির নাগরিক মনে করেন। এইসব নাগরিকদের কাছে জাগতিক অনেক কর্মকাণ্ডই তুচ্ছ। বাবা বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই তাঁকে আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। দুজন দুমেরু থেকে কথা শুরু করতেন। সেইসব কথা না জানি শুনতে কত সুন্দর হত ।

মারিয়ার মাকে আমি খালা ডাকি। হাসি খালা। মহিলারা চাচীর চেয়ে খালা ডাক বেশি পছন্দ করেন। খালা ডাক মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেক কাছের ডাক । খালা ডেকেও আমার তেমন সুবিধা অবশ্যি হয়নি। ভদ্রমহিলা গোড়া থেকেই আমাকে তীব্র সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তবে আচার-আচরণে কখনো তা প্রকাশ হতে দেননি। বরং বাড়াবাড়ি রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছেন।

হাত দেখার প্রতি এই মহিলার খুব আছে । আমি বেশ কয়েকবার তাঁর হাত দেখে

দিয়েছি। হস্তরেখা-বিশারদ ভদ্রমহিলার কাছে আমার নাম আছে। তিনি অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে তুই তুই করেন। সেই আন্তরিকতার পুরোটাই মেকি। পাঁচ বছর পর এই মহিলাও অবিকল তার স্বামীর মত আচরণ করবেন। স্বাভাবিক গলায় বলবেন, "কি রে হিমু, তোর খবর কি? দে, হাতটা দেখে দে।" তিনি এ জাতীয় আচরণ করবেন আবেগ চাপা দেবার জন্যে না, আবেগহীনতার জন্যে।

আর মরিয়া? মারিয়া কি করবে ? কিছুই বলতে পারছি না। এই মেয়েটি সম্পর্কে আমি কখনোই আগেভাগে কিছু বলতে পারিনি। তার আচার-আচরণে বোঝার কোন উপায় ছিল না – একদিন সে এসে আমার হাতে এক টুকরা কাগজ ধরিয়ে দেবে — যে কাগজে সাংকেতিক ভাষায় একটা প্রেমপত্র লেখা।

আমি সেদিন আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গল্প করছিলাম। বিষয়বস্তু এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স। আসাদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন ইউনিভার্সে ভর থাকার কথা, ততটুকু নেই – বিজ্ঞানীরা হিসাব মিলাতে পারছেন না। যদি কোনো ভর থাকে তবেই হিসাব মেলে। এখন পর্যন্ত এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যা থেকে বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোকে কিছু ভর দিতে পারেন। নিউট্রিনোর ভর নিয়ে আমাদের দুজনের দুশ্চিতার সীমা ছিল না। এমন জটিল আলোচনার মাঝখানে মারিয়া এসে উপস্থিত। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল — বাবা, আমি হিমু ভাইকে পাঁচ মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি?

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, অবশ্যই।

মারিয়া বলল, পাঁচ মিনিট পরে আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। তুমি যেখানে আলোচনা বন্ধ করেছিলে আবার সেখান থেকে শুরু করবে।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'তোমরা আজ কি নিয়ে আলাপ করছিলে ?'

'নিউট্রিনোর ভর।'

'ও, সেই নিউট্রিনো? তার কোন গতি করতে পেরেছ?'

'না।'

'চেষ্টা করে যাও বাবা। চেষ্টায় কি না হয় ।'

মারিয়া তার বাবার কাঁধে হাত রেখে সুন্দর করে হাসল। আসাদুল্লাহ সাহেব সেই হাসি ফেরত দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মাথায় তখনো নিউট্রিনো। আমি তাঁর হয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

মারিয়া বলল, হিমু ভাই, আপনি আমার ঘরে আসুন।

আমি মারিয়ার ঘরে ঢুকলাম। এই প্রথম তার ঘরে ঢোকা। কিশোর মেয়েদের ঘর যে রকম হয় সে রকম। র‍্যাক ভর্তি স্টাফড অ্যানিমেল। স্টেরিও সিস্টেম, এল পি রেকর্ড সারা ঘরময় ছড়ানো। ড্রেসিং টেবিলে এলোমেলো করে রাখা সাজবার জিনিস। বেশিরভাগ কৌটার মুখ খোলা। কয়েকটা ড্রেস মেঝেতে পড়ে আছে। খাটের পালে রকিং চেয়ারে গাদা করা গল্পের বই। খাটের নিচে তিনটা চায়ের কাপ। এর মধ্যে একটা কাপে পিপড়া উঠেছে। নিশ্চয়ই কয়েকদিনের বাসি কাপ, সরানো হয়নি।

আমি বললাম, তোমার ঘর তো খুব গোছানো।

মারিয়া বলল, আমি আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেই না। মাকেও না, বাবাকেও না। আপনাকে প্রথম ঢুকতে দিলাম। আমার ঘর আমি নিজেই ঠিকঠাক করি। কদিন

ধরে মন-টন খারাপ বলে ঘর গোছাতে ইচ্ছা করছে না।

'মন খারাপ কেন?'

'আছে, কারণ আছে। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

আমি বসলাম। মারিয়া বলল, আমি সাংকেতিক ভাষায় একটা চিঠি লিখেছি।

'কাকে?'

'আপনাকে। আপনি এই চিঠি পড়বেন। এখানে বসেই পড়বেন। সাংকেতিক চিঠি হলেও খুব সহজ সংকেতে লেখা। আমার ধারণা, আপনার বুদ্ধি বেশ ভাল। চিঠির অর্থ আপনি এখানে বসেই বের করতে পারবেন।'

'সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বুদ্ধি খুবই নিম্নমানের। ম্যাট্রিকে অংকে প্রায় ধরা খাচ্ছিলাম। সাংকেতিক চিঠি তো অংকেরই ব্যাপার। এখানেও মনে হয় ধরা খাব।'

মারিয়া তার রকিং চেয়ার আমার সামনে টেনে আনল। চেয়ারের উপর থেকে বই নামিয়ে বসে দোল খেতে লাগল। আমি সাংকেতিক চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। কিছু বুঝলাম না। তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে নিজের মনে দোল খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে । সেখানে তার ছোটবেলার একখানা ছবি। আমি বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

মারিয়া বলল, বুঝতে না পারলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিন উত্তর লিখে নিয়ে আসবেন।

'আর যদি কোনদিনই বুঝতে না পারি?'

'কোনদিন বুঝতে না পারলে আর এ বাড়িতে আসবেন না। এখন উঠুন, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। আপনাকে বাবার কাছে দিয়ে আসি।'

আমি চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালাম।

###

মারিয়াদের বাড়ির নাম – চিত্রলেখা।

আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর চিত্রলেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

মানুষ তাদের বাড়ির নাম কেন রাখে? তাদের কাছে কি মনে হয় বাড়িগুলিও জীবন্ত? বাড়িদের প্রাণ আছে — তাদেরও অদৃশ্য হৃদপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে?

কলিবেল টিপে অপেক্ষা করছি। কেউ এসে গেট খুলছে না। দারোয়ান তার খুপড়ি ঘর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে। আসছে না – কারণ উৎসাহ পাচ্ছে না। ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে কেউ এলে এর উৎসাহ পায়। ছুটে এসে গেট খুলে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়। যারা দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আসে তাদের বেল ভিন্ন নিয়ম। ধীরেসুস্থে এসে ধমকের গলায় বলবে – কাকে চান? দারোয়ানদের ধমক খেতে ইটারেস্টিং লাগে। এরা নানান ভঙ্গিতে ধমক দিতে পারে। কারো ধমকে থাকে শুধুই

বিরক্তি, কারো ধমকে রাগ, কারো ধমকে আবার অবহেলা। একজনের ধমকে প্রবল ঘৃণাও পেয়েছিলাম। তার ঘৃণার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

আমি আবারও বেল টিপে অপেক্ষা করত লাগলাম। আমার এমন কিছু তাড়া নেই। ঘণ্টাখানিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তাড়া থাকে ভিখিরীদের। তাঁদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে হয়। সময় তাদের কাছে মূল্যবান। আমার কাছে সময় মূল্যহীন। চিত্রলেখা নামের চমৎকার একতলা এই বাড়িটার সামনে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাও যা, দুঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাও তা। সময় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার। বাড়ির নাম নিয়ে ভাবা যেতে পারে। আচ্ছা, মানুষের নামে যেমন পুরুষ-রমণী ভেদাভেদ আছে – বাড়ির নামেও কি তাই আছে ? কোন কোন বাড়ি হবে পুরুষবাড়ি। কোন কোন বাড়ি রমণীবাড়ি। চিত্রলেখা নিশ্চয়ই রমণীবাড়ি। সুগন্ধ, শ্রাবণী, শিউলীও মেয়েবাড়ি। পুরুষবাড়ির কোন নাম মনে পড়ছে না। এখন থেকে রাস্তায় হাঁটার সময় বাড়ির নাম পড়তে পড়তে যেতে হবে, যদি কোন পুরুষবাড়ির নাম চোখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ভাল করে দেখতে হবে।

আমাকে প্রায় ঘণ্টাথানিক অপেক্ষা করতে হল – এর মধ্যে দারোয়ান শ্রেণীর একজন গেটের কাছে এসেছিল। গেট খুলতে বলায় সে বলল, যার কাছে চাবি সে ভাত খাচ্ছে। ভাত খাওয়া হলে সে খুলে দেবে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি কি চাবিটা এনে একটু খুলে দিতে পারেন না? এই কথায় সে বড়ই আহত হল। মনে হল তার সুদীর্ঘ জীবনে সে এমন অপমানসূচক কথা আর শোনেনি। কাজেই আমি বললাম, আচ্ছা থাক, আমি অপেক্ষা করি। আপনার কাছে ছাতা থাকলে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দিন। আমি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকি, প্রচণ্ড রোদ।

সে এই রসিকতাতেও অপমানিত বোধ করল। বড় মানুষের বাড়ির কাজের মানুষদের মনে অপমানবোধ তীব্র হয়ে থাকে।

'আপনে কার কাছে এসেছেন?'

'মারিয়ার কাছে।'

'আপা নাই।'

'না থাকলেও আসবে – আমি অপেক্ষা করব। গেট খুলে দিন।'

'গেট খুলনের নিয়ম নাই।'

আগের দারোয়ানদের কেউ নেই – সব নতুন লোকজন। আগেকার কেউ হলে চিনতে পারত। এত ঝামেলা হত না। আমি ভঙ্গিতে বললাম, ভাইসাহেব, আপনার নাম ?

'আমার নাম আবদুস সোবহান।'

'সোবহান সাহেব আপনি শুনুন – আমি খুব পাগলা কিসিমের লোক। গেট না খুললে গেটের উপর দিয়ে বেয়ে চলে আসব। আপনার সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন — হিমু এসেছে।'

'ও অচ্ছা, আপনে হিমু? আপনের কথা বলা আছে।'

দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে গেট খুলতে লাগল।

আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশাল ড্রয়িংক্রম পার হয়ে খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চলে এসেছি। কোন ফার্নিচার নেই। ঘরময় কার্পেট । এটা ফ্যামিলি রুম। ফ্যামিলির সদস্যরা এই ঘরে গল্প-গুজব করে, টিভি দেখে। যাদের

ফ্যামিলি যত ছোট তাদের ফ্যামিলি রুমটা তত বিশাল। মারিয়াদের ড্রয়িংক্রম আগের মতই ছিল, তবে ফ্যামিলি রুমের সাজসজ্জা বদলেছে। প্রকাণ্ড এক পিয়ানো দেখতে পাচ্ছি। পিয়ানো আগে ছিল না। পিয়ানো কে বাজায় ? মারিয়া ?

ফ্যামিলি রুমে কার্পেটের উপর হাসি খালাকে বসে থাকতে দেখলাম। তিনি তার দুহাত মেলে ধরেছেন। সেই হাতের নখে নেল পলিশ লাগাচ্ছেন সিরিয়াস চেহারার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে সোনালী চশমা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। তিনি খুব একটা বাহারী পাঞ্জাবি পরে আছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও ক্ষমতাবানদের কেউ হবেন। এ বাড়িতে বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। নেল পলিশ লাগানোর ব্যাপারে ভদ্রলোকের মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছে কাজটা অত্যন্ত জটিল। হাসি খালাও নড়াচড়া করছেন না। স্থির হয়ে আছেন। হাসি খালা এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু, তোর কি খবর?

'কোন খবর নেই।'

'মারিয়া বলেছিল তুই আসবি।'

যে ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, হাসি, নড়াচড়া করবে না। নড়লে আঙুল নড়ে যায়।

আমি বললাম, খালা, হচ্ছে কি?

হাসি খালা বললেন, কি হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। নতুন কায়দায় নেল পলিশ লাগানো হচ্ছে। নখের গোড়ায় কড়া লাল রঙ। আস্তে আস্তে নখের মাথায় এসে রঙ্গ মিলিয়ে যাবে।

'জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'জটিল তো বটেই। জিনিসটা দাঁড়ায় কেমন সেটা হচ্ছে কথা। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট।'

ভদ্রলোক আরেকবার বিরক্ত গলায় বললেন – হাসি, প্লীজ।

আমি কিছুক্ষণ নেল পলিশ দেয়া দেখলাম। গাঢ় লাল, হালকা লাল, সাদা — তিন রঙের কৌটা, নেল পলিশ রিমুভার নিয়ে প্রায় স্কুলস্থূল ব্যাপার হচ্ছে।

হাসি খালা বললেন, জামিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। এ হচ্ছে হিমু। ভাল নাম এভারেস্ট, কিংবা হিমালয়। মারিয়ার বাবার অনেক আবিষ্কারের এক আবিষ্কার। খুব ভাল হাত দেখতে পারে। হাত দেখে যা বলে তাই হয়।

ভদ্রলোক চোখ-মুখ কুঁচকে ফেললেন। আমি সামনে থেকে সরলে তিনি বাঁচেন এই অবস্থা। আমি বিনয়ী গলায় বললাম, স্যার, ভাল আছেন?

ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম ফাইন। থ্যাংক য়্যু।

'আপনার নেল পলিশ দেয়া খুব চমৎকার হচ্ছে, স্যার।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল। হাসি খালা বললেন – তুই যা, মারিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়। আর শোন, চলে যাবার আগে আমার হাত দেখে দিবি। জামিল, তুমি কি হিমুকে দিয়ে হাত দেখাবে?

জামিল নামের ভদ্রলোক নেল পলিশের রঙ্গ মেশানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শীতল গলায় বললেন — এইসব আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম, আধিভৌতিক বলে সবকিছু উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, স্যার। অ্যাস্ট্রলজি ছিল আধিভৌতিক ব্যাপার। সেই অ্যাস্ট্রলজি থেকে জন্ম নিয়েছে

আধুনিক অ্যাস্ট্রলমি। এক সময় আলকেমিও ছিল আধিভৌতিক। সেই আলকেমি থেকে আমরা পেয়েছি আধুনিক রসায়নবিদ্যা।

জামিল সাহেব বললেন, মিস্টার এভারেস্ট, এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না। আমি একটা কাজ করছি। যদি কখনো সুযোগ হয় পরে কথা হবে।

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

এই ঘর আগের মতই আছে। একটুকুও বদলায়নি। খাটে শুয়ে থাকা মানুষটা শুধু বদলেছে। ভরাট স্বাস্থ্যের সেই মানুষ নেই। রোগাভোগা একজন মানুষ। ছিল, চুল কমে গেছে। চোখের তীব্র জ্যোতিও মান। নিজের তৈরি বেহেশতে করতে করতে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, কেমন আছ হিমু?

'ভাল।'

'তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'আপনাকে দেখে আমার তেমন ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

'স্বর্গে বাস করা ক্লান্তিকর ব্যাপার হিমু। আমি আসলেই ক্লান্ত। সময় কাটছে না।'

'সময় কাটছে না কেন?'

'কিভাবে সময় কাটাব সেটা বুঝতে পারছি না। এখন বই পড়তে পারি না।'

'বই পড়তে পারেন না ?'

'না। বই পড়তে ভাল লাগে না, গান শুনতে ভাল লাগে না, শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। যা ভাল লাগে না, তা করি না। বই পড়ি না, গান শুনি না। কিন্তু শুয়ে থাকতে ভাল না লাগলেও শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আই হ্যাভ নো চয়েস। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন হিমু, বোস। আমার বিছানায় বোস।

আমি বসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব মুখ টিপে খানিকক্ষণ মিটমিট করে হাসলেন। কেন হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন- এখন আমি কি করছি যান?

'জ্বি না, জানি না। আপনি বলুন, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি।'

'আমি যা করছি তা হচ্ছে মানসিক গবেষণা।'

'সেটা কি?'

'মনে মনে গবেষণা। কোন একটা বিষয় নিয়ে জটিল সব চিন্তা করছি কিন্তু সবই মনে মনে। আমার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় হল – নারী-পুরুষ সম্পর্ক।'

'প্রেম ?'

'হ্যাঁ প্রেম। হিমু, তুমি কখনো কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছ ?'

'না।'

'মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত?'

'হ্যাঁ নিশ্চিন্ত।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি বল তো ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো এইসব নিয়ে গবেষণা করছি না। কাজেই বলতে পারছি না। আপনি বরং বলুন গবেষণা করে কি পেয়েছেন।

'শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বুকের নিচে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু হলেন। কথা বলা শুরু করলেন শান্ত ভঙ্গিতে এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে।

'হিমু শোন, গবেষণা না – একজন শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা। চিন্তাও ঠিক না — ফ্যান্টাসি। আমার মনে হয় কি জান? সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পাঁচটি অদৃশ্য নীলপদ্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। এই নীলপদ্মগুলি হল — প্রেম-ভালবাসা। যেমন ধর তুমি। তোমাকে পাঁচটি নীলপদ্ম দিয়ে পাঠানে হয়েছে। এখন পর্যন্ত তুমি কাউকে পাওনি যাকে পদ্ম দিতে ইচ্ছে করেছে। কাজেই তুমি কারোর প্রেমে পড়নি। আবার ধর, একটা সতেরো বছরের তরুণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল। মেয়েটির তোমাকে এতই ভাল লাগলো যে, সে কোনদিকে না তাকিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তার সবকটি নীলপদ্ম তোমাকে দিয়ে দিল। তুমি পদ্মগুলি নিলে কিন্তু তাকে গ্রহণ করলে না। পরে এই মেয়েটি কিন্তু আর কারো প্রেমে পড়তে পারবে না। সে হয়ত এক সময় বিয়ে করবে, তার স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করবে কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রেম তার থাকবে না।'

আমি বললাম, আর আমার কি হবে? আমার নিজের পাঁচটি নীলপদ্ম ছিল, তার সঙ্গে আরো পাঁচটি যুক্ত হয়ে পদ্মের সংখ্যা বেড়ে গেল না ?

'হ্যাঁ, বাড়ল।'

'তাহলে আমি কি ইচ্ছা করলে এখন কাউকে পাঁচটির জায়গায় দশটি নীলপদ্ম দিতে পারি?'

'তা পার না। অন্যের পদ্ম দেয়া যাবে না। তোমাকে যে পাঁচটি দেয়া হয়েছে শুধু সেই পাঁচটি দেয়া যাবে।'

'পাঁচটি কেন বলেছেন? পাঁচের চেয়ে বেশি নয় কেন ?'

'পাঁচ হচ্ছে একটা ম্যাজিক সংখ্যা। এই জন্যেই বলছি পাঁচ। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। বেশিরভাগ ফুলের পাপড়ি থাকে পাঁচটি। পাঁচ হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা তবে পাঁচের ব্যাপারটা আমার কল্পনা, পাঁচের জায়গায় সাতও হতে পারে। আমার হাইপোথেসিস তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'চমৎকার লাগছে।'

'আজকাল আমি দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবি। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ার মানুষ পায় না।'

'অনেকে হয়ত দিতেও চায় না।'

'হা, তাও হতে পারে। অনেকে পদ্মগুলি হাতছাড়া করতে চায় না। আবার এমনও হতে পারে, পদ্মগুলি দেয়া হয় ভুল মানুষকে। যাকে দেয়া হল সে পদ্মের মূল্যই বুঝল না। এই হচ্ছে আমার নীলপদ্ম থিওরি। তোমাকে বললাম, তুমি তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াও, অনেকের সঙ্গে মেশ, আমার থিওরিটা পরীক্ষা করে দেখ।'

'জি আচ্ছা। তবে আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, কিছু কিছু রহস্যময় ব্যাপার সম্পর্কে কোন থিওরি না দেয়াই ভাল। থিওরি বা হাইপোথেসিস রহস্য নষ্ট করে। থাকুক না কিছু রহস্য। সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবে, সকালে ওঠে। কত

রহস্যময় একটা ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এটা হচ্ছে জানার পর আর রহস্য থাকে না।'

'হিমু, তুমি কি জ্ঞানের বিপক্ষে।'

'জ্বি। জ্ঞান এক ধরনের বাধা। এক ধরনের অন্ধকার। কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দূরত্ব তৈরি করিয়ে দেয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'যেমন ধরুন, আপনার নীলপদ্ম থিওরি। এটা জানার পর থেকে আমার কি হবে জানেন? কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি ভাবব, আচ্ছা, এই মেয়েটিকে কি নীলপদ্ম দেয়া যায়? দেয়া গেলে ক'টা দেয়া যায়? মেয়েটি তার নিজের নীলপদ্মগুলি কি করেছে? কাউকে দিয়ে ফেলেছে?'

'আমার হাইপোথেসিস তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি এইসব আর কিছুই না, একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত প্রলাপ।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আমি আসি।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, তোমার কি মারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

'জ্বি না।'

'মারিয়া বাসাতেই আছে। নিজের ঘরে বসে আছে। ও কারো সঙ্গেই দেখা করে না। কথা বলে না। এমনকি আমার সঙ্গেও না।'

'তাই না-কি ?'

'তুমি যাবার আগে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে যাবে।'

'কারো সঙ্গেই যখন দেখা করে না – আমার সঙ্গেও করবে না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হাসলেন। পুরানো দিনের সেই চমৎকার হাসি। আমি চমকে উঠলাম।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'আমি আমার নীলপদ্ম থিওরি মারিয়াকে দেখে দেখেই তৈরি করেছি। মারিয়া তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি তোমাকে লেখে। খুব অল্প বয়সে লেখে। কাজেই আমার থিওরি অনুযায়ী তার সবকটা নীলপদ্ম তোমার কাছে।'

'চিঠি লেখার ব্যাপারটি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। আমার মেয়ের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, সে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি আমাকে দেখিয়ে লিখবে। মারিয়া রক্ষা করেছে। আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছে, তবে আমি যেন বুঝতে না পারি সে জন্যে ছেলেমানুষী এক সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে।'

'আপনি সেই সাংকেতিক চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছেন?'

'অবশ্যই। তবে ভান করেছি পারেনি।'

'মারিয়া সেই চিঠি কাকে লিখেছিল তা—কি আপনাকে বলেছে ?'

'না। তবে আমি অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি খারাপ না। হিমু শোন, আমার মেয়েটা পড়াশোনার জন্যে ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছে। আমি নিজেই জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনের যে শক্তি চালিত করে আমার মেয়েটার মনের সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে সেই ফেরত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজটা আমি

তোমাকে দিয়ে করাতে চাই। এই জন্যই তোমাকে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছি।'

'মনের শক্তি জাগানোর কাজটা আপনি করতে পারছেন না কেন?'

'আমার উপর মেয়েটির যে বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন?'

আসাদুল্লাহ সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন – তুমি কি লক্ষ্য করেছ মারিয়ার মার নখে এক ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন ?

'হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি।'

'নেল পলিশের এই এক্সপেরিমেন্ট অনেকদিন ধরেই করা হচ্ছে। মারিয়ার মা ঐ ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে। তারা শিগগিরই বিয়ে করবে। আমি সব জেনেও কিছু বলছি না। মারিয়া এতেও আহত হয়েছে। জীবনে সে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে।'

'আমাকে কি করতে বলেন?'

'ওকে জীবনের জটিলতার অংশটার কথা বুঝিয়ে বল। ও তোমার কথা শুনবে কারণ ওর নীলপদ্মগুলি তোমার কাছে।'

###

মারিয়া বলল, বসুন।

তার চোখ-মুখ কঠিন, তবু মনে হল সেই কাঠিন্যের আড়ালে চাপা হাসি ঝিকমিক করছে। সে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চাপা রঙের শাড়ি। রঙটা এমন যে মনে হচ্ছে ঘরে চাপাফুলের গন্ধ পাচ্ছি। গলায় লাল পাথর। চুণী নিশ্চয় না। চুণী এত বড় হয় না।

'রকিং চেয়ারে আরাম করে বসে দোল খেতে খেতে কথা বলুন। বাবা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাই তো ?'

আমি দোল খেতে খেতে বললাম, হ্যাঁ।

'বাবার ধারণা, আমার মন খুব অশান্ত। সেই অশান্ত মন শান্ত করার সোনার কাঠি আপনার কাছে। তাই না?'

'এ রকম ধারণা ওনার আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'এ রকম অদ্ভুত ধারণার কারণ জানেন?'

'না।'

'কারণটা আপনাকে বলি – অ্যাকসিডেন্টের পর বাবা মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি বিপর্যন্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আপনি তাকে কিছু কথা বলেন। তাতে তার মন শান্ত হয় । সেই থেকেই বাবার ধারণা হয়েছে মন শান্ত করার মত কথা আপনি বলতে পারেন। ভাল কথা, বাবাকে আপনি কি বলেছিলেন?'

''আমার মনে নেই। উদ্ভট কথাবার্তা তো আমি সব সময়ই বলি। তাকেও মনে হয় উদ্ভট কিছুই বলেছিলাম।'

'আমাকেও তাহলে উদ্ভট কিছু বলবেন?'

'তোমাকে উদ্ভট কিছু বলব না। তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে আমি তার জবাব লিখে এনেছি। সাংকেতিক ভাষায় লিখে এনেছি।'

মারিয়া হাত বাড়াল। তার চোখে চাপা কৌতুক ঝকমক করছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে সে খিলখিল করে হেসে ফেলবে। যেন সে অনেক কষ্টে হাসি থামাচ্ছে।

'সাংকেতিক চিঠিটায় কি লেখা পড়তে পারছ?'

'পারছি। এখানে লেখা I hate you.'

'I love you-ও তো হতে পারে।'

'সংকেতের ব্যাখ্যা সবাই তার নিজের মত করে করে, আমিও তাই করলাম। আপনার আটটা তারার অনেক মানে করা যায়, যেমন –

I want you.

I miss you.

I lost you.

আমি আমার পছন্দমত একটা বেছে নিলাম।'

'মারিয়া, তোমার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়?'

'যায় না, কিন্তু আপনি খেতে পারেন।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুমি কি তোমার বাবার নীলপদ্ম থিওরির কথা জান ?

মারিয়া এইবার হেসে ফেলল। কিশোরীর সহজ স্বচ্ছ হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আজগুবি থিওরি। আজগুবি এবং হাস্যকর।

'হাস্যকর বলছ কেন?'

'হাস্যকর এই জন্যে বলছি যে, বাবার থিওরি অনুসারে আমার পাঁচটি নীলপদ্ম এখন আপনার কাছে। কিন্তু আমি আপনার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করছি না। আপনাকে দেখে কোন রকম আবেগ, রোমাঞ্চ কিছুই হচ্ছে না। বরং কিশোর বয়সে যে পাগলামিটা করেছিলাম তার জন্যে রাগ লাগছে। বাবার থিওরি ঠিক থাকলে কিশোরী বয়সে পাগলামির জন্যে এখন রাগ লাগত না।'

'এখন পাগলামি মনে হচ্ছে ?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। হিমু ভাই, আমি সেই সময় কি সব পাগলামি করেছি একটু শুনুন। চা খাবেন?'

'না।'

'খান একটু। আমি খচ্ছি, আমার সঙ্গে খান। বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

মারিয়া বের হয়ে গেল। আমি নিজের মনে দোল খেতে লাগলাম। দীর্ঘ পাঁচ বছরে মারিয়ার ঘরের কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা ধরার চেষ্টাও করছি। ধরতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে ঘরটা ঠিক আগের মত আছে, আবার মনে হচ্ছে একেবারেই আগের মত নেই। সবই বদলে গেছে। মারিয়ার ছোটবেলাকার ছবিটা শুধু আছে। ছবি বদলায় না।

মারিয়া ট্রেতে করে মগভর্তি দুমগ চা নিয়ে ঢুকল। কোন কারণে সে বোধহয় খুব হেসেছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।

'হিমু ভাই, চা নিন।'

আমি চা নিলাম। মারিয়া হাসতে হাসতে বলল, জামিল চাচার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

'নখ-শিল্পী ?'

'হ্যাঁ নখ-শিল্পী। মা'র নখের শিল্পকর্ম তিনি কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছেন। মা

সেই শিল্পকর্ম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত।’

‘খুব সুন্দর হয়েছে?’

‘দেখে মনে হচ্ছে নখে ঘা হয়েছে — রক্ত পড়ছে। মাকে এই কথা বলায় মা খুব রাগ করল। মার রাগ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। মা যত রাগ করে আমি তত হাসি। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। চায়ে চিনি-টিনি সব ঠিক হয়েছে ?’

‘হয়েছে।’

‘বাবার সঙ্গে মার কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সেটা কি আপনি জানেন?’

‘না, জানি না। ঐ গল্প থাক – তোমার গল্পটা বল। কিশোরী বয়সে কি পাগলামি করলে ?’

‘আমার গল্পটা বলছি কিন্তু মার গল্পটা না শুনলে আমারটা বুঝতে পারবেন না। মা হচ্ছেন বাবার খালাতো বোন। মা যখন পড়তেন তখন বাবার জন্যে মার মাথা-খারাপের মত হয়ে গেল। বলা চলে পুরো উন্মদিনী অবস্থা। বাবা সেই অবস্থাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। মা কিছু ডেসপারেট মুভ নিলেন। তাতেও লাভ হল না। শেষে একদিন বাবাকে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখে সিনেমার প্রেমিকাদের মত একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে ফেললেন। মার জীবন সংশয় হল। এখন মরে তখন মরে অবস্থা। বাবা হাসপাতালে মাকে দেখতে গেলেন। মার অবস্থা দেখে তার করুনা হল। বাবা হাসপাতালেই ঘোষণা করলেন – মেয়েটা যদি বাঁচে তাকে বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই। মা বেঁচে গেলেন। তাদের বিয়ে হল। গল্পটা কেমন?’

‘ইন্টারেস্টিং।’

‘ইন্টারেস্টিং না, সিনেমাটিক। ক্লাসিক্যাল লাভ স্টোরি। প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহননের চেষ্টা। এখন হিমু ভাই, আসুন, মার ক্ষেত্রে বাবার নীলপদ্ম থিওরি অ্যাপ্লাই করি। থিওরি অনুযায়ী মা তার নীলপদ্মগুলি বাবাকে দিয়েছিলেন – সব ক’টা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে পড়ন্ত যৌবনে মা জামিল চাচাকে দেয়ার জন্যে নীলপদ্ম পেলেন কোথায়? জামিল চাচা বিবাহিত একজন মানুষ। তার বড় মেয়ে মেডিকেলে পড়ছে। তিনি যখন-তখন এ বাড়িতে আসেন। মার শোবার ঘরে দুজনে বসে ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। শোবার ঘরের দরজাটা তারা পুরোপুরি বন্ধও করেন না, আবার খোলাও রাখেন না। সামান্য ফাঁক করে রাখেন। মজার ব্যাপার না ?’

আমি কিছুই বললাম না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে মারিয়ার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

‘হিমু ভাই।’

‘বল।’

‘বাবার নীলপদ্ম বিষয়ক হাস্যরস ছেলেমানুষি থিওরীর কথা আমাকে বলবেন না।’

‘আচ্ছা বলব না।’

‘প্রেম নিতান্তই জৈবিক একটা ব্যাপার – নীলপদ্ম বলে একে মহিমান্বিত করার কিছু নেই।’

‘তাও স্বীকার করছি।’

‘হিমু ভাই, আপনি এখন বিদেয় হোন – আপনার চা আশা করি শেষ হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, চা শেষ।’

‘আমাকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। বাবার কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই,

আমি বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছি। এখানকার কোন কিছু নিয়েই আর আমার মাথাব্যথা নেই। বাবার সম কাটছে না, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি দেখব আমার নিজের জীবন, আমার কেরিয়ার।'

'খুবই ভাল কথা।'

'আমি উঠে দাঁড়ালাম। মারিয়া বলল, ও আচ্ছা, আরো কয়েক মিনিট বসুন, আপনাকে নিয়ে কি সব পাগলামি করেছি তা বলে নেই। আপনার শোনার শখ ছিল।'

আমি বসলাম। মারিয়া আমার দিকে একটু ঝুঁকে এল। দামী কোন পারফিউম সে গায়ে দিয়েছে। পারফিউমের হালকা সুবাস পাচ্ছি। হালকা হলেও সৌরভ নিজেকে জানান দিচ্ছে কঠিনভাবেই। মাথার উপরে ফ্যান ঘুড়ছে। মারিয়ার চুল খোলা। এই খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। কিছু এসে পরছে আমার মুখে।'

'হিমু ভাই।'

'বল।'

'একটা সময়ে আমি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ংকর কষ্টের কিছু সময় আমি পার করেছি। রাতে ঘুম হত না। রাতের পড় রাত জেগে থাকার জন্যই হয়ত মাথাটা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার হত। অনেকটা হেলুসিনেশনের মত। মনে করুন পড়তে বসেছি, হঠাৎ মনে হল আপনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার বই-এ আপনার ছায়া পড়েছে। তখন বুক ধুক ধুক করতে থাকত। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখতাম – কেউ নেই। আপনাকে তখনই চিঠিটা লিখি। আপনি তাঁর জবাব দেননি। আমাদের বাড়িতে আর আসেনওনি।'

'না এসে ভালই করেছি। তোমার সাময়িক আবেগ যথাসময়ে কেটে গেছে। তুমি ভুল ধরতে পেরেছ।'

'হ্যাঁ, তা পেরেছি। ঐ সময়টা ভয়ংকর কষ্টে কষ্টে গেছে। রোজ ভাবতাম, আজ আপনি আসবেন। আপনি আসেননি। আপনার কোন ঠিকানা নেই আমাদের কাছে যে আপনাকে খুঁজে বের করব। আমার সে বছর এ লেভেল পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। আমার পরীক্ষা দেয়া হয়নি। প্রথমত, বই নিয়ে বসতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হত আমি পরীক্ষা দিতে যাব আর আপনি এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবেন। আমি রোজ রাতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতাম।'

বলতে বলতে মারিয়া হাসল। কিন্তু তার চোখে অনেকদিন আগের কান্নার ছায়া পড়ল। এই ছায়া সে হাসি দিয়ে ঢাকতে পারল না।

আমি বললাম, তারপরেও তুমি বলছ নীলপদ্ম কিছু না- পুরো ব্যাপারটাই জৈবিক?

'হ্যাঁ বলছি। তখন বয়স অল্প ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি। চারপাশে কি ঘটছে তা দেখে শিখছি।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে খুবই দুঃখিত।

'চলে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠি নিয়ে যান। আট তারার চিঠি। এই হাস্যকর চিঠির আমার দরকার নেই।'

আমি চিঠি নিয়ে পকেটে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আসাদুল্লাহ সাহেবের নীলপদ্ম থিওরি ঠিক আছে। এই তরুণী তার সমস্ত নীলপদ্ম হিমু নামের এক ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার ভেতর বাস করছে। এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট থেকে

তার মুক্তি নেই। আমি তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে এখন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অশ্রু গোপন করার জন্যে মেয়েরা ঐ ভঙ্গিটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে।

'মারিয়া !'

'জি।'

'ভাল থেকো।'

'আমি ভালই থাকব।'

'যাচ্ছি, কেমন?'

'আচ্ছা যান। আমি যদি বলি – আপনি যেতে পারবেন না, আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে – আপনি কি থাকবেন? থাকবেন না। কাজেই যেতে চাচ্ছেন, যান।'

'গেট পর্যন্ত এগিয়ে দাও।'

'না। ও আচ্ছা, আমার হাতটা দেখে দিয়ে যান। আমার ভবিষ্যৎটা কেমন হবে বলে দিয়ে যান।'

মারিয়া তার হাত এগিয়ে দিল। মারিয়ার হাত দেখার জন্যে আমি আবার বসলাম।

'খুব ভাল করে দেখবেন। বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।'

'তোমার খুব সুখের সংসার হবে। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি কন্যার অপূর্ব সংসার। কন্যাটির নাম তুমি রাখবে – চিত্রলেখা।'

মারিয়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল — থাক, আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না। বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট কথা ! আমি আমার মেয়ের নাম চিত্রলেখা রাখতে যাব কেন? দেশে নামের আকাল পড়েছে যে বাড়ির নামে মেয়ের নাম রাখব? যাই হোক, আমি অবশ্যি ভবিষ্যত জানার জন্য আপনাকে হাত দেখতে দেইনি। আমি আপনার হাত কিছুক্ষণের জন্য ধরতে চাচ্ছিলাম। এম্নিতে তো আপনি আমার হাত ধরবেন না। কাজেই অজুহাত তৈরি করলাম। হিমু ভাই, আপনি এখন যান। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, রোদে আপনার বিখ্যাত হাঁটা শুরু করুন।

মারিয়ার গলা ধরে এসেছে। সে আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভেতর এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হল। মনে হল আমার আর হাঁটার প্রয়োজন নেই। মহাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ হয়ে মমতাময়ী এই তরুণীটির পাশে এসে বসি। যে নীলপদ্ম হাতে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, সেই তার হাতে তুলে দেই। তারপরই মনে হল – এ আমি কি করতে যাচ্ছি! আমি হিমু – হিমালয়।

মারিয়া বলেছিল সে গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসবে না। কিন্তু সে এসেছে। গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল মারিয়া চাপা রঙের শাড়ি পরে আছে, এখন দেখি শাড়ির রঙ নীল। রোদের আলোয় রঙ বদলে গেল, নাকি প্রকৃতি আমার ভেতর বিভ্রম তৈরি করা শুরু করেছে?

'হিমু ভাই।'

'বল।'

'যাবার আগে আপনি কি বলে যাবেন আপনি কে ?'

আমি বললাম, মারিয়া, আমি কেউ না। I am nobody.

আমি আমার এক জীবনে অনেককে এই কথা বলেছি – কখনো আমার গলা ধরে

যায়নি, বা চোখ ভিজে উঠেনি। দু'টা ব্যাপারই এই প্রথম ঘটল।

মারিয়া হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রচণ্ড রোদে আমি হাঁটছি। ঘামে গা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় এসে জামের ভেতর পড়লাম, কার যেন বিজয় মিছিল বের হয়েছে। জাতীয় পার্টির মিছিল। ব্যানারে এরশাদ সাহেবের ছবি আছে। আন্দোলনের শেষে সবাই বিজয় মিছিল করছে, তারাই বা করবে না কেন? এই প্রচণ্ড রোদেও তাদের বিজয়ের আনন্দে ভাটা পড়ছে না। দলের সঙ্গে ভিড়ে যাব কি-না ভাবছি। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মিছিলের সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধা হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে থেকেও একা থাকা যায়।

হাঁটলাম মিছিলের সঙ্গে। একজন আমার হাতে এরশাদ সাহেবের একটা ছবি ধরিয়ে দিল। এরশাদ সাহেবের আনন্দময় মুখের ছবি। প্রচণ্ড রোদে সেই হাসি ম্লান হচ্ছে না।

মিছিল কাওরান বাজার পার হল। আমরা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছি – পল্লীবন্ধু এরশাদ।

জিন্দাবাদ।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আমার পা-খোঁড়া কুকুরটা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। কাওরান বাজার তার এলাকা। সে আমাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে আমার পালে পাশে চলা শুরু করেছে। তার খোঁড়া পা মনে হচ্ছে পুরোপুরি অচল — এখন আর মাটিতে ফেলতে পারছে না। তিন পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আমি বললাম, তিন পায়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?

সে বলল, কুঁই কুঁই কুঁই।

কি বলতে চেষ্টা করল কে জানে? কুকুরের ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হত। আমার জানা নেই, তারপরেও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি —

'তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস আমার খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে খুব এক লাগে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কি আছে জানিস? পদ্ম। নীলপদ্ম। পাঁচটা নিয়ে ঘুরছি। কি অপূর্ব পদ্ম। কাউকে দিতে পারছি না। দেয়া সম্ভব নয়। হিমুরা কাউকে নীলপদ্ম দিতে পারে না।'

চৈত্রের রোদ বাড়ছে। রোদটাকে আমি জোছনা বানানোর চেষ্টা করছি। বানানো খুব সহজ — শুধু ভাবতে হবে – আজ গৃহত্যাগী জোছনা উঠেছে – চারদিকে থৈথৈ করছে জোছনা। ভাবতে ভাবতেই এক সময় রোদটাকে জোছনার মত মনে হতে থাকবে। আজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারছি না। ক্লান্তিহীন হাঁটা হেঁটেই যাচ্ছি – হেঁটেই যাচ্ছি।

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
হিমুর
দ্বিতীয় প্রহর
SUVO

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী বইমেলা ১৯৯৭

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/4 বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টার্স
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ড
৩৮/4 বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দাম ৭৫ টাকা
ISBN 984 437 145 7

উৎসর্গ
জাহিদ হাসান, প্রিয় মানুষ

মানুষ হিসেবে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে,

একদিন হয়ত অভিনয় দিয়েও মুগ্ধ করবে।
(দ্বিতীয় বাক্যটি দিয়ে তাকে রাগিয়ে দিলাম, হা হা হা।)

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম হিমুর সঙ্গে মিসির আলীর দেখা করিয়ে দেব। দু’জন মুখোমুখি হলে অবস্থাটা কি হয় দেখার আমার খুব কৌতূহল। ম্যাটার ও এন্টিম্যাটার একসঙ্গে হলে যা হয় তাঁর নাম ‘শুন্য’। মিসির আলী ও হিমুওতো এক অর্থে ম্যাটার ও এন্টিম্যাটার। দু’টি চরিত্রের ভেতর কোনটিকে আমি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা জানার জন্যেও এদের মুখোমুখি হওয়া দরকার। হিমুর দ্বিতীয় প্রহরে এদের মুখোমুখি করিয়ে দিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ
২৫-২-৯৭

ভীতু মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তা না। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে

চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনি বাথরুমে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে- কে যে হাঁটছে, গুন গুন করে গান গাইছে, কল ছাড়ছে-বন্ধ করছে, তাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই না। একবার ভূত দেখার জন্যে বাদলকে নিয়ে শ্মশানঘরে রাত কাটিয়েছিলাম। শেষরাতে ধুপধাপ শব্দ শুনেছি। চারদিকে কেউ নেই, অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভয়ের বদলে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার বাবা তার পুত্রের মন থেকে ভয়'-নামক বিষয়টি পুরোপুরি দূর করার জন্যে নানান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্ধতিগুলি খুব যে বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা যাবে না, তবে পদ্ধতিগুলি বিফলে যায়নি। কাজ কিছুটা করেছে। চট করে ভয় পাই না।

রাতবিরেতে একা একা হাটি। কখনো রাস্তায় আলো থাকে, কখনো থাকে না। বিচিত্র সব মানুষ এবং বিচিত্র সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি- কখনো আতঙ্কে অস্থির হইনি। তিন-চার বছর আগে এক বর্ষার রাতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। রাত দুটা কিংবা তারচে কিছু বেশি বাজে। আমি কাঁটাবনের দিক থেকে আজিজ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশ জনমানব শুন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছি। খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলি থেকে সোনালি বৃষ্টির ফোটা পড়ছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি- প্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি-পরা একজন মানুষ আমার দিকে ছুটে আসছে। রক্তে তার গেঞ্জি হাত-মুখ মাখামাখি- ছুরিতেও রক্ত লেগে আছে। বৃষ্টিতে সেই রক্ত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কি কাউকে খুন করে এদিকে আসছে? খুনি কখনো হাতের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালায় না। ব্যাপার কী? লোকটা থমকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। স্ট্রিট-লাইটের আলোয় আমি সেই মুখ দেখলাম। সুন্দর শান্ত মুখ, চোখ দুটিও মায়াকাড়া ও বিষণ্ন। লোকটির চিবুক বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। লোকটা চাপাগলায় বলল, কে? কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল। এই কয়েক মুহুর্তে অনেককিছু ঘটে যেতে পারত। সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। অস্ত্রহাতে খুনি ভযংকর জিনিস। যে-অস্ত্র মানুষের রক্ত পান করে সেই অস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে বারবার রক্ত পান করতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটে না।

লোকটি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম ।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না- পরদিন সবকটা কাগজ কিনে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোনো হত্যাকাণ্ডের খবর কি কাগজে উঠেছে? ঢাকা নগরীতে নিউ এলিফ্যান্ট রোড এবং কাঁটাবন এলাকার আশেপাশে কাউকে কি জবাই করা হয়েছে? না, তেমনকিছু পাওয়া গেল না। গতরাতে আমি যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় আবার গেলাম । ছোপ-ছোপ রক্ত পড়ে আছে কিনা সেটা দেখার কৌতুহল। রক্ত দেখতে না পাওয়ারই কথা। কাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। যেসব রাস্তায় পানি ওঠার কথা না সেসব রাস্তাতেও হাঁটুপানি।

আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম- না, রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার অনুসন্ধান অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাঙালির দৃষ্টি বড় কোনো ঘটনায় আকৃষ্ট হয় না, ছোট ছোট ঘটনায় আকৃষ্ট হয়। একজন এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, ভাইসাহেব, কী খুঁজেন?

'কিছু খুঁজি না।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার অনুসন্ধান দেখতে লাগলেন। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর রক্তের দাগ খোঁজা অর্থহীন। আমি চলে এলাম। ঐ রাতের ঘটনা ভয় পাবার মতো ঘটনা তো বটেই— আমি ভয় পাইনি। বাবার ট্রেনিং কাজে লেগেছিল। কিন্তু ভয় আমি একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়ে রীতমিতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধরনের ভয় যা মানুষের বিশ্বাসে ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। যে-ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোনো ভুবনে। ভয় পাবার সেই গল্পটি আমি বলব।
আমার বাবা আমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। সেই উপদেশগুলির একটি ভয়-সম্পর্কিত।

> "একজন মানুষ তার একজীবনে অসংখ্যবার তীব্র ভয়ের মুখোমুখি হয়। তুমিও হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। ভয়কে পাশ কাটাইয়া যাইবার প্রবণতাও স্বাভাবিক প্রবণতা। তুমি অবশ্যই তা করিবে না। ভয় পাশ কাটাইবার বিষয় নহে। ভয় অনুসন্ধানের বিষয়। ঠিকমতো এই অনুসন্ধান করিতে পারিলে জগতের অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হইবে। তোমার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি, এই জগতের রহস্য পেঁয়াজের খোসার মতো। একটি খোসা ছাড়াইয়া দেখিবে আরেকটি খোসা। এমনভাবে চলিতে থাকিবে- সবশেষে দেখিবে কিছুই নাই। আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি, আবার শূন্যে ফিরিয়া যাইব। দুই শূন্যের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা বাস করি। ভয় বাস করে দুই শূন্যে। এর বেশি এই মুহূর্তে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আমার বাবা, মহাপুরুষ তৈরির কারখানার চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদিও আমাকে বলেছেন ভয়কে পাশ না-কাটাতে, তবুও আমি ভয়কে পাশ কাটাচ্ছি। সব ভয়কে না- বিশেষ একটা ভয়কে। আচ্ছা, ঘটনাটা বলি।

আমার তারিখ মনে নেই। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে। শীত তেমন নেই। আমার গায়ে সুতির একটা চাদর। কানে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে চাদরটা মাথার উপর পেঁচিয়ে দিয়েছি। আমি বের হয়েছি পূর্ণিমা দেখতে। শহরের পূর্ণিমার অন্যরকম আবেদন। সোডিয়াম-ল্যাম্পের হলুদ আলোর সঙ্গে মেশে চাঁদের ঠাণ্ডা আলো। এই মিশ্র আলোর আলাদা মজা। তার উপর যদি কুয়াশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কুয়াশায় চাদের আলো চারদিকে ছড়ায়। সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো ছড়ায় না। মিশ্র আলোর একটি ছড়িয়ে যাচ্ছে, অন্যটি ছড়াচ্ছে না- খুবই ইন্টারেস্টিং!

সে-রাতে সামান্য কুয়াশাও ছিল। মনের আনন্দেই আমি শহরে ঘুরছি। পূর্ণিমার রাতে লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। অল্পকিছু মানুষ সারারাত জাগে। তারা ঘুমুতে যায় চাঁদ ডোবার পরে।

ইংরেজিতে এই ধরনের মানুষদের একটা নাম আছে- Moon Struck. এরা চন্দ্রাহত। এদের চলাফেরায় ঘোর-লাগা ভাব থাকে। এরা কথা বলে অন্যরকম স্বরে। এরা কিন্তু ভুলেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে চন্দ্রাহত মানুষদের চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। এদের যখন আমি দেখি তখন তাদের ছায়ার দিকে আগে তাকাই।

অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম । একসময় মনে হলো সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো বাদ দিয়ে জোছনা দেখা যাক। কোনো-একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। দুটা রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না এমন একটা গলি। খুব ভালো হয় যদি অন্ধগলি হয়। আগে থেকে জানা থাকলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষমাথায় চলে যাবার পর হঠাৎ দেখব পথ নেই। সেখানে সোডিয়াম-ল্যাম্প থাকবে না - শুধুই জোছনা।

ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। ঢাকা শহরের মাঝখানেই এই গলি। গলির নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না কৌতুহলী কেউ সেই গলি খুঁজে বের করুক। কিছুদূর এগুতেই কয়েকটা কুকুর চোখে পড়ল। এরা রাস্তার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল-আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে চারটা কুকুর। কুকুরদের স্বভাব হচ্ছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে একসঙ্গে ঘেউঘেউ করে ওঠা । ভয় দেখানোর চেষ্টা । এরা তা করল না। এদের একজন সামান্য একটু এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাকি তিনজন তার পেছনে। সামনের কুকুরটা কি ওদের দলপতি? লীডারশিপ ব্যাপারটা কুকুরদের আদিগোত্র নেকড়েদের মধ্যে আছে- কুকুরদের নেই। তবে সামনের কুকুরটাকে লীডার বলেই মনে হচ্ছে। আমি ভাব জমাবার জন্য বললাম, তারপর, তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? Is anything wrong?

কুকুরদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। এর কেউ লেজ নাড়ছে না। কুকুর প্রচণ্ড রেগে গেলে লেজ নাড়া বন্ধ করে দেয়। লক্ষণ ভালো না ।

এদের অনুমতি না নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। কাজেই বিনয়ী গলায় বললাম, যেতে পারি?

আমার ভাষা না বুঝলেও গলার স্বরের বিনয়ী অংশ বুঝতে পারার কথা। অধিকাংশ পশুই তা বোঝে ।

এরা নড়ল না। অর্থাৎ এরা চায় না আমি আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড হলো— আমি স্পষ্টই শুনলাম কেউ-একজন আমাকে বলছে- তুমি চলে যাও। জায়গাটা ভালো না- তুমি চলে যাও। চলে যাও।

অবচেতন মনের কোনো খেলা? কোনো কারণে আমি নিজেই গলিতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি বলে আমার অবচেতন মন আমাকে চলে যেতে বলছে? না, ব্যাপারটা তা না। আমি না-ভাবার কোনো কারণ নেই। আসলেই গলির ভেতর ঢুকতে চাচ্ছি। আমাকে গলির ভেতরের জোছনা দেখতে হবে। তারচে বড় কথা হচ্চে আমি কোনো দুর্বল মনের মানুষ না যে অবচেতন মন আমাকে নিয়ে খেলবে। আর যদি খেলেও থাকে সেই খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ধরে নিলাম অবচেতন মনই আমাকে চলে যেতে বলছে-অবচেতন মঙ্কে শোনানোর জন্যই স্পষ্ট করে বললাম, আমার এই গলিতে ঢোকা অত্যন্ত জরুরি। কুকুরগুলি একসঙ্গে আমাকে কামড়ে না ধরলে আমি অবশ্যই যাব।

তখন একটা কাণ্ড হলো। সবক'টা কুকুর একসঙ্গে পেছনের দিকে ফিরল। দলপতি কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে দলপতির আসন নিল। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পরিবর্তনটা কী বোঝার চেষ্টা করছি তখন অস্পষ্টভাবে লাঠির ঠকঠক আওয়াজ কানে এল। লাঠি-হাতে কেউ কি আসছে ? গ্রামের মানুষ সাপের ভয়ে লাঠি ঠকঠক করে যেভাবে পথে হাঁটে তেমন করে কেউ-একজন হাঁটছে। পাকা রাস্তায় লাঠির শব্দ। কুকুরদের শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তারা

কি শব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু পাচ্ছে? এদের মধ্যে একধরনের অস্থিরতা দেখা গেল। অস্থিরতা সংক্রামক। আমার মধ্যেও সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম। লাঠি ঠকঠক করে একজন 'মানুষ' আসছে। তাকে মানুষ বলছি কেন? সে কি সত্যি মানুষ? সে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। চারটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠে থেমে গেল। তারা একটু পিছিয়ে গেল ।

আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক, মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আরকিছু না । সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল, সে লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে-ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু মানুষটার কোনো ছায়া পড়েনি। ধক করে নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বিকট সেই গন্ধ। পাকস্থলী উলটে আসার উপক্রম হলো।

আমার মাথার ভেতর আবারও কেউ-একজন কথা বলল, এখনও সময় আছে, দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। এই জিনিসটা যদি তোমার দিকে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তুমি আর পালাতে পারবে না। কুকুরগুলি তোমাকে রক্ষা করছে। আরও কিছুক্ষণ রক্ষা করবে। তুমি দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করো। খবর্দার, এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবে না। এবং মনে রেখে আর কখনো এই গলিতে ঢুকবে না। কখনো না। এই গলি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।

আমি আস্তে আস্তে পেছনদিকে হাঁটছি- কুকুরগুলিও আমার হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছে।

জিনিসটার কোনো চোখ নেই। চোখ থাকলে বলতাম— জিনিসটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়।

মাথার ভেতর আবারও কেউ-একজন কথা বলল, তুমি জিনিসটার সীমার বাইরে চলে এসেছ। জিনিসটার ক্ষমতা প্রচণ্ড । কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা খুব ছোট। এই গলির বাইরে আসার তার ক্ষমতা নেই। তুমি এখন চলে যেতে পার।

আমি চলে গেলাম না। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার লাঠি নামিয়ে ফেলেছে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার গায়ে কাঁথার মতো একটা মোটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীরে জড়ানো। সে হাঁটছে হেলেদুলে। একবার মনে হচ্ছে বামে হেলে পড়ে যাবে, আবার মনে হচ্ছে ডানে হেলে পড়ে যাবে। জিনিসটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। যতই সে দূরে যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে। জিনিসটা আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। কুকুরগুলি ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের দলপতি শুধু একবার আমার দিক তাকিয়ে ঘেউঘেউ করল। মনে হয় কুকুরের ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চলে যাও।

ডিসেম্বর মাসের শীতেও আমার শরীর ঘামছে। হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। রাস্তা কেমন উঁচুনিচু লাগছে। নতুন নতুন চশমা পরলে যা হয় তা-ই হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাচের জগভরতি একজগ ঠাণ্ডা পানি এক চুমুকে খেতে পারলে হতো। কার কাছে পানি চাইব? কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হলো আমার দিক-ভুল হচ্ছে। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রিকশা চোখে পড়ছে না যে কোনো-একটা রিকশায় উঠে বসব। হোসহোস করে কিছু গাড়ি চলে যাচ্ছে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কেউ কি থামাবে? না, কেউ থামাবে না। ঢাকার গাড়ি-যাত্রীরা পথচারীর

জন্যে গাড়ি থামায় না। নিয়ম নেই। আমি ফুটপাতেই বসে পড়লাম। আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে বমি চেপে রেখেছিলাম। বসামাত্রই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল।

'আফনের কী হইছে?'

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ফুটপাতে বস্তা মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমায় তাদের একজন। বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করেছে। তার গলায় মমতার চেয়ে বিরক্তি বেশি।

আমি বললাম, শরীর ভালো না।

'মিরগি ব্যারাম আছে?'

'না। পানি খাওয়া যাবে? পানি খাওয়া দরকার।'

'রাইতে পানি কই পাইবেন।'

'রাতে পানির পিপাসা পেলে আপনারা পানি কোথায় পান?'

লোকটা বস্তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল । আমার উদ্ভট প্রশ্নে সে হয়তো বিরক্ত হচ্ছে। প্রশ্নটা তেমন উদ্ভট ছিল না। এই যে অসংখ্য মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, রাতে পানির তৃষ্ণা পেলে তারা পানি পায় কোথায়?

ক'টা বাজছে জানা দরকার। রাত শেষ হয়ে গেলে রিকশা, বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করবে- তখন আমার একটা গতি হলেও হতে পারে। বিটের পুলিশও দেখছি না। পূর্ণিমরাতে বোধহয় বিটের পুলিশ বের হয় না।

আমি বস্তা মুড়ি-দেয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ভাইসাহেব! এই যে ভাইসাহেব! এই যে বস্তা-ভাইয়া!

একা বসে থাকতে ভালো লাগছে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বমি হয়ে যাওয়ায় শরীরটা একটু ভালো লাগছে, তবে ভয়টা মাথার ভেতরে ঢুকে আছে। কারও সঙ্গে কথাটথা বলতে থাকলে হয়তো-বা তাকে ভুলে থাকা যাবে। আমি গলা উচিয়ে ডাকলাম, এই যে বস্তা-ভাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?

লোকটা বিরক্তমুখে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করল।

'কী হইছে?'

'এটা কোন জায়গা? জায়গাটার নাম কী?'

'চিনেন না?'

'জি না।'

'বুঝছি, মাল খাইয়া আইছেন। আরেক দফা গলাত আঙ্গুল দিয়া বমি করেন— শইল ঠিক হইব। আরেকটা কথা কই ভাইজান, আমারে ত্যক্ত করবেন না।'

'রাত কত হয়েছে বলতে পারেন? '

'জে না, পারি না।'

লোকটা আবার বস্তার ভেতর ঢুকে গেল । লোকটার পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়ব? গায়ে চাদর আছে। চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাকি রাতটা পার করে দেয়া যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি। গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। ফুটপাতে ঘুমানো হয়নি।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ার আগে কি তার অনুমতি নেয়ার দরকার আছে? ফুটপাতে যারা ঘুমোয় তাদের নিয়মকানুন কী? তাদেরও নিশ্চয়ই অলিখিত কিছু নিয়মকানুন আছে? ফুটপাতে অনেক পরিবার রাত কাটায়- স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের সোনার সংসার। সেইরকম কোনো পরিবারের পাশে নিশ্চয়ই উঠকো ধরনের কেউ

মাথার নিচে ইট বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারে না?

'বস্তা-ভাই। এই যে বস্তা-ভাই!'

'আবার কী হইছে?'

'আপনার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কি শুয়ে পড়তে পারি? যদি অনুমতি দেন।'

বস্তা-ভাই জবাব দিলেন না, তবে সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা করলেন। এই প্রথম লক্ষ করলাম-বস্তা-ভাই একা ঘুমাচ্ছেন না, তার সঙ্গে তার পুত্রও আছে। তিনি পুত্রকেও নিজের দিকে টানলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করতেছেন কেন? ইয়ারকি মারেন? গরিবরে লইয়া ইয়ারকি করতে মজা লাগে?

'না রে ভাই, ইয়ারকি করছি না। গরিব নিয়ে ইয়ারকি করব কী, আমিও আপনাদের দলে । মুখভরতি বমি। মুখ না ধুয়ে ঘুমুতে পারব না। পানি কোথায় পাব বলে দিন। একটু দয়া করুন।'

বস্তা-ভাই দয়া করলেন। আঙুল উঁচিয়ে কী যেন দেখালেন। আমি এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত কোনো চায়ের দোকান। দোকানের পেছনে জালাভরতি পানি । মিনারেল ওয়াটারের একটা খালি বোতলও আছে। আমি পানি দিয়ে মুখ ধুলাম। দুই বোতলের মতো পানি খেয়ে ফেললাম। এক বোতল পানি ঢেলে দিলাম গায়ে । ভয়-নামক যে ব্যাপারটা শরীরে জড়িয়ে আছে- পানিতে তা ধুয়ে ফেলার একটা চেষ্টা। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। কোনো এক পর্যায়ে কেউ-একজন সাবধানে আমার গায়ের চাদর তুলে নিয়ে চলে গেল। তাতেও আমার ঘুম ভাঙল না। সারারাত আমার গায়ে চাদের আলোর সঙ্গে পড়ল ঘন হিম । যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। দিনের আলোয় রাতের ভয়টা থাকার কথা না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম ভয়টা আছে। গুটিসুটি মেরে ছোট হয়ে আছে। তবে সে ছোট হয়ে থাকবে না। যেহেতু সে একটা আশ্রয় পেয়েছে সে বাড়তে থাকবে।

জ্বরে আমার শরীর কাঁপছে। চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সবচে ভালো বুদ্ধি হাসপাতালে ভরতি হয়ে যাওয়া। হাসপাতালে ভরতির নিয়মকানুন কী? দরখাস্ত করতে হয়? নাকি রোগীকে উপস্থিত হয়ে বলতে হয়- আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য এসেছি? আমার রোগ গুরুতর। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। চিকিৎসার চেয়ে আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে সেবা। ঘরে সেবা করার কেউ নেই। হাসপাতালের নার্সরা নিশ্চয়ই সেবাও করবেন। গভীর রাতে চার্জ-লাইট হাতে নিয়ে বিছানায়-বিছানায় যাবেন, রোগের প্রকোপ কেমন দেখবেন। স্যার, দয়া করে আমকে ভরতি করিয়ে নিন।

হাসপাতালে ভরতি হওয়া যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তত জটিল না। একজনকে দেখলাম দুটাকা করে কী-একটা টিকিট বিক্রি করছে। খুব কঠিন ধরনের চেহারা। সবাইকে ধমকাচ্ছে। তাকে বললাম, ভাই আমার এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। কী করতে হবে একটু দয়া করে বলে দিন ।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, হাসপাতালে ভরতি হবেন?

'জি ।'

'নিয়ে এসেছে কে আপনাকে?'

'কেউ নিয়ে আসেনি। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

'আপনার হয়েছে কী?'

'ভূত দেখে ভয় পেয়েছি। ভয় থেকে জ্বর এসে গেছে।'

'ভূত দেখেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আউটডোর পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন স্লিপ দিই।'

'কার কাছে যাব তা তো স্যার জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি বসুন ঐ টুলটায়।'

'টুলে বসতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি বরং মাটিতে বসি।'

'আচ্ছা বসুন।'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। যাদের স্যার বললে কাজ হবে তাদের বলবেন।'

'আপনাকে বলাতেও কাজ হয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

'আমি ব্যবস্থা করব কী? আমি দুই পয়সার কেরানি। আমার কি সেই ক্ষমতা আছে? যারা ব্যবস্থা করতে পারবেন তাদের কাছে নিয়ে যাব- এইটুকু।'

'স্যার, এইটুকুই-বা কে করে।'

এই লোক আমাকে একজন তরুণী-ডাক্তারের নিয়ে গেল। খুবই ধারালো চেহারা। কথাবার্তাও ধারালো। আমি এই তরুণীর কঠিন জেরার ভেতর পড়ে গেলাম।

'আপনার নাম কী?'

'ম্যাডাম, আমার নাম হিমু।'

'আপনার ব্যাপার কী?'

'ম্যাডাম, আমি খুবই অসুস্থ। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। ভূত দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার- আপনি হাসপাতলে ভরতি হতে চান- খুব ভালো কথা। দরিদ্র দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধার ভেতর যতটুকু করা যায় আপনার জন্যে ততটুকু করা হবে। হাসপাতালে সিট নেই। আপনার কি ধারণা হোটেলের মতো আমরা বিছানা সাজিয়ে বসে আছি! আপনাদের জ্বর হবে, সর্দি হবে-আপনারা এসে বিছানায় শুয়ে পড়বেন— নার্সকে ডেকে বলবেন, কোলবালিশ দিয়ে যাও। এই আপনার ধারণা?'

'জি না ম্যাডাম।'

'আপনি কি ভেবেছেন উদ্ভট একটা গল্প বললেই আমরা আপনাকে ভরতি করিয়ে নেব? ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে? রসিকতা করার জায়গা পান না!'

'ম্যাডাম, সত্যি দেখেছি। আপনি চাইলে আমি পুরো ঘটনা বলতে পারি।'

'আমি আপনার ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না।'

'ম্যাডাম, আপনি কি ভুত বিশ্বাস করেন না?'

'আপনি দয়া করে কথা বাড়াবেন না।'

'শেকসপীয়ারের মতো মানুষও কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন। তিনি হ্যামলেটে

বলেছেন- There are many things in heaven and earth. আমার ধারণা তিনি ভূত দেখেছেন। এদিকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন-'

'স্টপ ইট!'

'আমি স্টপ করলাম।'

তরুণী-ডাক্তার আমাকে যে-লোকটি নিয়ে এসেছিল (নাম রশিদ) তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। রশিদ বেচারা জোকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল।

'রশিদ!'

'জি আপা?'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও। ফালতু ঝামেলা আমার কাছে আর কখনো আনবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছি । আমাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তরুণী-ডাক্তার আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন। চোখ মেলতেই তিনি বললেন, হিমু সাহেব, এখন কেমন বোধ করছেন?

'ভালো ।'

এইটুকু বলে আমি দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারালাম, কিংবা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হাসপাতালের তৃতীয় দিনে আমাকে দেখতে এলেন বড় ফুপা- বাদলের বাবা। তার হাতে এক প্যাকেট আঙুর। একটা সময় ছিল যখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখতে যাবার সময় আঙুর নিয়ে যাওয়া হতো। ফলের দোকানি আঙুর বিক্রির সময় মমতামাখা গলায় বলত-রুগির অবস্থা সিরিয়াস?

এখন আঙুর একশো টাকা কেজি- বরই বরং এই তুলনায় দামি ফল।

বড় ফুপা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, অবস্থা কী?

আমি জবাব দিলাম না। কেউ রোগী দেখতে এসে যদি দেখে রোগী দিব্যি সুস্থ, পা নাচাতে নাচাতে হিন্দি গান গাইছে— তখন সে শকের মতো পায় । যদি দেখে রোগীর অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা, তখন মনে শান্তি পায়- যাক, কষ্ট করে আসাটা বৃথা যায়নি। কাজেই ফুপার প্রশ্নে আমি চোখমুখ করুণ করে ফেললাম, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাবও করলাম।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন? অবস্থা কী?'

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, ভালো। এখন একটু ভালো ।

'তোকে খুঁজে বের করতে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, কোন ওয়ার্ড, বেড নাম্বার কী কেউ জানে না।'

'ও আচ্ছা।'

'একবার তো ভেবেছি ফিরেই চলে যাই। নেহায়েত আঙুর কিনেছি বলে যাইনি। আঙুর খেতে নিষেধ নেই তো?'

'জি না।'

'নে, আঙুর খা।'

আমি টপাটপ আঙুর মুখে ফেলছি আর ভাবছি- ব্যাপারটা কী? আমি যে

হাসপাতালে, এই খোঁজ ফুপা পেলেন কোথায়? কাউকেই তো জানানো হয়নি। আমি বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না যে খবরের কাগজে নিউজ চলে গেছে-

হিমুর সর্দিজ্বর

জনদরদি দেশনেতা প্রাণপ্রিয় হিমু সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যান। কিছুক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে থেকে তার আশু আরোগ্য-কামনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বনমন্ত্রী, তেল ও জ্বালানি মন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন- হিমু সাহেবের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। হিমু সাহেবের ভক্তবৃন্দের চাপে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তারা যেন হিমু সাহেবকে বিরক্ত না করেন। হিমু সাহেবের দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রতিদিন দুপুর বারোটায় প্রকাশ করা হবে।

আমি যে হাসপাতালে এই খবর আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা ছাড়া আর কারোরই জানার কথা না। ধরা যাক খবরটা সবাই জানে, তার পরেও ফুপা হাসপাতালে চলে আসবেন এটা হয় না। এত মমতা আমার জন্যে বাদল ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্যকোনো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কী?

'ফুপা, আমি যে হাসপাতালে এটা জানলেন কীভাবে? পেপারে নিউজ হয়েছে?'

'পেপারে নিউজ হবে কেন? তুই কে? হাসপাতাল থেকে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'আপনার নাম্বার ওরা পেল কোথায়?'

'তুই দিয়েছিস।'

আমার মনে পড়ল কোনো একসময় হাসপাতালে ভরতির ফরম তরুণী-ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই ফিলআপ করেছেন এবং আগ বাড়িয়ে অসুখের খবর দিয়েছেন ।

'খুব মিষ্টি গলার একজন মেয়ে-ডাক্তার আপনাকে খবর দিয়েছে, তা-ই না?'

'হু। তোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল।'

'কী জানতে চাচ্ছিল?'

'তুই কী করিস না-করিস এইসব। তোর হলুদ পাঞ্জাবি, উদ্ভট কথাবার্তা শুনে ভড়কে গেছে আর কি। তুই আর কিছু পারিস বাঁ না পারিস মানুষকে ভড়কাতে পারিস।

'ডাক্তাররা এত সহজে ভড়কায় না। তারপর বলুন ফুপা, আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'তোকে দেখতে এসেছি আর কি।'

'আমাকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসবেন এটা বিশ্বাসযোগ্য না। ঘটনা কী?'

'বাদলের ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

ফুপা ইতস্তত করে বললেন।

আমি শান্ত গলায় বললাম, বাদলকে নিয়ে তো আপনার এখন দুশ্চিন্তার কিছু

নেই। সে কানাডায় আমার প্রভাববলয় থেকে অনেক দূরে। আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হচ্ছে না। নাকি সে কানাডাতেও খালি পায়ে হাঁটা শুরু করেছে?

ফুপা চাপাগলায় বললেন, বাদল এখন ঢাকায়।

'ও আচ্ছা।'

'মাসখানিক থাকবে। তোর কাছে আমার অনুরোধ, এই এক মাস তুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি । ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'গা-ঢাকা দিয়েই তো আছি। হাসপাতালে লুকিয়ে আছি।'

হাসপাতালে তো আর এক মাস থাকবি না, তোকে নাকি আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'আমাকে বাদলের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকতে হবে, তা-ই তো?'

'হ্যাঁ।'

'নো প্রবলেম।'

'শোন হিমু, আমরা চাচ্ছি ওর একটা বিয়ে দিতে। মোটামুটি নিমরাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন তুই যদি ভুজংভাজং দিস তা হলে তো আর বিয়ে হবে না। সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হাঁটা দেবে।'

'আমি কেন ভুজংভাজং দেব?'

'তোকে দিতে হবে না। তোকে দেখলেই ওর মধ্যে আপনা-আপনি ভুজংভাজং হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে নরম্যাল করেছি, সব জলে যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বাদল এয়ারপোর্টে নেমেই বলেছে- হিমুদা কোথায়? আমি মিথ্যা করে বলেছি, সে কোথায় কেউ জানে না ।'

'ভালো বলেছেন।'

'মেসের ঠিকানা চাচ্ছিল- তোর আগের মেসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'খুবই ভালো করেছেন, আগের ঠিকানায় খোজ নিতে গিয়ে ঠক খাবে।'

'খোঁজ নিতে এর মধ্যেই গিয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে কী যে দুশ্চিন্তায় আছি। বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত । আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। চিন্তাভাবনা যা করার বৌমা করবে।'

'বিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'

'কয়েকটা মেয়ে দেখা হয়েছে- এর মধ্যে একটাকে তোর ফুপুর পছন্দ হয়েছে। মেয়ের নাম হলো- চোখ।'

'মেয়ের নাম চোখ।'

'হ্যাঁ, চোখ। আজকাল কি নামের কোনো ঠিকঠকানা আছে যার যা ইচ্ছা নাম রাখছে।'

'চোখ নাম হবে কীভাবে আঁখি না তো?'

'ও হ্যাঁ, আঁখি । সুন্দর মেয়ে- ফড়ফড়ানি-টাইপ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনটা কথা বলে। বাদলের সঙ্গে মানাবে। একজন কথা বলে যাবে, একজন শুনে যাবে।'

‘মেয়ে আপনার পছন্দ না?’

‘তোর ফুপুর পছন্দ। পুরষমানুষের কি সংসারে কোনো say থাকে? থাকে না। পুরুষরা পেপার-হেড হিসেবে অবস্থান করে। নামে কর্তা, আসলে ভর্তা। তুই বিয়ে না করে খুব ভালো আছিস । দিব্যি শরীরে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস । তোকে দেখে হিংসা হয়। স্বাধীনতা কী জিনিস, তার কী মর্ম-সেটা বোঝে শুধু বিবাহিত পুরুষরাই। উঠিরে
হিমু।’

‘আচ্ছা।’

‘বাদলের প্রসঙ্গে যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

‘মনে থাকবে।’

‘ও আচ্ছা। তোর অসুখের ব্যাপারটাই তো কিছু জানলাম না! কী অসুখ?’

‘ঠাণ্ডা লেগেছে।’

‘ঠাণ্ডা লাগল কীভাবে?’

‘ফুটপাতে চাদর-গায়ে শুয়েছিলাম। চোর চাদর নিয়ে গেল।’

‘ফুটপাতে ঘুমুচ্ছিলি?’

‘জি ।’

‘ঘরে ঘুমুতে আর ভালো লাগে না?’

‘তা না-’

‘শোন হিমু, বাদলের কাছ থেকে দূরে থাকবি। মনে থাকে যেন।’

‘মনে থাকবে ।’

‘টাকাপয়সা কিছু লাগবে? লাগলে বল, লজ্জা করিস না। ধর পাঁচশো টাকা রেখে দে। অষুধপত্র কেনার ব্যাপার থাকতে পারে।'

আমি নোটটা রাখলাম। ফুপা চিন্তিত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। ছেলে আমার ফাঁদে পড়ে যদি আবার ফুটপাতে শয্যা পাতে। কিছুই বলা যায় না।

হাসপাতাল আমার বেশ পছন্দ হলো। হাসপাতালের মানুষগুলির ভেতর একটা মিল আছে। সবাই রোগী। রোগযন্ত্রণায় কাতর। ব্যাধি সব মানুষকে এক করে দিয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ অপরিচিত একজন সুস্থ মানুষের জন্যে কোনো সহমর্মিতা বোধ করবে না, কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অন্য একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে করবে।

হাসপাতালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। সকালে নাশতা আসছে। দুবেলা খাবার আসছে। দুনম্বরি ব্যবস্থাও আছে। জায়গামতো টাকা খাওয়ালে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের অনেক সংস্থাটংস্থা আছে। করুণ গলায় তরুণ ডাক্তারদের কাছে অভাবের কথা বলতে পারলে ফ্রি অষুধ তো পাওয়া যায়ই, পথ্য কেনার টাকাও পাওয়া যায়।

রোগ সেরে গেছে, তার পরেও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর সারাবার ব্যবস্থাও আছে। খাতাপত্রে নাম থাকবে না- কিন্তু বেড থাকবে। এক-একদিন এক-এক ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুমুতে হবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে গত সাত মাস ধরে হাসপাতালে বাস করছে এমন একজনের সন্ধানও পাওয়া গেল। নাম ইসমাইল মিয়া । স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছিল, তাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে মাসখানিক চিকিৎসা করাল। সেই ইসমাইল মিয়ার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবার নিয়ে সে

হাসপাতালে পার হয়ে গেল। স্ত্রী মরে গেছে। তাতে অসুবিধা হয়নি। বাচ্চারা হাসপাতালের বারান্দায় খেলে। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরে। কেউ কিছু বলে না। ইসমাইল মিয়া দিনে বাইরে কাজকর্ম করে (মনে হয় দুনম্বরি কাজ– চুরি, ফটকাবাজি)। রাতে হাসপাতালে এসে ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে । ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে ।

ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলো। অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী ! হাসিমুখ ছাড়া কথা বলে না। তার মধ্যে দার্শনিক ব্যাপারও আছে। আমি বললাম, হাসপাতালে আর কতদিন থাকবে?

ইসমাইল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ক্যামনে বলি ভাইজান? আমার হাতে তো কিছু নাই ।

'তোমার হাতে নেই কেন?'

'সব তো ভাইজান আল্লাহপাকের নির্ধারণ। আল্লাহপাক নির্ধারণ করে রেখেছে আমি বালবাচ্চা নিয়া হাসপাতালে থাকব- এইজন্যে আছি। যেদিন নির্ধারণ করবেন আর দরকার নাই- সেইদিন বিদায়।'

'আল্লাহপাকের হুকুম ছাড়া তো ভাইজান কিছুই হওনের উপায় নাই।'

'তাও ঠিক।'

'সামান্য যে পিপীলিকা- আল্লাহপাক তারও খবর রাখেন। আপনার পায়ের তলায় পইরা দুইটা পিপীলিকার মৃত্যু হবে তাও আল্লাহপাকের বিধান। আজরাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহপাকের নির্দেশে দুই পিপীলিকার জান কবজ করবে।'

'ও আচ্ছা।'

'এইজন্যেই ভাইজান কোনোকিছু নিয়া চিন্তা করি না। যার চিন্তা করার কথা সে-ই চিন্তা করতেছে। আমি চিন্তা কইরা কী করব।'

'কার চিন্তা করার কথা?'

'কার আবার, আল্লাহপাকের।'

ইসমাইল মিয়া খুবই আল্লাহভক্ত। সমস্যা হচ্ছে তার প্রধান কাজ- চুরি । চুরির পক্ষেও সে ভালো যুক্তি দাঁড় করিয়েছে-

'চুরিতে আসলে কোনো দোষ নাই ভাইজান। ভালুক কী করে? পেটে খিদা লাগলে মৌমাছির মৌচাক থাইক্যা মধু চুরি করে। এর জন্যে ভালুকের দোষ হয় না। এখন বলেন মানুষের দোষ হইব ক্যান।'

বগার মা নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তিনি ঝাড়ফুঁক করেন। ঝাটার কাঠি নিয়ে রোগীদের ঝাড়েন। তাতে নাকি অতি দ্রুত রোগ আরোগ্য হয়। হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সাথে সাথে চলে ঝাড়ফুঁক।

এই বৃদ্ধা দশ টাকার বিনিময়ে আমাকেও একদিন ঝেড়ে গেলেন। আমি দশ টাকার বাইরে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঝাড়ার মন্ত্র খাকিটা শিখে নিলাম।

'ও কালী সাধনা
বিষ্টু কালী মাতা ।
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম।
রও নাও— ঈশানে যাও ।
........'

বগার মা'র সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করলাম। জানা গেল বগা বলে তার কোনো

ছেলে বা মেয়ে নেই। তার তিনবার বিয়ে হয়েছিল। কোনো ঘরেই কোনো সন্তান হয়নি। কী করে তার নাম বগার মা হয়ে গেল তিনি নিজেও জানেন না ।

আমি বললাম, মা, ঝাড়ফুঁকে রোগ সারে?

বগার মা অতি চমৎকৃত হয়ে বললেন, কী কও বাবা! ঠিকমতো ঝাড়তে পারলে ক্যানসার সারে ।

'আপনি সারিয়েছেন?'

'অবশ্যই– ত্রিশ বচ্ছর ধইরা ঝাড়তেছি। ত্রিশ বচ্ছরে ক্যানসার ম্যানসার কতকিছু ভালো কইরেছি। একটা কচকা ঝাড়া দশটা "পেনিসিলি" ইনজেকশনের সমান। বাপধন, তোমারে যে ঝাড়া দিলাম এই ঝাড়ায় দেখবা আইজ দিনে-দিনে সিধা হইয়া দাঁড়াইবা।'

হাসপাতালে আমি অনেক কিছুই শিখলাম। হাসপাতালের ব্যাপারটা সম্ভবত আমার বাবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। নয়তো তিনি অবশ্যই তার পুত্রকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিতেন। এবং তার বিখ্যাত উপদেশমালার সঙ্গে আরও একটি উপদেশ যুক্ত হতো-

> 'প্রতি দুই বৎসর অন্তর হাসপাতালে সাতদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। মানুষের জরা-ব্যাধি ও শোক তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যাধি কী, জীবজগৎকে ব্যাধি কেন বারবার আক্রমণ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে । তবে মনে রাখিও, ব্যাধিকে ঘৃণা করিবে না। ব্যাধি জীবনেরই অংশ। জীবন আছে বলিয়াই ব্যাধি আছে।'

'কেমন আছে হিমু সাহেব।'

'জি ম্যাডাম, ভালো আছি।'

'আপনার বুকে কনজেশন এখনও আছে। অ্যান্টিবায়োটিক যা দেয়া হয়েছে কনটিনিউ করবেন। সেরে যাবে।'

'থাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'আপনাকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে, আপনি চলে যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

' প্রতিটি বাক্যে একবার করে ম্যাডাম বলছেন কেন? ম্যাডাম শব্দটা আমার পছন্দ না। আর বলবেন না।'

'জি আচ্ছা, বলব না।'

'আপনার হাতে কি সময় আছে? সময় থাকলে আমার চেম্বারে আসুন। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

'জি আচ্ছা।'

আমি তরুণী-ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তার নাম ফারজানা। সুন্দর মানুষকেও সবসময় সুন্দর লাগে না। কখনো খুব সুন্দর লাগে, কখনো মোটামুটি লাগে। এই তরুণীকে আমি যতবার দেখেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। অ্যাপ্রন ফেলে দিয়ে ফারজানা যদি ঝলমলে একটা শাড়ি পরত তা হলে কী হতো? ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, কপালে টিপ । হালকা নীল একটা শাড়ি- কানে ঝুলবে নীল পাথরের ছোট্ট দুল। এই মেয়ে কি বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যায় না? তখন চারদিকে অবস্থাটা কী হয়? বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মন-খারাপ করে ভাবে- এই মেয়েটা কেন এসেছে।

আজকের দিনে আমাকে সবচে সুন্দর দেখানের কথা। এই মেয়েটা সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এটা সে পারে না।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'বসুন।'

আমি বসলাম । আমার সামনে পিরিচে-ঢাকা একটা চায়ের কাপ । ফারজানার সামনেও তা-ই। চা তৈরি করে সে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভেতরে সামান্য হলেও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'কেউ দিলে খাই।'

'নিন, সিগারেট নিন। ডাক্তাররা সব রোগীকে প্রথম যে-উপদেশ দেয় তা হচ্ছে সিগারেট ছাড়ুন। সেখানে আমি আপনাকে সিগারেট দিচ্ছি- কারণ কী বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কারণ, আমি নিজে একটা সিগারেট খাব। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিগারেট ধরেছিলাম। ছেলেরা সিগারেট খাবে, আমরা মেয়েরা কেন খাব না? এখন এমন অভ্যাস হয়েছে এর থেকে বেরুতে পারছি না। চেষ্টাও অবিশ্যি করছি না।'

ফারজানা সিগারেট ধরাল। আশ্চর্য- সিগারেটটাও তার ঠোঁটে মানিয়ে গেল! পাতলা ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত আগুন। বাহ, কী সুন্দর! সুন্দরী তরুণীদের ঘিরে যা থাকে সবই কি সুন্দর হয়ে যায়।'

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'এখন গল্প করুন। আপনার গল্প শুনি।'

'কী গল্প শুনতে চান?'

'আপনি অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পেয়ে অসুখ বাধিয়েছেন। সেই অস্বাভাবক দৃশ্যটা কী আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কেন জানতে চাচ্ছেন?'

'জানতে চাচ্ছি- কারন এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে না। পৃথিবী চলে তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ সেইসব নিয়ম একে একে জানতে শুরু করেছে- এই সময় আপনি যদি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেন তা হলে তো সমস্যা?'

'মানুষ কি সবকিছু জেনে ফেলেছে?'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সবকিছু না জানলেও অনেককিছুই জেনেছে। ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হলো তাও জেনে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললাম, ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

'বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু। আদিতে ছিল প্রিমরডিয়েল অ্যাটম যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কিছুই নেই। সেই অ্যাটম বিগ ব্যাং-এ ভেঙে গেল-তৈরি হলো স্পেস এবং টাইম । সেই স্পেস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক্সপানডিং ইউনিভার্সে।'

'সময়ের শুরু তা হলে বিগ ব্যাং থেকে?'

'হ্যাঁ।'

‘বিগ ব্যাং-এর আগে সময় ছিল না?’

‘না।’

‘বিগ ব্যাং-এর আগে তা হলে কী ছিল?’

‘সেটা মানুষ কখনো জানতে পারবে না। মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং জ্ঞানের শুরুও বিগ ব্যাং-এর পর থেকেই।’

‘তা হলে তো বলা যেতে পারে- জ্ঞানের একটা বড় অংশই মানুষের আড়ালে রেখে দেয়া হয়েছে।’

‘আপনি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছেন?’

‘না, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। তারা যা বলে তা-ই হাসিমুখে মেনে নিই।’

সস্তা ধরনের কনভারসেশন আমার সঙ্গে দয়া করে করবেন না। “সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না” এটা বহু পুরাতন ডায়ালগ । বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। শুনলেই গা-জ্বালা করে। আপনি খুব অল্প কথায় আমাকে বলুন- কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর রিলিজ-অর্ডার নিয়ে বাসায় চলে যান।’

‘আমি আপনাকে বলব না।’

ফারজানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তার ঠোঁটের সিগারেট নিভে গিয়েছিল- সে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কেন বলবেন না?

আমি শান্তগলায় বললাম, আপনাকে আমি বলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। আপনাকে দৃশ্যটা দেখাতে হবে। ঘটনাটা কী পরিমাণে অস্বাভাবিক তা জানার জন্যে আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বরং আপনাকে দেখাবার ব্যবস্থা করি।

‘আপনি আমাকে ভূত দেখাবেন?’

‘ভূত কি না তা তো জানি না- যে-জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা দেখাব।’

‘কবে?’

‘কবে তা বলতে পারছি না। কোনো-একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যা।’

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আচ্ছ বেশ নিয়ে যাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব ।

@@

আমি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

ঢাকা শহরের অন্যসব গলির মতোই একটা গলি । একপাশে নোংরা নর্দমা । নর্দমায় গলা পিচের মতো ঘন-কালো ময়লা পানি । গলিতে ডাক্টবিন বসানো হয় না বলে দুপাশের বাড়ির ময়লা গলিতেই ফেলা হয়। সেই ময়লার বেশিরভাগ লোকের পায়ে পায়ে চলে যায়। আর বাকিটা জমে থেকে থেকে একসময় গলিরই অংশ হয়ে যায়।

চারটা কুকুর থাকার কথা- এদের দেখলাম না। সেই জায়গায় ছোট ছোট কিছু বাচ্চাকে দেখলাম টেনিস-বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলা আপাতত বন্ধ, কারণ বল নর্দমায় ডুবে গেছে। কাঠি দিয়ে বল খোঁজা হচ্ছে। ঘন ময়লা পানির নর্দমায়

টেনিসবলের ডুবে যাবার কথা না- আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ভেসে থাকার কথা। ডুবে গেল কেন কে জানে!

আমি গলির শেষ মাথা পর্যন্ত যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। এখন এই দিনের আলোয় শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া না-যাওয়া অর্থহীন— মধ্যরাতের পরেই কোনো একসময় আসতে হবে। আজ বরং কিছুক্ষণ বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরে আসা যাক । সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে শরীর অন্যরকম হয়ে গেছ । শরীর ঠিক করতে হবে। হিমু-টাইপ জীবনচর্চা শুরু করা দরকার।

বাচ্চারা বল খুঁজে পেয়েছে। নর্দমা থেকে বল তুলতে গিয়ে ছ'টা বাচ্চা নোংরায় মাখামাখি হয়েছে। তাতে তাদের কোনো বিকার নেই। বল খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত। তারা তাদের খেলা শুরু করল।

আমি শুরু করলাম আমার খেলা— ঢাকা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটা। গত সাতদিন এদের কাউকে দেখিনি। রাস্তাগুলির জন্যে আমার মন কেমন করছে। রাস্তাদেরও হয়তো আমার জন্যে মন কেমন করছে। কথা বলার ক্ষমতা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় জীবনানন্দের মতো বলত- হিমু সাহেব, এত দিন কোথায় ছিলেন?

সন্ধ্যার দিকে আমি কাকরাইলের কাছাকাছি চলে এলাম। আমার পদযাত্রা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত হলো- কারণ আমার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ। পেট ফুলে মোটা হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হলো মানিব্যাগটা চিৎকার করে বলছে- এই গাধা, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছস কেন? আমাকে তুলে পকেটে লুকিয়ে ফ্যাল। কেউ দেখছে না।

কালো পিচের রাস্তায় কালো রঙের মানিব্যাগ, চট করে চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকারে লোকজন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে না, সোজাসুজি তাকিয়ে হাঁটে । এইজন্যেই কি কারও চোখে পড়েনি? তার পরেও পেটমোটা একটা মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকবে আর তা কারও চোখে পড়বে না এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। আমি সাতদিন রাস্তায় ছিলাম না । এই বাংলাদেশের রাজপথগুলিতে কি অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে?

আমি হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগ তুললাম। অতিরিক্ত পেটমোটা মানিব্যাগে সাধারণত মালপানি থাকে না, কাগজপত্রে ঠাসা থাকে। এখানেও হয়তো তা-ই। তুলে ঠক খাব। আমার আগে অনেকেই এই ব্যাগ তুলে ঠক খেয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে সে ঘাপটি মেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজা দেখার জন্যে।

ব্যাগ খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মতো আনন্দ হলো। ব্যাগভরতি টাকা রাবারের রিবন দিয়ে বাধা পাঁচশো টাকার নোটের স্তূপ। ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ব্যাগটা বট করে পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলতে যাব তখন মনে হলো আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুদের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। হিমুরা অন্যের মানিব্যাগ এমন ঝট করে লুকিয়েও ফেলতে চায় না। এখন কী করব? ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে ফেলে রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পড়ে-থাকা দশ টাকার একটা নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচশো টাকার নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। নোটটা চুম্বক হয়ে মানব সন্তানদের আকর্ষণ করতে থাকে। অতি বড় যে সাধু তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে একটা ছিঁচকে চোর।

'ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কি মানিব্যাগ?'

আমি পাশ ফিরলাম। ছুঁচালো চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুলে চেহারায় যেমন অসুস্থ ভাব লেগে থাকে তার মুখে সেই অসুস্থ ভাব। চোখ হলুদ। ঠোট কালচে মেরে আছে। নিচের ঠোট খানিকটা ঝুলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়। তবে কাপড়চোপড় বেশ পরিপাটি। শুধু জুতাজোড়া ময়লা। অনেকদিন কালি করা হয়নি, রঙ চটে গেছে। একটু দূরে আরও একজন। তার চেহারাও ছুঁচালো। তার মুখেও অসুস্থ ভাব এবং চোখ হলুদ। কোনো ডাক্তার দেখলে দুজনকেই বিলিরুবিন টেষ্ট করাতে পাঠাত। আমি এই জাতীয় যুবকদের চিনি। সামান্য চুরি থেকে শুরু করে মানুষের পেটে দশ ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেয়ার মতো অপরাধ এরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে পারে। এরা কখনো একা চলাফেরা করে না। আবার এদের দল বড়ও হয় না। দুজনের ছোট ছোট দল। দুজনের একজন (সাধারণত দুবলা পাতলাজন) ওস্তাদ, তিনি হুকুম দেন। অন্যজন সেই হুকুম পালন করে।

এই দলটার যিনি ওস্তাদ তিনি আবার কথা বললেন, কী ব্রাদার, কথা বলছেন না কেন? হাতে কি মানিব্যাগ?

আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, তা-ই তো মনে হয়।

'কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'কুড়িয়ে পাব কীভাবে? মানিব্যাগ তো আর ফুল না যে পড়ে থাকবে আর কুড়িয়ে নেব!'

'পেয়েছেন কোথায়?'

'ছিনতাই করেছি।'

দ্বিতীয় ছুঁচালো যুবক এবার হালকা চালে এগিয়ে আসছে। এ বেশ বলশালী হলেও হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার মুখভরতি পান। সে ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে পানের পিক ফেলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, কী হইছে? প্রশ্নটা সে আমাকেই করল। তার পরেও আমি বিস্মিত হবার মতো করে বললাম, আমাকে বলছেন?

'জে আপনারে, প্রবলেমটা কী?'

'কোনো প্রবলেম নেই। আমার হাতে একটা মানিব্যাগ আছে, এটাই প্রবলেম। মানিব্যাগভরতি পাঁচশো টাকার নোট। ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার টাকা হবার কথা। দেখবেন? এই যে নিন দেখুন।'

তারা মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল । দেখতে চাইল না। তার পরেও আমি ব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখিয়ে দিলাম। তারা আবারও মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল। আমার ব্যবহারে তারা মনে হলো খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমি মিষ্টি করে হাসলাম । তাদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মধুর গলায় বললাম, মানিব্যাগ নিতে চান?

কাক মানুষের হাত থেকে খাবার নিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যদি যত্ন করে থালায় খাবার বেড়ে ডাকা হয় আয় আয় তখন তারা আর কাছে আসে না। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। উড়ে চলেও যায় না, আবার কাছেও আসে না। যুবক দুটির মধ্যে কাকভাব প্রবল বলে মনে হলো । তারা সরুচোখে মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে । হাত বাড়াচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না। আমি আবারও বললাম, কী, মানিব্যাগ নিতে চান? নিতে চাইলে নেন।

পানমুখের যুবক আবারও পিক ফেলল। সে একটু চিন্তিতমুখে তার ওস্তাদের

দিকে তাকাচ্ছে । ওস্তাদের নির্দেশের অপেক্ষা । ওস্তাদ নির্দেশ দিচ্ছেন না। সময় নিচ্ছেন।

পরিস্থিতি তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না। চট করে ডিসিশান নেয়া যাচ্ছে না।

জায়গাটা নির্জন নয়। ঢাকা শহরে নির্জন জায়গা নেই। তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সে-জায়গাটায় এই মুহূর্তে লোক-চলাচল নেই। ওস্তাদ এবং শাগরেদ আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদের বা হাত প্যান্টের পকেটে। লোকটি সম্ভবত বায়া। এবং সে তার বা হাতে ক্ষুর ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষুর বের করবে। সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা ।

আমি হঠাৎ করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা শুরু করলাম। তারা একটু হকচকিয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল । ওস্তাদ বিশেষ ভঙ্গিতে কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদ প্রায় দৌড়ে আমার সামনে চলে এল। এখন আমরা তিনজন হাঁটছি। শাগরেদ সবার আগে, মাখখানে আমি এবং পেছনে ওস্তাদ । ওরা আমার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। সবচে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত কাজ হলো মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়া। অবিশ্যি এদের নানানরকম টেকনিক আছে। এরা কোন টেকনিক ফলো করছে কে জানে!

কাকরাইলের আশেপাশের রাস্তার একটা নিয়ম হলো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদল তবলিগ জামাতি কোত্থেকে যেন উদয় হয়। এখানেও তা-ই হলো । দশ-এগারো জনের একটা দল পোটলা-পুটলি, বদনা, ছাতা নিয়ে উপস্থিত। হাসিখুশি কাফেলা। তারা চলছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার পেছনের ওস্তাদের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ হতাশায় গেছে। নিচের ঠোঁট আরও নেমে গেছে। ভালো একটা শিকার পেয়েছিল । সেই শিকার হাসিমুখে তবলিগ জামাতিদের দলে ভিড়ে গেছে ।

তবলিগের দল কাকরাইল মসজিদের দিকে চলে গেল। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম। তা করলাম না। আমি রওনা হলাম চায়ের দোকানের দিকে। ওস্তাদ এবং শাগরেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। তারা চোখে-চোখে কিছু কথা বলল। দুজনই একসঙ্গে সিগারেট ধরাল। তারাও আসছে। আসুক। চা-টা একসঙ্গে খাই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মজাদার নাটকের ভেতর ঢুকে গেছি। ভালো লাগছে। নাটকের শেষটা রক্তারক্তি পর্যন্ত না গড়ালেই হয়।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম কাওছার মিয়া। এক মধ্যরাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল । কাওছার মিয়ার ধারণা সেই রাতে আমি তাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। মধ্যরাতের পরিচিতজনরা সাধরণত সন্ধ্যারাতে কেউ কাউকে চেনে না। কাওছার মিয়া চিনল । "আরে হিমু ভাইয়া, আফনে!" এই বলে যে-চিৎকার দিল তাতে নামাজ ভঙ্গ করে কাকরাইল মসজিদের মুসুল্লিদের ছুটে আসার কথা। তারা ছুটে এলেন না, তবে ওস্তাদ ও শাগরেদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। কাওছার মিয়া চায়ের দোকানের মালিক হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভীমভবানীর মতো । সে আদর করে কারও পিঠে থাবা দিলে সেই মানবসন্তানের মেরুদণ্ডের বেশকিছু হাড় খুলে পড়ে যাবার কথা ।

কাওছার মিয়া চিৎকার দিয়েই থামল না, দোকান ফেলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে গেল। যেন অনেকদিন পর শিষ্য তার গুরুর দেখা পেয়েছে। চরণধুলি না নেয়া

পর্যন্ত শিষ্য-গুরুর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ হবে না।

'আফনেরে যে আবার দেখমু ভাবি নাই। আল্লাহপাকের খাস রহমতে আফনেরে পাইছি। আছেন কেমুন হিমু ভাই।'

'ভালো ।'

'আফনে একটা বড়ই আচায্য মানুষ। অখন কন কেমনে আফনের খেদমত করি।'

'চা খাওয়াও । পয়সা কিন্তু দিতে পারব না।'

কাওছার হতভম্ব গলায় বলল, পয়সার কথা তুললেন এর থাইক্যা জুতা দিয়া দুই গালে দুইটা বাড়ি দিতেন।

আমি ওস্তাদ ও শাগরেদকে দেখিয়ে বললাম, আমার দুজন গেস্ট আছে। এদেরও চা দাও।

কাওছার মিয়া তার সবকটা দাঁত বের করে বলল, আর কী খাইবেন কন ।

'আর কিছু লাগবে না।'

'ছিরগেট? ছিরগেট আইন্যা দেই?'

'দাও।'

কাওছার মিয়া দোকানের ছেলেটাকে পান-সিগারেট আনতে পাঠাল । তিনশলা বেনসন। তিনটা মিষ্টি পান, জর্দা 'আলিদা'।

ওস্তাদ ও শাগরেদ পুরোপুরি থমকে গেল । তবে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখন তাদের চোখ আমার হাতে-ধরা মানিব্যাগের দিকে । আমি চায়ের কাপ তাদের দিকে বাড়িয়ে বললাম, ভাই, চা খান অনেকক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড।

ওস্তাদ বললেন, চা খাব না।

শাগরেদও সঙ্গে সঙ্গে বলল, চা খাব না।

কাওছার মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধতেছে, আর চা খাইবেন না! কন কী আফনে? আচায্য ঘটনা! ধরেন, চা নেন।

ওস্তাদ ও শাগরেদ দুজনেই শুকনোমুখে চায়ের কাপ তুলল। কাওছার মিয়া তার বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনাদের পরিচয়?

ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখ-চাওয়াচাউয়ি করছে। আমি তাদের পরিচয়দান থেকে রক্ষা করলাম। কাওছারকে বললাম, শোনো কাওছার মিয়া। আমি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। মানিব্যাগে টাকার পরিমাণ ভালোই, ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাজার তো বটেই। টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো!

কাওছারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে রে! আমি ওস্তাদ ও শাগরেদের দিকে তাকালাম । তারা মনে হচ্ছে দুঃখে কেঁদে ফেলবে। আমি তাদের দিকে মানিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, ভালো করে দেখুন তো কোনো ঠিকানা-লেখা কাগজ আছে কি না। আর টাকাটাও গুনে দেখুন। ঠিকানা পাওয়া গেলে চলুন দিয়ে আসি । এতগুলি টাকা একা একা নিয়ে যাওয়া ঠিক না। আমার নাম হিমু, আপনাদের পরিচয়টা কী?

ওস্তাদ বিড়বিড় করে বললেন, আমার নাম মোফাজ্জল। আর এ জহিরুল ।

'ঠিকানা পাওয়া গেছে?'

'টুকরা কাগজ অনেক আছে- কোনটা ঠিকানা কে জানে!'

'ঐ দেখে দেখে বের করে ফেলব। আপনাদের কাজ না থাকলে চলুন আমার সঙ্গে । কাজ আছে?'

'না।'

'তা হলে মানিব্যাগটা আপনার পকেটে রাখুন। আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আপনাদের পাওয়ায় আমার সুবিধাই হলো।'

মোফাজ্জল আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার চেয়েও বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। বিচিত্র হাসি, বিচিত্র হাসিতে কাটাকাটি ।

কাওছার উৎসাহের সঙ্গে বলল, টেকাটা আগে গনেন। কত টেকা?

জহিরুল টাকা গুনছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গুনছে। কাওছার বলল, আরেক দফা চা দিমু হিমু ভাই?

'দাও।'

'মোফাজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই আফনেরারে দিমু?'

জহিরুল টাকা গোনায় ব্যস্ত। সে কিছু বলল না। মোফাজ্জল উদাস গলায় বলল, দাও।

আমরা রাত দুটার দিকে ঝিকাতলার এক টিনের বাড়ির দরজায় প্রবল উৎসাহে কড়া নাড়তে লাগলাম। আমরা কড়া নাড়ছি বলা ঠিক হচ্ছে না। আমি কড়া নাড়ছি, বাকি দুজন চিমশামুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরা আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না, আবার সঙ্গে থাকার কোনো কারণও বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। পঞ্চাশ-ষাট হবে বয়স। মাথার চুল ধবধবে শাদা। ভদ্রলোক মনে হয় অসুস্থ। কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলছেন না। আমি বললাম, আপনার কি কোনো মানিব্যাগ হারিয়েছে?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, মানিব্যাগে অনেকগুলি টাকা ছিল। আমার ধারণা আপনারই মানিব্যাগ ।

ভদ্রলোক বাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় ডাকলেন, মীরা! মীরা!

মীরা বের হয়ে এল। আমি হিমু না হয়ে অন্য কেউ হলে তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রেমে পড়ে যেতাম কী মিষ্টি যে তার মুখ! মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গোসল করে চোখে কাজল দিয়ে এসেছে। সব রূপবতী মেয়ের চোখ বিষণ্ন হয়। এই মেয়ের চোখও বিষণ্ন ।

ভদ্রলোক বললেন, মা, তোকে আমি বলেছিলাম না টাকাটা পাওয়া যাবে? এখন বিশ্বাস হলো?

মীরা তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, ভালো আছেন?

মীরা ভুরু কুঁচকে ফেলল। আমি মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, মানিব্যাগ দিয়ে দিন। মোফাজ্জল কঠিন গলায় বলল, মানিব্যাগ যে উনাদের তার প্রমাণ কী?

আমি উদাস গলায় বললাম, প্রমাণ লাগবে না। মীরা,তুমি টাকাটা গুনে নাও ।

মীরার কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল। আমার মতো অভাজন তাকে তুমি করে বলবে তা সে মেনে নিতে পারছে না। মানিব্যাগ-সংক্রান্ত জটিলতা না থাকলে সে নিশ্চয়ই শুকনো গলায় বলত, আমাকে তুমি করে না বললে খুশি হবো ।

মোফাজ্জল অপ্রসন্ন মুখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এরকম অপ্রীতিকর

কাজ সে মনে হয় তার জীবনে আর করেনি। মোফাজ্জলের চেয়েও বেশি মন-খারাপ হয়েছে তার টেণ্ডুল জহিরুলের। জহিরুল মনে হয় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলবে।

ভদ্রলোক আবারও মীরাকে বললেন, বলেছিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, বিশ্বাস হলো? তুই তো কেঁদে অস্থির হলি । নে, টাকাটা গুনে দ্যাখ। সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা আছে।

মীরা বলল, গুনতে হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আহা, গুনে দ্যাখ-না!

আমি বললাম, মীরা, তুমি সাবধানে গুনতে থাকো। আমরা চললাম।

শুরুতেই তুমি বলয় মেয়েটা রেগে গেছে তাকে আবারও তুমি বলে আরও রাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মোফাজ্জল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, এতগুলো টাকা ফেরত পেয়েছে তার কোনো আলামত নাই । শালার দুনিয়া! লাথি মারি এমন দুনিয়ারে!

জহিরুল বলল, এক হাজার টাকা বখশিশ দিলেও তো একটা কথা ছিল কী বলেন ওস্তাদ । বখশিশ না দেওয়াটা অধর্ম হয়েছে।

আমি বললাম, বখশিশ পেলে কী করতেন?

জহিরুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করতাম-মাল খাইতাম । গত চাইরদিনে তিন আঙ্গুল পরিমাণ বাংলা খাইছি। তিন আঙ্গুল বাংলায় কী হয় কন। তিন আঙ্গুল মাল ইচ্ছা করলে একটা মশাও খাইতে পারে। মাল খাওয়া তো দূরের কথা, আজ সারাদিনে ভাতও খাই নাই। আপনার পিছে পিছে বেফিকির হাঁটতেছি । আইজ যত হাঁটা হাঁটছি একটা ফকিরও অত হাঁটা হাঁটে না ।

মোফাজ্জল বিরক্তমুখে বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী। হিমু ভাইয়া বিদায় দেন, আমরা এখন যাই ।

'যাবেন কোথায়?'

'জানি না কই যাব।'

'আমার সঙ্গে চলেন, মাল খাওয়াব।'

মোফাজ্জল সরু চোখে তাকিয়ে রইল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করা খুবই কষ্টকর। মোফাজ্জল আছে সেই কষ্টে ।

'কী, যাবেন?'

'সত্যি মাল খাওয়াবেন?'

'হু।'

'কী খাওয়াবেন- বাংলা?'

'বাংলা ইংরেজি জানি না, তবে খাওয়াব।'

'চলেন যাই ।'

মোফাজ্জল অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটছে। তবে জহিরুলের চোখ চকচক করছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জন্মই হয় শিষ্য হবার জন্যে। জহিরুল হলো সেই মানুষ এরা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করে না। এরা বাস করে বিশ্বাসের জগতে । যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে।

জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপনেরে আমার পছন্দ হয়েছে।

‘কেন?’

‘জানি না কেন ।’

‘মাল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি এইজন্যে?’

‘হইতে পারে। আপনের পকেটে সিগারেট আছে হিমু ভাই? একটা সিগারেট দেন ধরাই ।’

‘আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই, আবার সিগারেট!’

‘সত্যই আপনের পাঞ্জাবির পকেট নাই!’

পাঞ্জাবির পকেট যে নেই তা আমি দেখালাম। মোফাজ্জ্বল বলল, টাকাপয়সা কই রাখেন? পায়জামার সিক্রেট পকেটে?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমার কোনো সিক্রেট পকেট নেই। আমি সঙ্গে কখনো টাকাপয়সা রাখি না ।

মোফাজ্জল আবারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে চলে গেল। আগের অবস্থা, আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না । সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তবে জহিরুল আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

আমি তাদের নিয়ে বাদলদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এত রাতে কারোরই জেগে থাকার কথা না, কিন্তু আমি জানি তারা সবাই জেগে আছে।

আমার মন বলছে- প্রবলভাবেই বলছে। কিছু-কিছু সময় আমার ইনটিউশন খুব কাজ করে।

আমি বড় ফুপার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাদলের ত্রিসীমানায় থাকব না। নির্বিঘ্নে বাদলের বিয়ে হয়ে যাবে। এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাত আড়াইটায় দুই উটকো লোক নিয়ে উপস্থিত হলে ঘটনা কী ঘটবে কে জানে! বড় ফুপা ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবেন বলে মনে হয় না। তবে সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে তিনি ইতিমধ্যে বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছেন। কারণ আজ বৃহস্পতিবার। ফুপার মদ্যপান-দিবস। বোতল নিয়ে বসার জন্যে সুন্দর অজুহাতও আছে- ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। এই তো সেদিন ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, শীতের দিনে বিছানায় পিপি করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলত, মা, কে যেন পানি ফেলে দিয়েছে। সে আজ বিয়ে করে বউ আনতে যাচ্ছে। এ তো শুধু আনন্দের ঘটনা না, মহা আনন্দের ঘটনা। সেই আনন্দটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে সামান্য কয়েক ফোটা দিয়ে গলা ভেজানো।

বড় ফুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল এরাও ভাগ পাবে। মদ্যপায়ীরা মদের ব্যাপারে খুব দরাজদিল হয়। দশটা টাকা ধার চাইলে এরা দেবে না, কিন্তু তিন হাজার টাকা দামের বোতলের পুরোটা আনন্দের সঙ্গে অন্যকে খাইয়ে দেবে।

যা ভেবেছি তা-ই ।

বাড়ির সব বাতি জ্বলছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনন্দ উছলে পড়ছে। খোলা জানালায় সেই আনন্দ উছলে বের হয়ে আসছে। হাসির শব্দ হৈচৈয়ের শব্দ, ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ। আমি কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল। বড় ফুপু দরজা খুললেন। তার পরনে লাল বেনারসি, ইদানীংকার ফ্যাশানের মতো কপালে সিঁদুর। বড় ফুপু হাসিমুখে বললেন, কী রে হিমু, তুই এত দেরি করলি? তোর জন্যে বাদল এখনও না খেয়ে বসে আছে।

আমি হাসলাম । “দেরি করার অপরাধে খুবই লজ্জিত” এই টাইপের হাসি।

ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। বাদলের বিয়ে হয়ে গেল নাকি? বিয়ে বোধহয় না। মনে হচ্ছে গায়ে-হলুদ। ফুপুর কপালে হলুদ লেগে আছে।

'আশ্চর্য, একটা দিন সময়মতো আসবি না, আমি কি রোজই ছেলের বিয়ে দেব? গায়ে-হলুদের এমন জমজমাট অনুষ্ঠান- আর তুই নেই! বাদল অস্থির হয়ে আছে তোর জন্যে । ঝিম মেরে আছিস, ব্যাপার কী? কথা বলছিস না কেন?'

'তোমাকে আসলে চিনতেই পারিনি। এইজন্যেই চুপ করে ছিলাম। মাই গড, তোমাকে তো দারুণ লাগছে! কে বলবে তোমার ছেলের বিয়ে! মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে হয়নি।'

'পাম-দেয়া কথা বলবি না তো। দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

আমি গলা নিচু করে বললাম, ফুপু, আমার দুজন গেষ্ট আছে, ওদের নিয়ে আসব?

'ওরা কোথায়?'

'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে ঢুকতে দাও কি না-দাও জানি না তো!'

'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি দিনদিন চলে যাচ্ছে নাকি? আমার ছেলের বিয়েতে তুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি না তো কি পাড়ার লোকের বিয়েতে আসবি! আর তোর আক্কেলটাই-বা কীরকম রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কোন হিসাবে- ওরা নাজানি কী ভাবছে!'

'কিছুই ভাবছে না, আমি নিয়ে আসছি। ফুপা কি বাসায় আছেন?'

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? একটা অজুহাত পেয়েছে ছেলের বিয়ে- বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। বাড়ি ভরতি লোকজন। নাজানি কী ভাবছে।'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে ফুপু! শাড়ি কি কোনো নতুন কায়দায় পরেছ? মোটাটা অনেকটা ঢাকা পড়েছে!'

'সত্যি বলছিস?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি।'

'রিনাও বলছিল আমাকে নাকি স্লিম লাগছে। তুই কথা বলে সময় নষ্ট করিস না তো! তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, আমি খাবার গরম করছি।'

'বন্ধুরা কিছু খাবে না ফুপু, ওরা খেয়ে এসেছে। আমি বাদলের সঙ্গে খাব, ওরা ছাদে বসে ফুপার সঙ্গে গল্প করবে।'

ফুপা আমাকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। মাতালরা একটা পর্যায়ে যে-কোনো ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়। তার এখন সেই অবস্থা চলছে। ফুপার মনেই নেই যে তিনি আমাকে আসতে নিষেধ করেছেন।

'আরে হিমু! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! তোর কথাই ভাবছিলাম।'

'ফুপা, এরা হলো আমার দুই বন্ধু, একজন মোফাজ্জল, আর একজন জহিরুল ।'

ফুপা মধুর গলায় বললেন, তোমরা কেমন আছ? তুমি করে বললাম, কিছু মনে কোরো না আবার! হিমু হলো আমার ছেলের মতো, সেই হিসেবে তোমরাও আমার ছেলে। হা হা হা, দাঁড়িয়ে আছ কেন, খুব ঠাণ্ডা তো, এইজন্যেই দুফোঁটা হুইস্কি খাচ্ছি। তার উপর ছেলের বিয়ে- মহা আনন্দের ব্যাপার! মেয়ের বিয়ে হলে কষ্টের ব্যাপার হতো। মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের বিদায়। ছেলের বিয়ে মানে নতুন একটা মেয়ে প্রাপ্তি। এই উপলক্ষে সামান্য মদ্যপান করা যায়। ঠিক না?

জহিরুল বলল, এই দিন যদি মাল না খান খাবেন কবে!

'এই ব্যাপারটাই তো তোমাদের ফুপুকে বোঝাতে পারছিলাম না। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে মেয়েরা ধরেই নিয়েছে মদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পরিমিত মদ্যপান যে হার্টের কত বড় অষুধ তা এরা জানে না। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার লেখা— যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক অর্ধেক কমে যায়। তোমরা কি একটু খেয়ে দেখবে?'

মোফাজ্জল বলল, জি না, জি না। আপনি মুরুব্বি মানুষ।

'লজ্জা করবে না তো, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবে আমি একা একা বসে আছি। তোমরা আসায় তাও কথা বলার লোক পাচ্ছি। হিমু যা তো, দুটা গ্লাস এনে দে। বোতল আরেকটা লাগবে। আমার ঘরে চলে যা। বুকশেলফের তিন নম্বর তাকে বইগুলোর পেছনে একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল আছে। এইসব জিনিস একা খেয়ে কোনো আনন্দ নেই- তাই না তফাজ্জল?'

'স্যার, আমার নাম মোফাজ্জল।'

'স্যার বলছ কেন? আমি হিমুর ফুপা, তোমারও ফুপা । এই যে শুটকা ছেলেটা তারও ফুপা । তোমার নাম যেন কী?'

'জহিরুল।'

'শুটকা ছেলে বলায় রাগ করনি তো?'

'জি না।'

'তোমার ফুপুকে দেখার পর পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকেই আমার কাছে শুটকা মনে হয়। একবার কী হয়েছে শোনো। প্লেনে করে চিটাগাং যাচ্ছি- সে দেখি প্লেনের সিটে ঢোকে না। হাস্যকর ঘটনা। এয়ার হোস্টেস, আমি দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি । এখনও মনে করলে লজ্জায় মরে যাই।'

আমি নিচে চলে এলাম। মোফাজ্জল আর জহিরুলকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। তারা মনের সুখে ব্ল্যাক ডগ খেতে পারবে। ফুপা যত্ন করে মুখে তুলে তুলে খাওয়াবেন। বোতল শেষ হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিচিত্র সব জায়গা থেকে নতুন নতুন বোতল বের হবে। শেষের দিকে সিচুয়েশন আউট অভ হ্যান্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অবিশ্যি আছে। এক মাতাল হয় বিষণ্ন প্রকৃতির, দুই মাতাল হয় মিত্রভাবাপন্ন- তিন মাতাল সর্বদাই ভয়াবহ।

খাওয়া শেষ করে আমি বাদলের ঘরে গিয়ে বসেছি। বাদলের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রাখি। চোখেমুখে লজ্জিত একটা ভাব। বিবাহ নামক অপরাধ করতে যাচ্ছে এই কারণে সে যেন ছোট হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছেও খুব সুন্দর। বিয়ের আগে-আগে শুধু যে মেয়েরই সুন্দর হয়ে যায় তা না, ছেলেরাও সুন্দর হয়। আমি বদলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

'বাদল, তোকে খুব সুন্দর গায়ের রঙও তো মনে হয় খোলতাই হয়েছে।'

বাদল হাসিমুখে বলল, হলুদ দিয়ে ডলাডলি করে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে, রঙ তো খোলতাই হবেই।

'বিয়ে হচ্ছে যার সঙ্গে সেই মেয়েটার নাম কী?'

'পুরানা ধরনের নাম- আঁখি।'

'মেয়েটা কেমন?'

'জানি না কেমন । কথা হয়নি তো!'

‘খুব সুন্দর?’

‘সবাই তো তা-ই বলছে।’

‘তুই বলছিস না?’

বাদল লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল, আমি বলছি।

‘তোর খুব ভালো একটা দিনে বিয়ে হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর। অদ্ভুত!’

‘২২ ডিসেম্বর কি খুব শুভদিন হিমুদা?’

‘বৎসরের সবচেয়ে লম্বা রাতটা হলো ২২ ডিসেম্বরের রাত। তোরা দুজন গল্প করার জন্যে অনেক সময় পাবি। এই কারণেই শুভ।’

বাদল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আঁখির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারছি না! বোকার মতো হয়তো কিছু বলব, পরে সে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

‘করুক-না হাসাহাসি! তোর যা মনে আসে তুই বলবি । দুই-একটা কবিতা টবিতা মুখস্থ করে যা।’

‘কী কবিতা?’

‘প্রেমের কবিতা।’

‘প্রেমের তো অনেক কবিতা আছে, কোনটা মুখস্থ করব সেটা বলো।’

‘কোনটা বলব, আমার তো দুই-তিন লাইনের বেশি কোনো কবিতা মনে থাকে না।’

‘দুই-তিন লাইনই বলো। এক সেকেণ্ড দাঁড়াও- আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি- লিখে ফেলি।’

বাদল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলপয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে বসেছে। আমি কবিতা বলব, সে লিখে মুখস্থ করবে, বাসররাতে তার স্ত্রীকে শোনাবে। হাস্যকর একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কেন জানি হাস্যকর লাগছে না। বাদল বলল, কই, চুপ করে আছ কেন, বলো!

আমি বললাম, লিখে ফ্যাল-

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না।
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুই জনে...
এভাবে হয়, এমন ভাবে হয়।

বাদল বলল, এটা কার কবিতা, তোমার?

‘পাগল হয়েছিস? আমি কবিতা লিখি নাকি? এই কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।’

‘কতদিন পর তোমাকে দেখছি, কী যে অদ্ভুত লাগছে!’

‘অদ্ভুত লাগছে?’

‘হু, লাগছে। আঁখির সঙ্গে বেশি গল্প হবে তোমাকে নিয়ে।’

‘ওকে নিয়ে আবার খালিপায়ে হাঁটতে বের হবি না তো?’

‘অবশ্যই বের হব। আমি পরব হলুদ পাঞ্জাবি, ওকে পরাব হলুদ শাড়ি। তারপর...’

‘তারপর কী?’

'সেটা বলতে পারব না, লজ্জা লাগছে। হিমুদা শোনো, তোমার জন্যে আমি খুব সুন্দর একটা গিফট এনেছি। আন্দাজ করো তো কী?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'একটা খুব দামি স্লিপিংব্যাগ নিয়ে এসেছি। তুমি তো যেখানে-সেখানে রাত কাটাও- ব্যাগটা থাকলে সুবিধা- ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়বে। স্লিপিংব্যাগের কালার তোমার পছন্দ হবে না। মেরুন কালার। অনেক খুঁজেছি- হলুদ পাইনি।'

বাদল স্লিপিংব্যাগ নিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে- অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে।

'হিমুদা, পছন্দ হয়েছে?'
'খুব পছন্দ হয়েছে।'
'ব্যাগটা থাকায় তোমার খুব সুবিধা হবে। ধরো তুমি জঙ্গলে জোছনা দেখতে গিয়েছ। অনেক রাত পর্যন্ত জোছনা দেখলে-ঘুম পেয়ে গেলে কোনো-একটা গাছের নিচে ব্যাগ রেখে তার ভেতর ঢুকে গেলে।'
'আমারও ইচ্ছে করছে। হিমুদা চলো, কাছেপিছের কোনো-একটা জঙ্গলে চলে যাই– জয়দেবপুরের শালবনে গেলে কেমন হয়?'
'বিয়ের আগে তোর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর তুই আর আঁখি, হিমু ও হিমি...'
আমি বাক্যটা শেষ করার আগেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ফুপু ঢুকলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খরখরে গলায় বললেন, তুই কাদের বাসায় নিয়ে এসেছিস? বাঁদর দুটোকে জোগাড় করেছিস কোথায়?
আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন, ওরা কী করেছে?
'দুটোই তো ন্যাংটো হয়ে ছাদে নাচানাচি করছে! তোর ফুপাও নাচছে।'
'বল কী!'
'তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে এদের নিয়ে বিদেয় হবি।'
আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বগলে বাদলের আনা মেরুন রঙের স্লিপিংব্যাগ ।
ফুটপাতে যারা ঘুমায় দেখা যাচ্ছে তাদের কিছু নীতিমালা আছে। তারা জায়গা-বদল করে না। ঘুমুবার জায়গা সবার যে নিউ মার্কেটের পাশে ঘুমায় সে যদি সন্ধ্যাবেলায় বাসাবোতে থাকে- সেও হেঁটে হেঁটে নিউ মার্কেটের পাশে এসে নিজের জায়গায় ঘুমুবে।
কাজেই বস্তা-ভাইকে খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধা হলো না। দেখা গেল সাত দিন আগে তারা যেখানে ঘুমুচ্ছিল এখনও সেখানেই ঘুমুচ্ছে। পিতা এবং পুত্র চটের ভেতরে ঢুকে আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম। বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের বয়স খুবই কম। চার-পাঁচ বছর হবে। কাঁচা ঘুম ভাঙায় সে খুবই ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে । আমি বললাম, এই গাবলু, তোর নাম কী?
গাবলু জবাব দিল না। বাবার কাছে সরে এল। বাবা বিরক্তমুখে বলল, আফনের কী বিষয়? চান কী?
আমি হাসিমুখে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি হচ্ছি আপনাদের সহনিদ্রক। একসঙ্গে ঘুমালাম- মনে নেই? শেষরাতে জ্বর উঠে গেল। আপনি রিকশা ডেকে- আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিলেন।
'মনে আছে। আফনে চান কী?'
'কিছু চাই না। আপনাদের সঙ্গে ঘুমাব-অনুমতি চাচ্ছি।'
'অনুমতির কী আছে? গভমেন্টের জায়গা। ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলে ঘুমাইবে।'
আমি তাদের পাশে আমার স্লিপিংব্যাগ বিছালাম। পিতা এবং পুত্র দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ব্যাগের জিপার খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই জিনিসটার নাম স্লিপিংব্যাগ। এর অনেক

সুবিধা-ভেতরে ঢুকে জিপার লাগিয়ে দিলে শীত লাগবে না, মশা কামড়াবে না। বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে না। চোর এসে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে না। চোর যদি নিতে চায় আমাকে সুদ্ধ নিতে হবে।

বস্তা-ভাই তার বিস্ময় সামলাতে পারল না। ক্ষীণস্বরে বলল, এই জিনিসটার দাম কীরকম ভাইজান?

আমি ঘুম-ঘুম গলায় বললাম, জানি না। বলেই জিপার লাগিয়ে দিলাম। স্লিপিংব্যাগটা আমি আসলে এনেছি এই দুজনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবার জন্যে। হিমুরা স্লিপিংব্যাগ নিয়ে পথে হাঁটে না। আমি ঠিক করেছি বাকি রাতটা স্লিপিংব্যাগে ঘুমুব। সকালে ব্যাগ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর পিতা এবং পুত্রকে ব্যাগটা উপহার দিয়ে চলে যাব। আহা, এই দুজন আরাম করে ঘুমাক । ছেলেটার চেহারা খুব মায়াকাড়া। কী নাম ছেলেটার? আচ্ছা, নামটা সকালে জানলেও হবে। এখন ভালো ঘুম পাচ্ছে। সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে বাদলদের বাড়ি থেকে মোফাজ্জল এবং জহিরুলকে নিয়ে আসা হয়নি। এরা এতক্ষণে কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনের আনন্দে ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়লেই হয়।

স্লিপিংব্যাগটা আসলেই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। !

'ভাইজান ও ভাইজান!'

'কী?'

'আমার ছেলে আফনের এই জিনিসটা একটু হাত দিয়া ছুইয়া দেখতে চায়।'

'উহু, ময়লা হবে। হাত যেন না দেয়।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'ছেলের নাম কী?'

'সুলায়মান।'

'ছেলের মা কোথায়?'

'সেইটা ভাইজান এক বিরাট হিস্টুরি।'

'থাক বাদ দিন, বিরাট হিস্টুরি শোনার ইচ্ছা নেই, ঘুম পাচ্ছে।'

'ভাইজান!'

'হু।'

'জিনিসটার ভিতরে কি দুইজন শোয়া যায়?'

'তা যায়। বড় করে বানানো।'

'বালিশ আছে?'

'না, বালিশ নেই। বালিশের দরকার হয় না।'

'যদি কিছু মনে না নেন ভাইজান, সুলেমান জিনিসটার ভিতরে কী, একটু দেখতে চায়। তার খুব শখ হইছে।'

আমি ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। পিতা এবং পুত্রের কাছে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলাম। তারা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হতভম্ব দৃষ্টি দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হলো। হিমুদের চোখে পানি আসতে নেই- আমি ওদের পেছনে ফেলে দ্রুত হাটছি। রাস্তার শেষ মাথায় এসে একবার পেছনে ফিরলাম। পিতা-পুত্র দুজনই ব্যাগের ভেতর ঢুকেছে। দুজনই মাথা বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কে জানে তারা কী ভাবছে।

ঘুম ভেঙেই দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে বাদল বসে আছে। আমি চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাতসকালে বাদলের আমার পাশে বসে থাকার কথা না । আজ ২৩ ডিসেম্বর। কাল রাতে তার বিয়ে হয়েছে। বউ ফেলে ভোরবেলাতেই সে আমার কাছে চলে আসবে কেন? চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক।

আমি থাকি আগামসি লেনের একটা মেসে। মেসের ঠিকানা বাদল জানে না। শুধু বাদল কেন, আমার পরিচিত কেউই জানে না। বাদলকে সেই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হয়েছে। সেটা তেমন জটিল কিছু না- আগে যে মেসে ছিলাম সেই মেসের ম্যানেজার নিতাই কুণ্ডু বর্তমান মেসের ঠিকানা জানেন। তাকে বলা হয়েছে আমার ঠিকানা কাউকে দেবেন না- তার পরেও ভদ্রলোক দিয়েছেন। বাদল নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে বা করেছে যে ঠিকানা না দিয়ে ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। খুব সম্ভব কেঁদে ফেলেছে। বাদল খুব সহজে কাঁদতে পারে।

একবার মেসে ঢুকে পড়ার পর আমার ঘরে ঢোকা অবিশ্যি খুবই সহজ। আমি দরজা এবং জানালা সব খোলা রেখে ঘুমাই। হিমুকে তা-ই করতে হয়। আমার বাবা আমার জন্যে যে-উপদেশনামা লিখে রেখে গেছেন তার সপ্তম উপদেশ হচ্ছে-

> "নিদ্রা ও জাগরণের যে বাধাধরা নিয়ম আছে, যেমন দিবসে জাগরণ নিশাকালে নিদ্রা- এসব নিয়ম মানিয়া চলার কোনো আবশ্যকতা নাই । কোনোরকম বন্ধনে নিজেকে বাঁধিও না। খোলা মাঠ বা প্রান্তরে নিদ্রা দিতে চেষ্টা করিবে । কোনো প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলে সেই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা সবই খুলিয়া রাখিবে যেন নিদ্রাকালে খোলা প্রান্তরের সহিত তোমার নিদ্রাকক্ষের যোগ সাধিত হয়।
>
> নিদ্রাকালে তস্কর বা ডাকাত আসিয়া তোমার মালামাল নিয়া পলায়ন করিবে এই চিন্তা মাথায় রাখিও না, কারণ তস্কর আকর্ষণ করিবার মতো কিছু তোমার কখনোই থাকিবে না। যদি থাকে তবে তাহা তস্কর কর্তৃক নিয়া যাওয়াই শ্রেয় ।"

বাবার উপদেশ আমি অনেকদিন থেকেই মেনে চলছি। খোলা প্রান্তরে শোয়া সম্ভব হচ্ছে না— দরজা-জানালা-খোলা ঘরে ঘুমুচ্ছি। তস্করের হাতে পড়েছি তিনবার। প্রথমবার সে একটা দামি জিনিসই নিয়ে গেছে- ওয়াকম্যান। সনি কোম্পানির ওয়াকম্যান আমাকে উপহার দিয়েছিল রূপা। রূপার উপহার দেয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর। গিফট-র্যাপে মুড়ে লাল রিবনের ফুল লাগিয়ে বিরাট শিল্পকর্ম। রূপা গিফট আমার হাতে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার।

আমি বললাম, আজ তো আমার জন্মদিন না।

সে নিজের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তোমার কবে জন্মদিন সেটা তো আমি জানি না, তুমি আমাকে বলবেও না। কাজেই আমি ধরে নিলাম আজই

জন্মদিন ।

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা না, বলো থ্যাংক য়্যু। উপহার পেলে ধন্যবাদ দেয়া সাধারণ ভদ্রতা। মহাপুরুষরা ভদ্রতা করেন না, তা তো না।'

'ধন্যবাদ। কী আছে এর মধ্যে?'

'একটা ওয়াকম্যান। তুমি তো পথে-পথেই ঘুরে বেড়াও । মাঝে মাঝে এটা কানে দিয়ে ঘুরবে। আমার পছন্দের তেরোটা গান আমি রেকর্ড করে দিয়েছি।'

'আবারও ধন্যবাদ।'

আমি খুব যত্ন করে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় রূপার উপহার সাজিয়ে রাখলাম। সাজিয়ে রাখা পর্যন্তই। ব্যাটারির অভাবে গান শোনা গেল না। রূপা মূল যন্ত্র দিয়েছে, ব্যাটারি দেয়নি। আমারও কেনা হয়নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা শুধুশুধু কানে দিয়ে বসে থাকতাম। কানের ফুটো বন্ধ থাকার জন্যই বোধহয় শোঁশোঁ শব্দ হতো। সেই শব্দও কম ইন্টারেস্টিং ছিল না। যা-ই হোক, একরাতে চোর (বাবার ভাষায়- তস্কর) এসে আমাকে ব্যাটারি কেনার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাল।

দ্বিতীয় দফায় তস্কর এসে আমার স্যান্ডেলজোড়া নিয়ে গেল। হিমুর স্যান্ডেল থাকার কথা না- খালিপায়ে হাঁটাহাটি করার কথা। তার পরও একজোড়া চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছিলাম। দাম নিয়েছিল দুশো তেত্রিশ টাকা। সাতদিনের মাথায় স্যান্ডেল চলে গেল ।

তৃতীয় দফায় চোরের হাতে আমার বিছানার চাদর এবং বালিশ চলে গেল। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর কী করে বিছানার চাদর এবং বালিশ নিয়ে গেল সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি ।

চোর-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কিছু নেই- আমার সামনে জটিল সমস্যা বসে আছে– বাদল। আমি চট করে দ্বিতীয়বার তাকে দেখে নিলাম । তার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। রাতে একফোঁটাও ঘুমায়নি তাও বোঝা যাচ্ছে। চোখের নিচে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে। আনন্দময়নিশি-জাগরণে চোখের নিচে কালি পড়ে না। কাজেই গতরাতটা তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তা হলে কি তার বিয়ে হয়নি?

আমি চোখ বন্ধ রেখেই বললাম, বাদল, তোর বিয়েটা কি কোনো কারণে ভেঙে গেছে?

বাদল বলল, হু।

'চা খাবি?'

'হু।'

'নিচে চলে যা। রাস্তা পার হলেই দেখবি তোলা উনুনে বাচ্চা এক ছেলে চা বানাচ্ছে। ওর নাম মফিজ। মফিজকে বলে আয়, দুকাপ চা পাঠাতে।'

'আমার বিয়েটা যে ভেঙে যাবে সেটা কি তুমি আগে থেকেই জানতে?'

'আগে থেকে জানব কীভাবে? আমি কি পীর-ফকির নাকি?'

'আমার মনে হয় তুমি জানতে। জানতে বলেই বরযাত্রী হিসেবে তুমি বিয়েতে যাওনি।'

'বরযাত্রী হিসেবে যাইনি, কারণ আমাকে ফুপা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি- তা হলে তুমি বুঝলে কী করে যে আমার বিয়ে

হয়নি।’

‘তোর চেহারা দেখে বুঝেছি। মানুষের সমগ্র অতীত তার চেহারায় লেখা থাকে। যারা সেই লেখা পড়তে পারে তারা মানুষকে দেখেই হুড়হুড় করে অতীত বলে দিতে পারে।’

‘তুমি পার?’

‘বেশি পারি না- সামান্য পারি। যা, চার কথা বলে আয় ।’

বাদল উঠে দাঁড়াল। বাদলের চেহারা খুব সুন্দর। আজ এই সকালের আলোতে তাকে আরও সুন্দর লাগছে। ক্রিম কালারের এই শার্টটা তাকে খুব মানিয়েছে। যদি বিয়েটা হতো তা হলে ভোরবেলায় বাদলকে দেখে আঁখি মেয়েটার মন ভালো হয়ে যেত। যতই মেয়েটা বাদলের কাছাকাছি যেত ততই সে বাদলকে পছন্দ করত। আমার ফুপা এবং ফুপুর চরিত্রের ভালো যা আছে তাঁর সবই আছে বাদলের মধ্যে। ফুপা এবং ফুপুর অন্ধকার দিকের কিছুই বাদল পায়নি। বাদলের জন্যে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও হিমুর মন-খারাপ হতে নেই। বাবার উপদেশনামার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে-

> “জগতের কর্মকাণ্ড চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া যাইবে। কোনোক্রমেই বিচলিত হইবে না। আনন্দে বিচলিত হইবে না, দুঃখেও বিচলিত হইবে না। সুখ দুঃখ এইসব নিতান্তই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারবে না।”

মুশকিল হচ্ছে, জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বোঝার জন্যে কোনোরকম ব্যস্ততা এখনও তৈরি হয়নি। আমার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়া আমাকে বড়ই বিচলিত করে।

মফিজ আমার জন্য যে-চা বানায় তার নাম- ইসপিসাল, ডাবলপাত্তি। এই চায়ের বিশেষত্ব হচ্ছে ঘন লিকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর চিনি। ইসপিসাল চা কাপে করে আসে না-প্রমাণ সাইজের গ্লাসভরতি হয়ে আসে। এক গ্লাস ইসপিসাল ডাবলপাত্তি খেলে সকালের নাশতা খেতে হয় না।

বাদল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। আমি বললাম, সিগারেট খাবি?

‘না, সিগারেট তো খাই না।’

‘চা খেতে খেতেই ঘটনা কী বল।’

‘ঘটনা বলে কী হবে?’

‘তা হলে ভোররাতে এসেছিস কেন?

বাদল চুপ করে রইল। আমি বললাম, কিছু বলতে ইচ্ছে না করলে বলতে হবে না। চা খেয়ে চলে যা ।

‘দেখি একটা সিগারেট দাও, খাই।’

আমি সিগারেট দিলাম। বাদল সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে প্রফেশনালদের মতো টানছে। নাকে-মুখে ভোঁসভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

‘হিমুদা!’

‘বল।’

‘বলার মতো কোনো ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা তো

সবাই গেলাম- পনেরোটা গাড়ি, দুটো মাইক্রোবাসে প্রায় একশোজন বরযাত্রী। আগে থেকে কথা হয়ে আছে রাত আটটায় কাজি চলে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। কাবিনের অ্যামাউন্ট নিয়ে যেন ঝামেলা না হয় সেজন্যে সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা। পাচ লক্ষ এক টাকা কাবিন ।

কাজি চলে এল আটটার আগেই । উকিলবাবা কবুল পড়িয়ে মেয়ের সই নিতে যাবে-মেয়ের বাবা বললেন, একটু সবুর করুন। নয়টা বেজে গেল। মেয়েপক্ষরা হঠাৎ বলল, আপনাদেরও খাওয়া হয়ে হয়ে যাক। দুই-তিন ব্যাচে খাওয়া হবে, সময় লাগবে। তখন বাবা বললেন, বিয়ে হোক, তারপর খাওয়া। বিয়ের আগে কিসের খাওয়া! মেয়ের মামা বললেন, একটু সমস্যা আছে। সামান্য দেরি হবে।

কী ব্যাপার তারা কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল তা হলো- মেয়ের নাকি সকালবেলায় তার মা'র সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। মেয়ে রাগ করে তার কোনো-এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। সেখান থেকে টেলিফোন করেছিল, বলেছে চলে আসবে। কোথায় আছে তা কেউ জানে না বলে তাকে আনার জন্যেও কেউ যেতে পারছে না।

বাবা রাগ করে বললেন, মেয়ে কি তার প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? এই কথায় মেয়ের মামা খুব রাগ করে বললেন, এসব নোংরা কথা কী বলছেন? আমাদের মেয়ে সেরকম না। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। টেলিফোনে কথা হয়েছে। চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন।

আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাসায় এসেও বিরাট লজ্জায় পড়লাম। বাবা বাসায় ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। বর-কনে আসবে, ব্যান্ড বাজা শুরু হবে। আমাদের ফেরত আসতে দেখে ব্যান্ড বাজা শুরু হলো। উদ্দাম বাজনা । পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করছিল..."

'কী ইচ্ছা করছিল?'

বাদল চুপ করে গেল। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় চোখের পানি সামলাচ্ছে। আমি বললাম, তুই আমার কাছে এসেছিস কেন?

'এমনি এসেছি। মনটা ভালো করার জন্যে এসেছি।'

'মন ভালো হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে চল আমার সঙ্গে, হাঁটাহাটি করবি। হাঁটাহাটি করলে মন ভালো হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি।'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো ।

'চিড়িয়াখানায় যাবি?'

'চিড়িয়াখানায় যাব কেন?'

'জীবজন্তু দেখলে মন দ্রুত ভালো হয়। চল বাঁদরের খাঁচার সামনে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি দেখে আসি। তারপর চল হাতির পিঠে চড়ি। পারহেড দশ টাকা নিয়ে ওরা হাতির পিঠে চড়ায়। তোর কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে। আমরা মিরপুর পর্যন্ত কি হেঁটে যাব?'

'অবশ্যই! ভালো কথা— তোর "হতে পারত শ্বশুরবাড়ি" টেলিফোন নাম্বার কি

তোর কাছে আছে? টেলিফোন করে দেখতাম আঁখি বাসায় ফিরেছে কি না। একটা মেয়ে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে- সে ফিরেছে না সেটা জানা আমাদের দায়িত্ব না? আছে টেলিফোন নাম্বার?

'হু।'

'তুই ওদের টেলিফোন নাম্বার পকেটে নিয়ে ঘুরছিস কেন?'

'পকেটে করে ঘুরছি না- তোমার এখানে আসা যখন ঠিক করেছি তখন মনে হয়েছে তুমি ওদের টেলিফোন নাম্বার চাইতে পার, তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছিস।'

'তুমি কি সত্যি মিরপুর পর্যন্ত হেঁটে যাবে?'

'হু। ঘণ্টা দুএক লাগবে- এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম। মনে হচ্ছে আজকের দিনটি হবে আমার জন্যে কর্মব্যস্ত একটি দিন ।

পথে নেমেই শুনি কোকিল ডাকছে। তার মানে কী? শীতকালে কোকিল ডাকছে কেন?

'বাদল।'

'হু।'

'কোকিল ডাকছে শুনছিস।'

'হু।'

'ব্রেইন-ডিফেক্ট কোকিল— অসময়ে ডাকাডাকি করছে।'

'হু।'

'তুই কি ঠিক করেছিস হুর বেশি কিছু বলবি না?'

'কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'কোকিল সম্পর্কে একটা তথ্য শুনবি?'

'বলো।'

'কোকিলের গলা কিন্তু এমিতে খুব কর্কশ। সে মধুর গলায় তার সঙ্গীকে ডাকে মেটিং সিজনে। তখনই কোকিল-কণ্ঠ শুনে আমরা মুগ্ধ হই।'

'ভালো।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'পথে হাঁটার নিয়ম জানিস?'

'হাঁটার আবার নিয়ম কী, হাঁটলেই হলো।'

'সবকিছুর যেমন নিয়ম আছে- হাঁটারও নিয়ম আছে। হাঁটতে হয় একা একা। বল তো কেন?'

'জানি না।'

দুজন বা তারচেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে হাঁটলে কথা বলতে হয়। কথা বলা মানেই হাঁটার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করা। হাঁটার প্রথম শর্ত হচ্ছে- নিঃশব্দে হাঁটা।

'হু।'

'হাঁটার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাঁটার সময় চারদিকে কী হচ্ছে দেখা, কিন্তু গভীরভাবে দেখার চেষ্টা না করা । ইংরেজিতে 'Glance'— চট করে তাকানো, 'Look' না।'

'হু।'

হাঁটার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পথে কোথাও থামা চলবে না। কাজেই তুই চট করে দাঁড়িয়ে পড়বি না।'

'আচ্ছা ।'

'পেছনদিকে তাকানো চলবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, বাদল, তুই হাঁটার চতুর্থ শর্ত ভঙ্গ করছিস ।

'চতুর্থ শর্তটা কী?'

'তুই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিস। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা চলবে না।

'ও আচ্ছা ।'

'তোর হাঁটতে কষ্ট হলে রিকশা নিয়ে নিই।'

'কষ্ট হচ্ছে না ।'

'আচ্ছা, তুই একটা প্রশ্নের জবাব দে। খুব সহজ প্রশ্ন। রিকশাওয়ালাদের রিকশায় প্যাডেল চাপাতে হয় । এই কাজটা করার জন্যে তাদের সবচে ভালো পোশাক হচ্ছে ফুলপ্যান্ট কিংবা পায়জামা । পুরানো কাপড়ের দোকানে সস্তায় ফুলপ্যান্ট পাওয়া যায়। রিকশাওয়ালারা কিন্তু কেউই ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরে না। তারা সবসময় পরে লুঙ্গি । এখন বল, কেন? খুব সহজ ধাধা।'

'জানি না কেন । ধাঁধা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে?'

'কোনোকিছু নিয়েই ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'চোখের কতকগুলি প্রতিশব্দ বল তো! প্রথমটা আমি বলে দিচ্ছি- আঁখি ।'

'বললাম তো হিমুদা, ধাঁধার খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না।'

আহা আয়-না একটু খেলি! বল দেখি চোখ, আঁখি...তারপর?'

'চোখ, আঁখি, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন...'

'গুড, ভালোই তো বলেছিস!'

'হিমুদা, খিদে লেগে গেছে।'

'খিদে ব্যাপারটা কেমন ইন্টরেস্টিং দেখেছিস- তোর যত ঝামেলা, যত সমস্যাই থাকুক, খিদের সমস্যা সবসময় সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'ফিলসফি করবে না। ফিলসফি ভালো লাগছে না।'

'খিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিস।'

'না।'

'খুব সহজ উপায়। বাহাত্তুর ঘণ্টা কিচ্ছু না-খেয়ে থাকা- পানি পর্যন্ত না। বাহাত্তুর ঘণ্টার পর এক চামুচ বা দুচামুচ পানি খাওয়া যেতে পারে। বাহাত্তুর ঘণ্টা পার করার পর দেখবি খিদেবোধ নেই- শরীরে ফুরফুরে ভাব। মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে আপনা-আপনি বাজনা বেজে ওঠে । আলোর দিকে তাকালে নানান রঙ দেখা যায়- তিনকোণা কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন রঙ দেখা যায় তেমন রঙ।'

'তুমি দেখেছ?'

'হু।'

‘কতদিন না-খেয়ে ছিলে?’

‘বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা, বাহাত্তুর ঘণ্টা ছিলাম।’

‘বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা তোমাকে কে বলল?’

‘বাবা বলেছিলেন। আমার গুরু হচ্ছেন আমার পিতা। মহাপুরুষ বানাবার কারিগর। তোর কি খিদে বেশি লেগেছে?’

‘হু।’

‘কী খেতে ইচ্ছে করছে?’

‘যা খেতে ইচ্ছে করছে তা-ই খাওয়াবে?’

‘আমি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, তুই যা খেতে চাইবি– মন্ত্র পড়ে তা-ই এনে দেব?’

‘তুমি ম্যাজিশিয়ান তো বটেই- অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। অন্যরা কেউ জানে না, আমি জানি । আমার বাসি পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে।’

‘বাসি পোলাও মানে?’

‘গতরাতে রান্না করা হয়েছে। বেঁচে গেছে, ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই বাসি পোলাওয়ের সঙ্গে গরম-গরম ডিমভাজা ।’

‘খুব উপাদেয় খাবার?’

‘উপাদেয় কি না জানি না। একবার খেয়েছিলাম, সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। মাঝে মাঝে আমার এই খাবারটা খেতে ইচ্ছা করে। বাসি পোলাও তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি চাইলে পাবে।’

‘আমি চাইলে পাব কেন?’

‘কারণ তুমি হচ্ছ মহাপুরুষ।’

মহাপুরুষরা বুঝি চাইলেই বাসি পোলাও পায়?’

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, আয় লাক ট্রাই করতে করতে যাই । রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার ভেতর ঢুকে যাই। সব বাড়ির সামনে দাঁড়াব। কলিংবেল টিপব- বাড়ির মালিক বের হলে বলব, আমরা একটা সার্ভে করছি। সকালবেলা কোন বাড়িতে কি নাশতা হয় তার সার্ভে। ইনকাম গ্রুপ এবং নাশতার প্রোফাইল।

‘কী যে তুমি বল!’

‘আরে আয় দেখি !’

‘তুমি কি সত্যি সিরিয়াস।’

‘অবশ্যই সিরিয়াস। তবে সার্ভের কথা বলে শুধুহাতে উপস্থিত হওয়া চলবে না। কাগজ লাগবে, বলপয়েন্ট লাগবে। ‘তুই বলপয়েন্ট আর কাগজ কিনে দে।’

‘আমার ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা।’

‘ভয়ের কিছু নেই, আয় তো!’

প্রথম যে-বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম সেই বাড়ির নাম উত্তরায়ণ। বেশ জমকালো বাড়ি। গেটে দারোয়ান আছে। গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়ির মালিকের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ি মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

আমি বললাম, আমরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো থেকে এসেছি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার ।

‘আপনার নাম?’

‘হিমু।’

‘কার্ড দেন।’

‘আমার সঙ্গে কার্ড নেই। আমরা ছোট কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে তো কার্ড থাকে না। আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন। বলবেন স্ট্রাটিসটিক্যাল ব্যুরো।’

দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা। শেষে হয়তো পুলিশে দিয়ে দেবে। মারধোর করবে।’

‘ভয়ের কিছু নেই।’

‘তোমার খালি পা। খালি পা দেখেই সন্দেহ করবে।’

মানুষ চট করে পায়ের দিকে তাকায় না। তাকায় মুখের দিকে। তা ছাড়া আমাদের ভেতরে নিয়ে বসাবে। তখন খালিপায়ে বসলে ভাববে স্যান্ডেল বাইরে খুলে এসেছি।’

‘তোমার মারাত্মক বুদ্ধি হিমুদা।’

‘তোর মন-স্যাতসেঁতে ভাবটা কি এখন দূর হয়েছে?’

‘হু।’

‘একটা উত্তেজনার মধ্যে তোকে ফেলে দিয়েছি যাতে আঁখি মেয়েটির চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি পাস।’

দারোয়ান এসে বলল, যান, ভিতরে যাইতে বলছে।

আমরা রওনা হলাম। বাদল ভালো ভয় পেয়েছে। তার চোখেমুখে ঘাম। তবে সে আঁখির হাত থেকে এখন মুক্ত।

আমদের বসালো ড্রয়িংরুমের পাশে ছোট একটা ঘরে। এটা বোধহয় গুরুত্বহীন মানুষদের বসার জন্যে ঘর। দেশ থেকে লোক আসবে- এখানে বসবে। বিল নিতে আসবে, বসবে এই খুপরিতে।

এক ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ঢুকলেন। বয়স্ক লোক। সকালবেলায় হঠাৎ-যন্ত্রণায় তিনি বিরক্ত। বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

‘আপনাদের ব্যাপারটা কী?’

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছি। সমীক্ষাটা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষদের ব্রেকফাষ্টের প্রোফাইল ।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের প্রোফাইল?

‘কোন পরিবারে কী ধরনের নাশতা খাওয়া হয় এর উপর একটা জেনারেল স্টাডি । আজ আপনাদের বাসায় কী নাশতা হয়েছে, আপনি কী খেয়েছেন?’

‘সকালে তো আমি নাশতাই খাই না। একটা টোষ্ট খাই আর এক কাপ কফি খাই ।’

আমি গম্ভীর মুখে কাগজে লিখলাম— টোষ্ট, কফি ।

‘কফি কি ব্ল্যাক কফি?’

‘না, ব্ল্যাক কফি না, দুধ-কফি।’

‘বাড়িতে নিশ্চয়ই অন্য সবার জন্যে কোনো-একটা নাশতা তৈরি হয়েছে, সেটা কী?’

‘দাঁড়ান, আমার ভাগ্নিকে পাঠাই। ও বলতে পারবে। এই জাতীয় স্টাডির কথা প্রথম শুনলাম। যেসব স্টাডি হবার সেসব হচ্ছে না— নাশতা নিয়ে গবেষণা!’

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-মেয়েটি ঢুকল সে মীরা। গভীর

রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগ এই মেয়েটির হাতেই দিয়েছি। তবে এমন জমকালো বাড়িতে নয়। মেয়েটি আমাকে চিনতে পারল না। সেও ভদ্রলোকের মতোই বিরক্তমুখে বলল, আজ এ-বাড়িতে কোনো নাশতা হয়নি। গতরাতে বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। বড়মামার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে পোলাও রান্না হয়েছে। অনেক পোলাও বেঁচে গেছে। ডীপ ফ্রিজে রাখা ছিল। সকালে সে-পোলাও গরম করে দেয়া হয়েছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, আমরা দুজন কি সেই বাসি পোলাও খেয়ে দেখতে পারি? পোলাওয়ের সঙ্গে ডিমভাজা ।

বাদল চোখমুখ শুকনো করে ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

আমি বললাম, তারপর মীরা, তুমি ভালো আছ?

মীরা এখনও তাকিয়ে আছে।

'আমাকে চিনতে পারছ তো? ঐ যে তোমাকে টাকা দিয়ে এলাম সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা?'

মীরা পুরো হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা হতচকিত অবস্থা থেকে চট করে উঠে আসতে পারে। মীরা পারছে না। মেয়েটি মনে হয় সহজ-সরল জীবনে বাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তেমন যোগ নেই তার জীবনে হকচকিয়ে যাবার ঘটনা তেমন ঘটেনি।

'মীরা, আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'হু।'

'ভেরি গুড! আমাদের নাশতা দিয়ে দাও। খেয়ে চলে যাই । স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব ধাপ্পাবাজি। আমরা আসলে নাশতা খেতে এসেছি।'

'ও আচ্ছা ।'

আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, নাশতা একজনের জন্যে আনবে, শুধু বাদলের জন্যে । আমি একবেলা খাই । বাদলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই। পিএইচ.ডি. করার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছে। জায়গাটা কোথায় রে বাদল?'

বাদল মাথা নিচু করে ছিল। সে মাথা নিচু করে ক্ষীণস্বরে বলল, কানাডা।

অপরিচিত মানুষের সামনে বাদল একেবারেই সহজ হতে পারে না। মেয়েদের সামনে তো নয়ই। বিশেষ করে মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তা হলে বাদলের জিহবা জড়িয়ে যায়। তোতলামি শুরু হয়। রাতে মীরা মেয়েটাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল দিনে তারচেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে।

ভেতর থেকে ভারি গলায় কে যেন ডাকল— মীরা মীরা!

মনে হয় শুরুতে যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই ডাকছেন । সকালে কী নাশতা হয় তার তালিকা দিতে মীরার এত দেরি হবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। আমি আসছি।

বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল হয়ে আছে। বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে, বিয়ে হলে বাদল তো মনে হয় সারাক্ষণ কান লাল করে বসে থাকত। পার্মানেন্ট তোতলা হয়ে যেত। কেমন আছিসরে বাদল? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত- ভা ভা ভা ল ।

‘হিমুদা।’
‘হু।’
‘এই মেয়েটাকে তুমি চেন?’
‘হু।’
‘আশ্চর্য তো!’
‘আশ্চর্যের কী আছে! সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে না?’
‘সেইজন্যে আশ্চর্য বলছি না। অন্য কারণে আশ্চর্য বলছি।’
‘কী কারণ?’
‘বাসি পোলাও খেতে চেয়েছি- তুমি এই বাড়িতে নিয়ে এলে। এই বাড়িতে আজই বাসি পোলাও নাশতা।’
‘একে বলে কাকতালীয় যোগাযোগ।’
‘কাকতালীয় না- এর নাম হিমুতালীয়। তোমার যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তা আমি গোড়া থেকেই জানি- তবে ক্ষমতাটা যে এত প্রবল তা জানতাম না।’
‘আমিও জানতাম না।’
‘হিমুদা!’
‘হু?’
‘তুমি কাউকে দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ বলতে পার?’
‘আমার নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারি-অন্যেরটা পারি না ।’
‘তোমার ভবিষ্যৎ কী?’
‘বলা যাবে না।’
‘হিমুদা।’
‘হু?’
‘তুমি কি জানতে এ-বাড়িতে আজ নাশতা হচ্ছে বাসি পোলাও?’
‘জানতাম না ।’
মীরা ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রে ভরতি খাবার। মীরার পেছনে একটা কাজের মেয়েতার হাতেও ট্রে। শুধু যে বাসি পোলাও এসেছে তা না, পরোটা এসেছে, গোশত এসেছে। ছোট ছোট গ্লাসে কমলার রস । মীরা বলল, আপনারা চা খাবেন, না কফি খাবেন?
আমি বাদলকে বললাম, কী খাবি বল ।
বাদল বলল, ক ক কফি ।
বাদলকে তোতলামিতে ধরে ফেলেছে।
মীরা আমার সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে নিজেকে তৈরি করে এসেছে। কী কী বলবে সব ঠিক করা। নাশতা নিয়ে ঢোকার আগে সে নিশ্চয়ই মনেমনে রিহার্সেল দিয়েও এসেছে। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উনি হিমুদা বলে ডাকছিলেন।
‘আমার নাম হিমু।’
‘ঐ রাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি। আসলে আমি আর বাবা আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম টাকাটা কখনো পাওয়া যাবে না । বাবা অবিশ্যি বারবারই বলছিলেন টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। তবে এটা ছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কথার কথা। আপনি যখন সত্যি সত্যি মানিব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন

আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আপনি যেমন হুট করে উপস্থিত হলেন তেমনি হুট করে চলেও গেলেন। তখন বাবা খুব হৈচৈ শুরু করলেন, মানুষটা গেল কোথায়, মানুষটা গেল কোথায়? বাবা খুব অল্পতে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তার ব্লাডপ্রেশারও বেড়ে যায়। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে রাত আড়াইটার সময় ঘর থেকে বের হলেন।

'বল কী!'

'আমার বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তার সঙ্গে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। উনি রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আপনাদের খুঁজে বেড়ালেন। আমি একা একা ভয়ে অস্থির।'

'একা, কারণ আমাদের সংসারে দুজনই মানুষ। আমি আর আমার বাবা। যা-ই হোক, বাবা বাসায় ফিরেই বললেন, মীরা শোন, আমি নিশ্চিত টাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা মানুষ না, অন্যকিছু।'

'আমি বললাম, অন্যকিছু মানে?'

'বাবা বললেন, অন্যকিছুটা কী আমি নিজেও জানি না। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষ যেমন বাস করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবরাও বাস করে। তাদের কেউ এসেছিলেন। বাবা এমনভাবে বললেন, যে, আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। সেই কারণেই আপনাকে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। বাবার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আজ কি যেতে পারবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

'বাঁদর দেখার জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। হাতির পিঠে চড়তে। এ জার্নি বাই এলিফ্যান্ট-টাইপ ব্যাপার। আঁখি নামের একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে । ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, কাল আসুন।'

'দেখি পারি কি না ।'

'আপনি আমার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। একটা ভুল ধারণা তার মনে ঢুকে গেছে। এটা বের করা উচিত।'

আমি হাসিমুখে বললাম, কোনটা ভুল ধারণা, কোনটা শুদ্ধ ধারণা সেটা চট করে বলাও কিন্তু মুশকিল। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আপেক্ষিক।

'আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না যে আপনি মানুষ না, অন্যকিছু?'

আমি আবারও হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত-করা হাসি। তবে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেক চালাক, যত বিভ্রান্তির হাসিই কেউ হাসুক মেয়েরা বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া পরিবেশের একটা ব্যাপারও আছে। বিভ্রান্ত হবার জন্যে পরিবেশও লাগে। আমি যদি রাত দুটায় হঠাৎ করে মীরাদের বাসায় উপস্থিত হই এবং এই কথাগুলি বলি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সে বিভ্রান্ত হবে।

এখন ঝলমলে দিনের আলো। আমাদের নাশতা দেয়া হয়েছে। কফি পটভরতি । কফির পট থেকে গরম ধোয়া উড়ছে। এই সময় বিভ্রান্তি থাকে না।

বাদল মাথা নিচু করে বাসি পোলাও খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসি পোলাও-এর মতো বেহেশতি খানা সে এই জীবনে প্রথম খাচ্ছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বাঁদরদের বাদাম খাওয়ালাম । তাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখলাম। তারপর হাতির পিঠে চড়লাম। দশ টাকা করে টিকিট। তারপর গেলাম শিম্পাঞ্জি দেখতে। শিম্পঞ্জি দেখে তেমন মজা পাওয়া গেল না। কারন তাঁর অবস্থা বাদলের মতো। খুবই বিমর্ষ। আমরা একটা কলা ছুড়ে দিলাম- সে ফিরেও তাকাল না। বাঁদরগোত্রীয় প্রাণী অথচ কলার প্রতি আগ্রহ নেই- এই প্রথম দেখলাম। বাদলকে বললাম, চল জিরাফ দেখি ।

বাদল শুকনো গলায় বলল, জিরাফ দেখে কী হবে!

‘জিরাফের লম্বা গলা দেখে যদি তোর মনটা ভালো হয়।’

‘আমার মন ভালো হবে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।’

‘যা, চলে যা । আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা সব পশুপাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে- ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।’

‘কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে আমি এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।’

‘তা হলে যা, বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দে।’

‘তুমি আঁখিকে টেলিফোন করবে না?’

‘করব।’

‘এখন করো। চিড়িয়াখানায় কার্ডফোন আছে। আমার কাছে কার্ড আছে।

‘তুই কি ফোন-কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এ-পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ক’বার টেলিফোন করেসিস?’

‘দুবার।’

‘তোর সঙ্গে কথা বলেনি?’

‘না।’

‘তোর সঙ্গেই কথা বলেনি, আমার সঙ্গে কি আর বলবে?’

‘তোমার সঙ্গে বলবে- কারণ তুমি হচ্ছ হিমু।’

‘টেলিফোন করে কী বলব?’

বাদল চুপ করে রইল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুই নিশ্চয়ই চাস না- কেমন আছ, ভালো আছি-টাইপ কথা বলে রিসিভার রেখে দি? মেয়েটাকে আমি কী বলব সেটা বলে দে।

‘তোমার যা ইচ্ছা তা-ই বলো।’

‘আমি কি বলব- আঁখি শোনো, মগবাজার কাজি অফিস চেন? এক কাজ করো- রিকশা করে কাজি অফিসে চলে আসো। আমি বাদলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো সমস্যা নেই।’

বাদল মাথা নিচু করে ফেলল। মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি আসতে বললে আঁখি চলে আসবে।

‘তোর তা-ই ধারণা?’

‘হাঁ।’

‘তুই কিন্তু ভালোই বোকা।’

‘আমি বোকা হই যা-ই হই তুমি হচ্ছ হিমু। তুমি যা বলবে তা-ই হবে।’

'আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক-আমি আঁখিকে আস্তে বলি বলব?'

বাদল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বলো।

বেশ কয়েকবার টেলিফোন করা হলো। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরছে না। বাদল শুকনোমুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। মায়া লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি পদেপদে মায়াকে তুচ্ছ করতে হয়।

@@

কোনো ভদ্রলোকের যদি বিয়ের দুবছরের মাথায় সন্তানপ্রসবজনিত জটিলতায় স্ত্রীবিয়োগ হয়, তিনি যদি আর বিয়ে না করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সন্তানকে বড় করার জটিল কাজে তখন তার ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার মূল কারণ অপরাধবোধ। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন। সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রী মারা যেত না। সন্তানের জন্মের জন্যে তার ভূমিকা আছে এই তথ্য তার মাথায় ঢুকে যায়। মাতৃহারা সন্তানকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তার নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তিনি সংসারে বেঁচে থাকেন অপরাধীর মতো। যতই দিন যায় তার আচার, আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি ততই অসংলগ্ন হতে থাকে। স্ত্রী জীবিত অবস্থায় তাকে যতটা ভালোবাসতেন, মৃত্যুর পর তারচে অনেক বেশি ভালোবাসতে শুরু করেন। সেই ভালোবাসাটা চলে যায় অসুস্থ পর্যায়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখে আমার তা-ই মনে হলো । মীরার বাবার নাম আশরাফুজ্জামান। একসময় কলেজে শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দেন। এটাই স্বাভাবিক। অস্থিরতায় আক্রান্ত একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারে না। বাকি জীবনে তিনি অনেককিছু করার চেষ্টা করেছেন- ইনসিউরেন্স কোম্পানির কাজ, ট্র্যাভেলিং এজেন্সির চাকরি থেকে ইনডেনটিং ব্যবসা, টুকটাক ব্যবসা সবই করা হয়েছে। এখন কিছু করছেন না। পৈতৃক বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুটিমাত্র মানুষ থাকায় তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের প্রচুর অবসর। এই অবসরের সবটাই কাটাচ্ছেন মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি উদ্ভাবনে। ভদ্রলোক খুব রোগা। বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা-হারানো ভাব। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে মাথায় কাচাপাকা চুল থাকার কথা। তার মাথার সব চুলই পাকা । ধবধবে সাদা চুলে ভদ্রলোকের মধ্যে ঋষি-ঋষি ভাব চলে এসেছে। তার গলার স্বর খুব মিষ্টি। কথা বলার সময় একটু ঝুঁকে কাছে আসেন। তার হাত খুবই সরু। মৃত মানুষের হাতের মতো— বিবর্ণ। কথা বলার সময় গায়ে হাত দেয়ার অভ্যাসও তার আছে। তিনি যতবারই গায়ে হাত দিয়েছেন, আমি ততবারই চমকে উঠেছি।

'আপনার নাম হিমু?'

'জি ।'

'মানিব্যাগ নিয়ে রাতে আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার চেহারা একরকম

ছিল— এখন অন্যরকম।'

আমি বললাম, তাজমহল দিনের একেক আলোয় একেক রকম দেখা যায়— মানুষ তো তাজমহলের চেয়েও অনেক উন্নত শিল্পকর্ম, মানুষের চেহারাও বদলানোার কথা।

'আমার ধারণা ছিল, আপনি মানুষ না।'

'এখন কী ধারণা, আমি মানুষ?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব সরুচোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখমুখে একধরনের অস্বস্তি। মনে হচ্ছে তিনি আমার ব্যা ব্যাপারে এখনও সংশয়মুক্ত না। আমি হাসিমুখে বললাম, একদিন দিনের বেলা এসে আপনাকে দেখাব- রোদে দাঁড়ালে আমার ছায়া পড়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব নিচুগলায় বললেন, মানুষ না, কিন্তু মানুষের মতো জীবদেরও ছায়া পড়ে।

'তা-ই নাকি?'

'জি। এরা মানুষদের মধ্যেই বাস করে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি অনেককিছু জানি, কিন্তু কাউকে মন খুলে বলতে পারি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না- পাগল ভাববে। মীরাকেও আমি তেমনকিছু বলি না।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছেন?'

'জি না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় আমি অসুস্থ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'মীরার ধারনা আমি অসুস্থ । যতই দিন যাচ্ছে ততই তার ধারণা প্রবল হচ্ছে। অথচ আমি জানি আমি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। আমার অস্বাভাবিকতা বলতে এইটুকু যে মীরার মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়।

'তা-ই বুঝি?'

'জি। মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। আমি খুবই আপসেট হয়ে বাসায় এসেছি। আমি মোটামুটিভাবে দরিদ্র মানুষ- এতগুলি টাকা! মীরাকে খবরটা দিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছি- তখন মীরার মা'র সঙ্গে আমার কথা হলো। সে বলল, তুমি মনখারাপ কোরো না, টাকা আজ রাতেই ফেরত পাবে। আমি মীরাকে বললাম, সে হেসেই উড়িয়ে দিল ।

'হেসে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি। টাকা তো সেই রাতেই ফেরত পেয়েছিলেন। তা-ই না?'

'জি। মীরার মা সারাজীবন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এখনও করছে?'

'ওনার নাম কী?'

'ইয়াসমিন।'

'উনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন, না প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাকে আনতে হয় ।'

তিনি নিচুগলায় বললেন শুরুতে প্লানচেট আনতাম। এখন নিজেই আসে। যা বলার সরাসরি বলে।'

‘তাকে চোখে দেখতে পান?’

‘সবসময় পাইনা- হঠাৎ হঠাৎ দেখা পাই। আপনি বোধহয় আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছেন না। অবিশ্বাসের একটা হাসি আপনার ঠোঁটে।’

‘আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করছি। আমি তো মিসির আলি না যে সব কথা অবিশ্বাস করব। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।’

‘মিসির আলি কে?’

‘আছেন একজন। তার মূলমন্ত্র হচ্ছে তর্কে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে বহুদূর । তার ধারণা— জীবনটা অঙ্কের মতো। একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হবে। কখনো তিন হবে না ।’

‘তিন কি হয়?’

‘অবশ্যই হয়- আপনার বেলায় তো হয়ে গেল। আপনি এবং মীরা- এক এক দুই হবার কথা। আপনার বেলায় হচ্ছে তিন । মীরার মা কোত্থেকে যেন উপস্থিত হচ্ছেন।’

‘আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন । চা খাবেন?’

‘চা কে বানাবে, মীরা তো বাসায় নেই।’

‘চা আমিই বানাব। ঘর-সংসারের কাজ সব আমিই করি। চা বানানো, রান্না- সব করতে পারি। মোগলাই ডিশও পারি।’

‘আপনার কোনো কাজের লোক নেই?’

‘না।’

‘নেই কেন? মীরার মা পছন্দ করেন না?’

‘জি না। আপনি ঠিক ধরেছেন।’

‘কোনো কাজের মানুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েকে বড় করতে আপনার কোনো সমস্যা হয়নি?’

‘সমস্যা তো হয়েছেই। তবে ইয়াসমিন আমাকে সাহায্য করেছে। যেমন ধরুন মেয়ে রাতে কাথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ঘুমে অচেতন। ইয়াসমিন আমাকে ডেকে তুলে বলবে- মেয়ে ভেজা কাথায় শুয়ে আছে।’

‘বাহ, ভালো তো।’

‘মীরার একবার খুব অসুখ হলো। কিছু খেতে পারে না, যা খায় বমি করে ফেলে দেয়- শরীরে প্রবল জ্বর। ডাক্তাররা কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, জ্বর সারছে না। তখন ইয়াসমিন এসে বলল, তুমি মেয়েকে অষুধ খাওয়ানো বন্ধ করো। কাগজিলেবুর শরবত ছাড়া কিছু খাওয়াবে না।’

‘আপনি তা-ই করলেন?’

‘প্রথম দিকে করতে চাইনি ভরসা পাচ্ছিলাম না- কারণ মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। এরকম একজন রোগীর অষুধপত্র বন্ধ করে দেয়াটা কঠিন কাজ ।’

‘অর্থাৎ আপনি আপনার স্ত্রীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি?’

‘জি করেছি কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। মেয়ের অবস্থা আরও যখন খারাপ হলো তখন প্রায় মরিয়া হয়েই ওষুধপত্র বন্ধ করে লেবুর শরবত খাওয়াতে শুরু করলাম। দুদিনের মাথায় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।’

‘এরকম ভূত-ডাক্তার ঘরে থাকাতো খুব ভালো।’

'দয়া করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো রসিকতা করবেন না। আমি এমিতেই রসিকতা পছন্দ করি না। স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করি না। চা খাবেন কি না তা তো বলেননি।'

'চা খাব।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চা আনতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। পুরো রাত আমার সামনে পড়ে আছে। আশরাফুজ্জামান সাহেব চা বানাতে থাকুন, আর আমি বসে বসে গুছিয়ে ফেলি রাতে কী কী করব। অনেকগুলি কাজ জমে আছে।

ক) আখি নামের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ করতে হবে। টেলিফোন করলেই ওপাশ থেকে পোঁ-পোঁ শব্দ হয়। বাদল কি টেলিফোন নাম্বার ভুল এনেছে?

খ) বড় ফুপু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় আঁখিসংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ করতে চান ।

গ) এক পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে— নাম ময়লা-বাবা । সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন। তার সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

ঘ) মিসির আলি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা। উনি কথা বলবেন কি না কে জানে! যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত না করলে উনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই ধরনের মানুষরা যুক্তির বাইরে পা দেন না। তারা জানেন অ্যান্টিলজিক হচ্ছে লজিকেরই উলটো পিঠ ।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনার চা নিন। চায়ে আপনি ক'চামচ চিনি খান?'

'যে যত চামচ দেয় তত চামচই খাই। আমার কোনোকিছুতেই কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই।'

'আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি।'

'খুব ভালো করেছেন। এবং চা অসাধারণ হয়েছে— গরম মশল্লা দিয়েছেন নাকি?'

সামান্য দিয়েছি- এক দানা এলাচ, এক চিমটি জাফরান। ফ্লেভারের জন্যে দেয়া।'

'খুব ভালো করেছেন।'

'আমার স্ত্রী চা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে রেখে দিত। মাঝে মাঝে চায়ে সামান্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে দিত। অসাধারণ টেষ্ট । কমলালেবুর শুকানো খোসা আমার কাছে আছে, একদিন আপনাকে খাওয়াব।'

'জি আচ্ছ। একটা কথা-আপনার স্ত্রী কি এই বাড়িতেই থাকেন, মানে ভূত হবার পর আপনার সঙ্গেই আছেন ?'

'ইয়াসমিন প্রসঙ্গে ভূত-প্রেত এই জাতীয় শব্দ দয়া করে ব্যবহার করবেন না।'

'জি আচ্ছ, করব না। উনি কি এখন আশেপাশেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার উপস্থিতি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কথা বললে সে শুনবে । সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে কি না তা তো জানি না! । সে মীরার সঙ্গেই কথা বলে না । মীরা তার নিজের মেয়ে।'

'আমি আপনার স্ত্রীকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কীভাবে বলব? বাতি নিভিয়ে বলতে হবে?'

'বাতি নেভাতে হবে না। যা বলার বলুন, সে শুনবে।'

'সম্বোধন করব কী বলে? ভাবি ডাকব?'

'হিমু সাহেব, আপনি পুরো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক না। আমার স্ত্রীকে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার কাছ থেকে জবাব এনে দিচ্ছি।'

'চা শেষ করে নিই। চা খেতে খেতে যদি ওনার সঙ্গে কথা বলি, উনি হয়তো এটাকে বেয়াদবি হিসেবে নেবেন।'

'আবারও রসিকতা করছেন?'

'আর করব না।'

আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমার ভালো নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। সবাই এখন আমাকে এই নামে চেনে। আমাকে বলা হয়েছে মীরার মৃতা মা এই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। আমি এর আগে কোনো মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলিনি। আমি জানি না তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। আমার কথাবার্তায় যদি কোনো বেয়াদবি প্রকাশ পায়- দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি। আমি একরাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কী দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা কি আপনি বলতে পারবেন?

কথা শেষ করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবও চুপচাপ বসে আছেন। তার চোখ বন্ধ। মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মানুষের মতো তিনি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন। তার ঘুম ভাঙাবার জন্য আমি শব্দ করে কাশলাম। তিনি চোখ মেললেন না, তবে নড়েচড়ে বসলেন । আমি বললাম, উনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?

'পেয়েছে।'

'উত্তরে কী বললেন?'

'সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চায় না।'

'আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। মীরকে বলে আমি এসেছিলাম।'

'আরেকটু বসুন, মীরা চলে আসবে। তার বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছে। বলে গেছে আটটার মধ্যে চলে আসবে । আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আজ মীরা আসতে অনেক দেরি করবে- বারোটা-একটা বেজে পারে। কাজেই অপেক্ষা করা অর্থহীন।

আশরাফুজ্জামান সাহেব ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, দেরি করবে বলছেন কেন?

'আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে। একধরনের ইনটিউশন। আমার ইনটিউশন ক্ষমতা প্রবল।'

ভদ্রলোক অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলেছেন আমি বিশ্বাস করেছি। আমার কথা আপনি

বিশ্বাস করছেন না কেন?

'মীরা কখনো রাত আটটার পর বাইরে থাকে না । আমার এখানে টেলিফোন নেই। দেরি হলে টেলিফোনে খবর দিয়ে সে আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বলেই কখনো দেরি করবে না। আপনি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। কমলালেবুর খোসা দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দি, খেয়ে দেখুন।'

'অন্য সময় এসে খেয়ে যাব। আমার খুব কিছু জরুরি কাজ আছে, আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।'

আমি রাস্তায় নামলাম ।

প্রথমে যাব বড় ফুপুর কাছে। ছেলের বিয়েভাঙার শোক তিনি সামলে উঠেছে কি না কে জানে। মেয়ের বিয়েভাঙার শোক সামলানো যায় না, ছেলের বিয়েভাঙার শোক ক্ষণস্থায়ী হয়। এইসব ক্ষেত্রে ছেলের মা একটু বোধহয় খুশিও হন— ছেলে আর কিছুদিন রইল তার ডানার নিচে । ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবারও কিছু নেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। ছেলেদের বিয়ের বয়স পার হয় না।

বড় ফুপু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তার মাথার নিচে অয়েলক্লথ। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। বিভ্রান্ত হবার মতো কোনো দৃশ্য না। যারা বড় ফুপুর সঙ্গে পরিচিত তারা জানে, মাথায় পানি ঢালা তার হবিবিশেষ। তিনি খুব আপসেট, মাথায় পানি ঢেলে তাকে ঠিক করা হচ্ছে এটা তিনি মাঝেমধ্যেই প্রমাণ করতে চান। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ফুপু, কী খবর?

ফুপু ক্ষীণস্বরে বললেন, কে?

এটাও তার অভিনয়ের একটা অংশ। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তার অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

'মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে, ব্যাপার কী ফুপু?'

'তুই কিছু জানিস না? আমাদের সবার কাপড় তো খুলে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে!'

'কে?'

'বাদলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাত এগারোটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে মেয়ে দেয়নি।'

'ও, এই ব্যাপার!'

বড় ফুপু ঝপাং করে উঠে বসলেন। যে পানি ঢালছিল তার হাতের এইম নষ্ট হওয়ায় পানি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। বড় ফুপু হুংকার দিয়ে বললেন, এটা সামান্য ব্যাপার? তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার?

'ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেয়ে মা'র সঙ্গে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে, এখন করা যাবে কী? আজকালকার মেয়ে, এরা কথায়-কথায় মা'দের সঙ্গে রাগ করে।'

'মেয়ে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে এই গাঁজাখুরি গল্প তুই বিশ্বাস করতে বলিস? তুই ঘাস খাস বলে আমিও ঘাস খাই! মেয়েকে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে?'

'তা-ই নাকি?'

'অবশ্যই তা-ই।'

'শুধু শুধু লুকিয়ে রাখবে কেন?'

'সেটা তুই জেনে দে।'

'আমি কীভাবে জানব?'

'তুই ওদের বাসায় যাবি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি, ব্যাপার কী সব জেনে আসবি। মেয়ের বাবাকে বলবি ঝেড়ে কাশতে । আমি সব জানতে চাই।'

'জেনে লাভ কী?'

'লাভ আছে। আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব যে তিন জন্মে ভুলবে না।'

'শিক্ষা দিয়ে কী হবে, তুমি তো আর স্কুল খুলে বসনি।'

'তোর গা-জ্বালা কথা আমার সঙ্গে বলবি না। তোকে যা করতে বলছি করবি। এক্ষুনি চলে যা।'

'ওদের গোপন কথা ওরা আমাকেই-বা শুধু শুধু বলবে কেন?'

'তুই ভুজুংভাজুং দিয়ে মানুষকে ভোলাতে পারিস। ওদের কাছ থেকে খবর বের করে আন, তারপর দেখ আমি কী করি।'

'করবেটা কী?'

'মানহানির মামলা করব । আমি সাদেককে বলে দিয়েছি- এর মধ্যে মনে হয় করা হয়েও গেছে। মেয়ের বাপ আর মামাটাকে জেলে ঢোকাব। তার আগে আমার সামনে এসে দুজনে দাঁড়াবে। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে।'

'তোমার বেয়াই তোমার সামনে কানে ধরে উঠবোস করবে এটা কি ঠিক হবে? বিবাহ-সম্পর্কিত আত্মীয় অনেক বড় আত্মীয়।'

'তারা আমার আত্মীয় হলো কখন?'

'হয়নি, হবে।'

'হিমু, তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?'

'না, ফাজলামি করছি না- কোনো-একটা সমস্যায় বিয়ে হয়নি, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বিয়ে হতে আপত্তি কী? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে পড়ে আছে।'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে, কী বলছিস তুই! যে-মেয়ে লাথি দিয়ে তাকে নর্দমায় ফেলে দিল, যে তাকে ন্যাংটো করে দিল এতমানুষের সামনে, তার কাছে-'

'যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'বাদল যদি কোনোদিন ঐ মেয়ের নাম মুখে আনে তাকে আমি জুতাপেটা করব। জুতিয়ে আমি তার রস নামিয়ে দেব।'

'জুতাপেটা করেও লাভ হবে না ফুপু। আমি বরং দেখি জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যায় কি না । বাদল আঁখির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে- যোগাযোগ করে দেখি।'

'বাদল তোকে ঐ মেয়ের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'দুধকলা দিয়ে আমি তো দেখি কালসাপ পুষেছি!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। যে-মেয়ে তোমাদের সবাইকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে তার জন্যে এত ব্যাকুলতা! তার টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছোটাছুটি।'

বড় ফুপুর রাগ চরমে উঠে গিয়েছিল। তিনি বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে রাগ সামলালেন । থমথমে গলায় বললেন, হিমু শোন। বাদল যদি এ মেয়ের কথা মুখে আনে তাকে আমরা ত্যাজ্যপুত্র করব। এই কথাটা তাকে তুই বলবি।'

'এক্ষুনি বলছি।'

‘বাদল বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে। তুই বসে থাক, বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাবি না।’

‘আচ্ছা যাব না। বাদল গেছে কোথায়?’

‘জানি না।’

‘আঁখিদের বাসায় চলে যায়নি তো?’

বড় ফুপু রক্তচক্ষু করে তাকাচ্ছেন। এইবার বোধহয় তার ব্লাডপ্রেসার সত্যি সত্যি চড়েছে। অকারণে মানুষের চোখ এমন লাল হয় না।

‘ফুপু তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানিটানি দেয়া হোক। আমি বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাচ্ছি না। ফুপা কোথায়?’

‘আর কোথায়, ছাদে।’

আমি ছাদের দিকে রওনা হলাম। আজ বুধবার— ফুপার মদ্যপান-দিবস। তার ছাদে থাকারই কথা। ফুপু অয়েলক্লথে মাথা রেখে আবার শুয়েছেন। বিপুল উৎসাহে তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

ফুপা ছাদেই আছেন।

তাকে যেন আনন্দিত বলেই মনে হলো। জিনিস মনে হয় পেটে পড়েছে। এবং ভালো ডোজেই পড়েছে। তাঁর চোখেমুখে উদাস এবং শান্তি-শান্তি ভাব।

‘কে, হিমু?’

‘জি।’

‘আছিস কেমন হিমু?’

‘জি ভালো।’

‘কেমন ভালো— বেশি, কম, না মিডিয়াম?’

‘মিডিয়াম ।’

‘আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।’

‘কেন।’

‘বাদলের বিয়েতে তো তুই যাসনি। বিরাট অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছিস । তারা বিয়ে দেয়নি। মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।’

‘বলেন কী?’

‘বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে। মেয়ে নাকি রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যার বিয়ে সে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি যাবে।’

‘আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।’

‘এটা তুই অবিশ্যি ঠিক বলেছিস । আমাদের সময় আর বর্তমান সময় এক না। সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঘরে-ঘরে এখন ভিসিআর, ডিশ অ্যান্টেনা । এইসব দেখেশুনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের ড্রামা করা শিখে যাচ্ছে। বিয়ের দিন রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে যাওয়া সেই ড্রামারই একটা অংশ। ভালো বলেছিস হিমু। well said.এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা আসলেই রাগ করে বান্ধবীর বাড়িতে গেছে।’

‘ছেলের বিয়ে হয়নি বলে আপনারা লজ্জার মধ্যে পড়েছেন । ওদের লজ্জা তো আরও বেশি । মেয়ের বিয়ে হলো না।’

‘অবশ্যই, অবশ্যই। ভাগ্যিস মুসলমান পরিবারের মেয়ে! হিন্দু মেয়ে হলে তো দুপড়া হয়ে যেত! এই মেয়ের আর বিয়েই হতো না। হিমু, ছেলেরা হচ্ছে হাসের

মতো, গায়ে পানি লাগে না। আর মেয়েরা হচ্ছে মুরগির মতো, একফোঁটা পানিও ওদের গায়ে লেপটে যায়। আঁখি মেয়েটার জন্যে খুবই মায়া হচ্ছে হিমু।'

'মায়া হওয়াই স্বাভাবিক।'

'ঐদিন অবিশ্যি খুবই রাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম মানহানির মামলা করব।'

'আপনার মতো মানুষ মানহানির মামলা কীভাবে করে! আপনি তো গ্রামের মামলাবাজ মোড়ল না। আপনি হচ্ছেন হৃদয়বান একজন মানুষ।'

'ভালো কথা বলেছিস হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাঁটি বলেছিস। গাড়ি করে যখন আমি শেরাটন হোটেলের কাছে ফুলওয়ালি মেয়েগুলি ফুল নিয়ে আসে ধমক দিতে পারি না। কিনে ফেলি। ফুল নিয়ে আমি করব কী বল। তোর ফুপুকে যদি দিই সে রেগে যাবে, ভাববে আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে। কাজেই নর্দমায় ফেলে দি। একবার তোর ফুপুকে ফুল দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ঢং কর কেন?'

'তা-ই নাকি?'

'এইসব দুঃখের কথা বলে কী হবে! বাদ দে।'

'জি আচ্ছা, বাদ দিচ্ছি।'

'তোর দুই বন্ধু এখনও আসছে না কেন বল তো?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ওদের কি আসার কথা নাকি?

'আসার কথা তো বটেই। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রতি বুধবারে আসতে বলেছি। ভেরি গুড কোম্পানি। ওরা যে আমাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে সেটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ফুপু বলছিলেন ওরা নাকি ন্যাংটা হয়ে ছাদে নাচানাচি করছিল।'

ফুপা গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোর ফুপু বিন্দুতে সিন্ধু দেখে- কাশির শব্দ শুনে ভাবে যক্ষ্মা। ঐ রাতে কিছুই হয়নি। বেচারাদের গরম লাগছিল- আমি বললাম, শার্ট খুলে ফ্যালো। গরমে কষ্ট করার মানে কী! ওরা শার্ট খুলেছে। আমিও খুলছি, ব্যস?

'ও আচ্ছা।'

'হিমু, তোর বন্ধু দুজন দেরি করছে কেন? এইসব জিনিস একা একা খাওয়া যায় না। খেতে খেতে মন খুলে কথা না বললে ভালো লাগে না। দুধ একা খাওয়া যায়, কিন্তু ড্রিংকসে বন্ধুবান্ধব লাগে।'

'আসতে যখন বলেছেন অবশ্যই আসবে।'

'তুই বরং এক কাজ কর, ঘরের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক। ওরা হয়তো বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাসা চিনতে পারছে না বলে ঢুকতে পারছে না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে নিয়ে আসবি । তোর ফুপুর জানার দরকার নেই। দুটো নিতান্তই গোবেচারা ভদ্র ছেলে- অথচ তোর ফুপু ওদের বিষদৃষ্টিতে দেখেছে। I don't know why শাস্ত্রে বলে না, নারী চরিত্র দেবা না জানন্তি কুতা মনুষ্যা- ঐ ব্যাপার আর কি হিমু-Young friend. রাস্তায় গিয়ে ওদের জন্যে একটু দাঁড়া ।

'জি আচ্ছা।'

আমি নিচে নেমে দেখি ফুপুর মাথায় পানি ঢালাঢালি শেষ হয়েছে। তিনি গম্ভীরমুখে বসে আছে। আমি দরজা খুলে রাস্তায় চুপিচুপি নেমে যাব। ফুপু গভীর গলায় বললেন, এই হিমু, শুনে যা । আমি পরিচয় করিয়ে দি, এ হচ্ছে সাদেক । হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ভয়ংকর কাজের ছেলে।

মানহানির মামলা ঠুকতে বলেছিলাম, এখন মামলা সাজিয়েছে। কাল মামলা দায়ের করা হবে, তারপর দেখবি কত গমে কত আটা। সাদেক, তুমি হিমুকে মামলার ব্যাপারটা বলো।

সাদেক বিরক্তমুখে বললেন, ওনাকে শুনিয়ে কী হবে?

'আহা, শোনাও-না! হিমু আমাদের নিজেদের লোক। মামলাটা কী সাজানো হয়েছে সে শুনুক, কোনো সাজেশন থাকলে দিক। এই হিমু, বসে ভালো করে শোন। সাদেক তুমি গুছিয়ে বলো।'

সাদেক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু মানহানি মামলা তো তেমন জোরলো হয় না। সাথে আরও কিছু অ্যাড করেছি।

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম,কী অ্যাড করেছেন?

সাদেক সাহেব ভারি গলায় বললেন, অ্যাড করেছি- কনেপক্ষ ভাড়াটে গুণ্ডার সহায়তায় কোনোরকম পূর্বউসকানি ছাড়া ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, যেমন লোহার রড, কিরিচসহ বরযাত্রীদের উপর আচমকা চড়াও হয়। বরযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী, যেমন মানিব্যাগ, রিস্টওয়াচ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণে বরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাহারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে। বরযাত্রীদের দুটি গাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই আর কি! সব ডিটেল দেয়া হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, বলেন কী!

সাদেক সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, সাজানো মামলা অরিজিনালের চেয়েও কঠিন হয়। অরিজিনাল মামলায় আসামি প্রায়ই খালাস পেয়ে যায়। সাজানো মামলায় কখনো পায় না। কথা হলো এভিডেন্স ঠিকমতো প্লেস করতে হবে।

'এভিডেন্স পাবেন কোথায়?'

'বাংলাদেশে এভিডেন্স কোনো সমস্যা না। মার খেয়ে পা ভেঙেছে চান? পা-ভাঙা লোক পাবেন। X-Ray রিপোর্ট পাবেন। রেডিওলজিক্টের সার্টিফিকেট পাবেন। টাকা খরচ করলে দুনম্বরি জিনিস সবই পাওয়া যায়।'

বড় ফুপ বললেন, টাকা আমি খরচ করব। জোঁকের মুখে আমি নুন ছেড়ে দেব। সাদেক মামলা শক্ত করার জন্য তোমার যা যা করা লাগে করো। দরকার হলে আমি আমার গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বলব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

'তা লাগবে না। পুরানো গাড়ির দোকান থেকে ভাঙা একটা গাড়ি এনে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে গাড়ির ব্লু বুক লাগবে। এটা অবিশ্যি কোনো ব্যাপার না।'

ফুপু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি থাকায় ভরসা পচ্ছি। ওদের আমি তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ব ।

সাদেক সাহেব বললেন, বাদলকে একটু দরকার। ওকে ব্যাক ডেট দিয়ে একটা ভাল ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দিতে হবে। মার খাবার পর মাথায় আঘাত পেয়ে আন্ডার অবজারভেশনে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে দরকার। কিছু এক্সরে-টেক্সরে করা দরকার ।

ফুপু উজ্জ্বলমুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। বাদল আসুক। আজই তাকে ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দেব। মাছ দেখেছে বড়শি দেখেনি।

ফুপু প্রবল উৎসাহে মামলার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি "নাকটা ঝেড়ে আসি ফুপু" বলে বের হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে

উধাও হলাম। সাদেক সাহেব ভয়াবহ ব্যক্তি! আমি উপস্থিত থাকলে পা-ভাঙা ফারিয়াদি হিসেবে আমাকেও হাসপাতালে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। মামলা আরও পোক্ত করার জন্যে মুগুর দিয়ে পা ভেঙে ফেলাও বিচিত্র না।

পথে নেমেই মোফাজ্জল এবং জহিরুলের সঙ্গে দেখা। ওরা ঘোরাঘুরি করছে। আমাকে দেখে অকূলে কূল পাওয়ার মতো ছুটে এল- হিমু ভাইয়া না?

‘হু।’

‘স্যারের বাসাটা ভুলে গেছি। স্যার আসতে বলেছিলেন।’

'এই বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে চলে যান।'
'স্যারের শরীর কেমন হিমু ভাইয়া?'
'শরীর ভাল।'
'ফেরেশতার মতো আদমি। ওনার মতো মানুষ হয় না। সারের জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি।'
'খুব ভালো করেছেন। দাড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান।'
তারা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।
রাত দশটার মতো বাজে। মীরাদের বাড়িতে একবার উকি দিয়ে যাব কিনা ভাবছি। মীরা ফিরেছে কিনা দেখে যাওয়া দরকার ।
মীরার বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন। আমি বললাম, মীরা এখনও ফেরেনি?
তিনি হাহাকার-মেশানো গলায় বললেন, জি না ।
'চিন্তা করবেন না, চলে আসবে। এখন মাত্র দশটা চল্লিশ । বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে চলে আসবে।'
ভদ্রলোক অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপরি বিভ্রান্ত। আমি আবারও পথে নামলাম ।

@@

গা-ঘেঁষে কোনো গাড়ি যদি হার্ডব্রেক করে তা হলে চমকে ওঠাই নিয়ম। শুধু চমকে ওঠা না, চমকে পেছন ফিরতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি মাঝেমধ্যেই হই। রূপা এই কাণ্ডটা সবচে বেশি করে। গাড়ি নিয়ে হুট করে গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে, এবং বিকট শব্দে হর্ন দেবে। ভেতরে ভেতরে চমকালেও বাইরে প্রকাশ করি না। কিছুই ঘটেনি ভঙ্গিতে হাঁঠতে থাকে যতক্ষণ গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেউ না ডাকে।
এবারও তা-ই করলাম। ঘ্যাস করে গা-ঘেঁষে গাড়ি থেমেছে। হর্ণ দেয়া হচ্ছে। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনে এগুচ্ছি।
'হিমু সাহেব। এই যে হিমু সাহেব!'
আমি তাকালাম। স্টিয়ারিং হুইল ধরে অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মাথায় ইরানি মেয়েদের মতো রঙিন ঝলমলে স্কার্ফ । মেয়েটিকে দেখাচ্ছেও ইরানিদের মতো ।
'আমাকে চিনতে পারছেন না?'
'জি না।'
'সে কী ভালো করে দেখুন তো!'
আমি ভালো করে দেখেও চিনতে পারলাম না। বাংলায় কথা বলে কোনো ইরানি তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।
'আমি ফারজানা।'
'ও।'

'ও বলছেন তার মানে এখনও চিনতে পারেননি। আমি ডাক্তার। আপনার চিকিৎসা করেছিলাম। ঐ যে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হলেন- ।'

'এখন চিনতে পেরেছি। আপনি ড্রেস অ্যাজ য়্যু লাইক প্রতিযোগিতা করছেন নাকি? ইরানি মেয়ে সেজেছেন।'

'ডাক্তাররা সাজতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে?'

'না, আইন নেই।'

'আপনার যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তা হলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। ফারজানা বলল, আমি খুবই আনাড়ি ধরনের ড্রাইভার। আজই প্রথম সাহস করে একা একা বের হয়েছি। আপনার কাজ হলো সামনের দিকে লক্ষ্য করা, যথাসময়ে আমাকে ওয়ার্নিং দেয়া। পারবেন না?

'পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়- ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে যাই।'

'ঢাকা শহরে ফাঁকা রাস্তা কোথায়?'

'হাইওয়েতে উঠবেন?'

'হাইওয়েতে কখনো উঠিনি।'

'চলুন আজ ওঠা যাক। ময়মনসিং-এর দিকে যাওয়া যাক। পথে ভদ্রটাইপের একটা জঙ্গল পড়বে। গাড়ি পার্ক করে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারি।'

'জঙ্গলে ঢুকব কেন?'

'ঢুকতে না চাইলে ঢুকবেন না। আমরা জঙ্গল পাশে ফেলে হোস করে চলে যাব।'

'আপনার পায়ে স্যান্ডেল নেই। সান্ডেল কি ছিঁড়ে গেছে?'

'গাড়ি চালাতে চালাতে পায়ের দিকে তাকাবেন না। এমিতেই আপনি আনাড়ী ড্রাইভার।'

'খুব আনাড়ি কি মনে হচ্ছে?'

'না- খুব আনাড়ি মনে হচ্ছে না।'

'আপনি কি জানেন হাসপাতাল থেকে আপনি চলে যাবার পর বেশ কয়েকবার আপনার কথা আমার মনে হয়েছে? আপনার এক আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার ছিল । বোধহয় আপনার ফুপা । তাকে একদিন টেলিফোনও করলাম। তিনি বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন।'

'ধমক দিলেন?'

'ধমক দেয়ার মতোই। তিনি বললেন, আমাকে টেলিফোন করছেন কেন? হিমুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর কখনো টেলিফোন করে বিরক্ত করবেন না । বলেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।'

আমি হাসলাম ।

ফারজানা বলল, হাসছেন কেন?

'আপনার গাড়ি চালানো খুব ভালো হচ্ছে- এইজন্যে হাসছি।'

'আমরা কি ময়মনসিং-এর দিকে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'যে-জঙ্গলের কথা বলছেন সেখানে কি চা পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। পোষা জঙ্গল । সবই পাওয়া যায়। যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন পিকনিক করতে আসেননি।'

'আমি পড়াশোনা দেশে করিনি। আমার এম ডি ডিগ্রি বাইরের।'

'বাংলা তো খুব সুন্দর বলছেন।'

'আমার মা ছিলেন বাঙালি।'

'ছিলেন বলছেন কেন?'

'ছিলেন বলছি, কারণ- তিনি এখন নেই। তার খুব শখ ছিল তার মেয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষের সেবা করবে। আমি বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছি মা'র ইচ্ছাপূরণের জন্যে । আমি ভেবে রেখেছি— এদেশে পাঁচ বছর কাজ করব, তারপর ফিরে যাব।'

'ক'বছর পার করেছেন?'

'তিন বছর কয়েক মাস। দাঁড়ান, একজাক্ট ফিগার বলছি- তিন বছর চার মাস।'

'বাংলাদেশে কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'মাঝে মাঝে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত লাগে। এদেশের কিছু মজার ব্যাপার আছে। বিনয়কে এদেশে দুর্বলতা মনে করা হয়, বদমেজাজকে ব্যক্তিত্ব ভাবা হয়। মেয়েমাত্রকেই অল্পবুদ্ধি ভাবা হয়। মেয়ে-ডাক্তার বললেই সবাই ভাবে দাত্রী, যারা বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আপনি আর কী জানেন?'

'আমি একজন নিউরোলজিস্ট। আমার কাজকর্ম মানুষের মস্তিস্ক নিয়ে। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের এটাও একটা কারণ। যে-কোনো কারণেই হোক আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকতেন। সেইসব আমি শুনেছি। কিছু ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করাও আছে।'

'রেকর্ড করেছেন?'

'জি। রেকর্ডও করেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আসলে আপনার উচিত একজন ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা । বাংলাদেশে ভালো সাইকিয়াট্রিক্ট আছেন না?'

'আছেন একজন।'

'একজন কেন? অনেক তো থাকার কথা।'

'একজনের নাম খুব শুনি। মিসির আলি সাহেব।'

'ওনার সঙ্গে একটা আপয়েন্টমেন্ট করুন। প্রয়োজন মনে করলে আমিও যাব।'

'আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আমার আগ্রহের কারণ আছে, সেটা আপনাকে বলা যাবে না। ভালো কথা, আপনার সেই বিখ্যাত জঙ্গল আর কতদূর?'

'এসে গেছি। মোড়টা পার হলেই জঙ্গল।'

'জঙ্গলে আরেকদিন গেলে কেমন হয়? আজ ইচ্ছা করছে না।'

'খুব ভালো হয়। শুধু একটা কাজ করুন, আমকে নামিয়ে দিয়ে যান- এসেছি যখন জঙ্গল দেখে যাই।'

'সত্যি নামতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ফেরা কোনো সমস্যা না । বাস পাওয়া যায়।'

ফারজানা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি শালবনে ঢুকে পড়লাম। পিকনিক পার্টি এড়িয়ে আমি ঢুকে পড়লাম গভীর

জঙ্গলে । জঙ্গল সম্পর্কে আমার বাবার দীর্ঘ উপদেশ আছে—

> "যখনই সময় পাইবে তখনই বনভূমিতে যাইবার চেষ্টা করবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানবশ্রেণির বন্ধন অতি প্রাচীন। আমার ধারণা আদি মানব একপর্যায়ে বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তবে সাধনায় ফল হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে যদি সক্ষম হও- তবে বৃক্ষের সহিত যোগাযোগেও সক্ষম হইবে। বৃক্ষরাজ তোমাকে এমন অনেক জ্ঞান দিতে সক্ষম হইবে যে-জ্ঞান এমিতে তুমি কখনো পাইবে না।"

কড়া রোদ উঠেছে। শালবনে ছায়া হয় না। তবু মোটামুটি ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখে তার নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের রোদ আরামদায়ক। শুকনো পাতার চাদরে শুয়ে আছি। নাড়াচড়া করলেই শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করছে। যেমন বলছে- নড়াচড়া করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। শালগাছের যে ফুল হয় জানতাম না। পীতাভ ধরনের অনাকর্ষণীয় কিছু ফুল চোখে পড়ছে। শালের ফুলে কি গন্ধ হয়? এত উঁচুতে যে, ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকা সম্ভব না। প্রকৃতি নিশ্চয়ই এই ফুল মানুষের জন্যে বানায়নি। মানুষের জন্যে বানালে ফুল ফুটত হাতের নাগালের ভেতর।

ঘুমের ভেতর অদ্ভূত স্বপ্ন দেখলাম- গাছ নিয়ে স্বপ্ন। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলছে। তবে উলটাপালটা কথা বলছে- কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। যেমন গাছটা বলল, হিমু, তুমি কি জান এই পৃথিবীর সবচে প্রাচীন গাছটি বাংলাদেশে আছে- যার বয়স প্রায় ছ'হাজার বছর?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলছ কেন? বাংলাদেশ উঠে এসেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে। এমন প্রাচীন গাছ এদেশে থাকা সম্ভব নয়।

'তোমাদের বিজ্ঞানীরা কি সব জেনে ফেলেছেন?'

'সব না জানলেও অনেক কিছুই জানেন।'

'গাছ যে একটা চিন্তাশীল জীব তা কি বিজ্ঞানীরা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন। জগদীশচন্দ্র বসু বের করে গেছেন।'

'তা হলে বলো গাছের মস্তিষ্ক কোনটি। একটা গাছ তাঁর চিন্তার কাজটি কীভাবে করে।'

'আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা জানেন।'

'কাঁচকলা। কেউ কিছু জানে না।'

'বিরক্ত করবে না, ঘুমুতে দাও।'

'সৃষ্টিরহস্য বোঝার ব্যাপারে তোমরা গাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর না কেন? আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেই তো আমরা সাহায্য করতে পারি।'

'তোমরা সাহায্য করতে পার?'

'অবশ্যই পারি। আমাদের পাতাগুলি অসম্ভব শক্তিশালী অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনার সাহায্যে আমরা এই বিপুল সৃষ্টিজগতের সব বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।'

'তা-ই নাকি?'

'মনে করো সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহে গাছ আছে। আমরা সেই গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমরা সেই গাছ থেকে তোমাদের জন্যে বৈজ্ঞানিক

তথ্য এনে দিতে পারি।’

‘বাহ, ভালো তো!’

‘পৃথিবীর মানুষরা অমর হতে চায়। কিন্তু অমরত্বের কৌশল জানে না। এই অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জেই একটা গ্রহ আছে যার অতি উন্নত প্রাণীরা অমরত্বের কৌশল জেনে গেছে। তোমরা চাইলেই আমরা তোমাদের তা দিতে পারি।’

‘শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।’

‘তুমি কি চাও?’

‘না, আমি চাই না। আমি যথাসময়ে মরে যেতে চাই হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে কী হবে?’

‘তুমি চাইলে আমি তোমাকে বলতে পারি।’

না, আমি চাচ্ছি না। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো ঔষধের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন বিদেয় হও। ভালো কথা, তোমার নাম কী?’

‘আমার নাম টরমেনালিয়া বেরেরিকা।’

‘এমন অদ্ভুত নাম!’

‘এটা বৈজ্ঞানিক নাম- সহজ নাম বহেরা। আমরা কিন্তু অদ্ভুত গাছ। শালবনের ফাঁকে গজাই এবং লম্বায় শালগাছকেও ছাড়িয়ে যাই। আমাদের বাকলের রঙ কী বলো তো? বলতে পারলে না। আমাদের বাকলের রঙ নীল। আচ্ছা যাও, আর বিরক্ত করব না। এখন ঘুমাও।’

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে-আগে। জেগে উঠে দেখি সত্যি সত্যি একটা বহেরা গাছের নিচেই শুয়ে আছি । গাছভরতি ডিমের মতো ফুল। আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে- আমি শুয়েছিলাম শালগাছের নিচে। শালের ফুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঢাকায় যেতে হবে পায়ে হেঁটে । সেটা খুব খারাপ হবে না। শীতকালে হাঁটার আলাদা আনন্দ । তবে ঢাকায় কতক্ষণে পৌছাব কে জানে। মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। দেখাটা আজ রাতেও হতে পারে। এক কাপ চা খাওয়া দরকার। বনের ভেতর কে আমাকে চা খাওয়াবে! আমি গলা উচিয়ে বললাম, আমার চারদিকে যেসব গাছ-ভাইরা আছেন তাদের বলছি। আমার খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। আমি আপনাদের অতিথি- আপনারা কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

প্রশ্নটা করেই আমি চুপ করে গেলাম। উত্তরের জন্যে কান পেতে রইলাম। উত্তর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক মুহুর্তের জন্যে আমার মনে হচ্ছিল গাছরা উত্তর দেবে।

দরজায় কোনো কলিংবেল নেই।

পুরানা স্টাইলে কড়া নাড়তে হর। প্রথমবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় জবাব এল-কে? আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমবারের ‘কে’-তে জবাব দিতে নেই। দ্বিতীয়বারে জবাব দিতে হয়। এই তথ্য আমার মামার বাড়িতে শেখা। ছোটমামা বলেছিলেন-

‘বুঝলি হিমু, প্রথম ডাকে কখনো জবাব দিবি না। খবর্দার না! তুই হয়তো ঘুমুচ্ছিস, নিশুতিরাতে বাইরে থেকে কেউ ডাকল-হিমু তুই বললি, জি? তা হলেই সর্বনাশ! মানুষ ডাকলে সর্বনাশ না। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে সর্বনাশ। বাঁদা পড়ে যাবি। তোকে ডেকে বাইরে নিয়ে যাবে। এর নাম নিশির ডাক। কাজেই সহজ

বুদ্ধি হচ্ছে- যে-ই ডাকুক প্রথমবারে সাড়া দিবি না। চুপ করে থাকবি। দ্বিতীয়বারে সাড়া দিবি। মনে থাকবে?'

আমার মনে আছে বলেই প্রথমবারে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যাতে মিসির আলি সাহেব দ্বিতীয়বার বলেন- কে? আমি আমার পরিচয় দিতে পারি।

মিসির আলি দ্বিতীয়বার 'কে' বললেন না। দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। খুব যে কৌতুহলী হয়ে তাকালেন তাও না। রাত একটার আগন্তুকের দিকে যতটুকু কৌতুহল নিয়ে তাকাতে হয় সে-কৌতুহলও তার চোখে নেই। পরনে লুঙ্গি। খালিগায়ে সাদা চাদর জড়ানো। ভদ্রলোকের মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল। আমি ভেবেছিলাম টেকোমাথার কাউকে দেখব। আইনস্টাইন-মার্কা এত চুল ভাবিনি। আমি বললাম, স্যার শ্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম হিমু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আগের মতো কৌতূহলশূন্য। তিনি কি বিরক্ত? বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন? না বোধহয়। ঘুমন্ত মানুষ প্রথমবার কড়া নাড়তেই কে বলে সাড়া দেবে না।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কথা বলার জন্যে রাত দুটা খুব উপযুক্ত সময় নয়। আপনি জেগে ছিলেন তাই দরজার কড়া নেড়েছি। আপনি যদি বলেন তা হলে অন্য সময় আসব।

'আমি জেগে ছিলাম না, ঘুমুচ্ছিলাম। যা-ই হোক, আসুন, ভেতের আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিসির আলি সাহেব দরজার হুক লাগালেন। দরজার হুকটা বেশ শক্ত, লাগাতে তার কষ্ট হলো। অন্য কেউ হলে দরজার হুক লাগাত না। যে-অতিথি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তার জন্যে এত ঝামেলা করে দরজা বন্ধ করার দরকারটা কী !

'বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন। হাতলের কাছে একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবিতে লাগলে পাঞ্জাবি ছিঁড়বে।'

মিসির আলি সাহেব পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসে বসে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। উল্লেখ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। কয়েকটা বেতের চেয়ার । গোল একটা বেতের টেবিল । টেবিলের উপরে বাংলা ম্যাগাজিন। উপরের পাতা ছিঁড়ে গেছে বলে ম্যাগাজিনের নাম পড়া যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা চৌকি। চৌকিতে বিছানা পাতা। এই বিছানায় কে ঘুমায়? মিসির আলি সাহেব? মনে হয় না। এই ঘরে আলো কম। বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না। মিসির আলি সাহেবের নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস। তার শোবার ঘরটা দেখতে পারলে হতো।

মিসির আলি ঢুকলেন। তার দুহাতে দুটা মগ । মগভরতি চা।

'নিন, চা নিন। দুচামচ চিনি দিয়েছি- আপনি কি চিনি আরও বেশি খান?'

'জি না। যে যতটুকু চিনি দেয় আমি ততটুকুই খাই।'

তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। এরকম বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ আমি

কম দেখেছি। কে জানে বিশেষত্বহীনতাই হয়তো তার বিশষত্ব। চা খাচ্ছেন শব্দ করে। নিজের চায়ের স্বাদে মনে হয় নিজেই মুগ্ধ। আমি এত আরাম করে অনেকদিন কাউকে চা খেতে দেখিনি।

'তারপর হিমু সাহেব, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি স্যার।'

'ও আচ্ছা । এর আগে বলেছিলেন কথা বলতে এসেছেন। আসলে কোনটা?'

'দুটাই। চোখ বন্ধ করে তো আর কথা বলব না- আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলব।'

'তাও তো ঠিক। বলুন, কথা বলুন। আমি শুনছি।'

'মানুষের যে নানান ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা শোনা যায় আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?'

'আমি সেরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এখনও কাউকে দেখিনি, কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমার মন খোলা, তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব।

'আপনি দেখতে চান?'

'জি না। আমার কৌতুহল কম। নানান ঝামেলা করে কোনো এক পীরসাহেবের কাছে যাব, তার কেরামতি দেখব, সেই ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেউ যদি আপনার সামনে এসে আপনাকে কোনো কেরামতি দেখাতে চায় আপনি দেখবেন?'

মিসির আলি চায়ের মগ নামিয়ে রাখলেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন—সম্ভবত সিগারেট খুঁজছেন। এই ঘরে সিগারেট নেই। আমি ঘরটা খুব ভালোমতো দেখেছি। মিসির আলি সাহেবের কাছে যেহেতু এসেছি স্বভাবটাও তার মতো করার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা । আমি লক্ষ্য করলাম, মিসির আলি সাহেবের চেহারায় সূক্ষ্ম হতাশার ছাপ পড়ল- অর্থাৎ শোবার ঘরেও সিগারেট নেই। নিকোটিনের অভাবে তিনি খানিকটা কাতর বোধ করছেন ।

আমি বলরাম, স্যার, আমার কাছে সিগারেট নেই।

ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় চমকাবেন। কিন্তু চমকালেন না। তবে তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির ছায়া দেখলাম। হাসিটা কি ব্যঙ্গের? কিংবা আমার ছেলেমানুষিতে তার হাসি পাচ্ছে? না মনে হয়।

'স্যার, আমি নিজেও সামান্য ভবিষ্যৎ বলতে পারি। ঠিক আড়াইটার সময় কেউ একজন এসে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেবে।'

মিসির আলি এবারে সহজ ভঙ্গিতে হাসলেন। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে দিতে বললেন, সেই কেউ-একজনটা কি আপনি?

'জি স্যার। আড়াইটার সময় আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যাব।'

'দোকান খোলা পাবেন?'

'ঢাকা শহরে কিছু দোকান আছে খোলেই রাত একটার পর।'

'ভালো।'

আমি মিসির আলি সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আমি কিন্তু স্যার মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারি। সবসময় পারি না- হঠাৎ-হঠাৎ পারি।

'ভালো তো!'

'আপনি কি আমার মতো কাউকে পেয়েছেন যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে?'

'সব মানুষই তো মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। এটা আলাদা কোনো ব্যাপার না। ইনটিউটিভ একটা বিষয় । মাঝে মাঝে ইনটিউশন কাজে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না। মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ বলে যুক্তি দিয়ে। সেইসব যুক্তির পুরোটা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের মনে হয় আমরা আপনা-আপনি ভবিষ্যৎ বলছি।'

'আমার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ইনটিউটিভ গেজ ওয়ার্কের চেয়েও সামান্য বেশি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বলে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতী সম্পর্কে অন্যরা জানে?'

'যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমাকে ভালোমতো চেনে তারা জানে।'

'আপনার আশেপাশের মানুষদের এই ক্ষমতা দেখাতে আপনার ভালো লাগে, তাই না?'

'জি, ভালোই লাগে। একজন ম্যাজিশিয়ান সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখাবার পর যেমন আনন্দ পায়- আমিও সেরকম আনন্দ পাই।'

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমার ধারণ আপনি একধরনের ডিলিউশনে ভুগছেন। ডিলিউশন হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। যে-কোনো কারণেই হোক আপনার ভেতর একটা ধারণা জন্মেছে আপনি সাধুসন্ত-টাইপের মানুষ। আপনার খালি পা, হলুদ পাঞ্জাবি এইসব দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। যে-কোনো ডিলিউশন মানুষের মাথায় একবার ঢুকে গেলে তা বাড়তে থাকে। আপনারও বাড়ছে। আপনি নিজে আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা নিয়ে একধরনের অহংকার বোধ করছেন। আপনাকে যতই লোকজন বিশ্বাস করছে আপনার ততই ভালো লাগছে। এখন রাত দুটায় আপনি আমার কাছে এসেছেন- বিশ্বাসীর তালিকা বৃদ্ধির জন্যে। রাত দুটার সময় না এসে আপনি সকাল দশটায় আসতে পারতেন। আসেননি, কারণ যে সাধু সেজে আছে সে যদি সকাল দশটায় আসে তা হলে তার রহস্য থাকে না। রহস্য বজায় রাখার জন্যেই আসতে হবে রাত দুটার দিকে। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্যে আপনি অদ্ভুত আচার-আচরণ করেন। যেমন আপনার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচুর হাঁটেন। মনে হচ্ছে রাতেই হাঁটেন। কারণ দিনে হাঁটা তো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে পড়ে। যেহেতু আপনি রাতে হাঁটেন- বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনার ডিলিউশনকে পোক্ত করতে এরাও সাহায্য করে। এদের কেউকেউ আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানেই আপনাকে সাহায্য করা। আমার ধারণা এদের কেউ-কেউ আপনাকে সাধুও ভাবে। আপনার পদধূলি নেয়।'

'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই একজনকে সাধু হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে?'

‘হ্যাঁ, তা করবে। মানুষ খুব যুক্তিবাদী প্রাণী হলেও তার মধ্যে অনেকখানি অংশ আছে যুক্তিহীন। মানুষ যুক্তি ছড়াই বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। প্রাণী হিসেবে মানুষ সবসময় অসহায় বোধ করে। সে সারাক্ষণ চেষ্টা করে অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে । পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী, হস্তরেখা, অ্যাস্ট্রলজি, নিউম্যারোলজির প্রতি এইসব কারণেই মানুষের বিশ্বাস।’

‘আপনার ধারণা, মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি?’

‘অবশ্যই মানুষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একদিন যে-মানুষ সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল জয় করবে তার ক্ষমতা অসাধারণ । তবে তার মানে এই না সে ভবিষ্যৎ বলবে। দুটা বেজে গেছে- আপনার কথা ছিল না আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেয়ার?’

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিসির আলি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে যাই। কোন দোকানটা রাত দুটার সময় খেলা থাকে আমাকে দেখিয়ে দিন। মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্যে খুব সমস্যায় পড়ি।

মিসির আলি তার ঘরের দরজায় তালা লাগালেন না। তালা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘর খোলা রেখে গভীর রাতে বের হচ্ছেন তার জন্যেও তার মধ্যে কোনো অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম না। ঘর খোলা রেখে বাইরে যাবার অভ্যাস তার নতুন না এটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মধ্যেও খানিকটা হিমুভাব আছে।

‘হিমু সাহেব!’

‘জি স্যার?’

‘আপনি আমার কথায় আপসেট হবেন না। আমি আপনাকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলিনি।’

‘আপনি যে এ-ধরনের কথা বলবেন তা আমি জানতাম।’

‘সব জেনেশুনেই আমার কাছে এসেছেন?’

‘জি স্যার।’

‘আমার ধারণা আপনি আমার কাছে এসেছেন অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে- যা আপনি বলছেন না।’

‘স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।’

‘কী জিনিস?’

‘আমি কিছুদিন আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে চাই।’

‘কেন? আপনি চান যে আমিও ভয় পাই?’

‘তা না।’

‘তবে?’

‘আমার কাছে শুনে আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না।’

‘তবু শুনি।’

আমি ভয় পাবার গল্পটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। মিসির আলি গল্পের মাঝখানে একবারও কিছু জানতে চাইলেন না- হ্যাঁ-হু পর্যন্ত বললেন না। সিগারেট কিনলাম। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। গল্পটা আবার বলুন।

‘আবার বলব?’

'হ্যাঁ, আবার।'

'কেন?'

'দ্বিতীয়বার শুনে দেখি কেমন লাগে।'

আমি আবারও গল্প শুরু করলাম। মিসির আলি সিগারেট টানতে টানতে তার বাসার দিকে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি এবং গল্প বলছি। তিনি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। আমি তার মুখে চাপা হাসিও লক্ষ্য করছি।

'হিমু সাহেব!'

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, আমি আপনার সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা বলব।'

'আপনি যদি চান, যে-জায়গাটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

'তা হলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা। আবার দেখা হবে। ভালো কথা, যে-গলিতে আপনি ভয় পেয়েছিলেনআপাতত সেই গলিতে না ঢোকা ভালো হবে।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'হঠাৎ ব্রেইনে চাপ সৃষ্টি না করাই ভালো। মানুষের একটা অসুখের নাম "এরিকনোফোবিয়া"- মাকড়সাভীতি। এই অসুখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে তার গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। মাকড়সা তার গায়ে কিলবিল করে হাঁটবে এবং রোগী বুঝতে পারবে যে মাকড়সা অতি নিরীহ প্রাণী। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে মাঝে মাঝে রোগ ভালো হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে খুব খারাপ ফল হয়— রোগী তখন চারদিকে মাকড়সা দেখতে পায়। আমি চাই না— আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটুক।'

'স্যার যাই?'

'আচ্ছা।'

আমি চলে আসছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে তাকালাম । মিসির আলি ঘরে ঢোকেননি। এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। কী দেখছেন, তারা? আমি একটু বিস্মিত হলাম— মিসির আলি ধরনের মানুষেরা মাইক্রোসকোপ টাইপ- কাছের জিনিসকে তারা সাবধানে দেখতে ভালোবাসেন । ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকার কথা না। তাঁরা অসীমের অনুসন্ধান করেন সীমার ভেতর থেকে।

মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে রাতটা হেঁটে হেঁটেই কাটিয়ে দিই, যদিও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। পা ভরি হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বস্তা-ভাইয়ের পাশে গিয়ে কি শুয়ে থাকব? স্লিপিংব্যাগ তাদের জীবন কেমন কাটছে সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে- ছেলেটার নাম যেন কি? গাবলু? না, গাবলু না। অন্যকিছু। নামটা কি সে আমাকে বলেছে? আচ্ছা প্রতিটি গাছের কি মানুষের মতো নাম আছে? গাছ-মা কি তার গাছশিশুদের নাম রাখে? আমরা যেমন গাছের নামে নাম রাখি- শিমুল, পলাশ, বাবলা- ওরাও কি পছন্দের মানুষের নামে তাদের পুত্রকন্যাদের নাম রাখে? যেমন একজনের নাম রাখল হিমু, আরেকজনের সোলায়মান ।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে- বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের নাম সুলায়মান। সুলায়মাকে দেখতে

ইচ্ছা করছে।

স্লিপিংব্যাগের ভেতর পিতাপুত্র দুজনই ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম না। তারে পাশে শুয়ে পড়লাম। এরা মনে হচ্চে আমার জন্যে জায়গা রেখেছে। পাশের জায়গাটায় খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছে। শুধু যে খবরের কাগজ তা না, খবরের কাগজের উপর বড় পলিথিনের চাদর । আমি শোয়ামাত্র স্লিপিংব্যাগের মুখ খুলে গেল। সুলায়মান তার মাথা বের করল।

'কী খবর সুলায়মান?'

সুলায়মান হাসল। তার সামনের দুটা দাঁত পড়ে গেছে।

দাঁত-পড়া সুলায়মানকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সুলায়মান লাজুক গলায় বলল, আফনের জন্যে বাপজান জায়গা রাখছে।

'ভালো করেছে।'

'এখন থাইক্যা আফনের এই জাগা "রিজাভ"।'

'বাঁচা গেল! সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু রিজার্ভ জায়গা দরকার। তুই কি পড়তে পারিস?'

'জ্বে না।'

'পড়াশোনা তো করা দরকার রে ব্যাটা।'

'গরিব মানুষের পড়ালেখা লাগে না।'

'কে বলেছে?'

'কেউ বলে নাই- আমি জানি।'

'এখন থেকেই নিজে নিজে জানা শুরু করেছিস?'

সুলায়মান দাঁত বের করে হাসল। চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, আফনেরে কী ডাকুম?

'যা ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাক। কী ডাকতে ইচ্ছা করে?'

'মামা।'

'বেশ তো, মামা ডাকবি।'

'মামা, আফনে কিচ্ছা জানেন?'

'জানি– শুনবি?'

সুলায়মান হ্যাঁ-না কিছু বলল না। খুব সাবধানে স্লিপিংব্যাগ থেকে বের হয়ে এল । সম্ভবত সে তার বাবার ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছে না। সুলায়মান এসে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। আমি গল্প শুরু করলাম- আলাউদ্দিনের চেরাগের গল্প, যে-চেরাগের ভেতর অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য ঘুমিয়ে থাকে। তাঁর যদি ঘুম ভাঙানো যায় তা হলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সব মানুষকেই একটি করে আলাউদিনের চেরাগ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অল্পকিছু মানুষই চেরাগে ঘুমিয়ে-থাকা দৈত্যকে জাগাতে পারে।

'সুলায়মান!'

'জি মামা?'

'তোর মনের যে-কোনো একটা ইচ্ছার কথা বল তো দেখি ! তোর যে-কোনো একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

'আমার কোনো ইচ্ছা নাই মামা।'

আচ্ছা, তা হলে স্লিপিংব্যাগের ভেতর চলে যা । বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক।'

‘আমি আফনের লগে ঘুমামু।’

সুলায়মান একটা হাত আমার গায়ে তুলে দিয়েছে। আমি চলে গেছি একটা অদ্ভুত অবস্থায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ ঘুম আসছে না। চোখ মেলে রাখতেও পারছি না, আবার বন্ধও করতে পারছি না। বিশ্রী অবস্থা!

‘হ্যালো, আঁখি কি বাসায় আছে?’

‘আপনি কে বলছেন?’

‘আমার নাম হিমু?’

‘হিমুটা কে?’

‘জি, আমি নীতুর বড় ভাই। নীতু হলো আঁখির বান্ধবী।’

‘তুমি আঁখির সঙ্গে কথা বলতে চাও কেন?’

‘নীতুকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বের হয়েছে, আর ফিরে আসেনি। আমরা আঁখিদের বাসা কোথায়, টেলিফোন নাম্বার কী, কিছুই জানতাম না। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। ঘনঘন ফিট হচ্ছেন...’

‘কী সর্বনাশ। ফিট হওয়ারই তো কথা। শোনো হিমু, নীতু নামে কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। নীতু কেন, কোনো মেয়েই আসেনি।’

‘আপনি একটু আঁখিকে দিন। আঁখির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মা শান্ত হবেন না। মা কথা বলবেন।’

‘তুমি ধরো, আমি আঁখিকে ডেকে দিচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের কী যে হয়েছে। মাই গড- চিন্তাও করা যায় না।’

আমি ফোঁপানির মতো আওয়াজ করে নিজের প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আঁখিকে টেলিফোনে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না- এই অভিনয়টা সেই কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আঁখি টেলিফোন ধরল। ভীত গলায় বুলল কে?

‘আমি হিমু। নীতুর বড় ভাই।’

‘আমি তো নীতু বলে কাউকে চিনি না।’

‘আমি নিজেও চিনি না । নীতুর গল্পটা তৈরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেউ তোমাকে টেলিফোন দিচ্ছিল না ।’

‘আপনি কে?’

‘আমি হিমু।’

‘হিমু নামেও তো আমি কাউকে চিনি না!’

‘আমি বাদলের দূর সম্পর্কের ভাই। ঐ যে, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল! তুমি পালিয়ে চলে গেলে বলে বিয়ে হয়নি।’

‘আপনি কী চান?’

‘আমি কিছুই চাই না— বাদলের কারণে তোমাকে টেলিফোন করেছি। ও বোকাটাইপের তো, বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় নানান ধরনের পাগলামি করছে- আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। তুমি ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ। বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা ভয়াবহ ব্যাপার।’

‘উনি বোকা?’

‘বোকা তো বটেই। ও হলো বোকান্দর। বোকা যোগ বান্দর- বোকান্দর । সন্ধি

করলে এই দাঁড়ায়। বোকা মানুষদের প্রতি বুদ্ধিমানদের কিছু দায়িত্ব আছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন কর।'

'আমি বুদ্ধিমতী আপনাকে কে বলল?'

'শেষমূহুর্তে তুমি বাদলকে বিয়ে করতে রাজি হওনি- এটি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। আঁখি শোনো- তুমি বাদলের পাগলামি কমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

'সরি, আমি কিছু করতে পারব না।'

'ও কিসব পাগলামি করছে শুনলে তোমার মায়া হবে। একটা শুধু বলি- রাত বারোটার পর ও তোমাদের বাসার সামনে হাঁটাহাটি করে। অন্য সময় করে না, কারণ অন্য সময় হাঁটাহাটি করলে তুমি দেখে ফেলবে। সেটা নাকি তার জন্যে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'শুনুন, ভালো একটা মেয়ে দেখে আপনারা ওনার বিয়ে দিয়ে দিন- দেখবেন পাগলামি সেরে যাবে।'

'সেটাই করা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে। মেয়ে খুব সুন্দর। শুধু একটু শর্ট- পাঁচ ফুট। হাইহিল পরলে অবিশ্যি বোঝা যায় না। মেয়ে গান জানে- রেডিওতে বি গ্রেডের শিল্পী।'

'ভালোই তো!'

'ভালো তো বটেই। ছাত্রও খুব ভালো- এস.এস.সি-তে চারটা লেটার এবং স্টার পেয়েছে। চারটা লেটারের একটা আবার ইংরেজিতে । ইংরেজিতে লেটার পাওয়া সহজ না।'

'আজকাল অনেকেই পাচ্ছে।'

'যারা পাচ্ছে তারা তো আর এম্নি এম্নি পাচ্ছে না খোঁজ নিলে দেখা যাবে চেম্বারস ডিকশনারি পুরোটা মুখস্থ।'

'আচ্ছা শুনুন- আপনার কথা শেষ হয়েছে তো? আমি এখন রেখে দেব।'

'তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না, তা-ই না?'

'জি না । মেয়েটার নাম কী?"

'কোন মেয়েটার নাম?'

'যার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।'

'তুমি সাহায্য না করলে তো বাদলের বিয়ে হবে না। আগে বাদলের ঘাড় থেকে "আঁখি"-ভূতকে নামাতে হবে। ঘাড় খালি হলেই "বাঁধন"-ভূত চেপে বসবে।

'মেয়েটার নাম বাঁধন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব কমন নাম- I'

'কমনের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আনকমন । আঁখি নামটাও তো কমন। কিন্তু তুমি তো আর কমন মেয়ে না।'

'আমিও কমন-টাইপের মেয়ে।'

'অসম্ভব' কমন-টাইপের কোনো মেয়ে বিয়ের দিন বিয়ে ভেঙে দিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যায় না। কমন-টাইপের মেয়ে প্রেমিকের কথা ভুলে গিয়ে খুশিমনে বিয়ে করে ফেলে।'

'শুনুন, আপনি খুব অশালীন কথা বলছেন। আমি কোনো প্রেমিকের কাছে

যাইনি। আমার কোনো প্রেমিক নেই।'

'ও আচ্ছা।'

'মা'র সঙ্গে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা শুনতে চান?'

'না।'

'না বললে হবে না, আপনাকে শুনতে হবে। আমাদের বাড়িতে খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা। কখনোই কেউ আমার ইচ্ছায় কিছু করে না। কখনোই না। মনে করুন, ঈদের জন্যে শাড়ি কেনা হবে। আমার একটা হলুদ শাড়ি পছন্দ। আমি সেটা কিনতে পারব না। মা বলবে- হলুদ শাড়ি তোমাকে মানায় না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিল নাচ শিখব। আমাকে শিখতে দেয়া হয়নি। নাচ শিখে কী হবে? আমার শখ ছিল সায়েন্স পড়ব- জোর করে আমকে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে দেয়া হলো। ধরুন আমার যদি কোনো টেলিফোন আসে– আমাকে সে-টেলিফোন ধরতে দেয়া হবে না। দফায়-দফায় নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। "কে টেলিফোন করল?" "বান্ধবী?" বান্ধবীর বাসা কোথায়?" "বাবা কী করেন?" ধরুন আমি কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি- হুট করে একসময় মা করবে কি, হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে দিয়ে শুনবে আসলেই কোনো মেয়ে কথা বলছে, না কোনো ছেলে কথা বলছে। আমার গায়ে হলুদের দিন কী হলো শুনুন। আমি মাছ খেতে পারি না। গন্ধ লাগে। মাছের গন্ধে আমার বমি এসে যায়। না, তাঁর পরেও খেতে হবে। গায়ে-হলুদের মাছ না খেলে অমঙ্গল হয়। মাছ খেলাম, তারপর বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। তখন খুব রাগ উঠে গেল- আমি রিকশা নিয়ে পালিয়ে চলে গেলাম বান্ধবীর বাড়িতে। এই হচ্ছে ঘটনা।'

'তোমার তা হলে কোনো প্রেমিক নেই?'

'অপরিচিত কোনো ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই- আর আমার থাকবে প্রেমিক! অথচ দেখুন, আমার সব বান্ধবী প্রেমবিশারদ। প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে। জয়দেবপুরে শালবনে হাঁটতে যাচ্ছে। আমার এক বান্ধবী, নাম হলো শম্পা। সে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে। দেখুন-না, কীরকম রোমান্টিক। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন কী ছিল জানেন? একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে, তারপর গোপনে তাকে বিয়ে করব।'

'সেটা তো এখনও করতে পার। তবে তোমার মা-বাবা খুব কষ্ট পাবেন।'

'আমি চাই তারা কষ্ট পাক।'

'তা হলে একটা কাজ করলে হয়- তুমি বাদলকেই কোর্টে বিয়ে করে ফ্যালো। কেউ কিছু জানবে না। তোমার বাবা-মা শুরুতে প্রচণ্ড রাগ করবেন। তারপর যখন জানবেন তুমি তাদের পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করেছ তখন রাগ পানি হয়ে যাবে। আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

আঁখি চুপ করে আছে। আঁখি পরিকল্পনা ধুম করে ফেলে দেয়নি। আমি গভীর গলায় বললাম, তোমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে— বাবা-মা'কে কঠিন একটা চিঠি লেখা-মা, আমি সারাজীবন তোমাদের কথা শুনেছি। আর না। এখন আমি আমার নিজের জীবন নিজেই বেছে নিলাম । বিদায় । বিদায়টা লিখবে প্রথমে ইংরেজি ক্যাপিটেল লেটার B বাংলা দায় । B দায় ।

'আপনি আমাকে থ্রি ফোর-এর বাচ্চা ভাবছেন?'

'ঠাট্টা করছি। তবে তোমাকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে- বাসর করতে

হবে- অপরিচিত কোনো জায়গায়।'
'কোথায় সেটা?'
'আমার মেসেও হতে পারে। আমার অবিশ্যি খুবই দরিদ্র অবস্থা।'
'যাক, এইসব ছেলেমানুষি আমার ভালো লাগছে না।'
'তা হলে থাক।'
'তা ছাড়া আপনার ভাই বাদল, মিঃ রেইন- ও কি রাজি হবে? আমার কাছে আইডিয়াটা খুবই মজার লাগছে, কিন্তু তার কাছে লাগবে?'
'ও বিরাট গাধা। তুমি যা বলবে ও তাতেই রাজি হবে।'
'মানুষকে হুট করে গাধা বলবেন না।'
'সরি, আর বলব না।'
'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'
'সাক্ষী নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না তুমি চলে এসো।'
'কোথায় চলে আসব?'
'মগবাজার কাজি অফিসে চলে আসো। বাদল সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'
'আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন কেন? মিঃ রেইন শুধু শুধু মগবাজার কাজি অফিসে বসে থাকবে কেন?'
'বাদল সেখানে আছে, কারণ আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে তারপর তোমাকে টেলিফোন করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বললেই তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'
'হিমু সাহেব, শুনুন । নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখবেন না। আমি আপনার প্রতিটি কথায় তাল দিয়ে গেছি দেখার জন্যে যে আপনি কতদূর যেতে পারেন।'
'তুমি তা হলে কাজি অফিসে আসছ না?'
'অবশ্যই না। এবং আমি আপনার প্রতিটি মিথ্যা কথাও ধরে ফেলেছি।'
'কোন কোন মিথ্যা ধরলে?'
'এই যে আপনি বললেন, মিঃ রেইন মগবাজার কাজি অফিসে বসে আছে।'
'কীভাবে ধরলে?'
'এখন ধরিনি। তবে ধরব । মগবাজার কাজি অফিস আমাদের বাসা থেকে দুমিনিটের পথ । আমি এক্ষুনি সেখানে যাচ্ছি।'
'শুধু দেখার জন্যে বাদল সেখানে আছে কি না?'
'হ্যাঁ।'
খট করে শব্দ হলো। আঁখি টেলিফোন রেখে দিল । আমি মনে মনে হাসলাম । বাদলকে আমি আসলেই কাজি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে একা না, সঙ্গে দুজন সাক্ষীও আছে। মোফাজ্জল এবং জহিরুল ।
ওদের জন্যে সুন্দর একটা বাসরঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচে ভালো হতো রাতটা যদি তারা দুজনে গাছের নিচে কাটাতে পারত। সেটা সম্ভব না। গল্পে-উপন্যাসে গৃহবিতাড়িত তরুণ-তরুণীর গাছতলায় জীবন কাটানোর কথা পাওয়া যায়। বাস্তব গল্প-উপন্যাসের মতো নয়।

রাত দশটায় ফুপুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে জানা দরকার।

বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট গ্যাঞ্জাম। ফুপুর মাথা আইসব্যাগ চেপে ধরা আছে। পাশেই ফুপা । তিনিও রণহুংকার দিচ্ছেন। ফুপু বললেন, খবর কিছু শুনেছিস হিমু?

'কী খবর।'

'হারমজাদটা ঐ বদ মেয়েটাকে কোর্ট ম্যারজ করেছে। ওর চামড়া ছিলে তুলে মরিচ লাগিয়ে দেয়া দরকার।'

'কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে— বাদলের মতো নিরীহ ছেলে!'

'নিরীহ ছেলে কি আর নিরীহ আছে? ডাইনির খপ্পরে পড়েছে না!'

ফুপা বললেন, আমিতো কল্পনাও করতে পারছি না! কী ইচ্ছা করছে জানিস হিমু?

'না। কী ইচ্ছা করছে?'

'ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হারামজাদাটাকে গুলি করে মারতে।'

ফুপু কঠিনচোখে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব আবার কী ধরনের কথা! নিজের ছেলের মৃত্যু কামনা।

'আহা, কথার কথা বলেছি গাধাটার তো দোষ নেই। ডাইনির পাল্লায় পড়েছে না!'

আমি বললাম, নিজের ছেলের বউকে ডাইনি বলা ঠিক হচ্ছে না। দুজনই ছেলেমানুষ, একটা ভুল করেছে...এখন উচিত ক্ষমাসুন্দর চোখে...

ফুপু গর্জন করে উঠলেন, হিমু, তুই দালালি করবি না। খবর্দার বললাম। এই বাড়ি চিরদিনের জন্যে ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

'বেচারারা বাসররাতে পথে-পথে ঘুরবে!'

'কেউ যদি জায়গা না দেয় পথে-পথে ঘোরা ছাড়া গতি কী! আঁখি বাদলকে নিয়ে তার মা'র বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'তা তো দেবেই। বদের ঝাড় না? আমার ছেলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে, এতবড় সাহস! আমি এই বাড়িতেই আমার ছেলের বাসর করব।'

'এটা মন্দ না। লাইট-ফাইট নিয়ে আসি।'

'লাইট-ফাইট কেন?'

'আলোকসজ্জা করতে হবে না?'

'আলোকসজ্জা তো পরের ব্যাপার- বাসরঘর সাজাতে হবে। ফুল আনতে হবে। এত রাতে ফুল পাবি?'

'পাব না মানে?'

ফুপু মাথার আইসব্যাগ ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

ফুপার চোখ চকচক করছে। মনে হয় ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আজ তিনি বোতল খুলবেন । তাঁর সঙ্গীর অভাব হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল বড়ির সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। সিগন্যাল পেলেই চলে আসবে।

@@

সাদেক সাহেব শুকনোমুখে ফুপুদের বসার ঘরে বসে আছেন। তার সামনে এক কাপ চা। নাশতার প্লেটে দুপিস কেক। দেখেই মনে হচ্ছে অনেকদিনের বাসি,

ছাতাপড়া । আমাকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, বাড়ির সবাই কোথায় গেছে জানেন?

আমি বললাম, না। যদিও সুনসান নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছিলাম। বাদল এবং আঁখি হানিমুন করতে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এ-বাড়ির সবাই রওনা হয়েছে। ফুপা সম্প্রতি একটা মাইক্রোবাস কিনেছেন। মাইক্রোবাস ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন সুযোগ হয়েছে। হানিমুনে স্বামী-স্ত্রী একা থাকবে এটাই নিয়ম। এ-বাড়িতে সব নিয়মই উলটোদিকে চলে।

'বাড়ির সবাই কোথায় আপনি জানেন না?'

'জি না।'

'ওরা সবাই কক্সবাজার চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আপনি মনে হয় কিছুটা আপসেট হয়েছেন।'

'আপসেট হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? আপনার ফুপুর ঠেলাঠেলিতে মামলার সমস্ত ব্যবস্থা করে চারজনকে আসামি দিয়ে মামলা দায়ের করে বাসায় এসে শুনি সবাই কক্সবাজার ।'

'মামলা দায়ের হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। পাঁচজন সাক্ষী জোগাড় করেছি। এর মধ্যে মারাত্মক আহত আছে দুজন। দুজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আসামি করেছি তিনজনকে- মেয়ের বাবা মেয়ের বড়মামা আর মেজোমামা। আজই ওয়ারেন্ট ইসু হবে।'

'আপনি তো ভাই খুবই করিৎকর্ম মানুষ। ডায়নামিক পার্সোনিলিটি।'

প্রশংসায় সাদেক সাহেব খুশি হলেন না। তিনি আরও মিইয়ে গেলেন। বাসি কেক কচকচ করে খেয়ে ফেললেন।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আমার অবস্থাটা চিন্তা করুন। যাদের নামে মামলা করেছি তারা ফরিয়াদিদের সঙ্গে মিলিমিশে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই-এর সঙ্গে হানিমুনে চলে গেছে।'

'ঐ পার্টিও গেছে নাকি?'

'জি, তারাও গিয়েছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে জেনেছি। তারা আরেকটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে।'

'বাহ, ভালো তো!'

সাদেক সাহেব রেগে গেলেন। হতভম্ব গলায় বললে, ভালো তো মানে? ভালো তো বলছেন কেন?'

'কিছু ভেবে বলছি না, কথার কথা বলছি।'

'আমার অবস্থাটা আপনি চিন্তা করছেন?'

'আসলে মামলার কথাতে নেচে ওঠাটা আপনার ঠিক হয়নি। সবুর করা উচিত ছিল। সবুরে "ফুট" ফলে বলে একটা কথা আছে। সবুর করলে আপনাকে এই ঝামেলায় যেতে হতো না। ফ্রুট ফলত, আপনিও মাইক্রোবাসে করে হানিমুন পার্টিতে শামিল হতে পারতেন।'

‘রসিকতা করছেন?’

‘রসিকতা করছি না।’

‘দয়া করে রসিকতা করবেন না। রসিকতা আমার পছন্দ না। আমি সিরিয়াস ধরনের মানুষ।’

‘চা খাবেন?’

‘না, চা খাব না। আচ্ছা দিতে বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে গেছে, এখন করবটা কী বলুন তো?’

‘সাজেশান চাচ্ছেন?’

‘না, সাজেশান চাচ্ছি না। আমি অন্যের সাজেশানে চলি না।’

‘না চলাই ভালো। ফুপুর সাজেশান শুনে আপনার অবস্থাটা কী হয়েছে দেখুন। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন।’

সাদেক সাহেব সিগারেট ধরালেন । বেচারাকে দেখে সত্যি সত্যি মায়া লাগছে।

‘সাদেক সাহেব!’

‘জি?’

‘আপনি মন-খারাপ করবেন না। আমি আছি আপনার সঙ্গে।’

‘আপনি আমার সঙ্গে আছেন মানে কী?’

‘ওরা যা ইচ্ছা করুক। ওদের মিল-মহব্বতের আমরা তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের মতো মামলা চালিয়ে যাব ।’

‘আবার রসিকতা করছেন?’

‘ভাই, আমি মোটেই রসিকতা করছি না। আমি সিরিয়াস। আঁখির বাবা এবং দুই মামাকে আমরা হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব। পুলিশকে দিয়ে রোলারের ডলা দেওয়াব। কানে ধরে উঠবোস করাব।’

‘হিমু সাহেব। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনি উন্মাদ?’

‘আমি উন্মাদের মতো কথা বলছি?’

‘অবশ্যই বলছেন।’

‘তা হলে আরেকটা সাজেশান দিই। আপনি নিজেও কক্সবাজার চলে যান। আসামি ফরিয়াদি দুই পার্টিকেই একসঙ্গে ট্যাকল করুন। দুপার্টিই আপনার চোখের সামনে থাকবে। আপনি বিচক্ষণ আইনবিদ। আইনের প্যাচে ফেলে হালুয়া টাইট করে দিন। ওরা বুঝুক হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি রাইস।’

‘শুনুন হিমু সাহেব, আপনি আপনার মাথার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর এ সিক পারসন।’

‘আপনার চায়ের কথা বলা হয়নি। দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে আডডা দেব।’

সাদেক সহেব উঠে দাড়ালেন এবং আমাকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে— ঝড়ের বেগে নিস্ক্রমণ।

ফুপুর কাজের ছেলে রশিদ আমার খুব যত্ন নিল। আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। রশিদের বয়স আঠারো-উনিশ। শরীরের বাড় হয়নি বলে এখনও বালক-বালক দেখায়। ফুপার বাড়িতে সে গত দুবছর হলো আছে। ফুপুর ধারণা রশিদের মতো এক্সপার্ট কাজের ছেলে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা নেই। সে একা একশো না, একাই তিনশো। কথাটা মনে হয় সত্যি।

রশিদ দাঁত বের করে বলল, আইজ আর কই ঘুরবেন, শুইয়া বিশ্রাম করেন। মাথামালিশ কইরা দিমু। দুপুরে আফনের জন্যে বিরানি পাকামু।

'বিরানি রাঁধতে পারিস?'

'আমি পারি না এমন কাম এই দুনিয়াতে পয়দা হয় নাই। সব কিসিমের কাম এই জীবনে করছি।'

'বলিস কী!'

'আমার ভাইজান আফনের মতো অবস্থা। বেশিদিন কোনো কামে মন টিকে না। চুরিধারি কইরা বিদায় হই।

'চুরি ধারি করিস?'

'পরথম করি না। শেষ সময়ে করি। বিদায় যেদিন নিমু তার একদিন আগে করি। ভাইজান, আফনের চুল বড় হইছে, চুল কাটবেন?'

'নাপিতের কাজও জানিস?'

'জানি। মডান সেলুনে এক বছর কাম করছি। কলাবাগান। ভালো সেলুন। এসি ছিল । করিগরও ছিল ভালো।'

'নাপিতের দোকান থেকে কী চুরি করেছিলি?'

'ক্ষুর, কেঁচি, চিরুনি, দুইটা শ্যাম্পু এইসব টুকটাক...'

'খারাপ কী? ছোট থেকে বড়। টুকটাক থেকে একদিন ধুরুমধারুম হবে। দে, চুল কেটে দে।'

আমি হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় মোড়ায় বসলাম। রশিদ মহা উৎসাহে আমার চুল কাটতে বসল।

'মাথা কামাইবেন ভাইজান?'

'মাথা-কামানোর দরকার আছে?'

'শখ হইলে বলেন। মাতাকামানিটা হইল শখের বিষয়।'

মাথা কামাতে তোর যদি আরাম লাগে তা হলে কামিয়ে দে। সমস্যা কিছু নেই। আমার মাথায় চুল থাকাও যা, না-থাকাও তা।'

রশিদ গম্ভীরমুখে বলল, লোকের ধারণা মাথা-কামানি খুব সহজ। আসলে কিন্তু ভাইজান বড়ই কঠিন কাজ ।

আমি গভীর গলায় বললাম, জগতের যাবতীয় কঠিন কাজই আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়। সহজ কাজকে মনে হয় কঠিন। যেমন ধর সত্য কথা বলা। মনে হয় না খুব সহজ, ইচ্ছা করলেই পারা যাবে? আসলে ভয়ংকর কঠিন। যে-মানুষ একমাস কোনো মিথ্যা না বলে শুধুই সত্যিকথা বলবে, ধরে নিতে হবে সে একজন মহামানব।

'ভাইজান!'

'বল।'

'আফনের সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা ছিল।'

'বলে ফ্যাল।'

'আফনের কাছে আমি একটা জিনিস চাই ভাইজান— আফনে না বলতে পারবেন না।'

'কী জিনিস চাস?'

'সেইটা ভাইজান পরে বলতেছি । আগে আফনে ওয়াদা করেন দিবেন।'

‘তুই চাইলেই আমি দিতে পারব এটা ভাবলি কী করে?’

‘আফনে মুখ দিয়া একটা কথা বললেই সেইটা হয়- এইটা আমরা সবেই জানি।’

‘তোকে বলেছে কে?’

‘বলা লাগে না ভাইজান। বুঝা যায়। তারপরে বাদল ভাই বলছেন। বাদল ভাইয়ের বিবাহ গেছিল ভাইঙ্গা। বাদল ভাই আফনেরে বলল- সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক।’

‘তুই চাস কী?’

‘বিদেশ যাইতে খুব মন চায় ভাইজান । দেশে মন টিকে না।’

‘আচ্ছা যা, হবে।’

রশিদ মাথা-কামানো বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ আমার পা ছুয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল । আমি সিদ্ধপুরুষদের মতোই তার শ্রাদ্ধ গ্রহন করলাম। মানুষকে ভক্তি করতে ভালো লাগে না- মানুষের ভক্তি পেতে ভালো লাগে।

আমার মাথা-কামানো হলো । মাথা-ম্যাসেজ করা হলো । গা-মালিশ করা হলো । দুপুরে হেভি খানাপিনা হলো। খাসির বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট। অতি সুস্বাদু রান্না, ভরপেট খাবার পরেও মনে হচ্ছে আরও খাই ।

‘রশিদ, তুই তো ভালো রান্না জানিস!’

‘চিটাগাং হোটেলে বাবুর্চির হেল্পার ছিলাম ভাইজান। বাবুর্চির নাম ওস্তাদ মনা মিয়া। এক লম্বর বাবুর্চি ছিল। রান্ধনের কাজ সব শিখছি ওস্তাদের কাছে।’

‘ভালো শিখেছিস। খুব ভালো শিখেছিস।’

‘রাইতে ভাইজান আফনেরে চিতলমাছের পেটি খাওয়ামু। এইটা একটা জিনিস?’

‘কি রকম জিনিস?’

‘একবার খাইলে মিত্যুর দিনও মনে পড়ব। আজরাইল যখন জান-কবচের জন্যে আসব তখন মনে হইব- আহারে, চিতলমাছের পেটি। ওস্তাদ মনা মিয়া আমারে হাতে ধইরা শিখাইছে। আমারে খুব পিয়ার করত।’

‘ওস্তাদের কাছ থেকে কী চুরি করলি?’

রশিদ চুপ করে রইল। আমি আর চাপাচাপি করলাম না। দুপুরে লম্বা ঘুম দিলাম। রাতে খেলাম বিখ্যাত চিতলমাছের পেটি। সেই রান্না শিল্পকর্ম হিসেবে কতটা উত্তীর্ণ বলতে পারলাম না— কারণ শুরুতেই গলায় কাঁটা বিঁধে গেল। মাছের কাঁটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতিনিয়তই সে জানান দিতে থাকে। আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি ঢোক গেলার প্রয়োজন নেই, তার পরেও ক্রমাগত ঢোক গিলে যেতে হয়। কাঁটার প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তার বিখ্যাত বাণীমালায় কাঁটাসংক্রান্ত বাণীও ছিল।

কণ্টক

কাঁটা, কণ্টক, শলা, তরুনখ, সূচী, চোঁচ

“বাবা হিমালয়, শৈশবে কইমাছের ঝোল খাইতে গিয়া একবার তোমার গলায় কইমাছের কাঁটা বিঁধিল । তুমি বড়ই অস্থির হইলে । মাছের কাঁটার যন্ত্রণা তেমন অসহনীয় নয়, তবে বড়ই অস্বস্তিকর। কণ্টক নীরবেই থাকে, তবে প্রতিনিয়তই সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। কন্টকের এই কোনো ব্যবস্থা করি নাই। তুমি কিছুদিন গলায় কাঁটা নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে । বাবা হিমালয়, তুমি কি জান যে মানুষের মনেও পরম করুণাময় কিছু

কাঁটা বিধাইয়া দেন? একটি কাঁটার নাম-মন্দ কাঁটা । তুমি যখনই কোনো মন্দ কাজ করিবে তখনই এই কাটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তুমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবে। ব্যথা বোধ না- অস্বস্তিবোধ ।

সাধারণ মানুষদের জন্য এইসব কাঁটার প্রয়োজন আছে। সিদ্ধপুরুষদের জন্য প্রয়োজন নাই। কাজেই কণ্টকমুক্তির একটা চেষ্টা অবশ্যই তোমার মধ্যে থাকা উচিত। যেদিন নিজেকে সম্পূর্ণ কণ্টকমুক্ত করিতে পারবে সেইদিন তোমার মুক্তি। বাবা হিমালয়, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা কথা বলি, মহাপাষণ্ডরাও কণ্টকমুক্ত। এই অর্থে মহাপুরুষ এবং মহাপাষণ্ডের ভিতরে তেমন কোনো প্রভেদ নাই।”

গলায় কাঁটা নিয়ে রাতে আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে আছেন। আমার মুণ্ডিত মস্তক তার নজরে এল না। তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

‘ভাইসাহেব, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।’

‘আজ কি বিশেষ কোনো দিন?’

‘জি। আজ আমার মেয়ের পানচিনি হয়ে গেছে।’

‘বলেন কী।’

‘কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে ভাই! একটু পরপরই চোখে পানি এসে যাচ্ছে।’

তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। চোখ মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই মুছছেন। চোখ লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার মেয়ে কোথায়? এত বড় উৎসব, বাসা খালি কেন?

‘মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমার কান্না দেখেই কাঁদছিল। শেষে তার মামাতো ভাইবোনরা এসে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিতে চাচ্ছিল, আমি যাইনি।’

‘যাননি কেন?’

ইয়াসমিন একা থাকবে। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব। আমার দায়িত্ব এখন শেষ।’

‘ওনার দায়িত্বও তো শেষ। মেয়েকে আর চোখে-চোখে রাখতে হবে না। উনি আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন না তো? জীবিত শ্বাশুড়িকেই জামাইরা দেখতে পারে না- উনি হলেন ভূত-শ্বাশুড়ি।’

আশরাফুজ্জামান সাহেব করুণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করবেন না ভাই। আমি মনে খুব কষ্ট পাই ।

‘আচ্ছা যান, আর করব না।’

‘ভাই, আজ রাতটা আপনি আমার সঙ্গে থেকে যান। দুজনে গল্পগুজব করি।’

‘আমি থাকলে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কীভাবে?’

‘ওর সঙ্গে তো সারাক্ষণ কথা বলি না। কথাবার্তা সামান্যই হয় । ওর কথা বলতে কষ্ট হয়।’

‘ও আচ্ছা।’

‘হিমু সাহেব! ভাই আমার অনুরোধটা রাখুন। থাকুন আমার সঙ্গে। বিছানায় ধোয়া

চাদর দিয়ে দিচ্ছি।’

‘চাদর-ফাদর কিছু লাগবে না। একটা বিড়াল লাগবে। আপনার বাসায় কি বিড়াল আছে?’

‘জি না, বিড়াল লাগবে কেন?’

‘আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। বিড়ালের পা ধরলে নাকি গলার কাঁটা যায়...’

‘এইসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। এসব হচ্ছে কুসংস্কার। গরম লবণপানি দিয়ে গার্গল করেন, গলার কাঁটা চলে যাবে। আমি গরম পানি এনে দিচ্ছি। গলার কাঁটার খুব ভালো হোমিওপ্যাথি অষুধ আছে। কাল সকালে আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব- অ্যাকোনইট ৩।’

‘আপনি তা হলে হোমিওপ্যাথিও জানেন?’

‘ছোট বাচ্চা মানুষ করেছি, হোমিওপাথি তো জানতেই হবে। বই পড়ে পড়ে শিখেছি, স্বআহৃত জ্ঞান। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোনো ব্যাধি থাকে বলবেন, চিকিৎসা করব। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একজন ভালো চিকিৎসক।’

‘ভয়-পাওয়া রোগ সারাতে পারবেন?’

‘ভয়-পাওয়া রোগ? আপনি ভয় পান?’

‘একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়টা মনে গেঁথে ক্রনিক হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে- পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

‘এই দুটি রোগেরই হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো চিকিৎসা আছে। ভূত-প্রেত দেখতে পেলে স্ট্রামোনিয়াম ৬, আর যদি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন তা হলে খেতে হবে প্ল্যাটিনা ৩০, দুটাই মানসিক অসুখ।’

‘মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসা আছে।’

‘অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি মনে রে সব বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কফিয়া ৬, অনবরত কথা-বলা রোগের জন্যে ল্যঅকেসিস ৬, লোকের সঙ্গ বিরক্তি এলে নাস্কভমিকা ৩, উদাসীন ভাব অ্যাসিড ফস-৩, খুন করার ইচ্ছা জাগলে হায়াসায়েমাস ৩, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা- অরাম সেট ৩০, কথা বলার সময় কান্না পেলে- পালস ৬, অতিরিক্ত ধর্মচিন্তা- নাক্সভমিকা।’

‘অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা কমে কোন অষুধে বললেন?’

‘ল্যাকেসিস ৬।’

‘ঘরে আছে না?’

‘জি আছে। গলার কাঁটার অষুধটা নেই। এইটা আছে।’

‘আপনার তো মনে হয় ল্যাকেসিস ৬ অষুধটা নিয়মিত খাওয়া উচিত।’

‘হিমু সাহেব, আমি কিন্তু কথা কম বলি। কথা বলার মানুষই পাই না- কথা বলব কী করে? আমার মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। যখন ছোট ছিল তখন বলত। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সে দূরে সরে যাচ্ছে। কথা কম-বলা রোগেরও ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আছে- অ্যাসিড ফস ৬, উদাসীন ভাবের জন্যে অ্যাসিড ফস ৩, আর কথা কম-বলা রোগের জন্যে অ্যাসিড ফস ৬, কিন্তু আমার অষুধ খাবে না। ওর ধারণা হোমিওপ্যাথি হলো চিনির দলা । কোনো-একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পরীক্ষা না করেই কেউ যদি বলে চিনির দলা, সেটা কি ঠিক?’

'জি না, ঠিক না।'
'আমাদের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা ছাড়াই সিদ্ধান্ত । খারাপ না?'
'খুবই খারাপ।'
'আমি কথা বেশি বলায় বিরক্ত হবেন না। অনেকদিন পর আপনাকে পেয়েছি বলে এত কথা বলছি। আপনি তো আর সাধারণ মানুষের মতো না যে আপনার সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলতে হবে!'
'আমি সাধারণ মানুষের মতো না?'
'অবশ্যই না। ঐদিন আপনি আমার কন্যার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে যে-সময় বলে গিয়েছিলেন, সে ঠিক সেই সময় ফিরেছে। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট আমার বিস্ময়ভাব এখনও যায়নি। প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তো আর আজকাল পাওয়া যায় না। যাদের এই ক্ষমতা আছে তারা তা প্রকাশ করেন না। তারা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকের যোগাযোগ আছে । আপনি যদি দয়া করে এমন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে খুব খুশি হবো। আছে এমন কেউ?'
'আছে একজন— ময়লা-বাবা । গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন।'
'ময়লা মেখে বসে থাকে কেন?'
'বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'
জিজ্ঞেস করেননি কেন?'
'জিজ্ঞেস করিনি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। একদিন যাব।'
'হিমু সাহেব ভাই, যেদিন যাবেন অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবেন। ওনার ক্ষমতা কেমন?'
'লোকমুখে শুনেছি ভালো ক্ষমতা। মনের কথা হড়বড় করে বলে দেন। আপনার মনে কোনো খারাপ কথা থাকলে ওনার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। হড়বড় করে বলে দেবেন, আপনি পড়বেন লজ্জায়।'
'ওনার নাম কী বললেন, ময়লা-বাবা?'
'জি, ময়লা-বাবা।'
'কী ধরনের ময়লা গায়ে মাখেন?'
'এক-তৃতীয়াংশ নর্দমার পানির সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনের ময়লা, একষষ্ঠমাংশ টাটকা গু প্লাস আরও কিছু হাবিজাবি দিয়ে সেমি সলিড একটা মিকশ্চার তৈরি করে তেলের মতো গায়ে মেখে ফেলেন।'
'সত্যি?'
'ভাই আমি রসিকতা করছি। সত্যি কি না এখনও জানি না । দেখা হলে জানব । ময়লার ফর্মুলা নিয়ে আসব। ইচ্ছা করলে আপনিও গায়ে মাখতে পারেন।'
একজন মানুষ যে অন্য একজনকে কী পরিমাণ বিরক্ত করতে পারে আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এই তথ্য জেনে গেলাম।
আমি পা গুটিয়ে বিছানায় বসে আছি। তিনি বসে আছেন আমার সামনে একটা বেতের চেয়ারে। তিনি ননস্টপ কথা বলে যাচ্ছেন। ঢাকা-চিটাগাং আন্তনগর ট্রেনও কিছু স্টেশনে থামে। উনি কোনো স্টেশনই ধরছেন না। ছুটে চলছে তুফান মেইল । তার সব গল্পই তার কন্যা এবং ভূত-স্ত্রী প্রসঙ্গে। আমি শুনে যাচ্ছি- মন দিয়েই

শুনছি। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিদ্যা আমার ভালোই আয়ত্ত হয়েছে।

'বুঝলেন হিমু ভাই, আজ আমি একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রী ম্যান। মানে এখনও ফ্রী না, তবে হয়ে যাচ্ছি। যেদিন আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হবে, সেদিনই আমি হবো একজন স্বাধীন মানুষ। মেয়েটা সুন্দর হওয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছিল । কলেজে ওঠার পর থেকে শুধু বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শুধু সম্বন্ধ এলে ক্ষতি ছিল না। তারা নানানভাবে চাপাচাপি করে। ভয় পর্যন্ত দেখায় এমন অবস্থা বিয়ে না দিলে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব, এই জাতীয় কথাবার্তা পর্যন্ত বলে। শুধু যে ওরা চাপাচাপি করেছে তাই না, আমার আত্মীয়স্বজনরাও চাপাচাপি করেছে। আমি একা মানুষ, মেয়ে মানুষ করতে পারছি না- এইসব উদ্ভট যুক্তি। যখন বিয়ে দিতে মন ঠিক করলাম তখন অন্য সমস্যা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়, ছেলে পছন্দ হয়, কথাবার্তা পাকা হয়, তখন বিয়ে ভেঙে যায়। ক'বার এরকম হলো জানেন? পাঁচবার । এর মধ্যে তিনবার বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে কার্ড দেখাব। সব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

'বিয়ে ভেঙে যায় কেন?'

'দুষ্ট লোকেরা কানভাঙানি দেয়। আমার মেয়ের নামে আজেবাজে কথা বলে, উড়ো চিঠি দেয়। টেলিফোন করে। সুন্দরী মেয়েদের প্রসঙ্গে আজেবাজে ধরনের কথা মানুষ খুব সহজে বিশ্বাস করে । বিয়ে ভেঙে যায়। আমার মেয়ে এতে খুব কষ্ট পায়। আমি তেমন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আগেই আমাকে জানিয়ে দেয় বিয়ে ভেঙে যাবে। আমার ভেতর একধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমার মেয়ের ভেতর থাকে না বলে সে খুব কষ্ট পায়। বিয়ে হচ্ছে না এইজন্যে কষ্ট না, অপমানের কষ্ট।'

'কষ্ট হবারই কথা।'

'তারপর সে ঠিক করল কোনোদিন বিয়েই করবে না। কঠিনভাবে আমাদের সবাইকে বলল, তার বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও যেন না বলা হয়। আমার মেয়ে আবার খুব কঠিন ধরনের- একবার যা বলবে তা-ই। এর কোনো নড়চড় হবে না। আমরা বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা দীর্ঘদিন বলিনি। এতদিন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। অতিদ্রুত সব ফাইনাল হয়ে গেল।'

'ভালো তো!'

'ভালো তো বটেই! কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না ।'

'আপনার স্ত্রী? তিনিও কি আপনার মতোই আনন্দিত?'

'হ্যাঁ, সেও খুশি। খুব খুশি।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জি, কথা হয়েছে।'

'তিনি আবার বলেননি তো যে এবারও বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'না, বলেনি। অবিশ্যি সে ভবিষ্যতের কথা খুব আগেভাগে বলতে পারে না। শেষমুহূর্তে বলে। কে জানে এইবারও শেষমুহূর্তে কিছু বলে কি না।'

'শেষমুহূর্তে কিছু বলার সুযোগ না দিলেই হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। ধরো তক্তা মারো পেরেক অবস্থা। কেউ ভাঙনি দেবার সুযোগ পাবে না ।'

'তা কি আর হয়! মেয়ের বিয়ে বলে কথা! এ তো আর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার মতো ঘটনা না যে রাত আটটায় ঠিক করা হবে রাত ন'টায় খেতে যাওয়া হবে!'

'তাও ঠিক।'

'মেয়ের ছবি দেখবেন?'

'নিশ্চয়ই দেখব।'

'সব ছবি দেখতে সময় লাগবে । শত শত ছবি আমি তুলেছি। একসময় ফটোগ্রাফির শখ ছিল। এখনও আছে। নিয়ে আসব?'

'আনুন।'

'সব মিলিয়ে পঁচিশটা অ্যালবাম।'

'পঁচিশটা অ্যালবাম!'

'জি, একেক বছরের জন্যে একেকটা। আসুন আলবাম দেখি। আমি মেয়েকে বলেছি, মা শোন, এই বাড়ি থেকে তুই সবকিছু নিয়ে যা, শুধু অ্যালবামগুলি নিতে পারবি না।'

আমরা অ্যালবাম দেখা শুরু করলাম। ছবির উপর দিয়ে শুধু যে চোখ বুলিয়ে যাব সে-উপায় নেই- প্রতিটি ছবি আশরাফুজ্জামান সাহেব ব্যাখ্যা করছেন-

'যে-ফ্রকটা পরা দেখছেন, তার একটা সাইড ছেঁড়া আছে। মীরার খুব প্রিয় ফ্রক। ছিঁড়ে গেছে, তার পরেও পরবে। থুতনিতে কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন না? বাথরুমে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। বাসায় গাদাফুল ছিল। সেই ফুল কচলে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছে।'

আমরা ভোর চারটা পর্যন্ত সাতটা অ্যালবাম শেষ করলাম। অষ্টম অ্যালবাম হাতে নিয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সাহেব, কাপড় পরুন তো!

তিনি চমকে উঠে বললেন, কেন?
আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে।
'কী বলছেন এসব?'
'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি।'
আশরাফুজ্জামান সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন ।
আমরা ভোর পাঁচটায় ধানমণ্ডিতে মেয়ের মামার বাড়িতে পৌছলাম। দেখা গেল আসলেই মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। রাত দশটায় কাজি এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে।
আমি বলরাম, মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে, ব্যাপারটা কী?
মেয়ের মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি বাইরের মানুষ, আপনাকে কী বলব, না বলেও পারছি না- মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেত তার বাবার কারণে। উনিই পাত্রপক্ষকে উড়ো চিঠি দিতেন। টেলিফোনে নিজের মেয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে বিয়ে ভাঙতেন। বিয়ের পর মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সহ্য করতে পারতেন না। উনি খানিকটা অসুস্থ। আমরা যা করেছি উপায় না দেখেই করেছি।
আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি তাকে রেখে নিঃশব্দে চলে এলাম। সকালবেলায় হাঁটার অন্যরকম আনন্দ ।

@@

ময়লা-বাবার আস্তানা কুড়াইল গ্রামে। বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রিকশায় দু-কিলোমিটার যেতে হয়। তারপর হন্টন। কাঁচা রাস্তা ক্ষেতের আইল সব মিলিয়ে আরও পাঁচ কিলোমিটার। মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার না।
'বাবা' হিসেবে তার খ্যাতি এখনও বোধহয় তেমন ছড়ায়নি। অল্পকিছু ভক্ত উঠোনে শুকনোমুখে বসে আছে। উঠোনে চাটাই পাতা, বসার ব্যবস্থা। উঠোন এবং টিনের বারান্দা সবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। যে-বাবা সারাগায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন তার ঘরদুয়ার এমন ঝকঝকে কেন- এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই মনে আসে।
আমার পাশে একজন হাঁপানির রোগী। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হয় সময় হয়ে এসেছে, চোখমুখ উলটে এক্ষুনি ভিরমি খাবে। আমি তাতে বিভ্রান্ত হলাম না । হাঁপানি রোগীকে যত সিরিয়াসই দেখাক এরা এত সহজে ভিরমি খায় না। রোগী আমার দিকে চোখ-ইশারা করে বললেন, বাবার কাছে আইছেন?
আমি বললাম, হ্যাঁ।
'আপনার সমস্যা কী?'
'সমস্যা কিছু না, ময়লা-বাবাকে দেখতে এসেছি। আপনি রোগ সারাতে এসেছেন?'
'জি।'
'বাবার কাছে এই প্রথম এসেছেন?'
'জি।'

‘আর কোনো বাবার কাছে যাননি? বাংলাদেশে তো বাবার অভাব নেই।’

‘কেরামতগঞ্জের ন্যাংটা বাবার কাছে গিয়েছিলাম।’

‘লাভ হয়নি?’

‘বাবা আমার চিকিৎসা করেন নাই।’

‘ইনি করবেন?’

‘দেখি, আল্লাহপাকের কী ইচ্ছা।’

রোগীর হাঁপানির টান বৃদ্ধি পেল। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কষ্ট দেখা কষ্টের । হাঁপানি রোগীর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও নিশ্বাসের কষ্ট হয় ।

সকাল এগারোটার মতো বাজে। বাবার দেখা নেই। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। গা চিড়বিড় করছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাবার খাদেমদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা ছেলেদের এক জায়গায় বসাচ্ছে, মেয়েদের এক জায়গায় বসাচ্ছে। সবারই উঠোনে চাটাইয়ে বসতে হচ্ছে, তবে চাটাইয়ের মাঝামাঝি চুনের দাগ দেয়া । এই দাগ আগে চোখে পড়েনি। চোখে সুরমা-দেয়া মেয়ে-মেয়ে চেহারার এক খাদেমকে নিচুগলায় বললাম, ময়লা-বাবা টাকাপয়সা কী নেন?

খাদেম বিরক্তমুখে বলল, বাবা টাকাপয়সা নেন না।

‘টাকাপয়সা না নিলে ওনার চলে কীভাবে?’

‘ওনার কীভাবে চলে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না।’

‘আপনাদেরও তো খরচপাতি আছে। এই যে চোখে সুরমা দিয়েছেন, সেই সুরমাও তো নগদ পয়সায় কিনতে হয়। বাবার জন্যে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে এসেছি, কার কাছে দেব বলেন।’

‘বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।’

‘উনি দর্শন দেবেন কখন?’

‘জানি না। যখন সময় হবে উনি একজন একজন করে ডাকবেন।’

‘সিরিয়ালি ডাকবেন? যে আগে এসেছে সে আগে যাবে?’

‘বাবার কাছে কোনো সিরিয়াল নাই। যাকে ইচ্ছা বাবা তাকে আগে ডাকেন। অনেকে আসে বাবা ডাকেনও না।’

‘আমার ডাক তো তা হলে নাও পড়তে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাইসাহেব।’

‘বাবার কাছে নিকট-দূর কোনো ব্যাপার না।’

‘তা তো বটেই, নিকট-দূর হলো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে। বাবাদের জন্যে না।’

‘আপনি বেশি প্যাচাল পাড়তেছেন। প্যাচাল পাড়বেন না, বাবা প্যাচাল পছন্দ করেন না। ঝিম ধরে বসে থাকেন। ভাগ্য ভালো হলে ডাক পাবেন।’

আমি ঝিম ধরে বসে রইলাম। আমার ভাগ্য ভালো, বাবার ডাক পেলাম। খাদেম আমার কানেকানে ফিসফিস করে বলল, বাবার হুজরাখানা থেকে বের হবার সময় বাবার দিকে পিঠ দিয়ে বের হবেন না। এতে বাবার প্রতি অসম্মান হয়। আপনার এতে বিরাট ক্ষতি হবে ।

বাবাদের হুজরাখানা অন্ধকার ধরনের হয়। ধূপ-টুপ জ্বলে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই থাকে। দরজা-জানালা থাকে বন্ধ । ভক্তকে একধরনের আধিভৌতিক

পরিবেশে ফেলে দিয়ে হকচকিয়ে দেয়া হয় । এটাই নিয়ম । ময়লা-বাবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার হুজরাখানায় দরজা-জানালা সবই খোলা। প্রচুর বাতাস। বাবা খালিগায়ে বসে আছেন। আসলেই গা ভরতি ময়লা । মনে হচ্ছে ডাস্টবিন উপুড় করে গায়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে। উৎকট গন্ধে আমার বমি আসার উপক্রম হলো । একী কাণ্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বাবার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এবং তার মুখ হাসিহাসি। কুটিল ধরনের হাসি না, সরল ধরনের হাসি। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে টানা-টানা গলায় সুর করে বললেন, কেমন আছেন গো?

আমি বললাম, ভালো।

'দুর্গন্ধ সহ্য হচ্ছে না?'

'জি না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকেন- সহ্য হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ কষ্ট করেন।'

'গায়ে ময়লা মেখে বসে আছেন কেন?'

'কী করব বলেন, নাম হয়েছে ময়লা-বাবা। নামের কারণে ময়লা মাখি। গু মেখে বসে থাকলে ভালো হতো। লোকে বলত গু-বাবা । হি হি হি ।'

তিনি হাসতে শুরু করলেন। এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। অস্বাভাবিক হাসি। এবং খানিকটা ভয়-ধরানো হাসি।

'আপনার নাম কী গো বাবা?'

'হিমু।'

'বাহ, ভালো নাম-সুন্দর নাম। পিতা রেখেছেন?'

'জি।'

'ভালো-অতি ভালো। গন্ধ কি এখনও নাকে লাগছে বাবা।'

'এখনও লাগছে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। সব খারাপ জিনিসই মানুষের সহ্য হয়ে যায়। আপনার কি অসুখবিসুখ আছে?'

'না।'

'এত চট করে না বলবেন না। মানুষের অনেক অসুখ আছে যা ধরা যায় না। জ্বর হয় না, মাথা বিষ করে না- তার পরেও অসুখ থাকে। ভয়ংকর অসুখ । এই যে আমি ময়লা মেখে বসে আছি এটা অসুখ না?'

'জি, অসুখ।'

'মনের ভেতরে আমরা যখন ময়লা নিয়ে বসে থাকি তখন সেটা অসুখ না, কারণ সেই ময়লা দেখা যায় না, সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাই। তাই না বাবা?'

'জি।'

'বাইরের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এখন আমি যদি গরম পানি দিয়া গোসল দেই, শরীরে সাবান দিয়া ডলা দেই– ময়লা দূর হবে। হবে না?'

'হবে।'

'মনের ময়লা দূর করার জন্যে গোসলও নাই, সাবানও নাই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আপনি আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন বলেন।'

'শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আপনি মানুষের মনের কথা ধরতে

পারেন। সত্যি পারেন কি না দেখতে এসেছি।'

'পরীক্ষা না- কৌতুহল।'

'শুনেন বাবা, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। ময়লা মেখে বসে থাকি বলে লোকে নানান কথা ভাবে । কেউ-কেউ কী করে জানেন? আমার গা থেকে ময়লা নিয়ে যায়। তাবিজ করে গলায় পরে— এতে নাকি তাদের রোগ আরোগ্য হয়—
ডাক্তার কবিজার গেল তল
ময়লা বলে কত জল?
হি হি হি– '

ময়লা-বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে শুরু করলেন। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম, শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি। মানসিক দিক দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ। এর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা ঠিক না। জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা এরা বলে। কিংবা সাধারণ কথাই বলে- পরিবেশের কারণে সেই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ত কথা বলে মনে হয়।

'ময়লা নিবেন বাবা?'

'জি না।'

'ঢাকা শহর থেকে কষ্ট করে এসেছেন- কিছু ময়লা নিয়ে যান। সপ্তধাতুর কবচে ময়লা ভরবেন। কোমরে কালো ঘুনশি দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা শরীরে ধারন করবেন- এতে উপকার হবে।'

'কী উপকার হবে?'

'রাতে-বিরাতে যে ভয় পান সেই ভয় কমতে পারে।'

আমি মনেমনে খানিকটা চমকালাম । পাগলাবাবা কি থটরিডিং করছেন? আমার ভয় পাবার ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন? নাকি কাকতালীয়ভাবে কাছাকাছি চলে এসেছেন? বিস্তৃত ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছি- তিনি সেই ফাঁদ এখন গুটিয়ে আনবেন।

'ভয়ের কথা কেন বলছেন? আমি তো ভয় পাই না!'

'রাতে কোনোদিন ভয় পান নাই বাবা?'

'জি না।'

'উনারে তো একবার দেখলেন । ভয় তো পাওনের কথা।'

'কাকে দেখেছি?'

'সেটা তো বলব না। তার হাতে লাঠি ছিল, ছিল না?'

আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হলাম ময়লা-বাবা থটরিডিং জানেন। কোনো-একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের কথা পড়তে পারছেন। এটি কি কোনো গোপন বিদ্যা- যে-বিদ্যার চর্চা শুধুই অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ময়লা-বাবাকে প্রশ্ন করলে কি জবাব পাওয়া যাবে? মনে হয় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ময়লা-বাবা বললেন, বাবা কি চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?'

'মনে হয় করেছেন। বুঝতে পারছি না?'

'বুঝেছেন বাবা, আমি নিজেও বুঝতে পারি না। খুব কষ্টে আছি। দুর্গন্ধ কি এখনও পাচ্ছেন বাবা?'

‘জি না।’

‘সুগন্ধ একটা পাচ্ছেন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অনেকেই পায়।’

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম- সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রিয় একটা ফুলের গন্ধ। বেলিফুলের গন্ধ। গন্ধে কোনো অস্পষ্টতা নেই- নির্মল গন্ধ। এটা কি কোনো ম্যাজিক? আড়কের শিশি গোপনে ঢেলে দেয়া হয়েছে?

‘গন্ধ পাচ্ছেন না বাবা?’

‘জি পাচ্ছি।’

‘ভালো। এখন বলেন দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি?’

ময়লা-বাবা আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন। ম্যাজিশিয়ান তাঁর কোনো খেলা দেখানোর পর যে-ভঙ্গিতে দর্শকের বিস্ময় উপভোগ করে— অবিকল সেই ভঙ্গি। আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

‘কিছু ক্ষমতা তো সবারই আছে। আপনারও আছে।’

‘আমি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই আপনি যাবেন?’

‘না।’

‘না কেন?’

‘অসুবিধা আছে। আপনি বুঝবেন না।’

‘তা হলে আজ উঠি।’

‘আচ্ছা যান। আপনারে যে-খেলা দেখালাম তার জন্যে নজরানা দিবেন না? একশো টাকার নোটটা রেখে যান!’

‘শুনছিলাম আপনি টাকাপয়সা নেন না।’

‘সবার কাছ থেকে নেই না। আপনার কাছ থেকে নিব।’

‘কেন?’

‘সেটা বলব না। সবেরে সবকিছু বলতে নাই। আচ্ছা এখন যান। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি- আর না।’

‘আমি যদি কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, তাকে কি আপনি আপনার খেলা দেখাবেন?’

ময়লা-বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের হাসি হাসতে শুরু করলেন। আমি একশো টাকার নোটটা তার পায়ের কাছে রেখে চলে এলাম। ময়লা-বাবার ব্যাপারটা নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। সবচে ভালো হতো যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মিসির আলি-টাইপের মানুষ সহজে কৌতুহলী হন না। এঁরা নিজেদের চারপাশে শক্ত পাঁচিল তুলে রাখেন। পাঁচিলের ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না। এ-ধরনের মানুষদের কৌতুহলী করতে হলে পাঁচিল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়— সেই ক্ষমতা বোধহয় আমার নেই।

তবু একটা চেষ্টা তো চালাতে হবে। ময়লা-বাবার ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে দেখা যেতে পারে। লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না, তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

'কে?'

আমি জবাব দিচ্ছি না, চুপ করে আছি। দ্বিতীয়বার 'কে বললে জবাব দেব। মিসির আলি দ্বিতীয়বার কে বলবেন কি না বুঝতে পারছি না। আগের বার বলেননি- সরাসরি দরজা খুলেছেন। আজ আমি মিসির আলি সাহেবের জন্যে উপহার নিয়ে এসেছি। এক পট ব্রাজিলিয়ান কফি । ইভাপোরোটেড মিল্কের একটা কৌটা এবং এক বাক্স সুগার কিউবস্। কফি বানিয়ে চায়ের চামচে মেপে মেপে চিনি দিতে হবে না। সুগার কিউব ফেলে দিলেই হবে। একটা সুগার কিউব মানে এক চামচ চিনি। দুটা মানে দু-চামচ ।

উপহার আনার পেছনে ইতিহাসটা বলা যাক। শতাব্দী স্টোরে আমি গিয়েছিলাম টেলিফোন করতে। এমনিতে শতাব্দী লোকজনদের ব্যবহার খুব ভালো, শুধু টেলিফোন করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে। টেলিফোন নষ্ট, মালিকের নিষেধ আছে, চাবি নেই- নানান টালবাহানা করে। শেষ পর্যন্ত দেয় তবে টেলিফোন শেষ হওয়ামাত্র বলে, পাঁচটা টাকা দেন। কল চার্জ। আজও তা-ই হলো। আমি হাতের মুঠা থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বের করলাম ।

'ভাংতি দেন!'

'ভাংতি নেই। আর শুনুন, আপনাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। এখন যে-কলটা করেছি সেটা পাঁচশো টাকা দামের কল । আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলেছি, ওর নাম রূপা। আরেকটা কথা শুনুন ভাই- আমি যতবার আপনাদের এখান থেকে রূপার সঙ্গে কথা বলব ততবারই আপনাদের পাঁচশো করে টাকা দেব। তবে অন্য অন্য কলে আগের মতো পাঁচ টাকা। ভাই যাই?'

বলে আমি হনহন করে পথে চলে এসেছি— দোকানের এক কর্মচারী এসে আমকে ধরল। শতাব্দী স্টোরের মালিক ডেকেছেন। আমাকে যেতেই হবে, না গেলে তার চাকরি থাকবে না।

আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিরে গেলাম। নিতান্ত অল্পবয়েসি একটা ছেলে। গোলাপি রঙের হাওয়াই শার্ট পরে বসে আছে। সুন্দর চেহারা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হিসেবে তাকে মানাচ্ছে না। তাকে সবচে মানাত যদি টিভি সেটের সামনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখত এবং কোনো ব্যাটসম্যান ছক্কা মারলে লাফিয়ে উঠত।

শতাব্দী স্টোরের মালিক আমাকে অতি যত্নে বসাল। কফি খাওয়াল। আমি কফি খেয়ে বললম, অসাধারণ! জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতোই অসাধারণ।

সে বলল, কোন কবিতা?

আমি আবৃত্তি করলাম-

"পুরানো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে,
সবুজ ধানের নিচে– মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে- আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা,
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।"

শতাব্দী স্টোরের মালিক তাঁর এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, ওনাকে সবচে ভালো কফি একটিন দাও, ইভাপোরেটেড দুধের একটা টিন, সুগার কিউব দাও।

আমি থ্যাংকস বলে উপহার গ্রহণ করলাম। তারপর ছেলেটা বলল, এখন থেকে দোকানে উনি এলে প্রথম জিজ্ঞেস করবে ওনার কী লাগবে । যা লাগবে দেবে। কোনো বিল করতে পারবে না। উনি ঢোকামাত্র আমার ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে টেলিফোন আছে । উনি যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে পারবেন।

ব্যবসায়ী মানুষ (তার বয়স যত অল্পই হোক) এমন ফ্রী পাশ দেয় না। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম । ছেলেটা বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি হিমু। দোকানের লোকজন আপনাকে চিনতে পারেনি- ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন বলুন আপনি কোথায় যাবেন। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ড্রাইভার আমাকে মিসির আলির সাহেবের বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কড়া নেড়ে অপেক্ষা করছি কখন মিসির আলি সাহেব দরজা খোলেন। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ মানুষের বাসা হলে কড়া নাড়তাম, এই বাসায় থাকেন মিসির আলি- কিংবদন্তি পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শব্দেই তার বুঝে যাবার কথা কে এসেছে, কেন এসেছে।

দরজা খুলল। মিসির আলি সাহেব বললেন, কে? হিমু সাহেব?

‘জি স্যার।’

‘মাথা কামিয়েছেন। আপনাকে ঋষি-ঋষি লাগছে।’

আমি ঋষিসুলভ হাসি হাসলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আজ এত সকালসকাল এসেছেন, ব্যাপার কী? রাত মোটে নটা বাজে। হাতে কী?

‘আপনার জন্যে সামান্য উপহার। কফি, দুধ, চিনি।’

মিসির আলি সাহেবের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল । আমি বলললাম, স্যার, আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে?

‘হ্যাঁ, হয়েছে।’

‘তা হলে আমাকে রান্নাঘরে যাবার অনুমতি দিন, আমি আপনার জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে আসি।’

‘আসুন আমার সঙ্গে।’

আমি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরটা আমার পছন্দ হলো। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটাই আসলে তার লাইব্রেরি। তিনটা উচু বেতের চেয়ার, শেলফভরতি বই। রান্না করতে করতে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায়। রান্নাঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। ইজিচেয়ারের পায়ের কাছে ফুটরেস্ট। বোঝাই যাচ্ছে ফুটরেস্টে পা রেখে আরাম করে বই পড়ার ব্যবস্থা ।

মিসির আলি চুলা ধরাতে ধরাতে বললেন, রান্নাঘরে এত বইপত্র দেখে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

‘জি না। আমি কোনোকিছুতেই অবাক হই না।’

‘আসলে কী হয় জানেন? হয়তো চা খাবার ইচ্ছা হলো। চুলায় কেতলি বসালাম। পানি ফুটতে অনেক সময় লাগছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগে। তখন বই পড়া শুরু করি। চুলায় কেতলি বসিয়ে আমি একুশ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে পানি ফুটে যায়। এই থেকে আপনি আমার বই বড়ার স্পিড সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।’

আমরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম । মিসির আলি বললেন, আপনার গলায় কি মাছের কাঁটা ফুটেছে? লক্ষ্য করলাম অকারণে ঢোক গিলছেন।

আমি বললাম, জি।

'শুধুশুধু কষ্ট করছেন কেন? কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন- মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে গেলেই ওরা চিমটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে।'

'আমি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছি। মানুষ তো ক্যানসারের মতো ব্যাধিও শরীরে নিয়ে বাস করে, আমি কাঁটা নিয়ে পারব না?'

মিসির আলি হাসলেন। ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে বয়স্করা যে-ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি। দেখতে ভালো লাগে ।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমি আপনার ভয় পাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'ভয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। এইটিই সঠিক ব্যাখ্যা কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ। ব্যাখ্যা শুনতে চান?'

'বলুন।'

মিসির আলি কফির কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামান্য হাসলেন। সেই হাসি অতি দ্রুত মুছেও ফেললেন। কথা বলতে শুরু করলেন শান্ত গলায়। যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। যেন তিনি যুক্তি দিয়ে নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছেন

'হিমু সাহেব, আমার ধারণা যে- ভয়ের কথা আপনি বলছেন- এই ভয় অতি শৈশবেই আপনার ভেতর বাসা বেঁধেছে। কেউ-একজন হয়তো এই ভয়ের বীজ আপনার ভেতর পুঁতে রেখেছিল যাতে পরবর্তী কোনো একসময় বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। তীব্র ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে।

অতি শৈশবের তীব্র ভয় অনেক অনেককাল পরে ফিরে আসে। এটা একটা রিকারিং ফনোমেনা। মনে করুন তিন বছরের কোনো শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেল তাকে শেষমূহুর্তে পানি থেকে উদ্ধার করা হলো। সে বেঁচে গেল। পানিতে ডোবার ভয়ংকর স্মৃতি তার থাকবে না। সে স্বাভাবিকভাবে বড় হবে। কিন্তু ভয়ের এই অংশটি কিন্তু তার মাথা থেকে যাবে না। মস্তিস্কের স্মৃতি-লাইব্রেরিতে সেই স্মৃতি জমা থাকবে। কোনো কারণে যদি হঠাৎ সেই স্মৃতি বের হয়ে আসে তা হলে তার সমগ্র চেতনা প্রচণ্ড নাড়া খাবে। সে ভেবেই পাবে না, ব্যাপারটা কী। আপনি কি শৈশবে কখনো পানিতে ডুবেছেন?'

'হ্যাঁ, চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

'ঘটনাটা বলুন তো।'

'ঘটনা আমার মনে নেই। বাবার ডায়েরি পড়ে জেনেছি। আমার বাবা আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। মৃত্যুভয় কী এটা আমাকে বোঝানোর জন্যে তিনি একটা ভয়ংকর পরীক্ষা করেছিলেন। চৌবাচ্চায় ভরতি করে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তার হাতে ছিল স্টপওয়াচ। তিনি স্টপওয়াচ দেখে পঁচাত্তর সেকেন্ড আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।'

‘আপনার বাবা কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন?’

‘একসময় আমার মনে হতো তিনি মানসিক রোগী। এখন তা মনে হয় না। বাবার কথা থাক। আপনি আমার সম্পর্কে বলুন। আমি মানসিক রোগী কি না সেটা জানা আমার পক্ষে জরুরি।’

‘অতি শৈশবের একটা তীব্র ভয় আপনার ভেতর বাসা বেঁধে ছিল। আমার ধারণা সেই ভয়ের সঙ্গে আরও ভয় যুক্ত হয়েছে। মস্তিস্কের মেমোরি সেলে ভয়ের ফাইল ভারি হয়েছে। একসময় আপনি সেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছেন। তখনই ভয়টা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চাচ্ছে না আপনি তাকে অস্বীকার করুন।’

‘স্যার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন— ঐ রাতে আমি যা দেখেছি সবই আমার কল্পনা?’

‘না । বেশির ভাগই সত্যি। তবে সেই সত্যটাকে কল্পনা ঢেকে রেখেছে।’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ঐ রাতে আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। আপনার স্নায়ু ছিল অবসন্ন।’

‘খুব ক্লান্ত ছিলাম, স্নায়ু অবসন্ন ছিল বলছেন কেন?’

‘আপনার কাছ থেকে শুনেই বলছি। সারারাত আপনি হেঁটেছেন। জোছনা দেখেছেন। তারপর ঢুকলেন গলিতে। দীর্ঘ সময় কোনো-একটি বিশেষ জিনিস দেখায় ক্লান্তি আসে। স্নায়ু অবসন্ন হয়।’

‘ঠিক আছে বলুন।’

‘আপনাকে দেখে কুকুররা সব দাঁড়িয়ে গেল। একটি এগিয়ে এল সামনে, তা-ই না?’

‘জি।’

‘কুকুরদের দলপতি। আবার ঐ ভয়ংকর মূর্তি যখন এল তখন কুকুররা তার দিকে ফিরল। দলপতি এগিয়ে গেল সামনে। দেখুন হিমু সাহেব, কুকুররা যা করেছে তা হচ্ছে কুকুরদের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তারা উদ্ভট কিছু করেনি। অথচ তাদের এই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডই আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কারণ আপনি নিজে স্বাভাবিক ছিলেন না। আপনার মধ্যে একধরনের ঘোর কাজ করা শুরু করেছে। শৈশবের সমস্ত ভয় বাক্স ভেঙে বের হয়ে আসা শুরু করেছে।’

‘তারপর?’

‘আপনি শুনলেন লাঠি ঠকঠক করে কে যেন আসছে। আপনি যদি স্বাভাবিক থাকতেন তা হলে কিন্তু লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির হতেন না। লাঠি ঠকঠক করে কেউ আসতেই পারে। আপনি খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন বলেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আপনার মস্তিষ্ক অসম্ভব উত্তেজিত । সে বিচিত্র খেলা শুরু করেছে। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি সে এলোমেলো করতে শুরু করেছে। আপনি মানুষটা দেখলেন। চাদরগায়ে একজন মানুষ যার চোখ নেই, মুখ নেই। ঠিক না?’

‘জি।’

‘আমার ধারণা আপনি অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়া একজন অন্ধকে দেখেছেন। অন্ধ বলেই সে লাঠি-হাতে হাঁটাচলা করে। আপনাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠি উঁচু করল আপনার দিকে। একজন অন্ধের পক্ষে আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারা কোনো

ব্যাপার না। অন্ধদের ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে। অবিশ্যি অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠরোগীও হতে পারে। কুষ্ঠরোগীও এমন বিকৃত হতে পারে। আমি নিজে কয়েকজনকে দেখেছি।'

আমি বললাম, স্যার একটা কথা, আমি দেখেছি মানুষটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাকে খুব লম্বা দেখাচ্ছিল।

'আপনি যা দেখেছেন তা আর কিছুই না, লাইট অ্যান্ড শেডের একটা ব্যাপার। গলিতে একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো গায়ে ফেলে পরীক্ষাটা করতে পারেন। দেখবেন আলো কোথেকে ফেলছেন, এবং সেই আলো ফেলার জন্যে তার ছায়া কতবড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাকে কত লম্বা মনে হচ্ছে। একে বলে 'optical illusion'- ম্যাজিশিয়ানরা optical illusion ের সাহায্যে অনেক মজার মজার খেলা দেখান।'

'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে?'

'জি মনে হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জটিল সূত্রগুলির মূল কথা খুব সহজ। আপনি যে আপনার মাথার ভেতর শুনলেন কে বলছে ফিরে যাও, ফিরে যাও- তার ব্যাখ্যাও খুব সহজ ব্যাখ্যা । আপনার অবচেতন মন আপনাকে ফিরে যেতে বলছিল।'

'আমি কি আপনার সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেব, না নিজে পরীক্ষা করে দেখব?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার কেন জানি মনে হয় ঐ জিনিসটার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানে আমার মৃত্যু- সে আমাকে ছাড়বে না।'

'তা হলে তো আপনাকে অবশ্যই ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হতে হবে।'

'যদি না হই?'

'তা হলে সে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। আজ একটা গলিতে সে আছে। কাল চলে আসবে রাজপথে। একটি গলি যেমন আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি শুরুতে একটা রাজপথও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হবে, তারপর আরও একটা । তারপর একসময় দেখবেন শহরের সমস্ত পথঘাট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। সেখানেও যে স্বস্তি পাবেন তা না- মাঝরাতে হঠাৎ মনে হবে দরজার বাইরে ঐ অশরীরী দাঁড়িয়ে, দরজা খুললেই সে ঢুকবে...'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে কী উপদেশ দিতেন?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, আপনি যে উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশই দিতেন। আচ্ছা স্যার, আজ উঠি ।

'উঠবেন? আচ্ছা-কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষের কি থটরিডিং আছে?'

'থাকতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই ক্ষমতা সম্ভবত আছে । ডিউক ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা গবেষণা করা হয়েছিল। পঞ্চাশটা ইঁদুরকে দুটা থালায় করে খাবার দেয়া হতো। একটা থালায় নাম্বার 'এবং অন্যটার নাম্বার শূন্য। খাবার দেবার সময় মনে মনে ভাবা হতো শূন্য নাম্বার থালার খাবার যে-ইঁদুর খাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। দেখা গেল শূন্য নাম্বার থালার খাবার কোনো ইঁদুর স্পর্শ করছে না। অথচ একই খাবার।'

‘আপনার ধারণা ইঁদুর মানুষের মনের কথা বুঝত বলেই এটা করত?’
‘হতে পারে।’
‘আপনি থটরিডিং-এর ক্ষমতা আছে এমন কোনো মানুষের দেখা পাননি ?’
‘পেয়েছি। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। নিশ্চিত হতে ইচ্ছাও করেনি। থাকুক-না কিছু রহস্য!’
‘স্যার যাই।’
‘আচ্ছা।’
মিসির আলি সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ।
আমি রাস্তায় নেমে দেখলাম সুন্দর জোছনা হয়েছে।
কোথায় যাওয়া যায়?
কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। পথে-পথে হাঁটতেও ভালো লাগছে না। ভ্রমণের নেশায় মাতাল ভূপর্যটকও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন হাঁটতে ভালো লাগছে না? পরম শ্রদ্ধেয় সাধু যিনি প্রতি সন্ধ্যায় মুণ্ডিত মস্তকে বৎসদের নানান জ্ঞানের কথা বলেন তিনিও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন, আর ভালো লাগছে না? মানুষের শরীরযন্ত্রের দুটি তার একটিতে ক্রমাগতই বাজে- “ভালো লাগছে”, “ভালো লাগছে”— অন্যটিতে বাজে “ভালো লাগছে না”, “ভালো লাগছে না”। দুটি তার একসঙ্গেই বাজতে থাকে। একটি উঁচুস্বরে উঁচুসপ্তকে অন্যটি মন্দ্রসপ্তকে। কারও কারও কোনো একটি তার ছিঁড়ে যায়। আমার বেলায় কী হচ্ছে? ভালো লাগছে তারটি কি ছিঁড়ে গেছে?
ঘরে ফিরে যাব? চারদেয়ালে নিজেকে বন্দি করে ফেলব? সেই ইচ্ছাও করছে না। আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সন্ধানে রওনা হলাম। তিনি কি কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন? মনে হয় না। অতি আদরের মানুষের অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ বড়ই অভিমানী প্রাণী ।
আশরাফুজ্জামান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, কেমন আছেন?
আমি বললাম, ভালো আছি। আপনি কী করছেন?
‘কিছু করছি না। শুয়ে ছিলাম।’
‘শরীর খারাপ?’
‘জি না, শরীর খারাপ না। শরীর ভলো।’
‘খাওয়াদাওয়া করেছেন?’
‘জি না। রান্না করিনি।’
‘আপনার কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?’
‘জি না। ওরা চিটাগাং গেছে। ওর শ্বশুরবাড়ি চিটাগাং।’
‘যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যায়নি?’
‘আমাকে নেবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।’
‘আমি আপনাকে নিতে এসেছি।’
‘কোথায় নিয়ে যাবেন?’
‘তেমন কোথাও না। পথে-পথে হাঁটব। জোছনারাতে পথে হাঁটতে অন্যরকম লাগে, যাবেন?’
‘জি না।’

'পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করবেন, আমি শুনব। তার সব গল্প শোনা হয়নি। যাবেন?'

'আচ্ছা চলুন।'

আমরা পথে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম তাকে নিয়ে প্রচুর হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন– শরীর যতই অবসাদগ্রস্ত হবে মন ততই হালকা হবে।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি মেয়ের উপর খুব রাগ করেছি। আসলে রাগ করিনি। কারণ রাগ করব কেন বলুন, আমি তো আসলেই তার বিয়ে ভেঙেছি। উড়োচিঠি দিয়েছি, টেলিফোনে খবর দিয়েছি।'

'নিজের ইচ্ছায় তো করেননি। আপনার স্ত্রী আপনাকে করতে বলেছেন, আপনি করেছেন।'

'খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আমার মেয়ে বিশ্বাস করে না। তার মা'র সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয় এটাও বিশ্বাস করে না।'

'অল্প বয়সে সবকিছু অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। আমার আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণা দেয়। আমি যে কী ধরনের মন্দলোক এটা শুনতে শুনতে সেও বিশ্বাস করে ফেলেছে।'

'আপনি মন্দলোক?'

'ওদের কাছে মন্দ লোক। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নিই না। নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি করি । এইসব আর কি...'

'ওরা তো জানে না, আপনি যা করেন স্ত্রীর পরামর্শে করেন।'

'জানে। ওদের বলেছি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না।'

'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'জি না।'

'আশ্চর্য তো!'

'আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি। আজ সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলাম। সে থাকলে অবশ্যই কথা বলত। সে নেই।'

'আশরাফুজ্জামান সাহেব, এমনও তো হতে পারে যে তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। আপনার অবচেতন মন তাকে তৈরি করেছে। হতে পারে না?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি?'

'খিদে লেগেছে?'

'জি।'

'আসুন খাওয়াদাওয়া করি।'

'আপনি খান। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব। আপনার সঙ্গে ঘুরতে ভালো লাগছে না। আপনাকে আমি পছন্দ করতাম কারণ

আমার ধারণা ছিল আপনি আমার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন।'

'আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি বা না-করি— আপনাকে তো করি । সেটাই কি যথেষ্ট না?'

'না।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হনহন করে এগুচ্ছেন। আমার খুব মায়া লাগছে। রাগ ভাঙিয়ে ভদ্রলোককে রাতের ট্রেনে তুলে দেয়া যায় না? তুর্ণা নিশিতায় তুলে দেব। সেই ট্রেন চিটাগাং পৌছায় ভোররাতে। আশরাফুজ্জামান সাহেব ট্রেন থেকে নেমে দেখবেন স্টেশনে তাকে নিতে মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের সঙ্গে সব গল্পের সুন্দর সুন্দর সমাপ্তি থাকলে ভালো হয়। বাস্তবের গল্পগুলির সমাপ্তি ভালো না। বাস্তবের অভিমানী বাবারা নিজেদের অভিমান এত সহজে ভাঙে না। রূপকথার মতো সমাপ্তি বাস্তবে হয় না।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব এক সেকেন্ড দাঁড়ান তো?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে তাকে ধরলাম।

'চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দি।'

'দরকার নেই। আমি বাসা চিনে যেতে পারব।'

'আপনার জন্যে বলছি না। আমি আমার নিজের জন্যে বলছি। আমার একটা সমস্যা হয়েছে, আমি একা একা রাতে হাঁটতে পারি না। ভয় পাই।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব শান্তগলায় বললেন, চলুন যাই।

আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরছি, কেউ কোনো কথা বলছি না। আশরাফুজ্জামান সাহেবের গাল চকচক করছে। তিনি কাঁদছেন। কান্নাভেজা গালে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

চোখের জলে চাঁদের ছায়া আমি এই প্রথম দেখছি। অদ্ভুত তো! ভেজা গালে চাদের আলো নিয়ে কি কোনো কবিতা হয়েছে? কোনো গান?

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি।'

'মেয়ের উপর রাগ কমেছে?'

'ওর উপর আমার কখনো রাগ ছিল না। আচ্ছা হিমু সাহেব, আজ কি পূর্ণিমা?'

'জি না। আজ পূর্ণিমা না। পূর্ণিমার জন্যে আপনাকে আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'মেয়েটা কষ্ট পাবে। মেয়েটা ভাববে তার উপর রাগ করে বিষ খেয়েছি।'

'তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে যাবেন। ভালোমতো সব ব্যাখ্যা করবেন, তা হলেই হবে। তার পরেও কষ্ট পাবে। সেই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

'দীর্ঘস্থায়ী হবে না কেন?'

'আপনার মেয়ে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার সংসারে ছেলেপুলে আসবে। কারও হাম হবে, কারোর হবে কাশি। ওদের বড় করা, স্কুলে ভরতি করানো, হোমওয়ার্ক করানো, ঈদে নুতন জামা কেনা, অনেক ঝামেলা। দোকানের পর দোকান দেখা হবে, ফ্রকের ডিজাইন পছন্দ হবে না। এত সমস্যার মধ্যে কে আর বাবার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে!'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হেসে ফেললেন। সহজ স্বাভাবিক হাসি। মনে হচ্ছে তার মন থেকে কষ্টবোধ পুরোপুরি চলে গেছে।

‘হিমু সাহেব!’
‘জি?’
‘আপনি মানুষটা খুব মজার।’
‘মজার মানুষ হিসেবে আপনাকে মজার একটা সাজেশান দেব?’
‘দিন।’
‘চলুন আমরা কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যাই। আপনি তুর্ণা নিশিথায় চেপে বসুন। অন্ধকার থাকতে থাকতে চিটাগাং রেলস্টেশনে নামবেন। নেমেই দেখবেন আপনার মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের চোখভরতি জল। সে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।’
আশরাফুজ্জামান শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, হাসছেন কেন?
‘আপনার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে হাসছি।’
‘পৃথিবীটা ভয়ংকর উদ্ভট। কাজেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা- মাঝে মধ্যে করা যায়।’
‘সবচে বড় কথা কী জানেন হিমু সাহেব? এখন বাজছে রাত বারোটা! তুর্ণা নিশিথা চলে গেছে।’
‘আমার মনে হচ্ছে যায়নি। লেট করছে।’
‘শুধু শুধু লেট করবে কেন?’
‘লেট করবে- কারণ এই ট্রেনে চেপে এক অভিমানী পিতা আজ রাতে তাঁর কন্যার কাছে যাবেন। আমি নিশ্চিত আজ ট্রেন লেট।’
‘আপনি নিশ্চিত?’
‘হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কারণ আমি হচ্ছি হিমু। পৃথিবীর রহস্যময়তা আমি জানি। ট্রেন যে আজ লেট হবে এই বিষয়ে আপনি বাজি ধরতে চান?’
‘হ্যাঁ চাই। বলুন কী বাজি?’
‘ট্রেন যদি সত্যি সত্যি লেট হয় তা হলে আপনি সেই ট্রেনে চেপে বসবেন।’
আশরাফুজ্জামান সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আমি বেবিট্যাক্সির সন্ধানে বের হলাম। দেরি করা যাবে না- অতি দ্রুত কমলাপুর রেলষ্টেশনে পৌঁছতে হবে। আন্তনগর ট্রেন অনন্তকাল কারোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ট্রেন লেট ছিল।
আমরা যাবার পনোরো মিনিট পর ট্রেন ছাড়ল চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে প্রায় পুরো শরীর বের করে আশরাফুজ্জামান সাহেব আমার দিকে হাত নাড়ছেন। তাঁর মুখভরতি হাসি, কিন্তু গাল আবারও ভিজে গেছে। ভেজা গালে স্টেশনের সরকারি ল্যাম্পের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো।

@@

ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে-কথাটা আমার মনে হলো তা হচ্ছে- ‘আজ পূর্ণিমা’। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার কথা মনে হয় না। সূর্য ডোবার পরই মনে হয়- রাতটা কেমন হবে? শুক্লপক্ষ, না কৃষ্ণপক্ষ? আমি অন্যান্যদের মতোই দিনের আলোয় চাঁদের পক্ষ নিয়ে ভাবি না, কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ রাতের চাঁদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ মধ্যরাতে আমি সেই বিশেষ গলিটার সামনে

দাঁড়াব। লাঠিহাতের ঐ মানুষটার মুখেমুখি হবো। মিসির আলির ধারণা- সে আর কিছুই না, সাধারণ রোগগ্রস্ত একজন মানুষ। কিংবা এক অন্ধ— চাঁদের আলোয় লাঠিহাতে যে বের হয়ে আসে। চাঁদের আলো তাকে স্পর্শ করে না ।

আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা সে অন্যকিছু। তার জন্ম এই ভুবনে না, অন্য কোনো ভুবনে। সে-ভুবনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার জন্ম আলোতে নয়— আদি অন্ধকারে।

জানালার কাছে একটা কাক এসে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখছে। তার চোখে রাজ্যের কৌতুহল। আমি দিনের শুরু করলাম কাকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

'হ্যালো মিস্টার ক্রো, হাউ আর ইউ?'

কাক বলল— কা কা।

তার ধ্বনির অনুবাদ আমি মনে মনে করে নিলাম। সে বলছে, ভালো আছি। তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ কেন? কাঁথাগায়ে শুয়ে থাকো। মানবসম্প্রদায়ে তোমার জন্ম । তুমি মহাসুখীজনদের একজন। খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে তোমাকে উড়তে হয় না।

আমি বললাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক দুঃখ আছে রে পাখি। অনেক দুঃখ ।

'দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি।'

'জানি না। আমার মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়- এই যে তুমি এখন উঠবে, এক কাপ গরম চা খাবে, একটা সিগারেট ধরাবে- এই আনন্দ আমরা কোথায় পাব! আমাদের তো মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে!'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তা-ই।'

আমি বিছানা থেকে নামলাম। দুকাপ চায়ের কথা বলে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে নতুন একটা দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আজকের দিনটা আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আমি পরিচিত সবার সঙ্গে কথা বলব। দিনটা খুব আনন্দে কাটাব। সন্ধ্যার পর দিঘির পানিতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করব— তারপর চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে । হাতে-মুখে পানি দিতে দিতে দ্রুত চিন্তা করলাম— কাদের সঙ্গে আমি কথা বলব-

রূপা

আজ তার সঙ্গে কথা বলব প্রেমিকের মতো। তাকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাটিও করা যেতে পারে। একগাদা ফুল কিনে তার বাড়িতে উপস্থিত হবো। রক্তের মতো লাল রঙের গোলাপ।

ফুপা-ফুপু

তাঁরা কি কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন? না ফিরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। কক্সবাজারে কোন হোটেলে উঠেছেন তাও তো জানি না। বড় বড় হোটেল সবকটায় টেলিফোন করে দেখা যেতে পারে।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুরের খাওয়াটা তার সঙ্গে খেতে পারি। তাকে আজ রাতের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা বলা যেতে পারে...

আচ্ছা, দিঘি কোথায় পাব? ঢাকা শহরে সুন্দর দিঘি আছে না? কাকের চোখের মতো টলটলে পানি?

'স্যার চা আনছি।'

আমি চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পাশে রেখে দিলাম— মি. ক্রো যদি খেতে চান খাবেন।

আশ্চর্য, কাকটা ঠোঁট ডোবাচ্ছে গরম চায়ে । কক কক করে কী যেন বলল। ধন্যবাদ দিল বলে মনে হচ্ছে। পশুপাখির ভাষাটা জানা থাকলে খুব ভালো হতো। মজার মজার তথ্য অনেক কিছু জানা যেত। পশুপাখির ভাষা জানাটা খুব কি অসম্ভব? আমাদের এক নবী ছিলেন না যিনি পশুপাখির কথা বুঝতেন? হযরত সুলাইমান আলায়হেস-সালাম । তিনি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতেন। কোরআন শরিফে আছে- পিঁপড়েরা তার সঙ্গে কথা বলেছে। একটা পাখিও তার সঙ্গে কথা বলেছিল, পাখির নাম হুদ হুদ। সূরা সাদে তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

হুদ হুদ পাখি এসে বলল, "আমি এমনসব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আর আমি 'সেবা' থেকে আসল খবর নিয়ে এসেছি । আমি এক নারীকে দেখলাম যে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তার সবই আছে, এবং আছে এক বিরাট সিংহাসন।"

হুদ হুদ পাখি বলেছিল সেবার রানির কথা। কুইন অব সেবা- 'বিলকিস'।

হুদ হুদ পাখিটা দেখতে কেমন? কাক নয় তো?

কাকটা চায়ের কাপ উলটে ফেলেছে। তার ভাবভঙ্গিতে অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করছি। কেমন আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে- যেন বলার চেষ্টা করছে, Sir I am sorry, extremely sorry. I have broken the cup.

না, Broken the cup হবে না, কাপ ভাঙেনি, শুধু উলটে ফেলেছে। চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী হবে? রূপাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে । শতাব্দী স্টোর থেকে কিছু টেলিফোন করে দিনের শুরুটা করা যাক।

শতাব্দী স্টোরের লোকজন আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনজন এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার কেমন আছেন? একজন এসে অতি যত্নে মালিকের ঘরে নিয়ে বসাল। টেলিফোনের চাবি খুলে দিল। আমি বসতে বসতেই কফি চলে এল, সিগারেট চলে এল। পীর-ফকিররা যে কত আরামে জীবনযাপন করেন তা বুঝতে পারছি। শতাব্দী স্টোরে মালিক উপস্থিত নেই, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

'হ্যালো, এটা কি রূপাদের বাড়ি?'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'রূপা বাড়িতে নেই। বান্ধবীর বাসায় গেছে।'

'এত সকালে বান্ধবীর বাড়িতে যাবে কীভাবে! এখনও নটা বাজেনি। রূপা তো

আটটার আগে ঘুম থেকেই ওঠে না।'

'বলেছি তো ও বাসায় নেই।'

'আপনি তো মিথ্যা বলছেন। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষ-আপনি দিনের শুরু করেছেন মিথ্যা দিয়ে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি চাচ্ছেন না, রূপা আমার সঙ্গে কথা বলুক। সেটা বললেই হয়- শুধুশুধু মিথ্য বলার প্রয়োজন ছিল না।'

'স্টপ ইট।'

'ঠিক আছে স্যার, স্টপ করছি। রূপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম- আমার মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আচ্ছা স্যার, চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী?'

খট করে শব্দ হলো । ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি এখন যা করবেন তা হচ্ছে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখবেন, এবং হয়তো-বা মেয়েকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ভদ্রলোককে প্রচুর মিথ্যা কথা আজ সারাদিনে বলতে হবে। মিথ্যা দিয়ে যিনি দিনের শুরু করেন, তাকে দিনের শেষেও মিথ্যা বলতে হয়।

আমি ফুপুর বাসায় টেলিফোন করলাম। ফুপুকে পাওয়া গেল। তিনি রাগে চিড়বিড় করে জ্বলছেন।

'কে, হিমু। আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছিস কিছু?'

'না, কী হয়েছে?'

'রশিদ হারামজাদাটাকে বাসায় রেখে গিয়েছিলাম, সে টিভি, ভিসিআর সব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আলমিরাও খুলেছে। সেখান থেকে কী নিয়েছে এখনও বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় গয়না-টয়না নিয়েছে।'

'না, গয়না নিতে পারবে না। সব গয়না ব্যাংকের লকারে । ক্যাশ টাকা নিয়েছে। তোর ফুপার একটা বোতলও নিয়েছে। খুব দামি জিনিস নাকি ছিল। তোর ফুপা হায়হায় করছে।'

'এই দেখুন ফুপু, সব খারাপ দিকের একটা ভালো দিকও আছে। রশিদ আপনার চক্ষুশূল একটা জিনিসও নিয়ে গেছে।'

'ফাজলামি করিস না- পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কেনা।'

'ফ্রিজে আপনাদের জন্যে চিতলমাছের পেটি রান্না করা ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল। তুই জানলি কী করে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। পরে বলব, এখন বলুন কক্সবাজারে কেমন কাটল।'

'ভালোই কাটছিল, মাঝখানে সাদেক গিয়ে উপস্থিত হলো।'

'মামলা-বিষয়ক সাদেক?'

'হ্যাঁ। দ্যাখ-না যন্ত্রণা! তাকে ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি- সে সত্যি সত্যি মামলাটামলা করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। বেয়াই-বেয়ানের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছি ছি!'

'আপনার বেয়াই-বেয়ান কেমন হয়েছে?'

'বেয়াইসাহেব তো খুবই ভালো মানুষ। অসম্ভব রসিক। কথায়-কথায় হাসছিলেন। তোর ফুপার সঙ্গে তার খুবই খাতির হয়েছে। চারজনে মিলে নরক-গুলজার করেছে।'

'চারজন পেলেন কোথা? ফুপা আর তার বেয়াই দুজন হবে না?'
'এদের সাথে দুই ছাগলাও তো আছে- মোফাজ্জল আর জহিরুল।'
'এই দুইজন এখনও ঝুলে আছে?'
'আছে তো বটেই! তবে দুটাকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ না।'
'ভালো কাজ কী করেছে?'
'সাদেককে শিক্ষা দিয়েছে। আমি তাতে খুব খুশি হয়েছি। সাদেক সবার সামনে মামলা নিয়ে হৈচৈ শুরু করল, ওয়ারেন্ট নাকি বের হয়ে গেছে এইসব। আমি লজ্জায় বাঁচি না। কী বলব কিছু বুঝতেও পারছি না, তখন মোফাজ্জল এসে ঠাশ করে সাদেকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।'
'সেকী!'
'খুবই আকস্মিক ঘটনা, আমি খুব খুশি হয়েছি। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ছোটলোকের বাচ্চা— আমাকে মামলা শেখায়!'
'মোফাজ্জল আর জহিরুল মনে হচ্ছে আপনাদের পরিবারে এন্ট্রি পেয়ে গেছে?'
'এন্ট্রি পাওয়ার কী আছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, মায়া পড়ে গেছে এটা বলতে পারিস।'
'আমাদের সর্বনাশ করল এই মায়া! আমরা বাস করি মায়ার ভেতর আর চেঁচিয়ে বলি আমাদেরকে মায়া থেকে মুক্ত করে!'
'জ্ঞানের কথা বলবি না হিমু চড় খাবি।'
'জ্ঞানের কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হচ্ছে মায়া সর্বগ্রাসী । এই যে রশিদ আপনার এত বড় ক্ষতি করল তার পরেও সে যখন মিডল ইষ্ট থেকে ফিরবে, জায়নামাজ, তসবি এবং মিষ্টি তেঁতুল নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আপনি কিন্তু খুশিই হবেন। আপনি হাসিমুখে বলবেন- কেমন আছিস রে রশীদ?'
'ঐ হারামজাদা কি মিডল ইষ্ট যাচ্ছে?'
'হ্যাঁ।'
'তুই এতসব জানলি ক করে?'
'কী আশ্চর্য, আমি জানব না। আমি হচ্ছি হিমু!'
'তুই ফাজিল বেশি হয়েছিস । তোকে ধরে চাবকানো উচিত, হাসছিস কেন?'
'বাদল এবং আঁখি এরা কেমন আছে?'
'ভালোই আছে। কক্সবাজারে ওরা যে-কাণ্ডটা করেছে- আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা।'
'কী করেছে?'
আরে, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হোটেলের দরজা বন্ধ করে বসা। আমরা এতগুলি মানুষ এসেছি সেদিকে কোনো লক্ষই নেই। ডাইনিংহলে সবাই খেতে বসি, ও খবর পাঠায়- জ্বরজ্বর লাগছে। আসতে পারবে না। খাবার যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার পেটের ছেলে যে এত নির্লজ্জ হবে ভাবতেই পারি না।'
'ফুপু!'
'বল কী বলবি।'
'সত্যি করে বলুন তো ওদের ভালোবাসা দেখে আনন্দে আপনার মন ভরে গেছে না? কী, কথা বলছেন না কেন? আপনাদের যখন বিয়ে হয়েছিল— আপনি এবং ফুপা- আপনারা কি এই কান্ড করেননি?'

'আমরা এত বেহায়া ছিলাম না।'

'আমার তো ধারণা আপনারাও ছিলেন।'

'তোর ফুপা অনেক বেহায়াপনা করেছে। বুদ্ধিকম মানুষ তো! বাদ দে।'

'না, বাদ দেব না। আপনারা কী ধরনের বেহায়াপনা করেছেন তার একটা উদাহরণ দিতেই হবে। জাস্ট ওয়ান।'

'হিমু!'

'জি ফুপু?'

'তুই এত ভালো ছেলে হয়েছিস কেন বল তো?'

'আমি কি ভালো ছেলে?'

'অবশ্যই ভাল ছেলে। তুই আমার একটা কথা শোন- ভালো দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর । তারপর তুই বউমাকে নিয়ে নানান ধরনের বেহায়াপনা করবি- আমরা সবাই দূর থেকে দেখে হাসব।'

'ফুপু রাখি?' বলে আমি খট করে রিসিভার রেখে দিলাম। কারণ কথা বলতে বলতে ফুপু কেঁদে ফেলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি- মাতৃশ্রেণীর মানুষের কান্নাভেজা গলার আহবান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। সেই আহবান এই কারণেই শোনা ঠিক না।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি বললাম, জি না।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব শরীর খারাপ। আপনি কি কোনো কারণে টেনশান বোধ করছেন?'

'স্যার, আজ পূর্ণিমা।'

ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আপনি তা হলে ভয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন?'

'জি স্যার।'

'আপনি যদি চান- আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

'না, আমি চাচ্ছি না।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না।'

আমার সঙ্গে চারটা খান। খাবার অবিশ্যি খুবই সামান্য। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। খাবেন?'

'জি খাব।'

'হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার সাজাই।'

'দুজনের মতো খাবার কি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আজ সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হলো- দুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি আমার এখানে আসবেন। এইসব টেলিপ্যাথিক ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব আমি দিই না-তার পরেও দুজনের খাবার রান্না করেছি। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের মনের একটা অংশ রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। আমরা অনেক কিছুই জানি তাঁর পরেও অনেককিছু জানি না। বিজ্ঞান বলেছে- 'Out of nothing nothing can be created'- তার পরেও আমরা জানি শূন্য থেকেই এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি

তৈরি হয়েছে যা একদিন হয়তো-বা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। ভাবলে ভয়াবহ লাগে বলে ভাবি না।'

'স্যার, আপনার খিচুড়ি খুব ভালো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি যদি মনে করেন ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না তা হলে বাদ দিন।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'বুঝতে পারছি না কেন বলছি। আমার লজিক বলছে- আপনার উচিত ভয়ের মুখোমুখি হওয়া, আবার এই মুহূর্তে কেন জানি মন সায় দিচ্ছেনা। মনে হচ্ছে মস্ত কোনো বিপদ আপনার সামনে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, এরকম মনে হচ্ছে কারণ আপনি আমার প্রতি একধরনের মায়া অনুভব করছেন। যখন কেউ কারও প্রতি মমতাবোধ করতে থাকে তখনই সে লজিক থেকে সরে আসতে থাকে। মায়া, মমতা, ভালোবাসা যুক্তির বাইরের ব্যাপার।

'ভালো বলেছেন।'

'এটা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী । তিনি তার বিখ্যাত বাণীগুচ্ছে তার পুত্রের জন্যে লিখে রেখে গেছেন।'

'আমি কি সেগুলি পড়ে দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। আমি বাবার খাতাটা নিয়ে এসেছি আপনাকে দিয়ে যাব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যদি কোনোদিন ফিরে না আসি আপনি খাতার লেখাগুলি পড়বেন। আর যদি কাল ভোরে ফিরে আসি, আপনি খাতা না-পড়েই আমাকে ফেরত দেবেন।'

'খুব জটিল শর্ত তো না।'

'না। শর্ত আপনার জন্যে জটিল না। আমার জন্যে জটিল।'

মিসির আলি হাসলেন নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমি খাওয়া শেষ করে, খাতা তার হাতে দিয়ে বের হলাম। ঘুম পাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে লম্বা ঘুম দেব যখন জেগে উঠব তখন যেন দেখি চাঁদ উঠে গেছে।

@@

ঘুমভেঙে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমি কোথায় শুয়ে আছি? সবকিছু খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গহিন কোনো অরণ্যে শুয়ে আছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। খুব হাওয়া হচ্ছে- হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। অসংখ্য পাতা একসঙ্গে কেঁপে উঠলে যে অস্বাভাবিক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেরকম শব্দ। ব্যাপারটা কী? আমি ধড়মড় করে উঠে বললাম। তাকালাম চারদিকে। না, যা ভাবছিলাম তা না।

আমি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের একটা পরিচিত বেঞ্চিতেই শুয়েছিলাম । গাছের

পাতার শব্দ বলে যা ভাবছিলাম তা আসলে গাড়ি চলাচলের শব্দ। এতবড় ভ্রান্তিও মানুষের হয়?

আকাশে চাঁদ থাকার কথা না? কই, চাঁদ দেখা যাচ্ছে তো! পার্ক অন্ধকার। পার্কের বাতি কখন জ্বলবে? ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পুর্ণিমার রাতে শহরের সব বাতি জ্বালায় না। চাঁদই তো আছে- সব বাতি জ্বালানোর দরকার কী? এরকম ভাব।

পূর্ণিমার প্রথম চাঁদ হলুদ বর্ণের থাকে। আকারেও সেই হলুদ চাঁদটাকে খুব বড় লাগে । যতই সময় যায় হলুদ রঙ ততই কমতে থাকে। একসময় চাঁদটা ধবধবে সাদা হয়ে আবারও হলুদ হতে থাকে। দ্বিতীয়বার হলুদ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্যরাতের পর । আজ আমার যাত্রা মধ্যরাতে । আমি আবারও চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম ।

'কী দেহেন?'

আমি চমকে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। ঝুপড়ির মতো জায়গায় মেয়েটা বসে আছে। নিশিকন্যাদের একজন। যে-গাছের গুড়িতে সে হেলান দিয়ে আছে সেটা একটা কদমগাছ। আমার প্রিয় গাছের একটি। রুবিয়েসি পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম এনথোসেফালাস কাদাম্বা। গাছটা দেখলেই গানের লাইন মনে পড়ে—"বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।"

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী নাম?

সে 'থু' করে থুথু ফেলে বলল, কদম ।

আসলেই কি তার নাম কদম? না সে রসিকতা করছে, কদমগাছের নিচে বসেছে বলে নিজের নাম বলছে কদম? বিচিত্র কারণে এ-ধরনের মেয়েরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। পৃথিবী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেই বোধহয় খানিকটা রসিকতা তারা পৃথিবীর মানুষদের ফেরত দেয়।

'তোমার নাম কদম?'

'হু।'

'যখন নারিকেল গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বস তখন তোমার নাম কী হয়? নারকেল?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এখন আর তাকে নিশিকন্যাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরীর মতো লাগছে, সে সন্ধ্যাবেলা একা একা বনে বেড়াতে এসেছে। হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। হাসি মানুষের সব গ্লানি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'আমার নাম ছফুরা।'

'ছফুরার চেয়ে তো কদম ভালো।'

'আচ্ছা যান, আফনের জন্যে কদম।'

'একেক জনের জন্যে একেক নাম? ভালো তো!'

'আফনের ভালো লাগলেই আমার ভালো।'

মেয়েটা গাছের নিচ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বেঞ্চিতে বসে হাই তুলল। মেয়েটার মুখ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না, তার পরেও মনে হচ্চে দেখতে মায়াকাড়া। কৈশোরের মায়া মেয়েটি এখনও ধরে আছে। বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। কদম শাড়ি পরে আছে। শাড়ির আঁচলে বাদাম। সে বাদাম ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছে।

'এট্টু পরে পরে আসমানের দিকে চাইয়া কী দেহেন?'

'চাঁদ উঠেছে কি না দেখি।'

'চাঁদের খোঁজ নিতাছেন ক্যান? আফনে কি চাঁদ সওদাগর?'

কদম আবারও খিলখিল করে হাসল। আমি মেয়েটির কথার পিঠ কথা বলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

'রাগ হইছেন?'

'রাগ হবো কেন?'

'এই যে আফনেরে নিয়া তামশা করতেছি।'

'না, রাগ হইনি।'

'আমর ভিজিট পঞ্চাশ টেকা।'

'পঞ্চাশ টাকা ভিজিট?'

'হু।'

'ভিজিট দেবার সামর্থ্য আমার নেই। এই দ্যাখো পাঞ্জাবির পকেট পর্যন্ত নেই।'

'পঞ্চাশ টেকা আফনের কাছে বেশি লাগতেছে?'

'না। পঞ্চাশ টাকা বরং কম মনে হচ্ছে- রমণীর মন সহস্র বৎসরের সখা সাধনার ধন।'

'আফনের কাছে আসলেই টেকা নাই?'

'না।'

'সত্য বলতেছেন?'

'হ্যাঁ। আর থাকলেও লাভ হতো না।'

'ক্যান, মেয়েমানুষ আফনের পছন্দ হয় না?'

'হয়। হবে না কেন?'

আমার চেহারাছবি কিন্তু ভালো। আন্ধাইর বইল্যা বুঝতেছেন না। যখন চাঁদ উঠবো তহন দেখবেন।'

'তা হলে বসো— অপেক্ষা করো। চাঁদ উঠুক।'

'আপনের কাছে ভিজিটের টেকা নাই। বইস্যা থাইক্যা ফায়দা কী?'

'কোনো ফয়দা নেই।'

'আফনে এইখানে কতক্ষণ থাকবেন?'

'বুঝতে পারছি না, ভালমতো চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত থাকব।'

'তাইলে আমি এটু ঘুরান দিয়া আসি?'

'আসার দরকার কী?'

'আচ্ছা যান আসব না। আমার ঠেকা নাই।'

'ঠেকা না থাকাই ভালো।'

'বাদাম খাইবেন?'

'না।'

'ধরেন খান। ভালো বাদাম । নাকি খারাপ মেয়ের হাতের জিনিস খান না?'

কদম আঁচলের বাদাম বেঞ্চিতে ঢেলে দ্রুতপায়ে চলে গেল। আমি বসে বসে বাদাম খাচ্ছি। একটা হিসাবনিকাশ করতে পারলে ভালো হতো— আমি আমার একজীবনে কত মানুষের অকারণে মমতা পেয়েছি, এবং কতজনকে সেই মমতা ফেরত দিতে পেরেছি। মমতা ফেরত দেবার অংশগুলি মনে থাকে- মমতা পাবার অংশগুলি মনে থাকে না । কিছুদিন পর মনেই থাকবে না কদম-নামের একটি পথের মেয়ে নিজের অতি কষ্টের টাকায় কেনা বাদাম আমাকে খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আমি

যখন পথে নামব, ফুটপাতে শুয়ে-থাকা মানুষের দিকে তাকাব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে- বস্তা-ভাই এবং বস্তা-ভাইয়ের পুত্রকে আমি একবার একটা স্লিপিং ব্যাগ উপহার দিয়েছিলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হলুদ রঙের কুৎসিত একটা চাঁদ। চাঁদটাকে সাজবার সময় দিতে হবে। তার সাজ সম্পন্ন হোক, তারপর আমি বের হবো। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, তার পরেও চোখ থেকে ঘুম যাচ্ছে না। বেঞ্চিতে আবার শুয়ে থাকা যাক। আমি শুয়ে পড়লাম। মশা খুব উৎপাত করছে, তবে কামড়াচ্ছে না। বনের মশারা কামড়ায় না। পার্কের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার সঙ্গে ইলেট্রিকের আলো একেবারেই মানায় না। ইলেকট্রিকের আলোয় মনে হচ্ছে গাছগুলির অসুখ করেছে। খারাপ ধরনের কোনো অসুখ।

আমি অপেক্ষা করছি।

কিসের অপেক্ষা? আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি অপেক্ষা করছি কদম-নামের মেয়েটার জন্যে। সে আসবে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। আলোর অভাবে তার মুখ ভালো করে দেখা হয়নি। এইবার দেখা হবে । সে কোথায় থাকে সেই জায়গাটাও তো দেখে আসা যায়। মেয়েটার নিজের কি কোনো সংসার আছে? পাইপের ভেতরের একার এক সংসার। যে-সংসার সে খুব গুছিয়ে সাজিয়েছে। পুরানো কালেন্ডারের ছবি দিয়ে চারদিক সাজানো । ছোট্ট ধবধবে সাদা একটা বালিশ। বালিশে ফুল-তোলা। অবসরে সে নিজেই সুই সুতা দিয়ে ফুল তুলে নিজের নাম সই করেছে- কদম।

না, কদম না। মেয়েটার নাম হলো ছফুরা। নামটা কি আমার মনে থাকবে? আজ মধ্যরাতের পর আবারও যদি ফিরে আসি ছফুরা মেয়েটিকে খুঁজে বের করব। তাকে নিয়ে তার সংসার দেখে আসব। কথাগুলি ময়েটাকে বলে যেতে পারলে ভালো হতো। রাত বাড়ছে, মেয়েটা আসছে না। সে হয়তো আর আসবে না।

কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে কুয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালাম ।

এখন মধ্যরাত ।

আমি দাঁড়িয়ে আছি গলির সামনে। ঐ তো কুকুরগুলি শুয়ে আছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই আগের মতো- কোনো বেশকম নেই। যেন আমি সিনেমাহলে বসে আছি। দেখা ছবি দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো হচ্ছে। ঐ রাতে কুকুরগুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। কী কথা বলেছিলাম মনে পড়ছে না। কিছু মনে পড়ছে না।

পড়েছে। মনে পড়েছে। আমি বলে ছিলাম-তারপর, তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ।

না, এই বাক্যগুলি বলা যাবে না। কুকুররা এখন আর শুয়ে নেই। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীর শক্ত হয়ে আছে। তারা কেউ লেজ নাড়ছে না। তারা হঠাৎ চমকে উলটো দিকে ফিরল। এখন আর এদের কুকুর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। আমি যেন হঠাৎ প্রবেশ করছি- প্রাণহীন পাথরের দেশে, যে-দেশে সময় থেমে গেছে। লাঠির ঠকঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে, সে আসছে।

মাথার ভেতরটা টালমাটাল করছে। ফিসফিস করে কে যেন কথা বলছে। গলার

স্বর খুব পরিচিত, কিন্তু অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে বলে চিনতে পারছি না। চাপা ও গভীর গলায় কে যেন ডাকছে, হিমু— হিমু!

'বলুন, শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কে বল দেখি !'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোর বাবা।'

'আপনি আমার বাবা নন। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি বলেই আমার মন আপনাকে তৈরি করেছে। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে।'

'এইগুলি তো তোর কথা না রে ব্যাটা। এগুলি মিসির আলির হাবিজাবি। তুই চলে আয়। চলে আয় বলছি।'

'না।'

'শোন হিমু। তুই তোর মা'র সঙ্গে কথা বল। এইবার আমি একা আসিনি। তোর মাকে নিয়ে এসেছি।'

'কেমন আছ মা?'

অদ্ভুত করুণ এবং বিষন্ন গলায় কেউ-একজন বলল, ভালো আছি।

'মা শোনো— তোমার চেহারা কেমন আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি দেখতে কেমন। তুমি কি জান আমার জন্মের পরপর বাবা তোমার সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন যাতে কোনোদিনই আমি জানতে না পারি তুমি দেখতে কেমন ছিলে?'

'এতে একটা লাভ হয়েছে না? তুই যে-কোনো মেয়ের দিকে তাকাবি তার ভেতর আমার ছায়া দেখবি।'

'মা, তুমি দেখতে কেমন?'

'অনেকটা কদম মেয়েটার মতো।'

'ওকে আমি দেখতে পাইনি।'

'জানি। হিমু শোন-তুই ঘরে ফিরে যা।'

'না।'

'তোর বাবা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে- তার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

লাঠির ঠকঠক আরও স্পষ্ট হলো। মা'র কথাবার্তা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লাঠির শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কোনো শব্দ নেই। দেখা যাচ্ছে- কুৎসিত ঐ জিনিসটাকে দেখা যাচ্ছে। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে- ঐ তো সে লাঠি উঁচু করল। চাঁদের আলোয় তার ছায়া পড়েনি। একজন ছায়াশূন্য মানুষ।

আমি পা বাড়ালাম। কুকুররা সরে গিয়ে আমার যাবার পথ করে দিল । আমি এগুচ্ছি। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তার পরই আমি তার মুখোমুখি হবো। আচ্ছা, শেষবারের মতো কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখব- আজ রাতের জোছনাটা কেমন?

(সমাপ্ত)

হিমুর রুপালী রাত্রি

হুমায়ূন আহমেদ

ফাতেমা খালা একটা চিরকুট পাঠিয়েছেন। চিরকুটে লেখা—

হিমু,

এক্ষুনি চলে আয়, ম্যানেজারকে পাঠালাম। খবর্দার দেরি করবি না। very urgent.

ইতি
ফাতেমা খালা।

ম্যানেজার ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে আছেন। তার গায়ে স্যুট। পায়ে কালো রঙের জুতা। মনে হয় আসার আগে পালিশ করিয়ে এনেছেন। জুতা জোড়া আয়নার মত চকচক করছে। গলায় সবুজ রঙের টাই। বেশির ভাগ মানুষকেই টাই মানায় না। ইনাকে মানিয়েছে। মনে হচ্ছে ইনার গলাটা তৈরিই হয়েছে টাই পরার জন্যে। ভদ্রলোক আফটার শেভ লোশন, কিংবা সেন্ট মেখেছেন। মিষ্টি গন্ধ আসছে। তার চেহারাও সুন্দর। ভরাট মুখ। ঝকঝকে শাদা দাঁত। বিদেশী টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপনে এই দাঁত ব্যবহার করা যেতে পারে। ভদ্রলোককে ফাতেমা খালার ম্যানেজার বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন মান্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। বোঝাই যাচ্ছে, আমার ঘরটা তাঁর খুবই অপছন্দ হচ্ছে। তিনি সম্ভবত কোন বিকট দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। কারণ কিছুক্ষণ পরপরই চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে নিঃশ্বাস টানছেন। পকেটে হাত দিচ্ছেন, সম্ভবত রুমালের খোঁজে। তবে ভদ্রতার খাতিরে রুমাল দিয়ে নাকচাপা দিচ্ছেন ন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সম্ভবত দুর্গন্ধ কোথেকে আসছে তা বের করার চেষ্টা।

ভদ্রলোক অস্থির গলায় বললেন, ‘বসে আছেন কেন? চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, ‘কোথায় যাব?’

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার খালার বাসায়। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

‘দেরি হবে। হাত-মুখ ধোব, চা-নাশতা করব।’

‘চা-নাশতা ম্যাডামের বাসায় করবেন। চট করে মুখটা শুধু ধুয়ে নিন।’

‘মুখ ধুতেও দেরি হবে। ঘন্টা দুই লাগবে।’

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ার মত করে বললেন, ‘মুখ ধুতে দুঘন্টা লাগবে?’

আমি আবারো হাই তুলতে তুলতে (এবারের হাইটা নকল হাই) বললাম, ‘বেশিও লাগতে পারে। আমাদের এই মেসে একটা মোটে বাথরুম। ত্রিশজন বোর্ডার। ত্রিশজন বোর্ডারের সঙ্গে সব সময় থাকে গোটা দশেক আত্মীয়, কিছু দেশের বাড়ির মানুষ। সব মিলিয়ে গড়ে চল্লিশজন। এই চল্লিশজনের সঙ্গে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। সকালবেলার দিকে লম্বা লাইন হয়।’

‘দু'ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব না। আপনি গাড়িতে উঠুন। হাত-মুখ আপনার খালার বাড়িতে ধুবেন। সেখানকার ব্যবস্থা অনেক ভাল।’

ভদ্রলোকের গলায় এখন হুকুমের সুর বের হচ্ছে। স্যুট-টাই পরা মানুষ অবশ্যি নরম স্বরে কথা বলতে পারে না। আপনাতেই তাদের গলার স্বরে একটা ধমকের ভাব চলে আসে। অবশ্যি সুট পরা মানুষ মিনমিন করে কথা বললে শুনতেও ভাল লাগে না। তাদেরকে ঘরজামাই মনে হয়। শ্বশুরবাড়ির সুটে পার্সোনিলিটি আসে না।

একি এখনো বসে আছেন? বললাম না, চলুন।'

আমি চৌকি থেকে নামতে নামতে বললাম, আজ কি বার?

'মঙ্গলবার।'

আমি আবারো ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লাম। চিন্তিত ভঙ্গিতে বললাম, মঙ্গলবার যদি হয়, তাহলে যাওয়া যাবে না। মঙ্গলবার যাত্রা নাস্তি।

'যাবেন না?'

'জ্বি না। আপনি বরং বুধবারে আসুন।'

'বুধবারে আসব?'

'জ্বি। খনার বচনে আছে — বুধের ঘাড়ে দিয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'

ম্যানেজার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খনার বচন শোনা তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি মনে হয় খানিকটা রেগেও যাচ্ছেন। চোখ ছোট ছোট হয়ে গেছে। রাগলে মানুষের চোখ ছোট হয়ে যায়। আনন্দিত মানুষের চোখ হয় বড় বড়।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনাকে যেতেই হবে। ম্যাডাম আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে তে। আমি না নিয়ে যাব না। আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধোন, চা-নাশতা খান, ইচ্ছে করলে আরো খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করুন। আমি বসছি। দু'ঘন্টা কেন দরকার হলে সাত ঘন্টা বসে থাকব। কিছু মনে করবেন না, নাশত কি নিজেই বানাবেন?'

'জ্বি না। ছকু দিয়ে যাবে।'

'ছক্কুটা কে?'

'বিসমিল্লাহ রেষ্টুরেন্টের বয়।'

'ছক্কু নাশতা কখন দিয়ে যাবে?'

'হাত-মুখ ধুয়ে এসে উত্তর দিকের এই জানালাটা খুলে দেব। এটাই হল আমার সিগন্যাল। বিসমিল্লাহ রেষ্টুরেন্ট থেকে আমার ঘরের জানালা দেখা যায়। ছক্কু আমার ঘরের জানালা খোলা দেখে বুঝবে আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলেছি। সে নাশতা নিয়ে চলে আসবে। পরোটা-ভাজি।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি এখনই জানালাটা খুলে দি। আপনার হয়ে সিগন্যাল দিয়ে দি। নাশতা চলে আসুক। নয়ত নাশতার জন্যে আবার এক ঘন্টা বসতে হবে।'

'আগেভাগে জানালা খোলা ঠিক হবে না। আমার ঘরটা নর্দমার পাশে তো— বিকট গন্ধ আসবে। আপনি নতুন মানুষ। আপনার অসুবিধা হবে। শুধু রুমালে কাজ হবে না। গ্যাস মাস্ক পরতে হবে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে — সহজে বিস্মিত হয় না। তারা যখন বিস্মিত হয় তখন দেখতে ভাল লাগে। এই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে সেই দলের। তার বিস্মিত দৃষ্টি দেখতে ভাল লাগছে। তাকে আরো খানিকটা ভড়কে দিলে কেমন হয়?

ম্যানেজার সাহেব! আপনার নাম কি?

'রকিব! রকিবুল ইসলাম।'

'আপনি ভাল আছেন?'

রকিবুল ইসলাম জবাব দিলেন না। সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না।

‘ফাতেমা খালার ম্যানেজারী কতদিন হল করছেন?’

‘বেশিদিন না, দুমাস।'

‘খালার অবস্থা কি? তার মাথা কি পুরোপুরি আউলা হয়ে গেছে— না এখনো কিছু বাকি আছে?’

‘কি বলছেন আপনি, মাথা আউলা হবে কেন?’

‘গুপ্তধন পেলে মানুষের মাথা আউলা হয়। খালা গুপ্তধন পেয়েছেন। গুপ্তধন এখনো আছে, না খরচ করে ফেলেছেন?’

ম্যানেজার গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, ম্যাডাম সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। উনি আপনার খালা। উনার সম্পর্কে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি পারি না। আমি তার এমপ্লয়ী। আমার অনেক দায়িত্বের একটি হল তার সম্মান রক্ষা করা। হিমু সাহেব, আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। আপনি বরং দয়া করে বাথরুমের লাইনে দাঁড়ান। উত্তরের জানালা খোলার দরকার নেই। আমি বিসমিল্লাহ রেষ্টুরেন্টে গিয়ে ছক্কুকে নাশতা দিতে বলে আসছি।

‘ধন্যবাদ?’

‘আর আপনি যদি চান, আমি আপনার হয়ে লাইনেও দাঁড়াতে পারি।'

‘এই বুদ্ধিটা খারাপ না। আপনি বরং লাইনে দাঁড়ান। আমি চট করে রেস্টুরেন্ট থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি। কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যে খালি পেটে চায়ের কোন তুলনা নেই। কড়া এক কাপ চা। চায়ের সঙ্গে একটা আজিজ বিড়ি। ডাইরেক্ট একশান। কোষ্ঠের জগতে তোলপাড়। কোষ্ঠ মানে কি জানেন তো? কোষ্ঠ মানে হচ্ছে গু। কোষ্ঠ কাঠিন্য মানে কঠিন গু।’

রকিবুল ইসলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এরকম কঠিন চোখে অনেক দিন কেউ আমার দিকে তাকায়নি।

দোতলায় নেমে এলাম। মেসের কেয়ার টেকার হাবীব সাহেব (আড়ালে ডাকা হয় হাবা সাহেব। যদিও তিনি মোটেই হাবা না। চালাকের চূড়ান্ত। সুগার কুটেট কুইনাইনের মত হাবা কেটেট বুদ্ধিমান। বললেন, ‘হিমু ভাই, আজকের কাগজ পড়েছেন?’

আমি বললাম, ‘না।’

‘ভয়াবহ ব্যাপার। আবার একটা ন'বছরের মেয়ে রেপড হয়েছে। একটু দাঁড়ান, পড়ে শোনাই।’

‘এখন শুনতে পারব না। আপনি ভাল করে পড়ে রাখুন — পরে শুনে নেব।’

‘মেয়েটার নাম মিতু। যাত্রাবাড়িতে বাসা। বাবা রিকশা চালায়।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমি একটা ফাইলের মত করছি। সব রেপের নিউজ কাটিং জমা করে রাখছি।’

‘ভাল করছেন।’

হাবা সাহেবের হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ভাগ্য ভাল তাঁর হাত থেকে আজ সহজেই ছাড়া পাওয়া গেল। ভাগ্য একবার ভাল হওয়া শুরু হলে ভালটা চলতেই থাকে। অতি সহজে বাথরুমেও ঢুকে পড়তে পারলাম। মনের আনন্দে দু লাইন গানও গাইলাম —

‘জীবনের পরম লগ্ন করে না হেলা
হে গরবিনী।’

রবীন্দ্রনাথ কি কোনদিন ভেবেছিলেন তার গান সবচে বেশি গীত হবে বাথরুমে! এমন কোন বাঙালি কি আছে যে বাথরুমে ঢুকে দু'লাইন গুণগুণ করেনি!

বাথরুমকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। জগতের মহত্তম চিন্তাগুলি করা হয় বাথরুমে। আমি অবশ্যি এই মুহূর্তে তেমন কোন মহৎ চিন্তা করছি না। ফাতেমা খালার কথা ভাবছি— হঠাৎ খোঁজ করছেন, ব্যাপারটা কি?

ফাতেমা খালার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক মহিলাই ছিলেন। জর্দা দিয়ে পান খেতেন। আগ্রহ নিয়ে টিভির নাটক, ছায়াছন্দ এবং বাংলা সিনেমা দেখতেন। ম্যাগাজিন পড়তেন (তাঁর ম্যাগাজিন পড়া বেশ অদ্ভুত। মাঝখানের পৃষ্ঠা খুলবেন। সেখান থেকে পড়া শুরু হবে। খালা দুটা ভিডিও ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ক্লাব থেকে লেটেস্ট সব হিন্দী ছবি নিয়ে আসতেন। তাঁর ঘরের দু'জন কাজের মেয়েকে নিয়ে রাত জেগে হিন্দী ছবি দেখতেন। কঠিন কঠিন হিন্দী ডায়ালগ ওদের বুঝিয়ে দিতেন। অমিতাভ বচ্চন কেন দিলীপ কুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা— এই ধরনের উচ্চতর গবেষণা ওদের নিয়ে করতেন এবং ওদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

তাঁর একটা অটোগ্রাফের খাতাও ছিল। বাইরে বেরুলেই সেই খাতা তাঁর সঙ্গে থাকত। যে কোন সময় বিখ্যাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। খাতা সঙ্গে না থাকলে সমস্যা। নিউ মার্কেটে একদিন রুটি কিনতে গিয়ে আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ফাতেমা খালাকে অটোগ্রাফ দিলেন —

জয় হোক
আসাদুজ্জামান নূর।

আরেকবার এলিফ্যান্ট রোডে দেখা হল চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে। মৌসুমী ম্যাডাম বোরকা পরে ছিলেন। তারপরেও ফাতেমা খালা তাকে চিনে ফেললেন। মৌসুমী ম্যাডামও অটোগ্রাফ দিয়েছেন –

মানুষ হও
মৌসুমী।

খালার জীবন মোটামুটি সুখেই কেটে যাচ্ছিল। সমস্যা বাধালেন খালু সাহেব। তিনি ফট করে একদিন মরে গেলেন।

ফাতেমা খালার জীবনধারায় বিরাট পরিবর্তন হল। তিনি পুরোপুরি দিশহারা হয়ে গেলেন। খালাকে দোষ দেয়া যায় না। যে কোন মানুষই দিশাহারা হত। কারণ ছোট খালুর মৃত্যুর পর দেখা গেল এই ভদ্রলোক কয়েক কোটি টাকা নানানভাবে রেখে গেছেন। ফাতেমা খালার মত ভয়াবহ খরুচে মহিলার পক্ষেও এক জীবনে এত টাকা খরচ করার কোন উপায় নেই।

ছোট খালু মোহাম্মদ শফিকুল আমিন বিচিত্র মানুষ ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হত মাথা নিচু করে বসে থাকা ছাড়া তিনি কোন কাজ করেন না। বসে থাকা ছাড়া তিনি আর যা করেন তা হচ্ছে গায়ের চাদর দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার। শীত এবং গ্রীষ্ম দুই সিজনেই তিনি গায়ে চাদর পরতেন সম্ভবত চশমার কাচ পরিষ্কারে সুবিধার জন্যে। মোহাম্মদ মুকাদেস মিয়াকে দেখে কে বলবে তার নানান দিকে নানান ব্যবসা — ব্রিক ফিল্ড, স্পিনিং মিলের শেয়ার, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, গারমেন্টসের ব্যবসা, ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা।

ব্যবসায়ী মানুষ মাত্রই উদ্বেগের ভেতর বাস করে। ঘুমের অষুধ খেয়ে রাতে ঘুমায়। পীর-ফকিরের কাছে যাতায়াত করে। হাতে রংবেরং-এর পাথরওয়ালা আংটি পরে। অল্প বয়েসেই তাদের ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, হাই ব্লাড প্রেসার হয়। সবচে বেশি যা হয় তার নাম গ্যাস। ব্যবসায়ী মাত্রেরই পেট ভর্তি থাকে গ্যাস। মাঝারি টাইপের যে কোন ব্যবসায়ীর পেটের গ্যাস দিয়ে দুই বার্নারের একটা গ্যাস চুলা অনায়াসে কয়েক ঘন্টা জ্বালানো যায়। একমাত্র ছোট খালুকে দেখলাম গ্যাস ছাড়া। পেটে গ্যাস নেই, ব্যবসা নিয়ে কোন উদ্বেগও নেই। তাকে বেশির ভাগ সময়ই দেখেছি জবুথবু হয়ে বসে থাকতে। আগবাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলতেন না। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা এক বিয়েবাড়িতে। বিয়েবাড়ির হৈচৈ-এর মধ্যে তিনি এক কোণায় সোফায় পা উঠিয়ে বসে আছেন। মনে হল তার শীত করছে, কেমন গুটিমুটি মেরে বসা। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন?

তিনি নিচু গলায় বললেন, ভাল।

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হু।'

'তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন, চলে যান।'

'তোমার খালার জন্যে বসে আছি। একটু দেখবে – ও যাবে কিনা। মনে হয় না বিয়েবাড়ির মজা ফেলে যাবে।'

আমি খালাকে খুঁজে বের করলাম। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, 'পাগল! আমি এখনি যাব কি? খাওয়া-দাওয়ার পর গান-বাজনা হবে। গান শুনব না? তুই তোর খালুকে চলে যেতে বল। গাড়িটা যেন রেখে যায়। হিমু শোন, তুই একটা উপকার করবি? তোর খালুর সঙ্গে বাসায় চলে যা। আমার অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে আয়।'

'খাতা ফেলে এসেছ?'

'হু। মাঝে মাঝে এমন বোকামি করি যে ইচ্ছা করে নিজেকেই নিজে চড় মারি। চড় মেরে চাপার দাঁত ফেলে দেই।'

'বিয়েবাড়িতে বিখ্যাত কেউ এসেছে?'

'তুই কি গাধা নাকি? দেখতে পাচ্ছিস না— জুয়েল আইচ সাহেব এসেছেন, উনার স্ত্রী বিপাশা আইচ এসেছেন। এরা কতক্ষণ থাকবেন কে জানে। তুই চট করে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আয়। আমার ডেসিং টেবিলের উপর আছে। শুধু খাতা না, কলমও আনবি।'

আমি খালু সাহেবের সঙ্গে বাসায় গেলাম। ডেসিং টেবিলের উপর থেকে ফাতেমা খালার অটোগ্রাফের খাতা উদ্ধার করলাম। খালু সাহেব গুণে গুণে সাত টাকা দিয়ে দিলেন ফেরার রিকশা ভাড়া। আমাকে বললেন, রিকশাওয়ালা আট টাকা চাইবে। দরাদরি করলে সাত টাকায় রাজি হবে।

আমি কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে খালুর দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা। পরদিন খালু সাহেবকে আমি চার টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, 'শেয়ারে রিকশা পেয়ে চলে গেছি। তিন টাকা নিয়েছে। আপনার চার টাকা বাঁচিয়ে দিলাম।'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐদিন গুণে গুণে সাত টাকা দিয়েছি বলে রাগ করেছ?'

আমি বললাম, না, 'রাগ করব কেন?'

'মনে হয় রাগ করেছ। রাগ না করলে এই চার টাকা ফেরত দিতে আসতে না।

যাই হোক, তুমি কিছু মনে করো না। হিসেব করে করে এই অবস্থা হয়েছে। সারাক্ষণ হিসেব করি। গাড়িতে যখন তেল ভরি তখন হিসেব করি কতটুকু তেল নিলাম। গাড়ি কতক্ষণ চলবে। এর আগে কবে তেল নিয়েছি। বুঝলে হিমু, আমি শান্তিমত পাঁচটা টাকাও খরচ করতে পারি না। ঐদিন কি হয়েছে শোন — গাড়ি করে যাচ্ছি মতিঝিল। শেরাটনের কাছে রেড লাইটে গাড়ি থেমেছে — ফুল বিক্রি করে একটা মেয়ে এসে ঘ্যানঘান শুরু করল, ফুল নেন। ফুল নেন। আমি মুখ শক্ত করে বসে আছি। হঠাৎ দেখি আমার ড্রাইভার তার পকেট থেকে ফস করে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটাকে দিয়ে দিল। আমি হতভম্ব।'

'ড্রাইভারের কাণ্ড দেখে খুশি হলেন?'

'না। আমার মাথায় ঢুকে গেল, ড্রাইভার কি পয়সা মারছে? তেল চুরি করছে? নতুন টায়ার বিক্রি করে পুরান টায়ার লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে? তা না করলে ফুলওয়ালীকে ফস করে দশ টাকার নোট দেয় কি করে?'

'আপনি ড্রাইভার ছাঁটাই করে দিলেন?'

'ঠিক ধরেছ। নতুন ড্রাইভার নিলাম। আমি অবশ্যি এমিতেই এক ড্রাইভার বেশিদিন রাখি না। চার মাসের বেশি কাউকেই রাখি না। ডাইভাররা শুরুতেই চুরি শুরু করে না। একটু সময় নেয়। আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের রাখি। তারপর বিদায়। সবই হচ্ছে আমার হিসেব। আমি বাস করি কঠিন হিসেবের জগতে।'

'তার জন্যে কি আপনার মন খারাপ হয়?'

'না, মন খারাপ হয় না। আমাকে তৈরিই করা হয়েছে এইভাবে — মন খারাপ হবে কেন? সাধু সন্ত মানুষ কি মন খারাপ করে – কেন তারা সাধু প্রকৃতির হল? না করে না। কারণ তাদের মানসিক গড়নটাই এমন। আমার বেলাতেও তাই। এই যে তুমি হিমু সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াও — তোমার কি মন খারাপ হয়?'

'না।'

'কফি খাবে?'

'কফিও নিশ্চয়ই আপনার হিসেব করা। আমি খেলে কম পড়বে না?'

'না, কম পড়বে না, খাও। কফি খেতে খেতে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

ছোট খালু নিজেই কফি বানালেন। টিনের কৌটা খুলে বিসকিট বের করলেন। কেক বের করলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন, 'আলসারের মত হয়েছে। ডাক্তার শুধু চা কিংবা কফি খেতে নিষেধ করেছে। গরু ছাগলের মত সারাক্ষণই কিছু খাই।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'নিজের জন্যে এক্সটা খরচ করতে হচ্ছে – এই জন্যে মনটা সব সময় খচখচ করে?'

খালু সাহেব লজ্জিত মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, করে।'

'আচ্ছা খালু সাহেব, আপনার ঠিক কত টাকা আছে বলুন তো?'

'তেমনভাবে হিসেব করিনি। ভালই আছে।'

'ভালই মানে কি?'

'বেশ ভাল।'

'কোটির উপর হবে?'

'তা তো হবেই।'

একটা মানুষের কোটির উপর টাকা আছে, সে নির্বিকার ভঙ্গিতে কফি বানাচ্ছে ভেবেই আমার শীত শীত করতে লাগল। অবশ্যি আজ এমিতেই শীত। কোল্ড

ওয়েভ। শীতটা টের পাচ্ছিলাম না। এখন পাচ্ছি।

'খালু সাহেব চলুন একটা কাজ করি। এক রাতে আমরা দুটা ফিফটিন সিটার মাইক্রোবাস ভাড়া করি। বাস ভরতি থাকবে কম্বল। শীতের রাতে আমরা শহরে ঘুরব– যেখানেই দেখব খালি গায়ে লোকজন শুয়ে আছে– ওমি দূর থেকে তাদের গায়ে একটা কম্বল ছুড়ে দিয়েই লাফ দিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পালিয়ে যাব। যাকে কম্বল দেয়া হয়েছে সে যেন ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগও না পায়।'

'কাজটা কি জন্যে করব, সোয়াবের জন্যে? বেহেশতে যাতে হরপরী পাই?'

'না সোয়াব-টোয়াব না, হঠাৎ দামী কম্বল পেয়ে লোকগুলির মুখের ভাব দেখে মজা পাওয়া। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই মজার অংশ খুব কম। যাদের জীবনে মজার অংশ কম তারা অন্যদের মজা দেখে আনন্দ পায়। দুধের স্বাদ তাতের মাড়ে মেটানোর মত।'

খালু সাহেব সিগারেট ধরালেন। শান্ত মুখে সিগারেট টান দিচ্ছেন, কিছু বলছেন না। আমি কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ছোট খালু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। বাস ভর্তি কম্বল দেয়া যাক। কবে দিতে চাও?'

'পুরোটাই তো আপনার উপর। আপনি যে রাতে ঠিক করবেন, সেই রাতেই যাব। চলুন আজই যাই।'

'আজ না, তুমি আগামী সোমবারে এসো। রাত ন'টার দিকে চলে এসো। এক সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে বের হয়ে পড়ব। রাত বারোটার দিকে বের হব।'

'ঠিক আছে।'

'আমি কম্বল কিনিয়ে রাখব। হাজার পাঁচেক কম্বল কিনলে হবে না?'

'অবশ্যই হবে। কম্বল দিয়ে একবার যদি মজা পেয়ে যান তাহলে আপনি কম্বল দিতেই থাকবেন। কে জানে আপনার নামই হয়ত হয়ে যাবে শফিকুল আমিন কম্বল।'

খালু সাহেব আমার রসিকতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিচুগলায় বললেন, 'কম্বল দেয়া যেতে পারে। আমার যে মাঝে মাঝে দিতে ইচ্ছা করে না, তা না। কেন জানি শেষ পর্যন্ত দেয়া হয় না।'

সোমবার রাত বারোটায় তাঁর কম্বল নিয়ে বেরুবার কথা, উনি মারা গেলেন শনিবার সকাল দশটায়। অফিসে যাবার জন্যে কাপড় পরেছেন, ফাতেমা খালাকে বললেন, 'একটা সুয়েটার দাও তো। ভাল ঠাণ্ডা লাগছে, শুধু চাদরে শীত মানছে না।'

খালা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার হাত বন্ধ, তুমি নিজে খুঁজে নাও। আলমিরায় আছে। নিচের তাকে দেখ।'

খালু সাহেব নিজেই সুয়েটার খুঁজে বের করলেন। সুয়েটার পরলেন না। হাতে নিয়ে খাবার ঘরে বসে রইলেন। ফাতেমা খালা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, তুমি অফিসে যাওনি?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। দেখি এক কাপ লেবু চা দাও তো।'

'সুয়েটার হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?'

'পরতে ইচ্ছা করছে না। আঁস ফাঁস লাগছে।'

ফাতেমা খালা আদা চা বানিয়ে এসে দেখেন খালু সাহেব কাত হয়ে চেয়ারে পরে আছেন। ক্রীম কালারের সুয়েটারটা তার পায়ের কাছে পরে আছে। প্রথম দেখায় তার মনে হল— মানুষটা বুঝি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

আমি সকাল বেলাতেই খবর পেলাম – ঠিক করলাম একটু রাত করে খালাকে দেখতে যাব। সন্ধ্যার মধ্যে চিৎকার, কান্নাকাটি থেমে যাওয়ার কথা। যে বাড়িতে মানুষ মারা যায় সে বাড়িতে মৃত্যুর আট থেকে ন'ঘন্টা পর একটা শান্তি শান্তি ভাব চলে আসে। আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করে চোখের পানির ষ্টক ফুরিয়ে ফেলে। চেষ্টা করেও তখন কান্না আসে না। তবে বাড়ির সবার মধ্যে দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে। সবাই সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক — দেখাবার চেষ্টা করে মৃত্যুতে সে-ই সবচে বেশি কষ্ট পেয়েছে। মূল দুঃখের চেয়ে অভিনয়ের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ। যে বাড়িতে মায়ের কোন সন্তান মারা যায় সে বাড়িতে আমি কখনই যাই না। সন্তান শোকে কাতর মায়ের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হিমুদের দেয়া হয়নি।

আমি রাত ন'টার দিকে ফাতেমা খালার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বাড়ি ভর্তি মানুষ। ফাতেমা খালা নাকি এর মধ্যে কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছেন। এখন একটু সুস্থ। ডাক্তার রিলাক্সেন খেয়ে শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে। তিনি তাঁর শোবার ঘরে ওয়ে আছেন। সেই ঘরে কারের যাবার হুকুম নেই।

হুকুম ছাড়াই আমি শোবার ঘরে ঢুকে গেলাম। খালা আমাকে দেখে হেঁচকির মত শব্দ তুলে বললেন, 'হিমু রে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রে লেবু চা খেতে চেয়েছিল – বুঝলি। ঘরে লেবু ছিল না বলে আদা চা বানিয়ে নিয়ে পরে দেখি এই অবস্থা। নড়ে না, চড়ে না, চেয়ারে কত হয়ে আছে। মানুষটার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। সামান্য লেবু চা, তাও খেতে পারল না।'

'ঘরে লেবু ছিল না?'

'বুলি হিমু আসলে ছিল। পরে আমি ফ্রীজের দরজা খুলে দেখি ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুড়ানো চার-পাঁচটা কাগজি লেবু।'

'ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ানো কেন?'

'কাজের মেয়েটা যে আছে জাহেদার মা— সে কি যে বোকা তুই চিন্তাও করতে পারবি না। তাকে একবার বলেছিলাম, পান ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখতে। এর পর থেকে সে করে কি, যা-ই পায় ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখে।'

খালা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসলেন। আমি এখন স্বস্তি বোধ করছি। খলাকে মৃত্যুশোক থেকে বের করে কাজের মেয়ের সমস্যায় এনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'হিমু শোন, এই মেয়েটা আমাকে যে কি যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছা করে ওর গায়ে এসিড ঢেলে দেই।'

'সে কি?'

'তোর খালু মারা গেছে সকাল দশটায়। এগারোটা থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। আর তখন জাহেদার মা শুরু করেছে কান্না। আছাড় পিছাড় কান্না। বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে যায় এমন অবস্থা। আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, খবর্দার, চোখের পানি, চিৎকার সব বন্ধ। আরেকটা চিৎকার যদি করিস গলা টিপে মেরে ফেলব।'

'কেন? আরে বুঝিস না কেন –তার কান্নাকাটি দেখে লোকজন ভাববে না – বাড়ির বুয়া এত কাঁদে কেন? রহস্যটা কি? তার উপর মেয়েটা দেখতে ভাল। শরীর স্বাস্থ্যও ভাল। ভারী বুক, ভারী কোমর। মাথার চুলও লম্বা। চুলে গোপনে গোপনে

শ্যাম্পু দেয়। আমার শ্যাম্পুর বোতল ফাঁক করে দেয়। এত সাজগোজ লোকজন উল্টাপাল্টা ভাবতে পারে না?'

'তা তো পারেই।'

'এইসব কথা তো কাউকে বলতেও পারি না। তুই এসেছিস, তোকে বলে মনটা হালকা হল। চা খাবি?'

'না।'

'খা এক কাপ চা। তোর সঙ্গে আমিও খাই। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমি তো আর এই অবস্থায় চা দিতে বলতে পারি না। সবাই বলবে স্বামীর লাশ কবরে নামিয়েই চা কফি খেয়ে বিবিয়ানা করছে। ভাঙ্গা দরজারও ছিটকিনি আছে। মানুষের মুখের তো আর ছিটকিনি নেই। তুই যা, চায়ের কথা বলে আয়।'

চা খেতে খেতে খালা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। কোথায় শোক, কোথায় কি? সব জলে ভেসে গেল।

'বুঝলি হিমু, তোর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। তুই যে কোন কথা সহজভাবে নিতে পারিস, বেশির ভাগ মানুষ তা পারে না। একটা সাধারণ কথার দশটা বাঁকা অর্থ বের করে। এখন থেকে তুই আমাকে পরামর্শ দিবি, বুঝলি। তোর পরামর্শ আমার দরকার।'

'কি পরামর্শ?'

'তোর খালু মেলা টাকা রেখে গেছে। বিলি ব্যবস্থার ব্যাপার আছে।'

'কত রেখে গেছেন?'

'পুরোপুরি জানি না। আন্দাজ করতে পারছি। ভয়ে আমার হাত-পা পেটে ঢুকে যাচ্ছেরে হিমু।'

'কেন?'

'টাকাওয়ালা মানুষের দিকে সবার নজর। তাছাড়া আমি মেয়েমানুষ। তোর খালুর আত্মীয়-স্বজনরা এখন সব উদয় হবে। মড়া কান্না কাঁদতে কাঁদতে আসবে। তারপর সুযোগ বুঝে হায়েনার মত খুবলে ধরবে।'

'তুমি বড় হায়েনা হয়ে হাহা করে এমন হাসি দেবে যে হাসি শুনে ওরা পালাবার পথ পাবে না।'

'রসিকতা করিস না। সব দিন রসিকতা করা যায় না। এই বাড়িতে আজ একটা মানুষ মারা গেছে— এটা মনে রাখিস। এখনো কবরে নামেনি। আচ্ছা শোন— কুলখানির একটা ভাল আয়োজন করা দরকার না?'

'অবশ্যই দরকার। এমন খাওয়া আমরা খাওয়াব যে সবার পেটে অসুখ হয়ে যাবে। পরের এক সপ্তাহ ওরস্যালাইন খেতে হবে।'

খালা গম্ভীর গলায় বললেন, 'হিমু তুই আবার ফাজলামি শুরু করেছিস। তোকে অসহ্য লাগছে। একটা মৃত মানুষের জন্যে তোর সম্মান থাকবে না? তুই কি অমানুষ?'

'ঠিক জানি না খালা। আমি কি তা পরে সবাই মিলে ঠিক করলেই হবে। আপাতত এসে কুলখানির মেনু ঠিক করি। তুমি কি খেতে চাও?'

'আমি কি খেতে চাই মানে? ফাজিল বেশি হয়েছিস। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস? আমার সঙ্গে রসিকতা। তুই এক্ষুনি বিদেয় হ। এই মুহূর্তে।'

'চলে যাব?'

খালা রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, 'অবশ্যই চলে যাবি। আমি কি খেতে চাই জিজ্ঞেস করতে তোর মুখে বাধল না? শোন হিমু, আর কোনদিন তুই এ বাড়িতে আসবি না।'

আমি খুবই সহজভাবে বললাম, 'তুমি ডাকলেও আসব না?'

খালা তীব্র গলায় বললেন, 'না, আসবি না। তোর জন্যে এ বাড়ির দরজা বন্ধ। হাবার মত বসে আছিস কেন? চলে যেতে বললাম, চলে যা।'

আমি চলে এলাম। খালা আর ডাকলেন না, আমিও গেলাম না।

দু'বছর হয়ে গেল। ফাতেমা খালা কাঁটায় কাঁটায় দু'বছর পর ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি আবারো যাচ্ছি। তার মধ্যে কি পরিবর্তন দেখব কে জানে। ম্যানেজার সাহেবকে দেখে শংকিত বোধ করছি। মনে হচ্ছে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাব। কে জানে, হয়ত দেখব শাড়ি ফেলে দিয়ে স্কার্ট টপ ধরেছেন। চুল বব করিয়ে ফেলেছেন। মাথার সাদা চুলে আগে মেন্দি দিতেন। এখন সম্ভবত রিচ করাচ্ছেন।

'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি।'

'ফাতেমা খালা - আপনার ম্যাডাম আছেন কেমন?'

'ভাল আছেন। গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে, চিকিৎসার জন্যে শিগগিরই সিঙ্গাপুর যাবেন।'

'গ্যাসের প্রবলেম মানে কি? পেটে গ্যাস হচ্ছে?'

'জ্বি।'

'খুবই দুঃসংবাদ। মেয়েদের পেটে গ্যাস একেবারেই মানায় না। গ্যাসের জন্যে সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে?'

'গ্যাসটাকে তুচ্ছ করে দেখবেন না। গ্যাসের প্রবলেম থেকে অন্যান্য মেজর প্রবলেম দেখা দেয়। গ্যাস বেশি হলে উপরের দিকে ফুসফুসের ডায়াফ্রেমে চাপ দেয়, হার্টের ফাংশানে ইন্টারফেয়ার করে।'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, 'ভাই আপনি তো মনে হচ্ছে জ্ঞানী ম্যানেজার। ডাক্তারীও জানেন।'

ভদ্রলোক আমার রসিকতা পছন্দ করলেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন। সারা পথে তার সঙ্গে আমার আর কোন কথাবার্তা হল না। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম — ম্যানেজার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'গাড়িতে এসি চলছে। সিগারেট ফেলে দিন।'

আমি বড়ই সুবোধ ছেলে হয়ে গেলাম। সিগারেট ফেলে দিলাম।

ফাতেমা খালাকে দেখে আমি ছোটখাট একটা চমক খেলাম। স্কার্ট টপ না, তিনি সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজই পরে আছেন। সাধারণ মানে বেশ সাধারণ – সুতি শাড়ি। হালকা সবুজ রঙে সাদা সুতার কাজ করা। তার পরেও তাঁকে দেখে চমকাবার কারণ হচ্ছে তাঁকে খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমে গেছে। মুখ হাসি হাসি। পান খেয়েছেন বলে ঠোঁট লাল হয়ে আছে। সারা শরীরে সুখী সুখী ভাব। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

খালা বললেন, 'হা করে কি দেখছিস?'

'তোমাকে দেখছি। তোমার ব্যাপারটা কি?'

‘কি ব্যাপার জানতে চাস?’

‘তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?’

‘কেমন দেখাচ্ছে?’

‘খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমিয়ে ফেলেছ।’

‘ফাজলামি করিস না হিমু।'

‘ফাজলামি করছি না। আমার এই হলুদ পাঞ্জাবীর শপথ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কুড়ি বছর কমেছে।’

‘একটু আগে তো বললি দশ বছর কমেছে।'

‘শুরুতে দশ বছর মনে হচ্ছিল – এখন মনে হচ্ছে কুড়ি । ব্যাপারটা কি?’

খালা আনন্দিত গলায় বললেন, ‘ফুড হেবিট চেঞ্জ করেছি। এখন এক বেলা ভাত খাই। শুধু রাতে। তাও গাদা খানিক খাই না, চায়ের কাপের এক কাপ ভাত। আতপ চালের ভাত। দিনে শাকসব্জি, ফলমূল খাই। সেই সঙ্গে ভিটামিন।'

‘কি ভিটামিন?’

‘ভিটামিন ই। এন্টি এজিং ভিটামিন। খুব কাজের। ভিটামিন ই ক্রীম পাওয়া যায়। ঐ ক্রীম মুখে মাখি। গুলশানে একটা হেলথ ক্লাবে ভর্তি হয়েছি। কী হ্যান্ড একসারসাইজ করি। একসারসাইজের পর সোয়ানা নেই। সোয়ানার পর আধঘণ্টা সুইমিং করি। সোয়ানাটা শরীরে ফ্যাট কমানের জন্যে খুব উপকার।'

‘সোয়ানাটা কি?’

‘স্টীম বাথ। দশ-পনেরো মিনিট ষ্টীম বাথ নিলে শরীর পুরোপুরি রিলাক্সড হয়ে যায়। টেনশন কমে। সুস্থ থাকার প্রধান রহস্য টেনশন ফ্রী থাকা।'

‘সোয়ানা-ফুয়ানা নিয়ে তুমি যে টেনশন ফ্রী হয়েছ এটা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এবং খুবই ভাল লাগছে। তোমাকে মায়াবতী লাগছে। তবে তোমার ম্যানেজার বলছিল তুমি নাকি মায়াবতীর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসোবতী হয়েছ। গ্যাস ছেড়ে আসার জন্যে সিঙ্গাপুর যাচ্ছ।’

খালা গম্ভীর গলায় বললেন, ‘গ্যাসোবতী হয়েছি মানে — কি ধরনের কথা বলছিল। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান রেখে কথা বলবি না? আমি তোর খালা না? আমি কি তোর ইয়ার-বান্ধবী?’

‘অবশ্যই তুমি আমার খালা। ধনবতী খালা। আমাকে ডেকেছ কেন বল?’

‘তাড়াহুড়া করছিস কেন? বলব। তোকে খুব জরুরী কাজে ডেকেছি। গুছিয়ে না বললে তুই বুঝবি না। সময় নিয়ে বলতে হবে। তুই তো একেবারে কাকের মত হয়ে গেছিস, খুব রোদে রোদে ঘূরিস?’

‘হু ঘুরি।’

‘আজকের জন্যে ঘোরাঘুরি বাদ দে। বাড়িটা নতুন করে ঠিকঠাক করেছি। ঘুরে ফিরে দেখ, মজা পাবি। সপ্তাহখানিক পরে এলে সোয়ানা পাবি। আর্কিটেক্ট ডেকে সোয়ানা বানাতে বলে দিয়েছি। রোজ রোজ গুলশানে গিয়ে পোষায় না।’

‘ভাল করেছ।’

‘সোয়ানাটা বানানো হলে তোর যখন ইচ্ছা করে সোয়ানা নিয়ে যাবি। দারোয়ানকে বলে দেব— আমি না থাকলেও ঢুকতে দেবে।’

‘থ্যাংক য়্যু।'

‘একটা সুইমিং পুল দেবার ইচ্ছা ছিল। আর্কিটেক্ট বলল, সম্ভব না। জায়গা নেই।

ছাদের উপর যে করব সে উপায়ও নেই। সুইমিং পুলের লোড নেয়ার মত স্টাকচারাল ষ্টেংগথ বাড়ির নেই।'

'নতুন বাড়ি করছ না কেন?'

'নতুন বাড়ি করার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। বাড়ি করা কোন ব্যাপার না। জলশানে তোর খালু জায়গা কিনে রেখেছিল। ভাবলাম কি দরকার পুরানো বাড়িতে তো ভালই আছি। তাছাড়া তোর খালুর এই বাড়িতে আছে। মানুষটা তো হারিয়েই গেল, তার স্মৃতিটা থাক। কি বলিস ?'

'ঠিকই বলছ।'

'আমার ম্যানেজার কেমন দেখলি?'

'স্যুট পরা ম্যানেজার?'

'আমিই বলেছি স্যুট পরতে। স্মার্ট লাগে। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা একটা লোকের কথায় মানুষ যতটা গুরুত্ব দেয় স্যুট পরা মানুষের কথায় তারচে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়।'

'মানুষটা কে তার উপরেও কিছুটা নির্ভর করে। নেংটি পরা মানুষের কথাও লোকজন খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনে, যদি মানুষটা হয় মহাত্মা গান্ধী।'

'ফালতু কথা বলিস না তো হিমু, মহাত্মা গান্ধীকে আমি ম্যানেজার হিসেবে পাব কিভাবে? আমি যা পেয়েছি তাই ভাল। খুব চালাক চতুর ছেলে। মাছির মত চারদিকে চোখ। সব দেখছে। সমস্যা হলে নিজেই ডিসিশান নিচ্ছে, তেমন প্রয়োজন হলে আমাকে জানাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার বুঝতেই তো পারছিস।'

'টাকা এখনো খরচ করে শেষ করতে পারনি?'

'কি বলছিস তুই? তোর কি ধারণা, হাতে টাকা পেয়ে দুই হাতে উড়াচ্ছি? খুব ভুল ধারণা। খরচ তো অবশ্যই করছি। টাকা তো খরচের জন্যেই। ব্যাংকে জমা রেখে টাকার ডিম পাড়ানোর জন্যে না। তবে খরচ-টরচ করেও তোর খালু যা রেখে গেছে সেটাকেও বাড়িয়েছি। গুলশানের এত বড় জায়গা শুধু শুধু ফেলে রেখেছিল – রিয়েল এষ্টেট কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছি। আমাকে চারটা ফ্ল্যাট দিচ্ছে, প্লাস এক কোটি টাকা ক্যাশ — বুলবুলই সব ব্যবস্থা করেছে।'

'বুলবুল তোমার ম্যানেজার?'

'হ ভাল নাম রকিবুল ইসলাম। ডাকনাম বুলবুল। আমি বুলবুলই ডাকি।'

'বুলবুল সাহেব তাহলে তোমার ডান হাত?'

'তা বলতে পারিস— খুব ওস্তাদ ছেলে। হঠাৎ করে তোর খালুর এক আত্মীয় সেদিন বের হল, সৎ বোন। সম্পত্তির ভাগ নিয়ে হৈচৈ শুরু করল। ছোট আদালতে মামলাও করে দিল। বুলবুল তাকে এমন প্যাচে ফেলেছে যে তার চৌদ্দটা বেজে গেছে। এখন কেঁদে কূল পাচ্ছে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তামান্নাকে বললাম, বলে দাও আমার সঙ্গে দেখা হবে না। তারপরেও যাবে না। শুরু করেছে কান্নাকাটি। আমি তামান্নাকে বললাম, যেভাবে পার ঐ মহিলাকে বিদায় কর। একবার বলেছি দেখা করব না – দেখা করব না।'

'তামান্না আবার কে?'

'ও আচ্ছা, তামান্নার কথা তো তোকে বলা হয়নি—আমার পি.এ। বুলবুল যেমন শক্ত, তামান্না তেমনি নরম। উচু গলায় কাউকে কোন কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব না। তুই তার সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে কিছু বলবি ওমি দেখবি মেয়ের চোখ ছলছল

করছে।’

‘তামান্নাকে দেখছি না তো।’

‘দেখবি। আজ রোববার তো, ওর আসতে দেরি হবে। রোববার সে তার সংসারের জন্যে বাজার করে। সংসার মানে ভাই-বোন, মা-বাবার সংসার। আমরা বিয়ে করেনি। বিয়ে করবেই বা কিভাবে ঘাড়ে এত বড় সংসার। যাই হোক, ওকে নিয়ে আর তোকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে।’

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ‘এই জন্যে তুমি আমাকে আনিয়েছ?’

খালা হাসিমুখে বললেন, ‘তোকে আনিয়েছি অন্য কারণে। সেটা এখন না, পরে বলব। তার সঙ্গে তামান্নার সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তুই তামান্নাকে দেখ। তার সঙ্গে কথাবার্তা বল। সারাজীবন পথে পথে ঘুরবি নাকি? হিমুগিরি তো অনেকদিন করলি, আর কত। ঘর-সংসার করবি না? মুসলমান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম না – সংসার ধর্মই আসল ধর্ম।’

‘মেয়েটা দেখতে কেমন?’

‘সাধারণ বাঙালি মেয়ের মত। সাধারণের চেয়ে একটু ডাউনও হতে পারে। তবু খুব বেশি ডাউন না। চলে। আর তুই নিজেও তো বাগদাদের রাজপুত্র না। চেহারা করেছিস কাকের মত, চাকরি নেই, কিছু নেই। কাকের মতই এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খাচ্ছিস। যে মেয়ে তোকে বিয়ে করতে রাজি হবে বুঝতে হবে তার ব্রেইনে সমস্যা।’

‘তামান্না তো তাহলে রাজি হবে না।’

‘সেটা আমি দেখব। তুই একটা কাজ কর, হাত-মুখ ধুয়ে মোটামুটি ভদ্র ভাব ধরার চেষ্টা কর । এখনও খালি পায়ে থাকিস?’

‘হু।’

‘দাঁড়া, স্যান্ডেল কিনিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা শোন, এক কাজ কর, আমি বুলবুলকে বলে দিচ্ছি ও তোকে স্যান্ডেল কিনে দেবে। নাপিতের দোকান থেকে চুল কাটিয়ে আনবে। ভাল একটা পাঞ্জাবী কিনে দেবে। অসুবিধা আছে?’

‘কোন অসুবিধা নেই।’

খালা ম্যানেজারকে কি সব বললেন। নিচু গলায় বললেন, আমি কিছুই শুনলাম না।

ম্যানেজার সাহেব কর্মী মানুষ। তিনি প্রথমে আমার চুল কাটালেন। চুল কাটার সময় সামনে উপস্থিত থাকলেন এবং ক্রমাগত নাপিতকে ডিরেকশন দিতে লাগলেন —পেছনেরটা আরেকটু ছোট। সামনে বড়, জুলফি আরেকটু রাখ। চুল কাটাকে মনে হচ্ছিল শিল্পকর্ম এবং তিনি একজন মহান শিল্পনির্দেশক । মাথার চুলে পথের পাঁচালী বানানো হচ্ছে এবং তিনি সত্যজিৎ রায়।

চুল কাটার পর শ্যাম্পু করা হল, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো হল। তারপর আমরা গেলাম স্যান্ডেল কিনতে। নিউ এলিফ্যান্ট রোড থেকে মেড ইন ইটালী স্যান্ডেল কিনলাম। মাখনের মত মোলায়েম স্যান্ডেল। স্যান্ডেল জোড়া যেন গুণগুণ করে গাইছে, ‘চরণ ধরিতে দিও গো আমারে ......' পায়জামা পাঞ্জাবী কেনা হল। পাঞ্জাবীর উপর ফেলে রাখার জন্যে চাদর। সুতির চাদর তবে সুন্দর কাজ আছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, ‘চলুন, চশমা কিনে দেই।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘চশমা কেন? আমার তো চোখ খারাপ না।’

ম্যানেজার বিরক্ত মুখে বললেন, ‘চোখ খারাপের চশমা না, গেটাপ চেঞ্জের

চশমা। অনেক মানুষ আছে চশমা পরলে তাদের গেটাপে বিরাট পরিবর্তন হয়। যাদের চেহারায় মাংকি ভাব আছে — চশমা তাদের জন্যে মাষ্ট । মুখের অনেক—খানি ঢেকে ফেলে।’

আমার চেহারায় মাংকি ভাব আছে তা জানতাম না। আমি শুধু বললাম, ‘ও, আচ্ছ।’

‘আপনি যেভাবে ও আচ্ছা বললেন তাতে মনে হল আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। কথা সত্যি। গলায় টাই পরলে মানুষকে এক রকম লাগে, আবার টাইয়ের বদলে কাঁধে চাদর ফেললে অন্য রকম লাগে। তেমনি চশমা পরলে লাগবে এক রকম, চশমা না পরলে লাগবে আরেক রকম। সুন্দর ফ্রেম দেখে জিরো পাওয়ারের একটা চশমা কিনে দি চলুন।’

‘চলুন।’

আমি তোল পাল্টে ফেললাম। চশমা পরলাম। পাঞ্জাবী বদলে নতুন পাঞ্জাবী পরলাম। ডেসিং রুম ছিল না বলে পায়জামা বদলানো গেল না। কাঁধে ফেললাম চাদর। ম্যানেজার সাহেব ক্রিটিকের মত শুকনো গলায় বললেন, ‘আপনাকে দেখতে ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। প্রেজেন্টেবল। শুধু চুল কাটাটা তেমন ভাল হয়নি। আজকালকার নাপিত চুল কাটতে জানে না।'

‘চলুন আরেকবার কেটে আসি। মনে আফসোস রাখা ঠিক না।’

ম্যানেজার সাহেব বললেন, ‘না থাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলুন যাই।’

বাড়ি ফিরলাম। আমাকে দেখে ফাতেমা খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, ‘আরে তোকে তো চেনা যাচ্ছে না। তোর চেহারা থেকে চামচিকা ভাবটা মোটামুটি চলে গেছে।'

‘আমি কদমবুচি করে ফেললাম। খালা বললেন, ‘ওকি, সালাম করছিস কেন?’

‘নতুন জাম-কাপড় পরেছি এই জন্যে। তামান্না কি এসেছে খালা?’

‘না আজ আসবে না। ওর বাসায় সমস্যা হয়েছে। ওর ছোট ভাইটা রিকশা থেকে পরে সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছে। তামান্না ওকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। পুরো পরিবারটা মেয়েটার ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে আছে। একা সে কাদিক সামলাবে? দুর্গার মত তার তো আর চারটা হাত না, দুটা মোটে হাত।’

‘খালা আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে — এত ঝামেলা করে গেটাপ চেঞ্জ করা হল, কোন কাজে লাগল না। তামান্নার সঙ্গে দেখা হল না। এক কাজ করলে হয় না? ঠিকানা দাও বাসায় চলে যাই।’

‘বাসায় গিয়ে কি করবি?’

‘তামান্নাকে বলব, আমাকে ফাতেমা খালা পাঠিয়েছেন। আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পরে ব্যথা পেয়েছে— ঐ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছেন। তামান্নার ছোট ভাইটার নাম কি খালা?’

‘জামাল।’

‘জামানের বয়স কত?’

‘পাঁচ বছর।’

‘জামানের জন্যে বেলুন-টেলুন জাতীয় কোন গিফট নিয়ে গেলে কেমন হয় খালা?’

‘তুই কি সত্যি যাবি?’

‘অবশ্যই।’

'যাক, তোর মধ্যে কিছু চেঞ্জ তাহলে এসেছে। আমি ভেবেছিলাম তুই আর বদলাব না।'

'বাসার ঠিকানা দাও, রিকশা ভাড়া দাও ঘুরে আসি।'

'তামান্নার বাসায় উপস্থিত হওয়াটা বাড়াবাড়ি হবে। আমি ব্যবস্থা করব, তুই চিন্তা করিস না। যে জন্য তোকে ডেকে আনালাম সেটি তো বলা হল না।'

'কখন বলবে?'

'আয়, শোবার ঘরে আয় ---বলি।'

ফাতেমা খালার শোয়ার ঘরে আমি বসে আছি। খালা খাটে, আমি খাটের সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে। খালা কথা বলছেন ফিসফিস্ করে। দরজাও ভেজিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘর আধো অন্ধকার। কেমন ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব। মিলিটারী কু যখন হয় তখন সম্ভবত জেনারেলরা এইভাবেই কথা বলেন।

'একজন লোককে তুই খুঁজে বের করব। লোকটার নাম ইয়াকুব । বাবার নাম সোলায়মান মিয়া। বয়স পঞ্চাশের উপর। তার স্থায়ী ঠিকানা আমার কাছে নেই। ঢাকায় যেখানে থাকতো সেই ঠিকানা আছে– অতীশ দীপংকর রোড। সেখানে এখন নেই। ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলাম। কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না৷ তোর কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করা। ঢোল পিটিয়ে খোঁজা যাবে না। চুপি চুপি খুঁজতে হবে।'

'তোমার ম্যানেজার যেখানে ফেল করেছে সেখানে আমি পাশ করব কিভাবে।'

'তুই পাশ করবি। তোর কাজই তো পথে পথে ঘোরা। আর ইয়াকুব লোকটা খুব সম্ভব পথে পথেই থাকে।'

'যদি পাই কি করব? কানে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসব?'

'আমার কাছে আনতে হবে না। খবর্দার আমার কাছে আনবি না। তুই তার সঙ্গে গল্পগুজব করবি।'

ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব, এই আমার কাজ?'

'হু।'

'খালা আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কি ধরনের গল্পগুজব করব? দেশের রাজনীতি? হাসিনা-খালেদা সংবাদ?'

খালা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়া, তোকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি। পুরো ঘটনা না শুনলে তুই গুরুত্বটা বুঝবি না। আমাকে কথা দে যে দ্বিতীয় কেউ জানবে না। কসম কাট।'

'কসম কাটছি কেউ জানবে না।'

'এইভাবে কেউ কসম কাটে? তোর কোন প্রিয় মানুষের নামে কসম কাট।'

'তামান্নার কসম। দ্বিতীয় কেউ জানবে না।'

খালা অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর সবকিছু নিয়ে ফাজলামিটা আমার অসহ্য লাগে। তোকে খবর দিয়ে আনাই ভুল হয়েছে। তামান্নার নামে কসম কাটছিস কোন হিসেবে? ও তোর অতি প্রিয়জন হয়ে গেল?'

'তুমিও আমার অতি প্রিয়। তোমার নামে কসম কাটব?'

'থাক কসম কাটতে হবে না। ঘটনাটা শোন – তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে কেউ যেন না জানে।'

'কেউ জানবে না খালা। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলুন।'

দরজা ভেজানোই ছিল। খালা উঠে গিয়ে লক করে দিলেন। এতেও তার মন ভাল না। তিনি আবার দরজা খুলে বাইরে উকি দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। চেয়ার টেনে আমার কাছে নিয়ে এলেন। গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন, 'তোর খালুজান ছিল খুব বেষয়িক মানুষ। তার বিলি-ব্যবস্থা, হিসাব-নিকাশ খুব পরিষ্কার। তার মৃত্যুর পর টাকা-পয়সার কি করতে হবে না করতে হবে সব সে লিখে গেছে। উকিলকে দিয়ে সাক্ষি-সাবুদ দিয়ে উইল করে গেছে। সেই উইল ঘাঁটতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ— ইয়াকুব নামের এক লোককে সে মালীবাগের বাড়ি আর নগদ দশ লাখ টাকা দিয়ে গেছে।'

'সে কি, কেন?'

'আমারো তো সেটাই প্রশ্ন— কেন? তোর খালুজানের কাছে সারাজীবনে একবার তার নাম শুনলাম না কোথাকার কোন ইয়াকুব —তাকে বাড়ি আর দশ লাখ টাকা। তোর খালুর কি ভীমরতি হয়েছে।'

'ভীমরতি-ফতি খালুজানের হবে না।'

'ঠিক বলেছিস সে ঐ টাইপের না। টাকা যখন দিয়েছে তখন কোন কারণেই দিয়েছে।'

'এ লোককে খুজে বার করা তোমার জন্যে খুব বোকামি হবে। ও আসবে বাড়ি আর নগদ টাকা নিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ভিনি ভিডি ভিসি।'

'গাধার মত কথা বলিস না তো হিমু। বাড়ি আর টাকা নেয়া অত সহজ— আমি শুধু জানতে চাই তোর খালুজানের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কি ছিল? আমার ধারণা ফিসফাস কোন ব্যাপার?'

'ফিসফাস ব্যাপার মানে? ফিসফাসটা কি?'

'মেয়েঘটিত কিছু।'

'কিছুটা কি?'

'সেটা কি আর আমি জানি নাকি?'

'খালুজান যেমন মানুষ তাঁর তেমন ভীমরতি হওয়া সম্ভব না, তেমনি ফিসফাস হওয়াও সম্ভব না।'

'পুরুষ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। পুরুষ জাতি বড়ই আজব জাতি।'

'তাহলে আমার কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করে তার পেটের ভেতর থেকে গল্প টেনে বের করে নিয়ে আসা।'

'হু। পারবি না?'

'ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করতে পারলে পারব।'

'বুঝলি হিমু, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে লোকটাকে পাওয়া যেত, কেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না— বুঝতেই পারছিস।'

'তা পারছি।'

'তুই এই উপকারটা আমার কর। লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি তোকে খুশি করে দেব।'

'আচ্ছা।'

'খুজে বের করতে পারবি না?'

'মনে হয় পারব।'

‘কিভাবে খুঁজবি?’

‘রাস্তায় রাস্তায় হাঁটব— সন্দেহজনক কাউকে দেখলে জিজ্ঞেস করব, স্যার আপনার নাম কি ইয়াকুব? নাম যদি ইয়াকুব না হয় তাহলে আমার কোন কথা নেই। আর নাম যদি ইয়াকুব হয় তাহলে আমার একটা কথা আছে। কথাটা হচ্ছে আপনার পিতার নাম কি?’

‘হিমু।'

‘কি খালা?’

‘তুই তো মনে হয় আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছিস। তোকে ইয়ারকি করার জন্যে আমি ডাকিনি। আমি খুব ভাল করে জানি ইয়াকুব নামের লোকটাকে খুঁজে বের করা তোর কাছে কোন ব্যাপার না। ইচ্ছা করলে তুই তিন দিনের মাথায় লোকটাকে বের করে ফেলবি। এই জন্যেই তোকে ডাকিয়েছি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

‘তুই লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি কথা দিচ্ছি তোকে খুশি করে দেব।’

‘আমি তো সব সময় খুশি হয়েই আছি। তুমি এরচে বেশি খুশি কি করে করবে?’

‘বললাম তো তোকে খুশি করব। কিভাবে করব সেটা তখন দেখবি।'

‘আজ তাহলে বিদায় হই খালা?’

‘আচ্ছা যা।’

‘স্যান্ডেল চশমা এইসব রেখে যাই? তামান্নার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা যখন হবে তখন পরব। খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে। স্যান্ডেল পায়ে পথে নামলে হুমড়ি খেয়ে চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়ে যেতে পারি। তেমন কিছু ঘটলে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান পাবে না। সেটা ঠিক হবে না।'

‘তোর যা ইচ্ছা কর। তোর কথাবার্তা একনাগাড়ে শোনা অসম্ভব ব্যাপার। তুই যে কি বলিস না বলিস তা বোধহয় তোর নিজেরো জানা নেই।'

আমি স্যান্ডেল, চাদর, চশমা রেখে খালার বাড়ি থেকে বের হলাম। গেটের দারোয়ান সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আচ্ছা, এই দারোয়ানের নাম ইয়াকুব না তো? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। অনুসন্ধান খালার বাড়ির গেট থেকেই শুরু হোক। দারোয়ানের বয়স চল্লিশের উপরে। কাজেই তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখা যেতে পারে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দারোয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বললাম, ‘কে ইয়াকুব না? ইয়াকুব কেমন আছ? ভাল?’

দারোয়ান থতমত খেয়ে বলল, ‘স্যার আমার নাম কালাম।’

‘ও আচ্ছা, কালাম তোমার চেহারা অবিকল ইয়াকুবের মত। সেই রকম নাক, সেই রকম মুখ। তোমার চোখও ইয়াকুবের মতই ট্যারা। ভাল কথা, ইয়াকুব নামে কাউকে চেন?’

‘জ্বে না।’

‘না চেনাই ভাল। ডেনজারাস লোক।’

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুচ্ছি। দারোয়ানের বিস্ময় এখনো কাটছে না। সে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা, বিষ্ময় নামক মানবিক আবেগ কত ধরনের হতে পারে? কি কি কারণে আমরা বিষ্মিত হই?

অন্যের বোকামি দেখে বিস্মিত হই।

অন্যের বুদ্ধিমত্তা দেখেও বিস্মিত হই।

এখানেও সমস্যা আছে। যে মহাবোকা সে অন্যের বোকামি দেখে বিস্মিত হবে না। সে সেটাই স্বাভাবিক ধরে নেবে। বিজ্ঞানীদের উচিত বিস্ময় ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করা। বিস্ময় মিটার জাতীয় যন্ত্র বের করে ফেলা। যে যন্ত্র মানুষের চোখের পলকে বিস্ময় মেপে ফেলবে। বিস্ময় মাপা হবে এক থেকে দশের মধ্যে। লগারিদমিক স্কেলে। দশ হবে বিস্ময়ের সর্বশেষ সীমা। একজন মানুষের জীবনে মাত্র দু'বার বিস্ময় মিটারের সর্বশেষ মাপ দশে উঠবে।

প্রথমবার হবে যখন সে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবে। পৃথিবী দেখে বিস্ময় দশ। আর শেষবার আবারো বিশ্বয় মিটারের মাপ দশ হবে যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবে। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করবে, সে হতভম্ব হয়ে ভাববে— কি হতে যাচ্ছে? একি, আমি কোথায় যাচ্ছি?

যারা খুব ভাগ্যবান মানুষ তাদের কেউ কেউ এক জীবনে বিস্ময় মিটার আরো এক দুবার হয়ত দশ স্কোর করবেন। নেইল আর্মষ্টং যখন চাঁদে নামলেন তখন তিনি দশ স্কোর করলেন।

টমাস আলভা এডিসন ফনোগ্রাফ আবিষ্কার করলেন । এমন এক যন্ত্র যা মানুষের কথা বন্দি করে ফেলতে পারে। আসলেই তা পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্যে নিজেই যন্ত্রের সামনে বসে বিড়বিড় করে একটা ছড়া বললেন –

Mary had a little lamb
Its fleece was as white as snow
And every where that Mary went
That lamb was sure to go.

ছড়া শেষ করে উত্তেজনায় কপালের ঘাম মুছলেন। তার গলার শব্দ আসলেই কি যন্ত্রটা বন্দি করতে পেরেছে? তিনি যন্ত্র চালু করলেন – যন্ত্রের ভেতর থেকে শব্দ আসতে লাগল —

Mary had a little lamb

সেদিন বিস্ময় মিটার ফিট করে রাখলে টমাস আলভা এডিসনের বিশ্বয় দশ বা দশের কাছাকাছি হত।

আচ্ছা আমি এইসব কি ভাবছি মূল দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান করতে হবে। বরশি ফেলে তার পেটের ভেতর থেকে কথা বের করে নিয়ে আসতে হবে।

পাজেরো একটা জীপ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জীপের মালিক বিরসমূখে বসে আছে। বিরসমুখের কারণ গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেছে। ড্রাইভার চাকা বদলাচ্ছে। আচ্ছা পাজেরোর মালিকের নাম কি ইয়াকুব হতে পারে না? আমি কেন ধরে নিচ্ছি ইয়াকুব লোকটা হবে হতদরিদ্র? সে বিত্তশালীও তো হতে পারে।

আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে খানিকটা সন্দেহও আছে। পাজেরোর মালিকরা সবার দিকে খানিকটা সন্দেহ নিয়ে তাকান।

'স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি ইয়াকুব?'

কোন জবাব আসছে না। আমি হাসিমুখে বললাম, স্যার আপনার যে ভাইভার তার নাম কি? বাই এনি চান্স ইয়াকুব না তো? আমি ইয়াকুবের সন্ধানে বের হয়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন।

I need your friend help.

পাগলদের দিকে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ভদ্রলোক সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এতক্ষণ তার চোখ ভর্তি ছিল সন্দেহ এখন সেই সদেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়। তিনি দ্রুত গাড়ির কাচ উঠাচ্ছেন। গাড়ির কাচে নাক চেপে ভদ্রলোককে ভেংচি কাটলে কেমনে হয়। ভয়ে তার নিশ্চয়ই পিলে চমকে যাবে। পাজেরোর মালিকরা ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে আমার মত নিরীহ পথচারীকে ভয় দেখান। কাজেই সুযোগ মত তাদেরকেও ছোটখাট ভয় দেখাবার অধিকার আমার আছে। আমি গাড়ির কাচে নাক চেপে জিভ বের করে সাপের মত এদিক-ওদিক করতে লাগলাম এবং ঘেঁষ ঘেঁষ জাতীয় শব্দ করতে লাগলাম। পাজেরো মালিক ভয়ে এবং আতংকে কেমন জানি হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন নেই। থাকলে পুলিশকে খবর দিতেন।

২

ইয়াকুবের সন্ধানে যাত্রা শুরু হল। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আলাদা আনন্দ। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ছক্কুর দোকানে চা খেয়ে ফুটপাতে পা রাখা মাত্র নিজেকে কলম্বাসের মত মনে হল। একজন মানুষ, একটা মহাদেশের মত। মানুষকে আবিষ্কার এবং মহাদেশ আবিষ্কার একই ব্যাপার।

ফুটপাতে বিশাল এক পাথর।

পাথরে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার জোগাড় হল। নিজেকে পতন থেকে অনেক কষ্টে সামলালাম। ডান পায়ের নখ কেটে রক্ত বের হচ্ছে দু হাতে পায়ের নখ চেপে বসে পড়তেই কে একজন জিজ্ঞেস করল, ‘ভাইজান, আইজ কত তারিখ?’

তাকিয়ে দেখি পাথরটা থেকে পাঁচ ছ হাত দূরে এক মধ্যম বয়সী ভিখিরী। তার একটা চোখ নষ্ট। ভাল চোখটা অতিরিক্ত ভাল। সেই চোখের পাতা ক্রমাগত পিট পিট করছে। দৃষ্টিও তীক্ষ। একচক্ষু ভিখিরীই তারিখ জানতে চাচ্ছে। তার মুখে চাপা হাসি। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা ব্যাপারটা দেখে সে মনে হয় মজা পেয়েছে। ভিখিরীদের জীবনে মজার অংশ কম। অন্যের দুঃখকষ্ট থেকে মজা আহরণ করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। আমি বললাম, ‘এই পাথরটা কি তুমি এখানে রেখে দিয়েছ?’

ভিখিরী গভীর গলায় বলল, ‘রাখলে অসুবিধা কি?’

‘না কোন অসুবিধা নেই। তুমি রেখেছ কিনা সেটা বল।'

‘হ রাখছি।’

‘প্রতিদিনই লোকজন এখানে ধাক্কা খাচ্ছে?’

‘বেখিয়ালে হাঁটলে ধাক্কা খাইবই।’

‘আজ সারাদিন ক’জন ধাক্কা খেয়েছে?’

‘অত হিসাব নাই।’

‘আমিই কি প্রথম?’

‘জ্বি না — আফনে পরথম না।’

‘নাম কি তোমার?’

'আমার নাম নিয়া আফনের কি দরকার?'

'কোন দরকার নেই, তারপরেও জানতে চাচ্ছি। তুমি যেমন কারন ছাড়াই জানতে চাচ্ছিলে আজ কত তারিখ? আমিও সে রকম জানতে চাচ্ছি।'

'আমার নাম মেছকান্দর মিয়া। বাড়ি বরিশাল নবীনগর।'

'ভিক্ষা শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে যাও তখন পাথরটা কি কর, সঙ্গে করে নিয়ে যাও?'

'আমি পাথর নিমু ক্যান? পাথর কি আমার?'

'সারাদিনে তোমার রোজগার কত হয়?'

'এক জাগাত ভিক্ষা করি বইলা রোজগার কম। হাঁটাহাটিতে রোজগার বেশি।'

'হাঁটাহাটি কর না কেন?'

'ইচ্ছা করে না। সামান্য দুইটা পয়সার জন্যে অত খাটনী ভাল লাগে না। কারোর ইচ্ছা হইলে দিব। ইচ্ছা না হইলে নাই। আমি কি আফনের কাছে ভিক্ষা চাইছি?'

'না।'

'আফনের কাছে যেমন ভিক্ষা চাই না, অন্যের কাছেও চাই না।'

'শুধু তারিখ জানতে চাও?'

'হু।'

মেছকান্দর মিয়া তার ঝুলির ভেতর কি যেন খোঁজাখুজি করছে। এর ঝুলিও অন্যদের ঝুলির মত। শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ। মেছকান্দর মিয়া বিড়ি বের করল। মুখে দিতে দিতে বলল, 'ফকির দুই কিসিমের আছে – ভিক্ষা চাওইন্যা ফকির। ভিক্ষা না চাওইন্যা ফকির। আমি হইলাম না চাওইন্যা।'

'ভাল কোনটা, চাওইন্যাটা, না না চাওইন্যাটা?'

'ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে।'

নখ থেকে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। রক্ত পড়ছে পড়ুক।

ভিক্ষুক আবারো বলল, 'স্যার তারিখ কত জানেন?'

আমি বললাম, 'জানি না। মনে করার চেষ্টা করছি। যদি মনে পড়ে তোমাকে জানিয়ে যাব। আর শোন, পাথরটাকে যত্নে রেখো, এটা সাধারণ পাথর না। এই পাথর রহস্যময়।'

মেছকান্দর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আমি ভাবছি আজকের তারিখটা যেন কত? ফাতেমা খালার সঙ্গে দেখা হবার পর সাতদিন কি কেটে গেছে? আজকে কি ষষ্ঠ দিবস, না সপ্তম দিবস?

ঘরে তারিখ ভুলে গেলে দেয়ালে ক্যালেন্ডার দেখা যায় – পথে ক্যালেণ্ডার ঝুলে না। নগরকর্তারা ধরে নেন যারা পথে নামে তারা তারিখ জেনেই নামে। এ জন্যেই শহরের মোড়ে মোড়ে ক্যালেন্ডার ঝুলে না।

ইদানীং ঢাকা শহর অনেক উন্নত হয়েছে – একটু পরপর দোকান সাজিয়ে চেংড়া ছেলেপুলে বসে আছে –আইএসডি টেলিফোন, দেশ-বিদেশে ফোন, ফ্যাক্স। এদের ব্যবসাও রমরমা। বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে টেলিফোন করতে ভালবাসে।

ধাই ধাই করে যে দেশ এগুচ্ছে সে দেশের পথে পথে ক্যালেন্ডার থাকা দরকার। কাউকে কি জিজ্ঞেস করব আজ তারিখ কত? ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করা সহজ। আজ কত তারিখ—জিজ্ঞেস করা খুব সহজ না। পরিচিত প্রশ্নের জবাব আমরা আগ্রহ করে দেই। অপরিচিত প্রশ্নের জবাব দিতে থমকে যাই। ভুরু কুচকে ভাবি

লোকটা এই প্রশ্ন করল কেন? সে তারিখ জানতে চায় কেন? রহস্যটা কি?

রাস্তার পাশে চিন্তিত মুখে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বোধহয় অফিসে যাবার তাড়া। বেবীটেক্সি দেখা মাত্র হাত উচু করছেন এবং এই বেবী এই বেবী করে চেঁচাচ্ছেন। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'স্যার আজ কত তারিখ?'

যা ভেবেছিলাম তাই, ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। এমনভাবে তাকালেন যেন আমি ভয়ংকর কোন মতলব নিয়ে তার কাছে এসেছি। শুরুতে ভাল মানুষের মত তারিখ জানতে চাচ্ছি, তারপরই নিচু গলায় ফিসফিস করে বলব, মানিব্যাগ বের করুন। আপসে মানিব্যাগ আমার হাতে দিয়ে চলে যান। নো সাউন্ড প্লীজ। আমি ভদ্রলোককে আরো ভড়কে দিলাম। মহা বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'এক্সকিউজ মি স্যার। আপনার নাম কি ইয়াকুব?'

ভদ্রলোক কোন কিছু না বলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। আজ মনে হয় তিনি বেবীটেক্সি নেবেন না। হেঁটেই অফিসে যাবেন। ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছনে ফিরলেন। ওম্নি আমি হাসলাম। হেসে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটা শুরু করলাম। ভদ্রলোক তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আমিও বাড়িয়ে দিলাম। তিনি এখন প্রায় দৌড়াচ্ছেন। ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌছে দেবার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করছি। পরোপকার বলা যেতে পারে।

আচ্ছা নগরীর মানুষ কি বদলে যাচ্ছে? তারা এত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে কেন? সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। আপনার নাম কি ইয়াকুব? এই নির্দোষ আতংকে অস্থির হওয়ার মানে কি? আপনার নাম কি গোলাম আযম? এই প্রশ্নে শঙ্কিত হওয়া যায়। এমন প্রশ্ন তো করছি না।

সামনের ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল। তিনি খালি বেবীট্যাক্সি পেয়ে প্রায় লাফিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে গেছেন। বেবীটেক্সির পেছনের জানালা দিয়ে কৌতুহলী হয়ে আমাকে দেখছেন। তার চোখ থেকে ভয় এখনো কাটেনি। আমি টা-টা, বাইবাই ভঙ্গিতে হাত নড়লাম। তিনি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অফিসে ফিরে এই ভদ্রলোক আজ রোমহর্ষক সব গল্প শুরু করবেন। তার সহকর্মীরা চোখ বড় র গল্প শুনবে — "

'ভয়ংকর এক বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলাম। অল্পের জন্যে জীবনটা রক্ষা পেয়েছে। বেবীটেক্সির জন্যে অপেক্ষা করছি— হঠাৎ দেখি হলুদ পাঞ্জাবী পরা এক লোক এগিয়ে আসছে। তার একটা হাত পাঞ্জাবীর পকেটে। সে যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝলাম তার হাতে পিস্তল। মদ খেয়ে এসেছে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ আসছে। আমাকে বলল, "তুমি ইয়াকুব?"

আমি বললাম, 'জ্বি না।'

সে বলল, 'মিথ্যা কথা বলছিস কেন? তোর নাম ইয়াকুব।' আমি হতভম্ব। কি বলব বা কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে বলল, 'কোন কথা না, আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠ। কুইক। নো সাউন্ড।'

আমি তাকিয়ে দেখি রাস্তার পাশে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রোবাসে ছয় জন বসে আছে। তাদের গায়েও হলুদ পাঞ্জাবী। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার হাত-পা জমে গেল। আমি কোনমতে বললাম, আপনি ভুল করছেন ....।'

শ্রোতারা হতভম্ব হয়ে গল্প শুনবে। তারা যতই হতভম্ব হবে, গল্পের ডালপালা

ততই ছড়াবে এবং একটা সময় আসবে যখন এই ভদ্রলোক নিজেই নিজের গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। তিনি যদি লেখক হন তাহলে তার আত্মজীবনীতে এই গল্প স্থান পাবে।

ফাতেমা বালার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁকে জানানো দরকার যে প্রজেক্ট ইয়াকুবের কাজকর্ম পূর্ণ উদ্যাম চলছে। অনুসন্ধান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই চলছে। ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মেছকান্দর মিয়াকে দিয়ে অনুসন্ধানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাফল্য দ্বারপ্রান্তে। টেলিফোন কোত্থেকে করব বুঝতে পারছি না। সঙ্গে কার্ড নেই যে কার্ড ফোনে কথা বলব। টেলিফোনের দোকান খুলে যারা বসে আছে তাদের কাছে গেলে লাভ হবে না। তাদের হচ্ছে 'ফেল কড়ি মাখ তেল' ব্যাপার। মালীবাগে আমার একটা টেলিফোনের বাকির দোকান আছে। সেখানে আমার নামে খাতা আছে। খাতায় নাম লিখে টেলিফোন করতে হয়। কল শেষ হবার পর দোকানের মালিক জগলু ভাই বিরস গলায় বলেন— 'টাকা তো অনেক জমে গেল হিমু সাহেব। কিছু অন্তত ক্লিয়ার করেন। আজ না পারলেও এই সপ্তাহের মধ্যে কিছু দিতে পারেন কিনা দেখেন। চা খাবেন?'

আমার টেলিফোনের এই বাকির দোকানের সবচে বড় সুবিধা হচ্ছে টেলিফোন শেষ হবার পর চা পাওয়া যায়। এক কাপ না, যত কাপ ইচ্ছা। দুপুরে গেলে জগলু ভাই জোর করে ভাত খাইয়ে দেন। রাতে বিপদে পড়লে ঘুমুবার ব্যবস্থাও আছে। জগলু ভাই রাতে দোকানে থাকেন। শোরুমের পেছনে বড় ঘর আছে। সেই ঘরের সবটা জুড়ে খাট পাতা। রাতে উপস্থিত হলে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বলেন—'কি ব্যাপার রাতে থাকবেন? বালিশ নেই, কোলবালিশ মাথার নিচে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আর শুনুন, নাক ডাকাবেন না। আমি সব সহ্য করতে পারি, নাক ডাকা সহ্য করতে পারি না।'

জগলু ভাইয়ের দোকান থেকে ফাতেমা খালাকে টেলিফোন করলাম। ভারী গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল— কে কথা বলছেন? ফাতেমা খালার ম্যানেজার।

আমি বললাম, 'বুলবুল নাকি? ভাল?'

'কে, হিমু সাহেব?'

'জ্বি।'

'দয়া করে আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না। বুলবুল আমার ডাকনাম। আমার ভাল নাম রকিবুল। আমি ডাকনামে পরিচিত হতে চাই না। আমি পরিচিত হতে চাই ভাল নামে।'

'মহাকবি শেক্সপীয়ার নাম প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছিলেন – গোলাপকে তুমি যে নামেই ডাক সে গন্ধ ছড়াবে।' 'দয়া করে আমার সঙ্গে শেক্সপীয়ার কপচাবেন না। এবং আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না।'

'আমার যদি কোনদিন খালার মত কোটি কোটি টাকা হয় তাহলে কি আপনাকে বুলবুল ডাকতে পারব?'

'আপনি কি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'জ্বি।'

'ধরুন দিচ্ছি। ম্যাডামের শরীরটা বেশি ভাল না। ডাক্তার তাকে মোটামুটি রেষ্টে থাকতে বলেছেন। কাজেই টেলিফোনে আপনি বেশিক্ষণ কথা বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা। ব্রাদার শুনুন, আজ কত তারিখ বলতে পারবেন?'

‘তারিখ দিয়ে আপনি কি করবেন? তারিখ তো আপনার কোন কাজে আসার কথা না।’

‘আমার জন্য না। একজন ভিখিরী আমার কাছে তারিখ জানতে চাচ্ছিল। ভিখিরীর নাম মেছকান্দর মিয়া।’

আজ ১৭ তারিখ। উনিশশো অষ্টআশি সাল। আপনি ধরে থাকুন। আমি ম্যাডামকে দিচ্ছি।’

খালা এসে টেলিফোন ধরলেন। চিঁচিঁ গলায় বললেন, ‘কে হিমু? আমি মারা যাচ্ছিরে।’

‘কি হয়েছে?’

‘ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে থাকি।’

‘সে কি।’

‘সূর্য উঠার পর ঘুম আসে। তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাই। তাও খুব অল্প ক্ষণ— ম্যাক্সিমাম দুই থেকে আড়াই ঘন্টা।’

‘দুই আড়াই ঘন্টাই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান তিন ঘন্টার বেশি ঘুমাতেন না।’

‘গাধার মত কথা বলিস না, আমি কি নেপোলিয়ান?’

‘অবশ্যই নেপোলিয়ান – মেয়ে মানুষ হয়ে এত বড় ব্যবসা দেখছ। তুমি কম কি? নেপোলিয়ানকে এই ব্যবসা দেখতে দেয়া হলে সে এক সপ্তাহের মধ্যে লাল বাতি জ্বলিয়ে সব ছেড়ে দূরে আসামের দিকে চলে যেত।’

‘তোর কথাবার্তার ধরন আর পাল্টাল না। ইয়াকুবের খোঁজ বের করেছিস?’

‘কাজ চলছে। শিগগিরই জানতে পারবে।’

‘লোকটাকে বের করতে পারলে তোকে আমি ক্যাশ কুড়ি হাজার টাকা দেব।’

‘টাকাটা আলাদা করে রাখ খালা – আমি দু একদিনের মধ্যে আসামী হাজির করছি।’

‘আরে গাধা, তোকে কি বলেছি আসামী হাজির করতে হবে না। শুধু পেট থেকে কথা বের করবি।’

‘নো প্রবলেম।’

‘তাহলে টেলিফোন রেখে দেই। কথা বলতে পারছি না। মাথা ছিড়ে পড়ে যাচ্ছে। অসম্ভব যন্ত্রণা।’

‘জামান কেমন আছে খালা।’

‘জামান কেমন আছে মানে? জামানটা কে?’

‘ঐ যে তামান্নার ছোট ভাই –রিকশা থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেল। আমি ঠিক করে রেখেছি কুড়ি হাজার টাকা পেলে ছেলেটাকে একটা লেগো সেট উপহার দেব। জামানের বোন ভাল আছে তো?’

‘তামান্নার কথা বলছিস?’

‘হু।’

‘আশ্চর্য, এখনো তোর মাথায় তামান্না আছে? আমি তো ভেবেছি সব ভুলে বসে আছিস। তোর যা নেচার। তোকে তো আমি আজ থেকে চিনি না। যাই হোক, তুই তামান্নার ব্যাপারে ভাবিস না। আমি সব ব্যবস্থা করব। আমি তামান্নাকে কিছু হিন্টস দিয়েছি। সরাসরি তোর কথা বলিনি– ঘুরিয়ে বলেছি। ও দেখি খুবই লজ্জা পাচ্ছে।’

‘অতিরিক্ত লজ্জার জন্যে আবার পিছিয়ে পড়বে না তো?’

'পিছিয়ে যাবে কোথায় – আমি এমন চাল চলিব।'
'খালা থ্যাংকস।'
'তোর পরিবর্তন দেখে আমি খুবই অবাক হচ্ছি। শোন হিমু, তোর জীবনটা আমি বদলে দেব। আমার ফার্মে তোকে চাকরি দেব।'
'স্যুট-টাই পরতে হবে?'
'পরতে হলে পরবি। স্যুট-টাই কি খারাপ? তোর হলুদ পাঞ্জাবীর চেয়ে ভাল।'
'তোমার মাথার যন্ত্রণা এখন একটু কম না?'
'হ্যাঁ কম। সকালে তো মাথা তুলতে পারছিলাম না এমন অবস্থা। তুই ইয়াকুবের খোঁজ পেলেই আমাকে জানাবি। আমি ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে ডেকে তুলবি।'
'আচ্ছা, খালা একটা কথা –ইয়াকুব লোকটা দেখতে কেমন তা কি জান? মোটা না রোগা, লম্বা না বেঁটে?'
'কিছুই জানি না।'
'না জানলেও অসুবিধা নেই। দু'একদিনের মধ্যেই জানা যাবে লোকটা কেমন। আজও জানা যেতে পারে। কুড়ি হাজার টাকা ক্যাশ দিয়ো খালা। ক্রশড চেক দিলে বিরাট সমস্যা হবে। আমার ব্যাংকে একাউন্ট নেই।'
একটা টেলিফোন করলে খালে পড়ার সম্ভাবনা। আমি আবার সাঁতার জানি না। কাজেই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় টেলিফোন করলাম। তামান্নার ব্যাপারটা রূপাকে জানানো দরকার। আজকাল রূপাকে টেলিফোনে ধরা সমস্যা হয়েছে। প্রথম একজন কাজের লোক টেলিফোন ধরে। তার কাছে নাম ঠিকানা দিতে হয়। অনেকক্ষণ টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে বসে থাকার পর দ্বিতীয় একজন টেলিফোন ধরে। তার কাছে দ্বিতীয় দফা নাম ঠিকানা দিতে হয়। সে বায়োডাটা পুরোটা শোনার পর বলে ধরেন দেখি আপা বাসায় আছে কিনা। খুব সম্ভব নই।
আজো তাই হল। ফাষ্ট রাউন্ড শেষ করে আমি সেকেন্ড রাউন্ডে উঠলাম। পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলবেন রূপা আপার সঙ্গে?'
আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'জ্বি।'
'আপনার নাম?'
'আমার নাম মেছকান্দর?
'কি বললেন? কি কান্দর?'
'মেছকান্দর।'
'আপনার পরিচয়?'
'আমি ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এজাজুল কবীর সাহেবের পিএ। ধর্মমন্ত্রী আপার সঙ্গে কথা বলবেন। বিশেষ প্রয়োজন।'
'লাইনে থাকুন দিচ্ছি।'
'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। জোহরের নামাজের টাইম হয়ে গেছে মন্ত্রী সাহেব নামাজে দাঁড়াবেন।'
'জ্বি দিচ্ছি।'
'একটা সেকেন্ড। আপনার নাম তো ইয়াকুব তাই না?'
ভদ্রলোক হতভম্ব গলায় বললেন, 'জ্বি। আপনি কি করে জানেন।'
আমি হাই তোলার মত শব্দ করতে করতে বললাম, 'আমাদের সব খোঁজখবর রাখতে হয়। জুমার নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাপার কি?'

টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিড় বিড় জাতীয় শব্দ হচ্ছে। ইয়াকুব সাহেবের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করেছে।

'স্যার একটু ধরেন আপাকে দিচ্ছি।'

'চার কলমা জানেন?'

'প্রথমটা শুধু জানি।'

'চারটা কলমাই শিখে রাখবেন। পরে আবার ধরব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রূপা টেলিফোন ধরেই বলল, 'কে হিমু?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'সবার সঙ্গে তামাশা কর কেন? ইয়াকুবকে উল্টাপাল্টা কথা বলছ কেন?'

'উল্টাপাল্টা কথা তো কিছু বলছি না। চার কলমা মুখস্ত করতে বলেছি।'

'ওর নামই বা জানলে কিভাবে?'

'আন্দাজে ঢিল ছুড়েছি। ঢিল লেগে গেছে। আজকাল যে কোন লোকের সঙ্গে কথা হলে প্রথমেই জানতে চাই—তার নাম কি ইয়াকুব? কেন জানতে চাই বলব?'

'নিশ্চয়ই উদ্ভট কোন কারণ আছে। আমি এখন আর উদ্ভট কিছু শুনতে আগ্রহী না। তোমার উদ্ভট আচার-আচরণ এক সময় ভাল লাগতো। একটা বয়স থাকে যখন বিভ্রান্ত হতে ভাল লাগে। সেই বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। হিমু শোন, আমার বয়স তোমার মত একটা জায়গায় স্থির হয়ে নেই। আমার বয়স বাড়ছে।'

'আমারো বয়স বাড়ছে। আমি এখন আর আগের হিমু না। পরিবর্তিত হিমু।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যা তাই। এখন আমার মধ্যে পাখিদের স্বভাব দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে পাখিদের মত ঘরে ফিরে আসি। গত দু'টা পূর্ণিমায় আমি ঘর থেকে বের হইনি।'

'আচ্ছা।'

'শুধু তাই না, আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব। বিয়ের কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। মেয়েটার নাম তামান্না। নাম সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, নাম সুন্দর।'

'চেহারা ছবি তেমন না। বেশ খানিকটা ডাউন। তা আমার মত ছেলেকে ডাউন মেয়েরাই তো বিয়ে করবে। আর মেয়েরা কেন করবে?'

'তাও ঠিক।'

'ভাবছি তামান্নাকে নিয়ে একদিন তোমার বাসায় যাব।'

'প্লীজ দয়া করে এই কাজটি করবে না। তোমার কোন কর্মকান্ডের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাচ্ছি না। এবং আমি খুব খুশী হব যদি তুমি ঐ মেয়েটিকে আর বিভ্রান্ত না কর।'

'তুমি ভুল করছ রূপা। আমি তামান্নাকে মোটেই বিভ্রান্ত করছি না। বরং সেই আমাকে বিভ্রান্ত করছে।'

'হিমু আমি এখন রাখি। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার শরীর ভাল না, জ্বর। গায়ে র‍্যাশের মত হয়েছে।'

'দেখতে আসব?'

'না। রাখি কেমন?'

রূপা খুব সহজভাবেই টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

আমি টেলিফোন রেখে জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। জগলু ভাই বললেন, 'হিমু সাহেব কিছু পেমেন্ট করবেন না। আপনার তো মেলা জমে গেল। একটা একটা করে বালি জমে মরুভূমি হয়ে যায়।'

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, 'মরুভূমি বলেই মরুদ্যানের খোঁজ থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে সব ক্লিয়ার করে দেব। কুড়ি হাজার টাকা পাচ্ছি।'

'চা খাবেন?'

'চা তো খাবই। ভাল কথা, আপনার কর্মচারীদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'

'না।'

'তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'

'জানি না, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

'ভাল কার খোঁজ নেবেন। আপনার মুখ এমন শুকনো কেন? শরীর ভাল।'

'জ্বি। শরীর ভাল।'

'মন খারাপ?'

'হু। মন খারাপ। খুবই খারাপ।'

'ব্যবসা হচ্ছে না?'

'না।'

জগলু ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'বাবা কিছু ক্যাশ রেখে গিয়েছিল বলে ভেঙ্গে খাচ্ছি। ক্যাশ শেষ হলে কি হবে জানি না। আপনার মত হলুদ পাঞ্জাবী পরে পথে পথে ঘুরতে হবে। ভাগ্য, বুঝলেন হিমু ভাই, সবই ভাগ্য।'

জগলু ভাই বিমর্ষমুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। জগলু ভাইয়ের দোকানের নাম সুরমা ষ্টেশনারী। রাস্তার মোড়ে বেশ বড় দোকান। জিনিসপত্র ভালই আছে। দোকানটা দেখতেও সুন্দর। দুজন কর্মচারী আছে। সুদর্শন, কথাবার্তায় ভদ্র। অথচ এই দোকানে কোন কাষ্টমার আসে না। আসলেই আসে না। জগলু ভাই এর আগে কলাবাগানে একটা দোকান দিয়েছিলেন –সাগর স্টোর। সেখানেও একই অবস্থা। আশপাশে সব দোকানে ভাল বিক্রি– সাগর ষ্টোরে মাছিও উড়ে না যে কর্মচারীরা মাছি মারবে। জগলু ভাই দোকানের জায়গা বদলালেন, নাম বদলালেন। আগে যে কর্মচারী ছিল তাকেও বদলালেন। কোন লাভ হল না। এখানেও এই অবস্থা। সব দোকানে রমরমা ব্যবসা—তারটা ফাঁকা।

'হিমু সাহেব?'

'জ্বি।'

'ভাগ্যটা কেমন জিনিস দেখলেন? আমি সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি, চা খাই আর মনে মনে ভাগ্য কি সেটা ভাবি। কেন আমার দোকানে লোক আসবে না? আমি জিনিসের দাম বেশি রাখি না, কাষ্টমারের সঙ্গে তাল ব্যবহার করি। তারপরেও এই অবস্থা কেন? বড় ধরনের পীর-ফকির পেলে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম। আপনার সন্ধানে কোন পীর-ফকির থাকলে নিয়ে আসবেন। উনাদের দোয়াতে যদি কিছু হয়। খরচপাতি যা লাগে আমি দিব। কথাটা মনে রাখবেন হিমু সাহেব।'

'জ্বি মনে রাখব।'

'চা কি আরেক কাপ খাবেন?'

'জ্বি না। আজ উঠি, কাজ আছে।'

'বসেন গল্প করি। চুপচাপ বসে থাকি – কথা বলার মানুষ নাই।'

'আরেক দিন এসে গল্প করব। আমার প্রচুর কাজ –একটা লোকের সন্ধান করছি। নাম ইয়াকুব।'

'শুধু নাম দিয়ে লোক খুঁজে বের করে ফেলবেন? এক কোটি লোক থাকে ঢাকা শহরে।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'চেষ্টা করে দেখি।'

'দুপুরে চলে আসুন। আজ খিচুড়ি রাঁধতে বলেছি। আমার কাজের ছেলেটা ভাত-মাছ রাঁধতে পারে না, খিচুড়ি পোলাও এইসব ভাল রাঁধে।'

'দেখি সময় পেলে চলে আসব।'

আমি আবারো পথে নামলাম। পায়ের ভাঙ্গা নখ কষ্ট দিচ্ছে। মানুষের দুটা অংশ শরীর এবং মন। মন অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। শরীর কেন পারে না? শরীরের বয়স বাড়ে। মনের বাড়ে না। জড়া শরীরকে গ্রাস করতে পারে। মনকে পারে না। শরীরের মৃত্যু আছে মনের কি অবস্থা যে মন জড়াকে জয় করতে পারে সে নিশ্চয়ই মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। এই জাতীয় দার্শনিক চিন্তা করতে করতে এগুচ্ছি।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ। তাদের ব্যস্ততাও দেখার মত। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে যে চা খাচ্ছে সেও ব্যস্ত। স্থির হয়ে চা খাচ্ছে না, সারাক্ষণ এদিকওদিক তাকাচ্ছে। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রহস্যময় ইয়াকুব।

ঢাকা শহরের মানুষদের ঠিকঠাক পরিসংখ্যান থাকলে দেখা যেত এই শহরে মোট কতজন ইয়াকুব আছে। তিন থেকে পাঁচ হাজার থাকার কথা। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অসম্ভব বিত্তবান। কেউ হতদরিদ্র। দু'একজন পাওয়া যাবে সাধু সন্ত— মহাপুরুষ পর্যায়ের, কয়েকজন নিশ্চয়ই ভয়ংকর অপরাধী— খুনটুন করে ফেলেছে। কিছু থাকবে রেপিষ্ট। ন'দশ বছরের বালিকা রেপ করে লুকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরের সব ক'টা ইয়াকুবকে একত্র করে একটা গ্রুপ ছবি তুলতে পারলে ভাল হত। এদের নিয়ে গবেষণাধর্ম একটা বইও লেখা যেত –

A comprehensive study in the lives of
Yakub's of
Dhaka city.

বাংলায়—"ঢাকা শহরের ইয়াকুবদের জীবন চর্চা।" না বাংলা নামটা ভাল লাগছে না। গবেষণাধর্মী বইয়ের নাম ইংরেজীতেই ভাল খুলে।

গরম লাগছে। শীতকালের রোদ খুব কড়া হয়। রোদটা জামা-কাপড় ভেদ করে চামড়ার ভেতর ঢুকে পড়ে। রোদ থেকে ছায়াতে গেলেই লাগে ঠাণ্ডা শীতকাল হল এমন এক কাল যে কালে রোদেও থাকা যায় না, ছায়াতেও থাকা যায়না।

আমি ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার সন্ধানে বের হলাম। আজ সতেরো তারিখ এই খবরটা তাকে জানানো দরকার। বেচারা তারিখ জানতে চাচ্ছিল। যে পাথর আমাকে ব্যথা দিয়েছে তাকেও দেখে আসতে ইচ্ছা করছে। জগৎ অতি রহস্যময়। কে জানে একদিন হয়ত বৈজ্ঞানিকরা বের করে ফেলবেন জড় পদার্থেরও মন আছে। তাদের জীবনেও আছে আনন্দবেদনার কথা। আমার বাবা তার জবেদা খাতায় লিখে গেছেন

"মহাপ্রাণ নানান ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, পশু কীটপতঙ্গ হিসেবেও নিজেকে প্রকাশ করেছেন। গাছপালাও মহাপ্রাণেরই অংশ। নদী, সাগর, বলি ধূলিকণাতেও তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই মহাপ্রাণের নানান রূপান্তর।"

আমার পিতার কথা সত্যি হলে পাথরেরও প্রাণ থাকবে। যেহেতু সে পাথর তার প্রাণ হবে কোমল। সে মানুষকে ব্যথা দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিজে সেই কারণে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে।

'কে হিমু না?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। পায়ের পাতা গরমে চিড়চিড় করছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ভয়াবহ ব্যাপার। শীতকাল এখনো শেষ হয়নি। অথচ দিনের বেলায় চৈত্র মাসের গরম পড়ছে। আলনিনোর এফেক্ট হবে। রাস্তার পিচ এখনো গলা শুরু করেনি। তবে মনে হচ্ছে করবে। ভরদুপুর হলেও কথা ছিল। বেলা চারটার মত বাজে। বিকেল শুরু হয়েছে। এখনো এত গরম।

'কথা বলছিস না কেন? তুই হিমু না?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম— 'জ্বি না। রং নাম্বার।'

বলা হল না। এমন তো হতে পারে যে প্রশ্ন করছে—তাকেই আমি খুঁজছি। তার নামই ইয়াকুব। বাবার নাম সোলায়মান। আমার অনুসন্ধানের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গড় অলমাইটি তাকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। প্রশ্নকর্তা মিডিয়াম সাইজ পর্বতের কাছাকাছি। টকটকে লাল শার্ট গায়ে দিয়ে আছেন। তাঁর বিশাল ভুরী শার্ট ছিড়ে যে কোন মুহূর্তে বের হয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে। মাথা পরিষ্কার করে কমানো। নেংটি পরিয়ে ছেড়ে দিলে জাপানী সুমো কুস্তিগীর হয়ে যাবে। জাপানীদের সঙ্গে চেহারার খানিকটা মিলও আছে। নাক চ্যাপ্টা। চোখ ছোট ছোট। এর নাম ইয়াকুব হবার কোন কারণ নেই।

প্রশ্নকর্তা আহত গলায় বলল, 'মাই ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড, তুই কি এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?'

আমি বললাম, 'না এখনো চিনতে পারিনি। তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুই

আছিস কেমন দোস্ত? শরীরটা তো মাশাল্লাহ ভাল বানিয়েছিস।’

প্রশ্নকর্তা বিষণ্ন গলায় বলল, ‘কেউ আমাকে চিনতে পারে না। তাদের দোষ দিয়ে কি হবে। আমি নিজেই নিজেকে চিনি না। তোর সঙ্গে কিশোর মোহন পাঠশালায় পড়তাম। আমি আরিফ। আরিফুল আলম জোয়ার্দার। এখনো চিনতে পারিসনি?’

‘না।’

‘চেনা চেনা কি লাগছে? না তাও লাগছে না?’

‘তাও লাগছে না। অবশ্য শুরুতে ভেবেছিলাম—তুই ইয়াকুব।’

‘ইয়াকুব কে?’

‘ইয়াকুব হল সোলায়মানের ছেলে।’

‘সোলায়মানটা কে?’

‘বাদ দে, চিনতে পারবি না। কেমন আছিস বল?’

‘দোস্ত সত্যি করে বল তুই এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?’

‘না।’

‘চিনতে না পারলে এমন আন্তরিকভাবে কথা বলছিস কেন?’

‘তুই আন্তরিকভাবে কথা বলছিস দেখে আমিও বলছি।’

আরিফুল আলম জোয়ার্দার গলা নিচু করে বলল, ‘ক্লাস ফোরে পড়ার সময় একদিন বেঞ্চিতে ‘ইয়ে’ করেছিলাম। যার জন্যে টিফিনের সময় ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। অংক স্যার আমাকে ডাকতেন – ‘ব্যাঙাচি।’

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি, ‘ব্যাঙাচির এই অবস্থা?’

ইউনিভার্সিটির পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মুখ হাসি হাসি করে জিজ্ঞেস করা হয়— ‘তারপর কি খবর ভাল আছেন? এখন কি করছেন?’ কলেজের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বলা হয়— ‘আরে তুমি? কেমন আছ?’ আর স্কুল লেভেলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে— একজন আরেকজনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে – তাই নিয়ম।

আমি ব্যাঙাচির উপর ঝাঁপ দেব কি দেব না ভাবছি। বেচারা যেভাবে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার ঝাঁপের অপেক্ষা করছে। ঝাঁপ দেয়াই মনস্থ করলাম।

দু’হাতেও তাকে ঠিক জড়িয়ে ধরা গেল না। ব্যাঙাচি ধরা গলায় বলল, ‘দোস্ত গরমের মধ্যে জড়াজড়ি করিস না ছাড়। শরীর ভর্তি চর্বি। জড়াজড়ি করলে অস্বস্তি লাগে।’

আমি বললাম, ‘লাগুক অস্বস্তি। তোকে ছাড়ব না। তুই এমন মটু হয়েছিস কি ভাবে?’

‘খেয়ে খেয়ে মটু হয়েছি দোস্ত। দিন-রাত খাই।’

‘বলিস কি?’

‘কেন খাব না বল— আল্লাহপাক মানুষকে খাওয়ার জন্যেই তো সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মানুষের খাদ্যদ্রব্য। গরু-মহিষ, ছাগলভেড়া, পোকা-মাকড়, গাছ-গাছড়া সবই তো আমরা খাচ্ছি। খাচ্ছি না?’

‘হু খচ্ছি।’

‘আমার এক চাচী ছিলেন পেটে সন্তান এলেই তিনি মাটি খেতেন। মাটির চুলার তিনটা মাথা ভেঙ্গে একদিন খেয়ে ফেললেন। সেদিন রান্না হল না। রাঁধবে কোথায়? চুলা নেই। চাচীর শাশুড়ি চাচীর উপর খুব রাগ করল—বৌমা এতই যদি মাটি খেতে

হয়— ক্ষেতে চলে যাও। ক্ষেতে গিয়ে মাটি খাও। আমি চোখের আড়াল হলে তুমি দেখি বাড়িঘর সব খেয়ে ফেলবে। তাদের আবার মাটির ঘরবাড়ি তো, এই জন্যে চিন্তাটা বেশি।'

আমি হো হো করে হাসছি। বড় হয়ে ব্যাঙাচি যে এমন রসিক হবে তা বোঝা যায়নি। ছোটবেলায় তার প্রতিভা বেঞ্চিতে 'ইয়ে' করে দেবার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাঙাচি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে দোস্ত। তুই যখন জড়িয়ে ধরলি তখন প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। দেখা হলে জড়িয়ে ধরার মত বন্ধু মানুষের এক দুটার বেশি থাকে না। আয় কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ভাল কথা, চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?'

'পার্ট টাইম চাকরি।'

'পার্ট টাইম চাকরি ভাল রে দোস্ত। টেনশান কম। কাজটা কি? বেতন কত? বেতন কম হলে বলিস না। তোকে লজ্জা দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করিনি। পুরানো বন্ধু সেই দাবিতে জিজ্ঞেস করা।'

'অনুসন্ধানের কাজ। একটা লোককে খুজে বের করা। খুজে বের করতে পারলে কুড়ি হাজার টাকা পাব। খুঁজে না পেলে লবডঙ্কা।'

'দোস্ত চিন্তা করিস না। আমি তোকে সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। পুরানো বন্ধুর জন্যে এইটুকু না করলে কি হয়। তাছাড়া আমার কাজকর্মও কিছু নেই। আয় কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ফর ওল্ড টাইম সেক। তোর সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

'না। আমার পাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

'এটা ভাল করেছিস। পকেটই ফেলে দিয়েছিস। টাকা আমার কাছেও নেই। বউ টাকা দেয় না। টাকা দিলেই খাওয়া-দাওয়া করব এই জন্যে দেয় না। সে যেমন বুনো ওল আমিও তেমন বাঘা তেতুল। আমিও ব্যাঙাচি —ঢাকা শহরে তিনটা জায়গায় ব্যবস্থা করা আছে। বাকিতে খাই, মাসকাবারি টাকা দেই। চল আমার সঙ্গে একটু হাঁটতে হবে। পারবি না?'

'পরব।'

'তোকে দেখে এমন ভাল লাগছে দোস্ত। আবার খারাপও লাগছে। খালি পায়ে হাঁটছিস দেখে মনে ব্যথা পেয়েছি। আই এ্যাম হার্ট। ভিক্ষা করে যে ফকির সেও স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দেয়। আর তুই হাঁটছিস খালি পায়ে? তুই কোন চিন্তা করিস না—তোকে আমি ভাল এক জোড়া স্যান্ডেল কিনে দেব। প্রমিস। টাকা থাকলে আজই কিনে দিতাম। জুতার দোকানে বাকি দেয় না।'

ব্যাঙাচি আমাকে নিয়ে মালীবাগের এক কাবাব হাউসে ঢুকল। পিয়া কাবাব এণ্ড বিরানী হাউস। সাইনবোর্ডে রোগা পটকা এক খাসির ছবি। খাসির মুখটা হাসি হাসি। হাস্যমুখী ছাগল যে পেইন্টার একেছে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী হাসতে পারে না বলে যে ধারণা প্রচলিত তা যে সম্পূর্ণ ভুল হাস্যমুখী ছাগল দেখে তা বোঝা যায়।

'দোস্ত কি খাবি? যা খেতে ইচ্ছে করে খা। এটা বলতে গেলে আমার নিজেরই দোকান। মালিক আমার ভাগ্নে। আপন না, পাতানো। আপন ভাগ্নের চেয়ে পাতানে ভাগ্নের জোর বেশি তাতো জানিসই। জানিস না? বিরানী খাবি?'

‘বিকাল বেলা বিরানী খাব?’

‘বাসি বিরানী। এর টেষ্ট আলাদা। গরম করে দিবে, নাশতার মত খা। বিরানী যত বাসি হয় তত স্বাদ হয়— ঘি ভেতরে ঢুকে। মাংস নরম হয়। মাংসের প্রত্যেকটা আশ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আমার কথা শুনে আজ খেয়ে দেখ। একবার খেলে আর টাটকা পোলাও খেতে পারবি না। শুধু বাসি পোলাও খাবি।’

খাওয়ার মত স্থূল ব্যাপারও যে এত দৃষ্টিনন্দন হতে পারে ভাবিনি। আরিফ খাচ্ছে, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে পোলাওয়ের প্রতিটি দানার স্বাদ সে আলাদা করে পাচ্ছে। হাডিড চুষছে। আনন্দে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খাওয়ার মাঝখানে একটা আস্ত পেঁয়াজ নিয়ে কচকচ করে চিবিয়ে ফেলল। গাঢ় স্বরে বলল, পেঁয়াজের রস হজমের সহায়ক । ভরপেট বিরানী খাবার পর দুটা মিডিয়াম সাইজ পেয়াজ চিবিয়ে খেয়ে ফেলবি দেখবি আধ ঘন্টার মধ্যে আবার ক্ষিধে পেয়েছে। আমার অবশ্যি হজমের সমস্যা নেই।’

বিরানী পর্ব (তিন প্লেট। আর ছিল না। শেষ হবার পর এক বাটি স্যুপের মত তরল পদার্থ এল। স্যুপের উপর গুলমরিচের গুড়া ভাসছে। কুচিকুচি করে কাটা কাঁচা মরিচ ভাসছে। আরিফ বাটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। স্যুপের বাটির দিকে এমন মুগ্ধ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে এর আগে কি কেউ তাকিয়েছে? মনে হয় না।

আমি বললাম, ‘জিনিসটা কি?’

আরিফ গাঢ় স্বরে বলল, ‘কাচ্চি-রসা।’

'কাচ্চি-রসা মানে? এই নাম তো আগে কখনো শুনিনি।’

‘শুনবি কি করে? আমার দেয়া নাম —অসাধারণ একটা জিনিস — কাচ্চি বিরিয়ানীর তেল। চুইয়ে চুইয়ে পাতিলের নিচে জমা হয়। হাই প্রোটিন। খেতে অমৃত । হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, সেও এক ইতিহাস। শুনবি?’

‘বল শুনি।’

‘কিসমত নামে পুরানো ঢাকায় একটা রেষ্টুরেন্ট আছে। সেখানে বিরানী খাচ্ছি হঠাৎ দেখি বাবুর্চি পাতিল থেকে তেল নিংড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম খেয়ে দেখি জিনিসটা কেমন। খারাপ হবার কথা তো না, ঘি প্লাস গোশতের নির্যাস, প্লাস পোলাওয়ের চালের নির্যাস। এক চামচ মুখে দিয়ে বিশ্বাস কর দোস্ত আমার কলজা ঠান্ডা হয়ে গেল। সেই থেকে নিয়মিত খাচ্ছি। চেখে দেখবি একটু?’

‘না।’

‘থাক, রোগা পেটে সহ্য হবে না।’

ব্যাঙাচি গভীর তৃপ্তিতে কাচ্চি-রসার বাটিতে চুমুক দিল। লম্বা চুমুক না, ধীর লয়ের চুমুক। যেন প্রতিটি বিন্দুর স্বাদ আলাদা আলাদাভাবে নিচ্ছে। তার চোখ বন্ধ। মাথা সামান্য দুলছে। যেন কোন সংগীত রসিক বিথোভেনের ফিফথ সিমফনী শুনছে।

আরিফ হঠাৎ চোখ খুলে গোপন কোন সংবাদ দেবার মত করে বলল, মিরপুরে বিহারীদের একটা দোকান আছে। খাসির চাপ বানায়। এমন চাপ বেহেশতের বাবুর্চিও বানাতে পারবে না। তোকে একদিন নিয়ে যাব। আজই নিয়ে যেতাম ওরা আবার বাকিতে দেয় না। কি কি সব মশলা দিয়ে চাপটকে চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখে। তারপর ডোবা তেলে ভাজে । মশলার মধ্যেই কারিগরি।’

‘খাওয়া-দাওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে তুই কথা বলিস না?’

'বলব না কেন? বলি তবে বলতে ভাল লাগে না। খাওয়ার জন্যে মরতে বসেছি। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। শরীর ভর্তি চর্বি, হাই ব্লাড প্রেসার, হাই কোলেস্টারল, লিভার ড্যামেজড। ফ্যাটি লিভার। কিডনীর সমস্যা। হয়ত আর বছরখানিক বাঁচব। যার জন্যে মরতে বসলাম তারে নিয়েই কথা বলি। কাচ্চি রসা খেয়েছি—এখন তার এফেক্ট কি হয় দেখ– তাকিয়ে থাক আমার দিকে।'

আমি তাকিয়ে আছি। ব্যাঙাচি ঘামতে শুরু করেছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম না বৃষ্টির ধারার মত ঘাম নেমে আসছে। একটা বড় ফ্লোর ফ্যান তার দিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। পাখা ফুল স্পীডে ঘুরছে। ব্যাঙাচি ক্লান্ত গলায় বলল, এই রকম ঘাম চলবে আধ ঘন্টার মত। তারপর শরীর নেতিয়ে যাবে। তখন ঘন্টাখানিক শুয়ে থাকতে হবে। তুই চলে যা—এদের এখানে বিছানা আছে। আমি শুয়ে থাকব।'

'চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবি। এই নে কার্ডটা রেখে দে। বাসার ঠিকানা আছে। সন্ধ্যার পর চলে আসিস। তোকে স্যান্ডেল কিনে দেব। আমার হাতে তো এরা টাকাপয়সা দেয় না। তোর ভাবীকে বলব স্যাণ্ডেল কিনে দিতে। তুই খালি পায়ে হাঁটছিস দেখে খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি। ক্লাসের কত অগা-মগা-বগা কোটিপতি হয়ে গেল আর তুই খালি পায়ে হাঁটাইটি করছিস।'

'তুই কথা বলিস না, চুপ করে থাক। কথা বলতে তোর কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট তো হচ্ছেই। তোর কোন কার্ড আছে?'

'না।'

'জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। খালি পায়ে যে হাঁটে তার আবার কার্ড কি। যাই হোক, আমারটা রেখে দে। সন্ধ্যার পর বাসায় চলে আসবি। দারোয়ান ঢুকতে না দিলে কার্ড দেখাবি। স্ট্রেইট আমার কাছে নিয়ে যাবে। দারোয়ানকে বলা আছে। অপরিচিতদের মধ্যে যারা আমার কার্ড দেখাবে শুধু তাকেই ঢুকতে দেবে।'

'তুই কি খুব মালদার পার্টি না-কি?'

'কার্ডটা দেখ। কার্ড দেখলেই বুঝবি। আর দোস্ত শোন, তোকে আমি সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। ঐ লোককে খুঁজে বের করব।'

ব্যাঙাচির ঘাম আরো বেড়ে গেল। তাকে ওই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম। হাতে বাঙাচির কার্ড। হেন্ডশেকের বদলে কার্ডশেক। কিছুদিন পর কার্ড কালচারের আরো উন্নতি হবে বলে আমার ধারণা। কার্ডে সরকার বিধিনিষেধ এসে পড়বে। সাধারণ জনগণ ব্যবহার করবে সাদা রঙের কাড়, সংসদের সদস্যরা লাল পাসপোর্টের মত লাল কার্ড, কোটিপতিদের কার্ড হবে সোনালি, লক্ষপতিদের রূপালী — । ফকির-মিসকিনদের কার্ডের রঙ হবে ছাই রঙের। তাদের কার্ডে প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকবে। যেমন—

মেছকান্দর মি
ভিক্ষু

পিতাঃ কুতুব আলি
এক চক্ষু বিশিষ্ট (কানা)
ব্যবসায়ের স্থানঃ রামপুরা টিভি ভবন হইতে মৌচাক গোলচত্বর
ট্রেড মার্কঃ গোল পাথর
সরকারী রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ৭১৯৬৩৩০২/ক

সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার অবস্থানের জায়গাটায় গেলাম।

মেছকান্দর আমাকে দেখে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল। আমি মধুর গলায় বললাম, ‘কেমন আছ মেছকান্দর?’

সে জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। থুথু পড়ল পাথরটার উপর।

আমি বললাম, ‘মেছকান্দর আজ হল ২১ তারিখ। তুমি তারিখ জানতে চাও। কাজেই আমি ঠিক করেছি রোজ এসে তোমাকে তারিখ জানিয়ে যাব।’

মেছকান্দর এক চোখে তাকিয়ে আছে। এক চোখের দৃষ্টি এমনিতেই তীক্ষ্ণ হয়। আজ আরো তীক্ষ্ণ লাগছে। মেছকান্দর বিড়ি বের করে ধরাল। আমি অমায়িক গলায় বললাম, ‘আমাকে একটা বিড়ি দাও তো।’

মেছকান্দর বিরক্ত গলায় বলল, ‘ক্যান আমারে ত্যাক্ত করতেছেন? আমি আপনের কি ক্ষতি করছি?’

বলতে বলতে সে পাথরের উপর আবার থুথু ফেলল। আমি বললাম, ‘পাথরের উপর থুথু ফেলো না। আমি ঠিক করেছি এই পাথরটা আমি আমার এক বন্ধুকে উপহার দেব। সে সর্বভুক। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে সে খেয়ে ফেলবে। একটু সিরকা দেবে, কিছু লবণ, কিছু গোলমরিচ। পাথরের চাটনি।’

মেছকান্দর কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতের বিড়ি নিভে গেছে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলছে। আমি পাথরের উপর বসে পড়লাম। সন্ধ্যা হচ্ছে। পাথরে বসে সন্ধ্যার দৃশ্য দেখতে ভাল লাগার কথা। মেছকান্দরের মুখ ভর্তি থুথু মনে হচ্ছে পাথরটা সে ব্যবহার করে থুথু ফেলার জন্যে। আমি পাথরে বসে থাকায় সে থুথু ফেলতে পারছে না।

৪

আমি ইয়াকুব সাহেবকে স্বপ্নে দেখলাম। ভদ্রলোকের কেমন মমি মমি চেহারা। তাঁর চোখেও কোন সমস্যা আছে। সারাক্ষণ পিটপিট করে চোখের পাতা ফেলছেন। শবাসনের মত শিরদাঁড়া সোজা করে আমার বিছানায় বসে আছেন। খালি গা, গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। অথচ শীতকাল। আমি চাদর গায়েই স্বপ্নের ভেতর কাঁপছি। ইয়াকুব সাহেব মাঝে মাঝে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। খালি গায়ের কারণে তাঁর পাঁজরের সব হাড় দেখা যাচ্ছে। পাঁজর বের করা বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে কিছু মিল আছে। বুদ্ধদেবের কানের মত বড় বড় কান টান টান চোখ ।

আমি বললাম, ‘ইয়াকুব সাহেব না?’

তিনি বললেন, ‘জ্বি জনাব। আমার নাম ইয়াকুব।’

‘আপনাকে ক'দিন ধরেই খুজে বেড়াচ্ছি। কেমন আছেন?’

‘জ্বি ভাল।’

‘ধ্যান করছিলেন নাকি?’

‘অনেকটা সে রকমই।’

‘সরি, আপনার ধ্যান ভাঙ্গালাম।’

‘না, ঠিক আছে।’

‘আপনি আসল ইয়াকুব তো? আপনার বাবার নাম কি?’

'বাবার নাম শ্রী সোলায়মান।'
'নামের আগে শী বসাচ্ছেন কেন? আপনি মুসলমান না?'
'জ্বি না। আমাদের মানব ধর্ম।'
'ও আচ্ছা, মানব ধর্ম।'
'মানব ধর্মে নামের আগে শ্রী বসানো যায়, আবার জনাবও বসানো যায়। আপনার যা ভাল লাগে তাই বসাতে পারেন।'
'জানতাম না।'
ইয়াকুব সাহেব ধ্যানস্ত হয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ। আমি ইতস্তত করে বললাম, 'ধ্যান করে কিছু পাচ্ছেন?'
'কিছু পাওয়ার জন্যে তো ধ্যান করছি না। মনের শান্তির জন্যে ধ্যান করছি।'
'শান্তি পাচ্ছেন?'
'এখনো পাচ্ছি না, তবে পাব।'
'ইয়াকুব সাহেব!'
'জ্বি।'
'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?'
'জ্বি। একটু লাগছে।'
'আমার চাদরটা কি আপনার গায়ে জড়িয়ে দেব?'
'দিতে পারেন। তবে আপনার তো ঠাণ্ডা লাগবে।'
'ঠাণ্ডায় আমার কষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা সহ্য করার মন্ত্র আমাকে আমার বাবা শিখিয়ে গেছেন।'
'মন্ত্রটা কি?'
'আপনাকে বলা যাবে না। গুরুমুখী গুপ্ত বিদ্যা। আপনাকে বললেই বিদ্যা চলে যাবে।'
'তাহলে বলার দরকার নেই। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে দিন। ভাল ঠাণ্ড পড়েছে।'
'এত ঠাণ্ডা জানলে খালি গায়ে ধ্যানে বসতাম না। মিসটেক হয়ে গেছে।'
আমি ইয়াকুব সাহেবের গায়ে চাদর জড়িয়ে দিলাম। স্বপ্নের মধ্যেই শীতে আমার নিজের শরীর জমে গেল এবং আমি জেগে উঠে দেখি গায়ের লেপ মেঝেতে পড়ে আছে। আমি ঠকঠক করে কপিছি। এ বছর আবহাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ক'দিন আগেই গরম ছিল – এখন আবার শীত নেমে গেছে। ভয়াবহ শীত। শৈত্য প্রবাহ চলছে। খবরের কাগজ বলছে এক সপ্তাহ থাকবে। নেতাদের খুব সুবিধা হয়েছে। করুণ মুখ করে – সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনেলে, গাবতলীতে, কমলাপুর রেল ষ্টেশনে শীতের কাপড় বিলি করতে পারছেন। সেই ছবি টিভিতে দেখানো হচ্ছে। পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ ছাপা হচ্ছে। ছবির ক্যাপশান—

শীতার্ত মায়ের মুখে হাসি

দেখা যাচ্ছে মা একজন খালি গায়ের শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা এবং শিশু দুজনের মুখ ভর্তি হাসি। দুজনই কম্বলের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।
সবাই খুশি। নেতা খুশি তিনি কম্বল দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। মা এবং শিশু খুশি তারা কম্বল পাচ্ছে। ফটোগ্রাফার খুশি দারুণ একটা ছবি তোলা গেল।
মেঝে থেকে লেপ তুলতে গিয়ে আমি ছোটখাট একটা শকের মত পেলাম।

আমার ঘরে বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে। পায়ের কাছের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মেয়েটা প্রিন্টের একটা শাড়ি পরেছে। শীতের জন্যে মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। মেয়েটিকে সুন্দর দেখাচ্ছে বললে ভুল হবে— অপূর্ব লাগছে বললেও কম বলা হয়। স্বপ্ন দৃশ্যের মেয়েরাই এত সুন্দর হয়। একটু আগে স্বপ্নে ইয়াকুবকে দেখেছি— এই মেয়েটিকেও স্বপ্ন দেখছি না তো। আজ বোধহয় আমার স্বপ্ন দেখার দিন। না স্বপ্ন না, মেয়েটির গা থেকে সেন্টের গন্ধ আসছে। স্বপ্ন দৃশ্যে গন্ধ থাকে না। মেয়েটার চোখ ভর্তি বিস্ময়। ঠোঁট চেপে সে হাসছে। ঘুমের মধ্যে আমি হাস্যকর কোন কাণ্ড করেছি কি-না কে জানে।

শান্ত চেহারার মেয়ে। নিশ্চয়ই কোন বাড়ির বড় মেয়ে, যার অনেকগুলি ছোট ছোট ভাই-বোন আছে। ভাই-বোনগুলি দুষ্ট। এদের সবাইকে সামলে-সুমলে রাখতে হয়। এ ধরনের বাড়ির বড় মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়। এরা মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল, শুধু সমস্যা একটাই— এরা সবাইকে ছোট ভাইবোনের মত দেখে।

আমার যদি ঘুম ভেঙ্গে না যেত আমি নিশ্চিত সে মেঝে থেকে লেপ তুলে আমার গায়ে দিয়ে দিত। মাথার নিচের বালিশ ঠিকঠাক করে দিত। আমি দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছি— মেয়েটা কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমার পরিচিত। পরিচিত না হলে ঘরে ঢুকবে না। দরজা খোলা থাকলেও উকি দিয়ে দেখেই দরজায় টোকা দেবে। ঘরের বাইরে থেকে সাড়াশব্দ করে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করবে। মেয়েদের সম্পর্কে সবার ধারণা তারা খুব ধৈর্যশীলা। আসলে তা না। মেয়েরা ধৈর্য ধরে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেরা যেখানে দু তিনবার কলিং বেল টিপবে— মেয়েরা সেখানে কলিং বেল টিপে যেতেই থাকবে।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, ‘আপনি বোধহয় আমাকে দেখে খুবই বিস্মিত হচ্ছেন। ভাবছেন কে-না কে? অভদ্রের মত ঘুমন্ত মানুষের ঘরে বসে আছে।’

আমি লেপ দিয়ে গা ঢাকতে ঢাকতে বললাম, ‘আমি মোটেই বিস্মিত হচ্ছি না। আপনাকে দেখে ভাল লাগছে।’

‘অপরিচিত একজন মানুষ ঘরে ঢুকে বসে আছে, তারপরেও বিস্মিত হচ্ছেন না?’

‘না। কারণ আপনি মোটেই অপরিচিত নন— আপনি হলেন তামান্না। ফাতেমা খালার পি.এ.।’

মেয়েটা নিজেই এবার বিস্মিত হয়ে বলল, ‘বুঝলেন কি করে?’

‘আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা দিয়ে টের পাচ্ছি। খালা আপনাকে আমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলেনি?’

‘বলেছেন।’

‘আপনি বিশ্বাস করেননি?’

‘জ্বি-না।’

‘এখন কি করছেন?’

‘এখনো করছি না। আপনি অনুমান করে বলেছেন আমি তামান্না। এমন কোন জটিল অনুমানও না। সহজ অংক। দুই দুই-এ চার।’

‘ঠিক বলেছেন। আমার নিজেরো ধারণা আমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে অনেকের ধারণা খুব প্রবলভাবেই আছে। আপনার ম্যাডাম অর্থাৎ ফাতেমা খালা তাদের মধ্যে একজন।’

‘আমি ম্যাডামের একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।’

‘আপনাকে পাঠালো কেন? খালার টাই পরা ম্যানেজার কোথায়, বুলবুল ভাইয়া?’

‘উনি আছেন। তারপরেও আমাকে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক, এই নিন চিঠি। আপনি চিঠি পড়ুন, আমি চললাম।’

‘চিঠি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসুন। হয়ত চিঠিতে জরুরী কিছু আছে। আপনাকে দিয়েই জবাব পাঠাতে হবে।’

‘আচ্ছা আপনি চিঠি পড়ুন, আমি বসছি। আপনি কি দরজা খোলা রেখে ঘুমান? চোর ঢুকে না?’

‘ঢুকে। আমার ঘরের জিনিসপত্র দেখে লজ্জা পেয়ে চলে যায়। চোরদেরও কিন্তু চক্ষু লজ্জা আছে।’

‘ঘর খোলা রেখে ঘুমান কেন? চোরদের লজ্জা দেবার জন্যে?’

‘তা না। আমার বাবা আমাকে খোলা মাঠে ঘুমুতে বলেছেন। খোলা মাঠের বিকল্প হিসেবে খোলা ঘর।’

আমি চিঠি পড়া শুরু করেছি। তামান্না আড়চোখে আমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে আমার চিঠি পড়া দেখে সে মজা পাচ্ছে। খালা তাঁর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় লিখেছেন —

হিমু,

তুই যে গেলি আর তো দেখা নেই। একদিন শুধু টেলিফোনে হড়বড় করে কিসব বললি। মাথার যন্ত্রণায় সব বুঝতেও পারলাম না। ইয়াকুবকে খোঁজার ব্যাপারে কি করছিস আমাকে জানাবি না? না-কি ভুলেই গেছিস যে, তোকে একটা দায়িত্ব দিয়েছি? তোর চশমা, চাদর, নতুন পাঞ্জাবী সব তো ফেলে গেলি।

ঐদিন একটা ভুলও করেছি — ইয়াকুবকে খুঁজে বের করার জন্যে তোকে কিছু খরচ দেব বলে ভেবে রেখেছিলাম। সেদিন যাবার সময় তুই এমন তাড়াহুড়া শুরু করলি যে খরচ দেবার কথাটাই মাথা থেকে দূর হয়ে গেল ।

তুই রবি সোম এই দুদিন বাদ দিয়ে যে কোন একদিন চলে আয়। ম্যানেজারকে না পাঠিয়ে ইচ্ছে করে তামান্নাকে পাঠালাম। যাতে তোর সঙ্গে পরিচয় হয়। কৌশলটা ভাল করিনি? মেয়েটাকে নিশ্চয়ই তোর পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবার মতই মেয়ে। দেখতেও খুব সুন্দর তাই না? রঙটা শুধু যদি আর এক পোছ সাদা হত তাহলে আর চোখ ফেরানো যেত না। মেয়েটা যে এত সুন্দর এটা তোকে ইচ্ছে করেই আগে জানাইনি। বরং ইচ্ছা করে বলেছি মেয়েটা ডাউন টাইপ। আগে জানিয়ে রাখলে তুই কল্পনায় উর্বশী বা মেনকা ভেবে রাখতি। তখন আর তামান্নাকে এখন যত সুন্দর লাগছে তত সুন্দর লাগত না।

হিমু, তোকে আল্লার দোহাই লাগে তুই এমন কিছু করিস না যেন মেয়েটা চিরদিনের জন্যে তোর প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। তোর আচার-আচরণ, কথাবার্তা কিছুই ভাল না। তোর টাইপের ছেলেদের কাছ থেকে মেয়ের একশ হাত দূরে থাকে। কাজেই

ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও মেয়েরা যেসব আচরণ পছন্দ করে সে রকম আচরণ করবি।

আমি রিডার্স ডাইজেষ্টে পড়েছি মেয়েরা এটেনশন খুব পছন্দ করে। তুই এমন ভাব করবি যেন তামান্নার ধারণা হয় তুই তার দিকে খুব এটেনশান দিচ্ছিস । তোর ফাজলামি ধরনের রসিকতাগুলি অবশ্যই করবি না। মেয়েরা রসিকতা পছন্দ করে না। এটাও রিডার্স ডাইজেষ্টে পড়েছি। মেয়ের সিরিয়াস টাইপ পুরুষ পছন্দ করে। যারা রসিকতা করে মেয়েরা তাকে ছ্যাবলা ভাবে।

আমি যা বলছি তোর ভালর জন্যেই বলছি। তোর খালু তোকে খুব পছন্দ করতো। এই জন্যেই তোর জন্যে আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে, যদিও খুব ভাল করেই জানি যে মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তার জীবনটা ছারখার হয়ে যাবে।

তুই ভাল থাকিস। ইয়াকুবের ব্যাপারটা মনে রাখবি। আমি খুব টেনশানে আছি। ঐ ব্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার পেটে গ্যাস হচ্ছে। গ্যাসের চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাব। সিঙ্গাপুরে আমেরিকান হসপিটালটা নাকি খুব ভাল। আরেকটা হসপিটাল আছে এলিজাবেথ হসপিটাল। দুটার একটায় যাব। এখনো ফাইনাল করিনি। আচ্ছা হিমু শোন, তুই কি আমার সঙ্গে যাবি? তুই তো দেশের বাইরে কখনো যাসনি। এই ফাঁকে বিদেশ দেখা হল। আমি ঠিক করে রেখেছি তামান্নাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তুই যদি সঙ্গে থাকিস তাহলে ভালই হয়, মাঝে মধ্যে তামান্নাকে নিয়ে শপিংএ গেলি। বা দুজনে মিলে ছবি দেখলি। এইভাবেও মেয়েটার সঙ্গে তোর ভাব হতে পারে। যাই হোক, অনেক কথা লিখে ফেললাম। ভাল থাকিস ।

তোর
ফাতেমা খালা।

চিঠি শেষ করে আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। সে আগের মতই মিটি মিটি করে হাসছে। এখন মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে ফেলেছে। স্কার্ফ খোলার জন্যে তাকে আরো সুন্দর লাগছে। তার মাথা ভর্তি ফুলানো-ফাপানো চুল। তামান্না যদি ছেলে হত তাহলে নাপিতরা তার চুল কেটে খুব মজা পেত। গোছা গোছা চুল কাটা হবে। শব্দ হবে কচকচ কচকচ।

আমি বললাম, 'আপনি চিঠিটা পড়েছেন তাই না?'

তামান্না হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'জ্বি। দয়া করে ম্যাডামকে কিছু বলবেন না। ম্যাডাম বিশ্বাস করে এই চিঠি আমার হাতে পাঠিয়েছেন। আমি বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হয়েছি।'

'পড়লেন কেন?'

'ম্যাডামের সব চিঠিপত্র আসলে আমি লিখে দেই। উনি শুধু সই করেন। এই চিঠিটা উনি নিজে অনেক সময় নিয়ে লিখলেন। নিজেই খামে মুখ বন্ধ করলেন। খামের মুখ ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি-না নানানভাবে পরীক্ষা করলেন। এতে আমার কৌতুহল খুব বেড়ে গেল। এবং কি জন্যে জানি আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম

চিঠিটায় আমার প্রসঙ্গে লেখা আছে। সেই কারণেই খুলে পড়েছি। আমার মস্ত বড় ভুল হয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি না, চা খাব না।'

'কফি খাবেন?'

তামান্না তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'খালা আপনার প্রতি এটেনশন দিতে বলেছেন এই জন্যেই চা-কফির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'জ্বি না, কফিও খাব না।'

'ঠাণ্ডা কিছু পেপসি বা কোক কিংবা লাচ্ছি?'

তামান্না হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। হেসেই বোধহয় তার মনে হল হাসা ঠিক হয়নি। সে গভীর হতে চেষ্টা করল। মানুষের চরিত্রে তরল ভাব চলে এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন করা সহজসাধ্য না। মেয়েটা গম্ভীর হতে চেষ্টা করছে, পারছে না। আমি বললাম, 'আপনি বসুন আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। তারপর চলুন বোটানিকেল গার্ডেন দেখে আসি। না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে যেতে চান? বিবাহপূর্ব প্রেমের জন্যে চন্দ্রিমা উদ্যান ভাল।'

তামান্না আবারো হেসে উঠল। মেয়েটা ভাল হাসতে পারে। কিংবা এও হতে পারে যে, সে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে হাসার সুযোগ তেমন নেই। অনেকদিন পর মন খুলে হাসতে পারছে।

তামান্না এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'চা দিতে বলি চা খান?'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবেন?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'চোখ বন্ধ করতে হবে কেন?'

'আমি খালি গায়ে লেপের ভেতর বসে আছি। চোখটা বন্ধ করলে লেপটা ফেলে দিয়ে শার্ট গায়ে দিতে পারি। সুন্দরী একটা মেয়ের সামনে খালি গা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

আমি আজ চলে যাই, 'আরেকদিন এসে চা খাব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

তামান্না উঠে দাঁড়াল। মাথায় স্কার্ফ পরল। আবার বসে পড়ল। সে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলবে। সিরিয়াস ধরনের কোন কথা। ছেলেরা হুটহাট করে সিরিয়াস কথা বলে ফেলতে পারে। মেয়েরা পারে না। তাদের সিরিয়াস কথা বলার জন্যে সামান্য হলেও আয়োজন লাগে। তামান্না সেই আয়োজন করছে। কি বলবে তা আমি মনে হচ্ছে আন্দাজ করতে পারছি।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'ম্যাডাম আপনার সম্পর্কে আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। আমি ম্যাডামের কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। ধরে নিচ্ছি উনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু....

'আমাকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব না, তাই তো?'

'জ্বি।'

‘আমাকে বিয়ে দেবার দায়িত্ব ম্যাডামকে দেয়া হয়নি। উনি আগবাড়িয়ে সেই দায়িত্ব কেন নিতে চাচ্ছেন তাও জানি না। বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। উনি কেন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবেন?’

‘আমি কি খালাকে নিষেধ করে দেব?’

‘না। ম্যাডাম বিরক্ত হবেন। আমি কিছুতেই ম্যাডামকে বিরক্ত করতে চাই না। উনার মতের বাইরে গেলেই আমার চাকরি চলে যাবে। ভাই-বোন নিয়ে আমি পথে বসব। কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘আমি একটা পরামর্শ দেই?’

‘দিন।’

‘মনে করুন আপনি হাওড়ের মাঝখানে নৌকা নিয়ে আছেন। দুর্ঘটনায় আপনার হাত থেকে বৈঠা পড়ে গেছে। আপনার নৌকায় পাল ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় আপনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে হাওড় পাড়ি দেয়া। কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা বড় কথা নয়। হাওড় পাড়ি দেয়া বড় কথা। কাজেই আপনাকে যে দিকে হাওয়া সেদিকে পাল দিতে হবে। আপনার ম্যাডাম হচ্ছেন হাওয়া, হাওয়া যেদিকে বইছে সেই দিকে পাল তুলে দিন।’

‘আপনাকে বিয়ে করতে বলছেন?’

‘তা বলছি না। খালার সব কথায় সায় দিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন। বিয়ের পিড়তে বসে হঠাৎ বলবেন — একটু বাথরুমে যেতে হবে। এই বলে পগার পার।’

‘রসিকতা করছেন?’

‘মোটেই রসিকতা করছি না। বিয়ে নিয়ে একটা পাতানো খেলা খেলতে আমি রাজি আছি।’

তামান্না উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনাকে কোন কিছুতে রাজিও হতে হবে না, অরাজিও হতে হবে না। আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। আমার সমস্যার সমাধান সবসময় আমি নিজে করেছি, এখনো তাই করব।’

‘জ্বি আচ্ছা।’

‘আপনি শুধু দয়া করে এখন আপনার সঙ্গে যেসব কথা হল তা খালাকে বলবেন না।’

‘জ্বি আচ্ছা।’

তামান্না ক্লান্ত ভঙ্গিতে চলে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটার উপর রাগ হচ্ছে।

অথচ রাগ লাগার তো কোন কারণ নেই। আমার অবচেতন মন কি চাচ্ছিল—এই মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হোক? হাসিঠাট্টা করে বললেও কি মনের একটি অংশ সত্যি সত্যি চাচ্ছে যে তাকে নিয়ে আমি চন্দ্রিমা উদ্যানে হাঁটতে বের হই।

আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে লিখিতভাবে যে উপদেশমালা রেখে গেছেন সেখানে বারবার আমাকে একটি ব্যাপারেই সাবধান করা হয়েছে –

বাবা হিমালয়,

হিন্দু নারী সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত লোক-শ্লোক আছে –

"পুড়ল কন্যা
উড়ল ছাই
তবেই কন্যার
গুণ গাই।”

অর্থাৎ কন্যার দাহকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার গুণকীর্তন করা যাবে না। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তার পা পিছলাতে পারে। সে ধরা দিতে পারে প্রলোভনের ফাঁদে। পা রাখতে পারে চোরাবালিতে।

এটা শুধু হিন্দু মেয়ে না, সবার জন্যে প্রযোজ্য। এবং তোমার জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মায়া যখন হাতছানি দিবে তখন তোমাকে রক্ষা করার জন্যে কেউ থাকবে না। মায়াকে মায়া বলে চিনতে হবে। এই চেনাই আসল চেনা।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে আরেকটি শ্লোক বলি। শ্লোকটি রচনা করেছেন চাক মুনির পুত্র। তাঁর জন্মস্থান তক্ষশিলা। তিনি ছিলেন মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা। যাই হোক, শ্লোকটা এ রকম—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনানি
সমানি চৈতাদি নৃনাং পশুনাম।
জ্ঞানী নরানামধিকো বিশেষ্যে।”

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু এবং মানুষদের ভেতর সমভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ জ্ঞানী— আর এখানেই তার বিশিষ্টতা।

চানক্যের এই শ্লোক সব মানুষের জন্যে প্রযোজ্য কিন্তু তোমার জন্যে নয়। পশু এবং মানুষের ভেতর যা সমভাবে বিদ্যমান তোমাকে তা থেকে আলাদা করার চেষ্টা আমি করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি আমি জানি না। তবে আমার ধরণ–- আমার সারাজীবনের সাধনা বিফলে যাবে না। তুমি সন্ধান পাবে পরম আরাধ্যের।

আমার নিজের ধারণা বাবার সাধনা বিফলেই গেছে। তাঁর পুত্র বর্তমানে পরম আরোধের সন্ধান করছে না। সন্ধান করছে— ইয়াকুবের।

আমি হাত-মুখ ধুতে গেলাম। আজ অনেকগুলি কাজ করতে হবে। ব্যাঙাচিকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাঙচিকে নিয়ে শুরু হবে অভিযান –

In search of Yakub.

যে কোন অনুসন্ধানেই দু'জন থাকলে ভাল হয়। হিমালয়ে হিলারী এক উঠেননি, সঙ্গে ছিল তেনজিং।

দরজায় টকটক শব্দ হচ্ছে। তামান্না ফিরে এল না-কি? আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘কে?’

ছক্কু গলা বের করল। সে কোকের বোতল ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। সিগন্যাল না দিতেই চা নিয়ে এল ব্যাপার কি?

‘কি খবর ছক্কু?’

‘জ্বে খবর ভাল।'

ছকু চায়ের বোতল নামিয়ে রাখল। পরোটা ভাজির বাটি সাজাতে বসল। আজ দেখি পরোটা ভাজির সঙ্গে ডিমের ওমলেট উকি দিচ্ছে। এইখানেই শেষ না। আরেকটা বাটিতে ঝোল জাতীয় কিছু। সেখানে মুরগির ডানার হাড় ডুব দিয়ে আছে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘ব্যাপার কিরে?’

‘ব্যাপার কিছুনা।'

‘তুই দেখি রাজাবাদশার খাবার নিয়ে এসেছিস। করেছিস কি? দুটাকা হল আমার নাশতার বাজেট। পরোটা ভাজি রেখে বাকি সব ফিরিয়ে নিয়ে যা।’

ছক্কু লজ্জিত মুখে বলল, ‘খান। আইজের খানা ফিরি।’

‘ফিরি কেন?’

'আইজ আমি খাওয়াইতেছি।'

'ভাল। ঝোলের মত ঐ জিনিসটা কি?'

'ছুপ। মুরগির ছুপ।'

হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। পরোটা ছিড়ে মুরগির ছুপে ভিজিয়ে খাচ্ছি। ছক্কু আনন্দিত চোখে আমাকে দেখছে। পরোটাগুলি আগুন গরম। ছুপ জিনিসটা দেখতে কুৎসিত হলেও খেতে ভাল। আমি তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়া শেষ করে বললাম, 'খেয়ে আরাম পেয়েছিরে ছক্কু। এখন বল কি চাস? ঝটপট বলতে হবে। যা চাইবি তাই পাবি। কি চাস তুই?'

ছক্কু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে পারছে না। আমি চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, 'আশ্চর্য এ রকম একটা সুযোগ মিস করলি। মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারলি না।'

ছক্কু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে সে বিরাট সুযোগ হেলায় হারিয়েছে।

'তোর কিছু চাইবার নেই?'

'আছে।'

'সেটা কি?'

'একটা দোকান দিতে ইচ্ছা করে।'

'চায়ের দোকান?'

'জ্বি না ইষ্টিশন দোকান।'

'ষ্টেশনারী দোকান?'

'জ্বে। নানান পদের বাজে মাল থাকব।'

'ভুল করলি, তোরে ব্যাটা যখন চাইবার তখন চাইলি না।'

'এমন সুযোগ আর আসব না?'

'সুযোগ তো বার বার আসে না। হঠাৎ হঠাৎ আসে– '

মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। কাঁদুক। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছে তখন কাঁদতে তো হবেই।

৫

মেসের ম্যানেজার খবর পাঠিয়েছে — রুলটানা কাগজে পেনসিলে লেখা – মোটা এক আদমী দেখা করতে এসেছে। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠবে না। তাঁর ঘরে বসে আছে। লোকটাকে ভাল মনে হচ্ছে না। এখন কি করণীয়?

আমি নিচে নেমে দেখি ব্যাঙাচি। গভীর মনোযোগে বাসি খবরের কাগজ পড়ছে। ব্যাঙাচিকে আজ আরো মোট লাগছে। তার গায়ের শার্টটা জমকাল। লাল নীল ফুল লতা পাতা সাপ খোপ আঁকা। সাহেবরা হাওয়াই দ্বীপ বেড়াতে গেলে এ রকম শার্ট পরে। তাদের বগলে থাকে রোগা পটকা মেয়ে। যে সাহেব যত মোটা তার বগলের তরুণী ততই রোগা। রোগা পটকাদের এ রকম শার্ট মানায় না।

ব্যাঙাচি আমাকে দেখে মুখ ভর্তি করে হাসল। আমি বললাম, 'নাশতা খেয়ে বের

হয়েছিস?'

'হু।'

'কি নাশতা? পরোটা ক'টা ছিল?'

'পরোটা না আটার রুটি। দেড় পিস রুটি।'

'বলিস কি? রুটির সঙ্গে কি?'

'পেঁপে ভাজি। আধা কাপ কমলার রস।'

'ব্যাস আর কিছু না?'

'দোস্ত আর কিছু না। তোর ভাবী আমাকে খেতে দেয় না। তার ধারণা খেতে না দিলে আমি বোধহয় আগের মত হয়ে যাব।'

'না খেলেও তুই ফুলতে থাকবি?'

'অবশ্যই। এখন একবার ওজন নে। না খাইয়ে সাতদিন একটা ঘরে বন্দি করে রাখ। সাত দিন পর ওজন নে, দেখবি ওয়েট এগারো কেজি বেড়েছে।'

'সর্বনাশ!'

'সারাক্ষণ পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুরি, দোস্ত। ক্ষুধা কমে না। আমার জীবনের একটা শখ কি জানিস দোস্ত। একটাই শখ মনের তৃপ্তিতে একবেলা খাব। ক্ষিধে না মেটা পর্যন্ত খেয়েই যাব। মানুষের নানা রকম ভাল ভাল স্বপ্ন থাকে—আমার এই একটাই স্বপ্ন। জানি না স্বপ্ন সত্যি হবে কিনা।'

'ইনশাল্লাহ হবে।'

'তুই যদি কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে যাস তাহলে ভালমত একবেলা খাওয়াবি।'

'অবশ্যই খাওয়াব।'

'প্রমিজ করছিস তো?'

'হ্যাঁ, প্রমিজ।'

'তোকে আমি সাহায্য করব। জান দিয়ে সাহায্য করব। ঐ লোকটাকে খুঁজে বার করব। পথেঘাটে খুঁজলে হবে না। সিস্টেমেটিকালি খুঁজতে হবে। প্ল্যান করে এগুতে হবে।'

'আয় প্ল্যানটা করি?'

ব্যাঙাচি চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'চল, কোন একটা রেষ্টুরেন্টে বসে প্ল্যান করি। তোর চেনা-জানা কোন রেষ্টুরেন্ট আছে যেখানে বাকি দেবে?'

আমি বললাম, 'তোর ঐ রেষ্টুরেষ্টে যাই— কাচ্চি রসা যেখানে খাস?'

ব্যাঙচি মুখ করুণ করে বলল, 'ঐ রেষ্টুরেন্ট দুপুরের আগে খুলবে না৷ পাঁচশ টাকার একটা নোট পকেটে নিয়ে বের হয়েছিলাম –আরাম করে নাশতা করব। তোর ভাবী পকেট সার্চ করে নিয়ে নিয়েছে। পকেটে ফচ টেপ মারা এক টাকার একটা নোটও নেই। মাঝে মাঝে মনের দুঃখে ভাবি কাক হয়ে কেন জন্মালাম না।'

'কাক হয়ে জনালে লাভটা কি হত?'

'মনের সুখে ময়লা খেতাম। ঢাকা শহরে আর যাই হোক ময়লার অভাব নেই।'

ব্যাঙাচি ফুস করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমি তাকে নিয়ে গেলাম বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্টে। রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজার জোবেদ আলি কোন কারণ ছাড়াই আমার ভক্ত। সে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, 'জোবেদ আলি সাহেব, গরম গরম পরোটা ভেজে আমার বন্ধুর প্লেটে ফেলতে থাকবেন। পরোটার সঙ্গে কি আছে? পেপে ভাজি বাদ দিয়ে যা আছে সবই দিন। যেটা ভাল লাগবে সেটা বেশি করে

নেবে।’

রেস্টুরেন্টে মোটামুটি একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। ছক্কুর ডিউটি পড়ল আমাদের খাওয়ানো। ব্যাঙাচি আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, দোস্ত, তুই তো সাধারণ মানব না। মহামানব। আমি খুশি হয়েছি। যা প্রমিজ করলাম– ‘তোর ঐ লোক না পাওয়া পর্যন্ত আমি দাড়ি-গোফ ফেলব না। যদি দাড়ি-গোঁফ ফেলি তাহলে আমি বাপের ঘরের না। আমি বেজন্মা।’

আমি আবারো মুগ্ধ হয়ে ব্যাঙাচির খাওয়া দেখছি। শুধু আমি না, ছক্কু এবং জোবেদ আলিও মুগ্ধ। এত তৃপ্তি নিয়ে যে কেউ খেতে পারে তাই আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারটাকে সে উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

‘দোস্ত?’

‘খাওয়া শেষ করে তারপর কথা বল।’

‘খেতে খেতেই বলি। খাওয়া শেষ হতে দেরি হবে। তোর ঐ লোক আগে কোথায় থাকত বললি?’

‘অতীশ দীপংকর রোড।’

‘তাহলে আমাদের অনুসন্ধানের সেন্টার হবে অতীশ দীপংকর রোড। ঐ লোক অতীশ দীপংকর রোডের আশপাশেই আছে।’

‘বুঝলি কি করে?’

‘বাড়ি ভাড়া করে যারা বাস করে তারা বাড়ি বদলালেও সেই অঞ্চলেই থাকে, দূরে যায় না। যে ঝিকাতলায় থাকে সে কখনো বাড়ি বদলে কলাবাগানে যাবে না। ঝিকাতলার আশপাশেই ঘুরঘুর করবে।’

‘যুক্তি ভাল।’

‘আমাদের খোঁজ করতে হবে মুদির দোকানে। নাপিতের দোকানে।’

‘চায়ের স্টল?’

‘না, চায়ের ষ্টল না। বাড়ির আশপাশের চায়ের ষ্টলে শুধু ব্যাচেলাররা চা খায়। যার ঘর-সংসার আছে সে বাড়ির পাশে চায়ের দোকানে চা খাবে না। সে বউকে বা মেয়েকে চা বানিয়ে দিতে বলবে।’

‘ঐ লোকের বউ বা মেয়ে আছে কি-না তা তো জানি না।’

‘তাহলে একটা সমস্যা হয়ে গেল। যাই হোক অসুবিধা হবে না। বিটের পোষ্টম্যানকে ধরতে হবে। এদের স্মৃতিশক্তি ভাল হয়। নাম বলা মাত্র চিনে ফেলতে পারে।’

‘পোষ্টম্যানের কথা আমার একবারও মনে হয়নি।’

‘রেশনের দোকান উঠে গেছে। রেশন শপ থাকলে সমস্যা হত না। ভাল ভাল জিনিসই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে।’

ব্যাঙাচির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চা দিতে বলল। তার পেটে নিশ্চয়ই এখনো ক্ষিধে আছে। তবে প্রবল ক্ষিধের সমস্যা মিটেছে তা বোঝা যায়।

‘হেভী খেয়েছি দোস্ত। তোর কাছে অন্নখণ হয়ে গেল। যাই হোক ঋণ শোধ করব, চিন্তা করিস না। বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াস চিন্তা করছি। অতীশ দীপংকর রোডের পোস্টম্যান হল আমাদের সার্কেলের কেন্দ্রবিন্দু। তারপর ধীরে ধীরে সার্কেলটা বড় করব। পাঁচ বছর আগে হলে লণ্ড্রী থেকে চট করে বের করে ফেলা যেত। এখন

আর যাবে না। ঢাকা শহরে লন্ড্রী নেই। লোকজন এখন আর ধোপাখানায় কাপড় ধোয় না।'

'এটা তো লক্ষ্য করিনি।'

'তোর লক্ষ্য না করলেও হবে। আমি করছি। ব্যাটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব এখন আমার। তোর অন্নঋণ শোধ দিতে হবে। চল উঠি, একশানে নেমে পড়ি।'

'যে খাওয়া খেয়েছিস হাঁটতে পারবি তো?'

ব্যাঙাচি করুণ গলায় বলল, 'হাঁটতে পারব না দোস্ত। রিকশা নিতে হবে। এখন হাঁটলে আবার ক্ষিধে পেয়ে যাবে। অনেক কষ্টে ক্ষিধেটা চাপা দিয়েছি।'

রেস্টুরেন্টে বাকি খাওয়া যায়—বাকিতে রিকশা পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। সম্ভব না বলেই আমার ধারণা। লিফট পাওয়া গেলে হত। বিদেশে এই সব ক্ষেত্রে বুড়ো আঙ্গুল তুলে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। কারোর দয়া হলে তুলে নেয়। বাংলাদেশে লিফট প্রথা চালু হয়নি। কার দায় পড়েছে নিজের কেন গাড়িতে অন্যকে চড়ানো।

অবশ্যি এ জাতীয় পরিস্থিতিতে গাড়িওয়ালা মানুষের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে আমি উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছি। শুধু উৎসাহব্যঞ্জক বললে ভুল হবে, খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। একবার উত্তরার কাছে এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাত একটার মত বাজে। পান-সিগারেটের একটা দোকান খোলা। সেও বন্ধের উপক্রম করছে। হেঁটে হেঁটে ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। একটা মিলিটারী জীপ এসে থামল। জীপের ড্রাইভার নেমে এল সিগারেট কিনতে। ড্রাইভারের পাশে বিষন্নমুখে যে অফিসারটি বসে আছেন মনে হয় তাঁর জন্যেই সিগারেট কেনা হচ্ছে। অফিসার কোন স্তরের বুঝতে পারছি না। এত বিষন্ন কেন তাও বুঝতে পারছি না। যুদ্ধটুদ্ধ হচ্ছে না বলেই মনে হয় বিষন্ন। যুদ্ধ নেই কাজেই কাজও নেই। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'স্যার আপনার গাড়ির পেছনটা তো ফাঁকা। আপনি কি একজনকে পেছনে বসিয়ে ঢাকা নিয়ে যাবেন? তার খুব উপকার হয়।'

অফিসার কিছু বললেন না। একবার আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে ড্রাইভার সিগারেট নিয়ে ফিরেছে। তিনি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করতে শুরু করেছেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে যাচ্ছে। তিনি ড্রাইভারকে নিচু গলায় কি যেন বললেন—ড্রাইভার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে নেমে এল। জীপের পেছনটা আমাকে খুলে দিল।

আমি উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। সেই অফিসার আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি সিগারেট খেলে ধোঁয়াতে আপনার কি অসুবিধা হবে?'

আমি বললাম, 'অসুবিধা হবে না, স্যার। বরং সুবিধা হবে। অনেকক্ষণ সিগারেট খাচ্ছি না। আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড ধোঁয়া পাব।'

তিনি তাঁর প্যাকেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'নিন, সিগারেট নিন।'

আমি সিগারেট নিলাম। তিনি জীপের ড্যাসবোর্ডে কি একটা টিপলেন, ওমনি ক্যাসেটে রবীন্দ্র সংগীত শুরু হয়ে গেল—

"বধূ কোন আলো লাগল চোখে"

মিলিটারী জীপ হুঁশ-হাস করে অনেক সময়ই আমার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে।

সেখান থেকে কখনো রবীন্দ্র সংগীত ভেসে আসতে শুনিনি। আমার ধারণা মিলিটারী জীপে ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রই থাকে না। আর থাকলেও ট্রাম্পেট জাতীয় বাজনা বাজবে। রবীন্দ্রনাথ না।

আমি বললাম, 'স্যার, আমাকে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি যে কোন জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

বিষন্ন চেহারার ভদ্রলোক তার জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনি আপনমনে গান শুনছেন। মিলিটারীর গান শোনাও অদ্ভুত। মাথা দুলানো না। পা দুলানো না এটেনশন ভঙ্গিতে গান শোনা।

ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি তিনি আমাকে নামিয়ে দিলেন না। গাড়ি প্রথমেই চলে গেল ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। স্যালুটের পর স্যালুট পড়তে লাগল। ভদ্রলোক যে বিরাট বড় দরের কেউ এখন বুঝলাম।

তিনি জীপ থেকে নামলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'উনাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

আমি বললাম, 'স্যার, কোন দরকার নেই। আমার হেঁটে অভ্যাস আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আপনাকে বাসায় পৌছে দেবে, কোন সমস্যা নেই। নিন আরেকটা সিগারেট নিন। ওয়ান ফর দ্য রোড। আচ্ছা, রেখে দিন। প্যাকেটটা রেখে দিন। আমি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছি। আজ লোভে পড়ে কিনে ফেলেছি।'

ড্রাইভার অবশ্যি আমাকে আমার মেস পর্যন্ত নিয়ে গেল না। ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে সামান্য এগিয়ে কঠিন ব্রেক করে গাড়ি থামাল। তার চেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নামেন।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে ড্রাইভারকে বললাম, 'ভাই সাহেব আপনার না আমাকে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে যাবার কথা?'

'নামতে বলছি, নামেন।'

আমি হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। মিলিটারী মানুষ রেগে গিয়ে চড়-থাপ্পর মেরে বসতে পারে। কি দরকার।

কাজেই আমাদের দেশের গাড়িওয়ালারা পথচারীদের প্রতি একেবারেই যে দয়া দেখান না, তা না। মাঝে মধ্যে দেখান। সেই মাঝে মধ্যেটা আজও হতে পারে। মিষ্টি কথায় চিড়া ভেজে না বলে গাড়িওয়ালাদের মন ভিজবে না কেন। গাড়িওয়ালাদের মন এমনিতেই খানিকটা ভেজা অবস্থায় থাকে।

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে গাড়ির সন্ধানে বের হলাম। আমাদের টার্গেট ঝকঝকে নতুন গাড়ি। দামী গাড়ি। পাজেরো টাইপ। চড়বই যখন দামী গাড়িতেই চড়ি।

যেসব গাড়ি পছন্দ হচ্ছে তার কোনটাই দাঁড়াচ্ছে না— হোস করে চলে যাচ্ছে। গাড়িগুলি থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে কাকতাড়ুয়ার মত দু'হাত মেলে দাঁড়ানো। আমি আর ব্যাঙাচি দু'জন হাত ধরাধরি করে রাস্তা আটকালে গাড়ি থামতে বাধ্য। প্রথমে একটা থামবে তার পেছনে আরেকটা। দেখতে দেখতে সিরিয়াস যানজট লেগে যাবে। গাড়িতে গাড়িতে গিট্টু। কেউ বুঝতে পারবে না যানজট কেন হচ্ছে। এক সময় গুজব ছড়িয়ে পড়বে— যানজট হচ্ছে কারণ সামনে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য গুজব বলেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলবে। পেছনের গাড়িগুলি তখন চেষ্টা করবে উল্টো দিকে

ঘুরাতে। এই চেষ্টার ফলে এমন যানজট হবে যে সারাদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। রাজনৈতিক নেতারা খবর পাবেন যে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাংচুর হচ্ছে। তাঁরা ভাববেন যেহেতু তাঁরা মিছিল করেননি—কাজেই বিপক্ষ দল মিছিল বের করেছে। তাঁরা আন্দোলনে পিছিয়ে পড়েছেন। কি সর্বনাশ! তাঁরা তড়িঘড়ি করে জঙ্গি মিছিল বের করবেন। এবং তখন সত্যি সত্যি শুরু হবে গাড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি ।

পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিয়ে ছোটাছুটি। টিয়ার গ্যাসের সেল মারবে কি, মারবে না বুঝতে পারছে না। সরকারী দলের মিছিলে টিয়ার গ্যাসের শেল মারতে খবর আছে। এই হাঙ্গামার মধ্যে কেউ না কেউ মারা যাবে। নাম পরিচয়হীন সেই লাশ নিয়ে পড়ে যাবে কড়াকড়ি। একদল বলবে এই লাশ বিএনপি কর্মীর, আরেক দল বলবে আওয়ামী লীগের। অথচ কেউ জানে না মৃত মানুষের কোন দল থাকে না।

আমি ব্যাঙাচিকে আমার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়া করাতে রাজি করতে পারলাম না। সে চোখ কপালে তুলে বলল, 'দোস্ত তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? গাড়ি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। তুই শেষ মুহুর্তে লাফ দিয়ে পার পাবি। আমি তো লাফও দিতে পারি না। নাম ব্যাঙচি হলে কি হবে লাফাতে তো পারি না। আমি বরং রাস্তার পাশে দাঁড়াই।'

ব্যাঙাচি চিন্তিত মুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দু'হাত মেলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে ফল পেলাম। প্রায় নতুন একটা পাজেরো জীপ (আমার খুব পছন্দের গাড়ি) আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে এক সানগ্লাস পরা লোক মাথা বের করে বলল, 'কি ব্যাপার?'

ভদ্রলোককে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বুঝতে পারছি না। সানগ্লাস খুললে হয়ত চিনতে পারব।

'আপনি কি চাচ্ছেন?'

'স্যার, আমরা দুই বন্ধু আপনার কাছে লিফট চাচ্ছি। আমাদের অতীশ দীপংকর রোডে নামিয়ে দিন।'

'লিফটের জন্য হাঁট উঁচিয়ে গাড়ি থামালেন?'

'জ্বি।'

'আসুন, উঠে আসুন। আপনার বন্ধুকেও ডাকুন।'

ব্যাঙাচি গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'দোস্ত, তোর প্রতিভা দেখে আমি মুগ্ধ। তুই তো মানব না, মহামানব। গাড়িতে লোকজন না থাকলে আমি তোর পায়ের ধুলা নিতাম।'

গাড়ি অতীশ দীপংকর রোডের দিকে গেল না। রমনা থানার সামনে থামল। চশমা পরা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নামুন। আমি আপনাদের পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চেনাচেনা লাগছে। আপনি কি বিখ্যাত কেউ?'

'আমি বিখ্যাত কেউ না। আগে একদিন আপনি আমাকে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন। আমি গাড়ির কাচ তুলে দিলাম—আপনি বাইরে থেকে ভেংচি কাটছিলেন। নানান অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। এখন চিনতে পেরেছেন?'

'জ্বি।' এখন চিনতে পারছি। চোখে সানগ্লাস থাকায় চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।'

‘আজ আবার গাড়ি আটকেছেন। ইউ আর এ পাবলিক নুইসেন্স। পুলিশের উচিত আপনাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করা।’

ব্যাঙাচি শুকনো গলায় বলল, ‘স্যার আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা হেঁটে হেঁটে অতীশ দীপংকর রোডে চলে যাব। হাঁটাটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল। আপনি চলে যান, আপনাকে শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলাম। আমরা দুই বন্ধুই আন্তরিক দুঃখিত। আওয়ার এপলজি।’

এপলজিতে কাজ হল না। রমনা থানার সেকেন্ড অফিসার বিরসমুখে আমাদের হাজতে ঢুকিয়ে দিলেন। এছাড়া তার উপায়ও ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি এক প্রতিমন্ত্রীর শালা। মন্ত্রীর শালাদের ক্ষমতা মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। মন্ত্রী তাঁর পাজেরো গাড়ি নিয়ে যত ঘুরেন— তার শালা তার চেয়ে বেশি ঘুরেন। এটাই নিয়ম।

ব্যাঙাচি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। তার করুণ মুখ দেখে মায়া লাগছে। কেঁদেটেদে ফেলবে কিনা বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত এটাই তার প্রথম হাজত বাস।

ব্যাঙাচি হতভম্ব গলায় বলল, ‘দোস্ত, সর্বনাশ হয়ে গেলো তো।’

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, ‘সর্বনাশের কি আছে?’

‘তোর ভাবী যখন শুনবে আমি হাজতে তখন অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পারছিস না?’

‘ভাবী খুশিও হতে পারে। হাজতে থাকা মানে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ভাবীর তো খুশি হবারই কথা।’

‘হাজতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ মানে? এরা খেতে দেয় না?’

‘পার হেড এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা বাজেট। এই টাকায় কি খাবি? এর আগে একবার হাজতে আমি সারাদিনে একটা কলা খেয়েছিলাম। অবশ্যি বেশ বড় সাইজ কলা।’

‘তুই কি এর আগেও হাজতে ছিল নাকি?’

‘থাকি মাঝে মধ্যে।’

‘কি সর্বনাশ বলিস কি? তোর সঙ্গে মেশা, তো ঠিক হয়নি।’

‘এবার ছাড়া পাবার পর আর মিশিস না।’

‘ছাড়া পাব কিভাবে?’

‘আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পুলিশের বড় কর্তা, কিংবা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কেউ আছে?’

‘না।’

‘মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর শালাদের কারোর সঙ্গে মহব্বত আছে?’

‘তোর ভাবীর থাকতে পারে। আমার নেই।’

‘শেখ হাসিনা, কিংবা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে পরিচিত কেউ কি আছে যে তোকে চেনে।’

‘আমার জানা মতে নেই। তবে তোর ভাবীর থাকতে পারে। ওর কানেকশন ভাল।’

‘তাহলে টেলিফোন করে ভাবীকে বল। ভাবী একটা-কিছু ব্যবস্থা করবে।’

‘সর্বনাশ তোর ভাবীকে জানানোই যাবে না। কারবালা হয়ে যাবে। পুলিশ শুনেছি ঘুষ খায়। এরা খাবে না?’

‘প্রতিমন্ত্রীর শালা এসে আমাদের দিয়ে গেছে তো—পুলিশ এখন আর ঘুষ খাবে না। তবে আমাদের নিজ থেকেই উচিত পান খাওয়ার জন্যে তাদের কিছু দেয়া। মারের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই দিতে হবে।’

ব্যাঙাচি আঁৎকে উঠে বলল, ‘মারবে নাকি?’

‘মারবে তো বটেই। কথা বের করার জন্যে মারবে। ইন্টারোগেশনের টাইমে হেভি ধোলাই দিতে পারে। তোর সঙ্গে কথা বলছে, কথা বলছে—স্বাভাবিক ভাবেই বলছে, আচমকা গদাম করে তলপেটে এক ঘুষি।’

‘বলিস কি? ইন্টারোগেশন কখন হবে?’

‘ওসি সাহেবের সময় হলেই হবে। যত দেরিতে উনার সময় হয় ততই ভাল। এত দুঃচিন্তা করে লাভ নেই। ঘুমিয়ে থাক।’

‘হিমু।’

‘বল।’

‘দোস্ত, তুই কিছু মনে করিস না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। তোর সঙ্গে মেশা আমার ঠিক হয়নি। বিরাট ভুল হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। তোকে ভাল মানুষের মত দেখালেও তুই আসলে ডেঞ্জারাস।’

‘আর মিশিস না।’

‘মিশিস না বললেই তো হবে না। তুই আমার বাল্যবন্ধু।’

‘বিপদের সময় বাল্য-বন্ধু, বৃদ্ধ-বন্ধু কোন ব্যাপার না।’

‘এটাও ঠিক বলেছিস। দোস্ত, এখানে বাথরুমের কি ব্যবস্থা? আমার টেনশানে বাথরুম পেয়ে গেছে।’

‘ছোট বাথরুম হলে এক কোণায় বসে পড়। হাজতের সেলে ছোট বাথরুম করা যায়। কেউ কিছু বলে না। বড়টা হলে সমস্যা আছে।’

‘কি সমস্যা?’

‘সেন্ট্রিকে ডাকতে হবে। তার যদি দয়া হয় বাথরুমে নিয়ে যাবে।’

‘দয়া না হলে?’

‘দয়া না হলে দয়া তৈরি করার সিষ্টেম আছে। টাকা দিলেই দয়া তৈরি হয়।’

‘আমাদের সঙ্গে তো টাকা নেই।’

‘তোর কি বড়টা পেয়েছে?’

‘হু। সকালবেলা বাউলস ক্লিয়ার হয়েছে— এখন এই টেনশানটায় সিষ্টেমে গন্ডগোল— আগামীকাল সকালে যেটা হবার কথা সেটা এখন হতে চাচ্ছে। দোস্ত কি করব?’

‘দেখি, সেন্ট্রিকে ডাকি।’

‘যদি রাজি না হয়? দোস্ত আমার পানির পিপাসাও পেয়েছে। এখানে পানি খাবার সিস্টেম কি?’

‘বাথরুমে যখন নিয়ে যাবে ঐ সময় পানি খেয়ে নিবি। উটের মত বেশি করে খাবি। যাতে জমা করে রাখতে পারিস। আবার পানি খাবার সুযোগ কখন হবে কে জানে।’

ব্যাঙাচি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। তার কপাল ঘামছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। মনে হয় কোন দোয়া-টোয়া পড়ছে। নিয়ামুল কোরানে কোন বিপদে কোন দোয়া পড়তে হয় তার বিবরণ আছে। ঝড়ের সময়ে

দেয়া, আগুন লাগলে দোয়া, দামী জিনিস হারিয়ে গেলে খুঁজে পাবার দোয়া... পুলিশের হাতে পরলে কোন দোয়া পড়তে হবে সেটা নেই। থাকলে জনগণের উপকার হত।

ওসি সাহেব প্রথমে আমাকে ডাকলেন। তাও ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে। ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির। চেহারার মধ্যেই একটা ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাব। মাঝে মাঝে জিব বের করে ঠোঁট চাটেন। চাটা দেখে মনে হয় ঠোঁটে অদৃশ্য চিনি মাখানো। জিব দিয়ে সেই চিনি চেটে নিয়ে মজা করে খাচ্ছেন।

'আপনার নাম?'

'স্যার, আমার ভাল নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু।'

'হাজতে এই প্রথম এসেছেন, না এর আগেও এসেছেন?'

'এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি।'

'তাহলে তো আপনি আত্মীয়ের মধ্যেই পড়েন। কখনো কনভিকশান হয়েছে?'

'জ্বি না। হাজত থেকেই ছাড়া পেয়ে গেছি।'

'এইবার পাবেন না। এইবার জেলখানার ল্যাপসি খাওয়াবার ব্যবস্থা করে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে মজা পাচ্ছেন। মজার ইংরেজী জানেন?'

'জানি স্যার - ফান।'

'এইবার আপনার ফানের ব্যবস্থা করে দেব। গাড়ি ভাঙ্গতে খুব মজা লাগে?'

'স্যার, আপনার সামান্য ভুল হয়েছে। আমি গাড়ি ভাঙ্গিনি। অতি ভদ্রভাষায় লিফট চেয়েছিলাম। উনি লিফট দেয়ার নাম করে থানায় নিয়ে এসেছেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার, এটাই ঘটনা। বাংলাদেশ পেনাল কোডে – কথা দিয়ে কথা না রাখার কি কোন শাস্তি আছে? যদি থাকে তাহলে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত।'

'আপনি কি নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভাবেন?'

'জ্বি না, ভাবি না। তবে স্যার, সত্যি কথা বলতে কি — আমি যেমন নিজেকে চালাক ভাবি না— অন্যকেও ভাবি না।'

'আপনি কার গাড়ি ভেঙ্গেছেন সেটা জানেন?'

'স্যার, আমি কারোর গাড়ি ভাঙ্গিনি। তবে যিনি গাড়ি ভাঙ্গার কথা বলছেন তিনি ক্ষমতাবান মানুষ মন্ত্রীর শ্যালক। এই তথ্য জানি।'

'তিনি এফ আই আর করে গেছেন— আপনি এবং আপনার বন্ধু মিলে তাঁর গাড়ি ভেঙ্গেছেন। এবং আগে একদিন তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন। থান ইট দিয়ে তার মাথা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন।'

'থান ইট দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেবার কথাটা সত্যি না হলেও ভয় দেখাবার ব্যাপারটা সত্যি।'

'ভয় কিভাবে দেখিয়েছেন?'

'ভেংচি কেটেছি। বাচ্চারা কাউকে ভেংচি দিলে ভয় লাগে না। কিন্তু বড় কোন মানুষ ভেংচি কাটলে বুকে ধাক্কার মত লাগে। কিভাবে ভেংচি কেটেছিলাম সেটা কি স্যার ডেমনসট্রেট করে দেখাব?'

'অবশ্যই দেখাবেন। আপনার মত ফাজিলদের কি চিকিৎসা আমরা করি সেটা আগে একটু ডেমনসট্রেট করে দেখাই। প্রথমে আমাদের ডেমনসট্রেশন, তারপর

আপনারটা।’

‘আপনাদের কর্মকাণ্ড শুরু হবার আগে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?’

‘পারেন।’

‘আপনার বোধহয় মনে আছে যে, আপনাকে আমি শুরুতেই বলেছি, আমি এর আগে বেশ কয়েকবার হাজতে এসেছি। প্রতিবারই ছাড়া পেয়েছি। কোন কনভিকশন হয়নি। তা থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমিও ক্ষমতাবান একজন মানুষ। মন্ত্রীর শালার চেয়েও আমার ক্ষমতা বেশি। কাজেই আপনি যা করবেন ভেবেচিন্তে করবেন। ইংরেজী ঐ বাক্যটা আশা করি আপনি জানেন –

Look before you leap.

ঝাঁপ দেবার আগে ভাল করে দেখ। একবার ঝাঁপ দিয়ে ফেললে কিন্তু সমস্যা।

ওসি সাহেব জিভ চাটা বন্ধ করেছেন। সরু চোখে তাকাচ্ছেন। ভেতরে একটু যে থমকে গেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই এই সুযোগটা নিতে হবে। ওসি সাহেবকে ভড়কে দিতে পারলে কিল-থাপ্পড় থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া যাবে।

‘আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনি একজন বিগ শট?’

‘জ্বি না, আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী – ভেরী থল শট। জীবাণু টাইপ। আমার পাজেরো গাড়ি নেই, মন্ত্রী দুলাভাই নেই— এবং পায়ে জুতা পর্যন্ত নেই। যদি কিছু মনে না করেন– কবীরের একটা দোঁহা আপনাকে শুনাতে পারি?’

‘কারে কি শুনাতে চাচ্ছেন?’

‘কবীরের দোঁহা – কবীর বলছেন,

হরি নে আপনা আপ ছিপায়।
হরি নে নফীজ কর দিখরায়া—

‘এর মানে কি?’

‘এর মানে হচ্ছে, ঈশ্বর আপনাকে আপনি লুকিয়ে রাখেন আবার কি অদ্ভুত সুন্দর করেই না নিজেকে প্রকাশিত করেন।’

‘আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই যে লাইন দুটা বললেন– এর মানে কি?’

‘মানে তো আপনাকে বললাম।’

‘ব্যাখ্যা করেন।’

‘ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে।’

‘কত সময় লাগবে?’

‘দুই তিন দিন সময় লাগবে। এক কাজ করুন, আমাকে দুই তিন দিন হাজতে রেখে দিন। আমি লাইন দুটার ব্যাখ্যা করব। তবে একটা শর্ত আছে।’

‘কি শর্ত?’

‘আমার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে হবে।’

‘ও আচ্ছা।’

‘ও আচ্ছা বলার দরকার নেই। মন্ত্রীর শালাবাবুর কাছে অপরাধ যা করেছি আমি করেছি। আমার বন্ধু করেনি। ওকে ছেড়ে দিন— আপনার লাভ হবে।’

‘কি লাভ হবে?’

‘সেটা যথাসময়ে দেখবেন। লাভ-লোকশান প্রসঙ্গেও কবীরের একটা দোহা আছে বলব?’

'দোহা ফোহা বাদ দিন। ঝেড়ে কাশুন। আপনি কে ঠিক করে বলুনঃ আপনার ব্যাক গ্রাউন্ড কি? আপনি করেন কি?'

'আমি স্যার কিছুই করি না। হলুদ পাঞ্জাবী পরে পথে পথে হাঁটি।'

'আপনার চলে কি ভাবে?'

'এত বড় একটা শহরে একজন মানুষের বেঁচে থাকা কোন কঠিন ব্যাপার না।'

'পথে পথে ঘুরেন কেন?'

'আমার বাবার জন্যে পথে পথে ঘুরি। আমার বাবার মাথা ছিল খারাপ। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারত না। তাঁর সমস্ত আচার-আচরণ ছিল স্বাভাবিক মানুষের মত। শুধু চিন্তা ভাবনা ছিল পাগলের মত।'

'কি রকম?'

'তাঁর ধারণা হল— যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, ডাক্তার স্কুলে পাঠিয়ে বানানো যায় ডাক্তার, তাহলে মহাপুরুষ বানানোর স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে কেন মহাপুরুষ বানানো যাবে না।'

'মহাপুরুষ বানানোর স্কুল আছে নাকি?'

'জ্বি না, বাবা একটা স্কুল দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আর আমি তাঁর ছাত্র। প্রথম এবং শেষ ছাত্র।'

'স্কুলে কি শেখানো হত?'

'নির্দিষ্ট কোন সিলেবাস ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মাথায় যখন যা আসত তাই ছিল পাঠ্যক্রম। একটা উদাহরণ দেই। আমি অন্ধকারে ভয় পেতাম। সেই ভয় কাটানোর জন্যে তিনি একদিন একরাতে আমাকে বাথরুমে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। আমার বয়স তখন সাত।'

'বলেন কি, এ তো পাগলের কান্ড।'

'আগেই তো বলেছি বাবা পাগল ছিলেন।'

'আপনার মা বাধা দেননি?'

'মা যাতে বাধা দিতে না পারেন সেই জন্যে মাকে মেরে ফেলেছিলেন। বাবার ধারণা মাতৃস্নেহ মহাপুরুষ হবার প্রক্রিয়ায় বড় বাধা। মহাপুরুষকে সব রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। স্নেহের বন্ধন, মায়ার বন্ধন, ভালবাসার কন্ধন।'

'আই সি। বাবার ট্রেনিং এর ফলে আপনি কি মহাপুরুষ হয়েছেন?'

'জ্বি না। মনে হয় পাশ করতে পারিনি। ফেল করেছি। তবে......'

'তবে আবার কি?'

'লোকজনদের খানিকটা বিভ্রান্ত করতে পারি। এটা মহাপুরুষদের একটা লক্ষণ। মহাপুরুষদের কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। সত্যি করে বলুন তো স্যার আপনি কি বিভ্রান্ত হননি?'

'আমি বিভ্রান্ত হয়েছি?'

'জ্বি হয়েছেন। আপনার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। আপনি ভাবছেন – হলুদ পাঞ্জাবী পরা এই লোকটা মহাপুরুষ হলেও তো হতে পারে। আপনার মন দুর্বল বলেই সন্দেহটা প্রবল।'

'আমার মন দুর্বল?'

'জ্বি স্যার— ঘুষ যারা খায় তাদের মন দুর্বল থাকে।'

'আই সি।'

‘আপনি কি স্যার দয়া করে আমার বন্ধুকে ছেড়ে দেবেন?’

ওসি সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ঝিম ধরে রইলেন। এক সময় তাঁর ঝিম কাটল। তিনি মিনিট তিনেক পা নাচালেন। মানুষ সাধারণত একটা পা নাচায়— উনি দুটা পা এক সঙ্গে নাচাচ্ছেন। দেখতে ভাল লাগছে। পা নাচানো থামল। ওসি সাহেব গভীর গলায় বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে যান— আপনার বন্ধুকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি কিন্তু আছেন।’

‘অবশ্যই আছি। আপনাকে কবীরের দুই লাইনের ব্যাখ্যা না দিয়ে আমি যাব না।’

‘চা খাবেন?’

‘জ্বি চা খাব এবং একটা সিগারেট খাব। স্যার আরেকটা কথা, হাজতে ঢুকানোর পর কি একটা টেলিফোন করার সুযোগ পাওয়া যায় না। আত্মীয় - স্বজনকে জানানো যে, দয়া কর, দুশ্চিন্তা কর— আমি হাজতে আছি।’

‘টেলিফোন করতে চান?’

‘জ্বি চাই।’

‘কাকে ফোন করবেন, প্রধানমন্ত্রীকে?’

‘জ্বি না স্যার, আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। জীবাণু টাইপ। জীবাণুর চেয়েও ছোট-ভাইরাস বলতে পারেন।’

‘ভাইরাস মাঝে মাঝে ভয়ংকর হয়।’

‘জ্বি স্যার, তা হয়।’

‘নাম্বার বলুন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।’

‘মন্ত্রী সাহেবের শালার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। উনার টেলিফোন নাম্বার তো আপনি রেখে দিয়েছেন। তাই না?’

‘টেলিফোনে কি বলবেন?’

‘সেটা এখনো ঠিক করিনি। বাংলাদেশ আইনে আমি হাজত থেকে একটা টেলিফোনের সুযোগ পাই। সেই সুযোগ ব্যবহার করতে চাচ্ছি।’

‘আচ্ছা দেখি - উনি কথা বলতে চান কিনা কে জানে।’

ওসি সাহেব নিচু গলায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমার সম্পর্কে কিছু বললেন বোধহয়। তারপর টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আনন্দিত গলায় বললাম—‘কেমন আছেন ভাই। আমি হিমু।’

‘কি চান আমার কাছে?’

‘আমি আল্লাহর কাছেই কিছু চাই না, আর আপনার কাছে কি চাইব?’

‘বড় বড় কথা শিখেছেন। মুখের চেয়ে জিহ্বা বড়। জিহবা এখন সাইজ মত কাটা পড়বে।’

‘স্যার আপনার বুকের ব্যথাটার খবর কি শুরু হয়েছে?’

‘তার মানে?’

‘আমি একজন মহাপুরুষ টাইপ জিনিস। আপনি আমার নামে মিথ্যা ডাইরী করেছেন। তার শাস্তি হিসেবে আপনার বুকে ব্যথা শুরু হবার কথা। এখনো হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না।’

‘চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব হারামজাদা।’

‘স্যার, ব্যথাটা খুব বেশি হলে দেরি না করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চলে যাবেন। এনজিষ্ট ট্যাবলেট আনিয়ে রাখুন। জিভের নিচে দিতে হবে।’

টেলিফোনের ওপাশে ভদ্রলোক রাগে থর থর করে কাঁপছেন। ভদ্রলোককে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে। আমি তাঁর রাগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বললাম, ‘আমার নামে মিথ্যা এফ আই আর করিয়েছেন— এটা ঠিক হয়নি। বুকের ব্যথা উঠামাত্র থানায় ওসি সাহেবকে সত্যি কথাটা জানাবেন। ব্যথা কমে যাবে। আপনার দুলাভাই মিথ্যা বললে কোন সমস্যা না, তিনি মন্ত্রী মানুষ। মিথ্যা তিনি বলবেন না তো কে বলবে? তিনি সত্যি কথা বললেই সমস্যা।’

‘সত্যি কথা বললে সমস্যা মানে?’

‘মন্ত্রীরা মিথ্যা বলেন এটা ধরে নিয়েই আমরা চলি। এতে সিষ্টেম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই হঠাৎ একজন মন্ত্রী যদি সত্যি কথা বলা শুরু করেন তাহলে সমস্যা হবে না?’

‘ফর ইওর ইনফরমেশন – আমার দুলাভাই কখনোই মিথ্যা বলেন না। এমপিরা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি পায় আপনি বোধহয় জানেন। সংসদে সব এমপিরা কোন বিষয়েই একমত হন না, শুধু ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির বিষয় ছাড়া। সেখানে আমার দুলাভাই ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি নেননি।’

‘আমি যে গাড়িতে চড়তে চাইলাম সেটা তাহলে কার?’

‘আমার।’

‘স্যার আপনি কি করেন?’

‘ব্যবসা।’

‘গার্মেন্টস?’

‘ঠিক ধরেছেন।’

আপনাদের গার্মেন্টসে কি হলুদ পাঞ্জাবী হয়? আমাদের দু'টা হলুদ পাঞ্জাবী দিতে পারবেন? একটা আমার জন্যে, একটা ওসি সাহেবের জন্যে। আমার সাইজ চৌত্রিশ। ওসি সাহেবের ছয়ত্রিশ। এক্সটা লার্জ কিনলেই হবে।’

খট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। ওসি সাহেব চিন্তিত এবং বিরক্তমুখে বললেন, ‘আপনি শুধু যে নিজে বিপদে পড়েছেন তা না। আপনি তো মনে হয় আমাকেও বিপদে ফেলেছেন। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে ঢাকায় পোষ্টিং নিয়েছি— বিরাট ইনভেষ্টমেন্ট। ইনভেষ্টমেন্টের দশ ভাগের এক ভাগও এখনো তুলতে পারিনি। এর মধ্যে যদি বদলি করে দেয় তাহলে আম-ছালা সবই যাবে। শুধু পড়ে থাকবে আমের আঁটি। ভাল কথা, ভদ্রলোকের বুকে কি সত্যি ব্যথা উঠবে?’

‘জ্বি উঠবে। আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্যে না। এমিতেই উঠবে। মানসিক ভাবে দুর্বল তো তার জন্যে মনে একটা চাপ আছে। এ চাপ শরীরে চাপ ফেলবে। বুকে তীব্র ব্যথা হবে। এও হতে পারে— ব্যথা ট্যাথা কিছু হল না, কিন্তু মনে হবে ব্যথা হচ্ছে। স্যার, আমার বন্ধুকে ছাড়ার ব্যবস্থা করবেন না?’

‘করছি। সিগারেট খাবেন?’

‘জ্বি খাব।’

ব্যাঙাচি বিশ্বাসই করছে না যে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। সে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং দুঃখিত। তাকে ছেড়ে দিচ্ছে এই আনন্দ তার রাখার জায়গা নেই। আবার আমাকে আটকে রেখেছে এই দুঃখেও সে আসলেই বিপর্যস্ত।

‘দোস্ত তোকে রেখে চলে যেতে খুবই খারাপ লাগছে।’

‘আমাকে তো রেখে যেতেই হবে। আমি দোষ করেছি গিল্টি পার্টি। তুই তো দোষ করিসনি।’

‘তা ঠিক। তোর ভাবীর অনেক বড় বড় আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের ধরলেই তোর রিলিজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তোর ভাবীকে কিছুই বলা যাবে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, তোর কথা বললেই সে বলবে – তোমার বন্ধু হাজতে সেই খবর তোমাকে কে দিল? আমি তার জেরার মুখে পড়ে স্বীকার করে ফেলব যে আমিও হাজতে ছিলাম। দাবানল লেগে যাবে, বুঝলি।’

'বুঝতে পারছি।'

'শোন দোস্ত। তুই আশা ছাড়িস না, আমি ধর্মীয় লাইনে চেষ্টা করব। আমাদের বাড়ির পাশেই এক হাফেজ সাহেব আছেন। এক হাজার টাকায় কোরান খতম দেন। আর্জেন্ট ব্যবস্থাও আছে। খুব ইমার্জেন্সি হলে মাদ্রাসার তালেবুল এলেমদের নিয়ে চার ঘন্টায় খতম শেষ করে দোয়া করে দেন। দোস্ত তোর জন্যে এক্সটা ফি দিয়ে আর্জেন্ট দোয়া করাব। ইনশাল্লাহ আমি কথা দিলাম। আর আমি রোজ এসে তোর খোঁজখবর করব। টিফিন কেরিয়ারে করে খাওয়া নিয়ে আসব। প্রমিজ।'

'কিছু আনতে হবে না।'

'অবশ্যই আনতে হবে। তুই না খেয়ে থাকবি? দোস্ত মনে ভরসা রাখ– কাল সকালের মধ্যে খতম স্টার্ট হবে। ইনশাল্লাহ।'

আমাকে হাজতে থাকতে হল তিনদিন। ওসি সাহেবের সঙ্গে এই তিনদিন আমার কথা হল না। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। কোন একটা ঝামেলা হয়েছে – দিন রাত চব্বিশ ঘটাই তাকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। এই তিনদিনে ব্যাঙাচির কোন খোঁজ নেই। তার টিফিন কেরিয়ার নিয়ে আসার কথা।

চতুর্থ দিন সকালে ওসি সাহেব আমাকে ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তমূখে বললেন, 'যান, চলে যান।'

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। গত পরশুই আপনাকে ছেড়ে দেবার কথা। আমি অপারেশনে যাবার আগে সেকেণ্ড অফিসারকে বলে গিয়েছিলাম আপনাকে ছেড়ে দিতে। সে ভুলে গেছে। কিছু মনে করবেন না – দুদিন এক্সটা হাজতবাস হল।'

'আপনাকে কবীরের দোঁহার ব্যাখ্যাটা তো বলা হল না।'

'ব্যাখ্যা বাদ দেন। আমার জান নিয়ে টানাটানি। খুব সমস্যায় আছি। এক কাপ চা খান— চা খেয়ে চলে যান। মনে কোন কষ্ট পুষে রাখবেন না। প্রতিমন্ত্রীর শালা টেলিফোন করে আমাকে বলেছেন যে, তিনি দুঃখিত – এই খবরটা যেন আপনাকে দেয়া হয়। আমি দিলাম। কাজেই আমার দায়িত্ব শেষ।'

'উনার কি ব্যথা উঠেছিল?'

'ব্যথার খবর জানি না। উঠেছে তো বটেই। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন হয়েছে। গলা চিঁচিঁ করছে। আপনি ইন্টারেষ্টিং কারেক্টর।'

'থ্যাংক য়্যু।'

আমি ওসি সাহেবের সঙ্গে চা খেলাম। ওসি সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, মনটা খুবই খারাপ। মনে হয় আমাকে বদলি করে খাগড়াছড়ি-টরির দিকে পাঠাবে। শান্তি বাহিনীর ডলা খাব।

'শান্তি চুক্তি তো হয়ে গেছে, এখন আর কিসের ডলা?'

'এখনকার ডলা হবে আপোসের ডলা। শান্তি শান্তি ভাবে হাসতে হাসতে ডলা। যাই হোক, বাদ দেন। চায়ের সঙ্গে কিছু খাবেন?'

'একটা সিগারেট খাব।'

ওসি সাহেব সিগারেট দিলেন। লাইটার জ্বলিয়ে সিগারেট ধরাতে এসেছেন। বাতাসের জন্যে ধরাতে পারছেন না। বাতাসে লাইটারের আগুন নিভে যাচ্ছে। তিনি মহা বিরক্ত আমি ওসি সাহেবকে বললাম, 'একটা মজার কথা কি জানেন ওসি সাহেব! ছোট্ট আগুনের শিখা বাতাসে নিভে যায়। কিন্তু বিশাল যে আগুন, যেমন

মনে করুন দাবানল, বাতাস পেলে ফুলে-ফেপে উঠে।'

'ওসি সাহেব বললেন, 'এটাও কি কবীরের দোঁহা?'

'জ্বি না, এটা হিমুর দোঁহা।'

'হিমুটা কে?'

'আমিই হিমু।'

'ও আচ্ছা, আপনি হিমু একবার বলেছিলেন। ভুলে গিয়েছি। কিছু মনে থাকে না। এমন এক বিপদে আছি যা বলার না। কারো সঙ্গে পরামর্শও করতে পারছি না। এটা এমনই এক সেনসেটিভ ইস্যু যে পরামর্শও করা যাচ্ছে না। ইয়ে তাল কথা, আপনি পরামর্শ কেমন দেন?'

'খুবই খারাপ পরামর্শ দেই। আমার পরামর্শ যে শুনবে তার অবস্থা কাহিল।'

'শুনি আপনার পরামর্শটা।'

'ঘটনা না শুনে পরামর্শ দেব কিভাবে?'

ওসি সাহেব গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা রেপ হয়েছে। অল্প বয়েসী একটা মেয়েকে তার স্বামীর সামনে তিন মস্তান রেপ করেছে। মস্তান তিনটার আবার খুব ভাল পলিটিক্যালে কানেকশান আছে। মেয়ে এবং মেয়ের স্বামী এদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।'

'আপনাকে চাপ দেয়া হচ্ছে মামলা ভণ্ডুল করে দিতে?'

'এটা করলে তো ভালই ছিল। মামলা নষ্ট করা কোন ব্যাপারই না। আমাকে বলা হচ্ছে এই তিনজনের জায়গায় অন্য তিনজনের নাম ঢুকিয়ে দিতে। এটা কি করে সম্ভব বলেন?'

'সম্ভব না কেন? মেয়ে যে তিন নাম বলছে সেই তিন নাম না লিখে আপনি লিখবেন অন্য তিন নাম। ঐ তিনজনকে ধরে এনে রাম ছ্যাচা। ব্যাটা তোরা কেন রেপ করলি না? অন্যরা রেপ করে চলে গেল তোরা ছিলি কোথায়?'

'রসিকতা করছেন না? করেন, রসিকতা করেন। আমরা নষ্ট হয়ে গেছি। আমাদের নিয়ে তো রসিকতা করবেনই। যারা আমাদের নষ্ট করল তাদের নিয়ে রসিকতা করার সাহস আছে? নেতাদের হাত থেকে দেশটাকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের হাতে দেন– তারপর ...'

ওসি সাহেব চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, 'ওসি সাহেব একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কি কাজ?'

'আপনি সত্যি আসামীদের ধরে সেই ভাবেই কেইস সাজিয়ে দিন। নিরপরাধ তিনজনকে শাস্তি দেবেন সেটা কেমন কথা?'

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, পাগলের মত কথা বলবেন না। দেশের পরিস্থিতি বিচার করে কথা বলবেন। হাই লেভেল থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটাই করতে হবে।'

'আপনি যখন সত্যি কাজটা করবেন তখন আপনি হাই লেভেলে চলে যাবেন। বাকি সবাই চলে যাবে লো লেভেলে।'

'আপনি বিদায় হোন। নিন, এ সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিন। ঘুষের টাকায় কেনা। অসুবিধা নেই তো?'

'কোন অসুবিধা নেই।'

আমি থানা থেকে বের হলাম। ওসি সাহেবও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলেন। তাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তার চেহারা থেকে ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাবটা চলে গেছে।

৬

বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে তামান্নার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। সেটা ঠিক হবে কি? খাল কেটে হাঙ্গর নিয়ে আসা হবে না তো। ফ্ল্যাটবাড়িগুলিতে অবধারিতভাবে কিছু নিষ্কর্মা বডি বিল্ডার থাকে। তারা কারোর শালা, কারোর খালাতো ভাই। এদের প্রধান কাজ ফ্ল্যাটবাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করা। কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে ইটিস-পিটিস করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা, সন্দেহভাজন কেউ ঘুর ঘুর করছে কিনা তাও নজরে রাখা। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে বসে থাকা অবশ্যই সন্দেহজনক কর্মকান্ডের ভেতর পড়ে। তামান্নার মা-বাবাই জানালা দিয়ে হাত ইশারা করে কাউকে ডাকিয়ে আনতে পারেন।

পানির তৃষ্ণা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। কলিংবেল টিপে পানি খেতে চাইলে কেমন হয়? একবার পানি চাইলে দরজা খুলতেই হবে। তৃষ্ণার্তকে পানি দেবে না এমন বাঙালি মেয়ের এখনো জন্ম হয়নি। রোজহাশরের ময়দানে সূর্য চলে আসবে মাথার এক হাত উপরে। তৃষ্ণায় তখন বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইবে। তখন শুধুমাত্র তাদেরকেই পানি পান করানো হবে যারা তৃষ্ণর্তিকে পানি পান করিয়েছে।

আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বডি বিল্ডার উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছে তাকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। সম্ভবত তামান্নার মা পেছনের বারান্দা থেকে পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন। কারণ বডি বিল্ডার শীতল গলায় বলল, ‘ব্রাদার একটু নিচে আসেন। কুইক।’

এইসব ক্ষেত্রে কোন রকম তর্কবিতর্কে যাওয়া ঠিক না। আমি হাসি মুখে বডি বিল্ডারের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। সেখানে আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছে। অপেক্ষমান এক শুটকা যুবকই মনে হয় বডি বিণ্ডারদের লীডার। সে জ্ঞানী টাইপ মুখ করে চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। মুখে সিগারেট। তবে সিগারেটে আগুন নেই। হাতে লাইটার আছে। সিগারেট এখনো ধরানো হয়নি। শুটকা তরুণ লাইটারটা এক হাত থেকে আরেক হাতে লোফালুফি করছে।

নিশ্চয়ই ভিসিআরে এমন কোন ছবি দেখেছে সেখানে নায়ক এইভাবে চেয়ারে বসে পা নাচায়, ঠোঁটে থাকে সিগারেট। সে হাতে লাইটার নিয়ে জগলিং করে। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরানোর দৃশ্যটিও ইস্টারেষ্টিং হবার কথা। আমি সেই দৃশ্য দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

বডি বিল্ডার শুটকার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মনা ভাই, ধইরা আনছি।’

মন ভাই পা নাচানো বন্ধ করে আমাকে দেখলেন। ইন্টারোগেশন পর্ব শুরু হল।

‘কি নাম?’

'হিমু।'

'এখানে কার কাছে?'

'তামান্নার কাছে।'

'তামান্না কে হয়?'

'কিছু হয় না।'

'কিছু হয় না তাহলে এসেছেন কেন?'

'এখনো কিছু হয় না তবে ভবিষ্যতে হতে পারে।'

'তার মানে কি?'

'তামান্নার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে।'

মনা ভাই সঙ্গে সঙ্গে পা নাচানো বন্ধ করল। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। সে মনে হয় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে। হকচকিয়ে যাবার কারণে সিগারেট ধরানোর দৃশ্য তেমন জমল না।

'প্রেমের বিয়ে না এরেনজড ম্যারেজ?'

'এরেনজড ম্যারেজ। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'কথাবার্তা কি পাকা হয়ে গেছে।'

'এখনো পাকেনি। বিয়ে পাকতে একটু সময় লাগে।'

'স্ট্রেইট কথা জিজ্ঞেস করছি, স্ট্রেইট জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনা ভাই বডি বিল্ডারকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল। তাদের সঙ্গে কানে কানে কিছু কথা হল। বডি বিল্ডার অতি দ্রুত চলে গেল। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত কর্মকান্ড স্থগিত। মনাভাই আবারো লাইটার নিয়ে লোফালুফি করছেন। আমি দেখছি ইতিমধ্যে আরো কিছু উৎসাহী দর্শক উপস্থিত হয়েছে। মজাদার কিছু দেখার আগ্রহে দর্শকরা চক চক করছে। এই ফ্লাটবাড়িতে মনা ভাই এর কারণে প্রায়ই মনে হয় মজাদার কিছু হয়।

বডি বিল্ডার ফেরত এল এবং আনন্দিত গলায় জানাল যে, 'তামান্নার মা হিমু নামে কাউকে চেনেন এবং তার মেয়ের কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।'

মনা ভাই এর চোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। সে মুখে সুরুয়া টানার মত শব্দ করল। বুঝতে পারছি আমার কাটা খাল দিয়ে হাঙ্গর ঢুকে পড়েছে। হাঙ্গরের হাত থেকে শুধুমাত্র তামান্নাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'মনা ভাই, আমার বিচার যা করার তামান্না এলে করবেন। আপাতত দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখুন। যাতে আমি পালিয়ে যেতে না পারি।'

'দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

'জ্বি সেটাই ভাল হবে। শুধু একটা রিকোয়েষ্ট। কাউকে দিয়ে এক জগ ঠান্ডা পানি আনিয়ে দিন।'

মনা ভাই বলল, 'তুমি জামাই মানুষ পানি খাবে? তোমার জন্যে সরবতের ব্যবস্থা করি। ঠান্ডা সরবত।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'জ্বি আচ্ছা।'

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

আমি ছাড়া পেলাম রাত এগারোটায়। তামান্না তার এক অসুস্থ বান্ধবীকে দেখতে গিয়ে ফিরতে দেরি করেছে। যে কারণে আমার রিলিজ অর্ডারেও দেরি হল। তামান্না

আমাকে রিকশায় তুলে দিল এবং গভীর ভঙ্গিতে বলল, ‘আপনি দয়া করে আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে এইসব ভুলে যান। আপনার সঙ্গে আমার কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।’

আমি বললাম, ‘তামান্না, রিকশা ভাড়াটা দিয়ে দাও। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।’

তামান্না বলল, ‘রিকশা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে তুমি করে ডাকবেন না।’

ঘরে ঢুকে চিঠি পেলাম। দুটা চিঠি। ফাতেমা খালার ম্যানেজার লিখেছেন এবং ব্যাঙাচি লিখেছে। প্রথম পড়লাম ম্যানেজারের চিঠি।

হিমু সাহেব,

গত তিন দিনে আমি চারবার আপনার খোঁজ করেছি। আপনি কোথায় আছেন কেউ বলতে পারছে না। আপনাদের মেসের ম্যানেজার বলল, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া নাকি আপনার পুরানো রোগ। গত বছর একনাগাড়ে তিন মাস আপনার কোন খোঁজ ছিল না।

আমি খুবই চিন্তিত বোধ করছি। কারণ ম্যাডামের সিঙ্গাপুরে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। তিনি আপনার সঙ্গে কথা না বলে যেতে পারছেন না। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসের টিকিট কাটা আছে, কিন্তু আপনার কারণে কনফার্ম করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, এই চিঠি আপনার হাতে যেদিন আসবে দয়া করে সেদিনই ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বিনীত

রকিবুল ইসলাম।

ব্যাঙাচির চিঠিটার অর্ধেক বল পয়েন্টে লেখা। কয়েক লাইন বল পয়েন্টের কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় বিনা কালিতে লেখা। তারপর লেখা পেনসিলে।

দোস্ত,

আমার উপর রাগ নিশ্চয়ই করেছিস। দোস্ত কি করব বল- থানায় যেতে সাহসে কুলায়নি। তবে তোর জন্যে কোরান মজিদ খতম দিয়েছি। জুমাবারে ইমাম সাহেবকে বলে স্পেশাল দোয়া করিয়ে দিয়েছি। তুই যে হাজতে আছিস সেই কথা বলিনি। শুধু বলেছি বিপদগ্রস্ত মমিন মুসলমান। হাজতে আছিস শুনলে মুছল্লিদের কেউ কেউ অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। বিপদগ্রস্ত মমিন মুসলমানের জন্যে দোয়াতে কেউ আপত্তি করবে না।

যাই হোক, এখন আসল খবর হল তোর ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান বের করেছি। তার পিতার নাম সুলেমান – তার ঠিকানা, (এইখানে কয়েক লাইন বিনা কালিতে লেখা)।

তোকে বাসা চিনিয়ে দেব। ভদ্রলোক মাই ডিয়ার টাইপের। অতিরিক্ত কথা বলেন। পেশায় জ্যোতিষী। মন্ত্রতন্ত্র জানেন। কবিরাজী চিকিৎসাও করেন। তিনি বলেছেন ইউনানী শাস্ত্রে মেদভূড়ি কোন ব্যাপার না। তোর সাথে আলোচনা করে উনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাব কিনা সেই

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

দোস্ত এখন বল তোর খোঁজখবর না নেয়ার জন্যে তুই রাগ করিস নাই। বাল্যবন্ধুর অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দে।

ইতি তোর বাল্যবন্ধু
আরিফুল আলম জোয়ার্দার।

ফাতেমা খালার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলাম। ফাতেমা খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কোত্থেকে? এতদিন ছিলি কোথায়?'

'এতদিন না খালা, মাত্র তিন দিন।'

'তোর জন্যে আমার সব আটকা পড়ে আছে। হোটেল রিজার্ভেশন করিয়ে ছিলাম লাষ্ট মোমেন্টে তাও ক্যানসেল করলাম।'

'এখন আবার রিজার্ভেশন করাও।'

'ইয়াকুবের সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

'আসল লোক তো? ফলস না?'

'না ফলস না।'

'তোর খালুকে চিনতে পারল?'

'এখনো তার সঙ্গে কথা হয়নি।'

'কথা না বলে ভাল করেছিস। আগবাড়িয়ে খবর্দার তুই কিছু জিজ্ঞেস করবি না। আগে ভাব দিবি। দরকার হলে রোজ যাবি। তাকে ইন কনফিডেন্সে নিয়ে নিবি। পারবি না?'

'পরব।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'এখনো দেখিনি। শুধু সন্ধান বের করেছি।'

'আমি জানতাম তুই পারবি। গতকালই তামান্নাকে বলছিলাম যদি কেউ ইয়াকুবের খোঁজ-খবর করতে পারে হিমুই পারবে। ভাল কথা, লোকটা কি করে?'

'কবিরাজ।'

'কবিরাজ মানে কি?'

'অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজি মতে চিকিৎসা করে। তোমার গ্যাসের জন্যে এখন আর সিঙ্গাপুরে যেতে হবে না। তাকে বললেই বাসক পাতার রস, তুলসি পাতার রস, হিলিঞ্চা গাছের শিকড়-ফিকড় মিশিয়ে এমন জিনিস বানিয়ে দেবে যে এক ডোজ খেলেই গ্যাস হজম।'

'তুই বুঝতে পারছিস না হিমু। আমার অবস্থা ভয়াবহ। এমন গ্যাস হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ভয় হয়, গ্যাস বেলুনের মত উপরে উঠে যাই কিনা। সিঙ্গাপুরে যে যাচ্ছি শখ করে তো যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ কবে?'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। কাল তো পারব না, দেখি পরশু যেতে পারি কিনা। এর মধ্যে তুই বাসায় এসে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যা। তোর কি ব্যাংকে একাউন্ট আছে?'

'না।'

'আমি ম্যানেজারকে বলে দেব - তোকে যেন ক্যাশ দেয়। ক্যাশ দেয়ার সিস্টেম

অবশ্যি আমাদের নেই। আমাদের সব টানজেকশান হয় চেকে। চেকে টানজেকশনের বড় সুবিধা হল – একটা ডকুমেন্ট থাকে। যাই হোক, তোর জন্যে স্পেশাল ব্যবস্থা হবে। হিমু লোকটাকে তুই ডিটেকটিভের মত ষ্টাডি করবি । আচ্ছা লোকটা ম্যারিড নাকি?'

'খালা, আমি এখনো জানি না। আপনি সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসুন।'

'ইতিমধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়ে রাখব।'

ফাতেমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, 'তুই আমাকে খুশী করেছিস — দেখিস আমিও তোকে খুশী করিয়ে দেব।'

'তামান্নাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে?'

'দিতেও পারি।'

খালার গলার স্বরে রহস্যের ঝিলিক।

৭

কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া গেল।

একশ টাকার দুটা বান্ডেল। সবই চকচকা নোট। নাকের কাছে ধরলে নেশার মত লাগে। সারাক্ষণ ধরে রাখতে ইচ্ছা করে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'টাকাটা গুনে নিন।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে গুনতে বসলাম। নতুন টাকা গুনতেও আনন্দ। কিছুক্ষণ গোনার পর হিসেবে গন্ডগোল হয়ে একান্ন না সাতান্ন সমস্যা দেখা দেয়। আবার নতুন করে গোনা। অসুবিধা কিছু নেই। আমার দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে না। এসি ঘরের হিম হিম হাওয়ায় টাকা গোনা যেতে পারে।

ম্যানেজার সাহেব বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাকে বিরক্ত করতেও ভাল লাগছে। মানুষকে বিরক্ত করা যত সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। বরং বেশ কঠিন। নিউরোলজীর এক অধ্যাপক বলেছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে সে বিরক্ত হতে খুবই অপছন্দ করে। সে আনন্দিত হতে পছন্দ করে, রাগতে পছন্দ করে, কিন্তু বিরক্ত হতে পছন্দ করে না। কোন মস্তিষ্ককে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকলে হয় সে বিরক্তিটাকে রাগে নিয়ে যাবে, কিংবা এমন কোন ব্যবস্থা করবে যাতে বিরক্তিকর ঘটনাটায় সে মজা পয়।

'হিমু সাহেব টাকা গোনা এখনো হল না।'

'জ্বি না। পঞ্চাশ ক্রশ করার পরই বেড়াছেড়া হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার কাছে দিন গুনেদি। আপনি বরং চা খান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে কি করবেন?'

'ভাবছি একটা পাথর কিনব।'

'ভাগ্য বদলানোর পাথর ব্লু স্যাফায়ার?'

'জ্বি না, সাধারণ পাথর। ভেঙ্গে রেল লাইনে দেয়, কিংবা বাড়ির ফাউন্ডেশনে ব্যবহার করে সেই পাথর।'

'পাথরটার দাম কুড়ি হাজার টাকা?'

'কততে বিক্রি করবে তা তো জানি না। কুড়ি হাজার হচ্ছে আমার লাষ্ট অফার। দিলে দেবে, না দিলে নাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা গোনা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'পাথরটার বিশেষত্ব কি?'

'বিশেষত্ব কিছুই নেই। পাথরের আবার বিশেষত্ব কি?'

'শখের জন্যে কিনছি। কিনতে পারব কিনা তাও জানি না। যার পাথর সেও শখ করে রাখছে।'

'পাথরের মালিক কে?'

'মালিকের নাম মেছকান্দর মিয়া। সে পেশায় একজন ভিক্ষুক।'

'আজই কিনবেন?'

'জ্বি।'

'যদি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

'কুড়ি হাজার টাকার পাথর দেখার লোভ হচ্ছে।'

'চলুন যাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা গুনছেন। তারও টাকা গোনায় সমস্যা হচ্ছে। খুব সম্ভব তার মাথায় পাথর চেপে বসেছে।

ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়া আগের জায়গাতেই আছে। পাথরটাও ঠিক আগের জায়গায়। আমাদের দেখে এক চোখ মিট মিট করে তাকালো। আমি বললাম, 'মেছকান্দর মিয়া আমাকে চিনতে পারছেন?'

মেছকান্দর মিয়া জবাব দিল না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আমি বললাম, 'মনে নেই ঐ যে আপনার পাথর ধাক্কা খেয়ে আংগুলে ব্যথা পেলাম।'

'জ্বে মনে আছে।'

'আজ ক'জন ব্যথা পেয়েছে?'

'তা দিয়া আফনের কি প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন কিছু নেই। কৌতুহল। তুমি বলবে না, তাই না?'

মেছকান্দর জবাব দিল না। সে এবং ম্যানেজার দুজনই এখন তাকিয়ে আছে পাথরের দিকে। আমি বললাম, 'মেছকান্দর মিয়া তুমি কি এই পাথরটা আমার কাছে বিক্রি করবে? কি দাম চাও বল।'

মেছকান্দর আবার আমার দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিতে ভয় এবং সন্দেহ। আমি আবার বললাম, 'বল কত চাও?'

মেছকান্দর বিড় বিড় করে বলল, 'পাথর বেচুম না।'

আমি বললাম, 'সাধারণ একটা পাথর। এটা তো কোহিনুর না। আমি ভাল দাম দেব।'

'জ্বি না সাব। পাথর বেচুম না। যত দামই দেন বেচুম না।'

'আমি নগদ টাকা সাথে করে নিয়ে এসেছি। একবার হ্যাঁ বল, আমি পাথর নিয়ে বাড়ি চলে যাই।'

'এক কথা ক'বার কমু। আমি পাথর বেচুম না।'

'কেন বেচবে না।'

'আমি পাথরের দোকানদারী করি না। আমি করি ভিক্ষা।'

'শোন মেছকান্দর। কুড়ি হাজার টাকা আমার শেষ অফার। কুড়ি হাজার টাকা থেকে এক পয়সা বেশি দিতে পারব না। তুমি বিবেচনা করে দেখ। ধর, সিগারেটটা ধরাও। সিগারেট টান দিয়ে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা কর।'

মেছকান্দর সিগারেট নিল। আমিই দেয়াশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। মেছকান্দর এগিয়ে গেল পাথরের দিকে। আমি বললাম, 'কি মেছকান্দর বেচবে?'

'জ্বে না।'

আমি কিন্তু চলে যাব, 'পেছন থেকে ডাকলে লাভ হবে না।'

মেছকান্দর চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'লাখ টাকা দিলেও পাথর বেচুম না।'

আমি ম্যানেজারকে নিয়ে হাঁটা দিলাম। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকালাম— মেছকান্দর পাথরের উপর বসে আছে। সিগারেট টানছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'ঐ গাধা বোধহয় কুড়ি হাজার টাকা মানে কত টাকা সেটাই জানে না।'

আমি বললাম, 'হতে পারে। একশ পর্যন্ত সে হয়তো গুনতেই জানে না। কুড়িতে আটকে আছে। তার কাছে একশ হল পাঁচ কুড়ি।'

'কিংবা এও হতে পারে গাধাটা ভেবেচে এটা অনেক দামী জিনিস। ফাঁকি দিয়ে তার কাছ থেকে সস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'এটাও হতে পারে।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'আপনি কেন কুড়ি হাজার টাকায় এই পাথর কিনতে চাচ্ছেন?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'এটা সাধারণ পাথর না। খুবই রহস্যময় পাথর।'

'কি রহস্য?'

'সেটা তো ম্যানেজার সাহেব বলা যাবে না। গুহ্য বিদ্যা বা বাতেনী জ্ঞান সর্ব সাধারণের জন্যে।'

'ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়া কি পাথরের রহস্যের কথা জানে?'

'জানতেও পারে। না জানলে সে তার ডেরায় ফেরার সময় এমন একটা ভারী পাথর বয়ে নিয়ে যায় কেন? ম্যানেজার সাহেব সিগারেট খাবেন?'

'জ্বি না, আমি ধূমপান করি না।'

'আপনাকে খুবই বিচলিত মনে হচ্ছে। শরীরে কিছু কাফিন ঢুকলে নার্ভ শান্ত হতে পারে।'

ম্যানেজার সাহেব সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরালেন। প্রথম টান দিচ্ছেন। তার নার্ভ শান্ত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠেছে। চোখ-মুখ শক্ত।

৮

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশও হতে পারে, আবার পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশও হতে পারে। রোদে জ্বলে যাওয়া চেহারা। মনে হয় দীর্ঘদিন ক্যানভাসারের চাকরি করেছেন— রোদে রোদে ঘুরেছেন। ক্যানভাসারদের মতই ধূর্ত চোখ। সারাক্ষণই ইদুরের মত

চোখের মণি নড়ছে। চোখই বলে দিচ্ছে, মানুষটা অস্থির প্রকৃতির। গলার স্বর ভারী। আমার ধারণা, যে স্বরে উনি এখন কথা বলছেন সেই স্বরটা আসল না, নকল। বিশেষ বিশেষ কথা বলার সময় ভদ্রলোক সম্ভবত গলার স্বর বদলান।

তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। গলার ভারী স্বর আরো ভারী করলেন। প্রায় ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, 'বুঝলেন ভাই সাহেব, আপনাকে একজন জন্মান্ধ জোগাড় করতে হবে। তাকে দিয়ে লোকালয়ের বাইরে অমাবশ্যার রাত্রিতে একটা লাউগাছের বিচি পুততে হবে। বিচি পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে কুমারী কন্যার ঋতুকালীন নষ্ট রক্ত। সেই কুমারী কন্যাকেও হতে হবে জন্মান্ধ!'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আপনার দেখি জন্মান্ধেরই কারবার।'

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, 'আমাকে কথা শেষ করতে দিন। মাঝখানে কথা বললে হবে কিভাবে? আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি কথা শেষ করি তারপর বলবেন।'

আমি আবারো হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'জ্বি আচ্ছা।'

আমার এবারের হাইটা ছিল নকল। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা যে তাঁর জন্মান্ধ বিষয়ক গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে না। ভদ্রলোক এই সহজ সত্য ধরতে পারছেন না। তিনি গল্প শুনিয়ে ছাড়বেন।

'এরপর আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রতিদিন খালি পায়ে স্রোতস্বিনী নদী থেকে মাটির পাত্রে এক পাত্র করে পানি আনতে হবে। পানি আনার কাজটা করতে হবে মধ্যরাতে।'

'ও আচ্ছা।'

'পানি আনতে হবে উলঙ্গ অবস্থায়। তখন গায়ে কোন কাপড় থাকলে চলবে না। সেই পানি দিয়ে প্রতি রাতেই লাউ গাছের বীজ যে জায়গায় পুতেছেন, সেই জায়গাটা ভিজিয়ে দিতে হবে। যতদিন না বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম না হচ্ছে।'

আমি আগ্রহশূন্য গলায় বললাম, 'ইন্টারেষ্টিং।'

ভদ্রলোক আরো খানিকটা ঝুঁকে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের গলা অন্য মানুষদের গলার চেয়ে লম্বা। তাঁর শরীরটা আগের জায়গাতেই আছে কিন্তু গলা লম্বার কারণে মাথাটা এগিয়ে এসেছে।

'অঙ্কুরোদগমের পর থেকে লাউগাছে প্রথম ফুল আসা পর্যন্ত আপনাকে ঠিক সন্ধ্যাবেলা হযরত মূসা আলায়হেস সালামের মায়ের সতেরোটা নাম পড়ে গাছে ফুঁ দিতে হবে।'

'সতেরোটা নাম আমি পাব কোথায়?'

'আপনাকে আমি লিখে দিচ্ছি। এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।'

'থাক, দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন?'

'কাগজ আমি রাখব কোথায়? আমার পাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, 'আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঘন ঘন হাই তুলছেন। অবশ্যি বিশ্বাস করা কঠিন।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'বিশ্বাস করছি। প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করছি। কারণ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—তর্কে বহুদূর।'

'মন্ত্রতন্ত্রের কথা আমি কাউকে বলি না। মানুষের মনে ঢুকে গেছে অবিশ্বাস।

অবিশ্বাসীদের এইসব বলে লাভ নেই। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলে বলছি। তাছাড়া আমি বেশিদিন বাঁচব না। সারাজীবনের সঞ্চয় কিছু মন্ত্র-তন্ত্র কাউকে দিয়ে যেতে চাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বি না।'

'খান, আরেক কাপ খান। চায়ের সঙ্গে কোন নাশতা দেব? মুড়ি আছে? মুড়ি মেখে দিতে বলি?'

'বলুন।'

ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমি বসে আছি অন্ধকারে। আমার সামনে এতক্ষণ একটা হারিকেন ছিল। ভদ্রলোক ভেতরে ঢোকার সময় হারিকেন নিয়ে গেছেন। ঢাকায় বিখ্যাত লোড শেডিং শুরু হয়েছে। দুঘন্টার আগে ইলেকট্রিসিটি আসবে না। এখন শীতকাল গরম লাগার কথা না। কিন্তু গরমে শরীর ঘেমে গেছে। ইলেকট্রিসিটি এলেও এই গরমের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। কারণ বসার ঘরে ফ্যান নেই। ভদ্রলোক গল্প করার সময় প্রবলবেগে হাওয়া করছিলেন। তিনি ভেতরে ঢোকার সময় হারিকেনের সঙ্গে হাতপাখাও নিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোকের আচার-আচরণের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে— ভেতরের বাড়িতে ঢুকলে সহজে বের হতে চান না। মুড়ির কথা বলে ভেতরে ঢুকেছেন, আর বের হচ্ছেন না। কখন বের হবেন কে জানে।

ইনিই আমাদের মুহাম্মদ ইয়াকুব। বাবা—সুলায়মান, গ্রাম— নিশাখালি, জেলা— নেত্রকোনা। ভদ্রলোক কবিরাজ হলেও কথাবার্তায় মনে হচ্ছে মন্ত্র-তন্ত্র যাদু-টোনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে খানিকটা পছন্দ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। আজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ এর মধ্যেই তিনি আমাকে অদৃশ্য হবার মন্ত্র শেখাচ্ছেন। অবশ্য এটা তাঁর কোন একটা কৌশলও হতে পাবে। ধূর্ত মানুষদের নানান ধরনের কৌশল থাকে। মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বলে আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা করছেন। আমি অভিভূত হচ্ছি না। এ ব্যাপারটাও সম্ভবত ভদ্রলোকের মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইয়াকুব সাহেব এক হাতে মুড়ির বাটি এবং হারিকেন অন্য হাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলেন।

'ইলেকট্রিসিটি আজ বোধহয় আসবেই না। নিন, মুড়ি খান। খেয়ে অবশ্যি আরাম পাবেন না— মুড়ি ন্যাতনাতা হয়ে গেছে। টিন ভাল করে বন্ধ করেনি। বাতাস ঢুকে মুড়ি মরা মরা হয়ে গেছে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'মরা মুড়ি জীবিত করার কোন মন্ত্র নেই? মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিলেন, মুড়ি তাজা হয়ে গেল।'

ভদ্রলোক দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুড়ি চাবাতে চাবাতে বললাম, 'ঠাট্টা করছিলাম।'

ইয়াকুব সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'মন্ত্র বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু মন্ত্র নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। মন্ত্র হল বিচিত্র ধ্বনির কিছু শব্দ। শব্দ তুচ্ছ করার বিষয় নয়। আদিতে কিছুই ছিল না। আদিতে ছিল মহাশূন্য। তারপর একটা শব্দ হল — 'বিগ বেং।' তৈরি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কাজেই সৃষ্টির মূলে আছে শদ।'

আমি বললাম, 'আপনার কাপড়ের ব্যাগে কি?'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাবার জন্যে এনেছিলাম – মানুষের একটা কঙ্কাল, নরমুণ্ড।'

'দেখন।'

'আপনি অবিশ্বাসী টাইপ মানুষ। আপনাকে দেখানো না-দেখানো সমান। সত্যিকার কোন জহুরীর হাতে পড়লে সে লাফিয়ে উঠত।'

'বিশেষ ধরনের নরমুণ্ডু?'

'খুব লক্ষ্য করে দেখুন, আপনার কাছে বিশেষ ধরনের মনে হয়, নাকি সাধারণ মনে হয়।'

আমি বিশেষ কিছু দেখলাম না। সাইজে ছোট একটা নরমুণ্ডু। স্কাল সাদা থাকে। এটা একটু কালচে হয়ে আছে– মনে হয় অনেকদিনের পুরানো।

'বিশেষ কিছু বুঝতে পারছেন না?'

'জ্বি না।'

'অক্ষিকোটর দু'টা থাকে— এর যে তিনটা সেটা বুঝছেন?'

আমি দেখলাম কপালেও একটা ফুটো। সেই ফুটাকে অক্ষিকেটের মনে করার কারণ নেই। হয়ত অন্য কোন কারণে ফুটো হয়েছে। কপালে গুলি খেলে কপাল ফুটো হবার কথা।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন জীবিত অবস্থায় এই মানুষটার তিনটা চোখ ছিল?'

ইয়াকুব সাহেব নরমুণ্ডু থলিতে ভরতে ভরতে বললেন, 'সব মানুষেরই তিনটা চোখ থাকে। দুটা দৃশ্যমান, একটা অদৃশ্য।'

'ও আচ্ছা।'

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। আমি বললাম, 'ইয়াকুব সাহেব, আমি উঠি।'

ইয়াকুব সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'একদিন এসে আমার সাথে চারটা খানা খান। দরিদ্র মানুষ বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না। মটরশুটি দিয়ে শিং মাছের ঝোল আর ভাত। কবে খাবেন বলুন।'

'আগামী সপ্তাহে আসি?'

'জ্বি আচ্ছা, আসুন। আপনার মোটা বন্ধুকেও নিয়ে আসবেন। উনার জন্যে একটা অষুধ বানিয়ে রাখব। খেলে ক্ষুধা কমে যাবে। অতি সুখাদ্যেও অরুচি হবে।'

'টেবলেট জাতীয় কিছু?'

'জ্বি। ফার্মেসীর ট্যাবলেট না— বড়ি জাতীয়। সকাল-বিকাল দু বেলা সেব্য।'

'বড়ি খেলে ক্ষিধে লাগবে না!'

'জ্বি না।'

'এই ক্ষুধা মুক্তি ট্যাবলেট তো সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্যে দরকার। তৈরি আছে? থাকলে দুটা দিন নিয়ে যাই— ট্রাই করে দেখি।'

'জ্বি না, তৈরি নেই।'

'তৈরি করে রাখুন। টেবলেটটির নাম কি?'

'কোন নাম দেইনি।'

'নাম দিন ইয়াকুবের ক্ষুধামুক্তি বড়ি।'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'

আমি জবাব না দিয়ে হাঁটা ধরলাম। ফাতেমা খালা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন কিনা

খবর নেয়া দরকার।

খালা বাড়িতে নেই। তিনি তাঁর আর্কিটেক্টের কাছে গিয়েছেন। বাড়িতে যে সোয়ানা বসবে তার ডিজাইন নিয়ে কথা বলবেন। পুরানো ডিজাইন তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ফলস সিলিং অনেক উচুতে হয়েছে। আরো নিচু হওয়া দরকার। সোয়ানার ঘরে দমবন্ধ দমবন্ধ ভাবটা আসল। তামান্না আমাকে বসতে দিল। তার আচার-আচরণ স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে আজই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমি চাইবার আগেই লম্বা গ্লাস ভর্তি সবুজ রঙের কি এক সরবত এনে দিল। সরবতের গ্লাসে বরফের কণা ভাসছে। আমি চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'জামান ভাল আছে?'

তামান্না বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামান কে?'

'আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পড়ে যে ব্যথা পেয়েছিল।'

'ও আচ্ছা। হ্যাঁ, জামান ভাল আছে। তার রিকশা থেকে পড়ে ব্যথা পাওয়ার কথা আপনাকে কে বলেছে?'

'আপনার ম্যাডাম বলেছেন।'

'যে আপনাকে যা বলে তাই আপনি মনের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে দেন?'

'সবাই তাই করে।'

'সবাই তাই করে না। আপনি অন্য সবার মত না।'

'আমি আলাদা?'

'হ্যাঁ আলাদা, তবে ভাল অর্থে আলাদা না, মন্দ অর্থে আলাদা। আপনার সমস্ত জীবন এবং কর্মকান্ড জুড়ে আছে ভান। মিথ্যা রহস্যের ধোঁয়া সৃষ্টি করে আপনি তার মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন। কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে আপনি পাথর কিনতে গিয়েছিলেন। যাননি?'

'হ্যাঁ।'

'যার পাথর সে বিক্রি করল না, কারণ আপনি এমনই এক রহস্যের কুয়াশা তার সামনে তৈরি করলেন যে সে ভাবল না জানি এটা কি পাথর। কাজটা আপনি করলেন ম্যানেজার সাহেবের সামনে কারণ আপনি একই সঙ্গে তা ভড়কে দিতে চেয়েছেন— তাই না?'

'হ্যাঁ। উনি কি ভড়কেছেন?'

'যথেষ্ট ভড়কেছেন। গতকাল অনেকক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ঝুলিঝুলি করেছেন পাথরটা দেখে আসার জন্যে।'

'আপনি কি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পাথরটা হাত দিয়ে ছুয়েছেন?'

'হাত দিয়ে ছোঁব কেন?'

'হাত দিয়ে ছুঁলেই একটা ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার হত। ইলেকট্রিক শকের মত একটা শক খেতেন। নেকষ্ট টাইম যখন যাবেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবেন।'

তামান্না একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আরাম করে সরবত খাচ্ছি। সরবতে কেমন লজেন্স লজেন্স গন্ধ। অতিরিক্ত মিষ্টি। অতিরিক্ত মিষ্টিটা মনে হয় এই সরবতের জন্যে প্রয়োজন। মিষ্টি কম হলে ভাল লাগত না।

'হিমু সাহেব?'

'জ্বি।'

'পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে আমি চারশ ভল্টের শক খাব?'
'চারশ ভোল্টের শক খাবেন না— মৃদু ধাক্কার মত লাগবে।'
'আপনি আমাকে নিয়েও রহস্য তৈরি করবেন না। প্লীজ। সরবত খাচ্ছেন— খান। আমি খুব দুঃখকষ্টে মানুষ হয়েছি। যারা দুঃখকষ্টে মানুষ হয় তারা এত সহজে বিভ্রান্ত হয় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমি কখনো বোকা ছিলাম না।'
আমি সরবতের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'ফাতেমা খালার ফিরতে মনে হয় দেরি হবে। আমি উঠি?'
তামান্না কঠিন গলায় বলল, 'না আপনি উঠবেন না। ম্যাডাম আমাকে বলে গেছেন আপনি যদি আসেন আপনাকে যেন আটকে রাখা হয়। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসতে পারেন— বইটই পড়লে সময় কাটবে।'
আমি বললাম, 'আপনার ম্যাডাম নিশ্চয়ই আপনাকে বলেননি আমাকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে বসাতে। আমার ধারণা তিনি আপনাকে বলে গেছেন আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে। তাই না!'
'হ্যাঁ তাই। বেশ আপনি গল্প করুন, আমি শুনছি।'
'রূপকথা শুনবেন?'
'যা শুনাবেন তাই শুনব।'
আমি বেশ কায়দা করে গল্প শুরু করলাম। যে কোন কারণেই হোক তামান্না মেয়েটি আমার উপর অসম্ভব বিরক্ত। বিরক্তিটা এই পর্যায়ে যে সে আমার দিকে তাকাতেও পারছে না। সে গল্প শুনছে খুবই অনাগ্রহ এবং অনিচ্ছায়।
তিন জেলে গিয়েছে মাছ মারতে। সাগরে জাল ফেলেছে। জালে ধরা পড়ল এক মৎস্যকন্যা, মারমেইড। মৎস্য কন্যা বলল, 'তোমাদের আল্লাহর দোহাই লাগে তোমরা আমাকে মের না। আমাকে সাগরে ফেলে দাও, তার বদলে তোমাদের প্রত্যেকের একটা করে ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। তবে আমি তো আর আলাদীনের জ্বিনের মত ক্ষমতাবান না— আমার ক্ষমতা সীমিত। আমি টাকা পয়সা ধনদৌলত দিতে পারব না।'
প্রথম জেলে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমার বুদ্ধি বাড়িয়ে দাও। এখন যে বুদ্ধি আমার আছে তা ডাবল করে দাও।'
মৎস্য কন্যা বলল, 'ডাবল করা হল।'
প্রথম জেলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝল তার বুদ্ধি বেড়েছে।
দ্বিতীয় জেলে বলল, 'একজন যখন বুদ্ধি নিয়েছে তখন আমিও বুদ্ধিই নেব। তবে ডাবল না আমার বুদ্ধি তিনগুণ করে দাও।' মৎস্য কন্যা বলল, 'তিনগুণ করা হল।'
তৃতীয় জেলে বলল, 'আমিও বুদ্ধই চাই তবে চাই দশগুণ।'
মৎস্যকন্যা বলল, 'খবর্দার, এইটি করবে না। দশগুণ বুদ্ধি তোমাকে দেয়া হলে তুমি বিপদে পড়বে।'
'বিপদে পড়া না পড়া আমার ব্যাপার। তোমার কাছে দশগুণ বুদ্ধি চেয়েছি, তুমি বুদ্ধি দাও।'
'এখনো সময় আছে ভেবে দেখ।'
'ভাবাভাবির কিছু নাই।'
মৎস্যকন্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা যাও, তোমাকে দশগুণ বুদ্ধি দেয়া হল।' আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জেলে একটা মেয়ে হয়ে গেল।

তামান্না বলল, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে দশগুণ বেশি?'

'হ্যাঁ।'

'এই গল্পটা কি আপনি আমাকে খুশি করার জন্যে বললেন?'

'আপনাকে খুশি করার একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা আমার ছিল তবে গল্পটা আমি বিশ্বাস করি।'

তামান্না নড়ে চড়ে বসল। এবং আমাকে হঠাৎ খুবই বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'হিমু সাহেব, শুনুন। ম্যাডাম চলে আসার আগে আপনাকে খুব জরুরী কিছু কথা বলি, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। আপনার বুদ্ধিও মেয়েদের মতই দশগুণ বেশি। তবে এই বুদ্ধিতে কাজ হবে না। আমি আপনাকে পছন্দ করি না। আমি যাদেরকে পছন্দ করি না তাদের সে ব্যাপারটা বুঝতে দেই না। বরং এমন ভাব করি যাতে তারা বিভ্রান্ত হন। তারা মনে করেন আমি তাদের খুবই পছন্দ করি। আপনার বেলায় ব্যতিক্রম করলাম। আমি যে আপনাকে অপছন্দ করি সেটা জানিয়ে দিলাম।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে অস্পষ্টতা রাখলাম না।'

'আপনি আপনার ম্যাডামকে খুবই অপছন্দ করেন তাই না?'

'হ্যাঁ উনাকে অপছন্দ করি। বোকা মানুষ আমার পছন্দ না। আপনার খালা মেয়ে হয়েও বোকা। মৎস্যকন্যার গল্প আপনার খালার ক্ষেত্রে কাজ করছে না। যে কারণে আমার অপছন্দের ব্যাপারটা উনাকে জানতে দেইনি। কারণ উনার সাহায্য আমার দরকার। আমি বিশাল সংসার নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি।'

তামান্না বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে অদৃশ্য একটা দাবার সেট। দাবা খেলা হচ্ছে। আমি তাকে কিস্তি দিয়ে দিলাম। কিস্তি কাটান দিয়ে সে উল্টো কিস্তি দিয়েছে। ঘোড়ার কিস্তি। এক সঙ্গে রাজা এবং মন্ত্রী ধরা পড়েছে। রাজা বাঁচাতে হলে আমাকে মন্ত্রী বিসর্জন দিতে হবে। রাজা না বাঁচিয়ে মন্ত্রী বাঁচালে কেমন হয়। খেলা শেষ হয়ে যায়। তাতে কি, মন্ত্রীর মত শক্তিশালী ঘুটি তো বেঁচে রইল। আমি রাজা বিসর্জন দেবার ব্যবস্থা করলাম। কোমল গলায় বললাম, তামান্না, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি। আপনার মত পছন্দ এই জীবনে আরেকটি মেয়েকে করেছিলাম তার নাম রূপা।'

তামান্না আমার কথায় মোটেই চমকাল না। সে কঠিন মুখে বলল, 'প্লীজ আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি এই দীর্ঘ জীবনে কাউকে পছন্দ করেননি। ভবিষ্যতেও কাউকে পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে কিছু কিছু খুব দুর্ভাগা মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তারা কাউকে ভালবাসতে পারে না। আপনি সেই সব দুর্ভাগা মানুষদের একজন।'

আমি বললাম, 'ও আচ্ছা।'

'আপনি মহাপুরুষ সেজে পথে পথে হাঁটেন—সেটাই আপনার জন্যে ভাল।

আমি আবারো বললাম, 'ও আচ্ছা।'

তামান্না দীর্ঘ কোন বক্তৃতার জন্যে তৈরি হচ্ছিল — নিজেকে সামলে নিল কারণ ফাতেমা খালা এসে পড়েছেন। তাঁকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কেমন আছিস হিমু?'

‘ভাল।’

‘আরো আগে চলে আসতাম, বুলবুল পাথরটার কথা বলল। ভাবলাম ঠিক আছে দেখেই যাই। পাথর দেখে এসেছি।’

‘হাত দিয়ে ছুঁয়েছ?’

‘হু। হিমু তুই বললে বিশ্বাস করবি না— হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র ইলেকট্রিক শকের মত শক খেলাম। মনে হল পাথরটা জীবন্ত। আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল।’

আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। তামান্না আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কিশোরীদের মত ছটফটে গলায় বলল, ‘ম্যাডাম, আপনি একা গিয়ে দেখে এলেন আমাকে নিলেন না। আমিও পাথরটা ছুঁয়ে দেখতাম।’

ফাতেমা খালা বললেন, ‘পাথর গিয়ে দেখার দরকার নেই। পাথরটা আমি কিনব। যত টাকা লাগে কিনব। গাড়িতে আসতে আসতে মন স্থির করেছি। হিমু, তোর উপর দায়িত্ব হচ্ছে পাথরটা কেনার ব্যবস্থা করা। তোকে আমি তার জন্যে আলাদা কমিশন দেব। কেনার ব্যবস্থা করতে পারবি না?’

‘পারব।’

‘বুলবুল বলছিল তুই নাকি এই পাথরটার বিষয়ে জানিস। পাথরটার ক্ষমতা কি বল দেখি।’

‘খালা এটা হল ইচ্ছাপূরণ পাথর। পাথরে হাত দিয়ে যা চাইবে তাই পাবে।’

‘সত্যি বলছিস, না ঠাট্টা করছিস।’

‘সত্যি বলছি।’

‘তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুই ঠাট্টা করছিস। ঠাট্টা করলেও কিছু যায় আসে না —পাথরটা আমার দরকার। তুই এক কাজ কর এক্ষুনি যা পাথরটা নিয়ে আয়। পাজেরো গাড়িটা নিয়ে যা— মালিক শুদ্ধ নিয়ে আসবি। পাথরের দাম যা ঠিক হয় আমি দিয়ে দেব।’

‘ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি এক কাজ করি, গাড়ি করে না হয় ইয়াকুব সাহেবকে নিয়ে আসি। পাথর আরেকদিন আনব।’

‘ইয়াকুব পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথর আগে নিয়ে আয়। পাথরের সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে কিনা সেটা আজ রাতেই টেষ্ট করব।’

আমি আড়চোখে তামান্নার দিকে তাকালাম। তার ঠোঁটের কোণায় মোনালিসা ষ্টাইল হাসি।

খালা তামান্নাকে বললেন, ‘তামান্না তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও। আমি হিমুকে কিছু পার্সোনাল কথা বলব।’

তামান্না চলে গেল। খালা গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, ‘মেয়েটাকে ইচ্ছা করে রেখে গিয়েছিলাম যাতে দু জনের মধ্যে পরিচয়টা গাঢ় হয়। মেয়েটাকে কেমন লাগছে?’

‘খুব ভাল।’

‘কি রকম সরল মেয়ে দেখেছিস? জগতের কোন জটিলতা এই মেয়ে ধরতে পারে না। আর আমাকে যে কি পছন্দ করে। আমার নিজের কোন মেয়ে থাকলে সেও আমাকে এত পছন্দ করত না। এই যে আমি তাকে ছাড়া পাথর দেখে এসেছি তার জন্যে সে কেমন মন খারাপ করে দেখেছিস? আর একটু হলে কেঁদে ফেলত।

তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘চোখ ছল ছল করছিল কিনা তুই বল।’

‘ছল ছল মানে আরেকটু হলেই টপটপান্তি পানি পড়া শুরু হত।’

‘আমি যদি এখন তাকে বলি, তামান্না আমি চাই তুমি হিমুকে বিয়ে কর সে কোনদিকে তাকাবে না, তুই যে একটা প্রথম শ্রেণীর ভ্যাগাবন্ড, চাকরি বাকরি নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াস এইসব নিয়েও ভাববে না। চোখ বন্ধ করে বিয়ে করবে।’

‘তাহলে বলে ফেল। ফেলছ না কেন? ধর তক্তা মার পেরেক ঝামেলা শেষ করে দাও।’

‘আমি বলব না। আমি চাই মেয়েটা যেন নিজ থেকে তোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে নিজেই যদি তোকে পছন্দ করে ফেলে তাহলে আর আমাকে পরে দোষ দিতে পারবে না। আমি অবশ্যি তামান্নার ব্রেইন ওয়াস করে ফেলেছি— তোর সবক্ষেত্রে তোর সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলি।’

‘খালা মেনি থ্যাংকস।’

‘তুই একটা কাজ করবি, মেয়েটাকে নিয়ে ভাল কোন রেষ্টুরেন্টে খেতে যাবি। আমি খরচা দেব। মেয়েরা রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ করে।’

‘ভাল কোন রেষ্টুরেন্টে তো খালি পায়ে আমাকে ঢুকতেই দেবে না।’

‘গাধার মত কথা বলিস না তো, তোকে স্যান্ডেল, পাঞ্জাবী এইসব কিনে দিয়েছি না। ফিটফাট হয়ে যাবি। আরেকটা কথা, রেষ্টুরেন্টের বয় বাবুর্চির সঙ্গে রসিকতা করবি না। লোয়ার লেভেলের লোকজনদের সঙ্গে রসিকতা মেয়েরা একদম পছন্দ করে না।’

‘কোথায় পড়েছ রিডার্স ডাইজেষ্টে?’

‘মনে নেই কোথায় পড়েছি। তুই এক কাজ কর – আগামীকালই যা। গুলশানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তন্দুরী খুব ভাল করে। আমার কাছে ওদের কার্ড আছে, তোকে দিচ্ছি। একটু বোস কার্ডটা নিয়ে আসি।’

‘কার্ডটা কাল নেই।’

‘কাল ভুলে যাব। আজই নিয়ে যা।’

আমি তন্দুর হাউসের কার্ড এবং পাজেরো গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ভিক্ষুক মেছকান্দর সাহেবকে পাওয়া গেল না। পাজেরো ডাইভারকে বললাম, চলুন শহরে ঘুরে বেড়াই। ভিক্ষুক খুঁজে বেড়াই।’

পাজেরো ড্রাইভার খুবই বিরক্ত হল। পুরো দুঘন্টা শহরে ঘুরলাম। তারপর গেলাম শহরের বাইরে। সাভার স্মৃতিসৌধ দেখে এলাম। স্মৃতিসৌধ দেখা হবার পর ড্রাইভার বলল, ‘আর কোথায় যাবেন?’

আমি বললাম, ‘জাপান বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে চল। সেতুটা দেখা হয়নি।’

‘গাড়িতে তেল নেই। তেল নিতে হবে। ফুয়েলের কাটা মাঝামাঝি জায়গায় আছে, সে বলছে তেল নেই। আমি মধুর গলায় বললাম, তেল ছাড়াই গাড়ি চলবে। আমি সাধু মানুষ, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি। বিনা তেলেই গাড়ি চলবে। তুমি তেল বিষয়ক কোন চিন্তাই মাথায় স্থান দিও না।’

‘আপনি সত্যি সত্যি জাপান-বাংলাদেশ সেতু দেখতে যাবেন?’

‘অবশ্যই। পাকিস্তান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু থাকলে ভাল হত। সেটাও দেখে

আসতাম। নাই যখন জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুই সই।'
'চলেন।'
আমি চোখ বন্ধ করে গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে গাড়ির ডেসবোর্ডে দু'টা ফুঁ দিয়ে দিলাম। ড্রাইভারের নিশ্চয়ই পিত্তি জ্বলে গেল।
জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু দেখে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। গাড়ি যখন সঙ্গে আছে ব্যাঙাচির বাসা খুজে বের করলে কেমন হয়। ড্রাইভারকে বললাম বাসাবোর দিকে যেতে। জীপের ড্রাইভার ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার পাশের সীটে বসে না থেকে আমি যদি রাস্তায় থাকতাম সে নির্ঘাৎ আমাকে চাপা দিত।
'ড্রাইভার!'
'জ্বি।'
'তেল ছাড়া শুধু ফুঁয়ের উপর গাড়ি কেমন চলছে দেখেছ?'
'রিজার্ভে সামান্য তেল ছিল তাই দিয়ে চলেছে। আর চলবে না।'
'চলবে না মানে? আবারো ফুঁ দিয়ে দেব – আবারো চলবে, ময়মনসিংহ থেকে ঘুরে আসতে পারব।'
'ময়মনসিংহ যাবেন?'
'জ্বি।'
'ময়মনসিংহে কি?'
'কিছু না। আমার ফুঁয়ের জোর পরীক্ষা করা।'
ড্রাইভার গম্ভীর হয়ে গেল। আমি খুঁজে খুজে ব্যাঙাচির বাড়ি বের করলাম। ছোট একতলা বাড়ি। গাছপালায় ভর্তি। আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, 'বেশিক্ষণ না। আমি ঘন্টা খানিক থাকব — তারপর ময়মনসিংহ। তুমি অপেক্ষা কর। আমার সঙ্গে টাকা পয়সা থাকে না, কাজেই চা খাওয়ার টাকা দিতে পারছি না। পেট্রল বেচে চা নাশতা করতে পার। সমস্যা নেই।'
ব্যাঙাচি বাসায় ছিল না। তার স্ত্রী খুবই কৌতূহলী হয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, ভেতরে এসে বসুন। ও এসে পড়বে।'
ভদ্রমহিলা অসম্ভব রোগা। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে কিংবা চশমার কাচ জ্বল জ্বল করছে। প্রফেসর প্রফেসর চেহারা। বয়সকালে রূপবতী ছিলেন। সেই রূপ পুরোপুরি চলে যায়নি। ভদ্রমহিলার গলার স্বর খুবই কোমল। তিনি বললেন, আপনার নাম হিমু?'
'জ্বি।'
'ও আপনার কথা আমাকে বলেছে। আপনি নাকি ওর স্কুল জীবনের বন্ধু। ওর কোন বন্ধু-বান্ধব বাসায় আসে না। আপনাকে দেখে সেই জন্যেই খুব অবাক হয়েছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'
আমি বসলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, 'চা দিতে বলি? চায়ে চিনি দুধ খান তো?'
'জ্বি খাই।'
ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকলেন। আমার জীবনে কোন বাড়িতে এত দ্রুত কাউকে চা দিতে দেখিনি।
ভদ্রমহিলা হাসি মুখে বললেন, 'আমার ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস। ফ্লাক্স ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখি। সেখান থেকেই আপনাকে দিলাম।'

‘থ্যাংক য়্যু।’

‘কিছু মনে করবেন না। আপনাকে শুধু চা দিতে হল। ঘরে কোন খাবার নেই। ইচ্ছা করেই খাবার রাখি না। খাবার যেখানেই থাকুক ও খুঁজে বের করে খেয়ে ফেলে।’

আমি কিছু বললাম না। চায়ে চুমুক দিলাম। ফ্লাস্কে রাখা চা কখনো খেতে ভাল হয় না। এই চাটা ভাল হয়েছে।

আপনার বন্ধুর খাই খাই স্বভাবের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে। আছে না।’

‘জ্বি আছে।’

‘ও সবকিছু খেতে পারে। একবার বড় গ্লাসে এক গ্লাস সোয়াবিন তেল নিয়ে লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। ও হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণ কে তা জানেন?’

‘জ্বি না।’

‘কুম্ভকর্ণ হল রাবণের মেঝো ভাই। তার মা'র নাম কৈকেয়ী। কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কখনো মিটতো না। এমন জিনিস নেই যে সে খেত না। সাধু সন্ন্যাসী, ঋষি সবই খেয়ে ফেলতো।’

‘ও আচ্ছা।’

‘তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ব্রহ্মা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ছয় মাস ঘুমাত। তারপর একদিন জাগত। আবার ছ’মাসের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ত। এই জন্যেই তার নাম কুম্ভকর্ণ। আপনার বন্ধুকে যদি এইভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত আমি বেঁচে যেতাম।’

ভদ্রমহিলা কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসে পড়লেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। দরজার দিকে তাকালেন। স্বামী এখনো ফিরছে না এটাই বোধ — হয় অস্থিরতার কারণ।

‘হিমু সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘ও এসে পড়বে। মিষ্টি পান আনতে গেছে। কাজের ছেলেটা গেছে ছুটিতে, বাধ্য হয়ে ওকেই পাঠাতে হয়েছে। এত দেরি কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ছে কিনা কে জানে।’

‘আমি কি আশপাশে খুঁজে আসব?’

‘দরকার নেই। আপনি কোথায় খুঁজবেন। তারপর বলুন কেমন আছেন?’

‘জ্বি ভাল আছি।’

‘আরেক কাপ চা খাবেন!’

‘জ্বি না।’

‘ওর রোগটা কিভাবে হয় সেটা কি আপনি জানেন।’

‘জ্বি না।’

‘আমার সঙ্গে বিয়ের পরপর সে জার্মানী চলে যায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। আমার জন্যে তখন তার খুব মন খারাপ থাকতো। কিছু ভাল লাগত না। শুধু যখন রেষ্টুরেন্টে খেতে যেত তখন আমার কথা ভুলতে পারত। আমাকে ভোলার জন্যে খাওয়া ধরেছে। সেই খাওয়াই কাল হয়েছে।’

‘ভালবাসার মনে ক্ষুধার যোগ আছে।’

‘প্রেমিক-প্রেমিকাকে সব সময় দেখবেন কিছু না কিছু খাচ্ছে। এই চটপটি, এই আইসক্রিম, এই বাদাম, এই ফুচকা।’

‘ও বলছিল আপনি নাকি তার চিকিৎসা করছেন। কি ধরনের চিকিৎসা বলুন তো?’

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বাঙাচি আমাকে তার চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত করেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমাকে সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলেনি।

ভদ্রমহিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কোন চিকিৎসায় ওর কিছু হবে না। চিকিৎসা কম করানো হয়নি। সাইকিয়াটিষ্ট দেখানো হয়েছে। ব্যাংকক নিয়ে পেট থেকে এক বালতি চর্বি বের করে ফেলা হয়েছে। অকুপাংচার করানো হয়েছে। একবার একজন বলল যারা সারাক্ষণ খাই খাই করে গাজা খেলে তাদের ক্ষুধা কমে। আমি নিজে গাঁজা কিনে সিগারেটে ভরে তাকে খাইয়েছি। কিছু হয়নি। মানুষটা একদিন খেতে খেতে মারা যাবে। কি কুৎসিত ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন তো।’

‘ঠিক হয়ে যাবে।’

‘কোনদিনও ঠিক হবে না। ওর যখন খুব ক্ষিধে পায় তখন ওর চোখের দিকে তাকাবেন। আপনার মনে হবে ও আপনাকে রান্না করে খেয়ে ফেলার কথা মনে মনে ভাবছে। আপনি কি দু’টা মিনিট বসবেন, আমি একটা জরুরী টেলিফোন করে আসি।’

‘আমি বসছি। আপনি টেলিফোন করে আসুন। কাজকর্ম সারুন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।’

আমি প্রায় এক ঘন্টার মত বসে রইলাম। ভদ্রমহিলা এক সময় বললেন, ‘ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি একটু খুঁজে দেখবেন? আশপাশের রেস্টুরেন্টগুলিতে গেলেই হবে। ও কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে।’

আশপাশের কোন রেস্টুরেন্টে ব্যাঙাচিকে পাওয়া গেল না। ব্যাঙাচি নেই— আমার পাজেরোও নেই। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ভেগেছে।

আমি হেঁটে হেঁটে মেসে ফিরলাম। ব্যাঙাচিকে যে পাইনি সেই খবরটাও তার স্ত্রীকে দিয়ে এলাম না। বেচারীর বিষন্ন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

৯

তামান্না গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছে, হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া। এত আদর করে অনেক দিন কেউ আমাকে ডাকেনি। এটা যে বাস্তব কিছু না, স্বপ্ন দৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম। গায়ে হাত দিয়ে তামান্না আমাকে ডাকবে না। এত আবেগ দিয়ে ভাইয়াও ডাকবে না। ভাইয়া সরাসরি উচ্চারণ করছে না – দুটা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করেছে। আবেগ মিশ্রিত চন্দ্রবিন্দু— হিমু ভাঁইয়াঁ। হিমু ভাঁইয়াঁ।

আমি এখন দুটা জিনিস করতে পারি, ঘুম না ভাঙ্গিয়ে স্বপ্নটাকে লম্বা করতে পারি। কিংবা জেগে উঠতে পারি। ঘুমের মধ্যেই দোটানায় পড়ে গেলাম। তামান্না ডেকে যেতে লাগল, হিমু ভাঁইয়াঁ। হিমু ভাঁইয়াঁ। গায়ে ধাক্কার পরিমাণও বাড়তে

লাগল। ঘুম ভাঙ্গল। বেলা অনেক হয়েছে, ঘরে রোদ ঢুকে গেছে। বিছানার কাছে মেসের ম্যানেজার সরফরাজ খাঁ দাঁড়িয়ে। চিকন গলায় তিনিই এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিলেন। তিনি ডাকছেন— হিমু ভাই। আমার মস্তিষ্ক ভাই ডাকটা বদলে ভাঁইয়াঁ করে ফেলছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ঘুম ভাঙ্গার পর পর মানুষ কিছু কান্ডকারখানা করে — আড়মোড়া ভাঙ্গে, হাই তোলে, চোখ ভলে এবং আবারো ঘুমের সুখ স্মৃতি কল্পনা করার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করে ফেলে। আমি তার কিছুই না করে মেস ম্যানেজারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'আমাদের সোনার বাংলা শ্মশান হতে কত বাকি?'

মেস ম্যানেজার শ্রেণীর মানুষ যাদের প্রধান কাজ দিনে আট ন ঘন্টা কাঠের চেয়ারে বসে থাকা তারা সাধারণত খুব রাজনীতি সচেতন হন। সোনার দেশ কেন শ্মশান হচ্ছে এই নিয়ে তারা খুব ভাবিত থাকেন। সরফরাজ খাঁ সাহেব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সোনার বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার চেয়ে বেশি চিন্তা শেখ হাসিনা কিংবা বেগম জিয়া কেউ করেন বলে মনে হয় না।

এক দুপুরে ঘামে ভিজে ক্লান্ত হয়ে মেসে ফিরেছি। দেখি চোখ-মুখ শক্ত করে সরফরাজ খাঁ সাহেব কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ এবং চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'হিমু সাহেব, সোনার বাংলা যে শ্মশান হয়ে গেল সেটা জানেন?'

আমি বললাম, 'পুরোটাই কি শ্মশান হয়ে গেছে না পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে?'

'পুরোটাই শ্মশান হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো হিন্দু ভাইদের জন্যে খুব সুবিধা হল। তারা যেখানে সেখানে মড়া পোড়াতে পারবে। মড়া নিয়ে এখন আর শ্মশান খুঁজতে হবে না। যে কোন জায়গায় মড়া চিৎ করে শুইয়ে হা করে মুখে আগুন দিয়ে দিলেই হল।'

সরফরাজ খাঁ আহত চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তগলায় বললেন, 'ঠিক আছে হিমু সাহেব ঘরে যান। আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যাওয়াটাই ভুল।'

আমি ভেবেছিলাম সোনার বাংলা শ্মশান হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনে আজও তিনি আহত চোখে তাকাবেন। তা করলেন না। মনে হয় আমার প্রশ্ন তার মাথায় ঢুকেনি। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ভীত গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'পুলিশ এসেছে। আমিও পুলিশ।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমাকে এ্যারেষ্ট করতে এসেছে?'

'সে রকমই মনে হচ্ছে। পুলিশের একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে মেসের সামনে। পুলিশরা কেউ জীপ থেকে নামেনি। শুধু ওসি সাহেব নেমেছেন। ভয়ংকর রাগী চেহারা।'

'উনি কোথায়?'

'স্যারকে আমার ঘরে বসেয়েছি। চা দিয়েছি। নিমক পরা আনিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন আনিয়ে দিয়েছি।'

'চা-সিগারেট খাচ্ছে?'

'এখন কথা বাড়াবেন না। পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিচে চলুন। আপনাকে নিয়ে খুবই টেনশনে থাকি হিমু সাহেব। সাতটা বাজেনি এর মধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত।

করেছেন কি আপনি?'

'মন্ত্রীর এক শালাবাবুকে মুখ ভেংচি দিয়েছিলাম। সেই মামলাটা ডিসমিস হয়ে গেছে জানতাম।'

সরফরাজ খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, 'এত লোক থাকতে মন্ত্রীর শালাকে মুখ ভেংচি দিলেন কেন? বাংলাদেশে কি ভেংচি দেয়ার লোকের অভাব আছে? তের কোটি মানুষ। পনেরো হাজার লোক বাদ দিয়ে বাকি বারো কোটি পঁচাশি লাখ লোককে ভেংচি দিতে পারেন।'

রমনা থানার ওসি সাহেব ম্যানেজারের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে বেনসনের প্যাকেট পড়ে আছে। প্যাকেট খোলা হয়নি। চায়ের কাপও চুমুক দেয়া। চায়ে সর পড়ে গেছে। ওসি সাহেব পুরনো অভ্যাস মত জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। ঘুষ পাওয়া যায় না এমন অঞ্চলে পোষ্টিং হয়ে গেছে— নিঝুম দ্বীপ টিপের দিকে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার কেমন আছেন?'

ওসি সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সরফরাজ খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

সরফরাজ খাঁ দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা খেলেন। মনে হল দরজা ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। ওসি সাহেব মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই ইডিয়ট কে?'

আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'উনি এই মেসের ম্যানেজার সরফরাজ আলি খাঁ। খুব উচ্চ বংশ এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশ নিয়ে উনি সর্বক্ষণ চিন্তা ভাবনা করছেন। গবেষণা করছেন। সোনার বাংলা কেন শাশান হচ্ছে আপনি যদি উনাকে জিজ্ঞেস করেন উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।'

'বাজে প্যাঁচাল পারবেন না। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি – বলে চলে যাব।'

'বলুন।'

'আপনাকে একটা রেপ কেসের কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'মিথ্যা আসামী দেয়ার কথা ছিল . . . .?'

'দিয়েছেন?'

'জ্বি না, আসল আসামী ধরেছি। ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছি।'

'আপনাকে এখনো নিঝুম দ্বীপে বদলি করেনি?'

'এত অল্প শাস্তি এরা আমাকে দেবে না। আমার জন্যে অনেক বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয় পাচ্ছি না।'

'আমার কাছে এসেছেন কি জন্যে খবরটা দেয়ার জন্য?'

'না। আমি এসেছি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। ঠিক করে বলুন তো আপনার কি কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?'

'না।'

'আপনি নিশ্চিত যে আপনার কোন ক্ষমতা নেই?'

'মোটামুটি নিশ্চিত।'

'আমার ধারণা আছে। ঘটনাটা বলি– আমি মিথ্যা আসামীকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। সারারাত জেগে মামলা সাজিয়েছি। ঘুমুতে গেছি ফজরের আজানের পরে। অনিয়ম করেছি তো, ঘুম আসছে না। ঝিমাচ্ছি। এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ তন্দ্রার মত এল। মনে মনে আপনাকে স্বপ্নে দেখলাম। আপনি আমাকে বললেন– ওসি সাহেব আপনাকে আমি এত স্নেহ করি আর এটা আপনি কি করলেন। নিরপরাধ কয়েকটা মানুষকে আপনি এমন এক কুৎসিত মামলায় জড়ালেন। আপনার জন্যে ভয়াবহ বিপদ কিন্তু অপেক্ষা করছে। দশ নম্বর মহা বিপদ সংকেত। এখনো সময় আছে।' তখন ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি ঘামে শরীর ভিজে গেছে।

ওসি সাহেব ঠান্ডা সর পড়া চায়ের কাপে নিজের ভুলে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। আমি বললাম, 'ওসি সাহেব, আপনার মত জাঁদরেল লোক স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্ত হন কি করে? এই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে ফ্রয়েড লাগে না। কুতুবুদ্দিন মিয়া টাইপ মানুষজনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আমি আপনাকে বলেছিলাম মিথ্যা মামলায় না যেতে। ঐ জিনিসটা আপনার মাথায় থেকে গেছে বলেই স্বপ্ন।'

'তা না।'

'তা না মানে?'

ওসি সাহেব আবার ঠাণ্ড চায়ের কাপে চুমুক দিলেন আবারো মুখ বিকৃত করলেন। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন, 'স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গার পর আপনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সেই ব্যাখ্যাটা আমার মাথায়ও এল। আমি স্বপ্নটা মোটেই পাত্তা দিলাম না। হাত-মুখ ধুলাম। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে রীনাকে বললাম, রীনা চা দাও। রীনা হল আমার স্ত্রী। আমি বরান্দায় বসে কাগজ পড়ছি রীনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এই শোন, আমি শেষ রাতে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তুমি চোরাবালিতে আটকা পড়েছ। একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছ। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছ কেউ শুনছে না। তখন একটা ছেলে ছুটে এল। তার গায়ে হলুদ রঙের পাঞ্জাবী। সে পাঞ্জাবী খুলে তোমার দিকে ধরেছে। তুমি পাঞ্জাবী ধরলে সে তোমাকে টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি কিছুতেই পাঞ্জাবী ধরতে পারছ না। যতই ধরতে চেষ্টা করছ ততই চোরাবালিতে ডেবে যাচ্ছ।'

'বুঝলেন হিমু সাহেব, রীনার কথা শুনে আমি সাত হাত পানির নিচে চলে গেলাম। কারণ আপনার কথা আমি আমার স্ত্রীকে কিছু বলিনি। স্বপ্নটা কি এখন আপনার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে?'

'না।'

'যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে। আমার স্ত্রী শুধু শুধু কেন স্বপ্নে দেখবে আমি চোরাবালিতে পড়েছি।'

'আপনি পুলিশ বিভাগে বিপজ্জনক চাকরি করেন। আপনার স্ত্রী আপনাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করেন কাজেই এ ধরনের স্বপ্ন দেখা খুবই স্বাভাবিক। আপনি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে আপনাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন।'

'আর হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা?'

'হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা ঠিক না। স্বপ্ন সব সময় শাদা-কালো হয়। স্বপ্নের আলো

হল রাতের আলো। চাঁদের আলোয় রঙ দেখা যায় না বলে স্বপ্ন শাদাকালো।'

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'হিমু সাহেব, এই কাগজটা আপনি রাখেন?'

'কি কাগজ?'

'এখানে আমার বাসার ঠিকানা লেখা আছে। আপনি চারটা ডাল-ভাত আমার এখানে খাবেন। আমি দেখতে চাই রীনা আপনাকে দেখে চিনতে পারে কিনা। স্বপ্নের হলুদ পাঞ্জাবী পরা মানুষ আর আপনি যে একই ব্যক্তি আমার ধারণারনা সেটা ধরে ফেলবে।'

'কবে আসতে বলছেন?'

'আজই আসুন। রাতে খান। আমি আপনাকে পাংগাশ মাছ খাওয়াব। পাংগাশ মাছ রীনা খুব ভাল রাঁধতে পারে।'

'পাংগাশ মাছ এর মধ্যে জোগাড় হবে?'

'তা হবে।'

'ওসি সাহেব আমি কি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারি? ভাল খাওয়া একা খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না, দলবল নিয়ে খেতে হয়।'

'ক'জন বন্ধু আসবে?'

'এই ধরুন চারজন। আমাকে নিয়ে পাঁচ। পাঁচ হল ম্যাজিক নাম্বার। এই জন্যেই পাঁচজন আসতে চাচ্ছি।'

'আসুন, পাঁচজনই আসুন। পাংগাশ মাছ ছাড়া আর কি মাছ খেতে চান?'

'গলদা চিংড়ি?'

'আর কিছু?'

'বড় কাতল মাছের মাথা জোগাড় করতে পারবেন?'

'আর কিছু না।'

'রাত আটটার দিকে চলে আসবেন।'

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কেমন যেন ইতস্তত করছেন। কিছু বলতে চান বলতে পারছেন না এমন ভাব। আমি বললাম, 'স্যার কিছু বলবেন?'

'না, কিছু বলব না। আপনারা আটটার দিকে চলে আসবেন। দেরি করবেন ন?'

'জ্বি আচ্ছা। স্যার আপনি সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাচ্ছেন।'

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ঢুকালেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে তিনিও অবিকল সরফরাজ আলি খাঁর মত কপালে ব্যথা পেলেন। সরফরাজ আলি খাঁ ব্যথা পেয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, ওসি সাহেব তা করলেন না। তিনি প্রচন্ড শব্দে দরজায় লাথি মারলেন। দরজার উপরের কজা সত্যি সত্যি খুলে গেল।

আমার চারজন বন্ধু নিয়ে ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমি ঠিক করে রেখেছি চারজন বন্ধু না, শুধু ব্যাঙাচিকে নিয়ে যাব। পাঁচজনের জন্যে রান্না করা থাকলে তার হয়ে যাবার কথা। তারপরও যদি শর্ট পরে রীনা ভাবী নিশ্চয়ই দশ বারোটা পরোটা চটচট ভেজে দিয়ে দেবে।

মহিলারা ক্ষুধার্ত মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পায় তবে সেই ক্ষুধার্ত মানুষকে হতদরিদ্র হলে চলবে না। ভিখিরী বারান্দায় খেতে বসে এক পর্যায়ে যদি ক্ষীণ গলায় বলে, আম্মাজী ভাত শেষ, আর চাইরটা ভাত দেন তাহলে গৃহিণী বলবেন, আর ভাত নাই।

তোমার জন্য লংগরখানা খোলা হয় নাই।

জোবেদ সাহেবের দোকানে গেলাম টেলিফোন করতে। ব্যাঙাচিকে দাওয়াতের কথা বলতে হবে। ফাতেমা খালাকেও জানাতে হবে যে পাথর পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান চলছে। যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা করে ফাতেমা খালা অসুখ বধিয়ে ফেলেন। পাথর এখনো পাওয়া যায়নি এই চিন্তায় তার ডায়রিয়া হয়ে যাওয়া উচিত।

জোবেদ সাহেবের দোকান যথারীতি খালি। মাছিও উড়ছে না। তিনি আমাকে দেখে বিরস মুখে বললেন, 'হিমু সাহেব আপনার কাছে অনেক পাওনা হয়ে গেল।' আমি হাসি মুখে বললাম, 'টাকা পেয়েছি। কুড়ি হাজার টাকা, এইবার আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব। টাকা আনতে ভুলে গেছি।'

'আজকালের মধ্যে পেলে সুবিধা হত।'

'আজই পাবেন। রাতে আমার এক জায়গায় দাওয়াত আছে। যাওয়ার পথে দিয়ে যাব। টেলিফোনটা কি ঠিক আছে?'

জোবেদ সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছায় বললেন, 'ঠিক আছে।' আমি তার পাওনা মিটিয়ে দেব এই কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। কোন পাওনাদার যখন দিনক্ষণ উল্লেখ করে বলে এই দিনে টাকা দিয়ে দেব তখন অবধারিতভাবে জানতে হবে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না।

'চা খাবেন হিমু সাহেব?'

জ্বি।'

'আপনাকে এই নিয়ে মোট কতকাপ চা খাইয়েছি জানেন?'

'জ্বি না।'

'আজকেরটা নিয়ে নয়শ আঠারো কাপ।'

'আপনি আমাকে ক'কাপ চা খাওয়াচ্ছেন তারও হিসাব রাখছেন?'

জোবেদ সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দোকানদার মানুষ, হিসাব করা হচ্ছে আমার অভ্যাস। তাছাড়া ব্যবসাপাতি নাই, কাজ কর্ম নাই। ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ফালতু চায়ের কাপের হিসাব করতাম না।

নয়শ আঠারো নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি টেলিফোনে কথা বলছি। ব্যাঙাচিকে পাওয়া যায়নি, কথা বলছেন মহিলা ব্যাঙাচি।

'ভাবী আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি. . . ?'

'হ্যাঁ চিনতে পারছি। আপনি গতরাতে এসেছিলেন। আপনি চলে যাবার তিন-চার মিনিটের মাথায় ও এসেছে। এসে যেই শুনেছে আপনি ওর খোজ করতে বের হয়েছেন ওম্নি সে আবার বের হয়েছে। ফিরেছে রাত একটায়।'

'বলেন কি?'

'ভাল মানুষের মত ফেরেনি, মারধর খেয়ে ফিরেছে।'

'সেকি, মারধর কে করেছে?'

'হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। টাকা পয়সা না পেয়ে চড় থাপ্পর মেরেছে। চর্বিওয়ালা মানুষ – মারলে আরাম লাগে। ওরা মনের সুখে মেরেছে। তাও ভাল চড় থাপ্পরের উপর দিয়ে গিয়েছে। পেটে ক্ষুর বসিয়ে দিলে পারত। পারত না?'

'অবশ্যই পারত। ভাবী, ওকি আশপাশে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। ঘুমুচ্ছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম। রাতে ঘুম হয়নি। সূর্য উঠার পর ঘুমুতে গেছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই। ঘুমুক। ওকে শুধু বলবেন রাত আটটার আগে খালি পেটে যেন আমার মেসে চলে আসে। ওর চিকিৎসা শুরু করেছি-প্রথম ডোজটা আজ পড়বে।'

'কি ধরনের চিকিৎসা করছেন?'

'জগাখিচুড়ি টাইপ। টোটকা তন্ত্রমন্ত্র মিলিয়ে একটা চিকিৎসা।'

'আপনার কি ধারণা কাজ হবে?'

'অবশ্যই কাজ হবে।'

'আমি তাকে অবশ্যই আটটার আগে পাঠায়ে দেব।'

'বিকেলে যেন নাশতা টাসতা কিছু না খায়। দুপুরে খেতে পারে কিন্তু সূর্য ডোবার পর কিছু মুখে দেয়া যাবে না।'

'আমি বলে দেখব। তাতে লাভ হবে কিনা জানি না। আমি চোখের আড়াল হলেই কিছু না কিছু খাবে। সোয়াবিন তেল যে খেতে পারে সে সবকিছুই খেতে পারে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন? মাঝে মাঝে মনে হয় – কেউ যদি আমাকে কেটে কুটে রাঁধত। ঝাল দিয়ে ভালমত কষিয়ে একটা বড় জামবাটিতে ওর সামনে দিয়ে বলত, এটা হল তোমার রান্না করা স্ত্রী। আপনার বন্ধু কিন্তু তারপরও খেয়ে ফেলত।'

আমি হা হা করে হাসলাম। তবে আমার হাসি তেমন জমল না। শব্দটা ঠোঁটে হল। এবং ঠোঁটেই ঝুলে রইল। আমার মনে হচ্ছে মহিলার কথা ভুল না। ব্যাঙাচি ঠিকই জামবাটি শেষ করে নিচু গলায় বলবে, তরকারি কি আরো আছে? রানের গোশত পাওয়া যাবে?

নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফাতেমা খালার সঙ্গে কথা হল। খালা এম্নিতেই উত্তেজিত থাকেন আজ তার উত্তেজনা সীমাহীন। ভালমত কথাই বলতে পারছেন না, কথা গলায় আটকে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলতে চাচ্ছেন পারছেন না। মানুষের মস্তিষ্ক এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা তৈরি করতে পারে কিন্তু মুখে বলতে পারে না। কথা বলার জন্যে দুটা মুখ থাকলে ভাল হত বোধহয়। একটা মুখ থাকবে শুধু সত্যি কথা বলার জন্যে। আরেকটা মুখ সত্য-মিথ্যা সবই বলবে। আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে সত্যবাদী মুখ ব্যবহার করতে হবে। অন্যমুখ কখনোই ব্যবহার করা যাবে না ।

ফাতেমা খালা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন। আমি রিসিভার কানে লাগিয়ে নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। চা ভাল হয়েছে। আজ মনে হয় নয়শ বিশ পূর্ণ করতে হবে।

'তোর জন্যে একটা মারাত্মক খবর আছে রে হিমু। তুই বিশ্বাসও করতে পারবি না কত মারাত্মক। তামান্নাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বললাম। সে রাজি হয়েছে। আমার আশংকা ছিল বোধহয় রাজি হবে না। তুই ষাঁড়ের গোবর হলেও তোর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তামান্না বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, সে ব্যাপারটা ধরেছে। তবে তামান্না যে বলতেই রাজি হয়ে যাবে ভাবিনি। আমি তামান্নার মা'র সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বললেন, তামান্নার আসল মা তো আমি না, আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনি যদি পথ থেকে কোন কুষ্ঠরোগী ধরে নিয়ে এসে বলেন, এর সঙ্গে তামান্নার বিয়ে। আমি তখনও বলব, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

আমি খালার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বললাম, 'কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্র থেকে ইয়াং দেখে একটা কুষ্ঠ রোগী ধরে নিয়ে আসব?'

খালা ধমক দিলেন, 'অনেক ফাজলামী করেছিস আর না। শোন হিমু, তোদের বিয়ের সব শপিং আমি করব। বিয়ের শপিং করতে আমার সব সময় ভাল লাগে। ভাবছি কোলকাতায় চলে যাব। শাড়ি-গয়না কোলকাতা থেকে কেনাই ভাল। তবে দাদারা খুব ঠগবাজ। একবার যদি টের পেয়ে যায় আমি বাংলাদেশের দিদি, তাহলে সর্বনাশ। মোলায়েম করে চামড়া ছিলে ফেলবে। এত মোলায়েম করে চামড়া ছিলবে যে বোঝাই যাবে না চামড়া ছিলছে, বরং মনে হবে গা ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।'

'কোলকাতা কবে যাচ্ছ?'

'সামনের সপ্তায় যাব। ইচ্ছা করলে তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস। তবে না যাওয়াই ভাল। বিয়ের শপিংএ হবু স্বামীর থাকতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমিই যাও।'

'বউকে কোথায় রাখবি, কি খাওয়াবি এইসব নিয়ে তুই একেবারেই ভাববি না। প্রথম এক বছর আমার সঙ্গে থাকবে। তিনটা ঘর তোকে আমি আলাদা করে দিয়ে দেব।'

'এসি দেয়া ঘর তো খালা?'

'ছাগলের মত কথা বলিস কেন? আমার কোন ঘর কি আছে এসি ছাড়া?'

'তাও তো ঠিক।'

'তোর সঙ্গে বক বক করতে গিয়ে আসল কথাই ভুলে গেছি। পাথর কিনেছিস?'

খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'না মানে? কি বলছিস তুই?'

আমি করুণ গলায় বললাম, 'মেছকান্দর মিয়া পাথর নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ মানে মহা সর্বনাশ। আমি হাল ছাড়িনি। ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছি।'

'গাড়ি লাগবে?'

'না, গাড়ি লাগবে না। পাজেরো জীপে করে ভিক্ষুক খোঁজা যায় না। তাছাড়া তোমার পাজেরো জীপের ড্রাইভার আমাকে পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করবে কিভাবে, তুই তাকে এক বাড়ির সামনে দাঁড়া করিয়ে উধাও হয়ে গেলি। বেচারা রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তোর জন্যে অপেক্ষা করেছে। এসব উদ্ভট কান্ডকারখানা কেন করিস? এই বেচারাকে রাত তিনটা পর্যন্ত শুধু শুধু বসিয়ে

রাখলি।'

'আর রাখব না। গাড়িটা তুমি পাঠিয়ে দিও।'

'একটু আগে না বললি গাড়ি লাগবে না।'

'এখন মনে হচ্ছে লাগবে। খালা গাড়িটা তুমি সারারাতের জন্যে দিও। ভিক্ষুকদের খোঁজ বের করার উত্তম সময় হচ্ছে রাত।'

'পাথরটা হাতছাড়া হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।'

'পাথর তুমি পাবে। একশ পারসেন্ট গ্যারান্টি।'

'পাথরটার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।'

'অবশ্যই। তবে সামান্য কিন্তু আছে।'

'কিন্তু আবার কি?'

'মাংকিস প' গল্পটা জান না খালা— ঐ যে একটা বাদরের থাবা ছিল, ঐ থাবাটার কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত। সমস্যা একটাই—ইচ্ছা পূর্ণ হবার পর পরই ভয়ংকর বিপদ হত।'

'বলিস কি? এত খাল কেটে কুমীর আনা।'

'পাথর প্রজেক্ট বাদ দিয়েদি?'

'না না। আমার পাথর লাগবে। পাথর ছাড়া চলবে না। বিরাট ভুল করেছি – আসলে ঐ দিনই কিনে ফেলা উচিত ছিল।'

'ইয়াকুব প্রজেক্ট কি বাদ?'

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, 'ইয়াকুব তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথরটা আগে জোগাড় কর।'

'পাথর তোমার চাই-ই?'

'অবশ্যই চাই।'

'মনে হচ্ছে কিছু খরচাপাতি করতে হবে।'

'খরচাপাতি তো করবই। না করেছি? এখন কত লাগবে বল, ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দি।'

'এখন লাগবে না। প্রজেক্ট শেষ হোক। তারপর তোমার নামে বিল করব।'

রাত আটটায় ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমরা আটটার আগেই উপস্থিত হলাম। ওসি সাহেবরা থানার সঙ্গে লাগোয়া সরকারী বাসায় থাকেন বলে শুনেছি— এই বাড়িটা তা না। কলাবাগানে এ্যাপার্টমেন্ট হাউস। কলিংবেল টিপতেই রোগা একজন মহিলা দরজা খুললেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙ্গেছে। ভয় এখনো কাটেনি। আমাদের দুজনকে দেখে ভয় আরো যেন বাড়ল।

আমি বললাম, 'ওসি সাহেব কি বাসায় আছেন?'

মহিলা শংকিত গলায় বললেন, 'জ্বি না। আপনার নাম কি হিমু?'

'জ্বি না, তবে ও আপনার কথা বলেছে। পাঁচজন আসার কথা না?'

'আমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। ও একাই চারজন —আর আমি এক পাঁচ।'

আমার রসিকতায় কাজ হল না। ভদ্রমহিলা ভীত গলায় বললেন, 'ওর আসতে একটু দেরি হবে। কি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। আপনারা বসুন।'

আমরা বসলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, 'চা দিতে বলি?'

ব্যাঙাচি চিন্তিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। যে অতিথি ডিনারের নিমন্ত্রণে

এসেছে চা দিতে বললে সেই অতিথি একটু ভড়কে যাবেই। আমি বললাম, 'ওসি সাহেব আমাদের ডিনারের দাওয়াত করেছিলেন।'

'জ্বি, আমি জানি। ও কোন বাজার করেনি। খুব জরুরী কি একটা কাজে আটকা পড়েছে। ও রেষ্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসবে। আপনাদের বসতে বলেছে।'

'আমরা বসছি।'

'চা দেব?'

দিতে পারেন।'

অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পর কাজের একটি মেয়ে দু কাপ চা এবং পিরিচে করে খানিকট চানাচুর দিয়ে গেল।

ব্যাঙাচি ফিসফিস করে বলল, 'চানাচুর খাওয়া ঠিক হবে না। ক্ষিধে নষ্ট হবে।'

আমি বললাম, 'বেছে বেছে দু একটা বাদাম খেতে পারিস।'

ব্যাঙাচি চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'বিকেলে কিছু না খাওয়ায় ক্ষিধেটা নাড়িতে চলে গেছে। যাই দেখছি তাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে।'

'সোফা চেয়ার ছাড়া তো এই ঘরে কিছু নেই। সোফা খাবি?'

ব্যাঙাচি কিছু বলল না। যেভাবে সোফার দিকে তাকাচ্ছে তাতে মনে হয় সোফা খাবার ব্যাপারটা সে বিবেচনায় রেখেছে। একেবারেই যে অগ্রাহ্য করছে তা না।

রাত এগারোটা বেজে গেল। ওসি সাহেবের স্ত্রী বড় বাটিতে করে এক বাটি পায়েস এবং পিরিচ চামচ দিয়ে গেলেন। আগের মতই ভীত গলায় বললেন, 'ও এতো দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। কখনো এ রকম করে না। দয়া করে আর কিছুক্ষণ বসুন। আপনাদের নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে, পায়েস খান। ঘরে বানানো। কাওনের চাউলের পায়েস।'

আমি বললাম, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমরা অপেক্ষা করব। আপনার মনে হয় শরীর ভাল না। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'আমার শরীর আসলেই বেশ খারাপ। গায়ে জ্বর আছে। আপনাদের একা বসিয়ে রাখতে খুব খারাপ লাগছে— কিন্তু উপায় নেই।'

ব্যাঙাচি বলল, 'বাসায় টেলিফোন নেই?'

'টেলিফোন আছে। দুদিন ধরে ডায়ালটোন নেই। আমার এক ভাইকে থানায় খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি। আপনারা দয়া করে পায়েস খান।'

আমি পুরোবাটি পায়েস একাই খেয়ে ফেললাম। ব্যাঙাচি খেল না, সে ক্ষুধা নষ্ট করবে না। সে ফিসফিস করে একবার বলল, 'বারোটা পঁচিশ বাজে হোটেল তো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তুই হোটেল বন্ধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না। ওসি সাহেব কাচা কাজ করবেন না। তিনি খাবারের অর্ডার আগেই দিয়ে রেখেছেন।'

রাত একটায় রীনা ভাবীর ভাই থানার খবর নিয়ে ফিরল। ওসি সাহেবের ষ্ট্রোকের মত হয়েছে। তাকে সোহরাওয়ার্দিতে নেয়া হয়েছে। অবস্থা ভাল না।

ওসি সাহেবের স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদছেন। আর ঘরে বসে থাকা যায় না। আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। ব্যাঙাচি ফিসফিস করে বলল, 'পায়েসটা না খাওয়া বিরাট বোকামী হয়েছে।'

১০

আজকাল মনে হয় চাইনীজ রেষ্টুরেন্টগুলির ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে— খালি পায়ে আমাকে ঢুকতে দিতে আপত্তি করল না। রেষ্টুরেন্টের বেয়ারা আমার নগ্নপদযুগলের দিকে তাকাল। খুব বিস্মিত হল বলেও মনে হল না কিংবা কে জানে তার হয়ত বিস্মিত হবার ক্ষমতা চলে গেছে।

চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে ঢুকলেই অন্ধকার কোণা খুঁজে বসতে ইচ্ছা করে। চট করে কেউ দেখতে পারবে না। আর দেখলেও চিনবে না। আলো থাকবে কম— কি খাচ্ছি তাও পরিষ্কার বোঝা যাবে না। ভাতের মাড়ের মত ঘন এক বস্তু এনে দিয়ে বলবে স্যুপ। চামচ দিয়ে সেই স্যুপ মুখে তুলতে তুলতে বলতে হবে এই রেস্টুরেন্টের চেয়ে ঐ রেষ্টুরেন্ট স্যুপটা ভাল বানায়। এই কথা থেকে অন্যরা ধারণা করে নেবে যে এই লোক নভিস কেউ না, চাইনীজ রেষ্টুরেন্ট সে চষে বেড়ায়।

আমাদেরকে (আমাদের বলছি কারণ তামান্না আছে।) ফাতেমা খালা আমাদের দু'জনকে চাইনীজ খেতে পাঠিয়েছেন। চাইনীজ খাবারের মাধ্যমে বিবাহ পূর্ব প্রেম গজাবে এই বোধহয় তার ধারণা। এক টেবিলের দুদিকে দুটা চেয়ার। সব চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে একটা অংশ থাকে প্রেমিক-প্রেমিকদের জন্যে।

তারা আসে দুপুর বেলা। অতি সামান্য খাবারের অর্ডার দিয়ে এসি ঘরে বসে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মেয়েটি সারাক্ষণ অভিমান করতে থাকে। ছেলেটির প্রধান কাজ হয় অতিমান ভাঙ্গনে। ছেলেটা হয়ত আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে মেয়েট মুখ অন্ধকার করে বলবে, 'তুমি না বললে সিগারেট ছেড়ে দেবে?'

ছেলেটা বলবে, 'বলেছি নাকি?'

'কি বলেছ তাও তুলে গেছ? আমার নাম মনে আছে তো। নাকি নামটাও ভুলে গেছ।'

'হু, কি যেন তোমার নাম?'

'তোমাকে আমি এমন চিমটি দেব?'

'ও আচ্ছা, তোমার নাম মনে পড়েছে – তোমার নাম চিমটি রানী।'

'একি তুমি আমাকে তুলিয়ে-ভালয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছ? তোমার শয়তানী বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। ফেল বললাম সিগারেট।'

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ এসট্রেতে সিগারেট ফেলে দেবে। মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলবে, 'দেখি সিগারেটের প্যাকেট আমার কাছে দাও। দ'ও বললাম।'

সিগারেটের প্যাকেট দেয়া হবে। মেয়েটা সেই প্যাকেট তার ব্যাগে রাখতে রাখতে বলবে, 'এখন থেকে তোমার যদি সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে আমার কাছে চাইবে। আমি যদি দেই তবেই সিগারেট খাবে। না দিলে না।'

'ও-কে।'

'আচ্ছা যাও, আজ চাইনীজ খাওয়া উপলক্ষে তোমাকে একটা সিগারেট খাবার অনুমতি দেয়া হল। পুরোটা খেতে পারবে না। হাফ খাবে।'

'ও-কে।'

'একটু পর পর ও-কে ও-কে করছ কেন?'

ঘন্টা খানিক এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা চলবে। কথার অভাব কখনো হবে না।

তামান্নাকে নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসেছি। আরো কিছু জোড়া দেখা যাচ্ছে যারা সমানে কথা বলে যাচ্ছে। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তামান্না খুবই গম্ভীর হয়ে আছে। তার বোধহয় খুব তাড়াও আছে। সে একটু পর পর ঘড়ি দেখছে। আমি অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, 'তামান্না তুমি কি খাবে?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি খাবে মানে? আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?'

'দু'দিন পর বিয়ে হবে, এখন তুমি বলতে অসুবিধা কি? খালা বলেছেন তুমি রাজি।'

'আমি বিয়েতে রাজি এমন কথা কখনো বলিনি আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি।'

'খালা তোমাকে বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তুমি তাকে অখুশীও করতে পারবে না। চাকরি চলে যাবে।'

'চাকরি চলে গেলে চলে যাবে। চাকরির জন্যে আমি যাকে তাকে বিয়ে করব?'

'সেটাও একটা কথা। বিয়ের মত একটা বড় ব্যাপার — সামান্য চাকরির জন্যে তোমায় বিয়ে করা ঠিক হবে না।'

'আশ্চর্য কান্ড এখনো তুমি তুমি করছেন। আপনি কি জানেন আপনি খুবই নির্লজ্জ ধরনের মানুষ।'

'এত রেগে যাচ্ছ কেন? তোমার চেঁচামেচি শুনে সবাই আমাদের দিকে আগাচ্ছে — তারা ভাবছে আমরা বোধহয়, প্রেমিক-প্রেমিকা না। স্বামী-স্ত্রী। এমন চেঁচামেচি স্বামী-স্ত্রীরাই করে।'

'প্লীজ আর কথা বলবেন না। খাবারের অর্ডার দিন। খেয়ে চলে যাই। স্যুপ অর্ডার দেবেন না। আমি খাই না।'

'টাকা এনেছেন তো?'

তামান্না বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি টাকা আনেননি?'

'না।'

তামান্না গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার কাছে টাকা আছে। আপনি খাবারের অর্ডার দিন।'

'তুমিই দাও। তোমার কাছে কত টাকা আছে তা তো জানি না। টাকা বুঝে অর্ডার দিতে হবে। কাপড় হিসেব করে জামা বানাতে হবে। আছে হাফসার্টের মত কাপড়, তুমি বানিয়ে বসলে ফুল হাতা সার্ট, ডাবল পকেট তা হবে না।'

তামান্না ভুরু কুচকে বলল, 'কেন আপনি অকারণে কথা বলছেন? আপনার নিজের ধারণ আপনি খুব মজা করে কথা বলছেন—আসলে তাও না। পুরানো সব কথা শুনতে খুবই বিরক্তি লাগছে।'

'কথা বলব না?'

'না।'

'একেবারেই না?'

'তুমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেব না— কি তাও দেব না?'

তামান্না জবাব দিল না। সে বিরক্তির প্রায় শেষপ্রান্তে পৌছে যাচ্ছে। ভয়াবহ ধরনের বিরক্ত মানুষ অদ্ভুত সব আচরণ করে। আমাদের ধারণা রাগে-দুঃখে মানুষ কাঁদে। বিরক্ত হয়েও হাউ মাউ করে কাঁদতে আমি দেখেছি। বিরক্তের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে তামান্না কি করে। আমার বাবা মহাপুরুষ

বানানোর বিখ্যাত কারিগর তার উপদেশমালায় বলে গেছেন –

দুঃখী মানুষের কাছে থাকিও।
শোকগ্রস্ত মানুষের কাছে থাকিও।
রাগে অন্ধ মানুষের কাছে থাকিও।
আনন্দিত মানুষের কাছে থাকিও।
দুঃখ-শোক, রাগ-আনন্দ তোমার ভিতরে আসিতে পারবে না।
কিন্তু কদাচ বিরক্ত মানুষের কাছে থাকিও না।
বিরক্ত মানুষ ভয়ংকর।

তামান্না এখন প্রচন্ড বিরক্ত কিন্তু তাকে মোটেই ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। বরং সুন্দর লাগছে। চশমা যেমন কাউকে কাউকে মানায় সবাইকে মানায় না, বিরক্তিও তেমন কাউকে কাউকে মানায়। তামান্নাকে খুব মানিয়েছে।

আমি খুবই নরম গলায় বললাম, 'তামান্না আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করে দেবে?'

তামান্না কিছু বলল না। শুধু তার চোখ তীক্ষ্ণ করে ফেলল। আমি বললাম, 'তাকিয়ে দেখ জানালার কাছে যে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল বসেছে তাদের কাছ থেকে একটা সিগারেট এনে দেবে। তুমি চাইলেই দিয়ে দেবে।'

'ওদের কাছ থেকে সিগারেট এনে দিতে হবে?'

'আমিই চাইতাম। তবে আমি চাইলে নাও দিতে পারে। তোমার মত সুন্দরী কোন মেয়ে যদি সিগারেট ভিক্ষা চায় সে ভিক্ষা পাবেই।'

তামান্না তার ব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করে বেয়ারাকে সিগারেট আনতে পাঠাল। এক প্যাকেট সিগারেট একটা দেয়াশলাই। আমি বললাম, 'থ্যাংকস।'

তামান্না বলল, 'থ্যাংকস ট্যাংকস কিছু দিতে হবে না। আপনি দয়া করে আর একটা কথাও বলবেন না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

আমরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। খাওয়ার সময় তামান্না একবার জিজ্ঞেস করল, 'এদের রান্না তো ভালই, তাই না?' আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খাওয়ার শেষে তামান্না জিজ্ঞেস করল, 'আইসক্রীম খাবেন?' আমি আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

তামান্না বলল, 'ম্যাডামের পাথরটা কি পাওয়া গেছে?'

আমি না সূচক মাথা নাড়লাম। তামান্না বলল, 'প্রশ্ন করলে জবাব দিন। মাথা নাড়ানাড়ি অসহ্য লাগছে। ম্যাডামের পাথরটা জোগাড় হয়নি কেন?'

'মেছকান্দর মিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথর নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোহিনুর হীরার আদি মালিককে যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে মেছকান্দরের অবস্থা সে রকম হয়েছে। সে তার কোহিনুর নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'আপনার ধারণা পাথরটা কোহিনুরের মতই দামি?'

'কোহিনুরের চেয়েও দামী। কোহিনূরের ইচ্ছাপূরণ ক্ষমতা ছিল না। এর আছে।'

'ক'টা ইচ্ছা এই পাথর পূরণ করে? একটা না তিনটা?'

'সে ইচ্ছা পুরণ করতেই থাকে। এর ক্ষমতা এক এবং তিনে সীমাবদ্ধ নয়।'

'ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার ক'টি ইচ্ছা এই পাথর পূর্ণ করেছে?'

'মেছকালর মিয়া কখনো কিছু চায় না বলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভিক্ষুকরা নিজের জন্যে কিছু চায় না। শুধুই অনোর জন্যে চায়। ভিক্ষা করার সময় এরা কি বলে দয়া করে মন দিয়ে শুনবেন। এরা বলে, 'আল্লা আপনার ভাল করব বাবা। ধনে জনে বরকত দিব।' এরা কখনো বলে না, 'আল্লা তুমি আমার ভাল কর, আমাকে ধন জন দাও।'

'আপনাকে শুনিয়ে না বললেও আড়ালে যে বলে না, তো কি করে জানেন?'

'আড়ালেও বলে না। এরা ধরেই নিয়েছে এই জাতীয় চাওয়া মূল্যহীন। তাদের মত অভাজনের ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। কাজেই ইচ্ছা ব্যাপারটাই এদের জীবন থেকে চলে গেছে।'

'আপনি মনে হচ্ছে একজন ভিক্ষুক বিশেষজ্ঞ?'

হ্যাঁ। প্রায়ই আমাকে যেহেতু ভিক্ষা করতে হয় ওদের সাইকলজি আমি জানি।'

'আপনাকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে হয়?'

'হ্যাঁ করতে হয়।'

'রাস্তায় কখনো হাত পেতে ভিক্ষা করেছেন?'

'করেছি। এক শবেবরাতের রাতে ভিক্ষা করে তিনশ একুশ টাকা পেয়েছিলাম। খরচ-টরচ দিয়ে হাতে ক্যাশ ছিল দুশ দশ টাকা।'

'খরচ-টরচ মানে কি? কিসের খরচ?'

'ভিক্ষার জন্যে জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোথায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা হবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল জায়গায় দখলের জন্যে টকা খাওয়াতে হয়। জায়গা বুক করার জন্যে টাকা তো লাগেই– ভিক্ষা করে যে টাকা আয় হয় তার উপর কমিশনও দিতে হয়।'

'আপনি কি সব সময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন?'

'মাঝে মাঝে বলি। সব সময় বলি না।'

'আমার তো ধারণা আপনি সব সময়ই মিথ্যা কথা বলেন। আপনি একজন প্যাথলজিকেল লায়ার। এবং আমি নিশ্চিত আপনার কোন একটা মানসিক ব্যধি হয়েছে। যে কারণে আপনি সত্যি কথা বলতেই পারেন না।'

'হতে পারে।'

'আপনি কি আমার একটা উপদেশ দয়া করে শুনবেন?'

'অবশ্যই শুনব।'

'আপনি একজন সাইকিয়াটিষ্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার চিকিৎসা দরকার।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

'আপনি যে একজন মানসিক রোগী তা কি জানেন?'

'জানি।'

তামান্না উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'জানলেই ভাল। বেশিরভাগ মানসিক রোগীই জানে না যে তারা রোগী। সুস্থ মানুষের মত তারা ঘুরে বেড়ায়। খায়দায় ঘুমায়।'

আমি বললাম, তুমি কি আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পারবে। ফাতেমা খালার পাথর তো পাওয়া গেল না—ভাবছি একটা ফলস পাথর কিনে দেব।'

'ফলস পাথর?'

হ্যাঁ, দু নম্বর পাথর। বর্তমান যুগটাই হচ্ছে দু নম্বরীর। কাজেই দু নম্বর পাথরই ভাল কাজ করবে।'

তামান্না গম্ভীর ভঙ্গিতে একশ টাকার একটা নোট বের করে দিল। আমি রিকশা নিয়ে রওনা হলাম। গাবতলী থেকে এই সাইজের একটা পাথর আনতে হবে। সিলেটের জাফলং থেকে নৌকা এবং বার্জ ভর্তি পাথর আসে গাবতলীতে। সেই সব পাথর ভেঙ্গে খোয়া বনানো হয়। সেই খোয়া বাড়িঘর তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুন্দর একটা পাথর গাবতলী থেকে জোগাড় করা কঠিন হবে না। পাথরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, শিরীষ মারতে হবে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে একটা ওয়াশ দিতে পারলে ভাল হবে। দাগটাগ থাকলে উঠে যাবে।

ওসি সাহেবকে দেখার জন্যে হাসপাতালে যাওয়া দরকার। হাসপাতালে তাঁর দিনকাল নিশ্চয়ই ভাল কাটছে না। ক্ষমতাবান মানুষদের জন্যে হাসপাতাল খুব খারাপ জায়গা। হাসপাতালের অপরিসর বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষমতাবান মানুষেরা এক সময় হঠাৎ বুঝতে পারেন— ক্ষমতা ব্যাপারটা আসলে ভূয়া। মানুষকে কখনোই কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি

১১

'এইটাই সেই পাথর?'

ফাতেমা খালা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন? এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাদির শাহ কোহিনুর পাথরের দিকে তাকিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। তেতুলের আচার দেখলে কিশোরীর মুখভর্তি লালা এসে যায়। খালার মুখেও লালা জমছে।

'পাথরটার ওজন কত রে?'

'চল্লিশ হাজার ক্যারেটের মত।'

'কত কেজি বল? ক্যারেটে বলছিস কেন?'

'দামী জিনিস তো খালা— এই জন্যেই ক্যারেটে হিসেব হচ্ছে।'

'পাথর জোগাড় করতে খরচ কত পড়ল?'

'খরচ ভালই পড়েছে তবে তুমি এই মূহুর্তে খরচ নিয়ে চিন্তা করবে না। আগে নিশ্চিত হয়ে নাও যে পাথরটা কাজ করে। যদি দেখা যায় এটা ফালতু রাস্তার পাথর তাহলে শুধু শুধু এর পেছনে এত টাকা খরচ করব কেন?'

'পাথর ফেরত নেবে?'

'অবশ্যই ফেরত নেবে। তুমি আগে ব্যবহার করে দেখ জিনিসটা কেমন?'

'ব্যবহারের নিয়ম কি?'

'নিয়ম জটিল না। গোধূলীলগ্নে পাক-পবিত্র হয়ে পদ্মাসনে বসতে হয়। পাথরটা রাখতে হয় কোলে। বসতে হয় উত্তরমুখী হয়ে। পাথরটার উপর প্রথম ডান হাত রাখতে হয়। ডান হাতের উপর থাকবে বাঁ হাত। আঙ্গুলগুলি থাকবে ৯০ ডিগ্রী

এঙ্গেলে। মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে যা চাইবার তা চাইতে হয়। ও আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। পাথরটা কোলে বসাবার আগে পরিষ্কার পানিতে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। মনের ইচ্ছা বলার পর পাথরটা বড় এক বালতি পানিতে ডুবিয়ে রাখবে। ইচ্ছাপূর্ণ হবার পর পাথরটা পানি থেকে তুলতে হবে। যে পানিতে পাথর ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সেই পানি কিন্তু নষ্ট করা যাবে না বা ফেলে দেয়া যাবে না।'

'এক বালতি পানি কি করব?'

'পানিটা ফুটিয়ে বাষ্প করে বাতাসে মিলিয়ে দিতে হবে।'

'জটিল কিছু না। আমার তো মনে হচ্ছে অত্যন্ত জটিল। তুই কাগজে লিখে দে তো। ভাল কথা— যে বালতিতে পাথরটা রাখব সেই বালতি কিসের হবে? প্লাষ্টিকের বালতিতে চলবে?'

'প্লাষ্টিকের বালতিতে চলবে, সবচে ভাল হয় রুপার বালতিতে রাখলে। অমৃত যেমন মাটির হাড়িতে রাখা যায় না, স্বর্ণ ভান্ডে রাখতে হয় সে রকম আর কি?'

'রুপার বালতি কিনব?'

'বাদ দাও। পাথর কাজ করে কি করে না— আগেই রুপার বালতি।'

খালা বললেন, 'রুপার বালতিতে আর কত খরচ পড়বে? তুই ম্যানেজারকে নিয়ে যা তো— রেডিমেড রুপার বালতি পাবি বলে তো মনে হয় না। একটা অর্ডার দিয়ে আয় থাকুক একটা রুপার বালতি।'

ম্যানেজার বুলবুল সাহেবকে খুব বিষন্ন লাগছে। আজ তিনি চকচকে লাল রঙের টাই পরেছেন। লাল টাইও তাঁর বিষন্নতা দূর করতে পারছে না। বরং আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'আপনার ভাগ্যটা ভাল।'

আমি হাসলাম। ভাগ্য যে ভাল তা স্বীকার করে নিলাম।

ম্যানেজার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনাকে আমি ঈর্ষা কর।'

আমি বললাম, 'আমি নিজেও নিজেকে ঈর্ষা করি।'

'ইদানীং আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে স্যুট-টাই ফেলে দিয়ে আপনার মত বের হয়ে পড়ি। তবে খালি পায়ে না। ঢাকার পথে খালি পায়ে হাঁটা খুবই আনহাইজিনিক।'

'ঠিক বলেছেন।'

'হিমু সাহেব আপনাকে তো কনগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি —কনগাচুলেশন।'

'কি জন্যে পাথর খুজে পেয়েছি এই জন্যে?'

'তামান্নার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে এই জন্যে। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। রুপ আর গুণ তেল জলের মত। হাজার ঝাঁকালেও মিশে না। তামান্নার ক্ষেত্রে এই মিশ্রণটা ঘটেছে। আপনি অসম্ভব ভাগ্যবান একজন মানুষ।'

'ধন্যবাদ। তামান্নাকে কি আপনার খুব পছন্দ।'

'উনার মধ্যে পছন্দ না হবার কিছু নেই। এক সঙ্গে কাজ করি তো। কাছ থেকে দেখেছি।'

'বিয়ে এখনো ফাইনাল হয়নি। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'আমি যতদূর জানি সব ফাইন্যাল হয়েছে। তারিখ পর্যন্ত হয়েছে। ম্যাডাম আপনাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে কিছু বলছেন না। একদিন বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আপনাকে সারপ্রাইজ দেবেন। ম্যাডামের মধ্যে এইসব ছেলেমানুষী আছে।'

'কার্ডের টাকাটা জলে যাবে। তামান্না শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না।'

'একটা খবর আপনি জানেন না, আমি জানি – তামান্না আপনাকে খুবই পছন্দ করেন। পাগলশ্রেণীর মানুষদের জন্যে মেয়েদের বিশেষ কিছু মমতা থাকে। আপনাকে পাগলশ্রেণীর বলায় আশা করি কিছু মনে করছেন না।'

'জ্বি না, মনে করছি না।'

আমি রুপার বালতির অর্ডার দিলাম। ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'চলুন আপনাকে কিছু কাপড়-চোপড় কিনে দেই। আপনাকে প্রেজেন্টেবল করার দায়িত্ব ম্যাডাম আমাকে দিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

'স্যুট কখনো পরেছেন ?'

'জ্বি-না।'

'চলুন একটা স্যুট বানিয়ে দেই।'

'চলুন।'

ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি হিমু সাহেব, দয়া করে সত্যি জবাব দেবেন।'

'অবশ্যই সত্যি জবাব দেব ?'

'যে পাথরটা আপন ম্যাডামকে দিয়েছেন– সত্যি কি তার ইচ্ছা পূরণ ক্ষমতা আছে ?'

'এখনো জানি না। আপনি টেষ্ট করে দেখুন না। পাথর তো আপনার হেফাজতেই থাকবে।'

'একটা সিগারেট দিন তো হিমু সাহেব, সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

'সিগারেট সঙ্গে নেই। কিনতে হবে। পাঞ্জাবীর পকেট নেই তো— সিগারেট কোথায় রাখব ভেবে কেনা হয় না।'

'আসুন আজ আপনাকে গোটা তিনেক পকেটওয়ালা পাঞ্জাবীও কিনে দেই। অসুবিধা আছে ?'

'জ্বি না, অসুবিধা নেই।'

১২

সুন্দরী মেয়েদের হাতের লেখা সুন্দর হয়। এটা হল নিপাতনে সিদ্ধ। সুন্দরীরা মনে প্রাণে জানে তার সুন্দর। তাদের চেষ্টাই থাকে তাদের ঘিরে যা থাকবে সবই সুন্দর হবে।

আমি তামান্নার চিঠি হাতে নিয়ে প্রথমেই হাতের লেখার তারিফ করলাম। সুন্দর হাতের লেখার একটা সমস্যা হচ্ছে— ভুল বানান খুব চোখে পড়ে। তামান্নার চিঠি পড়ছি বানান ভুল এখনো চোখে পড়ছে না – মেজাজ খারাপ হচ্ছে। দীর্ঘ একটা চিঠিতে সে বানান ভুল কেন করবে না। সে কি চলন্তিকা সামনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি পড়ে তাও তো মনে হচ্ছে না। ডিকশনারী সামনে নিয়ে লেখা চিঠি ভারিক্কী ধরনের হয়, এই চিঠি ভারিক্কী না। বরং মজার ভঙ্গিতে লেখা।

হিমু সাহেব,

আপনাকে একটা মজার খবর দেয়ার জন্যে চিঠি লিখতে বসেছি। আপনাকে তো টেলিফোনে পাওয়া সম্ভব না। কাজেই অফিস পিওনকে বলে দিয়েছি সে যেন সূর্য উঠার আগে আপনার মেসে উপস্থিত হয়। আমাদের এই পিওন বোকা টাইপের। তাকে যা বলা হয় রোবটের মত তাই সে করে। কাজেই আমার ধারণা তোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে সে আপনাকে আমার চিঠি দিয়েছে।

মজার খবরটা এখন দিচ্ছি। ম্যাডামের বদ্ধমূল ধারণ হয়েছে যে, আপনার পাথরটা কাজ করছে । তিনি পাথরের কাছে প্রথম যে জিনিসটা চেয়েছেন তা হল— রাতের ঘুম। পাথর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। গত চার রাত ধরে ম্যাডাম কোন রকম ঘুমের অষুধ ছাড়াই ঘুমুচ্ছেন। রাত এগারোটার দিকে ঘুমুতে যান— ভোর ন'টার আগে ওঠেন না। ম্যাডাম পাথরের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত। আমি আপনার মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত।

ম্যাডাম যে হারে লোকজনের কাছে পাথরের গল্প করছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকা অফিস থেকে লোকজন এসে পাথরের ছবি তুলে নিয়ে যাবে। টেলিভিশনের কোন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানেও ম্যাডামকে পাথরসহ দেখা যাবে।

হিমু সাহেব, বলুন তো আপনি এই পাথর দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন? কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি কিছু করেন না। সেই উদ্দেশ্যটা আমি আসলে ধরতে পারছি না।

যাই হোক, এখন আমি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে আসি। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে বিয়ের তারিখ হয়েছে মার্চের ১৫ তারিখ শুক্রবার। দাওয়াতের কার্ড ছাপা হয়েছে। বিয়ের নানান কর্মকাণ্ড নিয়ে ম্যাডামের সিমাহীন ব্যস্ততা। আমার হাত-পা কাঁপছে। ম্যাডাম এত আনন্দ নিয়ে ছুটাছুটি করছেন—আমি কি করে তাঁকে বলব যে আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব না।

একমাত্র আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আপনি কি দয়া করে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবেন? তাহলে আমি আমার মত চাকরি করে যেতে পারি। সব ঠিকঠাক মত চলতে থাকে। বিয়ে ভাঙ্গার কারণে ম্যাডাম যদি আপনার উপর রাগ করে তাহলে আপনার কিছুই যাবে আসবে না। কিন্তু আমার যাবে আসবে। আমার পক্ষে চাকরি ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সম্ভব না। আপনি আমার জন্যে কিছু না করলে আমাকে নিতান্তই বাধ্য হয়ে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। তার ফল আপনার বা আমার কারো জন্যেই শুভ হবে না।

আমি আপনার কাছে হাত জোড় করছি, আপনি আমাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

বিনীতা
তামান্না।

চিঠি শেষ করে খুশি খুশি লাগছে। এক ভুল বানান পাওয়া গেছে সীমাহীনের সী লিখেছে হ্রস্যইকার দিয়ে। অবশ্যি দীর্ঘই নাও হতে পারে আধুনিককালের বানান তো সব পাল্টে যাচ্ছে। শাড়ী বাড়ী এখন লেখা হচ্ছে হস্যইকার দিয়ে। সূর্য লেখার সময় আগে রেফের পরে য-ফলা লাগত। এখন লাগে না—সূর্যের তেজ কমে গেছে। তার জন্যে বাড়তি য-ফলা এখন দরকার নেই।

১৩

ফাতেমা খালার বসার ঘরের এক কোণায় খালার ম্যানেজার বসে আছেন। ম্যানেজার মুখ গম্ভীর। চোখ বিষন্ন। বসার ভঙ্গিও বিষন্ন। হালকা সবুজ সুট এবং চকচকে লাল টাই এ বিষণ্ণতা দূর করছে না। ফাইজার অষুধ কোম্পানি এখন তাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করতে পারে। তাঁর একটা ছবি। ছবির নিচে ক্যাপশান—

বিষণ্ণতা একটি ব্যাধি।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকালেন-অপরিচিত মানুষের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকানো হয় অবিকল সেই দৃষ্টি। আমি হাসিমুখে বললাম, 'ম্যানেজার সাহেব, আপনার কি বিষণ্ণতা ব্যাধি হয়েছে? ম্যানেজার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছে।'

ভদ্রলোক আমি কি বলেছি না শুনেই জবাব দিয়েছেন। লক্ষণ মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। আমি বললাম, 'আপনি ভাল আছেন?'

'জ্বি।'

'কোন কারণে কি মন খারাপ?'

'জ্বি না, মন ভাল। তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছেন।'

'তামান্নার কথা কিছু জানতে চাইনি। আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

'শরীর ভাল যাচ্ছে না। ঘুমের সামান্য সমস্যা হচ্ছে।'

'ইচ্ছাপূরণ পাথরে হাত দিয়ে ঘুম চাইলেই হয়। ঘুমের অষুধ তো আপনার হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই পাথর।'

ম্যানেজার সাহেব বসে পড়েছেন। এখন তার দৃষ্টি ঘরের কার্পেটে। কার্পেটের নকশার সৌন্দর্যে তার বিষন্নতা আরো বাড়ছে। আমি খালার সন্ধানে ভেতরে ঢুকে গেলাম। এ বাড়িতে এখন আমার অবাধ গতি— যে কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারি। কাজের মেয়েগুলি চাপা রাগ নিয়ে তাকায় কিন্তু কিছু বলে না।

খালাকে তার শোবার ঘরে পাওয়া গেল। তিনি পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। একটা কাজের মেয়ে তার চুলের গোড়ায় তেল ডলে ডলে দিচ্ছে। প্রক্রিয়া যথেষ্টই জটিল। এক গোছা চুল আলাদা করে তুলে ধরা হয়। চুলের গোড়া ম্যাসাজ করা হয়। তেল দেয়া হয়। সেই চুলের গোছা ধরে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে কিছুক্ষণ টানাটানি করা হয়।

খালা ইশারায় খাটের উপর আমাকে বসতে বললেন। এবং ইশারাতেই কাজের মেয়েটিকে চলে যেতে বললেন। অতিরিক্ত ধনবানেরা ইশারা বিশারদ হয়ে যায়। এমনিতে সারাক্ষণ কথা কিন্তু আদেশ জারির ক্ষেত্রে চোখের বা হাতের ইশারা।

‘মাথার চুল সব পড়ে যাচ্ছে রে হিমু। খুব দুশ্চিন্তায় আছি।’

‘দুশ্চিন্তার কি আছে? পাথরের কাছে চুল চাও।’

‘সামান্য জিনিস চাইতে ইচ্ছা করে না। বড় কিছু হোক তখন চাইব। পাথর তো ঘরেই আছে। পালিয়ে যাচ্ছে না তো ।’

‘পাথর তোমার মনে ধরেছে?’

খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ‘পাথর নিয়ে শুরুতে তোর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। ব্যবহার করে আমি হতভম্ব।’

‘কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?’

‘সাইড এফেক্ট আছে তবে পজেটিভ সাইড এফেক্ট। আমার তো রাতে ঘুম হত না। পাথরটার কাছে ঘুম চাইলাম। এখন কোন অষুধ ছাড়া মড়ার মত ঘুমুচ্ছি। রাত দশটার সময় বিছানায় যাই। পুরানো অভ্যাসমত ভেড়া গুনতে শুরু করি। বললে বিশ্বাস করবি না চল্লিশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুম।’

‘সাইড এফেক্ট কি?’

‘বললাম না পজেটিভ সাইড এফেক্ট। যেসব জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা হত সে সব নিয়ে এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। ঐ যে ইয়াকুবকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতাম— তোর খালু কেন ঐ হারামজাদাটাকে এত টাকা দিয়ে গেল। এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। দিয়েছে ভাল করেছে।’

‘ইয়াকুবের সঙ্গে কথা বলব না?’

‘কোন দরকার নেই।’

‘তোমার জীবন তো খালা টেনশান ফি হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাঁচবে কি করে? এখন তো তুমি হুট করে মরে যাবে।'

‘খামাখা কথা বলিসন তো হিমু।’

‘বেঁচে থাকার জন্যে টেনশন লাগে খালা । যার যত টেনশন তাঁর বাঁচা তত আনন্দময়।’

‘আমার টেনশন যথেষ্টই আছে। আমার টেনশান নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বুলবুল বলছে চাকরি করবে না। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। বুলবুলের মত আরেকজন মাসে লাখ টাকা দিলেও পাব না।’

‘বুলবুল সাহেব চাকরি করবে না কেন?’

‘জানি না কেন, পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না। সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে থাকে।’

‘পাথরকে বল বুলবুল যেন তোমাকে ছেড়ে না যায়।’

‘তাই মনে হয় বলতে হবে। হিমু তুই পাথরটার খরচ নিয়ে যা। কত খরচ পড়ল?’

‘পাথর উদ্ধারের ব্যাপারে একজনের সাহায্য নিয়েছি। বলতে গেলে সেই পাথর এনে দিয়েছে। তার নাম ছক্কু। ছক্কুর খুব শখ একটা ষ্টেশনারীর দোকান দেবে।’

‘এ তো মেলা টাকার ব্যাপার।’

‘পাথরটা কি তুমি দেখবে না?’

‘আচ্ছা যা দোকান দিয়ে দেব। বুলবুলকে এখনি বলে দিচ্ছি সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে।’

‘আমি ছক্কুকে নিয়ে আসি?’

‘যা নিয়ে আয়। আর দাওয়াতের কার্ডগুলি নিয়ে যা। তুই তোর বন্ধুবান্ধবকে

দাওয়াত করবি না?'
'কার্ড সুন্দর হয়েছে খালা।'
'সুন্দর হবে না? কি বলিস তুই কার্ড আমি নিজে বেছে কিনেছি।'
'তামান্না কি আশপাশে আছে?'
'হু আছে। এখন ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাব না। বিয়ের আগে কনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না।'
'আমি শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।'
'কি বলবি?'
'সেটা তো খালা তোমাকে বলা যাবে না।'
কৌতূহলে খালার চোখ চকচক করছে। কি কথাটা বলা হবে তা জানার জন্যে তার মধ্যে টেনশন তৈরি হচ্ছে। টেনশন তৈরি হচ্ছে বলেই তিনি বেঁচে আনন্দ পাচ্ছেন।
খালার হাত থেকে দাওয়াতের কার্ড নিলাম। প্রথম কার্ডটা দিলাম তামান্নাকে। আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি আমার হবু স্ত্রীকে করব না? সেটাই তো স্বাভাবিক।
তামান্না গম্ভীর গলায় বলল, 'থ্যাংকস।'
আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছ তামান্না?'
তামান্না বলল, 'ভাল।'
'তোমার ঘুম হচ্ছে তো?'
তামান্না কিছু বলল না। তার চোখে রাগ নেই, দুঃখবোধ নেই, অভিমান নেই। যেন সে পাথরের একটা মেয়ে। আমি দাওয়াতের কার্ড নিয়ে রওনা হলাম। কার্ডগুলি বিলি করতে হবে। কার্ড কাদের দেব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—

ভিক্ষুক মেছকান্দার
ছক্কু
দেশ প্রেমিক জোবেদ আলি
ওসি রমনা থানা
ইয়াকুব সাহেব।

আচ্ছা রূপাকে একটা কার্ড দেব না? অবশ্যই দেব। সবার শেষে দেব। রূপাকে কার্ড দেবার পর যে কার্ডগুলি বাঁচবে সেগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

'আমাকে চিনতে পারছেন?'
'হিমু সাহেব না?'
'ঠিকই চিনেছেন। আমি আপনাকে চিনতে পারছিলাম না। আপনার একি অবস্থা?'
'মরতে বসেছি হিমু সাহেব।'
'তাই তো দেখছি।'
ওসি রমনা থানা উঠে বসতে গিয়েও বসলেন না। আবার শুয়ে পড়লেন। বড় বড় করে শ্বাস নিতে লাগলেন। এই কয়েকদিনেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। চোখে মুখে ঘুম ঘুম ভাব। ডাক্তাররা সম্ভবত ঘুমের অষুধের মধ্যেই তাঁকে রাখছে। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে।
ভদ্রলোক কেবিনে সীট পাননি। তার দুপাশেই রোগীর সমুদ্র। এদের মধ্যে একজন বোধহয় মারা যাচ্ছে। ডাক্তার নার্স তাকে নিয়ে ছোটাছুটি করছে। আমি ওসি সাহেবের পাশে বসতে বসতে বললাম, 'আপনার হয়েছেটা কি বলুন দেখি।'

‘ষ্টোক করেছে। বাঁ পাটা কোমরের নিচ থেকে অচল।’
‘বলেন কি?’
‘পুরো ভেজিটেবল হয়ে গেছি। নিজেকে মনে হচ্ছে চালকুমড়া।’
ওসি সাহেব আবারো উঠে বসতে গেলেন। আমি তাকে সাহায্য করলাম। পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে দিলাম। ওসি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘একটা মশা আমাকে খুব বিরক্ত করছে। মেরে দিন তো।’
আমি মশা মেরে দিলাম। ওসি সাহেব মৃত মশার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কোন মৃত মশার দিকে এত কৌতুহল নিয়ে রোমান্স রসও তাকাননি। ওসি সাহেব মশার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, ‘হিমু সাহেব। যেন আমি না, মশাটাই হিমু।’
আমি বললাম, ‘জ্বি।’
‘আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি কি একটা ব্যাপার জানেন? আমি যে মরতে বসেছি আপনার জন্যেই মরতে বসেছি।’
আমি বললাম, ‘জানি। আমার কথা শোনার জন্যে আপনার উপর প্রেসার তৈরি হল। সেই প্রেসারে স্ট্রোক। আপনার চাকরি আছে না, গেছে?’
‘সাসপেনসনে আছি। চাকরি শেষ পর্যন্ত থাকবে বলে মনে হয় না।’
‘অপরাধী যাদের ধরেছিলেন তারা কি ছাড়া পেয়েছে?’
‘জ্বি না। তারা ছাড়া পায় নাই। তদন্তের ফলাফল এমন যে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে।’
অনেকক্ষণ পর ওসি সাহেবের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল ।
‘হিমু সাহেব!’
‘জ্বি।’
‘আমি তো মরতে বসেছি কিন্তু আছি সুখে। অনেকদিন পর প্রথম বুঝলাম যে আমি মানুষ। এত ভাল লাগল। চাকরি চলে গেলে চলে যাবে— ভিক্ষা করব।’
‘পা নষ্ট ভিক্ষা করার জন্যে ঘোড়া কিনতে হবে। ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা।’
ওসি সাহেব শব্দ করে হেসেই হাসি গিলে ফেললেন। হার্টের রোগীদের জেনারেল ওয়ার্ড শব্দ করে হাসির জায়গা না। অন্য রোগীরা অবাক হয়ে আমাদের দেখছে।
‘হিমু সাহেব!’
‘জ্বি।’
‘খুব ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল। মায়ের চেহারা-টেহারা কিছুই মনে নেই। গতকাল রাতেই মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বললেন, খোকন, তোর উপর আমি খুশি হয়েছি। তোর পা ঠিক হয়ে যাবে, পা নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না।’
‘নানান ধরনের অপরাধ আপনি করতেন। অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হওয়ায় এই স্বপ্ন দেখছেন।’
‘আপনার যা ইচ্ছা আপনি বলতে পারেন। ঘটনা যে কি তা আমি জানি।’
‘ভাবী কোথায়?’
‘ও বেবী এক্সপেক্ট করছে তো। এডভান্সড ষ্টেজ। প্রতিদিন আসতে পারে না।’
‘ভাবী বেবী এক্সপেক্ট করছেন না-কি? উনাকে দেখে কিছু বোঝা যায়নি।’
‘খুব সবধানে নিজেকে আড়াল করে রাখে বলে কিছু বোঝা যায় না।’

এটাই কি উনার প্রথম সন্তান?’

‘এর আগে তিনটা সন্তান হয়েছে। তিনটা সন্তানই মৃত অবস্থায় হয়েছে। তবে এবারেরটা বাঁচবে। কি হিমু সাহেব, আপনি বলেন দেখি বাঁচবে না?’

‘হ্যাঁ বাঁচবে।’

‘আমি ঠিক করে রেখেছি ছেলে হলে নাম রাখব হিমু।’

‘আপনার মেয়ে হবে।’

‘মেয়ে হলে তার নাম হিমি।’

ওসি সাহেব আবারো শব্দ করে হাসলেন। এবার আর হাসি গিলে ফেললেন না। অন্যান্য বেডের রোগীরা উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। কেউ রাগ করছে না।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, ‘ওসি সাহেব কার্ডটা রাখুন।’

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কিসের কার্ড?’

‘বিয়ে করছি। বিয়ের কার্ড। আপনি অসুস্থ মানুষ যেতে পারবেন বলে মনে হয় না।’

‘আপনি বিয়ে করবেন আর আমি যাব না, তা কি করে হয়। আমি এম্বুলেন্সে করে হলেও আপনার বিয়েতে যাব।’

সারাদিন আমি বিয়ের কার্ড দিয়ে বেড়ালাম। কেউ বাদ পড়ল না। ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়াও একটা কার্ড পেল। আমি বললাম, ‘ভিক্ষুক সাহেব মনে করে যাবেন কিন্তু। কাপড় চোপড় যা আছে তাতেই চলবে শুধু পাথরটা সঙ্গে নেবেন না। ডুপ্লিকেট হয়ে গেলে অসুবিধা আছে।’

মেছকান্দর বিড় বিড় করে বলল, ‘কি কন কিছুই বুঝি না।’

‘আমি বিয়ে করছি বিয়ের দাওয়াত।’

‘সাব আপনে বড় ত্যক্ত করেন।’

‘আচ্ছা যাও আর তাক্ত করব না। ভাল কথা তোমার পাথর কিন্তু এখনো কিনতে পারি। লাস্ট প্রাইস কুড়ি হাজার টাকা।’

‘পাথর বেচুম না।’

বিয়ের দাওয়াত সবাইকে দিলাম শুধু ইয়াকুব সাহেবকে পাওয়া গেল না। তাঁর খোঁজে গিয়ে শুনলাম পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে তিনি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছেন। বাড়িওয়ালা বের হয়ে আমার সঙ্গে খুব হম্বিতম্বি করতে লাগল, ‘আপনি যদি তার রিলেটিভ হন তাহলে খবর আছে। আপনার গলায় গামছা বেঁধে আমি টাকা আদায় করব।’

আমি বিনীতভাবে বললাম, ‘আমিও আপনার মতই পাওনাদার। আজ আমাকে টাকা দেবার কথা।’

‘আপনার কত টাকা গেছে?’

‘প্রায় দশ হাজার।’

‘কি রকম হারামজাদা লোক আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মধুর ব্যবহার। যেদিন চলে যাবে সেদিনও আমাকে বাসায় ডেকে এনে চা খাইয়েছে। বাসার প্রতিটা জিনিস এর মধ্যে সরিয়ে ফেলেছে। কিছু বুঝতে পারি নাই। একটা ডাবল খাট ছিল সেই খাটও নাই।’

‘বলেন কি?’

‘এত বড় খাট কি করে সরাল সেটাই আমার মাথায় আসে না।’

‘এডভান্স না রেখে বাড়ি ভাড়া দেয়া ঠিক হয় নাই।’

‘অতি সত্য কথা বলেছেন। কথা দিয়ে তুলিয়ে ফেলেছে। আমার স্ত্রী এখন আমাকে নিয়ে হাসাহসি করে।’

‘হাসাহাসি করারই কথা।’

‘বাড়িওয়ালা আমাকে ছাড়লেন না। চা বিসকিট খাওয়ালেন। দেশ যে মানুষের বদলে অমানুষে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছে ছাড়া পেলাম। বাকি রইল শুধু রূপা। রূপার কাছে যেতে ভয় ভয় করছে। সে কি বলবে কে জানে।

রূপা কার্ড হাতে নিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, ‘কার্ডটা খুব সুন্দর। তুমি কিনেছ?’

‘না! আমার খালা কিনেছেন।’

‘ধবধবে সাদা কার্ডে রূপালী লেখা। জোছনা জোছনা ভাব। তোমার বিয়েও তো দেখি পূর্ণিমা রাতে।’

‘ঐ দিন পূর্ণিমা?’

‘আজকাল জোছনার হিসাব রাখ না?’

‘না।’

‘আমি রাখি। তোমার বিয়ে পূর্ণিমার রাতেই হচ্ছে।’

‘একসেলেন্ট। রূপা তুমি বিয়েতে যাচ্ছ তো?’

রূপা আবারো হাসল। এমনিতে সে খুব কম হাসে। ছোটবেলায় কেউ বোধহয় তাকে বলেছিল— তাকে বিষন্ন অবস্থায় দেখতে ভাল লাগে। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকে গেছে। সে সারাক্ষণ বিষন্ন থাকে। আজ হাসছে। এর মধ্যে তিনবার হাসল।

‘হাসছ কেন রূপা?’

‘তুমি বদলে যাচ্ছ—এই জন্যে হাসছি। মানুষকে তুমি আগে ধোঁকা দিতে না। এখন দিচ্ছ।’

‘কাকে ধোঁকা দিচ্ছি?’

‘তামান্না নামের মেয়েটাকে দিচ্ছ। বিয়ের রাতে সবাই উপস্থিত হবে। তুমি হবে না। তুমি জোছনা দেখতে জঙ্গলে চলে যাবে। মেয়েটার কি হবে ভেবেছ কখনো?’

‘এমন যদি আমি করি তামান্নার কিছুই হবে না। তামান্নার জন্যে একজন ষ্ট্যান্ডবাই বর আছে। ফাতেমা খালার ম্যানেজার বুলবুল সাহেব। তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। বাকি জীবন দুজনে সুখেই কাটাবে।’

‘ওরা দুজন বিয়ে করবে ভাল কথা— মাঝখানে তুমি জড়ালে কেন?’

‘আমি না জড়ালে বিয়েটা হত না।’

‘তোমার সমস্যা কি জান হিমু, তোমার সমস্যা হল নিজেকে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে কর।’

‘সেটা কি দোষের? সামান্য যে বালিকণা সেও নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।’

‘বালির কণা এই কথা তোমাকে বলে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

রূপা আবারো হাসল। এই নিয়ে সে হাসল চারবার। পঞ্চমবার হাসলেই ম্যাজিক নাম্বার পূর্ণ হবে। তখন আমাকে উঠে পড়তে হবে।

‘রূপা!’

‘বল শুনছি।’

‘অনেকদিন জোছনা দেখা হয় না। গাজীপুরের জঙ্গলে আমার সঙ্গে জোছনা দেখবে?’

‘রূপা পঞ্চমবারের মত হেসে উঠে বলল, না।’

১৪

ব্যাঙাচি বলল, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

আমি বললাম, ‘গাজীপুরের শালবনে। জোছনা দেখব। জঙ্গলের জোছনা তুলনাহীন। একবার ঠিকমত দেখলে জোছনা মাথার ভেতর ঢুকে যায়। জীবনটা অন্য রকম হয়ে যায়।’

‘আজ না তোর বিয়ে? আমি গিফট কিনে রেখেছি। তোর ভাবী পার্লার থেকে চুল বাঁধিয়ে এনেছে।’

‘বিয়ে ভেঙ্গে গেছে।’

‘সেকি?’

ব্যাঙাচি অসম্ভব মন খারাপ করল। সে মমতামাখা গলায় বলল, ‘তোর ভাগ্যটা এত খারাপ কেন দোস্ত!’

‘জানি না।’

‘এই দেখ তোর জন্যে আমার চোখে পানি এসে গেছে।’

‘আমার সঙ্গে জোছনা দেখতে জঙ্গলে যাবি?’

‘অবশ্যই যাব। তুই যেখানে যেতে বলবি সেখানে যাব। তুই যদি নর্দমায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে বলিস তাই করব।’

‘বিয়ে বাড়ির চমৎকার খাওয়া মিস করবি মন খারাপ লাগছে না?’

‘না দোস্ত লাগছে না। মন খারাপ লাগছে তোর জন্যে। তোর ভাগ্য দেখি আমার চেয়েও খারাপ।’

জোছনা দেখতে রওনা হবার আগে তামান্নার সঙ্গে কথা বললাম। কমিউনিটি সেন্টারে টেলিফোনে খুব সহজেই তাকে ধরা গেল। সে টেলিফোন তুলে প্রথম যে কথাটা বলল, তা হচ্ছে— ‘আপনি আসছেন না, তাই না?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ। তুমি যা চেয়েছিলে তাই হচ্ছে।’

তামান্না বলল, শুনুন, ‘আমি মত বদলেছি। আপনি আসুন। আপনাকে আগে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। প্লীজ আপনি আসুন।’

‘ম্যানেজার বুলবুল সাহেব আছেন। তিনি তোমাকে খুবই পছন্দ করেন। তোমার বিয়ে হবে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে।’

‘আপনাকে কে বলল?’

‘আমাকে কেউ বলেনি। তবে ম্যানেজার সাহেব ইচ্ছা পূরণ পাথরে হাত রেখে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাথর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে।’

‘প্লীজ আপনি আমাকে রূপকথা শুনবেন না। পৃথিবীটা রূপকথা নয়।’

‘কে বলল পৃথিবী রূপকথা নয়?’
‘আপনি আসবেন না?’
‘না। আজ আমার জোছনা দেখার নিমন্ত্রণ।’
‘হিমু সাহেব শুনুন...।’
আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

গাজীপুরের জঙ্গলে ঢোকার মুখে দেখি একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি নষ্ট। স্টার্ট নিচ্ছে না। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং দুটা বড় বড় মেয়ে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন। হাত উচিয়ে হাইওয়ের গাড়ি থামাতে চাইছেন। কোন গাড়ি থামছে না। বাংলাদেশের হাইওয়ের নিয়ম-কানুন পাল্টে গেছে। হাইওয়েতে গাড়ি চালাবার প্রথম নিয়ম হচ্ছে কোন বিপদগ্রস্ত পথে দেখলে গাড়ি থামাবে না। গাড়ি থামালেই বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে হবে। তোমার দেরি হয়ে যাবে। তুমি নিজেও বিপদে পড়তে পার। কি দরকার।

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ব্যাঙাচির বিশাল শরীর দেখে মেয়ে দুটি ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘আপনাদের সমস্যা কি? গাড়ি ষ্টার্ট নিচ্ছে না?’

ভদ্রলোক বললেন, ‘না।’

আমি বললাম, ‘আমার এই বন্ধু অটোমোবাইল ইনঞ্জিনিয়ার। গাড়ির বনেট খুলুন ও দেখুক।’

ভদ্রলোক অনিচ্ছার সঙ্গে গাড়ির বনেট খুললেন। ব্যাঙাচি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা। মেয়ে দুটি আনন্দে চেঁচাচ্ছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, ‘ভাই, আমরা দু ঘন্টা ধরে জঙ্গলে পড়ে আছি। কি করে যে আপনাদের ঋণ শোধ করব।’

আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। গম্ভীর গলায় বললাম, ‘স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?’

ভদ্রলোক বিস্মিত গলায় বললেন, ‘জ্বি না।’

‘আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি খুব উঁচু পদের একজন মিলিটারী অফিসার না?’

‘আমি সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।’

‘অনেককাল আগে আপনি আমাকে একটা লিফট দিয়েছিলেন। এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?’

‘ও আচ্ছা হ্যাঁ, মনে পড়েছে।’

‘আমি সেই ব্যক্তি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আবার যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয়েছে।’

‘আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?’

‘জানতে পারেন। কিন্তু নাম জানার দরকার আছে কি? আমি আপনার নাম জানি না। আপনিও আমারটা জানেন না। আমরা না হয় আমাদের নাম নাই জানলাম। রাত অনেক হয়ে গেছে। আপনারা রওনা হয়ে যান।’

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে শালবনে ঢুকলাম। দুজনে এগুচ্ছি – ক্রমেই ঘন বনে ঢুকে

যাচ্ছি। ব্যাঙাচিকে বললাম, 'কি রে ভয় লাগছে?'

ব্যাঙাচি বলল, 'একটু লাগছে।'

'ক্ষিধে লাগছে?'

'আজ তুই জোছনা খেয়ে পেট ভরাবি।'

'জোছনা কি করে খাব?'

'ভাত মাছ যেভাবে খায় সেভাবে খাবি। হা করবি, মুখে চাঁদের আলো পড়বে। সেই আলো কোৎ করে গিলে ফেলবি। তারপর দেখবি আর কোনদিন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে না। তোর ক্ষিধে রোগ সেরে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

বনভূমিতে মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। জায়গাটা চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে এমন আলো দেখিনি। ব্যাঙাচির দিকে তাকালাম। সে চাঁদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর পর মুখ বন্ধ করে জোছনা খাবার ভঙ্গি করছে। ব্যাঙাচি এক ধরনের খেলা খেলছে কিন্তু - সে জানে না এই খেলা তার রক্তে ঢুকে যাচ্ছে। বাকি জীবনে সে আর এই খেলা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

ব্যাঙাচি হঠাৎ অবাক গলায় বলল, 'হিমু। কি ব্যাপার বল তো? আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ দেখি ধপ করে চাঁদটা অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। হচ্ছেটা কি?'

আমি কিছু বললাম না। শুধু যে চাঁদ নিচে নেমে আসছে তানা। আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটাও বড় হতে শুরু করেছে। একসময় তা বিশাল এক খোলা প্রান্তর হয়ে যাবে। সেখানে থৈ থৈ করবে অবাক জোছনা । চাঁদ নেমে আসবে হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই চাঁদ স্পর্শ করা যাবে। আমি অপেক্ষা করে আছি।

(সমাপ্ত)

একটি শুভম ক্রিয়েশন

একজন হিমু কয়েকটি ঝিঝিপোকা

হুমায়ূন আহমেদ

SUVOM
একজন
কয়েকটি
ঝিঁ ঝিঁ
হুমায়ূন

ভূমিকা

হিমু কখনো জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে না। ছোটখাট ঝামেলায় সে পড়ে। সেই সব ঝামেলা তাকে স্পর্শও করে না। সে অনেকটা হাসের মত। ঝাড়া দিল গা থেকে ঝামেলা পানির মত ঝরে পড়ল।
আমার খুব দেখার শখ বড় রকমের ঝামেলায় পড়লে সে কী করে। কাজেই হিমুর জন্যে বড় ধরনের একটা সমস্যা আমি তৈরি করেছি। এবং খুব আগ্রহ নিয়ে তার কাণ্ড-কারখানা দেখছি।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশপল্লী, গাজীপুর।

১

আমার চেহারায় খুব সম্ভবত ‘I am at your Service’ জাতীয় ব্যাপার আছে । আমি লক্ষ করেছি প্রায় সব বয়েসী মেয়েরা আমাকে দেখলেই টুকটাক কিছু কাজ করিয়ে নেয়। তার জন্যে সামান্য অস্বস্তিও বোধ করে না ।

নিতান্ত অপরিচিত মহিলা নির্বিকার ভঙ্গিতে আমাকে বলবে—এই ছেলে, এই হলুদ পাঞ্জাবি, একটা রিকশা খুঁজে দাও তো। রিকশা না পেলে বেবিটেক্সি। মালীবাগ যাব। ভাড়া ঠিক করে এনো।

এই ধরনের কাজ আমি আগ্রহের সঙ্গে করি দরদাম করে রিকশা ঠিক করি, জিনিসপত্র তুলে দেই । খট করে রিকশার হুড তুলি। এবং শেষপর্যায়ে প্রিয়জনদের উপদেশ দেবার মতো সামান্য উপদেশ দেই– ‘শাড়ি টেনে বসুন। চাকার সঙ্গে পেঁচিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ এইবার হয়েছে।’

শেষ উপদেশ রিকশাওয়ালাকে, রিকশা দেখেশুনে যাবে। No ঝাঁকুনি।

যার জন্যে এই কাজগুলি করা হয় তিনি খুব স্বাভাবিক থাকেন। আমার কর্মকাণ্ডে মোটেই বিস্মিত হন না। তিনি ধরেই নেন নিতান্ত অপরিচিত একজনের কাছ থেকে পাওয়া এই সেবা তার প্রাপ্য। রিকশা চলতে শুরু করলে আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি কেউ কেউ দেন। বেশিরভাগই দেন না। উদাস হয়ে থাকেন।

রহস্যটা অবশ্যই চেহারায় । কারোর চেহারাই থাকে মিথ্যুকের মত । তারা

নির্ভেজাল সত্যি কথা বললেও সবাই হাসে এবং মনে মনে বলে— ‘মায়ের কাছে খালাম্মার গল্প ? মিথ্যার ব্যবসা আর কত করবে ? এইবার ক্ষান্ত দাও না ।’

আবার কারোর চেহারা হয় 'সত্যকে’র মত। যত বড় মিথ্যাই বলে মনে হয় সত্যি কথা বলছে।

কিছু চেহারা আছে চোর টাইপ। বেচারা হয়ত সাধু সন্ত মানুষ। স্কুলের অংক স্যার। শুধু চেহারার কারণে বাসে উঠলে বাসের অন্য যাত্রীরা চট করে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ ঠিক আছে কি-না দেখে নেয়।

কসমেটিক সার্জারিতে চেহারা অদল-বদল করা হয় বলে শুনেছি। কসমেটিক সার্জনরা কি জানেন- মানুষের মুখের বিশেষ কোন জিনিসটির জন্যে সত্য ভাব, মিথ্যা ভাব, সাধু ভাব, চোর ভাব প্রকাশ পায় ? জানা থাকলে খুব সুবিধা হত। চোর চেহারার মানুষ ছোট্ট একটা অপারেশন করিয়ে সাধু হয়ে যেত।

এ ধরনের উচ্চশ্রেণীর চিন্তা আমি করছি ইস্টার্ন প্লাজা নামক এক বিশাল শপিং মলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। শপিং মলে ঢুকব কি-না ভাবছি। চলন্ত সিঁড়ি আছে। বিনা পয়সায় রেলগাড়ি চড়ার মত সিঁড়িগাড়ি চড়া। আগে মানুষ হাঁটতো সিঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। এখন সিঁড়ি হাঁটে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে।

'Excuse me'—

অল্পবয়েসী মেয়ের ঝনঝনে গলা নিশ্চয়ই সে আমাকে কিছু করতে বলবে ।

আমি ঘাড় ফেরালাম কে আমাকে ক্ষমা করতে বলছে তাকে দেখা দরকার ।

ক্ষমাপ্রার্থী এই তরুণীর বয়স বাইশ তেইশ। সাজগোজ একেবারেই নেই। সাজগোজ না-করে ক্যাজুয়েল থাকাটা বর্তমানের ফ্যাশান। অনেককে দেখছি চুল-ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটছে। কানে বিচিত্র ধরনের দুল পড়ছে।

মাটির দুলঃ শান্তিনিকেতনী। শ্বাশত বাংলার মাটির গয়না উঠে এসেছে কানে।
'ও আমার দেশের মাটি......'

কাঠের দুলঃ জাপানী বাবাজীরা বাঁশ, কাঠ কিছুই ফেলছে না। রং চং মাখিয়ে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে।

প্লাস্টিকের দুলঃ ইউরোপীয়। প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগের পর প্লাস্টিক যুগ।

লোহা লক্করের দুলঃ অবশ্যই আমেরিকান। আমেরিকানরা অন্য সবার মত করবে
না। আলাদা কিছু করবে। কাজেই তারা বানাচ্ছে এক কানের দুল। একটা কান দুলের ভারে ছিড়ে পড়ে যাচ্ছে। অন্য কান খালি ।

কিছু কিছু দুল এমনই বিচিত্র যে মেয়ের মুখের দিকে তাকানো হয় না। দুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সময় চলে যায়। আমার এক মামাতো বোন (রেশমী, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার ফলিত রসায়ন।) কানে যে দুল পরে তা ফুলের টবের মতো। সেই টবে সবুজ পাতাওয়ালা গাছ আছে। একটা গাছে আবার পিচকি পিচকি নীল ফুল ফুটে আছে। আমি বললাম, রেশমী তোর এই টবে কি নিয়মিত পানি দিতে হয়? রেশমী বিরক্ত হয়ে বলল, পানি দিতে হবে কেন ? এটা রিয়েল প্ল্যান্ট না, ইমিটেশন ।

যে মেয়েটি মধুক্ষরা কণ্ঠে excuse me বলেছে তার কানে কোনো দুল নেই। সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরে বোধ হয় অভ্যাস নেই। নানান জায়গায় সেফটিপিন দেখা যাচ্ছে। গোলগাল মুখ । চোখে চশমা। চশমার ফ্রেম রুপালি । আমার মনে হল—রুপালি না হয়ে সোনালি ফ্রেমের চশমা হলে খুব মানাত। এই মেয়ের মুখ তৈরিই হয়েছে সোনালি ফ্রেমের জন্যে ।

'আপনি কি আমার একটা উপকার করতে পারবেন ?'

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, অবশ্যই পারব। একটা না, দুটা উপকার করব।

একটা নরম্যাল উপকার। আরেকটা ফাউ।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফেলল। এই সময়ের মেয়েদের চরিত্রে দ্বৈত ভাব অত্যন্ত প্রবল। তারা পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দেবার সময় বলবে— যে সব পুরুষের রসবোধ আছে, যারা কথায় কথায় রসিকতা করে তাদেরকেই তারা পছন্দ করে। সেইসব পুরুষ তাদের স্বপ্নের পুরুষ। বাস্তবে কোনো ছেলে রসিকতা করে কোনো মেয়েকে কিছু বললে সেই মেয়ে ভুরু কুঁচকাবেই। রসিকতা যত নির্মলই হোক, সেই মেয়ে রসিকতায় কলঙ্ক খুঁজে পাবে এবং মনে মনে বলবে— গোপাল ভাঁড় কোথাকার। সব সময় ফাজলামী।

মেয়েটি বলল, আমি অনেকক্ষণ হল রাস্তা ক্রস করার চেষ্টা করছি, পারছি না। অন্যদিন ট্রাফিক পুলিশ থাকে। আজ ট্রাফিক পুলিশও নেই। আপনি কি রাস্তা ক্রস করার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

আমি 'দেখি কী করা যায়' বলেই ঝাঁপ দিয়ে দু'হাত উচু করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেলাম। সেইসঙ্গে বিকট চিৎকার— ট্রাফিক বন্ধ, ট্রাফিক বন্ধ। চাক্কা ঘুরবে না।'

নিমিষের মধ্যে ব্রেক কষে সব গাড়ি থেমে গেল। রিকশাওয়ালারা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির ড্রাইভাররা মুখ বের করে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে দেখতে চেষ্টা করল কী হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে টোকাইরা খুব মজা পায় । তারাও লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। এবং আমার মতোই হাত উঁচু করে গাড়ি আটকাতে লাগল। একজন অতি উৎসাহী ছুটে গিয়ে পর পর দুটা রিকশার 'পাম' ছেড়ে দিল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলাম রাস্তা পার হতে। সে রাস্তা পার হল।

ইতিমধ্যে রাস্তায় জট পাকিয়ে গেছে। একটা গাড়ির ড্রাইভার ভয় পেয়ে গাড়ি উল্টোদিকে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে পুরোপুরি গিট্টু পাকিয়ে ফেলেছে। এই গিট্টু আপনা-আপনি খুলবে না। গিট্টু খুলতে এক্সপার্ট ট্রাফিক সার্জেন্ট লাগবে। সে এসে বেশ কিছু রিকশাওয়ালাকে মারধোর করবে - তারপর যদি কিছু হয়।

আমি তরুণীকে বললাম, আর কোনো সাহায্য লাগবে ? আমি ধরেই নিয়েছিলাম মেয়েটি না-সূচক মাথা নাড়বে। সামান্য রাস্তা পার করাতে যে এত যন্ত্রণা করে তার ওপর ভরসা করা যায় না।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আরেকটু ফাউ সাহায্য করতে পারেন। আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারেন। একটা লোক আমাকে ফলো করছে । আমার ভালো লাগছে না।

'কে ফলো করছে ?'

'গলায় হলুদ মাফলারওয়ালা একটা লোক। আমি যখন ইস্টার্ন প্লাজায় ছিলাম তখনো আমার পেছনে পেছনে ঘুরেছে। এখনো দেখি পেছনে পেছনে আসছে।'

'প্যাচ লাগিয়ে দেব ?'

'প্যাচ লাগাতে হবে না। দয়া করে আমার পেছনে পেছনে এলেই হবে।'

আমি নিতান্ত অনুগতের মতো তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মেয়েটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'ভালো কথা আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কেন?'

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, চিনতে পারার কথা ?

'অবশ্যই। আমি সীমার বান্ধবী ।'

'সীমাটা কে ?'

'সীমাটা কে মানে ? সীমা আপনার মামাতো বোন। গত মাসে বিয়ে করেছে।

কোর্টে গিয়ে গোপন বিয়ে। আপনি সেই বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন।

'ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তুমিও ছিলে সেই বিয়েতে ?'

'হ্যাঁ ছিলাম। এবং আপনি সেদিন আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'সেদিন আমি সোনালি ফ্রেমের চশমা পরেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, রুপালি ফ্রেমের চশমা হলে আমাকে খুব মানাত। আমার মুখটা না-কি তৈরিই হয়েছে রুপালি ফ্রেমের জন্যে । আমি আপনার কথামতো রুপালি ফ্রেম কিনেছি।'

'ও আচ্ছা।'

''আপনি আমাকে না চিনেই লাফালাফি করে গাড়ি থামালেন। আশ্চর্য তো। অন্য কোনো মেয়ে যদি আপনাকে রাস্তা পার করাতে বলত আপনি কি এরকম লাফালাফি করতেন ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় করতেন। আমার নাম কি আপনার মনে আছে ?'

'অবশ্যই মনে আছে। তবে মনে থাকলেও মন থেকে টেনে মুখে আনতে একটু সমস্যা হচ্ছে। ফুলের নামে নাম । হয়েছে ?'

'বলুন কী ফুল ?'

'প্রচুর গন্ধ আছে এমন একটা ফুল । রাতে ফোটে। মনে পড়েছে তোমার নাম জুঁই।'

'কিছুই হয়নি। আমার নাম আঁখি।'

'ও আচ্ছা, আঁখি।'

মেয়েটি তার গাড়ি খুঁজে পেয়েছে। কালো রঙের বিশাল এক গাড়ি। গাড়ির মতো গাড়ির ড্রাইভারও বিশাল। ড্রাইভার সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখে ভালো লাগল। মানুষের সন্দেহের দৃষ্টিতে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে কেউ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে ধাক্কার মতো লাগে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় সব ঠিক আছে।

আঁখি বরফ শীতল গলায় বলল, গাড়িতে উঠুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমাকে গাড়িতে উঠতে বলছ !

'হ্যাঁ।'

'কেন বলো তো ?'

'আগে গাড়িতে উঠুন। তারপর বলছি।'

আমি গাড়িতে উঠে পড়লাম। আঁখি বলল, সহজে আমার মন খারাপ হয় না। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এইজন্যে মন খারাপ লাগছে। যে মেয়ে আপনার সামান্য কথায় চশমার ফ্রেম বদলে ফেলে আপনি তাকে চিনবেন না, এটা কেমন কথা ?

বিশালদেহী ড্রাইভার গাড়ির ব্যাক ভিউ মিরার নাড়াল। আমি এখন সেই আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখতে পাচ্ছি। কাজেই সেও নিশ্চয়ই আমাকে দেখছে। ড্রাইভার কাজটা করেছে আমাকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

আঁখি বলল, দয়া করে পেছনে ফিরে দেখুন তো লাল রঙের কোনো গাড়ি আমাদের ফলো করছে কি-না।

আমি বললাম, না।

'এখন না করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন ঐ গাড়ি আমাদের পেছনে চলে এসেছে। জানা কথা আসবে।'

আমি পেছন দিকে তাকিয়ে আছি। আঁখি বলল, এই ভাবে পেছন দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে না। গাড়ি আসুক পেছনে-পেছনে। আপনি সোজা হয়ে বসুন।

আমি সোজা হয়ে বসলাম ।

'আমার সঙ্গে গাড়িতে যেতে আপনার কি অস্বস্তি লাগছে ?'

'না।'

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন, গল্প করুন।'

'গল্প তো জানি না।'

'কথা বলুন।'

'কথাও জানি না ।'

'আমার বান্ধবীর বিয়ের দিন মজার মজার কথা বলছিলেন । আমি এমন সমস্যায় পড়েছিলাম, হাসতেও পারছিলাম না। আবার না-হেসেও থাকতে পারছিলাম না।'

'হাসতে পারছিলে না কেন ?'

'শীতের সময় তো, এইজন্যে হাসতে পারিনি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, শীতের সময় হাসা যায় না ?

আঁখি বলল, অন্য সবাই হাসতে পারে। আমি পারি না। আমার গায়ের চামড়া খুব খারাপ। শীতের সময় ঠোঁট ফাটে। ঠোট ফাটা অবস্থায় হাসার চেষ্টা করে দেখবেন তাহলে আমার সমস্যাটা বুঝবেন।

'তোমার উচিত এমন কোনো ছেলেকে বিয়ে করা যে কখনো তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করবে না। রামগরুড় ছানা টাইপ ।'

'আঁখি হেসে ফেলল।'

আমি মাথা ঘুরিয়ে আঁখির দিকে তাকালাম। মেয়েটার হাসি ভালো করে লক্ষ করতে হবে। হাসি নিয়ে আমার বাবার উপদেশবাণী আছে।

> হাস্যমুখি মানুষের দিকে ভালোমতো তাকাইও । অনেক কিছু শিখিতে পারিবে।
>
> মানুষের মনের ভাব কখনই মুখে প্রতিফলিত হয় না। মুখের উপর সর্বদা পর্দা
> থাকে। শুধু মানুষ যখন হাসে তখন পর্দা দূরিভূত হয়। হাস্যরত একজন
> মানুষের মুখে তার মনের ছায়া দেখা যায়।

আঁখি ভুরু কুঁচকে বলল, আপনি এ ভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ?

'তোমার হাসি দেখছি।'

'আমি তো ভালোমতো হাসিনি। হাসি দেখবেন কী ? ঐ দিনের মত মজার মজার কথা বলুন। আমি খিলখিল করে হাসব। আপনি ভালোমতো হাসি দেখতে পাবেন । ইচ্ছা করলে আমার হাসি ক্যাসেটে রেকর্ড করেও নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা শুনুন আপনার একটা হাসির গল্প আমি অনেকের সঙ্গে করেছি। কাউকে হাসাতে পারিনি। মনে হয় আপনি যেভাবে গল্পটা করেছেন আমি সেভাবে করতে পারিনি। কাইন্ডলি গল্পটা আরেকবার বলুন তো।'

'কোন গল্পটা ?'

'ঐ যে একজনকে জিজ্ঞেস করল তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ? সে বলল ক্লাস এইট, সেকেন্ড ইয়ার। তখন প্রশ্নকর্তা বলল, ক্লাস এইট, সেকেন্ড ইয়ার মানে কী ? সে বলল, ক্লাস এইটে এক বছর ফেল করেছি। এইজন্যে সেকেণ্ড ইয়ার।'

আঁখি গল্প শেষ করে মহানন্দে হাসতে লাগল। হাস্যমুখী মানুষের মুখ থেকে পর্দা সরে যাবার কথা। মেয়েটির মুখ থেকে পর্দা সরছে না। আমি তার মুখে মনের কোনো ছায়া দেখতে পারছি না। বরং মনে হচ্ছে নিজেকে সে খুব ভালভাবে আড়াল করে রেখেছে।

গাড়ি আলিয়াস ফ্রাসিসে থামল। আঁখি বলল, আমি এইখানে নামব। ফটোগ্রাফির উপর একটা কোর্স নিচ্ছি। আপনি কোথায় যেতে চান ড্রাইভারকে বললেই সে নিয়ে যাবে। আর আপনি যদি আমার সঙ্গে কফি খেতে চান তাহলে ঘন্টাখানিক গাড়িতে বসে থাকতে হবে। ক্লাস শেষ করে এক ঘন্টার মধ্যে ফিরব। আমার বান্ধবীর বিয়ের দিন আপনাকে আমার সঙ্গে কফি খেতে বলেছিলাম। আপনি বলেছিলেন কোনো একদিন খাবেন। আমি বলেছিলাম, কোনো একদিনটা কবে ? আপনি বলেছিলেন আবার যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে সেদিনই হবে— কোনো একদিন ।

'তুমি ফটোগ্রাফি শিখে এসো। আমি অপেক্ষা করি।'

'আপনি গাড়িতে বসে গান শুনতে পারেন। গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে ভিডিও গেম আছে। ইচ্ছা করলে ভিডিও গেম খেলতে পারেন।'

'দেখি কী করা যায় ।'

আমি গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক হাঁটলাম । গাড়ির ড্রাইভার তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার প্রতি তাঁর সন্দেহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। আমি রাস্তা পার হলাম। চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে। চা খেতে-খেতে চাওয়ালার সঙ্গে গল্প করলেও কিছু সময় কাটবে। আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে চায়ের দোকানটা এমন জায়গায় যে আঁখির ড্রাইভার গাড়িতে বসে আমাকে দেখতে পাবে না।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটি দিয়েছি, দ্বিতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময় আমার কাঁধে কে যেন হাত রাখল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি হলুদ মাফলার গলায় এক লোক। তার সামান্য গোঁফ আছে। হিটলার সাহেবের বাটার ফ্লাই গোঁফ । যা হিটলার ছাড়া আর কাউকেই মানায় না।

রাস্তার পাশে লাল রঙের একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও আরো দু'জন বসে আছে। তারাও কঠিন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

গলায় মাফলারওয়ালা বলল, আপনি কি একটু আসবেন ?

আমি হাসিমুখে বললাম, চা খাচ্ছি তো ।

'আচ্ছা ঠিক আছে। চা-টা দ্রুত শেষ করুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

আমি বললাম, আপনিও এক কাপ খান। আমি দাম দিচ্ছি। মাফলার ওয়ালা এমন ভাবে তাকাল যেন এমন অদ্ভুত নিমন্ত্রণ এর আগে সে পায়নি। আমি বললাম, আমাকে আপনার দরকারটা কী জন্যে ? মাফলারওয়ালা জবাব দিল না। লালগাড়ির ভেতর যে দু'জন বসেছিল তাদের একজন নেমে এল। রোদে পোড়া চেহারা। তার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। দাঁত লাল হয়ে আছে।

আমি ধীরে-সুস্থে চা খাচ্ছি। চা-টা খেতে ভাল হয়েছে। আরেক কাপ খেতে পারলে ভাল হত। মাফলারওয়ালা সেই সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না। আমি

মাফলারওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কি জানতে পারি ?

মাফলারওয়ালা বলল, আপনার ভয়ের কিছু নেই আমরা পুলিশের লোক। আই বি-র ।

পুলিশের লোক শুনে আমি আস্বস্তবোধ করছি, এমনভাব করে বললাম, আমি ভয়ংকর কেউ এরকম কোনো রিপোর্ট কি আপনাদের কাছে আছে ?

মাফলারওয়ালা জবাব দিল না। আমি বললাম, আমার নাম কি আপনারা জানেন ?

'জানি না।'

'আমি কি কোনো অপরাধ করেছি যে বিষয়ে আমি নিজে কিছু জানি না ?'

'আপনার চা খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন উঠুন।'

'দুটা মিনিট সময় দিন। আঁখির ড্রাইভারকে খবর দিয়ে যাই।'

'কাউকে কোনো খবর দিতে হবে না।'

'ও দুঃশ্চিন্তা করবে ।'

মাফলারওয়ালা আমার হাত চেপে ধরল। যাকে বলে বজ্র মুষ্ঠি। আমি সুবোধ বালকের মত তার সঙ্গে লাল গাড়িতে উঠলাম। প্রেমিকার ধরা হাতও ছাড়িয়ে নেয়া যায়। পুলিশেরটা যায় না।

পুলিশের খুব বড় অফিসারদের আমি কাছাকাছি থেকে আগে দেখিনি। আমার দৌড় রাস্তার ট্রাফিক সার্জেন্ট, থানার সেকেন্ড অফিসার বা ওসি সাহেব পর্যন্ত । এই প্রথম পুলিশের একেবারে উপরের দিকের কাউকে দেখছি। কী আশ্চর্য কলেজের সিনিয়ার প্রফেসরদের মত চেহারা। মুখে হাসি। পরেছেন ফিনফিনে পাঞ্জাবি পায়জামা । গলার স্বর মোলায়েম। দেখে মনেই হয় না এই ভদ্রলোক কাউকে জীবনে ধমক ধামক করেছেন কিংবা বুট দিয়ে লাথি মেরেছেন। এই ভদ্রলোকের পা নিশ্চয়ই ছোট ছোট। সেই মাপের বুট তৈরি না হবারই কথা ।

ঘরের সাজ সজ্জাও চমৎকার । কার্পেট বিছানো ঘর। অফিসের কার্পেটের মত নোংরা রঙজ্বলা কার্পেট না । মনে হচ্ছে এই মাসেই কেনা হয়েছে। দেয়ালে আধুনিক দেয়াল ঘড়ি এবং ঘড়ি বন্ধ হয়ে নেই ঠিক টাইম দিচ্ছে। অফিস ঘরের এসিতে সব সময় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। অফিস ঘরের এসি মানেই ব্রংকাইটিসের রুগী। অথচ এই ঘরে আছে শব্দহীন এসি । আমাকে কফি দেয়া হয়েছে। সেই কফির মগে ময়লা জমে নেই এবং কফিটা গরম । খেতে বেশ ভাল ।

'আপনার নাম ?'

'হিমু!'

'ভাল নাম বলুন। ডাকনামটা বাবা-মা এবং বন্ধুবান্ধবের জন্যে তোলা থাকুক।'

'ভাল নাম হিমালয়।'

'কফিটা কি খেতে ভাল হয়েছে ?'

'জ্বি ভাল হয়েছে।'

'ভাল হবার কথা না। আমার কফি বানায় ইদরিস নামের একজন সে আজ আসেনি। কোনো এক দিন হয়তোবা ইদরিসের বানানো কফি আপনাকে খাওয়াতে পারব।'

'স্যার আমাকে কি জন্যে এখানে আনা হয়েছে বললে টেনশানটা কমে ।'

'টেনশান বোধ করছেন ?'

'সত্যি কথা বলব ?'

'পুলিশের সামনে সত্যি কথা বলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তারপরেও সত্য বলতে চাইলে বলুন।'

'টেনশান বোধ করছি না।'

ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিলেন। তার সামনে রাখা টিস্যু বক্সে হাত দিয়ে টিস্যু বের করলেন । মুখ মুছে টিস্যু ফেললেন তার পায়ের কাছে রাখা বেতের ঝুড়িতে। কিছুক্ষণ পর পর টিস্যু দিয়ে মুখ মোছা মনে হয় এই পুলিশ সাহেবের অভ্যাস। আমার সামনেই তিনি তিনবার মুখ মুছলেন।

'আপনি তা হলে টেনশান বোধ করছেন না!'

'জ্বি না।'

'পুলিশ যে কোনো মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালেই সে টেনশান বোধ করে। সেখানে আপনাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তারপরেও টেনশান বোধ করছেন না ?'

'জ্বি না।'

'কারণ কি এই যে আপনার ধারণা আপনি কোনো অপরাধ করেননি কাজেই টেনশান বোধ করার কিছু নেই।'

'এটা কারণ না । আমি টোক গিলতে গিলতে বললাম, পুলিশ যাদের ধরে নিয়ে আসে তাদের বেশ বড় অংশই কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাদেরই টেনশন বেশি।'

'কেন ?'

'কারণ তারা চেষ্টা করে তাদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে । এই চেষ্টা করতে গিয়ে সব কিছু আরো জট পাকিয়ে ফেলে। অপরাধী পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পায় নিরপরাধী সাধারণত পায় না।'

'আপনার কি ধারণা আপনি অপরাধী না নিরপরাধী ?'

'নিরপরাধী।'

'তা হলে তো আপনার ভীত হওয়া উচিত । ভীত হচ্ছেন না কেন ?'

'থানা হাজতে আমার অভ্যাস আছে।'

'বাহ ভাল তো। আপনার কনভিকশান হয়েছে ? না-কি আপনার দৌড় হাজত পর্যন্ত ?'

'এখনো কনভিকশান হয়নি।'

'একটা অভিজ্ঞতা তা হলে বাকি থেকে গেল। এটা কি ঠিক হচ্ছে ?'

ভদ্রলোক হাসি মুখে প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এলেন। এই প্রথম তাকে পুলিশ বলে মনে হচ্ছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'জুঁই নামের কোনো মেয়েকে আপনি চেনেন ?'

'জ্বি না।'

'বড় কালো রঙের গাড়িতে করে যে মেয়েটির সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাকে চেনেন না

?’

‘ওর নাম জুঁই ?

‘হ্যাঁ জুঁই।’

‘জুঁইকে সামান্য চিনি।’

‘তার বাবাকে চেনেন ?’

‘জ্বি-না।'

‘আমি জুই-এর বাবা।'

ভদ্রলোক আবারো মিষ্টি করে হাসলেন । আমিও হাসলাম। হাত বাড়িয়ে টিস্যু পেপার নিয়ে মুখ ঘসলেন । এই কাজটা আমার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাউকে বিরক্ত করার সবচে সহজ পথ হচ্ছে তাকে অনুকরণ করা। সে হাসলে হাসা। সে ভুরু বাঁকালে ভুরু বাঁকানো, সে কাশলে কাশা। ভদ্রলোক থানার সেকেন্ড অফিসার হলে হাত বাড়িয়ে বক্স থেকে টিসুযু পেপার নিয়ে মুখ ঘসতাম। এনার সঙ্গে করা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক চট করে হাসি বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পুলিশের লোকরা এই কাজটা খুব ভাল পারে। এই মেঘ এই রোদ্র। এই চাদের আলো, এই বজ্রপাত ।

'হিমু!'

আমি সামান্য চমকালাম, ভদ্রলোক এতক্ষণ হিমু সাহেব বলছিলেন। এখন সাহেব বাদ পড়েছে। আমি বিনীতভাবে বললাম, ইয়েস স্যার।

'আমার এই মেয়েটাকে নিয়ে আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। সে আমার সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলছে। চার পাচ মাস ধরে সে সবাইকে লুকিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। দুই থেকে তিন ঘন্টা কাটিয়ে সহজ ভাবে ফিরে আসছে। উদাহরণ দেই। সে গাড়ি নিয়ে ইস্টার্ন প্লাজায় যাবে। গাড়ি দূরে কোথাও রেখে ইস্টার্ন প্লাজায় ঢুকবে। তারপর সে উধাও। ঘন্টা দু'এক পর খুব স্বাভাবিক ভাবে বের হবে। এই দুঘন্টা সে কিন্তু শপিং করছিল না। অন্য কোথাও ছিল । এরকম সে প্রায়ই করছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। তুমি কি জান সে কোথায় যায়!'

ব্যারোমিটারের কাটা দ্রুত নামছে। আগে ছিলাম আপনি। এখন হয়েছি তুমি । এই তুমি আন্তরিকতার তুমি না। অন্য তুমি । ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমি মোটামুটি করুণ মুখ করে বললাম, স্যার আমি জানি না।

'তুমি কি জেনে দিতে পারবে ?’

‘আমি জানতে পারব কিন্তু আপনাকে জানাব কি-না তা বলতে পারছি না ।’

ভদ্রলোক আবারো টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু নিলেন। মুখ ঘসতে-ঘসতে বললেন, তুমি জানবে এবং আমাকে জানাবে। তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ। এখন বিদেয় হও । একটা ব্যাপার তোমাকে বলে দিচ্ছি এখন থেকে আমার মেয়ের পেছনে না, তোমার পেছনে আমি লোক লাগিয়ে রাখব। বাঘের পেছনে যেমন ফেউ থাকে। তোমার পেছনেও ফেউ থাকবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বুদ্ধিমান ছেলে । তুমি আমার ভদ্র কথাবার্তা, এবং হাসি মুখ দেখে বিভ্রান্ত হোয়ো না। তুমি কি আমার বাসার ঠিকানা জান ?

'জ্বি না।’

'জুঁই তোমাকে কখনো বাসায় চা খেতে বলেনি ?’

'বলেছে।'

‘তুমি যাওনি ?’

'জ্বি না।'

'এখন যাবে। চা খেতে যাবে। গল্প করতে যাবে। এবং অতি অবশ্যই আসল খবরটা জুঁই-এর কাছ থেকে বের করবে। নাও এই কার্ডটা রাখ। এখানে আমার বাসার ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার আছে।'

'স্যার এক গ্লাস পানি খাব।'

ভদ্রলোক বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকল। পানির কথা বলতে হল না। এটা কি ভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারলাম না। বেল টেপার মধ্যেই কি কোনো সংকেত আছে। এই ধরনের বেল মানে চা, এই টাইপ বেল হল-পানি। আরেক ধরনের বেলের অর্থ সামনে যে বসে আছে তাকে ধরে মার লাগাও ।

'পানি খাব না স্যার ।'

ভদ্রলোক শীতল চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি কাচুমাচু মুখ করে বললাম, পুলিশ অফিসগুলিতে পানি খাওয়া ঠিক না। এদের পানির ট্যাংকে ডেডবডি থাকে। পত্রিকায় পড়েছি।

'আই সি । তা হলে পানি না খাওয়াই ভাল।'

আমি বের হয়ে এলাম এবং মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে জেনে গেলাম আমি শক্ত পাল্লায় পড়েছি। ইনি সহজ পাত্র না।

২

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেউ যদি দেখে তার পাশে এমন একজন লোক বসে আছে যার চেহারা তক্ষকের মত, এবং সে ক্রমাগত মুখ নাড়ছে কিন্তু মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না তখন কী করা উচিত ? লাফ দিয়ে উঠে বসে-"কে কে" বলে চিৎকার করা উচিত, না-কি প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলা উচিত ?

আমি লাফ দিয়ে উঠে না বসে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করলে হয়ত দেখা যাবে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জগতের অতি স্বাভাবিক ঘটনাগুলিও শুধু পরিস্থিতির কারণে অস্বাভাবিক মনে হয়।

যেহেতু আমার ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকে সেহেতু যে কেউ আমার ঘরে ঢুকতে পারে।

লোকটা চেয়ারে না বসে আমার গা ঘেসে বিছানায় বসে আছে। এরও যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। আমার চেয়ারের একটা পা নড়বড়ে। সে হয়ত চেয়ারে বসতে গিয়ে ভরসা না পেয়ে আমার বিছানায় বসেছে।

লোকটার চেহারা তক্ষকের মত। এটা খুবই অস্বাভাবিক ধারণা। তক্ষক সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী । মানুষ হোমোসেপিয়ান- তার চেহারা তক্ষকের মত হতে পারে না। লোকটার চোখ দুটা হয়ত বড় বড় এবং দুটা চোখই অক্ষিগোলক থেকে সামান্য বের হয়ে আছে। এ রকম প্রায়ই দেখা যায়। থাইরয়েড গঠিত সমস্যায় এরকম হয়, চোখ কোটর থেকে খানিকটা বের হয়ে থাকে। ভদ্রলোকেরও তাই হয়েছে। সে কারণেই তাকে হয়তোবা খানিকটা তক্ষক বা টিকটিকির মত লাগছে।

বাকি থাকল মুখ নাড়ানো। মুখ নাড়ছে ঠোট নাড়ছে, শব্দ হচ্ছে না। অনেক সময়ই মানুষের মুখ নড়ে, ঠোঁট নড়ে, শব্দ হয় না। যেমন পান খাবার সময়, চুইং গাম চিবানোর সময় । লোকটা নিশ্চয়ই পান খাচ্ছে কিংবা চুইং গাম চিবুচ্ছে। পুরো ব্যাপারটায় সাধারণ ব্যাখ্যা আছে। কাজেই সহজ ভাবে আমি চোখ মেলতে পারি এবং উঠে বসতে বসতে বলতে পারি "ভাই কেমন আছেন ? আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। কোথায় দেখেছি বলুন তো ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে তক্ষক-ভদ্রলোক হয়ত বলবেন, আপনি আমাকে আগে কখনো দেখেননি। আমি পুলিশের লোক। জুঁই-এর বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার উপর সারাক্ষণ লক্ষ রাখার কথা তো— এই জন্যেই বসে আছি। লক্ষ রাখছি। ভাল আছেন ?

আমি উঠে বসলাম । চোখ মেললাম, কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আপনি কি হিমু ? ভদ্রলোকের গলার স্বর অ্যান্টার্কটিকার বাতাসের মতই শীতল। এমন শীতল কণ্ঠস্বর সচরাচর শোনা যায় না। ভদ্রলোক এই ঘরে বসে দশ মিনিট বক্তৃতা দিলে ঘরের তাপ দশ ডিগ্রী কমে যাবার কথা।

'আপনার নাম হিমু ?'

'জ্বি আমার নাম হিমু।'

'আপনি মালিহা বেগম নামে কাউকে চেনেন ?'

'জ্বি না। চিনি না।'

'ভাল করে চিন্তা করে বলুন।'

'ভাল করে চিন্তা করেই বলছি, এই নামে কাউকে চিনি না।'

'উনি আমেরিকায় থাকেন সম্পর্কে আপনার খালা হন। দূর সম্পর্কের খালা।'

'ও আচ্ছা মালু খালা। ওনারা দুই বোন, একজনের নাম মালিহা, তাকে ডাকতাম মালু খালা। আরেক জনের নাম সালেহা । তাকে ডাকতাম সালু খালা। সালু খালার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই তবে মালু খালার সঙ্গে আছে। উনি প্রতি নিউ ইয়ার্সে একটা কার্ড পাঠান। শুধু কার্ড না, কার্ডের সঙ্গে ডলার থাকে। মালিহা খালার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ?'

'কোনো সম্পর্ক নাই । ঢাকায় ওনার যে বিষয় সম্পত্তি আছে তা দেখ ভাল করি। আমি কি আপনার ঘরে একটা সিগারেট খেতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন।'

'আমার নাম হাদি।'

'কী নাম বললেন, হাদি '

'জ্বি হাদি। সৈয়দ হাদিউজ্জামান খান ।'

'ও আচ্ছা। নাম তো খুবই জবরদস্ত।'

হাদি সাহেব সিগারেট ধরালেন। ভদ্রলোককে এখনো তক্ষকের মতই লাগছে। তার চোখ ঠিক আছে, মুখের শেপের কোনো সমস্যার জন্যেই বোধ হয় তক্ষক ভাব এসেছে। সমস্যাটা আমি ধরতে পারছি না। ভদ্রলোক পান বা চুইং গাম কিছুই খাচ্ছেন না। মাঝে মধ্যে মুখ নাড়ানো সম্ভবত ওনার অভ্যাস। ভদ্রলোকের চেহারা যেমনই হোক- তিনি পুলিশের লোক না এটা ভেবেই শান্তি শান্তি লাগছে। পুলিশের চেয়ে তক্ষক ভাল।

'হিমু সাহেব।'

'জি।'

'আপনার মালিহা খালা সামারের ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন। দুই মাস থাকবেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছেন।'

'ও।'

'চেষ্টা উনি করেন নাই। আমি করেছি। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন দুইবার করে এসেছি। শুধু গতকাল আসি নাই।'

'গতকাল আসেন নাই কেন ?'

'আমার মেয়েটা সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে- এই জন্যে আসতে পারি নাই।'

'ও আচ্ছা।'

হাদি সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছেন। চৈত্র মাসের গরমেও তার গায়ে খয়েরী রঙের কোট, গলায় টাই। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। রেগে গেলে আমার মত স্বাস্থ্যের যে কোনো মানুষকে দুহাতে তুলে আছাড় দিতে পারবেন। হাদি সাহেব চোখ মেলে বললেন, মাথায় তিনটা স্টিচ দিতে হয়েছে। আমার মেয়েটার কথা বলছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তিনটা স্টিচ। বলেন কি ?'

'মেয়েটা অগ্রণী স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে।

'নাম কী ?'

'ভাল নাম- সৈয়দা মেহেরুন্নেসা খানম । তার দাদীর নামে নাম রেখেছি। ডাক নাম এখনো রাখা হয়নি।'

'ক্লাস ফোরে পড়ে মেয়ে এখনো ডাক নাম রাখেননি। কী বলছেন !'

'কোনো নামই মনে ধরে না। এই জন্যে রাখা হয় নাই।'

'আপনি তাকে কী ডাকেন ?'

'যখন যা মনে আসে ডাকি । কয়েক দিন ধরে পাখি ডাকছি।'

'শুধু পাখি ? ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া এইসব কিছু না ?'

'জ্বি না শুধু পাখি।'

সৈয়দ হাদিউজ্জামান খান সাহেবের গলা এখন আর আগের মত শীতল লাগছে না। মেয়ের প্রসঙ্গ আসতেই গলা খানিকটা উষ্ণ হয়েছে। চেহারা থেকে তক্ষক ভাবটাও মনে হয় কিছু দূর হয়েছে। আমার ধারণা ভদ্রলোক যদি নিজ কন্যা প্রসঙ্গে আরো ঘন্টাখানিক কথা বলেন তা হলে চেহারা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমি বললাম, ভাই এখন বলুন আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন ? মালিহা খালা পাঠিয়েছেন ?

'জ্বি। উনি আপনার জন্যে একটা উপহার পাঠিয়েছেন। আরেকটা চিঠি দিয়েছেন।'

'দেখি উপহারটা কী ?'

'আগে চিঠিটা পড়তে বলেছেন।'

হাদি সাহেব খাম বন্ধ চিঠি বের করে দিলেন। কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা দীর্ঘ চিঠি লিখতে পছন্দ করে। "কেমন আছিস ?" এই সাধারণ বাক্যটাকেও তারা ফেনিয়ে ফেনিয়ে আধা পৃষ্ঠা করে ফেলে। শুধু কেমন আছিস তারা কখনো লিখবে না, তারা লিখবে

কী রে তুই কেমন আছিস ? অর্থাৎ তোর শরীর কেমন তাই জানতে চাচ্ছি। শরীরটা
ভাল তো ? না-কি শরীর খারাপ ? শরীরের দিকে তো তোর মন নেই। শরীর যদি যায়
উত্তরে, তুই যাস দক্ষিণে........

মালিহা খালাও ঐ গোত্রের। তার চিঠি মানে চল্লিশ পাতার মিনি উপন্যাস। তবে আজকের চিঠিটা তুলনামূলক ভাবে সংক্ষিপ্ত। খালা লিখেছেন—

হিমু,

তুই কেমন মানুষ বল তো ? গত তিন বছরে আমি খুব কম করে হলেও ত্রিশটা কার্ড পাঠিয়েছি। নিউ ইয়ার্স ডের কার্ড, হ্যালোইনের কার্ড, থ্যাংকস গিভিং-এর কার্ড, ঈদ উপলক্ষে কার্ড। অনেকগুলির সঙ্গে ডলারও ছিল । তুই একটার জবাবও দেয়ার প্রয়োজন মনে করিসনি। তুই এমন কি তালেবর হয়ে গেছিস তা বুঝতে পারছি না। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম দেশে ফিরে তোকে কঠিন শাস্তি দেব। এই শাস্তি তোর প্রাপ্য। কী শাস্তি দেব তাও তোর খালুর সঙ্গে মিলে প্ল্যান করে রেখেছি। তুই যদি ভাবিস আমি ঠাট্টা করছি তাহলে ভুল করবি। আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। শাস্তি ঠিকই দেয়া হবে। দেশে ফিরেছি পনেরো দিনের মত হল। দু'মাস ছুটির ওয়ান ফোর্থ পার হয়ে গেল তোর সঙ্গে দেখা হল না। আমি আমার বাড়ির কেয়ার টেকারকে এর মধ্যে কতবার যে পাঠিয়েছি। ওর নাম হাদি। স্ট্রেঞ্জ ধরনের মানুষ। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে ও বোধ হয় তোর কাছে যাচ্ছেই না । তোর কাছে যাবার নাম করে বের হচ্ছে। খানিকটা ঘুরে-ফিরে চলে আসছে।

তোকে আমার খুবই দরকার। কী জন্যে দরকার সাক্ষাতে বলব। ভাল কথা তোর সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার কি এখনো আছে ? না চলে গেছে ? তোকে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। আমি মানসিক ভাবে সামান্য হলেও বিপর্যস্ত । ঘুমুতে গেলেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি স্বপ্নটা কী বলি– স্বপ্নে দেখি মুখোশ পরা একটা মানুষ আমার গলায় ইলেকট্রিকের তার পেঁচিয়ে আমাকে মেরে ফেলছে। মানুষটার গায়ে রসুনের গন্ধ। লোকটার পায়ে কোনো জুতা নেই। কালো মোজা পরা পা । যে-ইলেকট্রিকের তার দিয়ে সে আমার গলা পেচিয়ে ধরছে সেই তারটার রঙ সবুজ।

আমি আমেরিকায় সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তুই বোধ হয় জানিস না— আমেরিকায় সাইকিয়াট্রিস্টের হেল্প নেয়া মানে জলের মত ডলার খরচ করা। জলের মতই ডলার খরচ করেছি। একেকটা সেশনে একশ ডলার করে লেগেছে, লাভ হচ্ছে না কিছু। ওরা হিপনোটিক ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করছে। এই সব ড্রাগে খুব ঘুম হয়, তবে আরামের ঘুম হয় না। ঘুমেরমধ্যেও টের পাওয়া যায় যে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর যদি কোনো কারণে একবার ঘুম ভেঙ্গে যায় তা হলে আর ঘুম আসে না। আমার এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কোনো বাড়িতে একা থাকতে পারি না। বাথরুমে যদি শাওয়ার নিতে যাই তখন মনে হয় বাথরুমের দরজা খোলা থাকলে কেউ ঢুকে পড়বে। আবার যদি দরজা বন্ধ করি তখন মনে হয় এই

বন্ধ দরজা আমি আর খুলতে পারব না। কী যে বিশ্রী অবস্থা। I need your help.

যাই হোক এখন অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। তোর জন্যে একটা উপহার পাঠালাম। কী উপহার আন্দাজ কর তো। তোর তো আবার অনুমান শক্তি খুব ভাল। তোর সঙ্গে প্রথম যে বার দেখা হল সেই কথা মনে আছে না ? ঐ যে তোকে বললাম- হিমু তোর যে সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল— তার একটা প্রমাণ দে তো। বল দেখি আজ আমি দুপুরে কী দিয়ে খেয়েছি। তুই সঙ্গে সঙ্গে বললি— তিন রকমের শুটকি। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অবশ্যি তোর খালু বলল- সিক্সথ সেন্স, সেভেন্থ সেন্সের কোনো ব্যাপার না। অনেক দিন পর বিদেশ থেকে যারা আসে তারা শুটকি-ফুটকি বেশি খায়। সেই হিসেবে বলেছে। আমি বললাম- তিন ধরনের শুটকির কথাটা কী ভাবে বলল ? তোর খালু বলল, মানুষ তিন সংখ্যা খুব বেশি ব্যবহার করে। ত্রিসন্ধ্যা, তিন কাল, তিন পদ, তে মাথা......সেখান থেকে বলেছে। তোর খালু তোর সিক্সথ সেন্স বিশ্বাস না করলেও আমি করি। এবং ভালই বিশ্বাস করি। এখন তুই তোর ক্ষমতা জাহির করে বল উপহারটা কী ? একটু হিন্টস দিচ্ছি গরুর গলায় যেমন ঘন্টা থাকে তোর জন্যে সে রকম একটা ঘন্টা কিনেছি। গলায় ঘন্টা ঝুলানো গরু যেখানে যায়- ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে মালিক টের পায় গরু কোথায় গেল। তোর উপহারটাও সে রকম। তুই যেখানে যাবি আমি জানব কোথায় গিয়েছিস । আন্দাজ করতে পারছিস উপহারটা কী ? একশ ডলার বাজি, পারছিস না। যাই হোক তোকে টেনশনে রেখে লাভ নেই আমিই বলে দিচ্ছি। একটা মোবাইল টেলিফোন। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে । তুই যেখানে যাবি- টেলিফোনটা সঙ্গে নিয়ে যাবি। এটা এমন কোনো ভারী বস্তু না। পকেটে ফেলে রাখলেই হল।

টেলিফোন সঙ্গে নিয়ে যাবি । যাতে ইচ্ছে করলেই আমি টেলিফোনে তোকে পাই। আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে আমি একা একা তিন মিনিটও থাকতে পারি না। কাউকে না কাউকে টেলিফোন করতে হয়। তুই অতি অবশ্যি টেলিফোন সঙ্গে রাখবি এবং অন করে রাখবি । ফোনের বিলের জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি বিল দিয়ে দেব। অবশ্যি আমি আমেরিকা ফিরে যাবার পর— You are on your own. অর্থাৎ নিজের বিল নিজে দিবি।

হাদি তোকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেবে কী ভাবে কল রিসিভ করতে হয়। কী ভাবে কল করতে হয় ।

তারপর হিমু তোর খবর কী বল। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটাহাটির রোগটা কি কমেছে না আরো বেড়েছে ? চিকিৎসা না করলে সব ব্যধিই বাড়ে কাজেই আমার ধারণা তোর ব্যধিও বেড়েছে। তবে তোর ব্যধিটা যেহেতু খুব ক্ষতিকর না, কাজেই হজম করা যেতে পারে।

শোন হিমু তোকে আমার জন্যে বেশ কিছু কাজ করতে হবে । কাজগুলি কী আমি পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখছি। নাম্বার ওয়ান.......

আমি চিঠি উল্টে দেখলাম সব মিলিয়ে আঠারোটা পয়েন্ট আছে। আঠারোটা পয়েন্ট পড়ার এখন কোনো মানেই হয় না।

আমি চিঠি পড়া বন্ধ করে হাদি সাহেবের দিকে তাকালাম। হাদি সাহেব এতক্ষণ মনে হয় এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখে চোখ পড়া মাত্র চোখ নামিয়ে নিলেন। কিছু কিছু মানুষ আছে কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকায় না। অন্য সময় তাকিয়ে থাকে।

হাদি সাহেব মেঝের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন- মেয়েটা এক ফোটা চোখের পানি ফেলেনি।

আমি বললাম, আপনার কথাটা বুঝতে পারিনি। কে চোখের পানি ফেলেনি ?

'আমার মেয়েটার কথা বলছি- পাখি। তিনটা ষ্টিচ দিয়েছে কিন্তু চোখে পানি নেই। আমি শুধু হাত ধরে বসেছিলাম।'

'আপনার মেয়ে খুব সাহসী?'

'জ্বি না সাহসী না, তেলাপোকা ভয় পায়। মাকড়সা ভয় পায়, শয়তানের ঘোড়া নামে একটা সবুজ রঙের পোকা আছে না, ঐটাকেও ভয় পায়। অত্যধিক ভয় পায়। তবে বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখে। যত বড় বিপদ, তার মাথা তত ঠাণ্ডা।'

'এইটুক মেয়ের আবার বিপদ কী ?'

'বিপদ তো আর বয়স বিচার করে না । পঞ্চাশ বছরের একজন মানুষের যে বিপদ আসতে পারে পাঁচ বছরের একজন বাচ্চাও সেই বিপদে পড়তে পারে।'

হাদি সাহেব উপহারের প্যাকেটটা আমাকে দিলেন। আমি আধুনিক গরুর গলার ঘন্টা প্যাকেট খুলে বের করলাম। হাতের তালুতে নেয়ার মত সুন্দর একটা খেলনা । খেলনাটার ব্যবহার হাদি সাহেব যত্ন নিয়ে শেখালেন। কোন বোতামের পর কোন বোতাম টিপতে হয় তা একটা কাগজে লিখেও দিলেন । যাবার আগে হঠাৎ করেই মুগ্ধ গলায় বললেন বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছে দেখেছেন স্যার। লোকজন টেলিফোন পকেটে কোনোদিন টাকা পয়সা হয় আমি এ রকম দুটা ফোন কিনব। একটা থাকবে আমার কাছে, আরেকটা থাকবে আমার মেয়ের কাছে। এইসব অবশ্য কল্পনা, আমার কোনোদিন টাকা পয়সা হবে না।

'টাকা পয়সা হবে না, কী ভাবে জানেন ?'

'এক ফকির আমাকে বলেছেন। খুবই কামেল দরবেশ। ওনার দেশের বাড়ি বাগেরহাট। মাঝে মধ্যে ঢাকায় এক মুরিদের বাড়িতে আসেন। তখন দেখা করি। ওনার জ্বীন সাধনা আছে, পরী সাধনাও আছে। আমাকে বলেছেন একদিন জ্বীন দেখাবেন। মানুষ তো অনেক দেখলাম। একটা জ্বীন দেখার শখ ছিল । স্যার যাই ?'

'আচ্ছা যান। জ্বীন দেখার সুযোগ পেলে আমাকে বলবেন । মানুষ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এখন জ্বীন-ভূত দেখতে পারলে ভাল লাগার কথা ?'

সবার হাতে সব কিছু মানায় না। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের হাতে বেত মানায় আবার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের হাতে মানায় না। নব্য ব্যবসায়ীর হাতে ব্রীফ কেস মানায়, পুরানো ব্যবসায়ীর হাতে মানায় না। ক্যাডারদের হাতে জর্দার কৌটা মানায় কিন্তু ক্যাডারদের যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের হাতে মানায় না। মোবাইল টেলিফোনেরও কি হাতে মানাবার কোনো ব্যাপার আছে ? হলুদ পাঞ্জাবি পরা খালি পায়ের একটা মানুষ কানে মোবাইল নিয়ে ঘুরছে এটি কি কোনো গ্রহণযোগ্য দৃশ্য ? ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে এটি বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য দৃশ্য। ভিক্ষাকে সম্মানজনক জীবিকা হিসেবেই ধরা হয়। হঠাৎ কেউ একজন ঠিক করে সে তার বাকি জীবন ভিক্ষা করে কাটাবে। বিষয় সম্পত্তি যা আছে বিক্রী করে সে একটা

ঘোড়া কেনে। ভিক্ষুকের যদি ঘোড়া থাকতে পারে, হিমুরও মোবাইল টেলিফোন থাকতে পারে।

হাদি সাহেবের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবী ধাই ধাই করে এগুচ্ছে। এমন একটা সময় হয়ত আসবে যখন পৃথিবীর সব মানুষ যে-কোনো সময় একজনের সঙ্গে আরেকজন কথা বলতে পারবে। নাম্বারের বোতাম টিপতে হবে না, মনে মনে ভাবলেই হবে- আমি অমুকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা শোনা যাবে।

চৈত্র মাসের দুপুরে পথে নেমেই আমার যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, তার কথা শুধু ভাবলেই হল । সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পি এর গলা শোনা যাবে-

'কে বলছেন, হিমু সাহেব ? ভাল আছেন ?'

'জ্বি ভাল।'

'প্রধানমন্ত্রী একটু টয়লেটে গেছেন। জানেন নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীদেরও টয়লেট পায়। আপনি কি একটু ধরবেন না দশ মিনিট পরে করবেন।'

'আমি ধরে আছি।'

'আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন ?'

'শাহবাগের মোড় থেকে।'

'খুবই গরম পড়েছে তাই না ?'

'জ্বি চৈত্রমাসের তালু ফাটা গরম।'

'প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন- ধরুন।'

'আমি ধরেই আছি। প্রধানমন্ত্রী মিষ্টি গলায় বললেন, কে হিমু সাহেব ?'

'জ্বি।'

'চৈত্র মাসের দুপুরে পথে পথে হাঁটছেন ?'

'কী করব বলুন।'

'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চলে আসুন। ঠাণ্ডা এক গ্রাস সরবত খেয়ে যান। বেলের সরবত ।'

'আজ থাক, আরেক দিন।'

'আরেক দিন না। আজই আসুন। আসতেই হবে, না এলে আমি খুব রাগ করব। আপনি কোথায় আছেন বলুন তো গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। থাক থাক কোথায় আছেন বলতে হবে না— আধুনিক টেলিফোন সেটগুলি খুব ভাল বানিয়েছে। আপনি কোথায় আছেন তার কো অর্ডিনেট রেকর্ড হয়ে গেছে। আপনি অপেক্ষা করুন গাড়ি চলে আসছে। খোদা হাফেজ।'

আমি টেলিফোন সেট কান থেকে নামাতে নামাতে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব গাড়ি পোঁ পোঁ করে বাশি বাজাতে বাজাতে উপস্থিত হল। উপায় নেই বেলের সরবত খেতে যেতেই হবে।

পোঁ পোঁ গাড়ির শব্দ হচ্ছে ঠিকই। সেই শব্দ প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো গাড়ির শব্দ না। এম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছে - সেই শব্দ। একটা সময় ছিল যখন সাইরেন বাজিয়ে এম্বুলেন্স ছুটে গেলে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত - আহারে কাকে না জানি নিয়ে যাচ্ছে। বেচারা বাঁচবে তো ?

এখন সাইরেন বাজিয়ে এম্বুলেন্স গেলে সবাই চোখ সরু করে এম্বুলেন্সের

ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে । আজকাল এম্বুলেন্সের ভেতর রুগী কমই থাকে। চিত্র নায়িকা বসে থাকেন। তাকে অতি দ্রুত শুটিং স্পটে নিয়ে যেতে হবে। সাইরেন ছাড়া গতি নেই। টেরার গ্রুপের প্রধানরাও মাঝে মধ্যে থাকেন- শান্তিবাগ এলাকায় ঝন্টু গ্রুপের প্রধান- জনাব ঝন্টু হয়ত যাচ্ছেন। কিংবা যাচ্ছেন ঝন্টু গ্রুপের কাউন্টার- জনাব কানা ছালেক । এক গ্রুপকে মদদ দিচ্ছেন সরকারী দল। আরেক প্রাপকে মদদ দিচ্ছেন বিরোধী দল। এবং এই দুই গ্রুপকেই মদদ দিচ্ছেন বাংলাদেশের মহান পুলিশ বাহিনী ।

ছালেক গ্রুপের প্রধান কানা ছালেক থানায় গেলে ওসি সাহেব লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন- আরে ছালেক ভাই। আপনি দেখি আমাদের ভুলেই গেছেন। আসেনই না। এই ছালেক ভাইকে চা দাও।

ঝন্টু গ্রুপের ঝন্টু সাহেব থানায় গেলেও একই ব্যাপার। ওসি সাহেব অভিমানী গলায় বলেন- আরে ঝন্টু ভাইয়া। না আপনার সঙ্গে কোনো কথা নাই। সেই বুধবারে আপনার সঙ্গে দেখা- তারপর আপনার কোনো খোজ নেই। আপনাকে বন্ধু মানুষ ভাবতাম.......

বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে যাচ্ছে। একশ পাতার বইটির শেষ পাতাটা শিগগিরই উল্টানো হবে। এখন আমরা অদ্ভুত সময় পার করছি। খুবই অদ্ভুত সময়।

আমার মোবাইল টেলিফোন বাজছে। নিশ্চয়ই মালিহা খালা । গলায় ঘন্টা বাধা গরুর খোঁজ নিতে চান। গরুর গলায় ঠিকঠাক মত ঘন্টা লাগানো হয়েছে কি-না সেই খোঁজ নেয়া। আমি হাদি সাহেবের ইনস্ট্রাকশন মত সবুজ বোতাম চেপে বললাম- হ্যালো। ও পাশ থেকে পুরুষ গলা শোনা গেল— হিমু সাহেব ?

'জ্বি।'

'আমি হাদি। আপনি টেলিফোন ঠিকঠাক মত ধরতে পারেন কি-না সেটা টেষ্ট করার জন্যে করলাম। কিছু মনে করবেন না।'

'টেস্টে মনে হয় পাশ করেছি ?'

'জ্বি। আমার মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলেন। ও টেলিফোনে কথা বলতে খুবই পছন্দ করে।'

'আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন ?'

'আজাদ ফার্মেসী থেকে । আমার বাসার কাছেই ফার্মেসী। মাঝে মধ্যে খুব জরুরি দরকার পড়লে এখান থেকে টেলিফোন করি। আজাদ ফার্মেসীর নাম্বারটা দিচ্ছি আপনি মোবাইলের মেমোরীতে ঢুকিয়ে রাখেন। হঠাৎ আমাকে কোনো খবর দিতে হলে এখানে খবরটা দিলেই আমি খবর পাব। মেমোরীতে নাম্বার কী ভাবে ঢুকাতে হয় মনে আছে ?'

'মনে আছে। নাম্বার পরে ঢুকাচ্ছি আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নেই।'

হাদি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আমার কথা হল।

'হ্যালো কে ? পাখি ?'

'জ্বি।'

'আমি কে তুমি কি জান ?'

'না।'

'অজানা একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছ ?'

'হু।'

‘তোমার গলার স্বরটা এমন লাগছে কেন ? তোমার কি জ্বর ?’
‘হ্যাঁ জ্বর আর গলা ব্যথা।’
‘খুব বেশি ব্যথা ?’
‘হু।’
‘তোমার জন্মদিন কবে ?’
‘বারো তারিখ ।’
‘এই মাসের বারো তারিখ ?’
‘হ্যা।’
‘জন্মদিন করছ না ?’
‘বাবা বলছেন জন্মদিন করবে।’
‘কী আমাকে দাওয়াত দিলে না তো।’
‘ভুলে গেছি।’
‘ভুলে গেলে তো কিছু করার নেই। এখন দাও।’
‘আপনি আমার জন্মদিনে আসবেন।’
‘আচ্ছা আসব।’
‘জন্মদিনে কি উপহার তোমার চাই ?’
‘একটা ছোট্ট হাতির বাচ্চা।’
‘হাতির বাচ্চা ?’
‘জ্বি।’
‘পুতুল না— আসল হাতির বাচ্চা।’
‘আচ্ছা ঠিক আছে।’
‘সত্যি দেবেন ?’
‘হ্যাঁ সত্যি দেব।’

বলে আমি নিজেই হকচকিয়ে গেলাম। কী সর্বনাশের কথা। আমি হাতির বাচ্চা পাব কোথায় ?

পাখি মেয়েটি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলল- হ্যালো আমার গলাব্যথা খুব কমে গেছে।

আমি টেলিফোনে হাদি সাহেবের গলা শুনলাম। হাদি সাহেব মেয়েকে বলছেন, দেখি মা আমি একটু কথা বলি। মেয়ে বলল, তোমাকে দেব না। আমি আসল কথাগুলি এখনো বলিনি।

পাখির আসল কথাগুলি আমি শুনলাম। আসল কথা হল— জন্মদিন হলেও, সেই দিনে তার মা আসতে পারবেন না। কারণ তার মা দেশে থাকেন না। বিদেশে থাকেন। বিদেশে থাকলেও তিনি পাখিকে আকাশের মত ভালবাসেন । পাখির একটা ছোট ভাই আছে সে থাকে মা’র সাথে । সেই ভাইটা পরীদের বাচ্চার মত সুন্দর। তার নাম অমিত। অমিতকে কোলে নিয়ে পাখি চেয়ারে বসে আছে এরকম একটা ছবি পাখির কাছে আছে। ছবিটা সে কাউকে দেখতে দেয় না, তবে আমাকে দেবে। ছবিটা কাউকে দেখতে না দেবার কারণ হল- ছবিতে অমিত খুব কাঁদছে। ছবি দেখলে সবার মনে হতে পারে যে অমিত পাখিকে পছন্দ করে না। আসলে খুবই পছন্দ করে। অমিতের বাবাও পাখিকে পছন্দ করেন। পাখি এবং অমিত দু'জনের মা এক হলেও দু’জনের বাবা ভিন্ন। একটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার তবে লজ্জার ব্যাপার না।

এরকম হয়।

বাচ্চা একটা মেয়ের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনলে মন খারাপ হয়। আমার মন খারাপ হল। যতটা হবার কথা তারচেয়ে বেশি খারাপ হল। মন খারাপ ভাব দূর করার জন্যে এমন কিছু করা দরকার যেন মনটা আরো খারাপ হয়। মন খারাপে মন খারাপে কাটাকাটি। কী করা যায় ? মাথায় কিছু আসছে না।

শাহবাগের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। যেতে এক ঘন্টার মত লাগবে। এই ঘন্টায় মন খারাপ করার মত অনেক কিছুই চোখে পড়ার কথা ।

আচ্ছা এমন যদি ব্যবস্থা থাকত যে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন গুপ্তচর তাদের প্রত্যেকের পাঞ্জাবির পকেটে লুকানো আছে মোবাইল টেলিফোন! তাদের কাজ হচ্ছে শহরে মন খারাপ হবার মত কী কী ঘটনা ঘটছে তা দেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন খারাপ দপ্তরে জানানো। দপ্তর ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মনে করা যাক আমি হিমু এমন একজন গুপ্তচর। পাঞ্জাবির পকেটে মোবাইল টেলিফোন নিয়ে বের হয়েছি। মন খারাপ হবার মত একটা ঘটনা চোখে পড়েছে। আমি তৎক্ষনাৎ মন খারাপ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মন খারাপ দপ্তরের মন্ত্রী (তিনি দেশের একজন প্রধান কবি) উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করছেন-

'ঘটনা কী ?'

'ঘটনা হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে ?'

'বয়স কত ?'

'আনুমানিক বয়স ছয় সাত।'

'কেন কাদছে ?'

'রাস্তার মোড়ে গ্যাস বেলুন বিক্রি হচ্ছে- ছেলেটা বেলুন কিনতে চাচ্ছে। বাবা কিনে দিচ্ছে না।'

'কেন দিচ্ছে না ? কারণটা কি অর্থনৈতিক ?'

'কারণ অর্থনৈতিক বলে মনে হচ্ছে না। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তার টাকা পয়সা আছে।'

'তা হলে বেলুন কিনে দিচ্ছে না কেন ?'

বাবা বলছেন- বেলুন দিয়ে হবেটা কী! একটু পরেই সুতা ছেড়ে দিবি বেলুন চলে যাবে আকাশে ।

'ছেলেটা কি এখনো কাঁদছে ?'

'না এখন কাঁদছে না, এখন সার্টের হাতায় চোখ মুছছে। তবে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে বেলুনওয়ালার দিকে তাকাচ্ছে।'

'তিনটা বেলুন কিনে এক্ষুনি ছেলেটার হাতে দেবার ব্যবস্থা কর।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'বেলুন পাবার পর ছেলেটার মনের অবস্থা কী হল- এক্ষুনি জানাও আমি লাইনে আছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নানা ধরনের আন্দোলন চলছে- দারিদ্র্য মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন, ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন। অশ্রু মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন কি শুরু করা যায় না ? যে পৃথিবীতে কেউ চোখের পানি ফেলবে না। সেই পৃথিবীর ডিকশনারীতে আনন্দ অশ্রু শব্দটা থাকবে

কিন্তু অশ্রু শব্দ থাকবে না।

রাস্তায় নেমে দেখি ধরনী তেতে আছে। পিচের রাস্তায় তো পা ফেলা যাচ্ছে না। ফুটপাথেও না। চৈত্র মাসের দুপুরে খালি পায়ে ঢাকা শহরে হাটা অসম্ভব ।

লু হাওয়ার মত হাওয়াও বইছে। মরুভূমি কি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে ? প্রকৃতি নানান খেলা মানুষকে নিয়ে খেলে। শস্য সবুজ জনপদকে মরুভূমি বানিয়ে দেয়— আবার মরুভূমিকে সবুজ করে দেয়। সমস্ত নদ নদী শুকিয়ে বাংলাদেশ কি মরুভূমি হয়ে যাবে ? চকচক করবে বালি। সেই বালির উপর উটের পিঠে চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব। আমাদের ইলেকশনে নৌকা, ধানের শীষ এবং লাঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হবে উট মার্কা ।

আমি পেছনে ফিরলাম, কেউ আমাকে লক্ষ করছে কি-এ দেখা দরকার। পুলিশের কর্তা ব্যক্তি যখন বলেন লোক লাগিয়ে রাখবেন তখন তিনি তার কথা রাখবেন। এক অন্ধ ভিখিরী পেছনে পেছনে আসছে। সে পুলিশের কেউ না তো ? সে হয়ত অন্ধ না, মেকাপ নিয়ে অন্ধ সেজেছে।

জুঁই মেয়েটাকে টেলিফোন করা দরকার। পুলিশ সাহেব যখন পরের বার আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন তখন নিশ্চয়ই বলবেন, তোমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলাম, টেলিফোন করনি কেন ?

এখন হাতেই মোবাইল । টেলিফোন করে ঝামেলা চুকিয়ে রাখা ভাল। টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা পাঞ্জাবির পকেটেই থাকার কথা। জুঁই-এর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব ? প্রথম কিছুক্ষণ চৈত্র মাসের গরম নিয়ে কথা বলা যায় তারপর কী ? আচ্ছা তারপরেরটা তারপরে দেখা যাবে। গায়ক হেমন্তবাবু তো গানের মধ্যে বলেই গেছেন- তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা ....

'হ্যালো !'

'হ্যালো কে বলছেন ? কাকে চাচ্ছেন ?'

আমি আমার মেরুদণ্ডে সামান্য কাপন অনুভব করলাম। কথা বলছেন জুই-এর বাবা। ভদ্রলোক আজ অফিসে যাননি না-কি ? শরীর খারাপ ? আমি গলার স্বর অতিরিক্ত মসৃণ করে বললাম, স্যার আপনার শরীরটা কি ভাল ?

'হ্যঁা ভাল। তুমি হিমু না ?'

'ইয়েস স্যার। টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারবেন বুঝতে পারিনি। জুঁই কেমন আছে স্যার ?'

'ভাল আছে।'

'আপনি অফিসে যাননি কেন ? শরীরটা ভাল না তাই না স্যার ?'

'শরীর ভাল। এবং আমি অফিস থেকেই বলছি। এটা অফিসের নাম্বার । তোমাকে জুঁই-এর নাম্বার বলে অফিসের নাম্বারটাই দেয়া হয়েছে।'

'ও।'

'জুঁই-কে কি কোনো খবর দিতে হবে ?'

'জি-না। শুধু বলবেন যে কোনো একদিন এসে কফি খেয়ে যাব।'

'আচ্ছা বলব ?'

'স্যার আরেকটা কথা।'

'বল।'

'আপনি বলেছিলেন আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রাখবেন । কিন্তু কাউকে তো

দেখতে পাচ্ছি না। একজন অন্ধ অনেকক্ষণ ধরে আমার পেছনে পেছনে আসছে কিন্তু তাকে তো আসল অন্ধ বলেই মনে হচ্ছে। চোখের মণি একেবারে কোটর থেকে তুলে নেয়া।'

'সে আমাদের কেউ না। তবে তোমার পেছনে লোক ঠিকই লাগানো আছে।'

'শুনে ভাল লাগছে স্যার। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'নিউ অর্লিন্স থেকে তোমার এক খালা এসেছেন– মালিহা। তুমি ডাকো মালু খালা । তোমার এই খালার স্বামীর নাম আরেফিন। তাদের কেয়ার টেকারের নাম হাদি। ঠিক হচ্ছে না ?'

'জ্বি ঠিক হচ্ছে। আমি পুলিশের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ। আচ্ছা স্যার হাদি সাহেবের মেয়েটার নাম বলতে পারবেন ?'

'না ।'

'মেয়েটার নাম পাখি। এ মাসের বারো তারিখে তার জন্মদিন । জন্মদিনে সে একটা হাতির বাচ্চা উপহার চায়। আপনাদের কাছে তো সব খবরই আছে। এই খবরটাও থাকা দরকার। স্যার হাতির বাচ্চা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন। একদিনের জন্যে ভাড়া করতাম।'

'টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। আমি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললাম।'

কেন জানি মনে হচ্ছে হাতির বাচ্চার সমস্যার একটা সমাধান করা যাবে। বড় বড় সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা যায়। ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করাই কঠিন।

৩

নতুন জামা উপহার পেলে জামা গায়ে দিয়ে যিনি উপহার দিয়েছেন তাকে সালাম করতে হয়। নতুন মোবাইল পেলে কী করতে হয় ? মোবাইল কানে লাগিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি খালার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ধানমন্ডিতে বাড়ি। এক বিঘা জমির উপর ছিমছাম ধরনের বাড়ি। সামনে বিরাট লন। একটা অংশে আবার চৌবাচ্চার মত আছে। পানি টলটল করছে। সেই পানিতে পেটমোটা রঙ্গিন মাছ। খালার এই বাড়ি মনে হয় রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর চোখে পড়েনি। চোখে পড়লে এর মধ্যে ছ'তালা ফ্ল্যাট উঠে পড়ত। স্মার্ট পোশাকের দারোয়ানরা ফ্ল্যাট পাহারা দিত। এইসব দারোয়ানদের আবার সবার হাতেই ট্রাফিক পুলিশের মত বাঁশি । বাচ্চা ছেলেদের মত অকারণে বাঁশি বাজাতেও এরা খুব পছন্দ করে।

মালু খালা দরজা খুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে চিনতে পারছেন না। চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। আমার চেহারা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। পোশাক আশাকেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি বললাম, কেমন আছ খালা ?

খালা তাকিয়ে রইলেন জবাব দিলেন না।

'চিনতে পারছ তো ?'

'পারছি। বুক ধড়ফড় করছে। বুক ধড়ফড়ানিটা কমুক তারপর কথা বলি।'

'দরজা থেকে সরে দাঁড়াও ভেতরে ঢুকি। না-কি তুমি চাও না আমি ঢুকি ?'

খালা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আমি ঘরে ঢুকে সোফায় বসলাম । পানির

বোতল এবং গ্লাস হাতে আমার পাশে বসতে বসতে বললেন-

'বেলটা শুনেই বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়েছে। তোর খালু বাসায় নেই। একা তো এই জন্যে।'

'তোমার কী মনে হচ্ছিল ? সবুজ রঙের ইলেকট্রিকের তার নিয়ে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ? তুমি দরজা খুলবে আর সে তার গলায় পেঁচিয়ে তোমাকে সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে দেবে ?'

খালা ঢক ঢক করে পানি খেতে খেতে বললেন- আসলেই তাই ভেবেছি। পুরোপুরি প্যারানয়েড হয়ে গেছি। হাদিকে পাঠিয়েছি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আনতে। সেই সকালে পাঠিয়েছি এখনো আসছে না।

'ইলেকট্রিক মিস্ত্রী কী করবে ?'

'সিলিং ফ্যান সবগুলো খুলে ফেলবে। আমি এ বাড়িতে কোনো সিলিং ফ্যান রাখব না ।'

'সিলিং ফ্যান খুলে লাভটা কী ?'

'স্বপ্নে দেখি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই ফ্যান খুলব।'

'ফ্যান খুললেও লাভ হবে না। ফ্যানের হুক তো থাকবে। তোমাকে হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে।'

খালা বিরক্ত মুখে বললেন, তুই এই ভাবে কথা বলছিস যেন আমাকে সত্যি সত্যিই ঝুলাবে।

আমি বললাম, তুমিও এমন ভাব করছ যে সত্যি সত্যি তোমাকে ঝুলানো হচ্ছে।

'আমি বলেছি বলে তুইও বলবি । আমার না হয় মাথার ঠিক নেই। তোর তো মাথা ঠিক আছে।'

'আমার ব্যাপারটা খালা অন্য রকম । আমি যখন যার কাছে থাকি তখন তার মত হয়ে যাই। মাথা খারাপের সঙ্গে থাকলে আমারও মাথা খারাপ থাকে, সুস্থ মাথার মানুষের পাশে আমার মাথাও সুস্থ থাকে। দুষ্ট লোকের কাছে যখন থাকি তখন আমিও দুষ্ট হয়ে যাই। আবার যখন..........'

'চুপ কর তো।'

'আচ্ছা চুপ করলাম।'

খালা সোফা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, তোকে দিয়ে আমি একুশটা কাজ করাব। আমি বললাম, চিঠিতে লিখেছিলে আঠারোটা ।

তিনটা বেড়েছে। প্রথম যে কাজটা তুই আমার জন্যে করবি সেটা হচ্ছে- আমার জন্যে একজন কেয়ার টেকার জোগাড় করবি।

'হাদি সাহেব বিদায় ?'

'অবশ্যই বিদায়। ওকে দেখলেই আমার গা শিরশির করে। তারচে বড় কথা লোকটার গা থেকে রসুনের গন্ধ বের হয়।'

'ও।'

'শুধু ও বললে হবে না। আমি স্বপ্নে যে লোকটাকে দেখি ওর গা থেকেও রসুনের গন্ধ আসত।'

'তা হলে তো বিদেয় করতেই হয়।'

তুই ভাল রেফারেন্সের একটা লোক বের করবি। আমি প্রতি মাসে চার হাজার টাকা দেই। চার হাজার টাকা খেলা কথা না।'

'তোমার বুক ধড়ফড়ানি কি একটু কমেছে ?'

'হু কমেছে। দিনের বেলা এমিতেই কম থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ে।'

'খালু সাহেব কোথায় ?'

'ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তার কী সব পুরানো বন্ধু বান্ধব আছে তাদের কাছে গিয়েছে। চলে আসবে। তুই দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবি।'

'কী খাওয়াবে ?'

'যা খেতে চাস খাবি। তোকে দেখে কেন জানি খুব মায়া লাগছে। দেখি কাছে আয় গায়ে হাত বুলিয়ে দেই।'

'আগে আমার জন্যে চা নিয়ে এসো। চা খেতে থাকি সেই ফাঁকে গায়ে হাত বুলাও।'

'আমার মধ্যে কোন চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছিস ?'

'পাচ্ছি। তুমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছ। অনেক খানি ফুলেছ।'

খালা আহত গলায় বললেন, আমার ওজন কমেছে নয় পাউন্ড। আমি স্পেশাল ডায়াটে আছি। আর তুই বলছিস মোটা হয়েছি ? তুই কি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলিস ?

'চা খাব খালা।'

'গরমের মধ্যে চা খাবি ? টক দৈ দিয়ে লাচ্ছি বানিয়ে দেই । দৈ ঘরে পেতেছি । দৈ বানানোর একটা যন্ত্র এবার নিয়ে এসেছি। এত সুন্দর দৈ হয় বলার না। আমি আমেরিকায় ফিরে যাবার সময় তোকে দিয়ে যাব।'

'আমি ঐ যন্ত্র দিয়ে কী করব ?'

'দৈ বানাবি। এরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছিস কেন ? তোকে দেখে মনে হচ্ছে দৈ বানানো ভয়ংকর কোনো কাজ। বোমা বানানোর মত ।'

'অনেকটা সে রকমই। খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতি প্রযুক্তির পেছনে সময় নষ্ট করা আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। সে ইচ্ছা করলে ভিক্ষা করে খাবে। কিন্তু হাড়ি পাতিল নিয়ে রান্না করতে বসবে না।'

'ফাজলামি ধরনের কথা বলবি না তো হিমু। আমার অসহ্য লাগে । আয় দৈ কী করে বানাতে হয় দেখে শিখে রাখ। দুপুরে হালকা ধরনের কিছু করব। ভাত টেংরা মাছ টাইপ। রাতে কিছু স্পেশাল ডিশ । রাজস্থানের এক মহিলার কাছ থেকে চিকেনের একটা প্রিপারেশন শিখেছি। অপূর্ব। গ্রীন চিকেন। লাউ পাতা বেটে সবুজ রঙের একটা পেষ্ট করা হয়। সেই পেস্টে ভিনিগার মিশিয়ে আস্ত মুরগী মাখিয়ে স্টীম করা হয়। মুরগী স্টীম হতে থাকবে এই ফাঁকে আরেকটা পেষ্ট বানাতে হবে । পোস্তা বাটা এবং বাদাম বাটার পেস্ট।'

'রান্না বান্নার এইসব কথা শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।'

'তোর খালুর জ্ঞানের কথার চেয়ে রান্না বান্নার কথা শেখা অনেক ভাল । চুপ করে শোন। পোস্তা বাটা এবং বাদাম বাটার পেস্টের সঙ্গে মিশাবি পেয়াজের রস। তারপর স্টীম মুরগীটার গায়ে এই পেষ্ট মাখাবি। বেসন যে ভবে মাখায় সেই ভাবে।'

'হু তারপর।'

'এখন শুনতে মজা লাগছে না ?'

'খুবই মজা লাগছে। তারপর বলো—'

'খুব পাতলা কাপড় দিয়ে মুরগীটাকে জড়াবি। সুতা দিয়ে পেচাবি যেন কাপড়

সরে না যায়।'

'মমীর মত আষ্টে পৃষ্ঠে কাপড় দিয়ে মুড়ানো ?'

'হু। এই ভাবে ডীপ ফ্রীজে রেখে দিবি আধ ঘন্টা।'

'লে হালুয়া। এই মুরগী কি ঠাণ্ডায় রান্না হবে ?'

'মোটেই ঠাণ্ডায় রান্না হবে না। ডীপ ফ্রীজে রাখা হয়েছে পেস্টটাকে জমাট বাধানোর জন্যে।'

'ও আচ্ছা ?'

'আধঘন্টা পর ডীপ ফ্রীজ থেকে মুরগীটা তুলে ডুবন্ত ঘিতে ভেজে ফেলবি ।'

'কাপড় শুদ্ধ ?'

'অবশ্যই কাপড় শুদ্ধ।'

'খাব কী ভাবে ? কাপড়ও খাব ?'

'খাবার সময় কাপড় খুলে নিয়ে খাবি।'

'এই জিনিসই কি আজ হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ এই জিনিসই হচ্ছে। তুই চোখ এমন কপালে তুলে ফেললি কেন ? মুরগী তো আর তোকে রান্না করতে হচ্ছে না। আমি রান্না করব।'

'রান্নার সময় তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তোমার পাশে থাকতে বলবে না ?'

'না বলব না। তুই বরং টিভি দেখিস। এর মধ্যে তোর খালু সাহেব চলে আসবে। তার সঙ্গে গল্প করবি।'

কলিংবেল বেজে উঠল। মালু খালা বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, দরজা খুলে দে তো হাদি এসেছে।

আমি বললাম, বুঝলে কী করে হাদি। খালু সাহেবও তো হতে পারেন।

খালা বললেন, ভক ভক করে রসুনের গন্ধ আসছে। সেখান থেকে বুঝেছি। হাদির গা থেকে রসুনের গন্ধ আসে। তুই রসুনের গন্ধ পাচ্ছিস না?

'না।'

'আমি পাচ্ছি। ভকভক করে গন্ধ আসছে। বুঝলি হিমু আমার সিক্সথ সেন্স বলছে আমার মৃত্যু হবে হাদি ব্যাটার হাতে। কেমন কেমন করে যেন আমার দিকে তাকায়।'

তোমাকে সে খুনটা করবে কেন ? মোটিভ কী?'

'এখানের সবকিছু দেখাশোনা করে সে। সে কিছু একটা গণ্ডগোল করে রেখেছে। আমাকে মেরে ফেললে গণ্ডগোলটা চোখে পড়বে না। As simple as that.'

আমি দরজা খুললাম। খালু সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। নিউ অর্লিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্বের অধ্যাপক আরেফিন সাহেব। ভদ্রলোক শুধু যে জ্ঞানী তা না, তার চেহারাও জ্ঞানী জ্ঞানী। তাকে দেখলেই মনে হয় জ্ঞানের ঝকঝকে নতুন ডিকশনারী। তাঁর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন অথচ তার পাঞ্জাবির ইস্ত্রী এতটুকু নষ্ট হয়নি।

'কেমন আছেন খালু সাহেব।'

'ভাল আছি হিমু সাহেব। দেশে ফিরে তোমাকে না পেয়ে তোমার খালার প্রায় মাথাখারাপ হবার মত জোগাড় হয়েছিল। এখন আশাকরি তার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।'

বলতে বলতে খালু সাহেব হাসলেন । সেই হাসিও দেখার মত জ্ঞান ঝরে ঝরে পড়ছে।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'এসো বসো আমার সঙ্গে । গল্প করি।'

খালা বললেন, গল্প পরে করবে। আমি এখন রান্না করছি ও আমার পাশে থেকে রান্না দেখবে।

আরেফিন খালু হাসিমুখে বললেন— আচ্ছা ঠিক আছে। দেখুক। বুঝলে হিমু রান্না হচ্ছে মেয়েদের কাছে একটি শিল্প কর্ম— a creative work. কোনো সৃষ্টিশীল কাজ যখন কেউ করে তখন কাউকে না কাউকে পাশে লাগে যে সেই কাজ এপ্রিশিয়েট করবে। কাজেই তুমি তোমার খালার পাশে থাক। মাঝে মধ্যে আমার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে বসতে পার। রান্না বিষয়ক কিছু মজার তথ্য আমার কাছে আছে। হয়তোবা তোমার ভাল লাগবে ।

আমি আমার সময়টা তিন ভাগে ভাগ করলাম। কিছুক্ষণ খালার সঙ্গে থাকি। তাঁর রান্না দেখি। কিছুক্ষণ হাদি সাহেবের সঙ্গে থাকি। হাদি সাহেব মিস্ত্রী নিয়ে চলে এসেছেন, তারা দু'জন ফ্যান নামাচ্ছেন। এদের কাজ কর্ম দেখি । তারপর যাই আরেফিন সাহেবের কাছে। মুগ্ধ হয়ে আরেফিন সাহেবের গল্প শুনি- বুঝলে হিমু। রান্না মাত্র তিন রকম,

পোড়া
ভাজা
সিদ্ধ

পৃথিবীর যাবতীয় রান্না এই তিনের পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন। রান্নার সবচে আদি রেসিপি বইটা কোথায় পাওয়া গেছে জান ?

'জ্বি না।'

'মিশরের পিরামিডের ভেতর । সমাধিকক্ষে । ফারাওদের খাবারের রেসিপি ।'

'সেই রেসিপি কি আছে আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ আছে। তোমার খালাকে বলেওছিলাম রেসিপি দেখে রান্না করতে । মিশরের ফারাওদের খাবার খেয়ে দেখি। সে রাজি হয়নি।'

'রাজি হননি কেন ?'

'রেসিপিটা হল ময়ূর রান্নার। পাখা শুদ্ধ আস্ত ময়ূর রান্না করা হয়। সেই ময়ুর খাবার টেবিলে এমন ভাবে সাজানো হয় যেন মনে হয় জীবন্ত ময়ুর বসে আছে। এক্ষুনি উড়ে চলে যাবে। ভাল কথা হিমু বাংলাদেশে কি ময়ুর পাওয়া যায় ?'

'চিড়িয়াখানায় পাওয়া যায় তবে তারা রান্না করে খাবার জন্যে ময়ূর দেবে বলে মনে হয় না। আপনি বললে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'না থাক। ফারাওদের মত ময়ূর খাবার একটা সখ অবশ্যি মাঝে মধ্যে হয়।'

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে রাত একটা বেজে গেল। আরেফিন খালু বললেন, এত রাতে মেসে ফিরে কী করবে থেকে যাও। পরিচিত বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না আশা করি এ ধরনের কোনো ব্যাপার তোমার মধ্যে নেই। অবশ্যি গরমে কষ্ট হবে। ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে।

আমি থেকে গেলাম। আরেফিন খালু গল্প করছেন। আমি শুনছি। খালুর কাছে জানা গেল মালু খালা রাতে ভেতর থেকে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে একা ঘুমান । দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে তিনি রাতে খালু সাহেবকে এক বিছানায় নিয়ে ঘুমুতে

পারেন না।

'হিমু।'

'জি খালু সাহেব।'

'আমি যে মোটামুটি একটা ভয়াবহ অবস্থায় আছি তা-কি বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।'

'দেখ তো আমার গা দিয়ে রসুনের গন্ধ আসছে কি-না।'

'না-তো।'

'তোমার খালার ধারণা সন্ধ্যার পর থেকে আমার গা দিয়ে রসুনের গন্ধ বের হয়। সহজ স্বাভাবিক ভাবে যে মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভেতর যে কী পরিমাণ অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে- তোমার খালা হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সন্ধ্যার পর থেকে আমি মদ খেতে বসি। রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত খেয়েই যাই । তোমার খালার অসুখ যদি খুব শিগগির না সারে তা হলে আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে যাব। এক দিন দেখা যাবে নিজেই গলায় দড়ি পেচিয়ে ফ্যানে ঝুলে পড়েছি।'

'ফ্যানের হুক ঠিকমত লাগানো আছে কি-না দেখে নেবেন। ঝোঁকের মাথায় ঝুলে পড়লেন তারপর ফ্যান নিয়ে ধপাস করে পড়ে কোমর ভেঙ্গে ফেললেন। এটা ঠিক হবে না।'

'রসিকতা করছ?'

'জ্বি।'

'আমার একটা প্রবলেম আছে হিমু। কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করলে আমার ভাল লাগে না।'

'ও।'

'ও না, কথাটা মনে রেখো।'

'জি আচ্ছা।'

'তুমি ঘুমুতে যাও।'

'আপনি ঘুমুবেন না ?'

'উহু। বই পড়ব । বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি কিছুক্ষণ বই পড়ি। ফিলসফির বই। এটা আমার অনেক দিনের বদ অভ্যাস।'

'আমি না ঘুমানো পর্যন্ত আপনি তা হলে বই পড়তে পারছেন না ?'

'না।'

'তা হলে এক কাজ করি। আমি চলে যাই- কারণ আমার ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'এত রাতে যেতে পারবে ?'

'আমি তো ঘোরাফেরা রাতেই করি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। খালু সাহেব আপত্তি করলেন না। দরজা খুলে দিলেন। ফিলসফির বই পড়াটা মনে হচ্ছে তার জন্যে খুবই জরুরি।

পাখির সঙ্গে কি মোবাইল টেলিফোনের কোনো মিল আছে ? পাখিরা উড়ে বেড়ায় । মোবাইল টেলিফোনও এক জায়গায় স্থির থাকে না- মানুষের হাতে কিংবা পকেটে ঘুরে বেড়ায়। পাখিরা কিচকিচ শব্দ করে মানুষের ঘুম ভাঙায়। মোবাইল ফোনও তাই করে। এই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙেছে মোবাইল টেলিফোনের শব্দে । আমি টেলিফোন কানে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে অসম্ভব মিষ্টি গলা শোনা গেল—

'আপনি কি হিমালয় ? বলুন দেখি আমি কে ?'

'বলতে পারছি না। এমন মিষ্টি গলা এর আগে শুনিনি।'

'আচ্ছা আপনাকে তিনটা প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছি। তিনটা প্রশ্ন করে যদি জেনে নিতে পারেন আমি কে তা হলে তো জানলেনই। আর না পারলে আমি কে সেই পরিচয় দেব না। কিছুক্ষণ গল্প করব। ও ভাল কথা তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবেন, কিন্তু নাম জানতে চাইলে পারবেন না। এখন বলুন আপনার প্রথম প্রশ্ন।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কেমন আছ ?'

'ভাল আছি।'

'তোমাদের ওখানে কি এখন লোডশেডিং চলছে ? না ইলেকট্রিসিটি আছে।'

'ইলেকট্রিসিটি আছে।'

'এখন বাজে কটা ?'

'সকাল ন'টা কুড়ি। আপনার তিনটা প্রশ্ন কিন্তু করা হয়ে গেছে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কে ?'

'তুমি হচ্ছ জুঁই।'

'আপনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন সেখান থেকে আমি যে জুঁই এটা কিন্তু বোঝার কথা না।'

'তুমি কথা বলছিলে আর আমি তোমার গলার স্বর মনে করার চেষ্টা করছিলাম।'

'আপনার টেলিফোন নাম্বার কার কাছ থেকে পেয়েছি জানতে চাইলেন না ?'

'না কারণ আমি অনুমান করতে পারছি। তোমার বাবাকে একদিন টেলিফোন করেছিলাম। সেখান থেকে ...।'

'থাক আর বলতে হবে না। বাবাকে আপনি চেনেন কীভাবে ?'

'এই প্রশ্ন তুমি তোমার বাবাকে করো না কেন ? উনিই জবাবটা ভাল দেবেন।'

'বাবাকে করেছিলাম। বাবা বললেন, আপনি পুলিশের ইনফরমার। মাঝে মধ্যে পুলিশকে গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি পুলিশের ইনফরমার শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

'খারাপ লাগার কী আছে। ধরো একটা খুন হয়েছে- আমি খুনী ধরার ব্যাপারে পুলিশকে কিছু গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করলাম। আমি যা করলাম তা হল সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।'

'পুলিশের ইনফরমাররা এই জাতীয় দায়িত্ব পালন করবার জন্যে টাকা নেয়। টাকার বিনিময়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন ব্যাপারটা হাস্যকর না!'

'হ্যাঁ হাস্যকর।'

'আপনি কি পুলিশের ইনফরমার ?'

'এখনো বুঝতে পারছি না।'

‘এখনো বুঝতে পারছি না মানে কী ?’

'মানেটা পরে বলব।'
'আমি যে আপনাকে অসম্ভব পছন্দ করি সেটা কি আপনি জানেন ?'
'না জানতাম না। এখন জানলাম।'
'আমি নিজেও জানতাম না। আমি নিজে কখন জানলাম জানেন ?'
'কখন জানলে ?'
'আপনাকে রেখে অ্যাঁলিয়াস ফ্রাসিসে ক্লাস করতে গেলাম। ক্লাস শেষ করে ফিরে এসে দেখি আপনি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল এবং আমি বুঝলাম যে আপনাকে আমি অসম্ভব পছন্দ করি। ...'
'ঐদিনের ব্যাপারটা হচ্ছে...'
'ঐদিনের ব্যাপারটা আমি জানতে চাচ্ছি না। আজ রাত আটটার দিকে কি আপনি আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন ?'
'কেন বলো তো ?'
'ডিনারের নিমন্ত্রণ।'
'আজ আমার একটু সমস্যা আছে। আজ আমার মালিহা খালার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ। খালা অতি জরুরি তলব পাঠিয়েছেন । আচ্ছা এক কাজ করা যেতে পারে, ডিনার শেষ করে তোমাদের বাড়িতে যেতে পারি। দশটার দিকে যদি আসি। রাত দশটা কি খুব বেশি রাত ?'
জুঁই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মেয়েটা ভয়াবহ রাগ করেছে। এই রাগ ভাঙানোর একমাত্র উপায় রাত দশটায় ওদের বাড়িতে উপস্থিত হওয়া। খালি হাতে না, দুটা বেলীফুলের মালা থাকতে হবে। বাংলাদেশের কোনো মেয়ে বেলীফুলের মালা হাতে নিয়ে রেগে থাকতে পারে না। এই ফুলের গন্ধের ভেতর কিছু আছে- ঝপ করে রাগ কমিয়ে দেয়।

আমি বসে আছি আরেফিন সাহেবের সামনে। ভদ্রলোককে আজ অনেক হাসি খুশি লাগছে। সোফায় পা উঠিয়ে বসেছেন। সফিসটিকেটেড মানুষরা কখনো পা নাচায় না। তিনি পা নাচাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী ?
'হিমু!'
'তুমি কেমন আছ বলো তো ?'
'বুঝতে পারছি না কেমন আছি।'
আরেফিন সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার জবাবটা আমার পছন্দ হয়েছে। হোমোসেপিয়ানসরা বেশিরভাগ সময়ই বুঝতে পারে না তারা কেমন আছে। তাদের নার্ভ সবসময় উত্তেজিত থাকে। উত্তেজিত নার্ভ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ঠিকমতো আনা-নেয়া করতে পারে না।
আমি কিছু না-বুঝেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। আরেফিন সাহেব আগের জায়গায় ফিরে গেলেন– বেতের সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। তিনি বসেছেন পা তুলে। দুই হাঁটুর মাঝখানে তার ছোটখাটো মাথাটা দেখা যাচ্ছে। তার মুখ হাসি-হাসি। কালো ফ্রেমের চশমার ভেতরের চোখ দুটিও হাসি-হাসি। আসল হাসি না, নকল হাসি। মানুষের চোখও যে নকল হাসি হাসতে পারে তা এই ভদ্রলোককে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।
'হিমু।'
'জ্বি।'

‘ময়ূরের নাচ কখনো দেখেছ?’

‘জ্বি না।’

‘চিড়িয়াখানার পোষা ময়ূরের আধুনিক নাচ না, বন্য ময়ূরের নাচ। সে এক অসাধারণ দৃশ্য । পুরুষ ময়ূররা সঙ্গিনীদের মনোহরণ করার জন্যে নাচে– সে এক দর্শনীয় জিনিস। সেই নাচের তাল আছে, ছন্দ আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে হাই বিটের যে-কোনো মিউজিক ফিট করা যায়। কখনো ছন্দপতন হবে না। তবে নাচের চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার একটা আছে। সেটা হচ্ছে নাচ থামানো। ময়ূর নাচ থামায় হঠাৎ। দ্রুতলয়ের যে-কোনো জিনিস থামার একটা নিয়ম আছে। ময়ূরের বেলায় কোনো নিয়ম নেই। তার নাচ হঠাৎ থেমে যাবে। এবং সে নাচ থামিয়ে মাটির দিক তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবে। মনে হবে হঠাৎ কোনো এক গভীর শোকে সে স্তম্ভিত। যেন তার সংসার হঠাৎ ভেঙে গেছে। আর নাচ নয়।’

আমি হাই চাপতে চাপতে বললাম, ইন্টারেস্টিং।

আরেফিন সাহেব বললেন, তোমার ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। তুমি হাই চাপার চেষ্টা করছ।

‘তা অবশ্যি করছি। ঘুম পাচ্ছে।’

‘রাত তো মোটে নটা এখনই ঘুম পাচ্ছে কেন ?’

‘বুঝতে পারছি না কেন। আমি আপনার গল্পের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম। অভদ্রতা হবে বলে অনেক কষ্টে জেগে আছি। আপনার ময়ূর বিষয়ক গল্প শেষ হয়েছে তো ? না-কি এখনো বাকি আছে ? নাচ শেষ করার পর ময়ূর করে কী ?’

আরেফিন সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, মূল গল্প শেষ হয়েছে। পরিশিষ্ট বাকি আছে। সেটা বলব কি-না বুঝতে পারছি না। যে আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনে না তাকে গল্প শুনিয়ে কোনো মজা নেই।

আমি বললাম, ঠিক বলেছেন। আমাদের দেশের মানুষরা বক্তৃতা শুনতে খুবই পছন্দ করে বলেই রাজনীতিবিদরা এত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মাঝখানে যদি লোকজন চেচিয়ে বলত—“অফ যা” তাহলে বক্তৃতার ডোজ কমত।

‘তাতে কী লাভ হত ? বক্তৃতা কমলেই কি কাজ বেশি হয় ?’

আমি বললাম, আপনার ময়ূর বিষয়ক গল্পের শেষটা বলে ফেলুন। আমি এখন উঠব। আপনার এখানে আধঘণ্টা থাকব ভেবে এসেছিলাম। পয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে।

‘যাবে কোথায় ?’

‘কোথায় যাব এখনো ঠিক করিনি।’

আরেফিন সাহেব সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি কি আসলেই জান না তুমি কোথায় যাবে ? না-কি তুমি জান কিন্তু তোমার চারদিকে রহস্যময়তা তৈরি করার জন্যে এরকম বলো।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, ঠিক ধরেছেন। আমি আমার চারদিকে ইচ্ছা করে ধোঁয়া বানিয়ে রাখি। ভেজা খড় পুড়িয়ে বুনকা বুনকা ধোঁয়া—

কন্যার বাপে হুক্কা খায়
বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়।

আরেফিন সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, হড়বড় করে কী বলছ? কন্যার বাপে হুক্কা খায়। বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়। এই ছড়াটা কেন বললে, কোন কনটেক্সটে বললে ?

'এমনি বললাম। তেমন কিছু ভেবে বলিনি। মাথায় দু-লাইন ছড়া এসেছে বলে ফেলেছি।'

'মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে লজিক থাকবে। কার্যকারণ থাকবে। শুধুমাত্র উন্মাদরাই লজিকের ধার ধারে না। তার মনে যা আসে সে তাই বলে। তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ নও। আমাকে বলো। এক্সপ্লেইন ইট টু মি। ময়ূরের নাচের সঙ্গে কন্যার বাপের হুক্কা খাবার কী সম্পর্ক ?'

আমি আরেফিন সাহেবের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোককে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তিনি যেন হঠাৎ আমার ওপর রেগে গেছেন। এই রাগ তিনি লুকিয়েও রাখছেন না। প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তার মতো সফিসটিকেটেড মানুষরা রাগলেও রাগ প্রকাশ করেন না। পাতলা ফিনফিনে রেশমি রুমালে তাদের মুখ ঢাকা থাকে। সেইসব রুমাল ফিল্টারের মতো কাজ করে। মুখের রাগ, বিরক্তি তারা ফিল্টার করে রেখে দেয়।

রাগলে মানুষের মুখ ছোট হয়ে যায়। আরেফিন সাহেবের মুখ এমনিতেই ছোট, এখন আরো এক সাইজ ছোট হয়েছে। তার চোখ আগেও জ্বলজ্বল করছিল, এখন একটু বেশি জ্বলছে। এটা মদ্যপানের জন্যেও হতে পারে। আমি এসে দেখি তিনি ক্রিস্টালের গ্লাসে হুইস্কি খাচ্ছেন। এই পয়তাল্লিশ মিনিটে তিন গ্লাস হয়েছে। প্রচুর মদ্যপান করলে মানুষের চোখ চকচক করে। এই জ্ঞানও আমার আরেফিন সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া । এলকোহল বেশি পরিমাণে শরীরে ঢুকলে চোখের মণি ডাইলেটেড হয়। তখন আলো বেশি প্রতিফলিত হয় ।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'ময়ূরের গল্পের শেষটা বলে ফেলি।'

'জ্বি বলুন। আমার ঘুমও কেটে গেছে। এখন আর গল্প শুনতে শুনতে হাই তুলব না।'

'হাই তুললেও ক্ষতি নেই। যারা শিক্ষকতা করে তারা শ্রোতাদের হাই তোলায় বা কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ায় আহত হয় না। এর সঙ্গে তারা পরিচিত। পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে কম করে হলেও পাঁচটা ছেলে হাই তুলবে। দু'জন ঘুমিয়ে পড়বে। এবং চারজন পাশের বন্ধুর সঙ্গে কাটাকুটি ধরনের খেলা খেলবে ।'

আমি ময়ূরের গল্পের শেষ অংশ শোনার জন্যে তৈরি হলাম। ভালো ছাত্র ভালো ছাত্র ভাব করে আরেফিন সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। যেন এটা মানুষের মুখ না— ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডে চকের লেখা আপনাআপনি ফুটে উঠছে। আমার হাতে নোটবই। নোটবই-এ আমি নোট করছি।

প্রায় একঘণ্টা হাতে ধরে— জ্ঞানী অধ্যাপকের বকবকানি শুনছি— মানুষের পক্ষে যতটুক বিরক্ত হওয়া সম্ভব তারচেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এর মধ্যে একবারের জন্যেও মালিহা খালা উকি দেননি।

আমি কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় এসেছি। এরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। সময়ের ব্যাপারে এরা খুবই সাবধান। কেউ এলে প্রথম তার দিকে তাকান না, প্রথম তাকান ঘড়ির দিকে। আমি আসার পর থেকে ময়ুর-বিষয়ক জ্ঞানের কথা শুনছি। মালিহা খালার দেখা নেই। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে উনি বোধহয় বাসাতেই নেই। বাসায় থাকলে এর মধ্যে কোনো-না-কোনো স্পেশাল ডিশ

নিয়ে উপস্থিত হতেন। খাঁটি বাংলা ধরনের খাবার— যে খাবার রান্না করতে বাঙালি মেয়েরা ভুলে গেছেন, কুমড়ো ফুলের বড়া, খাসির নাড়িভুড়ি ভাজা, গরুর চর্বিতে ফ্রাই করা কটকটি ভাজা । কিন্তু মালিহা খালা ভোলেননি।

আরেফিন সাহেব চশমা ঠিক করতে করতে ময়ূরের গল্পের শেষ অংশ শুরু করলেন। যদিও আমি খুব ভাল করে জানি– এটা শেষ না । শেষের পরেও থাকবে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টের পরে থাকবে উপসংহার। পুনশ্চের পিঠে পুনশ্চ।

'নাচ শেষ করে পুরুষ ময়ূর চারদিকে তার স্পার্ম ছড়িয়ে দেয়। এবং সেই স্পার্ম খুঁটে খুঁটে খায় স্ত্রী ময়ূর। এবং এর ফলে ময়ূরী গর্ভবতী হয়। ইন্টারেস্টিং না ?'

আমি বললাম, মোটেই ইন্টারেস্টিং না। ওয়াক থুইং।

'ওয়াক থুইং মানে ?'

'ওয়াক থুইং মানে— ওয়াক থু।'

'তুমি কি সবসময় এমন ফানি ভঙ্গিতে কথা বলো ?'

'চেষ্টা করি । সবসময় পারি না।'

'আমার মনে হয় সবসময় ফানি হবার চেষ্টা করা ঠিক না। এতে তোমার মধ্যে জোকার-ভাব চলে আসবে। তুমি সবাইকে হাসাবার একটা দায়িত্ব বোধ করতে থাকবে। একটা পর্যায়ে তোমার পার্সোনালিটি কলাপস করবে। আমার ধারণা এখনি করেছে।'

আমি আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্যে বললাম, খালা কি বাসায় নেই ?

'বাসায় আছে। তাকে কীজন্যে দরকার বলো।'

'এক কাপ চা খেতাম।'

'কফি হলে চলবে ?'

'চলবে।'

'এই মুহূর্তে তোমার খালার সঙ্গে দেখা হবে না। অপেক্ষা করতে হবে। তোমার কফি আমি বানিয়ে আনছি। চিনি ক' চামচ খাও ?'

'আমার কোনো ফিক্সড ব্যাপার নাই। যে যা দেয় তাই খাই।'

'Again you are trying to be funny. Please don't do that.'

আরেফিন সাহেব আমার জন্যে কফি আনতে গেলেন । আমার ধারণা কফি নিয়ে এসেই ময়ূর-বিষয়ক গল্পের পরিশিষ্ট শুরু করবেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিতে দিতে আমাকে গল্পের পরিশিষ্ট শুনতে হবে। ঠাণ্ডা কফি– কারণ পুরুষমানুষ যখন চা বা কফি বানায় তখন সেই চা-কফি সবসময় ঠাণ্ডা হয়, চিনি বেশি হয়। এবং সেই চা বা কফিতে একটা পুরুষপুরুষ গন্ধ থাকে।

আরেফিন সাহেব (তাকে সাহেব বলা ঠিক না, আমার বলা উচিত খালু। আরেফিন খালু। আরেফিন নামটাকে শর্ট করে আরে-খালু বললেও খারাপ হয় না।) মগ ভর্তি কফি আমার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, বাই এনি চান্স আজ সারাদিনে কি তোমার খালার সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে ?

আমি বললাম, হয়েছে।

'ঠিক কখন কথা হয়েছ বলো তো ?'

'এগজ্যাক্ট সময় বলতে পারব না। প্রথমবার কথা হয়েছে সন্ধ্যার দিকে। বাংলাদেশে বাস করি তো, সারাক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা আমাদের নিষেধ আছে।'

‘দ্বিতীয়বার কখন কথা হল ?’

‘প্রথমবারের ঘণ্টা খানিক পর।’

‘তার কথাবার্তা তোমার কাছে কি অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল ?’

‘না।’

‘সে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে ?’

‘জ্বি।’

‘কেন আসতে বলেছে সেটা কি ব্যাখ্যা করেছে ?’

‘না। শুধু বলেছেন– খুব জরুরি কথা আছে। আমার ধারণা জরুরি কথা টথা কিছু না, নতুন ধরনের কোনো খাবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ।’

‘কখন আসতে বলেছে ?’

‘রাত আটটায়।’

‘কফি খেতে কেমন হয়েছে ?’

‘ভালো হয়েছে। খেতে একটু অন্যরকম। তাতে অসুবিধা নেই।’

‘কফি কি কড়া হয়েছে ?’

‘একটু হয়েছে। আমি কড়া কফি পছন্দ করি।’

‘এখানে তুমি একটা ভুল করছ। শীতল পানীয় খেতে হয় কড়া। আর উষ্ণ পানীয় খেতে হয় হালকা করে।’

আমি কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললাম, আপনার এখানে আসা আমার জন্যে শিক্ষাসফরের মতো, কত কী যে শিখি।

আরেফিন সাহেব শীতল গলায় বললেন, তুমি কি আমাকে রিডিক্যুল করার চেষ্টা করছ ?

‘জ্বি না।’

‘আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা জোকারি করা তারা জোকারির ফাঁকে ফাঁকে অন্যকে রিডিক্যুল করার চেষ্টাও করে। তুমি কফিটা খাচ্ছ না কেন ?’

‘ভালো লাগছে না।’

‘ভালো না-লাগলেও খেতে হবে।’

‘কেন, আপনি বানিয়েছেন বলে?’

আরেফিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। কথাগুলি শোনার পূর্বশর্ত হচ্ছে— কফি খেয়ে শেষ করা। কফিতে আমি সামান্য রাম মিশিয়ে দিয়েছি। এই রাম তোমার নার্ভকে ষ্টেবল রাখতে সাহায্য করবে। আমি যে-কথাগুলি বলব তা শোনার জন্যে নার্ভ স্টেবল থাকা দরকার। আমি যে পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়েছি এই কারণে খেয়েছি।

‘পাঁচ পেগ হুইস্কি আপনাকে কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘আমি খুব শক্ত নার্ভের মানুষ। কতটা শক্ত তা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না। যাই হোক কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ করো।’

‘কফি খাব না। রাম দেয়া কফি খেয়ে অভ্যাস নেই। আমার গা কেমন যেন করছে। শেষটায় ময়ূরের মতো নাচতে শুরু করলে কেলেঙ্কারি।’

‘Young man don't try to be funny.’

খালু সাহেব আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, বলে ফেলুন। আমার নার্ভ আপনার মতো

শক্ত না হলেও খারাপ না । প্লাষ্টিকের নার্ভ। কোনো কিছুতেই এফেক্ট করে না।

'তুমি দয়া করে আমাকে খালু সাহেব ডাকবে না। খালু সাহেব শুনতে ভালো লাগে না। আমাকে নাম ধরে ডাকতে পার কোনো সমস্যা নেই।'

'নাম ধরে ডাকতে খারাপ লাগলে আরেফিন সাহেবও বলতে পার।'

'আপনাকে নাম ধরে ডাকলে মালিহা খালা রাগ করবেন।'

আরেফিন সাহেব অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার মালিহা খালা রাগ করবেন না। রাগ করার মতো অবস্থা তার না। She is dead like a log.

আমি তাকিয়ে আছি। আরেফিন সাহেব বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খালিগ্লাস নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গ্লাস ভর্তি করে ফিরে এলেন। গ্লাসে বরফের টুকরো ভাসছে। গোল করে কাটা লেবুর স্লাইস ভাসছে। তিনি চুমুক দিতে দিতে আসছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে-জিনিস তিনি খেতে খেতে আসছেন তা অত্যন্ত স্বাদু।

তিনি আমার সামনে বসতে বসতে বললেন—তুমি যে তোমার খালার মৃত্যুসংবাদ শুনে চেচিয়ে ওঠেনি এতে আমি ইমপ্রেসড। মৃত্যু এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না। মৃত্যুসংবাদ শুনে হাতপা এলিয়ে পড়ে যাওয়াও কোনো কাজের কথা না। বেশিরভাগ মানুষ এরকম করে। যাই হোক এখন আমি পুরো ব্যাপারটা বলব। তুমি মন দিয়ে শোনো।

'খালার ডেডবডি কি ঘরে আছে ?'

'ঘরে আছে মানে ? রীতিমতো সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে। রুচিকর দৃশ্য না বলেই তোমাকে দেখতে বলছি না। তারপরেও দেখতে চাইলে বসার ঘরের জানালা ফাঁক করে পর্দা সরিয়ে দেখে আসতে পার । দেখতে চাও ?'

'না ।'

'এক পেগ হুইস্কি খেয়ে দেখবে। এইসব পরিস্থিতিতে হুইস্কি টনিকের মতো কাজ করে।'

'হুইস্কি খাব না। কিন্তু সিগারেট খেতে পারি। আপনার কাছে কি সিগারেট আছে ?'

আরেফিন সাহেব সিগারেট-কেইস এবং লাইটার এনে দিলেন। আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, খুনটা কি আপনি করেছেন ?

আরেফিন সাহেব গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমার এইরকম সন্দেহ হচ্ছে ?

'হ্যাঁ।'

'এরকম সন্দেহ হবার কারণ কী ? আমি খুব স্বাভাবিক আছি এই কারণে ? ঘরে ডেডবডি রেখে ময়ূরের গল্প করছি। হুইস্কি খাচ্ছি। গেস্টকে কফি বানিয়ে খাওয়াচ্ছি... আমাকে খুনি ভাবার পিছনে আমার এইসব কর্মকাণ্ড কি কাজ করছে ?'

'বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হয়েছে বলে বললাম।'

'হঠাৎ বলে কিছু নেই। পৃথিবীটা হচ্ছে Cause and effect—এর পৃথিবী। প্রথমে cause তারপর effect, হুট করে তুমি কাউকে খুনি ভাববে না। সেই ভাবনার পেছনে অবশ্যই cause থাকতে হবে।'

'খালা মারা গেছেন কখন ?'

'আমি ডেডবডি ডিটেক্ট করি সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশে। আমার মনে হয় মৃত্যুর আগে

তোমার খালা তোমার সঙ্গেই শেষ কথা বলেছে।'

'পুলিশকে খবর দিয়েছেন ?'

'না। সব গুছিয়ে নিয়ে পুলিশকে খবর দেব। নয়তো পুলিশ এসে প্রথমেই তোমার মতো প্রশ্ন করবে— খুন কখন করেছেন ? আমি কী বলছি না-বলছি মন দিয়ে শুনবেও না। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'সব কি গুছিয়ে নিয়েছেন ?'

'না। ধাতস্থ হয়ে নিচ্ছি। আমি একা তো গুছাতে পারব না। তোমাকে নিয়ে গুছাতে হবে।'

আমি বললাম, ও । বলেই স্থির হয়ে গেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছি বিরাট বড় যন্ত্রণায় পড়তে যাচ্ছি। ভুল বললাম বিরাট যন্ত্রণাতে তো এমনিতেই আছি। পুলিশ ছায়ারমতো পেছনে আছে। এখন পড়ব আরো গভীর যন্ত্রণায় ।

আমি বসে আছি জ্ঞানী অধ্যাপকের সামনে । অধ্যাপক সাহেব হালকা নীল রঙের ঢিলেঢালা পোশাক পরে সোফায় পা তুলে বসে আছেন। তার হাতে হুইস্কির গ্লাস। যে বসার ঘরে বসে আছি, তার সাজ-সজ্জাও ইন্টেলেকচুয়েল ধরনের। কার্পেটের উপর শীতল পাটি। শীতল পাটির উপর বেতের সোফা। বেতের সোফার গদিগুলিতে কাঁথা-ষ্টিচের কভার । দেয়ালে পেইনটিং ঝুলছে। পিকাসোর ব্লু পিরিয়ডে আঁকা ছবির রিপ্রিন্ট । কার্পেটের রঙ বদল হলে পিকাসোও বদলাবেন বলে আমার ধারণা। ঘরে এসি চলছে। আরামদায়ক ঠাণ্ডা। এই বাড়িরই শোবার ঘরে একজন মহিলা সিলিং ফ্যানে ঝুলছেন বিশ্বাস করা কঠিন। অধ্যাপক সাহেব রসিকতা করছেন না তো ? জ্ঞানী মানুষদের রসিকতাগুলিও উচুশ্রেণীর হবার কথা। হয়তো দেখা যাবে মালিহা খালা শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বলবেন— হিমু কখন এসেছিস । জ্বর-জ্বর লাগছিল বলে শুয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারিনি। তুই আমাকে ডাকলি না কেন ? ছোট মাছ দিয়ে একটা টকের তরকারি করেছি। খেয়ে দেখ তো !

আরেফিন সাহেব সরু-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভুরু সামান্য কুঁচকে আছে। চিন্তার ভেতর আছেন বলে মনে হচ্ছে।

'হিমু।'

'জি।'

'আমার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার মন থেকে সন্দেহটা দূর করা। তোমার মন যদি লজিক্যাল হত তা হলে গোড়াতেই আমাকে সন্দেহ করতে না। তোমার খালার ওজন দু-মণের কাছাকাছি। দুইমণি আলুর বস্তা সিলিং ফ্যানে ঝুলানো আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই কাজে অতি অবশ্যই আমার একজন একমপ্লিস লাগবে। একমপ্লিস মানে আশা করি জান । একমপ্লিস মানে হল সাহায্যকারী। এখনো কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার খালার এই গন্ধমাদন পর্বত আমার পক্ষে কপিকল ছাড়া সিলিং ফ্যানে ঝুলানো সম্ভব ?'

'না সম্ভব না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'দ্বিতীয় লজিক হচ্ছে শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমার পক্ষে নিশ্চয়ই খুন করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে আসা সম্ভব না।'

'জ্বি না সম্ভব না।'

'তৃতীয় যুক্তিটি মারাত্মক। তোমার খালা একটা সুইসাইড নোট রেখে গেছেন। সো

নাইস অব হার । এই সুইসাইড নোটটাই আমাকে রক্ষা করবে।'

'সুইসাইড নোটটা একটু পড়ে দেখি।'

'নিশ্চয়ই পড়ে দেখবে। As a matter of fact তোমারই আগে পড়া উচিত। কারণ সুইসাইড নোটে তোমার নাম আছে।'

'বলেন কী ! আমি কেন ?'

আরেফিন সাহেব পকেট থেকে কাগজ বের করে আমার কাছে দিলেন । এই ভয়াবহ কাগজ নিয়ে ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার ভঙ্গিতে বসেছিলেন তা ভাবাই যায় না।

দেখেই চিনলাম খালার হাতের লেখা। এরকম গুটিগুটি অক্ষরের লেখা স্লিপ আমি বেশ কয়েকটা পেয়েছি। এই কাগজটায় বলপয়েন্টে লেখা—

আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।
আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে আমি
ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কেন এমন ভয়াবহ
সিদ্ধান্ত নিলাম তা হিমু কিছুটা জানে।
ইতি
মালিহা বেগম

আরেফিন সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার খালার মৃত্যু সম্পর্কে তুমি কী জানো দয়া করে আমাকে বলো। পুলিশের আগে আমি জানতে চাই। আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার।

'আমি কিছুই জানি না।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও পুলিশ করবে না। কোনো কিছু না-জানলেও একটা কিছু বের করো। পুলিশকে বলতে হবে। আমি কি তোমাকে কোনো সাজেশান দিতে পারি ?'

'দিন।'

'পুলিশকে বলো যে তোমার খালার দাম্পত্য-জীবন ছিল বিষময়। এটা মিথ্যাও না। আমার সম্পর্ক আদায় কাচকলায় এর চেয়েও খারাপ। তোমার খালা এ পর্যন্ত দু'বার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে।'

'বলেন কী ?'

'একবার থ্যাংকস গিভিং ডে-তে টার্কি কাটছিল, তখন আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল। তোমার খালা তার টেম্পার লুজ করে ছুরি হাতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। পাঁচটা স্টিচ লেগেছে।'

'ও।'

'তুমি যেভাবে 'ও' বললে তাতে মনে হল—আমার কথা বিশ্বাস করলে না। ঘটনা অনেকদূর গড়িয়েছিল। পুলিশি তদন্ত হয়েছে। আমেরিকান পুলিশের কাছে রেকর্ড আছে।'

'ও।'

'এইবারের 'ও' টা আগের বারের চেয়ে ভালো হয়েছে। দ্বিতীয়বার খুনের চেষ্টা কী ভাবে করে তা তোমাকে বলতাম। দ্বিতীয়বারের চেষ্টাটা ছিল হাস্যকর ছেলেমানুষী চেষ্টা। কিন্তু হাতে সময় নেই। দশটা বাজে পুলিশ চলে আসবে।'

'পুলিশ কি কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময়ই আসার কথা ?'

‘আমার কথার জবাব দেবার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল।’

আমি চমকে আরেফিন সাহেবের দিকে তাকালাম । পুলিশ না তো ? আরেফিন সাহেব বললেন, পুলিশ না । পুলিশ কখনো একবার বেল টেপে না। পৃথিবীর সবচে ভদ্র পুলিশ হল বৃটেনের পুলিশ। এরাও পরপর তিনবার বেল টেপে । যাও দরজা খোলো। আমার পক্ষে দরজা খোলা সম্ভব না । আমার পা টলছে। পাঁচটা হুইস্কি খাওয়া ঠিক হয়নি। আমার লাস্ট লিমিট হচ্ছে চার ।

আমি দরজা খুললাম। মালিহা খালা দাঁড়িয়ে আছেন। দু’হাত ভর্তি ব্যাগ। বাজার করে ফিরেছেন বোধ হয়। খালা হাসি মুখে বললেন- তোকে বুদ্ধিমান ছেলে বলে জানতাম। তুই তোর খালু সাহেবের ফাঁদে এভাবে পা দিবি বুঝতেই পারিনি। দরজা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। একটু সরে দাঁড়া। আর মুখ থেকে জম্বি ভাবটা দূর কর তো।

আরেফিন সাহেব বললেন, কিছু মনে কোরো না হিমু তোমার সঙ্গে একটু প্রাকটিক্যাল জোক করলাম। তোমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে হুইস্কি বলে যা খাচ্ছি- তাও আসলে হুইস্কি না- জাষ্ট প্লেইন ওয়াটার । মানুষের সব কথা এমন চট করে বিশ্বাস করবে না। তবে মালিহা, তোমার এই Nephew কঠিন চিজ আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস-করলেও ভড়কায়নি। টাইট হয়ে বসেছিল। I am impressed.

৫

আমার কি উচিত মানুষের সব কথা বিশ্বাস করা ? তর্কে যাকে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় বিশ্বাসে। তর্ক হল আগুনের মত। যে-আগুনের কাছে এলে বিশ্বাস বাষ্পের মত উবে যায়।

মালিহা খালার বাসা থেকে বের হলাম মন খারাপ করে । খালা এবং তার স্বামী দু'জনে মিলে আমাকে বোকা বানিয়েছে মন খারাপটা সে কারণে না। অন্য কোনো কারণে, যা আমি ধরতে পারছি না। মাথার মধ্যে একই খটকা ঢুকে গেছে। অস্থির বোধ করছি। মনে হচ্ছে কোনো বড় ধরনের সমস্যা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মন বসছে না। কোনো কিছুতেই মন বসছে না।

অস্থিরতা বিষয়ে আমার বাবা এলার্জিক ছিলেন । পুত্রের প্রতি যে সব উপদেশ রেখে গেছেন তার একটি অস্থিরতা বিষয়ক ।

> কখনো কোনো অবস্থাতে অস্থির হইবে না। পৃথিবী
> সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণিতে তুমি
> কখনো অস্থিরতা পাইবে না। তুমি পৃথিবীর স্বভাব
> ধারণ করবে। মানুষ বাদ্য যন্ত্রের মত। সেই বাদ্য
> যন্ত্র নিয়ত সংগীত তৈরি করে। অস্থির বাদ্যযন্ত্র
> সংগীত সৃষ্টিতে অক্ষম। কাজেই তোমার জন্যে
> অস্থিরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল। আমি জানি
> ইহা জগতের কঠিনতম কর্মসমূহের একটি। বাবা
> হিমু, কাউকে কাউকে তো কঠিনতম কর্মগুলি করিতে

হইবে ?

আমি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলাম। পকেটবিহীন পাঞ্জাবিগুলিতে আমি এখন বিরাট-বিরাট পকেট লাগিয়েছি। যখন চলাফেরা করি পকেট ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে চলা ফেরা করি। এই মুহুর্তে আমার পকেটে মোবাইল টেলিফোন ছাড়া আর যে সব জিনিসপত্র আছে তা হচ্ছে—

১. একটা দেয়াশলাই।

২. সিগারেটের খালি প্যাকেট।

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। প্যাকেটটা ফেলা হয়নি। পকেটে রেখে দিয়েছি।

৩. একটা মোমবাতি।

বড় সাইজের মোমবাতি। পাঁচ টাকা করে পিস। মোমবাতিটা খুব কাজে লাগে! রাতে কোনো বাসায় গিয়েছি, লোড শেডিং এর কারণে কারেন্ট চলে গেল। ওম্নি ম্যাজিসিয়ানদের মত পকেট থেকে মোমবাতি বের করলাম ।

৪. এক শিশি আতর।

আতরের নাম মেশকাতে আম্বর । বিছমিল্লাহ হোটেলের মালিক দয়াল খাঁ উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছেন। অতি উৎকট গন্ধ। দয়াল খাঁ বলেছেন- বিশেষ-বিশেষ সময়ে এই গন্ধই অপূর্ব লাগে। বিশেষ সময় বের করার জন্যই এই আতরটা দরকার।

৫. একটা হ্যান্ডবিল।

পিজি হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। বোরকা পরা এক মহিলা হাতে হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দিলেন। অনেক মানুষের হাতে হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দেবার কাজটা বোরখাপরা মহিলারা করেন না। ইনি করছেন দেখে ভাল লেগেছে বলে হ্যান্ডবিল রেখে দিয়েছি। হ্যান্ডবিলে জনৈক দেওয়ান কফিলউদ্দিন জানাচ্ছেন যে তিনি গ্যারান্টি সহকারে ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন। হ্যান্ডবিলটা রেখে দিয়েছি যদি কখনো সুযোগ হয় এই মহান চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলব।

পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে আমি অপেক্ষা করছি। রাস্তা পার হয়ে একজন আমার দিকে আসছেন। তার হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে তার পকেটে সিগারেট আছে কিন্তু দেয়াশলাই এর অভাবে ধরাতে পারছেন না। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে নিশিরাতে যারা চলাফেরা করে তাদের বেশির ভাগের সঙ্গেই দেয়াশলাই বা লাইটার থাকে না ।

‘ব্রাদার আগুন হবে ?’

আমি দেয়াশলাই দিলাম। তিনি সিগারেট ধরালেন। বিচারকের মত দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। আমিও তাকে দেখলাম। মুখে হালকা বসন্তের দাগ । ছোট-ছোট চোখ। আশ্বিন মাস হলেও, চাদর গায়ে দেয়ার মত শীত না। কিন্তু তিনি বেশ ভারী একটা চাদর গায়ে দিয়ে আছেন। ভদ্রলোক দেয়াশলাইটা নিজের পকেটে রেখে কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে রওনা হলেন । আমি তাকে বললাম না, ভাই চলাফেরা করে যাদের কখনোই কিছু বলতে হয় না। তবে এরা আরেকটু রাত করে নামে, ইনি সকাল-সকাল নেমে পড়েছেন। ট্রাকের পেছনে

সাবধানবাণী থাকে একশ হাত দূরে থাকুন। এদের গায়ে কোনো সাবধানবাণী লেখা থাকে না তারপরও এদের কাছ থেকে পাঁচশ হাত দূরে থাকতে হয়।

আমার মন অস্থির হয়ে আছে বলেই বোধহয় লোকটার পেছনে-পেছনে যেতে ইচ্ছা করছে। ঘাতক ট্রাকের পেছনে যে ছোট্ট বেবীটেক্সি থাকে তার স্পীডও এক সময় বেড়ে যায়। সে চলতে থাকে ট্রাকের পেছনের মাডগার্ডে গা লাগিয়ে ।

'হিমু ভাই না ?'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মুসলেম মিয়া। আমার অতি পরিচিত একজন। সাইজে ছোট-খাট পর্বত। বছর পাঁচেক আগে যে মেসে ছিলাম তার বাবুর্চি ছিল। আগুনের আঁচ সহ্য হয় না বলে বাবুর্চির কাজ ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছিল । ফ্লাক্সে করে চা বেচা । ভ্রাম্যমান টি স্টল। হাঁটাহাটিতে শরীর একটু কমবে এই দুরাশাও ছিল। বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যবসা নেই যা সে করেনি। গভীর রাতে যখন হাঁটাহাটি করছে তখন নিশ্চয়ই নতুন কোনো ব্যবসা।

'আমারে চিনেছেন ? আমি মুসলেম— ফ্লাক্সে কইরা চা বেচতাম।'

'চিনেছি।'

'করেন কী ?'

'কিছু করি না। তোমার এখন কিসের ব্যবসা ?'

'জিজ্ঞেস কইরেন না ভাইজান। লজ্জা পাব, তয় চুরি-ডাকাতি না।'

'পুরিয়া বিক্রি?'

'ছি, ভাইজান নিশার জিনিস আমি বেচব ? আমার কথা বাদ দেন ? আপনেরে দেইখ্যা মনে হইতেছে মন অত্যধিক খারাপ?'

'ঠিকই ধরেছ।'

'ঘটনা কী ভাইজান ?'

'একজন আমার দেয়াশলাই নিয়ে চলে গেছে। এই জন্যে মনটা খারাপ।'

মুসলেম পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল- ধরেন এইটা সাথে রাখেন। আমি মুসলেম থাকতে আপনে দেয়াশলাই-এর মত তুচ্ছ জিনিসের জন্যে মন খারাপ করবেন। সিগারেট লাগব ?

'দাও।'

মুসলেম আমাকে সিগারেট দিল। আমাকে আড়াল করে নিজেও একটা ধরাল। আমি বললাম, 'বৃষ্টি হবে মুসলেম ।'

মুসলেম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আসমান ফকফকা। বৃষ্টি হইব না।

'আমার মন বলছে হবে।'

'আপনের মন বললে অবশ্যই হবে। আপনের কথা ভিন্ন।'

'প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলে কী হয় জান ?'

'জ্বে না।'

'পাপ কাটা যায়। শরীরের ধুলা-ময়লার সঙ্গে পাপও ধুয়ে-মুছে চলে যায় ।'

'ভাইজান এইটা জানতাম না। আপনেরে কে বলেছে ? কোন মৌলানা সাব বলছেন ?'

'কোনো মৌলানা বলেনি, আমার এক খালু বলেছেন। আরেফিন সাহেব। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী। পৃথিবীর অনেক জ্ঞান তিনি হজম করে বসে আছেন। খালুর কাছে শুনেছি অস্ট্রেলীয়ার কিছু আদিবাসি আছে যাদের ধারণা প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন হয়ে স্নান

করলে শরীরের ধুলা ময়লার সঙ্গে পাপও ধুয়ে চলে যায়।'

'নেংটা হইয়া গোসল ? তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ্ বেশরম জাতি মনে হয়।'

'শরমটা একেক জাতির কাছে একেক রকম— রেইন ফরেস্টে কিছু মানুষ বাস করে এরা নগ্ন হয়ে থাকে। কাপড় পরাটাকেই এরা শরম মনে করে। এরা মনে করে যে সুন্দর শরীর দিয়ে সৃষ্টিকর্তা এদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কাপড় দিয়ে সেই শরীর ঢাকাটাই সৃষ্টিকর্তার অপমান।'

'এইটাও কি আপনার খালুজান বলেছেন ?'

'হু।'

'ভদ্রলোক বড়ই জ্ঞানী, ওনার কথাটা আমার মনে ধরেছে ভাইজান । আপনে আমারে নিয়া গেলে একবার ওনার পা ছুঁয়ে কদম বুসি করব। দোয়া নিয়া আসব।'

'আচ্ছা নিয়ে যাব।'

মুসলেম ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, পরথম বৃষ্টি রাইতে নামলে নেংটা হইয়া গোসল করতে কোনো অসুবিধা নাই। দিনে নামলে অসুবিধা। পুলিশ ধইরা নিয়া যাবে।

'তুমি কি নেংটো হয়ে গোসলের কথা ভাবছ ?'

মুসলেম দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল, পাপ এত বেশি করছি ভাইজান যে কিছু পাপ কাটান দেওন অতি প্রয়োজন। একবার পাপ কাটান দিলে আরো পাপ করণ যায়। পাপ কাটান না-দিয়া শুধু পাপ করলে অসুবিধা না ?

'অসুবিধা তো বটেই।'

'বৃষ্টিটা রাইতে নামলে জানে বাঁচি। দিনে পাবলিকের ঝামেলা আছে- তারপরে ধরেন আছে পুলিশ। আসল অপরাধী পুলিশ ধরে না— লেংটা-ফেংটা পাইলে ধইরা নিয়া মাইর দেয়। পুলিশ বড় জটিল জিনিস ভাইজান।'

মুসলেম চিন্তিত চোখে আকাশের দিকে তাকাল । তার মুখে বেশ কয়েকবার পুলিশের কথা শুনে আমার মনে পড়ল জুঁই-এর বাবার কথা । সেখান থেকে জুঁই-এর কথা। বেলীফুলের মালার কথা। এসোসিয়েশন অব আইডিয়া। বেলীফুলের মালা সঙ্গে নিয়ে জুঁই-এর সঙ্গে দেখা করার কথা। রাত কত হয়েছে কে জানে ? ফুলের দোকান কি খোলা আছে।

'মুসলেম!'

'জ্বি ভাইজান।'

'বাজে কয়টা ?'

'সাথে ঘড়ি নাই তয় ভাইজান রাইত বারটার কম না। উর্ধ্ব রাইত দুইটা, নিম্নে বারটা।'

'এত রাতে কি কোনো ফুলের দোকান খোলা আছে ?'

'ফুল দরকার ?'

'বেলী ফুলের দুটা মালা পাওয়া গেলে ভাল হত।'

মুসলেম হাসি মুখে বলল, ঢাকা শহরে তিন চারটা ফুলের দোকান আছে সারা রাইত খোলা থাকে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

'ধরেন দুপুর রাইতে হঠাৎ কইরা একটা বিবাহ ঠিক হইল। ফুল দরকার। ফুল পাইব কই ? বেলী ফুলের একটা মালার দাম চাইর টাকা । রাইত তিনটার সময় হেই

মালার দাম পনরো টাকা। তিনগুণ লাভ । চলেন আপনেরে মালা কিন্যা দেই। মালার দাম আমি দিব। রিকোয়েষ্ট!'

ফুলের দোকান একটা না, বেশ কয়েকটাই খোলা। মুসলেম আমাকে দুটা মালা কিনে দিল। এবং নিজেও দশটা মালা কিনল।

আমি বললাম, তুমি মালা দিয়ে কী করবে ?

মুসলেম উদাস গলায় বলল, কিছু করব না। শখ হয়েছে কিনে ফেলেছি। শখের জন্যে মানুষে মানুষ খুন করে । আমি দশটা মালা কিনলাম ।

'শখে মানুষ খুন করে ?'

'জ্বি করে। আপনার সঙ্গে পরিচয় করায়ে দিব। নাম বাহাদুর। আপনে এখন যাইবেন কই ?'

'জুঁই নামের একটা মেয়ের বাড়িতে যাব। ধানমণ্ডি।'

'আমি আগায়ে দিব ?'

'না আগিয়ে দিতে হবে না।'

মুসলেম বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান বৃষ্টিতে গোসলের সময় ফুলের মালা কি সঙ্গে রাখা যায় ?

'এটা তো জানি না।'

'ফুলের মালা তো আর কাপড় না। এইটা বোধ হয় রাখা যায়। আমি ভাবতেছি ফুলের মালা গলাত দিয়া যদি বৃষ্টির মধ্যে নামি.....'

মুসলেম মিয়ার গলার স্বর বদলে গেল। সে ঘোর লাগা চোখে আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টির প্রতিক্ষা। ধারা বৃষ্টিতে নগ্ন স্নানের ব্যাপারটা মুসলেমের মাথায় ঢুকে গেছে। ব্যাপারটা সে মাথা থেকে বের করতে পারছে না। বার করার চেষ্টাও করছে না বরং উল্টো আরও ভালমত ঢুকানোর ব্যবস্থা করছে। এ ধরনের ব্যাপার আমি আগেও লক্ষ করেছি— হঠাৎ কোনো একটা ব্যাপার মানুষের মাথায় ঢুকে যায়। হাজার চেষ্টা করেও সে এটা বের করতে পারে না।

আমি একজনকে জানি যার মাথায় শিমুল গাছের লাল ফুল কী করে যেন ঢুকে গিয়েছিল। প্রথম দিকে সে শিমুল গাছ দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে যেত। মুগ্ধ গলায় বলত— বাহ কী সুন্দর লাল টকটকা ফুল। তারপর সে উচ্ছসিত হতে শুরু করল। বলতে শুরু করল, গাছের মাথায় কী আগুন লাগছে ! আগুন নিভাতে দমকল লাগব । যত দিন যেতে লাগল শিমুল ফুল তার মাথায় ততই ঢুকে যেতে লাগল। শেষের দিকে তার কাজ হল শিমুল গাছের সঙ্গে কথা বলা। যখন ফুল ফোটার সময় না, তখন সে গাছের কাছে যাবে। গাছকে বলবে, হ্যালো বৃক্ষ। এই বৎসর মাথায় ঠিকমত আগুন লাগাতে পারবি তো ? দেখিস আগুন যেন ঠিকঠাক লাগে । ইজ্জতকা সাওয়াল। গত বছর তোর আগুন জমে নাই। লালটা কমতি ছিল ।

তার আত্মীয়-স্বজনরা নানান রকম চিকিৎসার চেষ্টা করল। শেষটায় রাচি মানসিক হাসাপাতালেও নিয়ে গেল। ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বললেন, কিছু করার নেই। তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হল, ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হত। কোনো একটা সুযোগ পেলেই সে ঘর থেকে বের হয়ে শিমুল গাছের মগডালে বসে থাকতো। শিমুল গাছে থেকে পড়ে গিয়ে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়।

গভীর রাতে কোনো বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ালে দারোয়ান তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। অত্যন্ত সন্দেহজনক চোখে তাকায় । এই বাড়ির দারোয়ানেরা তা করল

না। কারণ এরা দারোয়ান না—পুলিশ। পুলিশ সাহেবের বাড়ি পুলিশ পাহারা দেবে এটাই স্বাভাবিক। পুলিশের আচরণ দারোয়ানদের মত হবে না, এটাও স্বাভাবিক। আমি গেটের সামনে দাঁড়াতেই দু'জন পুলিশের একজন কাছে চলে এল এবং খুবই ভদ্র গলায় বলল, কাকে চাচ্ছেন ?

আমি বললাম, এটা জুঁইদের বাড়ি না ? আমি জুঁই এর কাছে এসেছি। দয়া করে একটু খবর দিন। বলুন- হিমু।

'খবর দিতে হবে না। যান ভেতরে যান।'

পুলিশের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হল— জুঁই আগেই গেটে বলে রেখেছে।

পুলিশ গলা নীচু করে বলল, বসার ঘরের দরজা খোলা। সবাই আপনার জন্যে বসে আছে।

পুলিশের এই কথার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হল না। সবাই আমার জন্যে বসে থাকবে কেন ? জুঁই বসে থাকতে পারে। সবাই মানে কী ? জুঁই এবং তার বাবা ? পিতা ও কন্যা ?

আমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ধাক্কার মত খেলাম। রুদ্ধ দ্বার বৈঠকের মত পরিস্থিতি। পাচজন পুরুষ মানুষ বসে আছেন। একজনের গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম। মনে হচ্ছে অতি গোপন কোনো আলোচনা চলছে।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঘরে কেউ ঢুকলে সবাই তার দিকে তাকাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকবে এটা স্বাভাবিক না। জুঁই এর বাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার কাছে চলে এলেন। আমার স্নামালিকুম বলা উচিত কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে সামাজিক সৌজন্য না-করলেও হয়। ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, জুঁই কোথায় ?

আমি মিষ্টি করে হাসলাম । যে হাসির অর্থ– জুঁই কোথায় বলছি। এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন ?

পরিস্থিতি এমন যে আমি যদি বলি জুঁই কোথায় তা তো জানি না। তা হলে শুরুতেই ভয়ংকর কিছু হয়ে যেতে পারে। ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টাটা মধুর হাসি দিয়ে সামলানো হলো। এখন দ্বিতীয় ঝাপটার প্রস্তুতি । ঝড়ের দ্বিতীয় ঝাপটা প্রথম ঝাপটার মত শক্তিশালী হয় না। এবং দ্বিতীয় ঝাপ্টার জন্যে এখন আমার মানসিক প্রস্তুতি আছে। প্রথমটার জন্যে ছিল না।

জুঁই-এর বাবা বললেন, এসো বসো । আমি গোল টেবিল বৈঠকে সামিল হলাম। জুঁই এর বাবা আমার দিকে ইঙ্গিত করে অন্যদের বললেন– এ হিমু।

এক সঙ্গে সবার চোখ সরু হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার নামের সঙ্গে এরা পরিচিত ।

জুঁই-এর বাবা বললেন, হিমু এখন বল জুঁই কোথায় ? কোন হাংকি পাংকি না । স্ট্রেইট কথা বলবে।

মধুর হাসি দ্বিতীয়বার দেয়া ঠিক হবে কি-না আমি বুঝতে পারছি না। ঝড়ের দ্বিতীয় ঝাপ্টা শুরু হয়েছে। সমস্যা হল, এই ঝাপ্টা প্রথমটার মতই শক্তিশালী। আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

বড় ধরনের বিপদে প্রকৃতি নিজে হাল ধরে। এখানেও তাই হল। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল । পুরো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। বড়লোকদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও সমস্যা হয় না। তাদের নানান ব্যবস্থা থাকে- জেনারেটার

চালু হয়ে যায়, আই পি এস চালু হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি চার্জ লাইট জ্বলে উঠে। এখানে তা হচ্ছে না। অন্ধকার বাড়ি, অন্ধকারই হয়ে আছে।

একজন অতি বিরক্ত গলায় বলল, রাত একটার সময় কিসের লোডশেডিং ? কল কারখানা সবই তো এখন বন্ধ। স্যার আপনার বাড়িতে আই পি এস নেই ?

জুঁই-এর বাবা বললেন, আছে। ইলেকট্রিক্যাল লাইনে কী যেন সমস্যা হয়েছে। এই রহমত! মোমবাতি জ্বালাও ।

অন্ধকার ঘরে ছোটাছুটি হচ্ছে। মোমবাতি পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পকেট থেকে মোমবাতি বের করলাম-দেয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালালাম। খাকি পোষাক পরা ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি পকেটে মোমবাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ান ?

আমি বললাম, জ্বি স্যার। কখন দরকার পড়ে যায়।

পরিস্থিতি এখন সামান্য হলেও আমার দিকে। সবাইকে সামান্য হলেও হকচকিয়ে দিয়েছি। এখন আমি যা বলব সবাই তা শুনবে। সামান্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে এই অসামান্য ব্যাপারটা করা হয়েছে। আমি জুঁই-এর বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার জুঁই কোথায় আমি জানি না। রাত দশটায় এই বাড়িতে এসে আমার কফি খাবার কথা। আসতে সামান্য দেরি হয়েছে। জুঁই এত রাতেও বাড়িতে ফেরেনি শুনে আমি অবাক হচ্ছি।

'তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি তার where abouts জান না ?'

'জ্বি না।'

'তোমার সঙ্গে মোবাইল আছে না ?'

'জ্বি আছে।'

'অন করা আছে ?'

'জ্বি আছে।'

'সে মোবাইলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি ?'

'জ্বি না।'

আমি লক্ষ করলাম জুঁই-এর বাবার সঙ্গে খাকি পোষাক পরা ভদ্রলোকের চোখের ইশারায় কিছু কথা হচ্ছে। মোমবাতির অল্প আলোয় চোখের ভাষা ঠিক পড়া যাচ্ছে না। অবশ্যি আলো বেশি থাকলেও লাভ হত না । চোখের ভাষা একেক শ্রেণীর জন্যে একেক রকম। অফিসের কেরাণীদের চোখের ভাষা, এবং পুলিশের চোখের ভাষা এক না। আমি শুধু রাস্তায় যারা হাঁটাহাটি করে তাদের চোখের ভাষা পড়তে পারি। অন্যদেরটা পারি না ।

'হিমু!'

'জ্বি স্যার।'

'জুঁই আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের হয়েছে। এখন রাত বাজছে একটা কুড়ি। এখনো ফিরছে না।'

'কোনো বান্ধবীর বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আড্ডা দিতে গিয়ে এত রাত হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। ওদের আবার টেলিফোনও নষ্ট । খবর দিতে পারছে না।'

'হিমু শোনো, তোমার এত কথা বলার দরকার নেই। তুমি যেখানে থাক সেখানে চলে যাও। জুঁই খুব সম্ভব তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এবং যোগাযোগ করা মাত্র আমাকে জানাবে।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি এখনই চলে যাব ?'

'হ্যাঁ। গাড়ি তোমাকে নামিয়ে দেবে।'

'কোনো দরকার নেই স্যার।'

'তোমার দরকার না থাকতে পারে। আমার আছে।'

আমি ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে মোমবাতিটা আবার পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মোমবাতি আমি নিয়ে যাব এটাই স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে খুব স্বাভাবিক কাজও আশেপাশের সবার চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়। যে পাঁচজন বৈঠক করছেন তাদের কাছে আমার আচরণ খুবই অস্বাভাবিক লাগছে তা বুঝতে পারছি। লাগুক অস্বাভাবিক।

মানুষকে সব সময় স্বাভাবিক লাগবে এটা কোনো কাজের কথা না। প্রাণী হিসেবে মানুষ অস্বাভাবিক। সে স্বাভাবিকের ভঙ্গি করে পৃথিবীতে বাস করে। আমি পুলিশের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, জুঁই-এর বাবা বের হয়ে এলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, এক কাজ করো তুমি তোমার মোবাইলটা রেখে যাও।

আমি মোবাইল তার হাতে দিলাম। তিনি বললেন, পুলিশের গাড়িতে করে তোমাকে পৌছে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি হেঁটে চলে যাও। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

৬

খবরটা ছাপা হয়েছে পত্রিকার প্রথম পাতায় । ছবি সহ বক্স নিউজ। এখনকার পত্রিকাগুলি অন্যরকম হয়ে গেছে, গুরুত্বহীন খবরগুলি প্রথমপাতায় ছাপা হয়। মিথ্যা খবর দিয়ে লিড নিউজ আসে। আগে ধর্ষণ সংক্রান্ত খবরগুলি ছাপা হত ম্যাগাজিনে। দৈনিক পত্রিকাওয়ালারা দেখল- এমন একটা 'মজাদার আইটেম' তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে- তারাও শুরু করল ধারাবাহিক ধর্ষণ প্রতিবেদন ।

ধর্ষণের পরের আইটেম ধারাবাহিক গালাগালি প্রতিবেদন। সরকার প্রধান বিরোধীদলকে গালি দিয়ে কী বললেন, আবার বিরোধীদলের প্রধান সরকারকে গালাগালি দিয়ে কী বললেন তার বিশদ বর্ণনা ।

রাজনীতির খেলা যত জমে পত্রিকাওয়ালাদের ততই রমরমা । রাজনীতিবিদরা তাদের খেলা খেলেন, পত্রিকাওয়ালারা খেলেন তাদের খেলা। তারা যে নিরপেক্ষ ভাবে খেলেন, তা না। প্রতিটি পত্রিকামালিক কোনো-না-কোনো রাজনীতিবিদের থলেতে বসে খেলেন । এই সিনড্রমের একটা নাম ক্যাঙ্গারু সিনড্রম। ক্যাঙ্গারুর ছানার মত থলেয় বসে খেলাধুলা।

আজকের প্রথম পাতায় বক্স করে ছাপা সংবাদটার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত না, হিমুনীতি খানিকটা জড়িত বলে খবরটা দু'বার পড়লাম। পত্রিকা পড়া আমার কাজ না। আজকের কাগজটা কিনিয়েছি জুঁই এর কোন খবর পত্রিকায় উঠেছে কি-না দেখার জন্যে। "পুলিশ কর্মকর্তার কন্যা নিখোঁজ" এই শিরোনামে পত্রিকাওয়ালারা কিছু লিখেছে কি ? কন্যা নিখোঁজ আইটেম ধর্ষণের মত ইন্টারেষ্টিং না হলেও খারাপ না ।

এ জাতীয় কোনো খবর নেই। তবে অন্য খবর আছে। প্রথম পাতায় সেই খবর

পেয়ে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল-

তপ্ত নগরীতে প্রথম বৃষ্টিধারা
এক দল নগ্ন মানুষের উল্লাস নৃত্য
(নিজস্ব প্রতিবেদন)

দীর্ঘ দাবদাহের পর গতকাল রাজধানীতে শান্তির বারিধারা হয়েছে। রাত একটার দিকে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তুমুল ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষল ধারে বর্ষণ শুরু হয়। দাবদাহে অতিষ্ট মানুষের মনে নেমে আসে প্রশান্তি । এই সঙ্গে নিউ পল্টন এলাকায় একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। জনৈক বিশালবপু মুসলেম মিয়ার নেতৃত্বে একদল মানুষ বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে নাচতে শুরু করে । তাদের প্রত্যেকের গলায় ছিল বেলী ফুলের মালা। তাদের উদ্যাম নৃত্য দেখে আতংকিত কিছু মানুষ পুলিশে খবর দেন। পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হওয়া মাত্র নৃত্যরত নগ্নদলের সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে, শুধু নাটের গুরু মুসলেম মিয়া পুলিশের হাতে ধৃত হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মুসলেম বলে, প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন নৃত্য করলে পাপ কাটা যায়। সে যেহেতু বিরাট পাপী ব্যক্তি, পাপ কাটানোর জন্যেই সে এই কাণ্ড করেছে। পুলিশ আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে দু'দিনের রিমান্ডে নেবার আয়োজন করেছে।

পুলিশ হাজতে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে মুসলেম মিয়ার কিছু কথাবার্তা হয়।প্রতিবেদককে সে জানায়—প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন স্নান করার ফলে সে এখন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। এমন নিষ্পাপ অবস্থাতেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায়। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। উল্লেখ্য প্রতিবেদকের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে পরিধানের জন্যে একটি লুংগী দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে ।

ঘটনাটি জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আগামীকাল মুসলেম মিয়া এবং তার জীবন দর্শন নিয়ে আমরা একটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন পাঠকপাঠিকাদের উপহার দেব।

প্রতিবেদন পড়ে আমি হিমু কিছুক্ষণ ঝিমু হয়ে বসে রইলাম । পত্রিকাওয়ালারা মুসলেম মিয়াকে নিয়ে যে হৈ চৈ টা করবে তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবেদনের পর প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। একদল মানুষের কাছে সে রাতারাতি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে নানান ধরনের বিস্ময়কর খবর রটতে থাকবে। একটা সময়ে রাজনীতিবিদরা, মন্ত্রীরা, বড় বড় আমলারা গভীর রাতে গোপনে গাড়িতে করে তার কাছে আসতে শুরু করবেন। কারণ নেংটা বাবার দোয়া তাদের দরকার।

পুলিশ দু'একদিনের মধ্যে আমাকে এসে ধরে নিয়ে যাবে এই আশঙ্কাও আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। মুসলেম মিয়া আমার নামটা পুলিশের কাছে বললেই আমি ফেঁসে যাব। পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করে দেবে। যে-কোনো হাস্যকর ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাতে পুলিশ বড়ই ভালবাসে ।

আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল— আজই আমাকে পুলিশ ধরবে, ঘন্টা দু'তিনেকের মধ্যেই পুলিশের জীপ এসে উপস্থিত হবে। এটাকে সিক্সথ সেন্স বলব কি-না বুঝতে পারছি না। সিক্সথ সেন্সই হোক আর সেভেনথ সেন্সই হোক হাজতে যেতে হলে তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বাথরুম সারতে হবে (বড়টা)। হাজতে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম যে জিনিসটা পায় তার নাম বড় বাথরুম। হাজতে

বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। বাথরুম পেলে গার্ড পুলিশের কাছে অনেকক্ষণ ধরে হাত কচলাতে হয়, নরম গলায় অনেক আবেদন নিবেদন করতে হয়। গার্ড সাহেবের দয়া হলে হাজতের ঘর খুলে তিনি বাথরুমে নিয়ে যান।

মাথার চুল কাটতে হবে। সবচে ভাল মাথাটা কামিয়ে ফেললে। চুল বড় বড় থাকলে খুবই গরম লাগে । তারচেয়েও বড় কথা প্রথম রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় রাতে পড়লেই মাথা ভর্তি হয়ে যায় উকুনে। উকুনগুলি বাইরে থেকে আসে, না এক রাতেই মাথায় গজায় এই রহস্যের মিমাংসা আমি এখনো করতে পারিনি। হাজতি-উকুনের আরেকটা মজার ব্যাপারে হচ্ছে, হাজত থেকে ছাড়া পাবার সঙ্গে-সঙ্গে উকুনও চলে যায়। হাজতি-উকুন মনে হয় হাজত ছাড়া অন্য কোনো পরিবেশে বাঁচে না।

আমি হাজত বাসের প্রস্তুতি নিয়ে বড় বাথরুম সারলাম। রাস্তার পাশে ইটালিয়ান সেলুন থেকে তিন টাকা দিয়ে মাথা নেড়া করলাম। নাপিত আবার মাথা নেড়ার পর কিছুক্ষণ মাথা মালিশ করে দিল । যে উৎসাহের সঙ্গে নাপিত মাথা মালিশ করল তাতে মনে হল- মাথা মালিশ করে সে খুবই মজা পেয়েছে।

মেসে ফিরে দেখি পুলিশ এসে গেছে। একজন সাব ইন্সপেক্টর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমার ঘরের সামনে পায়চারি করছেন । তিনি আমাকে দেখেই প্রায় হুংকার দিলেন। ভুল ইংরেজিতে বললেন— You name Himu ?

আমি বললাম, ইয়েস স্যার। I name Himu.

তিনি দ্বিতীয়বার হুংকার দিলেন– এবারের হুংকার খাটি বাংলা ভাষায়, চল থানায় চল ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, স্যার চলুন।

থানায় ওসি সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত। নাম রকিব উদ্দিন, চাঁদপুরে বাড়ি। বছর দুই আগে তিনি কিছুদিন আমাকে হাজতে রেখেছিলেন। অত্যন্ত উগ্রমেজাজের মানুষ, তবে শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে আমার খাতির হয়ে গিয়েছিল। সেই খাতির এখন কাজ করার কথা না। পুলিশ বড়ই বিস্মরণ প্রিয়। তারা অতীত মনে রাখে না। রকিবউদ্দিন সাহেব মনে রাখবেন সেই আশা আমি করিনি। দেখা গেল ভদ্রলোকের মনে আছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, বসুন। আমি বসলাম । যে সেকেন্ড অফিসার আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন রকিব উদ্দিন সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও বিরক্ত গলায় বললেন, হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়েছেন কেন ? হ্যান্ডকাফ লাগানোর দরকার ছিল না। খুলে দিন ।

আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়া হল । ওসি সাহেব চা দিতে বললেন।

চা দেয়া হল।

সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট ধরালাম ।

রকিবউদ্দিন এবার আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আজই মাথা কামিয়েছেন ?

আমি বললাম, জ্বি।

'মাথা কামিয়েছেন কেন ?'

পুলিশের লোকজন সত্যি কথা কখনই গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভট মিথ্যা তারা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে। মাথা কেন কামিয়েছি এই সত্য বলে লাভ হবে না, নানান ভাবে পেচাবে। মাথা কামানো নিয়ে ঘন্টা খানিক কথা বলতে হবে তারচে মিথ্যা বলাই ভাল। আমি বললাম, আজ একটি বিশেষ দিন। বৌদ্ধ পূর্ণিমা। এই

পূর্ণিমায় মহামতি সিদ্ধার্থ মস্তক মুন্ডন করে গৃহত্যাগ করেন। তাকে স্মরণ করে এই কাজটা করেছি। এখন স্যার বলেন আপনি কেমন আছেন ?

ওসি সাহেব বিরসগলায় বললেন, ভাল আছি।

‘আমাকে কেন আনিয়েছেন জানতে পারি কি স্যার ?’

‘হ্যাঁ জানতে পারেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব ?’

‘মুসলেম মিয়া সম্পর্কে ?’

‘কোঁন মুসলেম মিয়া ?’

‘খবরের কাগজে যার নিউজ ছাপা হয়েছে। নাসু বাবা।’

ওসি সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, মুসলেম মিয়াকে চেনেন না-কি ?

‘জ্বি চিনি।’

রকিবউদ্দিন সাহেব বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, বলেন কী ?

তার গলার আগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছে নাঙ্গু বাবা ইতিমধ্যেই প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তাকে নিয়ে গল্প গুজব ছড়াচ্ছে। আমি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললাম, সামান্য পরিচয় আছে।

‘কোথায় পরিচয় ?’

‘আমি রাতে বিরাতে হাঁটি তো। সেখানেই দেখা।’

‘লোকটার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তো প্রচণ্ড ।’

‘তাই না-কি ?’

‘হ্যাঁ প্রচন্ড। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি । যখন তাকায় তখন মনে হয়- মনের ভেতর যা আছে সব পড়ে ফেলেছে। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে । ঠান্ডা টাইপ হাসি। এরকম হাসি আমি কাউকে হাসতে দেখিনি।’

‘সে কি এই হাজতেই আছে ?’

‘না উনি আছেন ধানমণ্ডি থানায়।’

ওসি সাহেব আমার দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা ঘটনা। আপনাকে না বলেও পারছি না। ধানমন্ডি থানায় ওসি সাহেবের এক শালী- মেনস্ট্রেশন টাইমে তার প্রচণ্ড ব্যথা হয়। মাঝে মধ্যে অজ্ঞানও হয়ে যায়। তার ব্যথা উঠেছে ওসি সাহেব কি মনে করে মুসলেম সাহেবকে ঘটনাটা বললেন। শুনেই মুসলেম সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ের ব্যথা চলে গেল।

‘ও।’

‘এই ভাবে ও বললেন কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না। ধানমন্ডি থানার ওসি সাহেব নিজের মুখে ঘটনাটা আমাকে বলেছেন।’

‘আমরা কি মুসলেম মিয়াকে নিয়েই কথা বলব ?’

‘অবশ্যই না। আসুন যে জন্যে ডেকেছি এটা শেষ করি তারপর আপনাকে নিয়ে মুসলেম সাহেবের কাছে যাব।’

‘আপনার সঙ্গে পরিচয় কেমন ?’

‘খুবই খারাপ ধরনের পরিচয় । আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। একবার দাঁত-টাত বের করে কামড়াতে এসেছিল।’

‘তা হলে থাক। এই ধরনের মানুষ অবশ্যি খুব সামান্যতেই ভায়োলেন্ট হন । এদের ঘাঁটাতে নেই । আচ্ছা এখন আসল কাজে আসি। তার আগে আর এককাপ চা

খেয়ে নেবেন।'
'জ্বি না।'
'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। অনুমানে কিছু বলবেন না। প্রশ্নের উত্তর যদি জানা না থাকে বলবেন জানি না।'
'জ্বি আচ্ছা।'
'হাদিকে চেনেন ?'
'একজনকে চিনি। হাদিউজ্জামানু খান। তক্ষকের মত মুখ। লম্বা।'
'তার চেহারার বর্ণনা দিতে তো আপনাকে বলিনি। তাকে চেনেন কি না জানতে চেয়েছি।'
'চিনি।'
'তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা কবে হয়েছে?'
'গত পরশু ?'
'কী কথা হয়েছে?'
'কোনো কথা হয়নি।'
'তাকে চেনেন অথচ কথা হয়নি কেন ?'
'মালিহা খালার বাড়িতে উনি ফ্যান নামাতে গেছেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে কথা হয়নি।'
'ফ্যান কি একা একা নামাচ্ছিল না সঙ্গে কেউ ছিল ?'
'একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ছিল।'
'ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর নাম ?'
'নাম জানি না। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বা কল সারাই মিস্ত্রী, কিংবা টেলিফোনের মিস্ত্রী- এদের নাম সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয় না।'
'যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে হাদিউজ্জামানের সঙ্গে দেখেছিলেন তাকে দেখলে চিনতে পারবেন ?'
'হ্যাঁ পারব।'
'তা হলে একটু হাজতে আসুন- আইডেনটিফাই করবেন ?'
'ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভয়ংকর কিছু কি করেছে ?'
'সে একা করেনি দু'জনে মিলে করেছে। আচমকা খুন একজন করে। কিন্তু ক্যালকুলেটিভ মার্ডারের বেলায় একমপ্লিশ লাগে। খুন করেছে হাদিউজ্জামান, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী সালাম হল তার একমপ্লিশ।'
'খুন কে হয়েছে ?'
'মালিহা বেগম। আপনার খালা হন সম্ভবত ।'
আমি অবাক হয়ে রকিবউদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম । আমার এক আত্মীয় খুন হয়েছে এই খবরটা ওসি সাহেব আমাকে এখন দিচ্ছেন। খুন-টুনের ব্যাপারগুলি পুলিশের কাছে এতই গুরুত্বহীন ?
ওসি সাহেব বললেন, আপনার খালার খুন হবার খবর আপনি পাননি?
'জ্বি না।'
'কাগজে উঠেছে তো। কাগজ পড়েননি ?'
'খুন খারাবির নিউজগুলি আমি পড়ি না। এখন মনে হচ্ছে পড়া দরকার। আমার খালু, আরেফিন সাহেব উনি কোথায় ?......'

'উনাকেও খুন করার চেষ্টা হয়েছে। উনি হাসপাতালে আছেন। ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন।'

'ও আচ্ছা।'

ওসি সাহেব বললেন, 'চলুন তো আমার সঙ্গে সালামকে আইডেনটিফাই করবেন।

'হাদি সাহেবও কি হাজতে আছেন ?'

'হ্যাঁ। আছে। তবে জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। যে ডলা খেয়েছে তার খবর হয়ে গেছে।'

হাজতের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনেই পড়ে আছে। মুখ ফুলে এমন হয়েছে যে অতি পরিচিত জনেরও এদেরকে চেনার কথা না। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ছেলেটা পড়ে আছে খালি গায়ে। তার বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে। আমি আমার জীবনে কারো বুক এ ভাবে ওঠানামা করতে দেখিনি। একেকবার বুক ফুলে উঠছে আর মনে হচ্ছে ছেলেটার হৃদপিন্ড পাঁজর ফুড়ে বের হয়ে আসবে।

ওসি সাহেব বললেন, চিনতে পারছেন ?

আমি বললাম, না।

'হাদিকেও চিনতে পারছেন না ?'

'জ্বি না। যে মার মেরেছেন— মুখ যে ভাবে ফুলেছে আমি কেন পাখি এসেও চিনবে না।'

'পাখি কে ?'

'পাখি তার মেয়ে। বারো তারিখ মেয়েটার জন্মদিন। আমার দাওয়াত আছে। কোনো কাজ না থাকলে সেদিন আপনিও চলুন।'

ওসি সাহেব রাগী গলায় বললেন— আপনার খালা খুন হয়ে গেছেন আর আপনার মাথায় ঘুরছে— জন্মদিনের দাওয়াত ? আপনার ফালতু কথা বলার অভ্যাসটা দূর করুন। থানায় এসে একটা বাড়তি কথা বলবেন না।

'জি আচ্ছা। আমি কি হাদি সাহেবের সঙ্গে দুটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

আমি অনেকক্ষণ হাদি সাহেব, হাদি সাহেব বলে ডাকলাম। কেউ জবাব দিল না। অজ্ঞান মানুষ প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। তাঁর ঠোঁট কেটে দু'ফাক হয়ে গেছে, দাঁত ভেঙেছে। সে হাত তুলে আমাকে সালামও দিল । মনে হয় আমাকেও পুলিশের কেউ ভেবেছে।

আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চিত যে এরাই খুন করেছে ?

ওসি সাহেব বললেন, অবশ্যই। কিছু-কিছু খুনের মিমাংসা অতি দ্রুত হয়ে যায়, আবার কিছু কিছু খুনের মিমাংসাই হয় না। এই ক্ষেত্রে খুনের মিমাংসা দ্রুত হয়ে গেল ।

'হাদি সাহেব স্বীকার করেছেন যে খুনটা উনি করেছেন ?'

'সে করে নাই। তবে সালাম করেছে। তাকে রাজসাক্ষি করে দেব ।'

ওসি সাহেব সালামের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রে তুই খুন করেছিস?

সালাম হ্যাঁ-সুচক মাথা নাড়ল । তার কাটা ঠোঁটের কোণায় সামান্য হাসিও দেখা গেল। যেন খুন করে সে আনন্দিত ।

আমরা হাজত থেকে বের হয়ে এলাম। ওসি সাহেব বললেন, এ্যামেচার মার্ডারার। হাদি আপনার খালার ঢাকার বিষয় সম্পত্তির লোভে খুনটা করেছে। ক্যালকুলেশনস ছিল পুওর । ভজঘট করে ফেলেছে। বড় ক্রাইমের ক্রিমিন্যাল সব সময় ধরা পড়ে যায়। ক্রাইমে সে কিছু-না-কিছু খুঁত রেখে যায়। নিজের কিছু চিহ্ন রাখে। একমাত্র পুলিশই পারে কোনো রকম খুঁত ছাড়া ক্রাইম করতে। কারণ তারা খুঁতগুলি জানে।

'স্যার আপনার কথা শুনে ভাল লাগছে।'

'ভাল লাগার মত কী কথা বললাম। ভাল লাগার মত আমি কিছুই বলিনি। আপনি আপনার স্বভাবমত আমাকে নিয়ে ফান করার চেষ্টা করছেন । দয়া করে করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি চলে যাব, না থাকব ?'

'তদন্তের স্বার্থে আমার উচিত আপনাকে থানায় আটকে রাখা। কিন্তু আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে ছেড়ে দেয়ার।'

'নির্দেশটা কে দিয়েছেন ? জুঁই-এর বাবা ?'

'হ্যাঁ স্যারের নির্দেশ।'

'জুঁই-এর এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি ?'

'আমি জানি না।'

'আমি কি টেলিফোনে একটু খোঁজ নিয়ে দেখব ?'

রকিবউদ্দিন সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন । আমি আমার মোবাইলে টেলিফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই জুঁই-এর বাবার গলা শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, হ্যালো হ্যালো। কে বলছেন ?

'স্যার আমি হিমু।'

'ও তুমি।'

'জুঁই-এর কি কোনো খবর পাওয়া গেছে ?'

'না।'

'টেলিফোন করেনি ?'

'না।'

'আধ্যাত্মিক লাইনে চেষ্টা চালালে কেমন হয় স্যার ?'

'তার মানে ?'

'খুবই উচ্চশ্রেণীর এক সাধক ধানমন্ডি থানা হাজতে আছেন। তার নাম মুসলেম মিয়া। তবে এই নামে কেউ তাকে ডাকে না। এতে বেয়াদবী হয় এই জন্যেই। কেউ-কেউ তাকে ডাকেন নাঙ্গু বাবা, কারণ তিনি নগ্ন থাকেন। আবার কেউ-কেউ ডাকেন বেলী বাবা । কারণ উনি সব সময় বেলী ফুলের মালা গলায় দিয়ে থাকেন। অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন স্যার-শীত কালে যখন বেলী ফুলের সিজন না, তখনো তার গলায় টাটকা বেলী ফুলের মালা দেখা যায়। বাবার কাছে একবার গিয়ে দেখলে হত।'

'আমি কি করব না করব তা আমি ঠিক করব। তোমাকে ভাবতে হবে না ।'

'জি আচ্ছা।'

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ ?'

'থানা থেকে । আমার এক খালা খুন হয়েছেন । পুলিশ এই জন্যে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। তবে ওসি সাহেব বলেছেন, ছেড়ে দেবেন।'

'তুমি আর কিছু বলবে না-কি অর্থহীন বক বক করবে ? যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা না-থাকে তাহলে টেলিফোনটা রাখ। আমি এই টেলিফোনের লাইনটা সব সময় খোলা রাখতে চাই।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। ওসি সাহেবের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম।'

আজ সারাদিনে কোথায়-কোথায় যাব ঠিক করা দরকার। মালিহা খালার বাড়িতে যাব না। মৃত মানুষকে দেখতে যাওয়া অর্থহীন। এখানে দেখাটা হয় একতরফা । একজন দেখে- অন্যজন তাকিয়ে থাকে, দেখে না।

আরেফিন খালু সাহেবকে অবশ্যই দেখতে যাব। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে যারা থাকে তাদের দেখতে বড় ভাল লাগে। এরা তখন অদ্ভুতঅদ্ভুত কথা বলে। একজনকে পেয়েছিলাম যে বারবারই বিস্মিত হয়ে বলছিল- বেহেশত দেখতে পাইতেছি । আচানক বিষয় বেহেশত দেখতেছি। ও আল্লা একটা বাগান। বাগানটা পানির মধ্যে। কী সুন্দর টলটলা পানি। পানির মধ্যে এইটা কী আচানক বাগান। ঘর বাড়ি আছে— পানির রং বদলাইতেছে- ও আল্লা, বাগানের গাছগুলান হাসে। গাছ মানুষের মত হাসে। গাছগুলা আবার এক জায়গা থাইক্যা আরেক জায়গায় যায়... এইটা কি পানির মধ্যে পাখি উড়তাছে!!...

হাদি সাহেবের কন্যা পাখির সঙ্গেও দেখা করা দরকার। বেচারীর জন্মদিন যেন ভেস্তে না যায়। সার্কাস পার্টিরও খোঁজ নেয়া দরকার। কারো কাছে যদি হাতির বাচ্চা থাকে তা হলে একদিনের জন্যে ভাড়া করতে চাই। কে জানে একদিনের ভাড়া কত ?

আজ আকাশ মেঘমেদুর। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এক পশলা বৃষ্টি মনে হয় হয়েছে। পিচ ঢালা রাজপথ বৃষ্টির পানিতে ভেজা। রূপার পাতের মত চক চক করছে। রাস্তাগুলিতে নদী-নদী ভাব চলে এসেছে।

৭

আরেফিন খালু সাহেবকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ।

তার নাকে মুখে নল । বিছানার পাশে স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। মাথায়, হাতে ব্যান্ডেজ। একটা চোখ বের হয়ে আছে। সেই চোখের পাতা নামানো। ভাল করে দেখার আগেই পুরুষ টাইপ এক মহিলা নার্স— বের হন, বের হন বলে সবাইকে বের করে দিল। খালু সাহেবের আত্মীয়-স্বজনে হাসপাতাল গিজগিজ করছে। হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়াও বাইরের ডাক্তারও এসেছেন । মেডিক্যাল বোর্ড বসেছে। ডাক্তারদের আলাপ আলোচনায় যা জানা গেল তার সারমর্ম হল— রোগী ডীপ কোমায় চলে গেছে। কোনো মিরাকল না-ঘটলে বাঁচবে না। আরেফিন খালুর আত্মীয়স্বজনদের আলোচনায় জানা গেল ডীপ কোমায় যাবার আগে ডাক্তার, নার্স

এবং তার দূর সম্পর্কের এক ভাই-এর কাছে হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি ঘুমুচ্ছিলেন বসার ঘরের ড্রয়িং রুমে। তার স্ত্রী দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন শোবার ঘরে। তিনি নিজে অনেক রাত জেগে মদ্যপান করছিলেন বলে শেষ রাতের দিকে তার গাঢ় ঘুম হয়। হঠাৎ ধস্তাধস্তি এবং চিৎকারের শব্দ তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চমকে উঠে বসেন এবং দেখেন তার বাড়ির কেয়ারটেকারের সঙ্গে তার স্ত্রী ধস্তাধস্তি করছেন। তার স্ত্রীর শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি স্ত্রীকে রক্ষার জন্যে ছুটে যান তারপর কী হয় তা তার মনে নেই।

ইনটেনসিভ কেয়ার ঘরের সামনে একজন পুলিশও দেখলাম ঘোরাঘুরি করছে। চশমা পরা গুরুগম্ভীর একজনকে দেখা গেল। চৈত্রমাসের এই গরমেও তার গায়ে উলের কোট । শুনলাম তিনি ম্যাজিস্ট্রেট। ডেথ বেড স্টেটমেন্ট নিতে এসেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হল। তিনি তার মতই আরেক গুরু গম্ভীর মানুষকে ভুরু টুরু কুঁচকে হাত পা নেড়ে কী সব বলছেন। আমি কাছে গিয়ে শুনি,ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছেন- আমি তো সারাদিন এখানে বসে থাকব না। রোগীর যদি জ্ঞান ফেরে আমাকে খবর দিলে আমি চলে আসব। আর ধরেন ইন কেইস যদি জ্ঞান না ফেরে— ডাক্তারের কাছে রোগী যে কথা বলেছে সেটাকেই স্টেটমেন্ট হিসেবে নেয়া হবে। রোগী ডাক্তারকে কী বলেছে তা একটা কাগজে লিখে সই করে দিতে বলুন।

যাকে এই কথা বলা হল তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, আমি বলব কেন ? আপনি বলুন। এটা আপনার জুরিসডিকশান।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমার জুরিসডিকশান হবে কেন ?

‘আচ্ছা ফাইন, আপনার জুরিসডিকশান না। আপনি চিৎকার করছেন কেন? Why you are raising your voice.’

‘ভয়েস আমি রেইজ করছি না আপনি করছেন ?’

‘আপনি শুধু যে ভয়েস রেইজ করছেন তা না, আপনি মুখ দিয়ে থুথুও ছিটাচ্ছেন।’

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনতে অনেকেই জুটে গেল। সবাই মজা পাচ্ছে। আমিও পাচ্ছি, অপেক্ষা করছি ঝগড়াটা কোথায় থামে সেটা দেখার জন্যে। ঝগড়া থামতে হলে একজনকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। পরাজয়টা কে স্বীকার করে সেটাই দেখার ইচ্ছা। আমার ধারণা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরাজয় স্বীকার করবেন। চিৎকার উনিই বেশি করছেন। দম ফুরিয়ে যাবার কথা।

পেছন থেকে আমার পাঞ্জাবি ধরে কে যেন টানল । আমি ফিরে দেখি চন্দ্র চাচী । অনেক দূরের লতায় পাতায় চাচী । বিবাহ এবং মৃত্যু এই দুই বিশেষ দিনে লতা-পাতা আত্মীয়দের দেখা যায়। সামাজিক মেলামেশা হয়। আন্তরিক আলাপ আলোচনা হয়।

চন্দ্রা চাচী বিস্মিত হয়ে বললেন- তুই এখানে কেন ? আরেফিন সাহেব তোর কে হয় ?

আমি বললাম, আরেফিন সাহেব আমার কেউ হন না তার স্ত্রী আমার খালা হন।

‘ও আচ্ছা। আমি জানতামই না। কী রকম দুঃখের ব্যাপার দেখেছিস। দিনে দুপুরে জোড়া খুন।’

‘জোড়াখুন বলতে পার না— একজন তো এখনো ঝুলছে।’

চাচী দুঃখিত গলায় বললেন— একটা মানুষ মারা যাচ্ছে আর তুই তার সম্পর্কে

এমন ডিসরেসপেক্ট নিয়ে কথা বলছিস । এটা ঠিক না। স্বভাবটা বদলা হিমু।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, জ্বি আচ্ছা বদলাব।

কেমন যেন মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। রোবট টাইপ। মানুষের মৃত্যু, রোগ ব্যাধি এই সব কিছুই আর কাউকে স্পর্শ করছে না। ঠিক বলছি না ?

'অবশ্যই ঠিক বলেছেন।'

চন্দ্রা চাচী হাত ব্যাগ থেকে পান বের করে মুখে দিতে দিতে চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন— আমার ছোট মেয়ে ঝুমুর বিয়ে দিয়েছি। সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠান করেছি— গেষ্ট ছিল একহাজার।

'বল কী ?'

তাও তো সবাইকে বলতে পারিনি। তোকে অবশ্যই কার্ড পাঠাতাম । তুই কোথায় থাকিস জানি না।'

'বিয়ে ভাল হয়েছে কি না বল। ছেলে কেমন হীরের টুকরা না গোবরের টুকরা ?'

চন্দ্র চাচী চোখ মুখ শক্ত করে বললেন– ছেলে গোবরের টুকরা হবে কেন ? এই সব কী ধরনের কথা ? ছেলে কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ পি. এইচ. ডি. করেছে । আমেরিকায় থাকে । ছেলের আপন চাচা স্টেট মিনিস্টার ।

'বলো কি ? মিনিস্টারের ভাতিজা ?'

'ছেলের ফ্যামিলি খুবই পলিটিক্যাল। এবং খানদানী পলিটিক্স করে। এখনকার কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি পলিটিক্স না। ছেলের বড় দাদা বৃটিশ আমলের এম. এল.এ ছিলেন।'

'আশ্চর্য তো।'

চন্দ্রা চাচী আনন্দিত গলায় বললেন, ঝুমুর বিয়েতে মন্ত্রীই এসেছিল চারজন। বাংলাদেশের অনেক ইম্পরট্যান্ট কবি সাহিত্যিকেরা এসেছিলেন। শো বিজনেসের অনেকেই ছিল। ফিল্মের দুই নায়িকা এসেছিল। তারপর টিভির নায়িকারাও ছিল। অটোগ্রাফের জন্যে এমন হুড়াহুড়ি শুরু হল । সব ভিডিও করা আছে। বাসায় আসিস দেখাব ৷

আচ্ছা যাব একদিন ।

'আচ্ছা যাব একদিন।'

'আজই চল না। টোটাল চার ঘন্টা ভিডিও ছিল কেটে কুটে দুঘন্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার বাইরে থেকে মিউজিক পাঞ্চ করা হয়েছে। বিসমিল্লাহ খার সানাই জায়গামত বসানো হয়েছে। মিউজিকটা সামান্য sad হয়েছে তবে তুই দেখে খুবই মজা পাবি।'

'শুনেই আমার মজা লাগছে।'

'বিয়ের দিন ঝুমুকে কী সুন্দর যে লাগছিল। না দেখলে বিশ্বাস করবি না। এর কারণও আছে— ঝুমুরের মেকাপ দেয়ার জন্যে আমি ফিল্ম লাইন থেকে মেকাপম্যান নিয়ে এসেছি। দীপক কুমার শুর, দু'বার মেকাপে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া মেকাপম্যান। সে তিনঘন্টা লাগিয়ে মেকাপ দিয়েছে। ফিল্ম লাইনের মেকাপম্যানরা মুখের কাটা ভাঙতে পারে। ঝুমুরের থুতনী সামান্য উচু ছিল না ? এটা এমন করেছে.....'

'দাবিয়ে দিয়েছে ?'

'হু। আয়নায় ঝুমু নিজেকে দেখে চিনতে পারেনি।'

'দাঁতের কী করেছে ?'

চন্দ্রা চাচী বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আমি বললাম, ঝুমুর সামনে কোদাল সাইজের যে দুটা দাঁত ছিল তার কী করা হয়েছে ? সেগুলিও কি দাবিয়ে দেয়া হয়েছে ?

চন্দ্রা চাচী থমথমে গলায় বললেন, ঝুমুর কোদাল সাইজ দাঁত ?

আমি হাই চাপতে-চাপতে বললাম, ভুলে গেছ না-কি, ঝুমুকে স্কুলের বন্ধুরা মিকি মাউস বলে ক্ষেপাত। সে বাসায় ফিরে কাঁদত। ঐ দাঁত দুটার কি হল ? ফিল্ম লাইনে মেকাপ দিয়ে বড় দাঁত ছোট করার ব্যবস্থা-কি কিছু আছে ?

চন্দ্রা চাচী যে ভাবে তাকাচ্ছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়বেন। তাকে এই সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। চলে যেতে হবে। যাবার আগে আরেফিন খালু সাহেবকে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। যে ডীপ কোমায় আসে সে আমার কথা শুনতে পাবে এমন আশা করা ঠিক না। তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই। ইনটেনসিভ কেয়ারে ঢোকা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ঘরে এখন কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। উকি-ঝুঁকিও দিতে দিচ্ছে না। দরজার সামনে পুলিশ পাহারা বসে গেছে। কোনো একটা কৌশল বের করতে হবে। ইনটেনসিভ কেয়ারের দায়িত্বে যে ডাক্তার আছেন তাকে ধরতে হবে।

ইনটেনসিভ কেয়ারের দায়িত্বে যিনি আছেন তার নাম মালেকা। ডাঃ মালেকা বানু। আমি লক্ষ্য করেছি পুরুষদের নামের শেষে আকার যুক্ত করে যে সব মহিলাদের নাম রাখা হয় তাদের মধ্যে পুরুষ ভাব প্রবল থাকে। যেমন,

মালেক থেকে মালেকা
রহিম থেকে রহিমা
সিদ্দিক থেকে সিদ্দিকা
জামিল থেকে জামিলা
শামীম থেকে শামীমা

তবে ডাঃ মালেকা বানুকে সেরকম মনে হল না। তার চেহারার মধ্যেই খালা খালা ভাব। আমি দরজা খুলে তার ঘরে ঢুকলাম তিনি চোখ সরু করে তাকালেন না। বা বিরক্তিতে ঠোঁট গোল করলেন না। আমি শান্ত গলায় বললাম-আপনি ডাঃ মালেকা বানু ?

'জ্বি।'

'আরেফিন সাহেব কোমায় থাকা অবস্থায় আপনাকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা আপনি এখনো পুলিশের কাছে জমা দেননি কেন ? ডেথ বেড কনফেশন যে কি রকম গুরুত্বপূর্ণ তা-কি আপনি জানেন না। ফর ইওর ইনফরমেশন শুধু এই কনফেশনের কারণে দু'জনের ফাঁসি হয়ে যাবে।'

'আপনি কি পুলিশের কেউ ?'

'জ্বি। আমি গোয়েন্দা বিভাগের। এই মামলার পুরো তদন্তের দায়িত্বে আমি আছি।'

'বুঝতে পারছি।'

'না বুঝতে পারছেন না। মামলাটা আপনার কাছে যত সহজ মনে হচ্ছে আসলে তত সহজ না। অনেক জটিলতা আছে।'

'ও।'

'আমার পরিচয়টা আশা করি গোপন থাকবে। এখনে কেউ জানে না আমি কে! পুলিশের লোকজনও জানে না। আশা করি আপনার মাধ্যমেও কেউ জানবে না।'

'জ্বি না জানবে না। আপনি চা-কফি কিছু খাবেন ?'

'চা কফি কিছুই খাব না। আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে আমি আরেফিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

ডাঃ মালেকা বানু বিস্মিত হয়ে বললেন, ওনার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলবেন ? উনি ডীপ কোমায় আছেন।

'ডীপ কোমায় থাকা অবস্থাতেও চেতনার একটি অংশ কাজ করে। আমি সেই অংশটার সঙ্গে কথা বলব। হয়ত লাভ কিছু হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।'

'আপনি যখন কথা বলবেন তখন কি আমি পাশে থাকতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন।'

ডাঃ মালেকা বানু বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করেন। আমি ব্যবস্থা করছি। এই ফাকে একটু চা খান। প্লীজ।

'জ্বি না চা খাব না।'

'আপনার নামটা জানতে পারি ?'

'নকল নাম জানতে পারেন। আসলটা আপনাকে বলতে পারছি না। একেকটা মামলার সময় আমরা একেকটা নতুন নাম নেই। এই মামলায় আমি যে নাম নিয়েছি সেই নামটা কি বলব ?'

'থাক বলতে হবে না। আপনাকে দেখে পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না।'

'গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের দেখেই যদি কেউ বুঝে ফেলে সে পুলিশের লোক তা হলে সমস্যা না ?'

'জ্বি সমস্যা তো বটেই।'

আরেফিন খালু সাহেবের পাশে বসার জন্যে আমাকে একটা চেয়ার দেয়া হয়েছে। আমার পাশে ডাঃ মালেকা কৌতুহল এবং আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। ঘরে বাইরের কোনো আলো আসছে না, টিউব লাইট জ্বলছে। মনে হচ্ছে টিউব লাইট থেকেও ঠাণ্ডা আলো আসছে। ঘরে মৃত্যুর গন্ধ। আরেফিন খালুর বিছানার নীচে মৃত্যু থাবা গেড়ে বসে আছে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

আমি সহজ গলায় ডাকলাম— খালু সাহেব। খালু সাহেব। আমি হিমু।

ডাঃ মালেকা বানু চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। গোয়েন্দা বিভাগের লোক অপরিচিত একজনকে খালু সাহেব ডাকছে— বিস্মিত হবার মতই ব্যাপার। আমি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললাম—

'খালু সাহেব আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। মালিহা খালার মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে আপনি জানেন। আপনাকে ডীপ কোমা থেকে বের হয়ে এসে এই ঘটনা বলতে হবে। যদি না বলেই আপনি মারা যান- তা হলে দুটি নিরপরাধ লোক ফাঁসিতে ঝুলবে।'

ডাঃ মালিকা বানু আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন— Excuse Me........

আমি আবারো তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খালুকে বললাম, খালু সাহেব আমার ধারণা আপনি কোনো-না-কোনো ভাবে আমার কথা শুনছেন । আপনাকে মৃত্যুর আগে অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা বলে যেতে হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডাঃ মালেকা বানু কড়া চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

আমি তাকে মিষ্টি গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি পুলিশের কেউ না। উনি আমার খালু হন। আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন— আমার নাম হিমু।

ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন। আমি মধুর ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। হাদি সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে । তার ছোট মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মেয়েটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে খাতা। খাতায় কুমীরের ছবি আঁকা। কুমীর রঙ করা হচ্ছিল। আংগুলে ক্রেয়নের সবুজ রঙ লেগে আছে।

মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কঠিন ভঙ্গি আছে। তবে দুটা চোখই টলটলা। চোখের দিকে তাকালেই মনে হবে এক্ষুনি পানিতে চোখ ভর্তি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কেমন আছ পাখি ?

মেয়েটা জবাব দিল না। অপরিচিত মানুষের আন্তরিক প্রশ্নে খটকা লাগে । মেয়েটার মনে খটকা লাগছে। সে আমাকে লক্ষ করছে। বোঝার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, তোমার কুমীরের ছবির রঙটা ঠিক হয়নি। কুমীর কখনো সবুজ হয় না।

'এই কুমীরটা যে পানিতে ছিল সেই পানি শ্যাওলায় ভর্তি। এই জন্যেই কুমীরটা সবুজ।'

'কুমীর থাকে নদী-নালায়। নদী নালায় শ্যাওলা হয় না। আমার ধারণা তোমার কাছে শুধু সবুজ রঙ আছে বলে কুমীর সবুজ রঙ করেছ।'

'আমার কাছে সবুজ আর লাল রঙ আছে।'

'তা হলে সবুজ রঙের কুমীর বানিয়ে ভালই করেছ। লাল রঙের কুমীরের চেয়ে সবুজ রঙের কুমীর ভাল।'

পাখির কাঠিন্য হঠাৎ কমে গেল। সে শান্ত গলায় বলল, আপনাকে আমি চিনেছি। আপনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনার নাম হিমু। আপনি তো বাবার সঙ্গে কথা বলতে এসছেন, বাবা বাসায় নেই।

'আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। আজ স্কুলে যাওনি ?'

'না।'

'স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কেউ ছিল না এই জন্যে ?'

'হু।'

'বাসায় তুমি ছাড়া আর কে আছে ?'

পাখি জবাব দিল না। আমি লক্ষ করলাম তার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। সে হাতের তালুতে চোখ মুছল। লাভ হল না, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ আবার পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটা বাড়িতে একা আছে। গত রাতেও হয়তোবা একাই ছিল।

'ঢাকায় তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন না ?'

'আছেন।'

'তুমি তাদের ঠিকানা জান না ?'

মেয়েটা না-সূচক মাথা নাড়ল। সে তার চোখের পানি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিয়েছে। এখন তার চোখ শুকনা। ছলছলে ভাবও নেই।

'তোমার বাবা কোথায় তুমি জান ?'

'জানি।'

'সকালে নাশতা খেয়েছ ?'

'না '

'না কেন ? ঘরে খাবার কিছু ছিল না ?'

'না।'

'আমার ধারণা আছে। তুমি ভাল করে খুঁজে দেখনি। আটা থাকার কথা। আটা

দিয়ে রুটি বানানো যায়। শব্জি থাকার কথা। শব্জি ভাজি, রুটি। ডিম যদি থাকে তা হলে ডিমের মামলেট। তুমি রান্না করতে পার না ?'

'চায়ের পানি গরম করতে পারি।'

'আসলটাই তো পার। রুটি বেলাও খুব সহজ। আটা দিয়ে একটা গোল্লার মত বানিয়ে বেলতে হয়.....'

পাখির চোখের কোণায় সামান্য আনন্দ যেন ঝলসে উঠল। চোখ চিকচিক করে উঠল। আমি বললাম- চলো রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কী আছে, কী নেই। আমিও সকালে নাশতা করিনি। আজকের নাশতাটা তুমি বানাও। দু'জনে মিলে নাশতা করি। নাশতা বানাতে পারবে না ?

'আপনি দেখিয়ে দিলে পারব।'

'আমি দেখিয়ে দেব কী ভাবে ! আমি কিছু জানি না-কি ? যাই হোক দেখি দু'জনে মিলে চিন্তা-ভাবনা করে একটা কিছু করতে হবে। আগে চলো রান্নাঘর ইন্সপেকশন করে দেখি।'

রান্নাঘরে ময়দা পাওয়া গেল, আলু পাওয়া গেল; একটা ডিম পাওয়া গেল। আমি পাখিকে নিয়ে মহা উৎসাহে রান্না-বান্নায় লেগে গেলাম। রান্না করতে-করতে জানা গেল পাখি কাল রাতে একা ছিল । ঘরে পাউরুটি এবং কলা ছিল । পাউরুটি কলা খেয়েছে। বাবা ফিরে আসবেন এই ভেবে অনেকরাত পর্যন্ত জেগে ছিল। তার স্কুলের অনেক হোমওয়ার্ক ছিল সব করে ফেলেছে।

'ভয় লাগেনি ?'

'বাথরুমে কে যেন হাঁটাহাটি করছিল তখন একটু ভয় লেগেছে।'

আমি ভীত গলায় বললাম, বাথরুমে কে হাঁটাহাটি করছিল, ভূত ?

পাখি বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি কি যে বাচ্চাদের মত কথা বলেন। ভূত বলে পৃথিবীতে কিছু আছে না-কি ?

'নেই ?'

'অবশ্যই না। ভূত, রাক্ষস, খোক্কস সব বানানো।'

আমি বললাম, ভূত-প্রেতের গল্প এখন থাকুক। আমার এদের কথা শুনলেই গা ছমছম করে।

পাখি বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি এত ভীতু কেন ?

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমার অনেক বুদ্ধি তো, এই জন্যে ভীতু। বুদ্ধিমানরা ভীতু হয়। যার যত বুদ্ধি সে তত ভীতু ।

'আপনার কথা ঠিক না। আমারও অনেক বুদ্ধি কিন্তু আমি ভীতু না।'

'তা অবশ্যি ঠিক।'

'আর আপনি যে নিজেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলছেন, এটাও ঠিক না। এতে অহংকার করা হয়। কেউ অহংকার করলে আল্লাহ খুব রাগ করেন।'

'আল্লাহ মোটেই রাগ করেন না। আল্লাহ কি তোমার-আমার মত যে চট করে রেগে যাবেন ? কেউ অহংকার করলে আল্লাহ খুব মজা পান। মজা পেয়ে বলেন, আরে বোকাটা কী নিয়ে অহংকার করছে !'

'আপনাকে কে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি আমার মনে হয়।'

'আল্লাকে নিয়ে এই ধরনের কথা মনে হওয়াও খারাপ। এতে পাপ হয়। আপনি এ

ধরনের কথা আর কখনো বলবেন না।'

'আচ্ছা বলব না, আর শোনো তুমি কী রুটি বেলছ ? আঁকাবাকা হচ্ছে ।'

'আপনি উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন তো এই জন্যে মন দিয়ে কাজ করতে পারছি না।'

'আচ্ছা যাও আর কথা বলব না- লাস্ট কথাটা বলে নেই।'

'বলুন।'

'নাশতা শেষ করেই তুমি একটা সুটকেসে তোমার বই খাতা, জামা টামা এইসব দরকারি জিনিস গুছিয়ে নেবে। আমরা ঘরে তালা দিয়ে চলে যাব।'

'কোথায় যাব ?'

'আমার এক পরিচিত বাসায় তোমাকে রেখে আসব। এখানে তোমাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। যে-বাড়ির বাথরুমে ভূত হাঁটাহাটি করে সেই বাড়িতে তোমাকে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'বাথরুমে ভূত হাঁটাহাটি করে আপনাকে কে বলল ?'

'তুমিই না বললে ?'

পাখি মহা বিরক্ত হয়ে বলল, ভূত হাঁটাহাটি করে এরকম কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি- বাথরুমে শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কে যেন হাঁটছে।

'কে যেন হাঁটছেটাই ভূত। শহরের বেশির ভাগ ভূতই থাকে বাথরুমে। ওদের একটু পরপরই পানির তৃষ্ণা পায় তো, বাথরুমে থাকাটাই এদের জন্যে সুবিধাজনক। তবে এদের পছন্দ বাথটাবওয়ালা বাড়ি। রাতে বাথটাবে শুয়ে ওরা আরাম করে ঘুমায়।'

পাখি রুটি বেলা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, আপনি দেখি খুবই বোকা। আপনি এত বোকা কেন ?

আমি হেসে ফেললাম। কারণ, আপনি এত বোকা কেন ? এই প্রশ্নটি আমি আমার এক জীবনে অসংখ্যবার শুনেছি এবং শুধু মেয়েদের কাছ থেকেই শুনেছি। সবচে বেশি শুনেছি রূপার কাছ থেকে । আমার ধারণা আজ আমি যখন পাখিকে নিয়ে রূপার কাছে উপস্থিত হব রূপা কথাবার্তার এক পর্যায়ে অবশ্যই বলবে, হিমু তুমি এত বোকা কেন ?

আমার বাবা তার উপদেশমালায় লিখে গেছেন-

> বাবা হিমালয়,
> তোমাকে বাস করিতে হইবে অনেকের মধ্যে । লক্ষ রাখিও সেই অনেকের কেউই যেন তোমাকে কখনো চালাক বা বুদ্ধিমান মনে না করে। মহাপুরুষরা চালাক হন না, বুদ্ধিমান হন না, আবার তারা বোকাও হন না। পৃথিবীর এই অনিত্য জগতে বুদ্ধির স্থান নাই। বুদ্ধি দ্বারা এই জগত বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। চেতনা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বুদ্ধি চেতনাকে নষ্ট করে ....

রূপার শরীর ভাল নেই।

এই প্রচণ্ড গরমেও সে চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছে। চোখ মুখ ফোলা। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। কোলে রাখা টিসু বক্স দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম বলো তো ?

আমি বললাম, প্রায় এক বছর।

রূপা বলল, এক বছর সাত মাস, ন দিন।

'ঘণ্টা মিনিট বাদ দিলে কেন ?'

'ঘণ্টা মিনিটও বলতে পারব। বলতে ইচ্ছা করছে না বলে বলছি না। তোমার সঙ্গের এই মেয়েটি কে ?'

'ওর নাম পাখি । ও তোমার সঙ্গে কিছুদিন থাকবে। বারো তারিখ ওর জন্মদিন । জন্মদিনের দিন আমি ওকে নিয়ে যাব।'

রূপা কিছু বলল না। আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে ?

রূপা বলল, আমার তেমন কিছু হয়নি। তোমার কতদূর কী হয়েছে সেটা বলো। মহাপুরুষ হতে পেরেছ ?

'না।'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ ? এই মেয়েটাকে যে আমার এখানে রেখে যাচ্ছ এটাও কি তোমার মহাপুরুষ-কর্মশালার অংশ ?'

আমি হাসলাম ।

রূপা বলল, প্লীজ হাসবে না। তোমার হাসি কোনো দিনই আমার ভাল লাগেনি। যত দিন যাচ্ছে তোমার হাসি ততই বিরক্তিকর হচ্ছে । হায়নার হাসিও তোমার হাসির চেয়ে সুন্দর।

আমি বললাম, রূপা হাসি বন্ধ। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পাখিকে ডেকে ওর সঙ্গে একটা দুটা কথা বল। নতুন এক বাড়িতে সে থাকতে এসেছে তার এন্ট্রিটা সহজ করে দাও। ও তোমার কঠিন মূর্তি দেখে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না।

রূপা হাত ইশারায় পাখিকে ডাকল। পাখি শংকিত পায়ে এগিয়ে এল। রূপা কঠিন গলায়, মাস্টারনীর ভঙ্গিতে বলল, এই মেয়ে তোমার নাম কি ?

পাখি ভয়ে ভয়ে বলল, পাখি ।

'পাখি তোমার নাম ?'

'জ্বি।'

'তুমি কি উড়তে পার ?'

'না।'

'না বলে লাভ নেই। যেহেতু তোমার নাম পাখি সেহেতু তোমাকে আকাশে উড়তে হবে। আমি ওয়ান টু থ্রি বলব সঙ্গে সঙ্গে ওড়া শুরু করবে। ওয়ান-টু-থ্রী। কই উড়ছ না কেন ?'

পাখি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রূপা তার বিখ্যাত খিলখিল হাসি শুরু করেছে। আমি এই হাসির নাম দিয়েছিলাম জলতরঙ্গ হাসি। রূপার এই হাসির শব্দটাতেই একটা ম্যাজিক আছে। শব্দ শুনলেই মনে হয়- এটা শুধু হাসি না । হাসি দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়া। হাসির মাধ্যমে কাছে ডাকা ।

আমি যা ভাবছিলাম তাই হল, হাসির শব্দ শুনেই পাখি ছুটে এসে রূপাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বাচ্চা মেয়েটির বুকে অনেক অশ্রু জমে আছে। অশ্রু বের হওয়া দরকার।

আমি ওদেরকে রেখে আবার পথে নামলাম । আকাশ মেঘলা। রবীন্দ্রনাথের গানের মত মেঘের উপর মেঘ করে আঁধার হয়ে আসছে। এমন দিনে হাঁটতে চমৎকার লাগে ।

দশ গজ যাইনি তার আগেই গা ঘেসে একটা গাড়ি থামল। গাড়ির কাচ নামিয়ে বোরকা পরা এক মহিলা চাপা গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।

আমি গাড়িতে উঠলাম। বোরকাওয়ালী বললেন, ভাল আছেন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আমাকে চিনতে পেরেছেন ?'

'না।'

'বোরকা পরলেও আমার চোখ তো দেখা যাচ্ছে । চোখ দেখেও চিনতে পারছেন না ?'

'পারছি না।'

'আমার গলার স্বরও চিনতে পারছেন না ?'

'না। মেয়েদের গলার স্বরের মধ্যে একমাত্র রূপার গলার স্বর আমি চিনতে পারি। আর কারোর গলা চিনতে পারি না।'

'রূপা কে ? আচ্ছা থাক বলতে হবে না বুঝতে পারছি কে ! এবং আমার ধারণা আপনিও বুঝতে পারছেন আমি কে।'

'তুমি জুঁই। বোরকা পরেছ কেন ? কোনো মওলানা বিয়ে করেছ ?'

জুঁই হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার তার হাসিও রূপার হাসির মত । ঝনঝন করে জলতরঙ্গের মত বাজছে। কাছে ডাকার হাসি।

'খিলখিল করছ কেন ?'

'খিলখিল করছি কারণ আপনাকে দেখে খুব মজা লাগছে। আপনি কি জানেন আমি পাগলের মত আপনাকে খুঁজছি। আপনার একটা মোবাইল টেলিফোন ছিল না ? সেই নাম্বারটাও ভুলে গেছি। আমি আবার নাম্বার মনে রাখতে পারি না। ম্যাট্রিকের রোল নাম্বার কোনো ছেলে মেয়ে ভোলে না। অথচ আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা আপনার কি ম্যাট্রিকের রোল নাম্বার মনে আছে ?'

আমি বললাম, তুমি এত আনন্দিত কেন ?

জুঁই হাসতে-হাসতে বলল, আমি আনন্দিত কারণ চোর-পুলিশ খেলায় আমি বাবাকে হারিয়ে দিয়েছি। আপনি তো জানেন না বাবা আমার জীবন অতিষ্ট করে দিয়েছিল। আমার পেছনে সব সময় দু'তিনজন স্পাই। কোথায় যাই-না-যাই সব বাবা জানেন। আমার ঘরে যে টেলিফোন সেখানেও এমন ব্যবস্থা করা ছিল আমি যখন যার সঙ্গে কথা বলছি সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার অবস্থা তো তা হলে মনে হয় খারাপই।'

'হ্যাঁ খারাপ। খুব খারাপ। বাবা যে শুধু আমার পেছনে স্পাই লাগাতেন তা-না, আমি যদি কোনো ছেলের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলতাম তা হলে তার পেছনেও স্পাই লাগিয়ে দিতেন।'

'গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার জন্যে মনে হয় এটা হয়েছে।'

জুঁই সহজ গলায় বলল, আমার মা বাবাকে ছেড়ে পালিয়ে বাবার অতি প্রিয় এক বন্ধুকে বিয়ে করেছিল সেই থেকে হয়েছে। বাবা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। ভাল কথা আপনি কি আমাদের কয়েকদিন লুকিয়ে থাকার মত কোনো একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ?

'আমাদের মানে কি ? বিয়ে করেছ ?'

'হু করেছি।'

'প্রেমের বিয়ে ?'

জুঁই হাসতে-হাসতে বলল, বিয়ে করে ফেলার মত প্রেম ছিল না, বিয়ে করেছি বাবাকে শিক্ষা দেবার জন্যে ।

'আমার তো ধারণা ওনার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।'

'উহুঁ এখনো শিক্ষা হয়নি। আমি বাবার গোয়েন্দাগিরি জন্মের মত শেষ করব। এর মধ্যে আমি আবার মনসুরকে দিয়ে বাবাকে টেলিফোন করিয়েছি। মনসুর গলা মোটা করে বলেছে— থাক এসব বলতে ইচ্ছা করছে না। মনসুর আমার হাজবেন্ডের নাম। সে যেমন সাধারণ তার নামটাও সাধারণ । আমি অবশ্যি তাকে মনসুর ডাকি না। আমি ডাকি— 'মন' । কই আপনি বললেন না- কয়েকদিন থাকার মত একটা জায়গা আপনি দিতে পারেন কি-না। তিন-চার দিন থাকতে পারলেই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'কী ভাবে ?'

'আমার মা'কে খবর দিয়েছি। উনি থাকেন জার্মানীতে । মা চলে আসছেন।'

'ও।'

'এখন বলুন তিন-চার দিন লুকিয়ে থাকার মত কোনো জায়গা কি আছে ?'

'পাখিদের বাসায় থাকতে পারো !'

'পাখি কে ?'

'পাখি হল হাদিউজ্জামানের মেয়ে।'

'হাদিউজ্জামান কে ?'

'হাদিউজ্জামান হচ্ছে মালিহা বেগমের কেয়ারটেকার।'

'মালিহা বেগম কে ?'

'মালিহা বেগম হল আরেফিন সাহেবের মৃত স্ত্রী।'

জুঁই ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার সঙ্গে বক বক করতে ভাল লাগছে না, আপনি নিয়ে যান আমাকে ঐ বাড়িতে।

'আমার যাবার দরকার কী ? তোমাকে চাবি দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ির ঠিকানা বলে দিচ্ছি তুমি মন সাহেবকে নিয়ে উঠে পড়।'

'কেউ কিছু বলবে না ?'

'মনে হয় না কেউ কিছু বলবে। আর যদি বলে তুমি বলবে তুমি পাখির চাচাতো বোন। বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে আছ।'

'আমি রাজি।'

'এই নাও চাবি।'

জুঁই বিস্মিত হয়ে বলল, একটা পুরো খালি বাড়ির চাবি আপনি পকেটে নিয়ে কী জন্যে ঘুরছিলেন ?

আমি বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, জুঁই শোনো আমরা সবাই বড় একটা পরিকল্পনার অংশ। সেই বড় পরিকল্পনা যিনি করেন আমরা তাকে দেখতে পাই না। কেউ তাকে বলে নিয়তি, কেউ বলে প্রকৃতি আবার কেউ কেউ বলে আল্লাহ। আমি পাঞ্জাবির পকেটে খালি বাড়ির চাবি নিয়ে ঘুরব এবং তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে এটা আমার ধারণা বড় পরিকল্পনার ক্ষুদ্র একটা অংশ।

জুঁই শান্তগলায় বলল, আপনার কথা আমার বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করছি না। গোয়েন্দা বাবার মেয়ে এত সহজে সব কিছু বিশ্বাস

করে না।

আমি বললাম, জুঁই তুমি একটু শব্দ করে হাসো তো ?

জুঁই বলল, কেন ?

তোমার হাসির শব্দ অসম্ভব সুন্দর।

জুঁই বলল, আপনার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই কথাটা বিশ্বাস করলাম ।

৮

মুসলেম মিয়া আবারো পত্রিকার প্রথম পাতায় চলে এসেছে। ছবি সহ নিউজ ।

> ### মুসলেম ছাড়া পেলেন
>
> বৃষ্টিতে নগ্ননৃত্য করে যিনি সবার নজর কেড়েছিলেন সেই মুসলেম মিয়া দু'দিন হাজত বাসের পর ছাড়া পেয়েছেন। খবরে জানা গেছে পুলিশের গাড়ি তাকে পুরানো ঢাকার শাহসাহেব গলিতে নামিয়ে দেয়। সেই সময় তার পরনে পুলিশের উপহার দেয়া নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি ছিল । অপরাধী হিসেবে ধৃত কারোর প্রতি পুলিশের এই আচরণ নজিরবিহীন। জানা গেছে থানার পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অনেকেই পা ছুঁয়ে তার দোয়া নিয়েছেন ।
>
> মুসলেম মিয়া সম্পর্কে থানা সূত্রে প্রাপ্ত একটি তথ্য হচ্ছে গত দু'দিন মুসলেম মিয়া কোনো খাদ্য গ্রহণ করেননি। এবং এক মুহূর্তের জন্যেও নিদ্রা যাননি। গ্রেফতারের প্রথম দিনে কিছু কথাবার্তা বললেও দ্বিতীয় দিন থেকে তিনি কারো সঙ্গেই কোনো কথা বার্তা বলেন নি। একটি অসমর্থিত খবরে বলা হয় মুসলেম মিয়ার শরীর থেকে ভুড়ভুড় করে বেলী ফুলের গন্ধ আসছে।

মুসলেম মিয়াকে দেখতে যাওয়ার দরকার। সত্যি-সত্যি তার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে গেছে কি-না কে জানে। 'নদীর সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে' এ ধরনের কথা বলা হয়। নদীর সঙ্গে মানুষের সবচে বড় অমিল হল নদীর পানি হঠাৎ করে উল্টো দিকে বইতে শুরু করতে পারে না। মানুষের গতি পথ হুট করে কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পাল্টে যেতে পারে ।

ঘোর বৈষয়িক মানুষও এক ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হঠাৎ বলে বসতে পারেন- এ জীবনে যা উপার্জন করেছি, সৎ উপার্জন এবং অসৎ উপার্জন সবই আমি দান করে দিতে চাই। ব্যবস্থা করো। কিংবা আশ্রমের কোন মহাপুরুষ ধরনের সাধক মানুষ তার সমগ্রজীবনের পূন্যফল হঠাৎ কোনো এক রাতে আশ্রমের কোনো কাজের মেয়ের পায়ে তুলে দিয়ে বলে- এইটাই আসল জীবন।

মানুষ নদী না। মানুষ অন্য জিনিস ।

মুসলেম মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখলাম। তার সঙ্গে দেখা করার আগে আমাকে জরুরি ভিত্তিতে একটা কাজ করতে হবে, হাদি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাকে বলতে হবে তার মেয়ে ভাল আছে। এমন এক জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে যে তাকে নিয়ে আর কোনো দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। হাদি সাহেব যদি বাকি জীবন জেলেই কাটিয়ে দেন, কিংবা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়েন তাতেও সমস্যা নেই।

আমাকে দেখে ওসি রকিবউদ্দিন সাহেব কিছুক্ষণ এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন বিরক্ত হবেন না খুশি হবেন মনস্থির করতে পারছেন না। শেষে বিরক্ত হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার ?

আমি গদগদ গলায় বললাম, আপনাকে দেখতে এসেছি। সামাজিক মেলামেশা । অনেকদিন দেখি না। মনটা কেমন যেন করছে।

'থানা কি সামাজিক মেলামেশার জায়গা ? কোনো কাজে এসে থাকলে বলুন, আর কাজ না থাকলে চলে যান।'

'সামান্য কাজ ছিল।'

'সেটা কি ?'

'হাদি সাহেবকে বলা যে তার মেয়েটা ভাল আছে।'

'হাদিটা কে ?'

'হাদিউজ্জামান খান। খুনের আসামী।'

'বুঝতে পেরেছি। ও তো নেই।'

'নেই মানে কি ?'

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, বসুন বলছি। সামান্য ঘটনা আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বললাম, মেরে ফেলেছেন নাকি ? ডেড বডি কোথায় রেখেছেন ? পানির ট্যাংকে ? রিস্কি হয়ে যাবে তো ।

রকিবউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তবে এই বিরক্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। তিনি সিগারেট ধরালেন এবং সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ব্যাটাকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আমি বললাম, কেন ?

'পেটের ভেতর থেকে কথা বের করার জন্যে সামান্য ডলা দেয়া হয়েছিল। ডলাটা বেকায়দায় পড়ায় জ্ঞান হারিয়েছিল। ডলা খেয়ে অভ্যেস নেই তো।'

'সেই জ্ঞান আর ফেরেনি ?'

'নাহ্।'

'জ্ঞান ফিরবে ? না-কি আর ফিরবে না ?'

'আমি কী করে বলব ? ডাক্তার বলতে পারবে।'

'মানুষটা যদি মারা যায় আপনাদের কোনো ঝামেলা হবে না ?'

'ঝামেলা হবে কেন ?'

'আপনাদের ডলা খেয়ে মারা গেল।'

ওসি সাহেব হাই তুলতে-তুলতে বললেন, কোনো ঝামেলা নাই—থানায় এফ আই আর করা আছে- আসামী গভীর রাতে হাজতের শিকে মাথা ঠুকছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে নিবৃত্ত করা হয়।

'ও।'

'চা খান । দিতে বলব ?'

'বলুন।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললাম, এই যে ঘটনাগুলি ঘটে— আপনাদের হাতে লোকজন মারা যায় আপনাদের খারাপ লাগে না ?

ওসি সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিতে-দিতে বললেন, সত্যি কথা জানতে চান ?

'হ্যাঁ জানতে চাই।'

‘পরনে যখন খাকি পোষাক থাকে তখন খারাপ লাগে না । বাসায় গিয়ে যখন লুংগি গেঞ্জি পরি তখন খারাপ লাগে।’

আমি বললাম, পুলিশের পোষাক পাল্টে লুংগী গেঞ্জি করলে ভাল হত। তাই না ?

রকিবউদ্দিন সাহেব ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, লুংগি গেঞ্জি ? লুংগী পরে আমরা আসামীর পেছনে দৌড়াব ?

‘অসুবিধা কী ? মালকোচা মেরে দৌড় দেবেন।’

ওসি সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এখানে আর বেশি সময় থাকা ঠিক হবে না। চা-টা ভাল হয়েছিল। পুরো কাপ শেষ করলে ভাল হত । শেষ করা ঠিক হবে না। এই সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

আমি উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম- হাদি সাহেব কোথায় আছে বলবেন ? একটু দেখে আসতাম ! পুলিশের ডলা কী জিনিস সে সম্পর্কে ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ নিয়ে আসতাম।

ওসি সাহেব যন্ত্রের মত বললেন, মেডিকেলে। ইনটেনসিভ কেয়ারে।

ভেবেছিলাম আমাকে দেখেই ডঃ মালেকা বানু তেলেবেগুনে টাইপ জ্বলে উঠবেন। কর্কশ গলায় ‘গেট আউট’ বলে বসবেন এবং বেল টিপে দারোয়ান ডাকাবেন।

সেরকম কিছুই করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, হিমু সাহেব আসুন।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কারো কাছ থেকে খুব খারাপ ব্যবহার পাব এ জাতীয় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যাবার পর হঠাৎ যদি খুব ভাল ব্যবহার পাওয়া যায় তা হলে সব এলোমেলো হয়ে যায়। আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

মালিকা বানু বললেন, বসুন। তেতুলের সরবত খাবেন ? আমার বড় মেয়ে কোথেকে জানি তেতুলের সরবত বানানো শিখে এসেছে। রোজ ফ্লাস্ক ভর্তি করে তেতুলের সরবত দিয়ে দিচ্ছে। আমি আবার টক খেতে পারি না। মেয়েটাকে সেই কথা বলতেও পারছি না। বেচারী এত শখ করে একটা জিনিস বানাচ্ছে।

আমি বললাম, দিন তেতুলের সরবত ।

মালেকা বানু হাসিমুখে গ্লাসে তেতুলের সরবত ঢাললেন। আমার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিতে-দিতে বললেন, আজও কি আপনি আপনার খালু সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন ?

আমি তেতুলের সরবতে চুমুক দিতে-দিতে বললাম, জ্বি না। আজ এসেছি হাদিউজ্জামানের সঙ্গে কথা বলতে ।

‘থানা থেকে যাকে পাঠিয়েছে সেই হাদিউজ্জামান ?’

‘জ্বি। আচ্ছা আপা আপনি বলুন তো হাদিউজ্জামানের বিছানা এবং আমার খালুসাহেব আরেফিন সাহেবের বিছানা কি পাশাপাশি।’

‘হ্যাঁ পাশাপাশি।’

আমি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

মালেকা বানু চোখ সরু করে বললেন, কী রকম ?

আমি বললাম, আমার ধারণা প্রকৃতি বা আল্লাহ বা মহাশক্তি পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। দু’জনকে ইনটেনসিভ কেয়ারে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন বোঝা যাচ্ছে তার পরিকল্পনা মতোই সব কিছু হচ্ছে।

আমাদের দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ হবার কিছু নেই।

‘আপনি দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ ছিলেন ?’

‘হ্যাঁ ছিলাম। আমার ধারণা আমার খালুসাহেবই খুনটা করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আহত হয়েছেন। কারণ আমার খালাও খুব সহজ পাত্রী না। অপরাধটা নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলে দিয়েছেন হাদিউজ্জমানের ঘাড়ে। যাই হোক এখন যেহেতু দু'জন পাশাপাশি আছে প্রকৃতি ব্যাপারটার দ্রুত মিমাংসা করে ফেলবে। দেখা যাবে বারো তারিখে হাদিউজ্জামান সাহেব তার মেয়ের জন্মদিনে উপস্থিত হবেন।

ডঃ মালেকা বানু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার দু'চোখে শান্ত কৌতুহল। তার চোখ দু’টি বলে দিচ্ছে আমি নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। তবু তুমি যদি কিছু বলো তা হলে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনব ।

আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে। ইচ্ছা করছে পার্কের কোন বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে। আকাশের যে অবস্থা বৃষ্টি নামবেই। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে বৃষ্টিতে ভেজার মজা অন্য রকম।

আমি বললাম, আপা আপনার টেলিফোনটা কি একটু ব্যবহার করতে পারি ?

মালেকা বানু কোনো উত্তর না-দিয়ে টেলিফোন সেট এগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেলিফোনের কথাবার্তা তিনি শুনতে চান না। ভদ্রমহিলার ভদ্রতায় আরেকবার মুগ্ধ হলাম।

টেলিফোন করলাম নিজের মোবাইলের নাম্বারে । টেলিফোন ধরলেন জুঁই-এর বাবা। তিনি হতাশ এবং ক্লান্ত গলায় বললেন- কে ?

আমি বললাম, হিমু।

‘ও তুমি। জুঁই-এর কোনো খবর পেয়েছ ?’

‘জ্বি না, আপনি পেয়েছেন ?’

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, স্যার আপনি যে আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিলেন- ওরা কি এখনো আছে ?

‘না। ওরা হঠাৎ একদিন তোমাকে মিস করেছে। তারপর আর তোমাকে লোকেট করতে পারছে না।’

‘স্যার আপনি বোধহয় এক্সপার্ট কাউকে দেননি। শিক্ষানবিশ কাউকে পাঠিয়েছিলেন। এখন আমি আছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ডাঃ মালেকা বানুর চেম্বার।...’

‘হিমু শোনো...অর্থহীন কথা বলে আমার সময় নষ্ট করবে না। আমি আমার মেয়েকে পাচ্ছি না, আই এ্যাম অলমোস্ট এট দি পয়েন্ট অব লুজিং মাই সেনিটি.... আমি দু’রাত ঘুমাইনি। আমার ধারণা মেয়েটা মহা বিপদে পড়েছে। খুব খারাপ একটা টেলিফোন কল পেয়েছি,...’

আমি টেলিফোনে ফোঁপানির মত শব্দ শুনলাম। ভদ্রলোক কাঁদছেন নাকি ? কাঁদাটাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, স্যার আমি জুঁই-এর খবর আপনাকে দিতে পারি।

‘কী বললে ? জুই-এর খবর দিতে পার ?’

‘অবশ্যই পারি।’

‘কোথায় আছে সে ?’

‘সে কোথায় আছে তা এক শর্তে আপনাকে বলতে পারি।’

‘ডোন্ট টক নুইসেন্স। তোমার কাছে পুলিশের লোক যাচ্ছে- তুমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে জুঁই-এর কাছে তাদের নিয়ে যাবে। আমিও সঙ্গে আসছি। এখন বলো এখন তুমি কোথায় আছ ?’

‘স্যার আপনি মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। চিৎকার চেঁচামেচি করে কোনো লাভ হবে না। আপনার বা আপনার বাহিনীর সাধ্যও নেই আমাকে খুঁজে বের করার। আপনি আমার শর্ত মানলেই মেয়েকে পাবেন।’

‘শর্তটা কী ? তোমার কী লাগবে । টাকা ?’

‘টাকা না, একটা হাতির বাচ্চা।’

‘তার মানে ?’

‘একদিনের জন্যে আপনি একটা হাতির বাচ্চা জোগাড় করে দেবেন। এ মাসের বারো তারিখ ।’

‘হাতীর বাচ্চা আমি কোথায় পাব ?’

‘আপনার মত ক্ষমতাবান মানুষের পক্ষে হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোনো ব্যাপারই না। হাতির বাচ্চাটা জোগাড় করুন। বারো তারিখ ভোরবেলা আমি আপনাকে একটা ঠিকানা দেব। ঐ ঠিকানায় হাতির বাচ্চা নিয়ে চলে যাবেন। মেয়েকেও পেয়ে যাবেন।’

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অতি দ্রুত এখন আমাকে চলে যেতে হবে। জুঁই-এর বাবা এখন থেকে হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজবেন, যদি পেয়ে যান তা হলে আর হাতির বাচ্চার ব্যবস্থা হবে না। আমাকে না পেলে তিনি অবশ্যই হাতির বাচ্চা জোগাড় করবেন।

৯

আমি মুসলেম মিয়ার সঙ্গে কয়েকদিন ধরে আছি। দু’জনই পলাতক । মুসলেম পলাতক তার ভক্তদের কাছ থেকে, আমি পলাতক জুঁই-এর বাবার কাছ থেকে। পালিয়ে কেউ কেউ বস্তিবাসী হয়, আমরা দু’জন হয়েছি পাইপবাসী। বিশাল এক স্যুয়ারেজ পাইপে সংসার পেতেছি। পাইপের দু'মাথা চটের পর্দায় ঢাকা। বাইরের জগৎ থেকে চটের পর্দায় আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের সঙ্গে আরো পাইপ-সংসার আছে। এখানকার ব্যবস্থা আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়িগুলির মত। এক ফ্ল্যাটের মানুষ যেমন অন্য ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে খবর রাখে না, পাইপ জগতেও এক পাইপের সংসার জানে না অন্য পাইপে কী হচ্ছে।

আমরা মোটামুটি সুখেই আছি। তবে মুসলেম মিয়া খুবই যন্ত্রণা করছে। সারাক্ষণ হা হুতাশ— ভাইজান আপনের কথা শুইন্যা বৃষ্টির পানিতে নেংটা হইয়া নাচলাম। এরপরেই যে কী হইল ভাইজান। এখন মানুষের মনের কথা বুঝি। কে মনে মনে কী ভাবতাছে পরিষ্কার ধরতে পারি। এই যেমন ধরেন আপনে এখন ভাবতেছেন একটা হাতির বাচ্চার কথা। সত্য বলতেছি কি-না বলেন ভাইজান ।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, হ্যা সত্য বলছ। হাতির বাচ্চার কথাই ভাবছি।

'তারপর ধরেন বেলী ফুলের গন্ধ। সারা শইল দিয়া ভুরভুর কইরা গন্ধ বাইর হয়। আইজ সকালে একবার গায়ে মাখা সাবান দিয়া গোসল দিছি। দুপুরে গোসল দিছি কাপড় ধোয়া সাবান দিয়া । তারপরেও গন্ধ যায় না। কী করি ভাইজান বলেন।'

'কী করতে চাও ?'

'আগের মত হইতে চাই। পীর ফকির হইতে চাই না। পাপ করতে ইচ্ছা করে ।'

'ইচ্ছা করলে পাপ করো।'

'আমার যে অবস্থা ভাইজান আর তো মনে হয় পাপ করতে পারব না। পাপই যদি করতে না-পারি পৃথিবীতে বাইচা লাভ কী ? দুনিয়ার আসল মজা পাপে । পুণ্যির মজা নাই। কোনো একটা তরিকা আমারে বলেন যেন সব আগের মত হয়। ফুলের গন্ধটা অসহ্য হইছে ভাইজান। এরচে শইল্যে গু মাইখ্যা বইসা থাকা ভাল। এই যে দিন রাইত পাইপের মইধ্যে লুকাইয়া থাকি এইটা কি ভাল ?'

'চলো আজ রাতে বের হই। কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করি।'

'আপনে যা বলবেন করব। গু খাইতে বললে, বিসমিল্লাহ বলে কাচা গু খাব । খালি আমারে আগের মত বানায়া দেন।'

আমি মুসলেম মিয়াকে নিয়ে বের হলাম।

আজ বারো তারিখ। পাখির জন্মদিন। জন্মদিন হচ্ছে কি-না খোঁজ নেয়া দরকার। জুঁই এর বাবাকে সকালবেলা পাখিদের বাসার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। তিনি হাতির বাচ্চা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন কি-না সেটাও জানা দরকার।

পাখিদের বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াতে হল। বাড়ির সামনে বিরাট জটলা। অনেক লোকজন। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করতেই একজন হড়বড় করে বলল, এই বাড়িতে একটা হাতির বাচ্চা নিয়ে একজন গেছে।

আমি বললাম, হাতির বাচ্চা ?

'জ্বি হাতির বাচ্চা। দেড় টনী ট্রাকে করে এনেছে।'

'বিষয়টা কী ?'

'বিষয়কি জানার জন্যেই তো আমরা দাঁড়ায়ে আছি।'

পাখি মেয়েটির আনন্দ নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলাম না। মানুষের গভীর আনন্দ এবং গভীর বিষাদ কাছ থেকে দেখতে নেই।

আমি মুসলেমের দিকে তাকিয়ে বললাম, মুসলেম তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কী বলে ? পাখি মেয়েটির বাবা কি ফিরে এসেছে ?

মুসলেম সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি ফিরেছেন। উনার শইল খারাপ, তয় ফিরেছেন । পুলিশ উনারে ছাইড়া দিছে।

মুসলেমের কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তার গা দিয়ে বেলী ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। তীব্র ভাবেই ছড়াচ্ছে। এই গন্ধের উৎস অনেক গভীরে। সাবান পানির ধোয়ায় এই গন্ধ যাবে না। আমি মুসলেম মিয়াকে নিয়ে হাঁটছি। মুসলেমের চোখে পানি ।

সে বিড়বিড় করে বলল, ভাইজান আপনের পায়ে ধরি আমারে বদলায়া দেন। ফুলের গন্ধে আমি পিসাব করি। আপনে আমারে আগের মুসলেম বানায়া দেন ।

হায়রে সেই ক্ষমতা যদি আমার থাকত। সব ক্ষমতা নিয়ে একজন দূরে বসে আছেন। ভুল বললাম, দূরে না, কাছেই বসে আছেন। খুব বেশি কাছে বলেই তাকে

দেখা যায় না।

(সমাপ্ত)

একটি শুভম ক্রিয়েশন

তোমাদের এই নগরে

হুমায়ূন আহমেদ

তোমাদের এই নগরে

হুমায়ূন আহমেদ

তোমাদের এই নগরে

হুমায়ূন আহমেদ

উৎসর্গ

এ.এফ.এম. তোফাজ্জল হোসেন
এই মানুষটি জীবনে কোনো কিছুই চ্যালেঞ্জ
হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তবু তাঁর বন্ধুরা
তাকে আদর করে ডাকে- চ্যালেঞ্জার।

###

রাতে দরজা জানালা খোলা রেখে ঘুমানোর কিছু উপকার আছে। ঘরে বাতাস খেলে, নিজেকে প্রকৃতির অংশ বলে মনে হয়, খাঁচার ভেতর ঘুমুচ্ছি এরকম মনে হয় না। খোলা দরজা দিয়ে চোর ঢুকবে এবং ঘরের জিনিসপত্র সাফ করে দেবে তাও কিন্তু না। চোরদের গাইড-বুক বলে, তালাবন্ধ ঘরে তালা ভেঙে ঢুকবে। কিন্তু দরজা জানালা সবই খোলা এমন ঘরে কখনো ঢুকবে না- সমস্যা আছে। কেউ খামাখা দরজা খোলা রাখে না। নিশ্চয়ই কোথাও কিন্তু আছে। চোরেরা 'কিন্তু' ভয় পায়।

চোরদের সাইকোলজির উপর ভরসা করেই আমি দিনের পর দিন দরজা জানালা খোলা রেখে ঘুমাই কখনোই কোনো সমস্যা হয় নি। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার কয়েকদিন হল ঘটেছে- প্রায় রাতেই ঘরে চোর আসছে বলেই আমার ধারণা। চোর ধরতে পারছি না। অনেকের থাকে পাতলা ঘুম। খুটখাট শব্দ হলেই এরা লাফ দিয়ে উঠে বসে। গলায় মাইক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে-কে কে কে কে? আমার উলটো ব্যাপার। খুঁটখাট শব্দে আমার ঘুম গাঢ় হয়। তখন ঔ আর চোখ মেলতে পারি না।

প্রতি রাতেই ঘুমুবার সময় ভাবি— আজ চোর ধরতে হবে। যেভাবেই হোক ব্যাটাকে বেঁধে মেসের ম্যানেজারের হাতে তুলে দিতে হবে। সে চায়াটা কী? কী আছে আমার ঘরে যে রোজ রাতে আসতে হবে।

পরিকল্পনা পর্যন্তই, পরিকল্পনা আর কাজে খাটে না। শেষে ঠিক করলাম— দূর ছাই চোর ঘুরুক চোরের মতো। আমি ঘুমাই আমার মতো। সে আমার ঘর থেকে নেবেটা কী? তোষকের নিচে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাধা পাঁচ শ' টাকার নোটের তোড়া নেই। আখরোট কাঠের বাক্সে হীরার নেকলেশ নেই। টেবিলের উপর সস্তার একটা টাইমপিস আছে এটা নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাক। খামাখা চোরের বিষয়ে টেনশন করে ঘুম নষ্ট করে লাভ কী? দিলাম লেজ পেতে। লেজে পা দিয়ে চোর আসলে আসুক।

তখন চোর ধরা পড়ল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি চোর চেয়ারে বসা। ঘরে চাঁদের আলো! চারপাশ মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি— চোরের পরনে চেক - লুঙি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না— সে বসে আছে আমার দিকে পিঠ দিয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। দ্রুত পা নাচাচ্ছে বলে স্যান্ডেলে থপথপ শব্দ হচ্ছে। শব্দের মধ্যেও ছন্দ আছে।

থপথপ থপ থপপস
থপথপ থপ থপপস

স্যান্ডেল সংগীত আমি মোটামুটি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই শুনছি। স্যান্ডেলের থপথপ শব্দ থেমে গেল। চোর এবার টেবিলের ড্রয়ার ধরে টানাটানি করতে লাগল। এই ড্রয়ারটা শক্ত। চট করে খোলা মুশকিল। তবে খুললেও সমস্যা কিছু নেই। ড্রয়ার ফাঁকা থাকার কথা। কিছু চিঠি পত্র, একটা চাবির রিং, দেয়াশলাই এবং মোমবাতি । এর বেশি কিছু থাকার কথা না।

বেশ শব্দ করে ড্রয়ার খুলল। এই শব্দে আমার ঘুম ভাঙল কি না চোর চট করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেও নিল। এখন সে আগ্রহ নিয়ে ড্রয়ার হাতড়ে

দেখছে। এখন তার হাতে চাবির রিং। ঝনঝনি করে রিং বাজাচ্ছে। মনে হল রিং বাজিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে। এর মধ্যেও একটা ছন্দ আছে—রিনরিন রিন ঝিন রিনরিন রিন ঝিন। এবার সে উঠে দাঁড়াল। চাবির রিংটা এখনো তার হাতে আছে। চাবি দিয়ে ট্রাংক বা সুটকেসের কোন তালা খুলবে এরকম কোনো মতলব কি করছে? করলে ভুল করবে। আমার ঘরে সুটকেস, ট্রাংক কিছুই নেই। রিং ভরতি চাবিই শুধু আছে। খোলার মতো তালা নেই।

চোরটা আমার খাটের কাছে উবু হয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে খাটের নিচ থেকে কী যেন নিল। আবার গিয়ে চেয়ারে বসল। চাকুর হাতে এখন বিস্কুটের টিন। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম থেকে আমার আলসার হয়েছে এরকম সন্দেহে রূপা এই বিস্কুটের টিন আমাকে দিয়েছে। এক-দুই ঘণ্টা পরে পরে যেন বিস্কুট খেয়ে এক গ্লাস পানি খাই । আমি যে কাজটা এখনো করতে পারি নি— চোর তা বেশ আয়েশ করেই করছে দেখা গেল । সে জগ থেকে গ্লাসে পানিও ঢেলেছে। বিস্কুট খেয়ে পানি খাওয়া হবে তারপর নিশ্চয়ই আরাম করে সিগারেট ধরানো হবে। সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই আছে আমার বালিশের নিচে । এই ঘরের সব কিছুই এই চোরের জানা । কাজেই সে যে সিগারেটের জন্যে বালিশের নিচে হাত দেবে এটা প্রায় নিশ্চিত । চোরকে এই কাজটা করতে দেব, না তার আগেই উঠে বসব বুঝতে পারছি না। 'হ্যালো ব্রাদার কেমন আছেন?' এই প্রশ্ন করা যেতে পারে। আচমকা এই প্রশ্ন শুনে চোর হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে পেটে ছোরা বসিয়ে দেবে না তো? চোরের সঙ্গে ছোটখাটো অস্ত্র রাখে বলে শুনেছি- ছোরা, ব্লেড, ক্ষুর। Small range weapons.

কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ হচ্ছে। চোর বিস্কুট খাচ্ছে। আমি উঠে বসলাম। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে গলার স্বর যতটা স্বাভাবিক রাখা যায় ততটা স্বাভাবিক রেখে বললাম, কেমন আছেন?

কুড়মুড় শব্দে বিস্কুট খাওয়া বন্ধ হল। চোর পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঠোঁট মুছে আমার চেয়েও স্বাভাবিক গলায় বলল, জি ভালো।

'কী করছেন?'

'বিসকিট খাচ্ছি।'

'পরিচয় জানতে পারি?'

'দুই শ" আঠারো নম্বরের বোর্ডার। আমার নাম জয়নাল। ঘরে আলো কম তো এই জন্যে চিন্তে পারছেন না। মতিঝিল ব্রাঞ্চের কৃষি ব্যাংকে কাজ করি। কেশিয়ার। লাইট জ্বালালেই চিনবেন।'

'এখানে কী করছেন?'

'বসে আছি।'

'বসে আছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নিজের ঘর ছেড়ে আমার ঘরে বসে আছেন কেন?'

'রাগ করছেন?'

'রাগ করি নি। তবে খুবই অবাক হচ্ছি। আপনি রাতে প্রায়ই আমার ঘরে আসেন। তাই না?'

'জি।'

'এসে কি করেন। বিসকিট খান?'

'বিসকিট এর আগে একবার শুধু খেয়েছি। সেদিন খেয়েছিলাম দুটা, আজ

খেয়েছি। একটা ?'

'ও আচ্ছা।'

'মাঝে মধ্যে সিগারেট খাই। সিগারেটের প্যাকেট যদি টেবিলে থাকে তখনই খাই। আপনার বালিশের নিচে থাকলে খাই না, আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। এটা তো বিবেচনায় রাখতে হবে।'

ভদ্রলোকের বিবেচনায় মুগ্ধ হয়েই বোধ হয় বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সহজ ভঙ্গিতে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। তবে সিগারেট ধরালেন না। নিচু গলায় বললেন, ভাই সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন? এবং আমার উপর খুবই রাগ করছেন। রাত বিরাতে আপনার ঘরে ঢুকি। নিজের মতো ঘোরা ফিরা করি। বিস্কুট খাই, সিগারেট খাই। ট্রেসপাসিং কেইস । আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে পুলিশেও দিতে পারেন। পুলিশেই দেওয়া উচিত। আমি নিজে হলেও তাই করতাম। এই ধরনের কাজ করে আমি বড় লজ্জিত। ক্ষমা করবেন।

জয়নাল সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে না তিনি লজ্জিত কিংবা দুঃখিত। তিনি বিস্কুটের টিন খুলে আরেকটা বিস্কুট নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হচ্ছে বিস্কুট খেতে সংকোচ বোধ করছেন। আমার অনুমতি ছাড়া খাবেন না। আমি বললাম, খান বিস্কুট খান।

জয়নাল সাহেব ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বললেন- 'রাত জাগলে প্রচণ্ড ক্ষিধে লাগে। রাত তিনটার পর ক্ষিধার চোটে মাথা আউলা হয়ে যায়। আমার বিছানায় একটা কোল বালিশ আছে। কোল বালিশকে মনে হয় কলা। কভার খুলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

'রাত জাগেন কেন?'

'এই তো আসল প্রশ্ন করেছেন। রাত জাগি কারণ আমার রাতে ঘুম হয় না। শুনলে মনে করবেন বানিয়ে বলছি। একুশ বছর আমি রাতে ঘুমাই নাই। সামান্য ভুল বললাম, একুশ বছর এখনো হয় নাই সামনের নভেম্বরের নয় তারিখে একুশ বছর হবে।'

'একুশ বছর ধরে আপনি রাতে ঘুমান না?'

'জি না।'

'দিনে ঘুমান তো? না কি দিনেও ঘুমান না?'

'সূর্য উঠার পর ঘণ্টা খানিক ঘুম হয়। তাও সবদিন না। যেমন ধরেন গত শনিবারে আর সোমবারে দিনে সামান্য ঘুম হয়েছে।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তার কবিরাজ সবই দেখিয়েছি। টোটকা চিকিৎসা করিয়েছি। যে যা করতে বলেছে করেছি। একজন বলল বাদুড়ের মাংস খেতে। বাদুড়ও তো রাতে ঘুমায় না। কাজেই বাদুড়ের মাংস খেলে বিষে বিষক্ষয় হবে।'

'বাদুড়ের মাংস খেয়েছেন?'

'জি। বাদুড় ধরাতো মুশকিল। আমাদের গ্রামের এক ভাঙা মন্দির থেকে তিনটা বাদুড় ধরেছিলাম। আমি ধরি নি— জিতু বলে একটা ছেলে দশ টাকার বিনিময়ে ধরে দিয়েছিল। কেউ রান্না করতে চায় না। শেষে আমি নিজেই রান্না করলাম। রান্না তো না তেল মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি।'

‘খেতে কেমন ছিল?’

‘অত্যন্ত সুস্বাদু। মাংসটাও সুন্দর লাল। টকটকে মাংস। নরম। প্রথমে খুবই ঘেন্না লাগছিল। একটুকরা মুখে দেবার পর ঘেন্না কেটে গেল। চেটেপুটে খেয়েছি। তবে যে কারণে খেয়েছি তার কিছু হয় নি। ঘুম হয় নি।’

জয়নাল সাহেব সিগারেট ধরালেন । অনিদ্রার রোগী রাতে কথা বলার সঙ্গী পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়। ভদ্রলোকের তাই হয়েছে। মনের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছেন ।

‘বুঝলেন ভাই সাহেব রাতে ঘুম হয় না। নিজের ঘরে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায় । রাস্তায় গিয়ে যে হাঁটাহাঁটি করব সেই উপায় নেই- এরা রাত বারটার সময় কোলাপসিবল গোট বন্ধ করে দেয়। মেসের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি। আপনার ঘর সব সময় খোলা থাকে। একরাতে টুক করে আপনার ঘরে ঢুকে পড়লাম সেই থেকে অভ্যাস হয়ে গেল। বাংলা প্রবচন আছে না— “জ্বর হইয়া ৰউ লেংটা হইল, সেই থাইক্যা বউ এর অভ্যাস হইল।” এই প্রবচনটা শুনেছেন?’

‘জি না।’

‘এটা আমাদের নেত্রকোনা অঞ্চলের প্রবচন। একটু অশ্লীল। নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। প্রবচনটার অর্থটা পরিষ্কার করে না বললে বুঝবেন না। গ্রামের এক বউ-এর প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে। জ্বরের ঘোরে মাথা ঠিক নাই গায়ের কাপড় চোপড় খুলে ফেলেছে। সবার সামনেই পুরো নগ্ন। এর থেকে তার হয়ে গেল অভ্যাস। কথা নাই বার্তা নাই ফন্ট করে কাপড় খুলে নগ্ন হয়ে পড়ে। সার কথা হল মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রবচনটা এখন কি বুঝতে পেরেছেন?’

‘জি বুঝতে পারছি।’

‘আপনার সঙ্গে কথা বলে খুবই ভালো লাগছে। রাতের পর রাত একা বসে থাকি। গল্পের বই পড়ার অভ্যাস নাই। তাও পড়ার চেষ্টা করেছি। ভালো লাগে না । শরৎচন্দ্রের একটা বই কিনলাম। দোকানদার বলেছে খুবই ভাল বই— দেনা পাওনা নাম। এতবার সেই বই পড়েছি প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। যেমন ধরেন শুরুটা বলি—

‘চন্ডীগড়ের চন্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধে জয় করিয়া বারই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে ইহাকেই আশ্রয় করিয়া চন্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।.... আরো বলব?’

‘না আর বলতে হবে না।’

‘খবরের কাগজ পড়ি এতে কিছু সময় যায়। খবরের কাগজের কিছুই বাদ দেই না। সবই পড়ি। দুইবার করে পড়ি। জেনারেল নলেজের পরীক্ষায় কেউ আমার সঙ্গে পারবে না। বলেন দেখি গৌতমবুদ্ধের জন্ম কোথায় হয়েছে? গত পরশু পেপারে ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল তো সেই উপলক্ষে একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে— আমি তিনবার পড়লাম। বলতে পারবেন। গৌতম বুদ্ধের জন্ম কোথায় হয়েছে। একটা হিনটস দেই প্রথম অক্ষর ‘ল’।’

‘বলতে পারলাম না।’

‘লুম্বিনীর শালবনে।’

‘মৃত্যু কোথায় হয়েছে জানেন?’

‘না।’

'মৃত্যুও হয়েছে বৈশাখী পূর্ণিমায়। শালবনে। তবে লুম্বিনীর শালবনে না— কুশিনারার শালবনে। মহাপুরুষদের জন্ম মৃত্যু একই দিনে হয়। ভাই সাহেব উঠি অনেক বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। জানি আপনি কিছু মনে করেন নাই। মনে করলে আমার এত কথা শুনতেন না। অনেক আগেই আমাকে গেট আউট করে দিতেন। আপনি সেটা করেন নাই। সিগারেটের প্যাকেট আগায়ে দিয়েছেন। জাপানি একটা প্রবাদ আছে– "একটা আন্তরিক কথা দিয়ে তিনটা শীতকাল উষ্ণ করা যায়।" আপনার সঙ্গে কথা বলে জাপানি প্রবাদটার কথা মনে পড়ল। ছাত্রজীবনে আমার প্রবাদ সংগ্রহের বাতিক ছিল। প্রবাদ, প্রবচন লিখে তিনশ পৃষ্ঠার একটা খাতা ভরতি করেছিলাম। বাসার লোকজন ভুলক্রমে পুরোনো খবরের কাগজের সঙ্গে খাতাটা বিক্রি করে ফেলে। জীবনে এত দুঃখ পাই নাই। ভাইসাব যাই?'

আমি বললাম, আচ্ছা যান।

ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, আপনার ঘুম ভাঙায়েছি। যদি অনুমতি দেন তা হলে ঘুম পাড়ায়ে দিয়ে যাই।

'কীভাবে ঘুম পাড়াবেন?'

'মাথা বানিয়ে দিব। চুল টেনে দিব। নাপিতের কাছ থেকে শিখেছি। নাপিতের নাম নেক মর্দ। নাম শুনে মনে হয় হিন্দু। আসলে মুসলমান। অতি ভালো মানুষ। আমাকে যত্ন করে শিখিয়েছেন।'

'কী শিখিয়েছেন? মাথা বানানোর কৌশল?'

'উনার কাছে চুল কাটাও শিখেছি। ভবিষ্যতে চুল কাটার প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন । আমার কাছে কাঁচি চিরুনি সবই আছে।'

'জি বলব।'

'এখন যদি অনুমতি দেন, মাথা বানায়ে দেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়ায়ে দিব ইনশাল্লাহ। মাথার নিচে দুটা বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়েন।'

আমি আপত্তি করলাম না। মাথার নিচে দুই বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুরু হয়ে গেল মাথা মালিশ। জয়নাল সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, ভাই সাহেব কেমন লাগছে?

আমি বললাম, ভালো ।

'শরীর ছেড়ে দেন। যত ছাড়বেন তত আরাম পাবেন।'

আমি শরীর ছেড়ে দিলাম। জয়নাল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, আমি কী কথা বলছি, না বলছি মন দিয়ে শোনার কোনো দরকার নাই। এক কান দিয়ে ঢুকাবেন আরেক কান দিয়ে বের করে দেবেন।

আমি বললাম, আচ্ছা ।

'সবচে আরামের মালিশ হল চোখ মালিশ। এটা দিব সবার শেষে। তখন ঘুম চলে আসবে। আরাম লাগছে না ভাই সাহেব?'

'লাগছে।'

'শরীরের আরামকে অনেকে খুব খারাপ চোখে দেখে । এটা ঠিক না। শরীর হল আত্মার ঘর। ঘর আরাম পেলে আত্মা আরাম পাবে ঠিক না ভাই?'

'মেসের সবার ধারণা আপনার পাওয়ার আছে।'

'কী আছে?'

'পাওয়ার আছে।'

'পাওয়ার আছে মানে কী?'

'কিছু কিছু মানুষকে আল্লাপাকে পাওয়ার দিয়ে পাঠান। তারা যা ইচ্ছা করে তাই হয় ।'

'আপনার ধারণা আমার পাওয়ার আছে?'

'আমার কোনো ধারণা না- লোকজন বলে।'

'আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'আমি বিশ্বাসও করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। আল্লাহ কখন কাকে কী দেন। বলা মুশকিল। কে জানে হয়তো আপনাকে দিয়েছে। এমন তো না যে আপনাকে কিছু দিলে আল্লাহর টান পড়ে যাবে। উনার হল অফুরন্ত ভাণ্ডার।'

'আল্লাহ আমাকে কিছুই দেন নাই। তবে এখন আপনার মাধ্যমে আরাম দিচ্ছেন। খুবই আরাম পাচ্ছি। মাথা মালিশটাকে তো আপনি একেবারে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। চোখের কাজটা কখন শুরু করবেন?'

'দেরি আছে। কপাল ম্যাসাজ হবে, তারপরে ভুরু— তারপরে চোখ । ঘুম পাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ পাচ্ছে। খুবই ঘুম পাচ্ছে। কষ্ট করে জেগে আছি।'

'কষ্ট করে জেগে আছেন কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়লে তো আর আরামটা পাব না। যতক্ষণ জেগে থাকব ততক্ষণই আরাম। যে নাপিতের কাছ থেকে এই কাজ শিখেছেন তার নামটা যেন কী?'

'নেকমর্দ।'

'বেঁচে আছেন এখনো?'

'জি না। উনার ইন্তেকাল হয়েছে।'

'কবর হয়েছে কোথায়?'

'চাঁদপুরে।'

'মাজার জিয়ারত করতে যান না?'

'যাওয়া দরকার। এবং কবর বাধানোর ব্যবস্থা করাও দরকার। শ্বেত পাথরে লেখা থাকবে

মহান মাথা মালিশ শিল্পী
নেকমর্দ

বুঝতে পারছি আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুম চলে আসছে। ওস্তাদ নেকমর্দের যোগ্য উত্তরসূরি তার চোখের কাজ শুরু করেছেন । মনে হচ্ছে চোখের পাতার উপর দিয়ে ভেজা পায়ে পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে। পিঁপড়াদের মধ্যে দু-একটা আবার দুষ্ট প্রকৃতির। এরা পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কুটুস করে কামড় দিচ্ছে। সেই কামড়েরও আরাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়– "সুখের মতো ব্যথা।" মূল কবিতাটা মনে করার চেষ্টা করছি। ঘুমে মাথা এলোমেলো হয়ে আসছে— 'ভালো মনে আসছে না-—

কমল ফুল বিমল সেজখানি
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে।

বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা ।

'হিমু। এই হিমু।'

মাথা থেকে কবিতা উধাও হয়ে গেল— হঠাৎ মনে হল জয়নাল সাহেব বাবা। তাঁর গায়ের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। গভীর ঘুম। অবচেতন মনের যে অংশে বাবা ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন। সেই অংশ থেকে তিনি উঠে এসেছেন। কিছু কঠিন কঠিন কথা তিনি এখন শুনাবেন।

'হিমু!'

'জি।'

'বেহায়ার মতো মাথা পেতে শুয়ে আছিস তোর লজ্জা লাগছে না। ছোটলোকদের মতো মাথা মালিশ করাচ্ছিস?'

'লজ্জা লাগার কী আছে? শরীর আরাম পাচ্ছে। শরীরে বাস করছে আত্মা । কাজেই আত্মাও আরাম পাচ্ছে।'

'ফাজলামি করছিস? তোকে এত দিন কী শিখিয়েছি? যা শিখিয়েছি। সব ভুল মেরে বসে আছিস?'

'বাবা ঘুমুতে দাও। আরাম করে ঘুমুচ্ছি।'

'গৌতম বুদ্ধ কোথায় জন্মেছিলেন?'

'লুম্বিনীর শালবনে।'

'হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অনেক বাণী তোকে শিখিয়েছিলাম। মনে আছে?'

'না।'

'সব ভুল মেরে বসে আছিস?'

'বসে নেই বাবা শুয়ে আছি।'

'আমার সঙ্গে আবৃত্তি কর—

"আত্তাহি অওনো নাথো
কোহি নাথো পারসিয়া ।"

আমি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলাম। বাবা বললেন– "এর অর্থটা বলে দেই— "নিজের প্রদীপ নিজেকেই জ্বালাতে হবে।"

আমি বললাম, হু।

বাবা বললেন, 'কিছু না বুঝেই বলে ফেললি হু।'

'না বোঝার তো কিছু নেই। নিজের প্রদীপ নিজেকেই জ্বালাতে হবে এটা তো সহজ কথা।'

'মোটেই সহজ কথা না— অতি জটিল কথা। প্রদীপ থাকলেই হয় না। প্রদীপে তেল থাকতে হয়। প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে ম্যাচের কাঠি থাকতে হয়। বুঝতে পারছিস?'

'হু। বাবা দয়া করে তুমি যাও। আমাকে কিছুক্ষণ আরাম করে ঘুমুতে দাও। খুব ভোরে আমাকে উঠতে হবে।'

'কেন?'

'ফরিদা খালার বাসায় যেতে হবে? উনি জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।'

বাবা দুঃখিত গলায় বললেন, ব্যাটা তুই তো সংসারে জড়িয়ে পড়ছিস ।

‘তোকে জরুরি কাজে ডেকে পাঠাচ্ছে। তোর আবার কিসের জরুরি কাজ? খবর্দার তুই যাবি না।’

‘আচ্ছা যাও যাব না।’

‘তোর ফরিদা খালা ঘোর সংসারী মানুষ। তার কাছ থেকে এক শ’ হাত দূরে থাকবি ।’

‘আচ্ছা।’

‘এক শ’ হাত না, তারচেয়েও বেশি। পাঁচ শ' হাত দূরে থাকবি।’

‘আচ্ছা এখন তুমি যাও।’

বাবার আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি তলিয়ে যাচ্ছি গাঢ় গভীর ঘুমে।

###

ফরিদা খালা কখনোই আমাকে ধমক না দিয়ে কথা শুরু করতে পারেন না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বাড়ির পুরোনো ড্রাইভার দুদিনের কথা বলে পনেরো দিন পর ফিরে এলে তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা হয় সেই দৃষ্টি। তারপর শুরু হয় ধমক ৷ প্রথমেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। তারপর বলেন— আমার মতো অপদার্থ, অকর্মণ্য মানুষ তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। আমি এখনো কেন বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু থেকে লাফ দিয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়ছি না তা জানতে চান। তারপর এক সময় তার রাগী রাগী মুখ হাসি হাসি হয়ে যায়। তিনি বলেন— রামছাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছিস কী জন্যে? বোস। কী খাবি চা না সরবত। বরফ দিয়ে লেবুর এক গ্লাস সরবত খা। কিছু ভিটামিন সি শরীরে যাক ; চা খেয়ে খেয়ে শরীরের কি অবস্থা করেসিস খেয়াল আছে? আয়নায় নিজেকে কখনো দেখিস? দেখলে তো ওয়াক থু করে বমি করে আয়না নষ্ট করে ফেলতি। ঝামা দিয়ে ঘসে তোকে একদিন গোসল করাতে পারলে আমার মনটা শান্ত হত । তারপর বড় করে নিশ্বাস নিয়ে বলেন- ওই মরজিনা, মরজিনা হিমুকে লেবুর সরবত বানিয়ে দে। মরজিনা এ বাড়ির কাজের মেয়ে অনেকদিন থেকে আছে। খালা কথায় কথায় বলেন এই বাড়িতে মরজিনার নাম যতবার নেওয়া হয় আল্লাহর নামও ততবার নেওয়া হয় না।

খালা যখন মরজিনাকে ডাকাডাকি শুরু করেন তখন বুঝতে হবে তার রাগ পড়ে গেছে। এই পর্যায়ে আসতে মাঝে মাঝে অল্প সময় লাগে আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় লাগে । আজ যেমন লাগছে। খালার রাগ বাড়ছেই। তার গালাগালির মধ্যে আজ নতুন নতুন জিনিস যুক্ত হচ্ছে।

‘তুই বদ্ধ উন্মাদ এটা কি তুই জানিস? উন্মাদদের গা থেকে ‘রে’ বের হয়। এই ‘রে’-এর আশপাশে যারা থাকে তারাও উন্মাদ হয়। তোর গা থেকে যে ‘রে’ বের হয় এটা তুই জানিস? যে কোনো সুস্থ মানুষ তোর সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেউ যদি গলা টিপে তোকে মেরে ফেলে তা হলে তার বেহেশতে নাসিব হবে এটা কি তুই জানিস?

খালা চিৎকার করেই যাচ্ছেন- আমি যথারীতি দাঁড়িয়ে আছি। লেবুর সরবত প্রসঙ্গ কখন আসে তার জন্যে অপেক্ষা করছি। আর লক্ষ করছি আঠারো উনিশ বছরের একটা অপরিচিত মেয়ে খুবই কৌতুহলী হয়ে পাশের ঘর থেকে মুখ বের করে আমাকে দেখছে এবং খালাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়া মাত্র চট করে মাথা সরিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খালার ব্যাপারে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। একবার সে খালার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল—

প্লিজ প্লিজ।

খালা তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন— আমাদের কথার মধ্যে নাক গলাবে না। প্লিজ প্লিজ বলবে না। তুমি তোমার মতো থাক।

তারপর আবারো হেভি মেশিনগান চালু করলেন– কত লোক ট্রাকের নিচেই পড়ে মারা যায়– তুই কেন মারা যাচ্ছিস না? তুই তো রাস্তাতেই থাকিস। কোনো ট্রাক তোকে ধাক্কা দিয়েছে এই খবরটা শুনলেই আমি দশটা ফকির খাওয়াতাম। ফকির আমার খবর দেওয়াই আছে। আসবে। আর খিচুড়ি খেয়ে চলে যাবে।

বলতে বলতে খালা বাথরুমে ঢুকলেন। তার মাথায় নিশ্চয় রক্ত উঠে গেছে। মাথায় পানি ঢালা হবে।

অপরিচিত মেয়েটা এই সুযোগে ঘরে থেকে দ্রুত বের হয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল— আন্টির অতি নিম্নমানের “আচরণবিধির” জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার ধারণা তিনি কিঞ্চিৎ অসুস্থ। হাইপার টেনশনঘটিত ব্যাধির রোগীরা এরকম আচরণবিধি করে।

মেয়েটার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে— এই দেশের মেয়ে হলেও দেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বড় হয়েছে বিদেশে। ‘আচরণবিধি’ পত্রিকার ভাষা। বাংলাদেশের কোনো মেয়ে কথোপকথনে আচরণবিধি বলবে না। আমরা বিদেশীদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার সময় যেমন একটু ভয়ে ভয়ে থাকি ইংরেজিটা ঠিক হল কি না, মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিই এই মেয়েও তাই করেছে। সে প্রথমে কথাগুলি ইংরেজিতে গুছিয়ে নিয়ে পরে বাংলায় অনুবাদ করছে। বাক্যগুলি দ্রুত বলছে না। থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে বলছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটির চেহারা এবং পোশাকআশাক দেখে মনে হচ্ছে মফস্বলের মেয়ে বাবার সঙ্গে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। চিড়িয়াখানা দেখবে, আহসান মঞ্জিল দেখবে। বাড়ি ফেরার আগে আগে শাড়ি কিনবে, ডালা থেকে স্যান্ডেল কিনবে। মেয়ের বাবা স্টুডিওতে মেয়ের কিছু ছবিও তুলবেন। বিয়ের সময় এইসব ছবি কাজে লাগবে। বরপক্ষকে এইসব ছবি পাঠানো হবে। এমন শান্ত এবং কোমল চেহারার মেয়ে আমি অনেকদিন দেখি নি। এ ধরনের মেয়েদের একটা নাম আছে- অশ্রুকন্যা। এদের চোখে সব সময় জল ছলছল করে। তবে এরা প্রায় কখনোই কাঁদে না কিন্তু এদের দেখেই মনে হয় এরা কাঁদার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

‘আপনি বরঞ্চ চলে যান। ইহাই হবে উভয় পক্ষের জন্যে কল্যাণকর।’

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, খালা সরবত খেতে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এক্ষুনি মরজিনাকে ডেকে সরবতের কথা বলবেন। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

‘সরবত খেতে বলবেন কেন?’

'এটাই উনার নিয়ম। অনেকক্ষণ রাগারগি করে তারপর স্বাভাবিক হয়ে যান। ভালো কথা তুমি কে?'

'আমি আপনার খালার দূর সম্পর্কের নিস। আমার নাম আশা।'

'তুমি কি দেশের বাইরে থাক?'

'জি। আমি নিউজার্সিতে থাকি। এবার হাইস্কুল পাস করেছি। ইউনির্ভাসিটিতে ঢুকবো। ইউসিএল এ সুযোগ পেয়েছি।'

'প্রথম বাংলাদেশে এসেছ?'

'খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম। কিছু মনে নেই। আপনি কথা বলে সময়ের অপচয় না করে অতি দ্রুত 'নিস্কৃতি' হয়ে যান। আমার ভয় লাগছে।'

'অতি দ্রুত নিস্কৃতি হয়ে যাবার কোনোই দরকার নেই। দেখবে এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কথা শেষ হবার আগেই খালা বের হলেন । তাঁর মাথা ভেজা। অর্থাৎ মাথায় পানি দেওয়া হয়েছে। মাথায় পানি দেওয়ায় তেমন লাভ হয়েছে বলে মনে হল না। মুখ থম থম করছে। চোখ লাল। খালা আগের মতোই হুঙ্কার দিয়ে বললেন— তোকে খুব কম করে হলেও দশবার বলেছি। সকাল আটটার আগে আসবি। আমার খুব জরুরি দরকার। যেহেতু সকাল আটটায় আসতে বলেছি- তুই ইচ্ছা করে এলি সাড়ে এগারোটায়। আর কিছু না একটা ভাব দেখালি। যদি বলতাম দুপুরে আসিস তা হলে আসতি সকাল সাতটায়। ভাব না ধরলে আলাদা হওয়া যায় না। প্রমাণ করতে হবে না — আলাদা। আমাদের বিখ্যাত হিমু সাহেব। ঢাকার রাজপথ পর্যটক। রামছাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়িস না। তুই ল্যাম্পপোস্ট না যে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে । বোস। সরবত খাবি?

'না।'

'তা কেন খাবি? শরীরের উপকার হয় এমন কিছু খেলে তুই যে আলাদা একটা প্রমাণ হবে কেন? শরীর পুরোপুরি নষ্ট হয় এমন কিছু খা। গাঁজাটাজা খা । গাঁজা ধরেছিস না?'

'এখনো ধরি নি।'

'দেরি করছিস কোন ধরে ফেল। আর ধরার দরকারও নেই। গাঁজাখোরদের আশপাশেই তো থাকিস। ওতেই ভোজন হয়ে যায়।'

খালা আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আশার দিকে তাকিয়ে বললেন– হিমুকে বেশি করে লেবু দিয়ে একগ্লাস লেবুর সরবত বানিয়ে দে। রোদে রোদে ঘুরে, ওর ভিটামিন সি খুবই দরকার।

আশা বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসির আভাস। তাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয়ে সে অস্থির হয়েছিল। হঠাৎ সব ভয় কেটে গেছে। অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছে ঝলমলে সূর্যের আলো।

আমি বেতের সোফায় বসেছি। খালা বসেছেন আমার সামনে। টাওয়েল দিয়ে মাথার ভেজা চুল শুষছেন। তার চোখ মুখ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন- আসতে দেরি করলি কেন?

'রাতে ঘুম ভালো হয় নি। ঘরে চোর ঢুকে পড়েছিল। চোরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'চোরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে দেরি হল?'

‘হ্যাঁ।’
‘ওকে চা বিসকিট খাওয়ালি ।’
‘চা খাওয়াই নি বিসকিট খাইয়েছি।’

‘উদ্ভট অজুহাত আমাকে দিবি না। হিমু। অসহ্য।’

‘আচ্ছা যাও দেব না।’

‘আটটার সময় তোর আসার কথা। তুই আসছিস না। আশা হয়ে গেল অস্থির। বাঙালি মেয়ে হলেও সারাজীবন মানুষ হয়েছে বিদেশে। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা হল এদের অভ্যাস।’

‘আমার আসার সঙ্গে এই বিদেশিনীর অস্থির হবার সম্পর্কটা কী?’

‘সম্পর্ক আছে। এই মেয়ে এক মাসের জন্যে বাংলাদেশে এসেছে। এই একমাস সে বাংলাদেশে ঘুরবে। ছবিটবি তুলবে তারপর ফিরে গিয়ে বই লিখবে। বই এর নামও ঠিক হয়ে আছে Discovering Bangla!’

‘তার বই লেখার দরকার কী?’

‘তার বই লেখার দরকার কী সেটা সে জানে। আমি সেটা তাকে জিজ্ঞেস করি নি। বেচারি শখ করে এসেছে শখটা মিটলেই হল।’

‘আমাকে কী করতে হবে? তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ দেখাতে হবে?’

‘হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?’

‘না অসুবিধা কী? আমি নিজেও বাংলাদেশ দেখি নি। তার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও যদি বাংলাদেশ দেখে ফেলি তা হলেতো ভালোই। এক চিলে দুই পাখি। One stone two birds.’

‘তোর এই কথার মানে কী? তুই বাংলাদেশ দেখিস নি?’

‘না।’

‘না মানে?’

‘যে পোকা আমের ভেতর জন্মে সে কী করে বুঝবে আম কী? আমি তো বাংলাদেশেই ঘোরাফিরা করছি। বুঝব কী করে বাংলাদেশ কী?’

খালা কঠিন কোনো কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বলতে পারলেন না । তার আগেই আশা লেবুর সরবত নিয়ে উপস্থিত হল। খালা বললেন- ‘আশা এই ছেলের নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু। তুমি যা যা দেখতে চাও এ দেখাবে। তার সঙ্গে তুমি নিশ্চিত মনে ঘুরতে পারো। কোনো সমস্যা নেই।’

আশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল— ‘ধন্যবাদ।’

ধন্যবাদটা তেমন জোরালো হল না। মনে হল সে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। আমি বললাম, ‘চল বের হয়ে পড়ি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।’

আশা খালার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘উনার সঙ্গে পেমেন্টের ব্যাপারটা শুরুতেই ঠিক করে ফেলা উচিত না? উনি তাঁর সার্ভিসের জন্যে কত চার্জ করবেন এবং মুড অব পেমেন্ট কেমন হবে সেটা জানলে ভালো হত।’

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘পেমেন্ট আবার কী? ও তোকে নিয়ে ঘুরবে—- যেখানে যেখানে যেতে বলবি নিয়ে যাবে এর আবার পেমেন্ট কী?’

‘শুধু শুধু সার্ভিস নেব?’

‘অবশ্যই নিবি।’

‘উনি তাঁর কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে ঘুরবেন?’

‘ওর আবার কাজকর্ম আছে নাকি? ওর কাজই হচ্ছে ঘোরা।’

আশা বলল, আমি একটা বাজেট করে রেখেছি প্রতিদিন একশ ইউএস ডলার।

খালার মুখ আবারো রাগি রাগি হয়ে গেল। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন— ‘এটা

আমেরিকা না। এটা বাংলাদেশ। আর হিমু জীবনে কোনোদিন এক শ' ডলার চোখে দেখেছে। কিনা সন্দেহ। রিকশা করে বের হলে রিকশা ভাড়া দিবি । ট্যাক্সি করে বের হলে দিবি ট্যাক্সি ভাড়া। ব্যাস ফুরিয়ে গেল।'

আশা কিছু বলল না। চুপ করে গেল। তবে মনে হল খালার কথাটা তার ঠিক মনে ধরে নি। সে এক শ' ডলারের ব্যাপারটা ফয়সালা না করে বের হবে না। আমি আশার দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বললাম— 'তুমি কি ডেইলি পেমেন্ট করবে? না মাসের শেষে একসঙ্গে করবে?'

'আপনার জন্যে যেটা ভালো হয় সেটাই করব।'

'দুপুরে লাঞ্চ, তারপর ধর সন্ধ্যায় চা বিসকিট এই সব খরচ কিন্তু তোমার।'

'অবশ্যই।'

'আমি দশটা-পাঁচটা ডিউটি করব । এরচে' বেশি হলে ওভার টাইম দেবে।'

'অবশ্যই। ওভার টাইম কত হবে সেটা কি আমরা ঠিক করে নেব?'

'ঘণ্টা হিসেবে ওভারটাইম হোক। প্রতি ঘণ্টায় দশ ডলার কি তোমার কাছে খুব বেশি মনে হচ্ছে?'

'না বেশি মনে হচ্ছে না।'

খালা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন । মনে হচ্ছে আমার কথাবার্তায় তিনি এতই অবাক হয়েছেন যে নিজে কথা বলতে ভুলে গেছেন। তাকে দেখাচ্ছে মাছের মতো। চোখে পলক পড়ছে না। আমি আশার দিকে তাকিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললাম, 'আজ যেহেতু প্রথম দিন— তা ছাড়া এসেছিও দেরি করে আজ ফ্রি। আজকের জন্যে কোনো চার্জ দিতে হবে না।

আশা বলল, 'ধন্যবাদ।'

এবারের ধন্যবাদটা জোরালো । আগের মতো অস্পষ্ট না । খালা এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি মনে মনে কি ভাবছেন কে জানে।

আশা বলল, 'আমি কি তা হলে তৈরি হয়ে আসবো?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

'সঙ্গে কী কী জিনিস নেব?'

'নোট করার জন্যে খাতা কলম, ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা। তাৎক্ষণিকভাবে কথাবার্তা রেকর্ড করার জন্যে ক্যাসেট রেকর্ডার । ছাতা। পানির বোতল । বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা মোবাইল টেলিফোন। ফাস্ট এইড বক্স কি আছে? একটা ফাস্ট এইড বক্স থাকা দরকার। সুইস নাইফ থাকলে ভালো হয়। নাইলনের দড়ি অবশ্যই নিতে হবে। পৃথিবীতে দড়ির সবচে বেশি ব্যবহার হয় বাংলাদেশে। দেশলাই, মোমবাতি, টর্চ লাইটও নেবে কখন কোনটা কাজে লাগে। কে জানে। ও আর একটা ফ্লাস্ক । ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা।'

আশা বলল, 'আমি দশ মিনিটের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে আসছি।'

আশা ঘর থেকে বের হবার পর খালা মনে হয় তার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন– 'তুই কী শুরু করেছিস । সত্যি সত্যি তুই টাকা নিবি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'পারিবি টাকা নিতে?'

'অবশ্যই পারব।'

'অতি সহজ সাধারণ একটা মেয়ে, তুই তো এই মেয়ের মাথা পুরা আউলায়ে দিবি। দরকার নেই। আশাকে আমি তোর সঙ্গে ছাড়ব না। দরকার হলে আমি ওকে বাংলাদেশ দেখাব।'

'তাহলে আমি বিদেয় হই।'

খালা দুঃখিত গলায় বললেন- 'বিদেয় হতে চাইলে বিদেয় হ। শুধু এই মেয়েটা যে কত ভালো এটা শুনে যা । সারাজীবন Aপ্লাস পাওয়া স্টুডেন্ট। Aপ্লাস পাওয়া স্টুডেন্ট যে কী জিনিস এটা তুই কোনদিনও বুঝবি না। বোঝার দরকারও নেই। মেয়েটার এক বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। মেয়ের মা এক আমেরিকানকে বিয়ে করেন। এখন শুনতে পাচ্ছি সেই বিয়েও ভেঙে গেছে কিংবা যাচ্ছে।'

'মহিলা কি তৃতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন?'

'হু।'

'বল কী এমন ওস্তাদ মহিলার গর্ভে এমন সাদামাটা সন্তান ।'

'সাদামাটা সন্তান মানে? কী বললাম। এতক্ষণ এ প্লাস স্টুডেন্ট।'

'ঐ আর কী ওস্তাদ মহিলার গর্ভে পড়ুয়া সন্তান।'

'শুধু পড়ুয়া না, আশা ছবি আঁকতে পারে, গান গাইতে পারে, ফটোগ্রাফিতে প্রাইজ পেয়েছে... '

'বল কী গুণাবলি তো ঝরে ঝরে পড়ছে।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

'যার যে সম্মান প্রাপ্য তাকে সে সম্মানটা দিতে হয়। মেয়েটাকে তুই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারছিস এটাই তোর ভাগ্য।'

'তুমি যে সব কথা বলছ আমার তো খালা ভয় ভয় লাগছে আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে যাব।'

খালা গম্ভীর গলায় বললেন– 'তোর সেই ভয় নেই। আমি ভয় পাচ্ছি। মেয়েটাকে নিয়ে । অতি নরম মনের মেয়ে তোর পাগলামি দেখে তার মাথা আউলায়ে যেতে পারে । মেয়েটার মাথা আউলায় এমন কিছুই করবি না। খবর্দার।'

'অবশ্যই করব না।'

খালা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন– 'আমি চাচ্ছি। খুব ভালো কোনো ছেলে পেলে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিতে । ওর মা'র উপর আমার আর ভরসা নেই। তোর সন্ধানে ভালো ছেলে আছে নাকি রে?'

'ভালোছেলে অবশ্যই আছে। তবে গাঁজাখোর টাইপ। অন্তর অত্যন্ত ভালো তবে গাঁজা টাজা খায়.. ।'

খালা বড় করে নিশ্বাস নিলেন। কঠিন ধমক দেওয়ার প্রস্তুতি । ধমক দিতে পারলেন না- তার আগেই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আশা উপস্থিত হয়েছে। একটু আগের আশার সঙ্গে এই আশার কোনো মিল নেই। কোথায় আগরতলা কোথায় চিকিরতলা টাইপ বেমিল। জিনসের প্যান্ট, লাল শার্ট। মাথায় ক্রিকেটারদের টুপির মতো টুপি ৷ তবে টুপির রং সাদা না, নীল। পিঠে হ্যাভারস্যাক ব্যাগ। চুলেও মনে হয় কিছু করেছে যে কারণে বাঙালি মেয়ে বলে এখন আর তাকে মনেই হচ্ছে না। আশা আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'Let us move.'

আমি খালার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি ক্ষুদিরামের মতো বললাম, 'বিদায় দে খালা

ঘুরে আসি।’

‘আশা শোন, আমরা বাংলাদেশ দেখতে বের হয়েছি। অনেক কিছুই আমি তোমাকে দেখাব। তুমি নোট করবে, ছবি তুলবে, চিন্তা-ভাবনা করবে। এর থেকে এক সময় হয়তো তুমি বাংলাদেশ বের করে ফেলতে পারবে।’

আশা বলল, ‘আপনি শিক্ষকের মতো কথা বলছেন কেন? সাধারণভাবে কথা বলুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে নিয়ে ক্লাস করতে বের হয়েছেন।’

‘ক্লাস করতে বের হয়েছি তো বটেই। আশা শোন একজন পেইন্টারের কথা ভাব। এই পেইন্টারের হাতে সাতটা রং আছে। পেইন্টার সাতটা রং দিয়ে ছবি এঁকেছেন । মনে করা যাক এই সাতটা রঙের মধ্যে একটা বিশেষ রং হল বাংলাদেশ । মনে করা যাক সেই বিশেষ রংটা লাল ! আমার কথা কি ফলো করছ?’

‘অবশ্যই করছি।’

‘পেইন্টার ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক রঙের সঙ্গে লাল রংটাও ব্যবহার করবেন। কখনো এই রং নীলের সঙ্গে হবে খয়েরি, কখনো সবুজের সঙ্গে মিশে নীল। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে পেইন্টিং থেকে লাল রং আলাদা করতে হবে। বের করতে হবে কোথায় কোথায় লাল রং অর্থাৎ বাংলাদেশ আছে। কাজটা সহজ না।’

‘আপনার বক্তৃতা কি শেষ হয়েছে?’

‘হ্যাঁ শেষ হয়েছে।’

‘প্রথমে আমরা কী দেখতে যাচ্ছি।’

‘প্রথমে আমরা শশা খাওয়া দেখব।’

‘শশা খাওয়া দেখব মানে? শশা কি?’

‘শশার ইংরেজি আমি যতদূর জানি কুকুমবার। আমরা সেই কুকুমবার খাওয়ার দৃশ্য দেখব।’

‘বাংলাদেশে এই শশা কি বিশেষভাবে খাওয়া হয়?’

‘চল গিয়ে দেখি কীভাবে খাওয়া হয়। তারপর তুমিই বের করবে। এর কোনো বিশেষত্ব আছে কি না।’

‘আমি আপনার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা। আপনি গাইড হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। You are trying to be funny কিন্তু I mean busincss.

আমি তাকে গুলিস্তানের সামনে নিয়ে এলাম। এখানেই শশা কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে। লোকজন খাচ্ছে। আমি বললাম, আশা শশা খাওয়া দেখলে?

‘হ্যাঁ দেখলাম।’

‘মনে হচ্ছে দৃশ্যটা দেখে তেমন মজা পাও নি।’

‘মজা পাওয়ার কী আছে?’

‘কিছুই নেই?’

‘না কিছুই নেই। একটা লোক খুবই নোংরা পানিতে শশাটা ধুচ্ছে তারপর পিস করে লবণ মাখিয়ে খেতে দিচ্ছে। এর মধ্যে দেখার কী আছে?’

আমি হাসলাম। আশা বলল, ‘হাসছেন কেন?’

আমার মনে হল মেয়েটা রেগে যাচ্ছে। শুরুতে মেয়েটিকে অশ্রুকন্যা বলে মনে হয়েছিল । এখন মনে হচ্ছে সে অশ্রুকন্যা না ।

আশা বলল, 'কিছু মনে করবেন না। শশা খাবার দৃশ্য দেখা হয়েছে এখন আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই। Enough is enough.

আমি বললাম, আশা দৃশ্যটা তুমি কিন্তু ভালো করে দেখ নি। অর্থাৎ লাল রংটা তুমি আলাদা করতে পার নি। আমি তোমাকে যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে- শশা অল্প কিছু লোক খাচ্ছে— কিন্তু তাদের ঘিরে আছে অনেক মানুষ। এদের কোন কাজ কর্ম নেই। এরা গভীর আগ্রহে শশী খাওয়ার দৃশ্য দেখছে। কেউ বসে বসে দেখছে। কেউ দাড়িয়ে দেখছে। যেন এটা জগতের অতি আশ্চর্য একটা দৃশ্য।'

আশা চারদিকে তাকাল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

আমি বললাম, 'এমন না যে এদের খুব শশা খেতে ইচ্ছা করছে বলে এরা ভিড় করে আছে। টাকা নেই বলে খেতে পারছে না। এরা শশা খাওয়ার দৃশ্যটাই আনন্দ নিয়ে দেখছে।'

'আমি যদি তাদের একটা ছবি তুলি তারা কি রাগ করবে?'

'মোটেই রাগ করবে না। খুবই আনন্দ পাবে। বাংলাদেশের মানুষ ছবি তুলতে খুব পছন্দ করে। মনে করো কোনো এক ভদ্রলোকের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, সে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে তারমধ্যেও পত্রিকার কোনো সাংবাদিক যদি তাঁর ছবি তুলতে চায় সে কিন্তু হাসি মুখে ছবি তুলবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ সত্যি বলছি, ১৯৭১ সনে পাকিস্তান আর্মি আমাদের দেশের অনেক মানষকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারে। পাক আর্মির ফটোগ্রাফার তখন কিছু কিছু ছবিও ক্যামেরায় তুলে। সেইসব ছবিতে অনেককে দেখা গেছে মুখে
হাসি নিয়ে ছবির জন্যে পোজ দিয়েছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।'

'আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি না।'

'আপনার সব কথা যে আমি বিশ্বাস করছি তা না। এখন বলুন আমরা কোথায় যাব?'

'গর্ত দেখতে যাব।'

'গর্ত দেখতে যাব মানে?'

'টি এন্ড টি বোর্ড একটা গর্ত করছে। প্রায় দুশ' লোক গোল হয়ে বসে গর্ত করা দেখছে। গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে দেখছে। কেউ কেউ সকালে এসেছে, থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

আশা হোসে ফেলল ।

আমি তার হাসি দেখে অবাক হলাম। এমন প্রাণময় হাসি অনেকদিন দেখি নি। সে হাসি থামিয়ে ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করতে করতে বলল, 'আপনি আমাকে ইমপ্রেস করার একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা করছেন। ঠিক করে বলুন তো, করছেন না?'

'হ্যাঁ করছি। তুমি যদি আমার কর্মকাণ্ডে ইমপ্রেস না হও তা হলে আমার চাকরি থাকবে না। প্রতিদিন এক শ' ডলার করে পাবার কথা সেটা পাব না। যে কোনো বুদ্ধিমান কর্মচারীর মূল কাজ মুনিবকে খুশি রাখা।'

'আপনার যুক্তি মানলাম। গর্ত দেখতে ইচ্ছা করছে না। গর্ত দেখা ছাড়া আর কী করা যায় বলুন।'

'একজন ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নিলে কেমন হয়। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে।

ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নেওয়া হবে আবার আপনার ক্যাসেট প্লেয়ারও পরীক্ষা করা হবে।'

'ক্যাসেট প্লেয়ার পরীক্ষার জন্যে ভিক্ষুকের ইন্টারভ্যু নিতে হবে কেন। আপনার ইন্টারভ্যু নিই।'

'হ্যাঁ নিতে পার। তবে যে ভিক্ষুকের কাছে নিয়ে যাব সে মানুষ হিসেবে খুবই ইন্টারেস্টিং। দার্শনিক।'

'You mean philosopher?'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ভিক্ষুক শ্রেণী মানুষই দার্শনিক।'

'চলুন যাই।'

'রিকশা নেব না হাঁটতে পারবে?'

'হাঁটতে পারব। আমরা যার কাছে যাচ্ছি। তিনি কি আপনার পূর্ব পরিচিত?'

'হ্যাঁ। ইনার নাম বদরুদ্দিন। ইনি ভাড়া খাটেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ভাড়া হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। তুমিও ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাকে ভাড়া করতে পার।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তুমি ডে শিফটের জন্যে তাঁকে ভাড়া করলে। তিনি নিজে হাঁটতে পারেন না । বিয়ারিং দেওয়া চাকা লাগানো একটা বক্সে আধশোয়া অবস্থায় থাকেন। বক্স টেনে টেনে তাকে নিয়ে ঘুরতে হয়। বক্স যে টানবে তাকে খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে বিশ টাকা দিতে হয়। সব দিয়ে বাকি যা থাকবে সবই, যে ভাড়া করবে তার। চল একটা কাজ করি আমরা বদরুদ্দিনকে এক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করে ফেলি। বৃষ্টি বাদলা না হলে এক সপ্তায় আমাদের মোটামুটি ভাল লাভ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন? না সিরিয়াসলি বলছেন?'

'মোটেই ঠাট্টা করছি না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে আমি একটা খুবই অদ্ভুত এক দেশে উপস্থিত হয়েছি।'

'তুমি মোটেও কোনো অদ্ভুত দেশে উপস্থিত হও নি । ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের অতি প্রাচীন প্রথা। এ দেশের সব বড় বড় সাধু সন্তরা ভিক্ষা করেছেন। এখনো এ দেশে একটা সম্প্রদায় আছে ভিক্ষাবৃত্তি যাদের ধর্মের অংশ। কাজেই এই দিকে ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রফেশনালিজম তৈরি হয়েছে। তুমি এমন এক দেশ থেকে এসেছ যেখানে প্রফেশনালিজমকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। কাজেই ভিক্ষুকদের প্রফেশনালিজকে তুমি তুচ্ছ করবে না এটা আশা করতে পারি।'

আশা বিড়বিড় করে বলল, 'i am so confused.'

বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করতে খুবই সমস্যা হল। নিউ ইস্কাটনের যে বস্তিতে সে থাকত সেই বস্তি হঠাৎ উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে বস্তিবাসী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বদরুদিনের দুই স্ত্রীর একজন থাকে বাসাবোতে। তার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করলাম। আমি ভেবেছিলাম। আশার ধৈর্যচ্যুতি হবে। তা হল না। সে আমার সঙ্গে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে লেগে রইল।

বদরুদ্দিন মুখ গোমড়া করে বসেছিল। তার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ কারণ গত তিন দিন তার বুকিং হয় নি। পঞ্চাশ টাকা তার রেট । কোনো পার্টিই পঞ্চাশ দিতে চায় না। চল্লিশের উপর কেউ উঠছে না। বদরুদিন থু করে থুতু ফেলে বলল,

‘একবার চল্লিশে নামলে উপায় আছে? ভাইজান আপনে বলেন? দাম একবার যদি পড়ে আর তারে উঠানো যায় না। বরং তিন দিন না খায়া থাকব। তাও ভালো। এই বিষয়ে আপনের কী বিবেচনা ভাইবা বলেন।’

আমি মাথা চুলকে বললাম, ‘বুঝতে পারছি না।’

বদরুদ্দিন বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল- ‘আপনে লোকটা যে জ্ঞানী এইটা পরিষ্কার। জ্ঞানী না হইলে হুট কইরা একটা মত দিতেন। জ্ঞানী বইল্যাই সময় নিতাছেন। ভিক্ষা ব্যবসা বড় জটিল ব্যবসা। তার উপরে আমি হইছি ঠিকানা হারা। পুরানা পার্টির কেউ জানেও না আমি কই থাকি?’

আমি বললাম, ‘বদরুদিন যাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তার নাম আশা। উনি আমেরিকার নিউ জার্সিতে থাকেন। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।’

বদরুদ্দিন আশার দিকে তাকাল না। বিরক্ত মুখে বলল, ‘মন মিজাজ অত্যধিক খারাপ। কী কথা বলব কন? তিন দিন হইয়া গেছে কোনো বুকিং নাই।’

আমি বললাম, ‘আমরা বুকিং বিষয়েই আলাপ করতে চাই। টানা এক সপ্তাহ বুকিং নিব—দর কমাতে হবে। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা অসম্ভব ব্যাপার। ম্যাক্সিমাম চল্লিশ। খাওয়া খরচ নিজের।’

‘মাফ করেন। না খাইয়া মরব। কিন্তু পঞ্চাশের নিচে এক পয়সা নামব না। আমার একটা ইজ্জত তো আছে? নাকি ইজ্জত নাই?’

‘ইজ্জত তো অবশ্যই আছে। তবে পুরা সপ্তাহের জন্যে বুকিং এটা মনে রাখতে হবে। খুচরা রেট আর পাইকারীর রেট কখনো এক হয়?’

বদরুদ্দিন ঝুঁকে এসে বলল, ‘ভাইজান শুনেন পুরা ঢাকা শহরে দুই ঠ্যাং নাই ফকিরের সংখ্যা ছিল তের। এর মধ্যে দুই জন চলে গেছে নারায়ণগঞ্জ একজন গেছে ময়মনসিং সদরে। এখন আমরা আছি মোট দশজন। দশজনের মধ্যে গান করতে পারে আমারে নিয়া চারজন। আমার রেইট বেশি হবে না?’

‘অবশ্যই বেশি হবে। তবে তোমার গানের গলা তো ভালো না।’

‘ফকিরের গানের গলা যেমন হয় আমারটাও তেমন- আমিতো আর হেমন্ত না।’

‘দেখি আমার গেস্টকে একটা গান শুনাও।’

‘না।’

‘না কেন।’

‘ইচ্ছা করতেছে না।’

আশা বলল, ‘আমি কি আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?’

বদরুদ্দিন বলল, ‘না।’

আশা বলল, ‘সব কিছুতেই না বলছেন কেন?’

বদরুদ্দিন থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল, “দুই বোলা না খাইয়া থাকলে আপনের মুখ দিয়া কোনো শব্দ বাইর হইত না। আমি তো তাও না বলতেছি। অনেক বিরক্ত করেচেন। এখন যান সাংবাদিকের সাথে আমি কথা বলি না।’

‘সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন না কেন?’

‘এরা উল্টা পাল্টা সংবাদ ছাপে। ছবি দিয়া একবার আমার সংবাদ ছেপেছে সেখানে লিখেছে আমার তিন বিবাহ। ভিক্ষার রোজগারে আমি নাকি তিন বউ পালি।’

'আপনার বিয়ে কয়টি ।'

'দুই বিবাহ। তবে দুইটাই তালাক হয়ে গেছে। সংসার করতে যদি ইচ্ছা করে তা হলে করতে পারি। বর্তমানে সংসার ধর্মে মন নাই।'

বদরুদ্দিন অন্যদিকে ফিরে সিগারেট ধরাল তাকে দেখে মনে হচ্ছে বর্তমানে তার যে শুধু সংসার ধর্মে মন নেই তা না, কথাবার্তা বলতেও মন নেই। আমি আশার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজকের দিনের মত বাংলাদেশ দেখা বন্ধ করলে কেমন হয়?'

##

হিমু,

তোর ব্যাপারটা কি বলবি? প্রথম দিন এসে এই যে ডুব দিলি আর খোঁজ নেই। এদিকে আশা অস্থির হয়ে আছে। ওর ধারণা তোর অসুখবিসুখ করেছে। আমি তাকে বলার চেষ্টা করেছি। অসুখবিসুখ কিছু না— তোর স্বভাবই হল ডুব মারা। তুই তোর স্বভাব মতো ডুব মেরেছিস ।

আশাও তোকে একটা চিঠি দিয়েছে। খামের মুখ বন্ধ বলে কী লিখেছে। আমি পড়তে পারি নি। তুই আসার সময় অবশ্যই চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে আসবি । আমি পড়ব। মেয়েটা কেন এত বড় চিঠি লিখল জানা দরকার।

তুই অবশ্যই অবশ্যই চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবি । তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে । আমার কথা না শুনলে তোর ওপর আল্লাহর গজব পড়বে।

ইতি
তোর খালা

খালার চিঠি শেষ করে মুখবন্ধ খাম খুললাম। খামের উপর লেখা HEEMO, হিমু নামের ইংরেজি বানান কি HEEMo?

আশা চিঠিটা লিখেছে ইংরেজিতে। সম্ভোধন হল— Dear Sir. চিঠির ভঙ্গি এ রকম যেন স্কুলের ছাত্রী তার একজন শিক্ষককে লিখছে। চিঠিটা বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়—

প্রিয় মহোদয়,

ওই দিন আপনার সঙ্গে ঘুরে খুব আনন্দ পেয়েছি। বাড়িতে ফিরে অনেক চিন্তা করলাম--- 'কেন আনন্দ পেয়েছি?' কিছু বের করতে পারি নি। আপনি খুব মজা করে কথা বলেছেন এটা একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু মজা করে কথা তো অনেকেই বলে। একজন মজার মানুষের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছি এটাই কি আমার আনন্দের উৎস? নাকি এর বাইরেও কিছু আছে?

পরদিন খুব আগ্রহ নিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আপনি আসেন নি। দুপুরে আপনার খালা বললেন— আপনি আসবেন না। কিছু দিন পরপর কাউকে কিছু না বলে আপনি ডুব দেন। তখন নাকি

আপনার ছায়াও বলতে পারে না আপনি কোথায়। আপনার স্বভাবই নাকি এ রকম।

আমি জানতে চাইলাম, স্বভাব এরকম মানে কী?

উনি বললেন, হিমু যেই বুঝে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওমি সে ডুব মারে। ও বুঝে ফেলেছে তুই তার জন্যে অপেক্ষা করছিস। কাজেই ডুব মেরেছে।

আমি বললাম, প্রতিদিন উনি এক শ' ডলার করে পাবেন এটা তার কাছে কোন ব্যাপার না?

উনি বললেন, দৈনিক এক হাজার ডলারও তার কাছে কোনো ব্যাপার না। কারণ সে হ'ল— হিমু।

সে 'হিমু' এটা বলে আপনার খালা এক ধরনের অহঙ্কার বোধ করলেন। আমি এতেই সবচে' অবাক হয়েছি। মানুষ নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার করে এটা স্বাভাবিক। প্রকৃতি জীব জগতের মধ্যে মানুষকে অহঙ্কারী করে পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক ব্যাপার হল একজন মানুষ যখন অন্য একজনকে নিয়ে অহঙ্কার করে। আপনি কি জানেন যে আপনি সেই অসীম ভাগ্যবানদের একজন?

আপনি পরদিনও এলেন না। আপনার খালা হাঁসি মুখে বললেন- ও আর আসবে না। যেন আপনার না আসাটা আনন্দময় কোনো সংবাদ। আমি বললাম, উনি যদি না আসেন আমি যাব তার কাছে। আপনার খালা বললেন, ও কোথায় থাকে না-থাকে তার কি কোনো ঠিক আছে নাকি ।

আমি বললাম, উনার কোনো ঠিকানা নেই? আপনার খালা খুবই আনন্দিত গলায় বললেন- ওর ঠিকানা থাকলে তো কাজই হত।

'উনি থাকেন কোথায়?'

'ও কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। আজ এখানে কাল ওখানে। ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দির।'

শুনে আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমেরিকায় 'Hobo' সম্প্রদায় বলে একটা গোষ্ঠী আছে। এরাও ইচ্ছা করে সব ঠিকানা নষ্ট করে ঠিকানা বিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। আজ এখানে, কাল ওখানে সময় কাটাচ্ছে। ট্রেনে করে ঘুরেছে। স্লিপিং ব্যাগ পেতে ফুটপাতের এক কোণায় ঘুমিয়ে পড়ছে। ওদের জীবনযাত্রা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। আমি ওদের প্রচুর ছবি তুলেছি। কিছু স্লাইড আমার কাছে আছে। আপনাকে আমি দেখাব।

কিন্তু তার জন্যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। আপনার উপর জোর খাটানোর কোনো ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধুই অনুরোধ করছি টেলিফোনে হলেও আমার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার জন্যে। কারণটা স্পষ্ট করি আমার ধারণা আপনি কোনো কারণে আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। কেউ আমার উপর বিরক্ত এটা ভাবতেও আমার কাছে খারাপ লাগে। আশপাশের মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা হয়তো আমার নেই, তাই বলে তাদের বিরক্ত করব কেন? কারণটা স্পষ্ট করলাম। নয়তো আপনি ভেবে বসতেন— আমি আপনার প্রেমে পড়ে

গেছি। পুরুষ জাতির অনেক দুর্বলতার এক দুর্বলতা হচ্ছে তারা মনে করে মেয়ে মাত্রই তার প্রেমে পড়ার জন্যে পাগল হয়ে আছে। আশা করি আপনি সেরকম নন। আপনার যেরকম স্বভাব টেলিফোন নাম্বার নিশ্চয়ই আপনার মনে নেই। কিংবা আপনি কোথাও লিখেও রাখেন নি। আমি টেলিফোন নাম্বারটা আবার লিখে দিলাম।

বিনীতা
আশা

আমাদের মেসে একটা টেলিফোন আছে। টেলিফোন সেটের সামনে মেস ম্যানেজার আবুল কালাম বসে থাকেন। নগদ টাকা দিয়ে টেলিফোন করতে হয়। আগে রেট ছিল চার টাকা এখন বেড়ে সাত টাকা হয়েছে। মেসের টেলিফোন থেকে টেলিফোনের একটাই সমস্যা— টেলিফোনের প্রতিটি কথা আবুল কালাম সাহেব অত্যন্ত মন দিয়ে শুনেন। জগতের কোনো কাজে তিনি কোনো আনন্দ পান বলে মনে হয় না। এই কাজটা করেন খুব আনন্দ নিয়ে। টেলিফোনে কথা বলার সময় তিনি মাঝে মাঝে মাথাও খানিকটা এগিয়ে আনেন। অন্যপ্রান্ত থেকে কে কি বলছে তা শোনার চেষ্টায় এই কাজটা করা হয়। আমিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যে কথা বলার সময় মাঝে মধ্যে রিসিভারটা আবুল কালামের কানে দিয়ে দেই যাতে সে শুনতে পারে অপরপক্ষ থেকে কী বলা হচ্ছে। এই কারণে আবুল কালাম আমাকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। যেমন আমি আগের রেট চার টাকায় টেলিফোন করতে পারি। মাঝে মধ্যে আমাকে বাকি দেওয়া হয়।

'হ্যালো আশা।'

'জি।'

'আমি হিমু। কেমন আছ?'

'ভালো আছি। আপনি কি আজ আসবেন?'

'আজ আসতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি নামলেই চলে আসব।'

'বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছেন এর মানে বুঝতে পারছি না। বৃষ্টির সঙ্গে আপনার আসার সম্পর্ক কী?'

'বাংলাদেশ বৃষ্টির দেশ। এই দেশ দেখতে হলে বৃষ্টির ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেখতে হবে। আমি ঝুম বৃষ্টির অপেক্ষা করছি। তোমার কি রেইন কোট আছে?'

'একটা রেইন কোট কিনে ফেল। ঝুম বৃষ্টি নামলে ছাতায় কুলাবে না। এই সঙ্গে রাবারের গাম বুট।'

'এই কদিন আসেন নি কেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পার । সারারাত জগতে হচ্ছে তো। রাতে জাগছি, দিনে ঘুমুচ্ছি।'

'ও।'

'কেন রাত জাগছি জানতে চাও?'

'না।'

'আমার তো ধারণা তোমার জানার খুব কৌতুহল হচ্ছে— ভদ্রতা করে বলছ— 'না' । আমার সঙ্গে ভদ্রতা করার কোনো দরকার নেই।'

'আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করার দরকার নেই কেন?'

'কারণ আমি কারোর সঙ্গে ভদ্রতা করি না।'

'ও আচ্ছ। ঠিক আছে বলুন কেন রাত জাগছেন।'

'আমাদের মেসে এক ভদ্রলোক থাকেন তার নাম জয়নাল। তিনি রাতে ঘুমুতে পারেন না। এই বেচারাকে কিছু সময় দিচ্ছি। প্রায় রাতেই তাকে নিয়ে বের হচ্ছি। ঘুরছি। ভদ্রলোক খুবই আনন্দে আছেন।'

'মানুষকে আনন্দ দেবার মহান ব্রত কি আপনি মাথায় নিয়েছেন?'

'তা না। তবে কাউকে আনন্দ দিতে ভালো লাগে। সব মানুষ ওই চেষ্টা খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও করে। জগতের আনন্দ যজ্ঞে সবারই নিমন্ত্রণ থাকে।'

'কঠিন বাংলা আমি বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দিন।'

'টেলিফোনে না, যখন দেখা হবে তখন বুঝিয়ে দেব।'

'আমাকে বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। পরশু সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে Cats amd Dogs রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে যাবে। এমন বৃষ্টি হবে যে তোমার গাম বুটের ভেতরেও রাস্তায় জমে থাকা নোংরা পানি ঢুকে যাবে।'

'পরশু সকাল থেকে বৃষ্টি হবে। কী করে বুঝলেন?'

'আমার মন বলছে ।'

'যা আপনার মন বলে তাই কি হয়?'

'না তা হয় না।'

'কিন্তু আপনি যেভাবে কথা বললেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত যে পরশু সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হবে। রাস্তায় পানি জমে যাবে। আমার গাম বুটে পানি ঢুকে যাবে।'

'আমি মোটেই নিশ্চিত না। এম্নি বললাম। তবু তুমি তৈরি থেকে। সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম রেখো ।'

'চা খেতে খেতে বৃষ্টি দেখবেন? আপনার পরিকল্পনাটা কি জানতে পারি?'

'পরিকল্পনা খুবই ইন্টারেস্টিং। পাইপের ভেতর বসে বৃষ্টি দেখব।'

'একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন।'

'ঢাকা শহরের বেশ কিছু লোক পাইপের ভেতর বাস করে। পাইপ সংসার। সুয়ারেজ লাইনের জন্যে বিরাট বিরাট পাইপ আছে। তার কিছু খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে। ভাসমান মানুষরা তার ভেতর সংসার পাতে এবং অতি সুখে বাস করে। সে রকম একটা পাইপে বসে বৃষ্টি দেখব।'

'ও।'

'পাইপে বাস করে এমন একটা পরিবারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওরা আমার জন্যে একটা পাইপ আলাদা করে রেখে দিয়েছে। সেখানে আমার বিছানা বালিশ আছে। হাতপাখা আছে। গামছা আছে। এমনকি আয়না চিরুনি তো আছে।'

'মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'টয়লেটের ব্যবস্থা কী?'

'সেই ব্যবস্থাও আছে। খুবই ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা, তবে আছে। আশা শোন আমি যে

মেসে থাকি সেই মেসের ম্যানেজার আবুল কালাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

'কেন?'

'এম্নি । তোমার গলার স্বরটা টেলিফোনে কেমন শোনায় সেটা জানবেন। ম্যানেজার সাহেবের এটা একটা শখ। মানুষের অনেক রকম শখ থাকে। কেউ ডাকটিকেট জমায়, কেউ টেলিফোনে গলার স্বর জমায়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। Why?'

আমি Why এর জবাব না দিয়ে টেলিফোন রিসিভার আবুল কালাম সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি গম্ভীর গলায় বলছেন- "হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।" ও পাশ থেকে মনে হয় আশা টেলিফোন রেখে দিয়েছে। আবুল কালাম সাহেবের চোখে মুখে চরম হতাশা ৷

আমি বললাম, 'লাইন কেটে দিয়েছে?'

আবুল কালাম তিক্ত গলায় বললেন– 'কাটে নাই। রেখে দিয়েছে।'

'আচ্ছা আরেক দিন গলার স্বরা শুনিয়ে দেব। গলার স্বর খারাপ না। মিষ্টিকিশোরী মেয়েদের গলা ।'

কালাম সাহেব ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, কোনো দরকার নাই।

'আজ আপনার মনটা খারাপ কেন? চাকরি নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

কালাম সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। তার মানে হচ্ছে কিছুদিন পরপরই তার চাকরি নিয়ে সমস্যা হয়। মালিক নোটিস দিয়ে বেতন বন্ধ করে দেন। কালাম সাহেব তারপরেও নিয়মিত আসেন। ম্যানেজারের চেয়ারে না বসে সামনের চেয়ারে বসেন। তারপর একদিন হঠাৎ তার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা যায়। তিনি ফিরে যান তাঁর নিজের চেয়ারে। তাঁর পুরোনো গাম্ভীর্য ফিরে আসে। গলার স্বরও তখন অন্য রকম হয়ে যায় ।

'হিমু সাহেব।'

'জি।'

'বৃষ্টি হবার কথা যেটা বললেন এটা কি ঠিক? সত্যি হবে?'

'কথার কথা বলেছি। আমি তো আর আবহাওয়া অফিসের লোক না।'

'খুৰ জোর দিয়ে বলেছে তো এই জন্যে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। অনেকের অনেক পাওয়ার থাকে। আমার নিজেরো ছিল।'

'বলেন কী?'

'এখন নাই। ছোট বেলায় ছিল। ছয় সাত বছর বয়সের সময় ছিল। তখন যা বলতাম। তাই হত।'

'আশ্চর্য তো!'

'ধরেন খেলাধুলা করছি— হঠাৎ বললাম, আজ বাড়িতে মেহমান আসবে। ঠিকই আসত। একবারের কথা স্পষ্ট মনে আছে। গোল্লাছুট, খেলছি- হামিদ বলে আমার এক বন্ধু ছিল। সেও খেলছে। হঠাৎ আছাড় খেয়ে হামিদ আমার সামনে পড়ে গেল। তখন তাকে বললাম, আজ রাত তুই হেভি পিটুনি খাবি। পিটিয়ে তোর হাড্ডি ভেঙে দেবে। হামিদ বিশ্বাস করে নি ! বাপ মায়ের এক ছেলে আদরে থাকতো।'

হামিদ পিটুনি খেয়েছিল?

'জি খেয়েছে। সেই দিন এশার ওয়াক্তে ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল।

সবাইকে বেঁধে পিটিয়েছে। হামিদের গালে লাঠির বাড়ি মেরেছিল—চোয়ালের হাড্ডি ভেঙে মুখ বেঁকে গেল। আর ঠিক হল না। তার নাম হয়ে গেল— গাল ভাঙা হামিদ। আমাদের ক্লাসে দুটা হামিদ ছিল । একজন হল গালভাঙা হামিদ আরেকজনের নাম অশ্লীল বলা যাবে না। গালভাঙা হামিদ প্রায়ই মেসে আসে। একদিন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'জি আচ্ছা।'

উঠতে যাব। কালাম সাহেব বিনয়ী গলায় বললেন— রূপা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন না। অনেক দিন কথা বলেন না, এই জন্যে বললাম। অন্যকিছু না। টাকা সট থাকলে বাকিতে করেন । পরে দিয়ে দিলেই হবে । আমার কথায় আবার কিছু মনে করলেন না তো?

'না কিছু মনে করি নি।'

আবুল কালাম খানিকটা ঝুঁকে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, টেলিফোনে রূপা ম্যাডামের গলার স্বরটা যে কী মিষ্টি আসে আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না ভাই সাহেব। অত্যধিক মিষ্টি ।

'তাই নাকি?'

'জি।'

'আমি অনেক বিচার বিবেচনা করে একটা জিনিস বের করেছি ভাই সাহেব । সত্য মিথ্যা আল্লাহপাক জানেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্য। বলব?'

'বলুন।'

'যার গলার স্বর টেলিফোনে সুন্দর আসে তার অন্তরটাও সুন্দর।'

'এটা আপনার থিওরি?'

'জি ভাই সাহেব। পরীক্ষা করেও দেখেছি ঘটনা সত্যি। রূপা ম্যাডামকে লাইন করে দিব?'

'টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ?'

'কেউ যখন আমার সামনে অন্য কাউকে টেলিফোন করে তখন নাম্বারটা মুখস্থ হয়ে যায়। এই যে আপনি একটু আগে টেলিফোন করলেন নাম্বার মুখস্থ হয়ে গেছে। বলব?'

'বলার দরকার নেই বিশ্বাস করছি। আপনি কি এই নাম্বারে পরে টেলিফোন করবেন? আপনার কি এই অভ্যাস আছে?'

আবুল কালাম লজ্জিত গলায় বললেন, হঠাৎ হঠাৎ করি। তবে কথা বলি না। হ্যালো বললে রেখে দেই।

ম্যানেজার টেলিফোনে রূপাকে ধরে দিল। রূপা শান্ত গলায় বলল, এত দিন পর হঠাৎ কী ব্যাপার?

'কোন ব্যাপার না। গলার স্বর শোনার জন্যে টেলিফোন করলাম।'

'গলার স্বর তো শোনা হয়েছে। এখন কি টেলিফোন রেখে দেব?'

'না আরো কিছুক্ষণ শুনি।'

'কতক্ষন?'

'মিনিমাম তিন মিনিট।'

'তিন মিনিট কেন?'

'গান তিন মিনিটের মতো হয়। সেই জন্যেই তিন মিনিট।'

'ভালো। ঠিক আছে তিন মিনিট কথা শোন। এক নাগাড় তিন মিনিট কথা বলব? নাকি মাঝে মধ্যে তুমিও কিছু বলার?'

'রেগে আছ কেন রূপা?'

'রেগে নেই। শরীর ভালো না। নতুন কী একটা ভাইরাস এসেছে- সেই জ্বর। একটু আগে জ্বর দেখেছি— এক শ' তিন পয়েন্ট ফাইভ । মনে হয় এখন আরেকটু বেড়েছে।'

'বল কী? টেলিফোন রেখে মাথায় পানি দাও।'

'তিন মিনিট তো এখনো শেষ হয় নি। তিন মিনিট শেষ হোক।'

তিন মিনিটের শেষ এক মিনিট আবুল কালাম সাহেবের জন্যে আলাদা করে রাখ তো প্লিজ।'

'তার মানে?'

'আমাদের মেসের ম্যানেজারের শখ হল মানুষের গলার স্বর শোনা এবং সেই স্বর নিয়ে গবেষণা করা। তিনি তোমার গলার স্বরের ব্যাপারে আগ্রহী। তাকে টেলিফোন দেব?'

'দাও?'

'আমি কালাম সাহেবের দিকে টেলিফোন রিসিভার আগিয়ে দিলাম। তিনি অতি বিনয়ী গলায় বললেন, 'ম্যাডাম স্লামালিকুম....'

অন্যের টেলিফোনের কথাবার্তা আড়িপেতে শোনা কোনো কাজের কথা না । আমি উঠে পড়লাম।

##

আমি বসে আছি নৌকার গলুইয়ে। পা ঝুলিয়ে বসেছি। নৌকা খুব দুলছে বলেই মাঝে মাঝে নদীর পানিতে পা ডুবে যাচ্ছে। শরীর সিরসির করছে। গায়ে কঁপন লাগছে। নদীর পানি এত ঠাণ্ডা হবার কথা না— । এই নদীর পানি এত ঠাণ্ডা কেন? মনে হচ্ছে বরফ গলা পানি। ঘটনাটা কী? স্বপ্নের নদী না তো?

ঘুমের মধ্যেও চেতনার একটি অংশ জাগ্রত থাকে। সেই অংশ আমাকে বলল— 'তুমি স্বপ্ন দেখছ। এখন তোমার ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ইচ্ছা করলে তুমি জেগে উঠতে পার আবার ইচ্ছা করলে হাত পা লম্বা করে ঘুমুতেও পার । কিংবা যদি চাও স্বপ্নটা আরো কিছুক্ষণ দেখবে তাও পার। স্বপ্নকে তোমার ইচ্ছার অধীন করে দেওয়া হল।'

আমি বললাম— 'স্বপ্নটাই দেখি। স্বপ্নটা কোনো ভয়ঙ্কর দিকে মোড় না নিলেই হবে। যদি দেখি ঝড়ে নৌকা ডুবে গেছে। আমি পানিতে খাবি খাচ্ছি তা হলে সর্বনাশ। কী ঘটবে বলতো?'

'স্বপ্নে কি ঘটবে তা তো বলতে পারছি না।'

'তা হলে স্বপ্নটা বাদ থাক। আমি বরং আরো কিছুক্ষণ ঘুমাই।'

'বেশ তো। মাথা থেকে স্বপ্ন দূর করে দাও।'

আমি মাথা থেকে স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। স্বপ্নটা যাচ্ছে না। স্বপ্নে নৌকাটা অনেক বেশি দুলছে। আমি পা তুলে বসলাম। নদীর পানির ঠাণ্ডাটা অসহ্য

লাগছে। পা তুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন অন্যদিকে মোড় নিল। দেখা গেল বিশাল এক স্টিমার দ্রুত নদীর পানি কেটে আমাদের নৌকার দিকে আসছে। স্টিমারের মাথায় সার্চ লাইট । সেই সার্চ লাইটের আলো ফেলা হয়েছে। আমার চোখে । চোখ জ্বালা করছে। নৌকার মাঝি ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, হিমু ভাই, হিমু। স্টিমারের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে তাঁর গলা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন অতি দ্রুত খারাপ দিকে যাচ্ছে। আমার উঠে পড়া দরকার। আমি তাই করলাম। চোখ মেললাম। নৌকার মাঝি আমাকে ডাকছে না। ডাকছেন জয়নাল সাহেব ! নৌকার মাঝির মতোই ব্যাকুল গলায় হিমু ভাই, হিমু ভাই করছেন।'

জয়নাল সাহেব বললেন, 'জানালা খোলা রেখে ঘুমিয়েছেন। অবস্থাটা দেখেছেন– বৃষ্টিতে তো গোসল করে ফেলেছেন। ওঠে গা মুছেন ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ফ্লাস্কে করে চা এনেছি- চা খান। মুখ ধুয়ে আসবেন না বাসি মুখে চা খাবেন?'

আমি কিছু বললাম না। মাথা থেকে স্বপ্নটা এখনো যায় নি। স্টিমার চোখে দেখতে না পেলেও তার ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দ এখনো কানে বাজছে । সার্চ লাইটের আলো এখনো আমার চোখে— এই জন্যেই চোখ মিটমিট করছি ।

জয়নাল সাহেব গ্লাস ভর্তি করে চা ঢালছেন। তাকে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে। বড় কোনো আনন্দোর খবর দেবার আগে আগে মানুষের মুখে যে আভা থাকে তার চোখে মুখে সেরকম আভা । চোখে ছলছলে ভাবও আছে । আদরের কনিষ্ঠ কন্যা স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে বাবাদের চোখে এমন ছলছলে হয়ে যায়। জয়নাল সাহেবের কোনো মেয়ে আছে কিনা জানি না। মনে করে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'চা-টা খেয়ে আরাম পাবেন। স্পেশাল চা৷ গনিমিয়ার দোকানের চা। এই চা শুধু দুই জায়গায় পাওয়া যায়। এক ঠাটারি বাজার গনিমিয়ার দোকানে, আর পাওয়া যাবে বেহেশতে। আল্লাহপাক বলেছেন সব ভালো ভালো জিনিস বেহেশতে আছে।'

আমি হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাস নিলাম। জয়নাল সাহেব উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাতেও ভালো লাগছে।

'বুঝলেন ভাই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তো। বৃষ্টি দেখেই মনে করলাম গনিমিয়ার দোকানের স্পেশাল চা হিমু ভাইকে খাওয়াই।'

'ঠাটারি বাজার চলে গেলেন?'

'জি। প্রথমে একটা ফ্লাস্ক কিনলাম। এত দূর থেকে তো আর কোকের খা বোতলে করে চা আনা যাবে না। চা, গরম আছে না?'

'হ্যাঁ গরম।'

'খেতে কেমন?'

'অসাধারণ । মনে হচ্ছে লিকুইড অমৃত। মিষ্টি একটু বেশি। অমৃত মিষ্টি তো হবেই।'

'যখন এই চা খেতে ইচ্ছা করবে। আমাকে বলবেন । ফ্লাস্ক কিনে ফেলেছি চা গরম করা এখন আর সমস্যা না। সামনের মাসে বেতন পেলে একটা কেরোসিনের চুলো কিনব।'

'কেন?'

'মাঝে মধ্যে ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। চুলা থাকলে ফট করে রেঁধে

ফেললাম। বৃষ্টি বাদলার দিন– ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসলে— ভাজা করে. বা কলাপাতা দিয়ে মুড়িয়ে ভাতের মধ্যে দিয়ে ভাপা ইলিশ। আমি ভালো রানতে পারি। রেহানা যখন রান্না করত আমি পাশে বসে থাকতাম! দেখে দেখে শিখেছি। ইনশাল্লাহ। আপনাকে রেঁধে খাওয়াব ।'

'আচ্ছা।'

'রেহানার একবার টাইফয়েড হল। একুশ দিন ছিল জ্বর। আমিই রাঁধতাম।'

'ভালো তো।'

জয়নাল সাহেব খুবই আগ্রহ নিয়ে বললেন, ইলিশ খিচুড়ি খাবেন? ব্যবস্থা করি? বাবুর্চিকে বললেই ব্যবস্থা করে দিবে। পাঁচটা টাকা ধরায়ে দিলে হবে। রান্না আমি নিজের হাতে করব। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে ইলিশ খিচুড়ি না খেলে বৃষ্টির অপমান হবে।'

'আজ থাক। আরেক দিন।'

জয়নাল সাহেব অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন– 'আজ খুব হিসাব করে বৃষ্টি নেমেছে। শুক্রবার, অফিসে যেতে হবে না। মনে হচ্ছে আল্লাহপাক ইলিশ খিচুড়ি খাওয়ানোর জন্যেই বৃষ্টিটা নামিয়েছেন। নিয়ে আসি একটা ইলিশ কিনে? কী বলেন?'

'আচ্ছা আনুন। রান্না শেষ হলে সব খাবার টিফিন কেরিয়ারে ভরবেন। টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উপস্থিত হবেন।'

'কোথায় উপস্থিত হব?'

'ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি- ওই ঠিকানায়।'

'বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাব?'

'অবশ্যই। বৃষ্টি উপলক্ষে খিচুড়ি খাচ্ছেন। বৃষ্টিতে ভিজবেন না?'

'খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন ভাই সাহেব। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খিচুড়ি না খেলে— কিসের ইলিশ খিচুড়ি? আপনি ঠিকানা বলে দেন— আমি নিয়ে যাব।'

জয়নাল সাহেবকে ঠিকানা দিয়ে আমি নিচে নামলাম। বেশি দেরি করা যাবে না বৃষ্টি থাকতে থাকতেই আশাদের বাড়িতে উপস্থিত হব। একটা ছোট্ট চমক। আশাকে বলেছিলাম দুদিন পর বৃষ্টি নামবে। পাকে চক্রে তাই হচ্ছে দুদিন পরই বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি জহির হয়। যথা নিয়মে বৃষ্টি হচ্ছে— আমার কেরামতি জাহির হচ্ছে।

বের হবার মুখে মেস ম্যানেজার আবুল কালামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার চাকরি আবার হয়তো নট হয়েছে । তিনি ম্যানেজারের চেয়ারে বসে নেই। অন্য চেয়ারে বসা! মুখ অত্যন্ত মলিন। রাতে মনে হয় ঘুমও হয় নি। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে । একদিনে বয়স বেড়ে গেছে। এক শালিক দেখা যেমন খারাপ— মলিন মুখে একাকী কেউ বসে আছে দেখা ঠিক সেরকমই খারাপ। ঢিল মেরে অমঙ্গলের এক শালিক উড়িয়ে দেওয়া যায়। এক মানুষ উড়ানো যায় না। তবে মানুষটার মন ভালো করার চেষ্টা করা যায়। আমি সেই দিকেই অগ্রসর হলাম। হাসি মুখে বললাম, আবুল কালাম সাহেবের খবর কী?

'ভালো।'

'মন খারাপ নাকি?'

'না।'

'বৃষ্টি কেমন নেমেছে দেখেছেন? কুকুর বেড়াল বৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই

বৃষ্টির নাম সিংহ বাঘ বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজবেন নাকি। বৃষ্টি স্নান করতে চাইলে চলে আসুন।'

'না।'

'চাকরি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি তো? নিজের চেয়ার ছেড়ে অন্য চেয়ারে বসে আছেন এই জন্যে জিজ্ঞেস করলাম। কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না।'

আবুল কালাম 'না' বললেন খুবই দুর্বল ভঙ্গিতে এবং অন্যদিকে তাকিয়ে-এর অর্থ একটাই, চাকরি আবার নট হয়েছে। চাকরি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোকের মুখের বিমর্ষভাব কাটবে না। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বললাম— বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে কই মাছের মনেও আনন্দ হয়। তারা পুকুর ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ডাঙায় উঠে আসে। আর আপনি মুখ ভোতা করে বসে আছেন?

আবুল কালাম বিরক্ত মুখে বললেন— আমি তো কই মাছ না। খামখা লাফালাফি করব কেন? আপনি বৃষ্টিতে ভিজে লাফালাফি করেতে চান করেন।

'চাকরি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ চলে গেছে। খুশি হয়েছেন? যান এখন খুশি মনে বৃষ্টিতে ভিজেন।'

এক ঘণ্টা ঝুম বৃষ্টি ঢাকা শহর অচল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। রাত তিনটা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখন বাজছে নটা। ছয় ঘণ্টা এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে শহর পানিতে ডুবে যাবার কথা। ডুবন্ত শহর দেখারও আনন্দ আছে। চৈত্রদিনের শুকনো শহর আর বর্ষা দিনের ডুবন্ত শহরের মধ্যে আকাশ পাতালের চেয়েও বেশি ফারাক। এক শহরের দুই রূপ না, যেন সম্পূর্ণ আলাদা দুটা শহর ।

প্রতিটি বড় রাস্তা নদী হয়ে গেছে। রাস্তায় নদীর স্রোতের মতো স্রোত আছে। ঘূর্ণি পর্যন্ত আছে। অবস্থা যা জোয়ারভাটা থাকাও বিচিত্র না। ফুটপাতেও এক হাঁটু পানি। ম্যানহোলের খোলা ঢাকনা যখন চোখে দেখা যায় তখনো মানুষ ম্যানহোলে পড়ে যায়— আর আজ তো পানিতেই সব ঢাকা । আজ এগুতে হবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে। প্রথম পা ম্যানহোলে পড়ল কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই দ্বিতীয় পা তুলতে হবে।

রাস্তার জায়গায় জায়গায় গাড়ি ডুবে আছে। গাড়ির মালিকরা অসহায় ভঙ্গিতে টোকাই জোগাড় করার চেষ্টা করছে। গাড়ি ঠেলতে হবে। টোকাইরা গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়াতে যেমন দক্ষ— গাড়ি ঠেলার ব্যাপারেও সেরকমই দক্ষ। একটা সাধারণ পনের শ" সিসি গাড়ি ঠেলার জন্যে চার জন টোকাই-ই যথেষ্ট । মহানন্দে তারা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবে। বখশিশ, পেলে ভালো। না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। গাড়ি ঠেলতে পারার আনন্দেই তারা আনন্দিত ।

হরতালের দিন এইসব রাস্তায় ক্রিকেট খেলা হয়। আজ হচ্ছে সাঁতার সাঁতার খেলা। এরশাদ সাহেবের পথকলিরা পানিতে লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করছে। এরমধ্যে একটা কলাগাছও দেখি যোগাড় হয়েছে। কলাগাছ ধরে সাঁতার দেবার চেষ্টা হচ্ছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে অতি গভীর মুখে কলাগাছে বাসা। তিন-চারটা তার বয়সী ছেলে কলাগাছ ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যেন মেয়েটি বর্ষারানী। বৃষ্টি উৎসবের রানী। অতি মজাদার দৃশ্য। সিএনএন টিভির লোকজন থাকলে এই দৃশ্য ক্যামেরায় নিয়ে নিত। 'তলাবিহীন ঝুড়ির দেশের জলকেলি' শিরোনামে মজার কোনো রিপোর্ট পৃথিবীর মানুষরা দেখতে পেত ।

বিকল্প ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মানুষজন পারদর্শী। কাপড় না ভিজিয়ে রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুটা টুলবাক্সের সাহায্যে কাজটা করা হচ্ছে । দুটাকা করে পারানি। আরো তিন-চারদিন এই অবস্থা চললে অতি অবশ্যই রাস্তায় নৌকা নেমে যাবে। আওয়ামী নেতারা মুজিবকোট পায়ে দিয়ে হাসিমুখে বলবেন— ‘বলেছিলাম না নৌকা ছাড়া আমাদের গতি নাই। দেখলেন তো?’

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল আশা । এক সেকেন্ড দেরি হল না। মনে হল দরজায় হাতল ধরে সে দাড়িয়ে ছিল। কেউ বেল টিপবে। আর সে দরজা খুলবে।

আমি বললাম— ‘চল বের হয়ে পড়ি বৃষ্টি নেমেছে।’

আশা বলল, ‘আপনার একী অবস্থা। ভিজে কী হয়েছেন? হাতের চামড়া নীল হয়ে গেছে । আপনার ছাতা নেই?’

‘না।’

‘এমন বৃষ্টিতে ছাতা ছাড়া বের হয়েছেন? আপনার তো অসুখ করবে।’

‘তুমি সময় নষ্ট করছ কেন। বৃষ্টি থাকতে থাকতে বের হতে হবে।’

‘ঘরে ঢুকবেন না?’

‘গা দিয়ে পানি পড়ছে। এই অবস্থায় কার্পেটওয়ালা ঘরে ঢোকা যাবে না।’

‘টাওয়েল দিচ্ছি গা মুছে নিন।’

‘আবার তো ভিজতেই হবে গা মুছে লাভ কী?’

‘এ রকম বৃষ্টি আমি আমার জীবনে দেখি নি। কী অদ্ভুত কাণ্ড! নন স্টপ বৃষ্টি।’

‘পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে বের হয়ে এসো।’

‘গরম কফি বানিয়ে দেব। আপনি শীতে কাঁপছেন?’

‘কিছু লাগবে না। তুমি বের হও। গামবুট, রেইন কোট ছাতা সব আছে তো?’

‘সবই আছে। তবে আমি কোনোটাই নেব না। আপনি যেভাবে বের হয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই বের হব ! আপনার মতো খালি পায়ে হাঁটব।’

‘সেকী?’

‘শুধু শাড়ি পাল্টে প্যান্ট শার্ট পরব। ভেজা শাড়ি গায়ে লেস্টে থাকলে দেখতে খুব খারাপ লাগবে। আপনার পরিকল্পনা কী? আজ আমরা কী দেখব? পাইপে বসে বৃষ্টি?’

‘পাইপে বসে বৃষ্টি বিলাস করা হবে। ইলিশ খিচুড়ি খাওয়া হবে। তবে তার আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেতে হবে । সেখানে কদম ফুলের গাছ আছে। গাছ থেকে কদম ফুল ছিঁড়তে হবে।’

‘কেন?’

‘কদম ফুল ছাড়া বর্ষা যাপন হয় না।’

‘তার মানে?’

‘বর্ষা দেখতে হলে কদম ফুল লাগে । একেকটা দেখার একেক রকম নিয়ম। জোছনা দেখতে হয় সাদা রঙের কাপড় পরে। কালো কাপড় পরে জোছনা দেখা যায় না। একইভাবে বর্ষা দেখতে কদম ফুল লাগে।’

‘কে বানিয়েছে এসব নিয়ম।’

আমি হাসলাম। জবাব দিলাম না। আশা গেল কাপড় বদলাতে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছিল, আবারো মেঘা জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আজ সারাদিনে বৃষ্টি

ধরবে না। মেঘের পরে মেঘ জমবে। আঁধার হয়ে আসবে। রূপা তার সারাউন্ড সিস্টেমের ট্রাম্পেটের কোনো সিডি চালিয়ে দেবে। বৃষ্টি নামলেই তার নাকি ট্রাম্পেট শুনতে ইচ্ছা করে।

রাস্তায় নেমে আশা বাচ্চ মেয়ের মতো চেচিয়ে বলল "what a day!"

আমি বললাম, 'খুব মজা লাগছে।'

আশা বলল, 'মজা না, অন্য রকম লাগছে। গায়ে যেমন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরও পড়ছে। শুধু যদি গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ত তা হলে হত মজা বা ফান। যেহেতু বৃষ্টির ফোঁটা শরীরের ভেতরও পড়ছে কাজেই এটা আর ফান না— অন্য কিছু। আচ্ছা শুনুন- আপনি তো নানানভাবে আমাকে চমকে দিয়েছেন। আমিও কিন্তু আপনাকে চমকে দিতে পারি। আপনি যদি এই মুহূর্তে আমার হাত ধরেন তা হলে কিন্তু ভয়ঙ্কর চমকাবেন।'

'কোন বলত?'

'আগে বললে তো আর চমকাবেন না। কাজেই হাতটা ধরুন দেখি চমকান কিনা। ভালবেসে হাত ধরতে বলছি না। চমকাবার জন্যে হাত ধরা।'

আমি আশার হত ধরলাম এবং চমকে উঠলাম। চমকাবার কারণ আছে মেয়েটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

আশা হাসি মুখে বলল, 'জ্বর কত আন্দাজ করুন তো।'

'এক শ' চার?'

'হয় নি এক শ' তিন। আপনার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে তো এই জন্যে জ্বর বেশি লাগছে।'

আশা হাসছে। ছোট বাচ্চারা বড়দের সঙ্গে মজার কোনো তামাশা করলে যেমন আনন্দ পায় সেই আনন্দের ঝিলিক। তার চোখে মুখে ।

'হিমু সাহেব জ্বর গায়ে নিয়ে আপনি কখন বৃষ্টিতে ভিজেছেন?'

'হ্যাঁ ভিজেছি। ইচ্ছাকৃত ভেজা না! অনিচ্ছাকৃত। তখন আমার বয়স পঁচ কিংবা ছয় হবে। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। শীতে শরীর কাঁপছে। গায়ের উপর একটা কম্বল দেওয়া হয়েছে। সেই কম্বলে শীত মানছে না। বাবাকে বললাম— গায়ের উপর আরেকটা কিছু দিতে। তিনি লেপ নিয়ে এলেন । লেপ যখন গায়ে দিতে গেলেন তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হল। বাবা আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুললেন। খালি গা করে দাঁড়া করিয়ে দিলেন উঠোনে।'

'উনি খুবই ভালো কাজ করেছেন। জ্বর বেশি হলে গায়ে পানি ঢালতে হয়। এতে জ্বর দ্রুত নামে।'

'আমার বাবা জ্বর নামাবার জন্যে কাজটা করেন নি। তিনি কাজটা করেছেন যাতে শরীরের ব্যথা বেদনা নামক তুচ্ছ ব্যাপার আমি জয় করতে পারি। এটা ছিল তাঁর নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির একটা অংশ। ঐ রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থামে। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমাকে বাবা উঠানে ধরে রেখেছিলেন। নিজেও বৃষ্টিতে ভিজেছেন আমাকেও ভিজিয়েছেন।'

'আপনার জ্বর সেরেছিল?'

'আমার জ্বর সেরে গিয়েছিল--কিন্তু বাবার হয়ে গেল নিউমোনিয়া। জমে মানুষে টানাটানির অবস্থা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। হাসপাতালের বিছানায় বাবার পাশে আমি শুয়ে থাকি । বাবা বিড়বিড় করে। প্রলাপ বকেন। আশা তুমি কি অসুস্থ

মানুষের প্রলাপ কখনো শুনেছ?'
'না।'
'খুব ইন্টারেস্টিং। মনে হয় খুব ঘনিষ্ট কারো সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলার ভঙ্গিটাও ফরম্যাল। যেমন আমার বাবা প্রলাপের সময় বলেছিলেন—'
'কী বলেছিলেন?'
'অন্য আরেকদিন বলব?'
'আজ না কেন?'
'কৌতূহলটা থাকুক।'
'আচ্ছা বেশ থাকুক। হিমু সাহেব...'
'বল।'
'আপনাকে খুবই গোপন একটা কথা বলতে চাচ্ছি। যে কথাটা আর কাউকে কখনো বলি নি। জ্বরের কারণে আমার মধ্যে এক ধরনের ঘোর তৈরি হয়েছে। তারপর পড়ছে বৃষ্টি। ইনাইবিশন কেটে গেছে। মনে হচ্ছে কথাটা বলা যায়। বলব?'
'বল।'
আশা হাসতে হাসতে বলল, 'আজ না। অন্য আরেকদিন বলব। কৌতুহলটা থাকুক। আমার নাচতে ইচ্ছা করছে। what a day!'
কদম গাছ ভরতি ফুল।
নগরীর মানুষ গোলাপের ভক্ত। গোলাপ ভালো দামে বিক্রি হয়। কদমের বাজার দর নেই। মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় এক টাকা পিস। যে ফুল খোপায় পরা যায় না, হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয় কে কিনবে সেই ফুল?
আশা অবাক হয়ে বলল, 'এটা ফুল না। ফল? আমি বললাম, ফলের মতো দেখতে হলেও আসলে ফুল।'
'আচ্ছ এমন কোনো ফল কি আছে দেখতে ফুলের মতো?'
'থাকতে পারে প্রকৃতি তার জীবজগৎ নিয়ে নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছে — ফুলের মতো ফল বাগানের এক্সপেরিমেন্টও নিশ্চয়ই করেছে।'
ফুল পাড়তে সমস্যা হল না। আশা দু হাত ভরতি করে ফেলল। আমি লক্ষ্য করলাম। আশার আনন্দময় মুখ হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। যেন আচমকা ভয়ঙ্কর কোনো কথা মনে পড়ে গেছে।
আশা শুকনো গলায় বলল— আমার চিন্তা লাগছে।
'কী চিন্তা?'
'আমার মনে হচ্ছে "ফুলের মতো ফল। ফলের মতো ফুল" এই লাইনগুলি মাথায় ঢুকে — যাবে। ছোটবেলা থেকে আমার এই সমস্যা আছে। হঠাৎ কোনো একটা লাইন মাথায় ঢুকে যায়। তখন রেকর্ড বাজার মতো এই লাইনগুলি মাথায় বাজতে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় বাজে, ঘুমের মধ্যে বাজে। অন্তহীন "লুপ চলছেই, চলছেই। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়।'
'লাইনগুলি কি মাথায় ঢুকে গেছে?'
'হুম।'
'বের করার কোনো পদ্ধতি নেই?'
'না।'
'ফালতু এই লাইনগুলি বের করে নতুন কোনো লাইন ঢুকিয়ে দাও।'

'নতুন লাইনগুলি কী?'

'বাদলা দিনের কবিতার লাইন ঢুকিয়ে দাও— বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। আরেকবার বলি-বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। আরেকবার বলব?'

'না।'

'এটা যদি পছন্দ না হয়, মজাদার কোনো কবিতার লাইন বলি?'

শিওরে বসিয়া যেন তিনটি বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে ।

আশা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি পুরো ব্যাপারটাকে ফান হিসেবে নিচ্ছেন। আমার জন্য এটা যে কী পরিমাণ কষ্টদায়ক আপনি জানেন না। আমার এই সমস্যার জন্যে আমি নিউরোলজিষ্ট দেখিয়েছি, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছি।'

'বল কী?'

'দুটা লাইন মাথার ভিতর ঘুরপাক খাবে। লক্ষবার কোটিবার চলতেই থাকবে। প্রথমে খুব ধীরে চলবে তারপর গতি বাড়তে থাকবে। মনে করুন। আমি বই পড়ছি, কিংবা কোনো কাজ করছি। কিন্তু মাথার ভেতর ঘুরছে— ফলের মতো ফুল। ফুলের মতো ফল। ব্যাপারটা কি আপনার কাছে ভয়াবহ মনে হচ্ছে না?'

'এতক্ষণ হচ্ছিল না, এখন হচ্ছে।'

'আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। শুধু আমার একার ধারণা না। ডাক্তারদেরও সেরকম ধারণা। ডাক্তাররা অবিশ্যি সরাসরি বলছেন না। তারা বলছেন ব্রেইনের নিউরো কারেন্টে সাময়িক সর্ট সার্কিট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্সের জন্যে। সরি!! বৃষ্টি দেখতে এসে আমি ডাক্তারি কচকচানি শুরু করেছি।'

'মাথায় কি ফুল-ফল এখনো ঘুরছে?'

'হু।'

'কতক্ষণ থাকে?'

'কোনো ঠিক নেই। তিন-চার ঘন্টা থাকে- আবার বেশ অনেক দিন থাকে এ রকম হয়েছে। আমার সবচে বেশি ছিল— ২৭ দিন । আমাকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল।'

'বল কী? সবচে বেশি দিন যে লাইনটা ছিল সেটা মনে আছে?'

'আছে।'

'বলতে অসুবিধা আছে? নাকি বললে সেটা আবার ঘোরা শুরু করবে।'

'না ঘোরা শুরু করবে না। ২৭ দিন যে লাইনটা আমার মাথায় ছিল সেটা হল— what a day বাসে করে মেরিল্যান্ড যাচ্ছিলাম। মাঝপথে গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেল। হাইওয়ের এক পাশে গাড়ি রেখে ড্রাইভার গাড়ির চাকা বদলাচ্ছে। যাত্রিরা সবাই বাস থেকে নেমেছে। আমিও নামলাম ! দেখি খুবই অপূর্ব দৃশ্য। শীতের শুরুতে পাতা ঝরার আগে পাতাগুলি লাল হয়ে যায়। তাই হয়েছে পুরো বন লালচে হয়ে গেছে। ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম— what a day! এই বলাই আমার কাল হল। সাতাশ দিন what a day মাথায় নিয়ে বসে রইলাম।'

'এই বাক্যটা তো মনে হয় তুমি প্রায়ই বল। আজো দুবার বলেছ?'

'হু।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ। মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।'

'ফুল-ফল মাথায় ফুল স্পিডে ঘুরছে?'

'হু।'

'এক কাজ কর। কদম ফুলগুলি ফেলে দাও। চোখের সামনে ফুল-ফুল কিছু থাকবে না।'

'না ফুল ফেলব না। আমি বাসায় চলে যাব। আমি হাঁটতে পারব না- রিকশা বাঁ বেবিটেক্সি নিন।'

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আশা একটু পরপর মাথা বাঁকাচ্ছে। তার চোখ লাল। মনে হয় তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, 'মাথার যন্ত্রণাটা কি খুব বেশি?'

আশা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'বাসায় যাব। জ্বরটা মনে হয় চেপে আসছে। আমি দুঃখিত। সারাদিনের প্রোগ্রাম নষ্ট হল। একটা রিকশার ব্যবস্থা করুন না।'

'মাঠের মাঝখানে তো রিকশা আসবে না। তোমাকে হেঁটে রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে। পারবে না!'

আশা চাপা গলায় বলল, 'না।'

এখন মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। চোখের পানির রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে— ঝমঝম বৃষ্টির পানির মধ্যেও চোখের পানি আলাদা করা যায়।

###

কেউ একজন মাথা মালিশ করে দিচ্ছে। নরম হাত চুলের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে চুলের ভেতর দিয়ে চিরুণি চলার মত হচ্ছে। বেছে বেছে এমন সব চুলের গুচ্ছ ধরে টান দিচ্ছে যাদের টান দেওয়াই উচিত। অতি আরামদায়ক অবস্থা। মাথা মালিশের এই অপূর্ব কারিগর যে জয়নাল সাহেব তা বুঝতে পারছি। নেকমর্দ সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা ঢেলে দিয়েছেন। আমি মোগল সম্রাট হলে বলতাম— 'দাঁড়িপাল্লায় জয়নাল সাহেবকে তোল। তাঁর ওজনের সমান ওজন আশরাফি তাকে দাও এই সঙ্গে দুটা হাতি, একটা তরবারি এবং মণিমুক্ত বসানো পাগড়ি দিয়ে দাও। এখানেই শেষ না আরো বাকি আছে। একটা পরগনার জায়গীরদারিও তার। গরগনার নাম 'শিরশান্তি'।

'হিমু ভাই!'

'হু।'

‘আরাম পাচ্ছেন?’

‘পাচ্ছি! চোখ মালিশ করবেন না?’

‘চোখ মালিশ করলে ঘুমিয়ে পড়বেন এই জন্যে চোখ মালিশ করছি না। আমি আসলে আপনার মাথা মালিশ করছি ঘুম ভাঙানোর জন্যে।’

‘সে কী!’

‘আপনি গভীর ঘুমে ছিলেন। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম চট করে ভাঙানো ঠিক না। এই জন্যে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছি।’

‘আমার ঘুম ভাঙানোটা কি প্রয়োজন?’

‘জিনা প্রয়োজন নাই। একটা ঘটনা ঘটেছে। ভাবলাম আপনাকে বলি। মনটা খারাপ।’

‘পরিচিত। কেউ মারা গেছে?’

‘জিনা।’

‘তা হলে আর কি? চোখ মালিশ শুরু করে দিন। আমি ঘুমিয়ে পড়ি ।’

‘জি আচ্ছা।’

চোখ মালিশ শুরু হতে হতে থেমে গেল। ঘটনাটা মনে হচ্ছে আমাকে শুনতেই হবে । অথচ চোখ মেলতে পারছি না।

‘হিমু ভাই!’

‘বলুন।’

‘মনটা খারাপ। চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে তো— এই জন্যে মনটা অত্যধিক খারাপ। চোখের সামনে না ঘটলে খারাপ লাগতো না। চোখের আড়ালে কত কিছুই ঘটে। ঠিক না?’

‘অবশ্যই ঠিক ! কথা বলার সময় মাথা মালিশ বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন? নাপিত যেমন চুল কাটতে কাটতে কথা বলে— আপনিও তাই করুন— কথা এবং কাজ এক সঙ্গে চলুক।’

‘ঘটনাটা বলব?’

‘বলুন।’

‘মনটা এত খারাপ হয়েছে ভাই সাহেব। তখনই বুঝেছি আজ সারারাত আমার ঘুম হবে না।’

‘ঘুম তো আপনার এমিতেই হয় না।’

‘তাও ঠিক। কথার কথা বলেছি ভাই সাহেব। ঘটনাটা হ’ল— আমাদের মেসের ম্যানেজার আবুল কালামকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।’

‘ও।’

‘রাত এগারোটার সময় পুলিশ এসেছে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা । পুলিশ আমার সঙ্গে খুবই ভদ্রব্যবহার করেছে। জিজ্ঞেস করল, কালাম বলে কেউ আছে? আবুল কালাম? ভাবলাম বলি– ‘না’। না বলতে গিয়েছি মুখ দিয়ে সত্যি কথা বের হয়ে এল। পুলিশের সাথে মিথ্যা কথা বলা যেমন কঠিন। সত্যি কথা বলাও কঠিন। বললাম।— জি আবুল কালাম সাহেব অফিস ঘরে বসে আছে। তারপর নিজেই অফিস ঘর দেখিয়ে দিলাম।’

‘ভাল করেছেন।’

‘আমার চোখের সামনে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিল।’

‘মারধোর করেছে?’

‘মারধোর করে নাই। খুবই ভদ্রভাবে বলেছে— চলুন থানায় চলুন।’

‘এটা দেখেই মন খারাপ হয়েছে?’

‘পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে থানায় নিয়ে যাচ্ছে আবার ভদ্র ব্যবহার করছে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। আমি ভুক্ত ভোগী— আমি জানি।’

‘আপনাকেও পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল?’

‘জি। অনেক দিন আগের কথা। ঘটনাটা বলব?’

‘বলতে চাইলে অবশ্যই বলবেন । তার আগে বলুন- আবুল কালামকে এ্যারেস্ট করেছে। কেন?’

‘কেউ কিছু জানে না ভাই সাহেব ! কারোর জানার গরজও নাই। না থাকারই কথা। আমি একবার ভাবলাম থানাতে গিয়া খোঁজ নিয়ে আসি। সাহসে কুলায় নাই। বাংলা একটা প্রবচন আছে না ঘরপুড়া গরু মেঘ দেখলে ভয় পায়।’

‘মেঘ না সিঁদুরে মেঘ।’

‘জি। আমার ঘটনাও সেরকম। থানা পুলিশ ভয় পাই। খাকি রং দেখলেই ভয় পাই। আমার একটা খাকি রঙের প্যান্ট আছে, কোনোদিন পারি নাই।’

‘পুলিশের ডলা খেয়েছিলেন?’

‘জি। ঘটনা বলব।’

‘আজ থাক। আরেক দিন শুনব। এক দিনে দুইবার পুলিশের ডলার গল্প ভালো লাগবে না। বদহজম হয়ে যাবে।’

‘সংক্ষেপে বলি? ঘটনাটা আজই বলতে ইচ্ছা করছে। সবদিন সবকিছু বলার ইচ্ছা করে না। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে যে ঘুম থেকে তুলেছি- ঘটনাটা বলার জন্য।’

‘তা হলে বলুন। সার সংক্ষেপ। ইংরেজিতে যাকে বলে সামারী এন্ড সাবসটেন্স।’

‘চা দেই ভাই সাহেব । চা খেতে খেতে গল্পটা শুনেন?’

‘গনিমিয়ার দোকানের চা?’

‘জি। রাত বারোটার সময় নিয়ে আসছি। গনিমিয়ার দোকান সারারাত খোলা থাকে। একবার আপনাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। চা বিক্রি করে উত্তরখানে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ির নাম গনি কুঠির। দেখলে চোখ জুড়ায়ে যায়। দিব এক কাপ চা?’

আমি বিছানায় উঠে বসে হতাশ গলায় বললাম, ‘দিন।’

জয়নাল সাহেব আঁট ঘাট বেঁধে নেমেছেন। পুলিশের ডলা খাওয়ার গল্প আজ আমাকে শুনতেই হবে।

জয়নাল সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘ভাই সাহেব আমাকে দেখে আপনার কী মনে হয়? আমি লোকটা বোকা না বুদ্ধিমান?’

‘আপনি বোকাও না বুদ্ধিমানও না। আপনি সমান সমান।’

‘আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলে এটা বললেন। আসলে আমি খুবই বোকা টাইপ মানুষ।’

‘বোকা টাইপ মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। আপনি তো তা করছেন না। কাজেই আপনি বোকা না।’

‘আমি একসময় নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবতাম। খুবই বুদ্ধিমান ভাবতাম। পুলিশ

অ্যারেস্ট করার আগ পর্যন্ত ভাবতাম আমার মতো বুদ্ধিমান লোক কমই আছে।'

'আপনার ঘটনাটা বলার জন্যে আপনি বুদ্ধিমান না বোকা এটা জানা কি খুব দরকার?'

'জি দরকার আছে। আমি বোকা এটা ভেবে গল্পটা শুনলে আপনার কাছে এক রকম লাগবে। আবার আমি বুদ্ধিমান এটা জেনে গল্পটা শুনলে আপনার কাছে আরেক রকম লাগবে।'

'ধরে নিলাম আপনি বোকা, গল্প শুরু করুন। বাতি জ্বালাবেন? না ঘর অন্ধকার থাকবে?'

'অন্ধকার থাকুক। গল্পটা বলার সময় চোখে পানি এসে যেতে পারে। পুরুষ মানুষের চোখের পানি যে দেখে তার জন্যে অমঙ্গল।'

'কে বলেছে। আপনাকে?'

'এটা প্রচলিত কথা—

দেখলে ভাল নারীর চোখের জল ।
পুরুষের চোখের জলে আছে অমঙ্গল।
কহেন কবি কালিদাস
ব্যাভিচারীর চোখের জলে আছে সর্বনাশ ।
গল্প শুরু করব ভাই সাহেব?'

'করুন।'

জয়নাল সাহেব সিগারেট ধরালেন । গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট টানছেন। সিগারেটের আলোর আভায় তার চোখ মুখখানি দেখা যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য রাখছি তার চোখের দিকে। চোখে পানি দেখা যায় কিনা। কোথায় যেন পড়েছিলাম অনিদ্রা রোগীর চোখে জল থাকে না। জয়নাল সাহেব কথা বলছেন ফিসফিস করে। অন্ধকারে মানুষ স্বাভাবিকের চেয়েও উঁচু গলায় কথা বলে। জয়নাল সাহেব তা করছেন না। আমি বিবাহ করেছিলাম অল্প বয়সে। এখনকার পুরুষ মানুষ ৩৫ বছর চল্লিশ বছরের আগে বিবাহ করে না । আমি বিবাহ করেছিলাম ২৩ বছর বয়সে। আমার স্ত্রীর নাম রেহানা। বিবাহের আগে শুনেছিলাম রেহানার চেহারা ছবি মোটামুটি — গাত্রবর্ণকালো। একটু মোটা ধাঁচ। মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। আমাদের ছিল অ্যারেনজড ম্যারেজ ।

আমার মামা বললেন, 'ভাইগ্না পাত্রী দেখবা? বিবাহের আগে কন্যাকে চোখের-দেখা দেখা হাদিসে জায়েজ আছে। তবে কথা বলতে পারবে না । কন্যার কণ্ঠস্বর পরপুরুষের শোনা হারাম।'

আমার মনটা অত্যাধিক খারাপ— কারণ কন্যার চেহারা ছবি ভালো না । দেখলে মন খারাপ হবে এই ভেবে বললাম, 'দেখব না।'

কুড়ি হাজার এক টাকা কাবিনে বিবাহ হয়ে গেল। রেহানাকে দেখলাম বাসর রাতে। ভাই সাহেব মেয়ে দেখে আমার পালপিটিশন শুরু হয়ে গেল । শরীর ঘেমে গেল। শুধু হাঁচি আসতে লাগল। প্রায় বিশটার মত হাঁচি দিলাম।

'মেয়ে অতি রূপবতী?'

'জি ভাই সাহেব। যেমন চেহারা, তেমন গায়ের রং। তেমনই লম্বা চুল। তবে চুলের বর্ণ কালো না— পিঙ্গল চুল— আপনি কি ওই শ্লোকটা জানেন? পিংগল চুলের শ্লোক?'

‘না।’

উচ কপালী চিরুলদাঁতি পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ।

‘এত সুন্দর মেয়ে আপনাকে অসুন্দর বলল কেন?’

‘সবাই মিলে মশকরা করল। এর বেশি কিছু না। অতি রূপবতী মেয়েদের মনে নানান প্যাঁচঘোচ থাকে। রেহানা ছিল— অতি সরল। হাসিখুশি । অন্তর মায়াতে ভরতি । রেহানা খুব ভাগ্যবতীও ছিল। সে এসেছিল তার স্ত্রী ভাগ্য নিয়ে । বিয়ের পর পর ভালো একটা চাকরি পেলাম। মাল্টিনেশানাল কোম্পানির চাকরি— অনেক সুযোগ সুবিধা। সবচে বড় সুবিধা কোয়ার্টার আছে। তিন রুমের কোয়ার্টার। রান্নাঘরটা শুধু ছোট। এ ছাড়া বড়ই ভালো ব্যবস্থা। দক্ষিণ দুয়ারী। কী যে সুখের জীবন শুরু হল ভাই সাহেব। নিজেকে মনে হত রাজা বাদশা । সহজভাবে তখন হাঁটাও ভুলে গেছি। স্টাইল করে হাঁটতাম। বিয়ের দুই বছরের মাথায় বড় মেয়ের জন্ম হল। মেয়ের নাম অহনা।

'আপনার দেওয়া নাম?'

'জিনা। আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাত ভাই— সফিকের দেওয়া নাম। সে আমার মেয়েটাকে অত্যন্ত স্নেহ করত । অহানা ডাকত না । সে ডাকত গহনা কন্যা অহানা।'

'সফিক সাহেব করতেন কী?'

'সে খুবই উদ্যোগি ছেলে ছিল। বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারের চেয়েও বেশি– ব্লেড ধার। অসম্ভব হাসিখুশি। গভীর মুখে সে হাসির কথা বলতো— আমি আর রেহানা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। আমরা দুজনই তাকে খুব পছন্দ করতাম। রেহানার চেয়ে বেশি পছন্দ করতাম আমি। ধরুন, বাসায় কোনো একটা ভালা রান্না হয়েছে। আমি মেস থেকে সফিককে নিয়ে আসতাম। সে মেসে খেয়ে ফেলেছে তারপরেও নিয়ে আসতাম। বাসায় ভালোমন্দ কিছু রান্না হয়েছে আর আমি সফিককে খবর দিয়ে নিয়ে আসি নি। এ রকম কখনো হয় নাই।'

'সফিকের অংশটা এখন থাক। আপনার অংশটা বলুন।'

'জি ভাই সাহেব বলছি। একটু দম নিয়ে নেই। আরেকটা সিগারেট খেয়ে নেই।'

'গল্পটা কি অনেক লম্বা?'

'জিনা শেষ হয়ে এসেছে। বেশি হলে এক মিনিট লাগবে। গল্প শেষ করে আমি মাথা বানায়ে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিব।'

জয়নাল সাহেব সিগারেট খেলেন। চা খেলেন। মিষ্টি পান নিয়ে এসেছিলেন। পান খেলেন। গল্প আবার শুরু করলেন ।

'বর্ষাকালের ঘটনা বুঝলেন হিমু ভাই। অফিসে গিয়েছি বৃষ্টিতে ভিজে। আমার বস হাসান সাহেব আমাকে দেখে বললেন--- একী অবস্থা। আপনার ছাতা নেই? আমি বললাম, জিনা সার । উনি বললেন, 'বর্ষার দেশে বাস করেন— ছাতা নেই কেন?'

আমি বললাম, 'সার আমি খুব ছাতা হারাই। গত বছর তিনটা ছাতা হারিয়েছি। এই বৎসর ঠিক করেছি। ছাতা কিনব না।'

হাসান সাহেব বললেন, 'এই বৎসরও কিনবেন এবং ছাতা যেন না হারায় সে। জন্যে নাইলনের পাতলা দড়ি দিয়ে হাতের সঙ্গে বেঁধে রাখবেন।'

আমি বললাম, 'জি আচ্ছা সার। এখনই ছাতা কিনে নিয়ে আসছি।'

হাসান সার বললেন– 'আরো কী আশ্চর্য। আপনি ঠাট্টা বুঝেন না নাকি? ঠাট্টা করছি। ছাতা কেনার কোনো দরকার নেই। আমার কাছে বাড়তি রেইনকোট আছে। আমি রেইনকোট দিয়ে দেব। আজ যে ভেজা ভিজেছেন। অসুখ করবে। যান বাসায় চলে যান। আজ আপনার ছুটি । আপনার জন্যে রেইনি ডে।'

হাসান সারা আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। তার স্নেহের ঋণ শোধ করা অসম্ভব। যাই হোক যে কথা বলছিলাম— আমি অসময়ে বাসায় ফিরে দেখি— সফিক আমাদের বাসায়। আমার খুবই ভালো লাগল- ভালো হয়েছে গল্প করা যাবে। আমি বললাম— 'সফিক কেমন আছ?'

সফিক বলল, 'ভালো। আপনি অসময়ে চলে এসেছেন কেন? অফিস ছুটি হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'অফিস ছুটি হয় নি— আমার ছুটি। আমার রেইনি ডে।'

সফিক গম্ভীর গলায় বলল, 'অসময়ে দেখতে এসেছেন ভাবি কার সঙ্গে কী করছে? ভাবিকে আপনি সন্দেহ করেন? আপনার কি ধারণা ভাবি আমার সঙ্গে লটর

পটার করে?’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘তার মানে?’

সফিক বলল, ‘আপনি নানানভাবে আপনার স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেন। তাঁকে মারধোর করেন। একবার গলাটিপে খুন করতে গিয়েছেন। আপনি কি জানেন ভাবি যদি থানায় গিয়ে কেইস করে তা হলে পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। নারী নির্যাতন মামলায় আপনার দশ বছর জেল খাটতে হবে।’

আমি ভাবলাম সফিক রসিকতা করছে। কারণ রেহানা কিছুই বলছে না। কাজেই আমি হাসতে হাসতে বললাম— ‘আমি জেলে গেলে তোমায় ভাবিকে দেখবে কে?’

সফিক বলল, ‘ভাবিকে দেখার লোক পাওয়া যাবে। আপনি আপনার নিজের কথা ভাবুন। আপনি তো ভাবিকে থ্রেটও করেছেন। আপনি বলেছেন- ভাবির মুখ আপনি এসিড দিয়ে ঝলসে দেবেন। বলেন নি?’

‘কখন বললাম?’

‘আমার সামনেই তো বলেছেন? বলেন নি? ভাবি যেমন শুনেছে। আমিও শুনেছি।’

আমি বললাম, ‘সফিক এই সব তুমি কী বলছ? ঠাট্টা করছ নাকি? এই জাতীয় ঠাট্টা ভালো না।’

সফিক বলল, ‘ঠাট্টা করছি না। আপনার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক না। আপনি আমার দুলাভাই না।’

এই বলে সে উঠে চলে গেল। আমি রেহানাকে বললাম, ‘ব্যাপার কী? সফিক এরকম করছে কেন?’

রেহানা শুকনো গলায় বলল, ‘ও এরকম করছে কেন তা আমি কি করে বলব। ওর ব্যাপার ও জানে।’

এই বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। আমি কিছুই বুঝলাম না। মন খুবই খারাপ। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমালাম। সন্ধ্যাবেলায় উঠলাম। মাগরেবের নামাজ পড়ে অহনাকে নিয়ে খেলছি। এমন সময় বাসায় পুলিশ আসল। আমাকে অ্যারেস্ট করল । বাড়ি সার্চ করল। আমার অফিসের ব্যাগে এক বোতল এসিড তারা খুঁজে পেয়ে গেল। তখনো আমি ভাবছি পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন। মন খারাপ করে ঘুমুতে গেছি। এই জন্যে স্বপ্নে দেখেছি। রেহানা যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারি নি। পুলিশ এমন মার মারল— কী বলব ভাই সাহেব । মারের চোটে স্বীকার করলাম এসিড আমিই কিনেছি। পুলিশ কি করত। জানেন? আমাকে চিৎ করে শুইয়ে এসিডের বোতলের মুখ খুলে ফেলত। তারপর বলত- তোর কেনা এসিডে তোর একটা চোখ গালিয়ে দেব। তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল। হারামজাদা স্বীকার কর তুই এসিড কিনেছিস।’

‘খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।’

‘জি অস্বাভাবিক। আমার পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল। জেলের বছর নয় মাসে হয় এই জন্যে চার বছরের মতো জেলে ছিলাম। তবে জেলে খারাপ ছিলাম না । বললে অবিশ্বাস্য লাগবে জেলে শান্তিতে ছিলাম। সারাদিন খাটাখাটনি করতাম রাতে ভালো ঘুম হত। এক ঘুমে রাত কাবার। জেল থেকে বের হয়ে খুবই কষ্টে পড়লাম। রেহানা সফিককে বিয়ে করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া। আমার নেই চাকরি। দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছি।’

'মামলা যখন চলেছে তখনো কি বলেছেন এসিড আপনি কিনেছেন?'

'জি বলেছি। রেহানার উপর রাগ করেই বলেছি। ইত্তেফাকে আমার ছবিও ছাপা হয়েছিল। পাষণ্ড স্বামী এই শিরোনামে।'

'আপনার গল্প শেষ হয়েছে?'

'জি ভাই সাহেব । এখন শুয়ে পড়েন আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। আজ অন্য কায়দায় মাথা মালিশ করব । আঙুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে ভেজা আঙুলে চুলে বিলি কাটব । ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগবে, খুবই আরাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন।'

আমি শুয়ে পড়লাম। জয়নাল সাহেব ভেজা আঙুলে চুলে বিলি কাটছেন। সত্যি সত্যি ঘুম চলে আসছে। আমি ঘুম ঘুম গলায় বললাম— 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আর যোগাযোগ হয় নি?'

'জি না।'

'যোগাযোগের চেষ্টাও করেন নি?'

'করেছি। মেয়েটা কত বড় হল জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওদের ঠিকানা বের করতে পারি নি।'

'মেয়ের নাম কী বললেন যেন?'

'ভালো নাম তারা কী রেখেছে তা তো জানি না। তবে ডাক নাম— আহনা। গহনার সঙ্গে মিলিয়ে আহনা। অহনা অহনা, পরবে সোনার গহনা। নামটা সুন্দর না?'

'অবশ্যই সুন্দর।'

'এখন মেয়েটার বয়স তেইশ ! মেয়ে নিশ্চয়ই মায়ের মতো রূপবতী হয়েছে। চুলের রং পিঙ্গল হয়েছে কি না কে জানে। পিঙ্গল হলে সমস্যা। মেয়েকে দেশ বিদেশ ঘুরতে হবে। রেহানার চুল ছিল, এইজন্যে তাকে বিদেশে পড়ে থাকতে হয়েছে।'

জয়নাল সাহেব মাথায় আঙুল বুলাচ্ছেন। আমার চোখে নামছে রাজ্যের ঘুম। খুব হালকা সুরে বঁশি বাজলে ভালো হত ! শরীরের আরামের সঙ্গে যুক্ত হত মনের আরাম।

ঘুম ভেঙে দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে অতি বিখ্যাত এক ব্যক্তি বসে আছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি খুব রাগী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ ধ্বক ধ্বক করেছে। এতটা রাগ কবিদের মানায় না। বিদ্রোহী কবিকেও মানায় না। আমি উঠে বসলাম। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি যিনি বসে আছেন তিনি বিদ্রোহী কবি না— ফরিদা খালা। ভরাট গোলগাল মুখ বড় বড় চোখের কারনে ধান্ধা লেগে গিয়েছিল।

ফরিদা খালা কঠিন গলায় বললেন, এই আস্তাবলে তুই থাকিস? জায়গাটা তো ঘোড়া বাসেরও অযোগ্য। সারা মেঝেতে সিগারেটের টুকরা। একটা অ্যাসট্রে কিনতে কয় টাকা লাগে? গত এক বৎসরে এই ঘর কেউ ঝাঁট দিয়েছে বলে মনে হয় না ।

আমি মধুর গলায় বললাম, 'কেমন আছ খালা? শরীর ভালো?'

খালা সামাজিক আলোচনার ধার দিয়েও গেলেন না। আগের সূত্র ধরেই ধমকাতে লাগলেন-

'টেবিলে থাকে বই খাতা— তোর টেবিলে ময়লা কাপড়। একটা আলনা কি কেনা

যায় না? আমি টাকা দিচ্ছি তুই এক্ষুনি আলনা কিনে আনবি?’

‘জি আচ্ছা।’’

‘ঝাঁটা কিনবি— ঘর ঝাঁট দিবি। ফিনাইল দিয়ে ঘর মুছবি। সব আজই করবি।’

‘আচ্ছা।’

‘কাপড় ধোয়ার সাবান কিনে আনবি । নিজের হাতে কাপড় কাচবি। একটা টেবিল ক্লথ কিনবি, অ্যাসট্রে কিনবি। ঘরে তো কোনো তোয়ালে দেখছি না গা মুছিস কী দিয়ে?’

‘গা মুছি না।’

‘একটা তোয়ালে কিনবি, গামছা কিনবি। তোষকের উপর শুয়ে আছিস— অস্বস্তি লাগে না। দুটা বেডশিট কিনবি। দুদিন পর পর বেডশিট বদলাবি। বালিশ থেকেও তো তুলা বের হচ্ছে। ফেলে দে এই বালিশ– এক্ষুনি ফেল।’

আমি জানালা দিয়ে বালিশ ফেলে দিলাম । খালা যে রাগ রেগেছে— তাৎক্ষণিকভাবে বালিশ বিসর্জনে সেই রাগ কিছু কমার কথা।

‘দাঁত কেলিয়ে বসে আছিস কেন? হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোর সঙ্গে জরুরি কথা। ভালো কথা হাত মুখ্য যে ধুবি— টুথপেস্ট ব্রাশ আছে?’

‘কয়লা দিয়ে একটা ডলা দিলে কি চলবে?’

‘হাসবি না খবর্দার। হাসির কোনো কথা আমি বলছি না।’

মনে হচ্ছে খালার রাগ খানিকটা পড়েছে— জোয়ারের পর সামান্য ভাটা । রাগ আরেকটু কমানোর জন্যে বললাম, চা খাবে খালা?

‘না।’

‘কবি নজরুল খুব চা খেতেন। তিনি বলতেন চায়ে ‘না’ নাই। দিনে সত্তুর কাপ চা খাওয়ার রেকর্ডও তার আছে।’

খালা অবাক হয়ে বললেন, ‘কবি নজরুলের চা খাওয়ার সাথে আমার চা খাবার সম্পর্ক কী?’

‘তুমি দেখতে অবিকল কবি নজরুলের মতো।’

‘তার মানে?’

চুলগুলি ববক্যাট করলে তুমি পুরোপুরি নজরুল। নজরুলকে নিয়ে অন্নদাশংকর রায়ের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে । কবিতাটা জান খালা?’

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে।
ভাগ হয়নি কো নজরুল।

খালা রাগী গলায় বললেন, ‘যার সঙ্গে ইচ্ছা ফাজলামি করিস আমার সঙ্গে করবি না। আমি তোর ছোটশালী না, সম্পর্কে আমি তোর খালা।’

‘একজন বিখ্যাত মানুষের চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল। এতে তো আনন্দিত হবার কথা। তুমি রাগ করছ, কেন?’

‘আমি কি ব্যাটা ছেলে ?’

‘এই বিষয়ে কবি নজরুলেরই কবিতা আছে— আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। তা ছাড়া খালা, পুরুষ রমণীর প্রভেদটা হল বাহ্যিক । শারীরিক। মানুষের আসল পরিচয় তার আত্মায়। আত্মার কোনো নারী পুরুষ নেই। পুরুষের

আত্মাও যা নারীর আত্মাও তা।’

‘আমার সাথে বড় বড় কথা বলবি না। আমি আশা না যে তুই যা বলবি তাই হাসি মুখে মেনে নিব। আর মনে মনে বলব।– ‘হিমু সাহেব কত বড় জ্ঞানী। কত জ্ঞানের কথা জানেন।’ একটা থার্ড গ্রেড ফাজিলের সাথে তোর যে কোনো বেশকম নাই, এটা অন্য কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোর ফিলসফির কথা শোনার জন্যে আমি আসি নি।’

আমি হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি অতি অল্প সময়ে ফরিদা খালা অসাধ্য সাধন করেছেন। ঝাঁটা যোগাড় করে নিজেই ঘর ঝাঁট দিয়েছেন। টেবিলের ওপর রাখা কাপড় লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার চৌকিটা ছিল। ঘরের মাঝামাঝি সেটা সরিয়ে দিয়েছেন, এতে ঘরটাকে আগের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে।

আমাকে দেখেই খালা বললেন- ‘সন্ধ্যাবেলা রশীদকে দিয়ে জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ও সব ঠিকঠাক করে দেবে! তোর ঘরে তো ফ্যানও নেই। প্রচণ্ড গরমে ঐ ঘুমাস কী করে? একটা টেবিল ফ্যানও দিয়ে দেব। আর কী লাগবে বল?

‘কিছু পাঠাতে হবে না খালা। এই মেসে আগামীকাল থাকব কি না তার নাই ঠিক।’

‘যাবি কোথায়?’

‘এখনো ঠিক করি নি।’

‘এই মেসে অসুবিধা কী?’

‘অসুবিধা আছে। মেসটায় শনির নজর পড়েছে। পুলিশ এসে মেসের লোকজনই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হেভি পিটুনি দিচ্ছে।’

‘কাকে ধরে নিয়ে গেল?’

‘মেসের ম্যানেজার আবুল কালাম সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। অনেস্ট লোক। সাতে-পাঁচে নাই। এমন মার দিয়েছে যে এক মারের চোটে ডিসঅনেস্ট হয়ে গেছে।’

‘জহিরকে বলি সে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।’

‘জহির কে?’

‘জহিরকে তুই চিনিস না--- ধরে একটা আছাড় দিব। আমার ছোট ভাই।’

‘উনি ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন কীভাবে? প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তোমরা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় না?’

‘গাধার মতো কথা বলিস না তো— জহির অবশ্যই ছাড়াতে পারবে। সে পুলিশের আই জি না? পত্রিকায় জহিরের ছবি ছাপা হয়েছে—তার জীবনী পর্যন্ত ছেপেছে। তুই টেলিফোন করে বলে দে তা হলেই হবে। তোকে সে খুবই পছন্দ করে। ওর পার্সোনাল নাম্বার তোকে দিয়ে যাচ্ছি।’

‘আচ্ছা দিও— এখন বল আমার কাছে কেন এসেছ? রাগারগি না করে ঠাণ্ডা গ্নি মাথায় বল।’

খালা কঠিন গলায় বললেন, ‘আশার মাথায় তুই কী ঢুকিয়েছিস? ও বলছে ওর মাথায় কী নাকি ঢুকে গেছে— ‘ফুল-ফল।’ একটা বাচ্চা মেয়ের মাথায় ফুল-ফল ঢুকানোর মানে কী? ও তো তোর কোনো ক্ষতি করে নি। তুই তার ক্ষতি করলি কেন? কী মনে করে বাচ্চা একটা মেয়ের মাথায় ফুল-ফল ঢুকিয়ে দিলি?’

‘আমি মাথায় কিছু ঢুকাই নি খালা। ফুল-ফল অটো সিস্টেমে তার মাথায় ঢুকেছে।

ওর অবস্থা কী?'

'আধমরা হয়ে গত ছদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছে। কিছুই খাচ্ছে না।'

'চিকিৎসা করছি না?'

'নিউজার্সিতে ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি টেলিফোনে অষুধ পত্র দিয়েছেন। সবই মনে হয় ঘুমের অষুধ । সারাক্ষণ ঘুমিয়েই থাকে। মাঝেমধ্যে ঘুম ভাঙে তখন বলে, এখানো মাথার মধ্যে ফুল-ফল আছে। কী যে যন্ত্রণায় পড়েছি।'

'যন্ত্রণাতো বটেই?'

'অনেক অদ্ভুত রোগের কথা শুনেছি। এরকম তো কখনো শুনি নি।'

'বড়লোকের বড় রোগ। —মাথার মধ্যে কথা ঢুকে যাওয়া। ছোটলোকের ছোট রোগ- পাতলা পায়খানা, দাউদ বিখাউজ। তুমি এত চিন্তিত হয়ে না তো খালা। সেরে যাবে।'

'বাইরের একটা মেয়ে প্রথম বাংলাদেশে শখ করে এসেছে। দেখ তো এখন ঝামেলাটা। আমি আগামী শনিবার ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এত ঝামেলার আমার দরকার নেই—'যত মাব্রা মরে। রায় বাড়িতে এসে পুড়ে।' সব ঝামেলা আমার ঘাড়ে। আমার বাড়িটা হয়েছে রায় বাড়ি।'

'আমার কাছে তোমাব্র আসার উদ্দেশ্য কি এটাই? শনিবার আশা চলে যাচ্ছে এই খবর দেওয়া? নাকি আরো কিছু আছে?'

'আশা তোকে একটা চিঠি লিখেছে। আমি চিঠিটা নিয়ে এসেছি।'

'চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে পারতে। তোমার নিয়ে আসার তো দরকার নেই। তোমার আসার উদ্দেশ্যটা বল।'

খালা শান্ত গলায় বললেন, 'তুই আশার সঙ্গে আর কখনো দেখা করবি না। কোনো যোগাযোগ রাখবি না। তোকে টাকা দিচ্ছি— তুই ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যা। স্টিমারে করে পটুয়াখালি চলে যা। সেখান থেকে যাবি কুয়াকাটা। কুয়াকাটায় পর্যটনের মোটেল আছে। মোটেল বুক করে দেব। রাজার হালে থাকবি।'

'আমাকে চলে যেতে হবে কেন? সমস্যাটি কী?'

'আশা তোর প্রসঙ্গে তার মাকে টেলিফোনে কী সব বলেছে। তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। খুবই চিন্তিত। কান্নাকাটিও করেছেন। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কী বিপদে পড়লাম।'

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, 'আশা কি আমার প্রেমে পড়েছে খালা?'

খালা তিক্ত গলায় বললেন, 'তোর প্রেমে পড়বে কেন? তোর কোন জিনিসটা আছে প্রেমে পড়ার মতো? ছাল বাকল নেই একটা মানুষ।'

আমি গলা নিচু করে বললাম— 'সাধারণ মেয়েরা ছালবাকল নেই ছেলের প্রেমে কখনো পড়বে না। তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজবে। টাকা-পয়সা খুঁজবে। ঢাকায় বাড়ি আছে কিনা দেখবে। কিন্তু অতি বিত্তবান মেয়েরা ছালবাকল নেই ছেলেদের প্রতি এক ধরনের মমতা পোষণ করবে। অসহায়ের প্রতি করুণা। সেই করুণা থেকে প্রেম। দুই এ দুই বাইশ।'

'দুই এ দুই এ বাইশ হোক আর একুশ হোক। তুই এই মেয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবি না। তুই পালিয়ে যাবি।'

'কুয়াকাটায় পালিয়ে গিয়ে সূর্যস্ত সূর্যোদয় দেখব?'

‘দেখতে চাইলে দেখবি, আর মোটেলের ঘরে বসে থাকতে চাইলে বসে থাকবি। আমার কথা হচ্ছে এই মেয়ের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া।’

আমি শান্ত গলায় বললাম, ‘খালা এতে লাভ হবে না।’

‘লাভ হবে না কেন?’

‘আশা মেয়েটার স্বভাব চরিত্র যা দেখছি-- এই কাণ্ড করলে তার প্রেম আরো বেড়ে যাবে। অবশ্যই সে খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করে ফেলবে। কুয়াকাটায় উপস্থিত হবে। সমুদ্র তীরে নায়ক নায়িকার মিলন। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্র সংগীত– বধু কোন আলো লাগল চোখে।’

খালা কঠিন গলায় বললেন— ‘নায়ক নায়িকার মিলন মানে? ফাজলামি কথা পুরোপুরি বন্ধ। জটিল একটা সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় সেটা বল। সব রোগের অষুধ আছে। এই রোগের কী অষুধ তুই বলা? তুই রোগের জীবাণু সাপ্লাই দিয়েছিস। অষুধও তুই দিবি।’

‘প্রথম যে কাজটা করতে হবে তা হল মেয়েটার প্রেম ভাবটা কমাতে হবে। তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সেটা করা যাবে না। তার সঙ্গে ছ্যাবলামি করতে হবে। যতই ছ্যাবলামি করা হবে ততই প্রেম ভাব কমবে।’

‘কী রকম ছ্যাবলামি?’

‘গদগদ ভাবে কথা বলতে হবে। ভাবটা এরকম দেখাতে হবে যেন আমি তার প্রেমে পাগল। তারপর ফট করে একদিন বিয়ের প্রপোজল দিতে হবে। বাংলা ছবির নায়কের মতো কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে— আশা, ও আমার জানপাখি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর তা হলে আল্লাহর কসম কোনো একটা পাঁচ টনি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাব।’

‘এমন অশালীন কথা তুই আমার সামনে বলতে পারলি?’

‘পারলাম কারণ কথাগুলি তোমার কাছে অশালীন সুনালেও সমস্যা সমাধানের এই হচ্ছে পথ।’

‘তোর এইসব কথাবার্তা শুনে আশার প্রেম কমে যাবে?’

‘অবশ্যই কমবে। অতি দ্রুত কমবে। বিয়ের কথাটা যেই বলব ওমি প্রেম জ্বর ধাই ধাই করে নামতে থাকবে, তারপর দিতে হবে আসল অষুধ।’

‘আসল ওষুধটা কী?’

‘বিয়ের কথা বলার পরপরই বলতে হবে— “আশা শোন তোমাকে বিয়ে করলে কি আমি এটোমেটিক্যালি আমেরিকার গ্রিন কার্ড পাব? নাকি তার জন্যে আবার আরো ঝামেলা আছে? আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও তো।” আমার এই কথা শুনে আশার আক্কেল গুড়ুম হবে। সে বুঝবে আমার আসল উদ্দেশ্য হল গ্রিন কার্ড। সিন্দাবাদের ভূতের মতো স্ত্রীর কঁধে সওয়ার হয়ে আমেরিকা যাত্রা।’

খালা কিছু বলছেন না। এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না।

আমি বললাম, ‘খালা এখন বল পরিকল্পনা মতো এগুব? লদকালদকি টাইপ কথাবার্তা বলা শুরু করব?’

খালা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তোকে কিছু করতে হবে না। তুই চুপ করে থাক।’

‘এখানেই থাকব? না কুয়াকাটার দিকে রওনা হয়ে যাব?’

‘আপাতত এইখানেই থাক। আমি পরে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব। নে তোর চিঠি নে।’

‘খালা চিঠিতে রোমান্টিক কোনো ডায়ালগ কি আছে? আমি জীবনে কোনো প্রেমপত্র পাই নি। প্রেমের ডায়ালগ যদি এই চিঠিতে থাকে তা হলে এটাই হবে আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। কিছু কি আছে?’

‘তোর কাছে লেখা চিঠি আমি কি করে বলব প্রেমের ডায়ালগ আছে কি না।’

‘এই চিঠি না পড়ে তুমি আমাকে দিচ্ছ এটা বিশ্বাসযোগ্য না বলেই জিজ্ঞেস করছি। প্রেমের কথাবার্তা কি আছে?’

খালা বিরক্ত গলায় বললেন– ‘না। এইসব কিছু নেই। গদগদ টাইপ প্রেমের চিঠি লেখার মেয়ে আশা না।’

খালা উঠে দাঁড়ালেন। তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। আমি আশার চিঠি পড়তে শুরু করলাম। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়।

> হিমু সাহেব
>
> আমি এখন মাথার ভেতর একটা পোকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। পোকাটা ক্রমাগত গান করছে– “ফুলের মতো ফল। ফলের মতো ফুল।” ভয়ঙ্কর এবং কুৎসিত এই চক্রসংগীত। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলি । তারপর একটা চিমটা দিয়ে পোকাটা বের করে ফেলি । তা সম্ভব হচ্ছে না বলেই জটিল ধরনের সব সিডেটিভ খেয়ে ঘুমুচ্ছি। পোকা কিন্তু আমার ঘুমের ভেতরও গান গেয়ে যাচ্ছে।
>
> দয়া করে আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। অষুধ পত্র চলছে পোকা যথাসময়ে মারা যাবে। নতুন কোনো পোকা না ঢোকা পর্যন্ত সময়টা ভালোই কাটবে।
>
> ওই বর্ষার দিনে আমি খুবই আনন্দ করেছি। জ্বর নিয়ে বের হয়েছিলাম। জ্বর সেরে গেছে। আপনার সঙ্গে পাইপে বসে বৃষ্টি দেখা হল না— এই দুঃখটা দূর হচ্ছে না।
>
> ঝর-ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে আমরা দুজন পাইপে বসে বৃষ্টি দেখছি। এই দৃশ্যটা আমি কল্পনায় অনেকবার দেখেছি। বাস্তব কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা এটাই আমার দেখার ইচ্ছা । আমার কল্পনাশক্তি ভালো বলেই বাস্তব কখনোই আমার কল্পনাকে অতিক্রম করতে পারে না। যাই হোক মাথা থেকে পোকাটা বের হওয়া মাত্র আমি আপনাকে নিয়ে পাইপে ঢুকব। তখন যদি বৃষ্টি নাও থাকে আপনি দমকলকে খবর দেবেন যেন দমকল বাহিনী নকল বৃষ্টি তৈরি করে দেয়।
>
> একটা ছোট্ট অনুরোধ কি আমি আপনাকে করতে পারি? আমাকে এসে দেখে যান না? প্লিজ ।
>
> বিনীতা
> আশা।

##

কালাম সাহেবকে দেখতে থানায় উপস্থিত হলাম। ডিউটি অফিসার খুবই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ভেতরও তিনি চট করে আমাকে দেখে আবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাঁর ব্যস্ততা নাকের লোম ছেড়ায় সীমাবদ্ধ। এই মহৎ কর্মটি তিনি বেশ আয়োজন করে করছেন। তার সামনে ছোট্ট একটা আয়না । একপাশে কেচি এবং চিমটা। দুটা মাত্র গর্ত দিয়ে আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বলে তিনি ঝামেলায় পড়ে গেছেন। হাত তিনটা থাকলে তাঁর জন্যে সুবিধা হত। এক হাতে আয়না ধরে থাকতেন। অন্য দুহাত দিয়ে চিমটা এবং কাঁচি ব্যবহার করতেন ।

আমি ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ‘স্যার স্লামালিকুম।’

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে হাসি মুখে বললাম, ‘গল্প করতে এসেছি স্যার। কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে গসিপিং করব যদি অনুমতি দেন।’

ডিউটি অফিসার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ‘গসিপিং করব মানে? কিসের গসিপিং?’

আমি মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে বললাম— ‘আপনি তো স্যার অবসর আছেন, নাকের লোম ফেলছেন। আমিও অবসর। কাজেই আসুন কিছুক্ষণ গসিপিং করি।’

‘আপনি কে?’

‘আমি একজন কবি। আমার কথা মনে হয় বিশ্বাস হচ্ছে না। পুরোনো ফাইল ঘেঁটে দেখতে পারেন। তিন বছর আগে আপনাদের হাজতে চারদিন ছিলাম। সেখানে আমার পরিচয় লেখা আছে- কবি।’

‘কবি?’

‘জি স্যার কবি। পোয়েট। আমি রবীন্দ্রনাথ ঘরানার কবি। মিল দিয়ে দিয়ে কবিতা লেখি । যেমন—

পুলিশ
ফুলিশ

গরু
সরু

সিঁড়ি
কিড়িকিড়ি...

ডিউটি অফিসার নড়েচড়ে বসলেন। ঝড় আসার পূর্ব লক্ষণ। বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপ দেওয়ার আগে মাটিতে লেজের একটা বাড়ি দেয় । পুলিশও নড়ে চড়ে বসে।

আমি মধুর গলায় বললাম, ‘স্যার দুকাপ চা দিতে বলুন। আমারটায় চিনি একটু বেশি— তিন চামচ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চায়ে চিনি বেশি খেতে খেতেন বলে আমি সবদিকেই উনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। চিনি নিয়ে কবিগুরু একটা গানও

লিখেছেন । গানটা কি শুনেছেন?'
ডিউটি অফিসার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। পুলিশের ঠোঁট কামড়ানোর মানে হল- 'দশ নম্বর সিগন্যাল। তুফান এল বলে।' আমি শান্ত গলায় বললাম, চিনি নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের গানটা হচ্ছে—

"চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনি।"

অর্থাৎ তিনি বিদেশী চিনির কথা বলছেন। দেশি চিনি ময়লা লালচে ধরনের। বিদেশী চিনি ফকফকা সাদা ।
ডিউটি অফিসার কলিং বেলে চাপ দিলেন। এখন তাঁর মুখে সামান্য হাসি দেখা গেল। মাকড়সার জালে পোকা আটকে পরার পর মাকড়সা পোকার দিকে তাকিয়ে যেরকম হাসি দেয় সেরকম হাসি ।
আমিও হাসলাম। তবে হাসি তৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে বললাম— 'এই গানটার ইংরেজি শুনবেন- চিনিগো চিনি তোমারে Sagar Sugar you...'
কলিং বেল শুনে রাইফেল কাঁধে এক পুলিশ উপস্থিত হল। বেচারা অতি দুর্বল টাইপ। রাইফেলের ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কুঁজো হয়ে গেছে। এই পুলিশকে বাইরে ডিউটিতে পাঠানো ঠিক হবে না। প্রথম সুযোগেই সে রাইফেল কোনো ডাস্টবিনে ফেলে বাড়ি চলে যাবে ঘুমুবার জন্যে ।
দুর্বল পুলিশ খুবই কষ্ট করে ডিউটি অফিসারকে একটা স্যালুট দিল। ডিউটি অফিসার আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন— 'একে নিয়ে লকারে ঢোকাও । বড় সাহেব আসুক তারপর ব্যবস্থা নিব । হারামজাদার তেল বেশি হয়েছে- তেল কমায়ে দেই।'
আমি হাজতে ঢুকে পড়লাম। হাজতে আমাকে নিয়ে মোট ছজন। আমি সবার দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতো হাত নেড়ে বললাম— 'শুভ সকাল । আপনারা সবাই ভালো? কেউ জবাব দিল না। শুধু আবুল কালাম সাহেব চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। মনে হল তিনি চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোক যে ভালো ডলা খেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। তার একটা চোখ বড় একটা ছোট। কপালের একই অংশ নৈনিতালের আলুর মতো ফুলে আছে। দেখে মনে হচ্ছে পার্মানেন্ট ব্যবস্থা। এই ফোলা কখনো কমবে না। বাকি জীবন কপালে আলু নিয়ে ঘুরতে হবে । আগে পুলিশের মারের মধ্যে রাখ ঢাকা ছিল। দেখে কিছু বোঝা যেত না। মারটাও তার শিল্পকর্মের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল— এখন সে অবস্থা নেই। ইচ্ছা হল মেরে ফেললাম— পানির ট্যাংকে ফেলে দিলাম। ডেডবডি প্রকাশ হয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই- পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হবে – এই লোক পানির ট্যাংকে গিয়েছিল পানি খেতে। তারপর পা পিছলে ট্যাংকে পড়ে গেছে। সেখানেই মৃত্যু।
ডাক্তাররা সুরাতহাল করবেন। তারাও রিপোর্ট দেবেন— লাংসে পানি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ পানিতে ডুবে মৃত্যু। মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে– পানির ট্যাংকের ঢাকনায় ধাক্কার কারণে তা হতে পারে।
'হিমু সাহেব।'
'জি।'
'আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আবুল কালাম।'

'চিনতে পারছি। কেমন আছেন?'

আবুল কালাম জবাব দিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম, 'আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

আবুল কালাম বিড়বিড় করে বললেন, 'শুকরিয়া।'

বেচারা যে ঘোরের মধ্যে চলে গেছে এটা স্পষ্ট। যে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে সে আছে হাজতে এই সমস্যা তাকে বিচলিত করছে না। তবে অন্য হাজতিরা এখন আমাকে কৌতুহলী চোখে দেখছে। এদের মধ্যে একজনের চেহারা এবং কাপড়াচোপড় শোভন শ্রেণীর। চোখে সোনালি রঙের চশমা। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল টাইপ চেহারা। তিনি কাছে ঝুঁকে এলেন। আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাই সাহেব ভালো আছেন?' তিনি জবাব দিলেন না। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

আমি আবুল কালাম সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললাম, 'বেশি মেরেছে?'

আবুল কালাম ক্ষীণ গলায় বললেন, 'জি না। সন্ধ্যার পর মারবে।'

আমি বললাম, 'ঘণ্টা দু-একের মধ্যে ছাড়া পাবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে না।'

আবুল কালাম ফিসফিস করে আবারো বললেন, 'শুকরিয়া।'

'হাজত থেকে বের হয়েই গরম পানি দিয়ে একটা গোসল দেবেন। সাবান ডলা দিয়ে হেভি গোসল। তারপর দুটা প্যারাসিটামল খাবেন, একটা খাবেন সিডাকসিন। গনিমিয়ার চায়ের দোকান থেকে চা আনিয়ে দেব। মগভরতি এক মগ চা খাবেন। সঙ্গে একটা বেনসন সিগারেট— দেখবেন কেমন লাগে।'

'জি আচ্ছা। শুকরিয়া।'

'একটু পরপর শুকরিয়া বলছেন কেন? ঘটনা কী?'

আবুল কালাম ফিসফিস করে বললেন, 'মাথা আউলায়ে গেছে হিমু ভাই। কী বলতেছি না বলতেছি নিজেও জানি না। ছোট বেলায় মায়ের হাতে মার খেয়েছি তারপর পুলিশের কাছে মার খেলাম। কলিজা নড়ে গেছে। সন্ধ্যার পর নাকি আসল মার দিবে। আসল মারা মারার যে লোক তার ডিউটি সন্ধ্যার পর।'

'পুলিশ ধরেছে কেন?'

'মেসের মালিক সবুর সাহেবের শালার দুই লাখ টাকা চুরি গেছে। তার ধারণা টাকাটা আমি চুরি করেছি। পুলিশকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন টাকা উদ্ধারের জন্য। উদ্ধার হলে আরো দশ দিবে। এই হল কনট্রাক্ট। টাকা উদ্ধারের জন্যে পুলিশ দফায় দফায় মারছে। সন্ধ্যার পর ফাইন্যাল মারা মারবে।'

'এতক্ষণ পর্যন্ত কি হয়েছে সেমি ফাইন্যাল।'

'জি । মনে হয় রাতে জানেই মেরে ফেলবে।'

'টাকা কি আপনি নিয়েছেন?'

'জি না ভাইজান। আমি ছোটখাটো চুরি করি। মেসের বাজার করতে গিয়ে তিরিশ টাকা সরায়ে ফেললাম। হেঁটে কাচা বাজারে যাই- বিলের সময় লেখি রিকশা ভাড়া পনরো টাকা। এইসব করি। বড় চুরি কী ভাবে করব বলেন? বড় চুরি করতে বড় কইলজা লাগে। আমার কইলজা ছোট। অতিরিক্ত ছোট । ভয়ে অস্থির হয়ে থাকি। আমার পেটে পুলিশ হাঁটু দিয়ে গুতা দিয়েছে। ব্যথা সেরকম পাই নাই, কিন্তু ভয়ের চোটে পিসাব করে দিয়েছি। বালতি দিয়ে পানি এনে সেই পিসাব নিজেই

ধুয়েছি। কী লজ্জার কথা বলেন দেখি।'

'আপনার পিসাব আপনি ধুয়েছেন এতে লজ্জার কী আছে? আপনার পেসাব যদি ওসি সাহেব ধুতেন – সেটা ছিল লজ্জার।'

'তাও ঠিক । ভাই সাহেব সন্ধ্যার সময় যখন মারতে নিয়ে যাবে তখন বোধহয় মেরেই ফেলবে।'

'না তার আগেই আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

'কীভাবে?'

'ব্যবস্থা করে রেখেছি। আই জি সাহেব টেলিফোন করবেন। টেলিফোন তিনি বলবেন, আবুল কালাম অতি সৎ চরিত্রের মানুষ। আমার পূর্ব পরিচিত। এতেই কাজ হবে।'

'শুকরিয়া।'

'রাতে ঘুম হয় নি?'

'জি না।'

'এখন ছোট্ট একটা ঘুম দিন। আই জি সাহেবের টেলিফোন এলে আমি ডেকে তুলব।'

'শুকারিয়া।'

আবুল কালাম সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। যেভাবে নিশ্বাস পড়ছে তাতে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। ভাইস প্রিন্সিপালের মতো দেখতে ভদ্রলোক আবারো আমাদের দিকে ঝুঁকে এসেছেন । আড় চোখে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত আবুল কালামের দিকে। আমি বললাম, 'কিছু বলবেন?'

ভদ্রলোক না সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, 'আপনাকে পুলিশ ধরেছে কেন?'

ভদ্রলোক অতি মিষ্টি গলায় বললেন, 'খুনের আসামী হিসেবে ধরেছে।'

'খুন করেছেন?'

'হ্যাঁ করেছি।'

'কাকে খুন করেছেন?'

'করেছি একজনকে। তার নাম বলার দরকার দেখছি না। যে চলে গেছে তার নাম দিয়ে দরকার কী? He does not exist.'

'আপনার নাম কী?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন- 'আপনার এই লোক সারারাত ছটফট করেছে। এখন আপনাকে দেখে শান্তি পেয়ে ঘুমাচ্ছে। মিথ্যা কথা বলে আপনি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। মিথ্যার শক্তি যে সত্যের চেয়ে বেশি এটা বুঝলেন?'

'বোঝার চেষ্টা করছি।'

'এই যুগে সত্যি কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বললে সন্দেহের চোখে তাকায়। আমি যখন বললাম, খুন করেছি আপনি বিশ্বাস করেন নি। সন্দেহের চোখে তাকিয়েছেন। অথচ আমি সত্যি খুন করেছি।'

আমি চুপ করে ভদ্রলোকের কথা শুনছি। ভদ্রলোক কী সুন্দর করেই না কথা বলছেন। হাসিহাসি মুখ চোখ ঝিকমিক করছে।

ভদ্রলোক আধা খাওয়া সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন- খান সিগারেট খান। আপনি কী করে মিথ্যা কথা বলে একটা লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন সেটা মোটামুটি অবাক হয়েই দেখলাম। নাম কী আপনার?

'হিমু।'

'শুধু হিমু?'

'জি।'

'পুলিশ আপনাকে ধরেছে কেন?'

'আমি আবুল কালাম সাহেবকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। পুলিশ আমাকে লকারে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ভদ্রলোক মনে হল আমার কথায় খুব মজা পেলেন। শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। খুবই অন্যরকম হাসি। সমস্ত শরীর কাঁপছে, কিন্তু হাসির কোনো শব্দ আসছে না। চোখ দুটিতে কোনো হাসি নেই! চোখ স্থির।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'আমার নাম সাদেক চৌধুরী। আমার এই কার্ডটা রেখে দিন। প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করবেন।'

'শুকরিয়া।'

'শুকরিয়া বলা কি আপনি আপনার বন্ধুর কাছে শিখেছেন?'

'জি।'

'আমি আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি। করব?'

'দরকার নেই। আমরা ঘণ্টা দু-একের মধ্যে ছাড়া পাব।'

'আই জি সাহেব টেলিফোন করে ছাড়াবেন?'

'জি।'

ভদ্রলোক আবারো তার বিচিত্র হাসি হাসতে লাগলেন। তাঁর এ বারের হাসি দেখে গা শিরশির করে উঠল। নিঃশব্দ হাসির বিষয়ে বাবা লিখে গিয়েছিলেন।

> "যে মানুষ নিঃশব্দে হাসে তাহার বিষয়ে খুব সাবধান। দুই ধরনের মানুষ নিঃশব্দে হাসে— অতি উচু স্তরের সাধক এবং অতি নিম্ন শ্রেণীর পিশাচ চরিত্রের মানুষ। এই দুই এর ভেতর প্রভেদ করা তেমন জটিল কর্ম নহে। ঘ্রাণের মাধ্যমে এই দুই শ্রেণীকে আলাদা করা যাইবে। হাস্যকালীন সময়ে সাধু মানুষের গাত্র হইতে সুঘ্রাণ পাওয়া যাইবে । পিশাচ শ্রেণীর মানুষের গায়ে পাওয়া যাইবে তিক্ত ও কটুস্বাদময় দূষিত গন্ধ। সাধু মানুষ যেমন সংখ্যায় অতি নগন্য তেমনি পিশাচ শ্রেণীর মানুষও সংখ্যায় অতি নগন্য। এই দুই শ্রেণীর মানুষের কাছেই অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। বাবা হিমু মনে রাখিও অতি ভয়ঙ্কর যে গরল তাহাতেও অমৃত মিশ্রিত থাকে। অতি পবিত্র অমৃতে থাকে প্রাণসংহারক গরল। খাদ ছাড়া সোনা হয় না। গরাল ছাড়া অমৃতও হয় না।"

হাজতের দরজা খুলেছে। দুবলা পুলিশ আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। কথা বলার পরিশ্রম করতেও সে মনে হয়। রাজি না।

ওসি সাহেবের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে দেখলেন। চোখ মুখ কুঁচকালেন। একজন শিক্ষক যেমন যাকেই দেখেন তাকেই ছাত্র মনে

করেন। একজন পুলিশ অফিসারও যাকে দেখেন তাকে খারাপ ধরনের ক্রিমিন্যাল মনে করেন। আমি অতি বিনয়ী টাইপ হাসি দিয়ে বললাম, স্যারের শরীর এবং মন কি ভালো? কোনো ক্রিমিন্যাল শরীর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলে রাগে শরীর জ্বলে যাবার কথা। ওসি সাহেবের শরীর জ্বলল না। তিনি চোখ মুখ কুঁচকেই রাখলেন। তবে ভদ্র স্বরে বললেন, 'বসুন।'

আমি বসলাম । ওসি সাহেব চোখে চশমা পরতে পরতে বললেন- 'শুনলাম আপনি একজন কবি।'

আমি বিনয়ী ভঙ্গিতে বললাম, 'জি স্যার কবি । মনে একটা ক্ষোভ ছিল পুলিশ বিডিআর এবং আর্মিকে নিয়ে কেন কবিতা লেখা হয় না। এরাও তো জনগোষ্ঠির অংশ। রবীন্দ্রনাথ কত কিছু নিয়ে কত কবিতা লিখেছেন- অথচ পুলিশ নিয়ে কোনো কবিতা লিখেন নি ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। উনি লিখেছেন— "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।" তা না লিখে তিনি অনায়াসে লিখতে পারতেন— "ও আমার দেশের পুলিশ তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।" এতে পুলিশ ভাইদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত।'

'ফজিলামি করবেন না।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

'আবুল কালাম লোকটা কে?'

'গুরুত্বপূর্ণ কেউ না স্যার।'

'গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই পুলিশের আইজি তার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। সে সাধারুণ লোক হবে কীভাবে?'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'পুলিশের আইজি ইন্টারেস্টেড কারণ তাকে অনেক উপর থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে।

'সেই অনেক উপরটা কী?'

'তা তো স্যার বলা যাবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আবুল কালামকে নিয়ে চলে যান।'

'ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'জি ছেড়ে দিচ্ছি। চা খাবেন?'

'না চা খাব না। তবে ছোট্ট একটা কাজ করলে খুব উপকার হয়— মারের চোটে আবুল কালাম সাহেবের নাকের লোম বের হয়ে গেছে। উনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নাক দিয়ে লোম বের করা অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া ঠিক না। যদি তাঁর নাকের লোমগুলি একটু ছোট দেবার ব্যবস্থা করেন। খুব উপকার হয়।'

ওসি সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'তার মানে?'

'আপনাদের ডিউটি অফিসারকে বললেই বুঝবেন। উনি কোনো কারণ ছাড়া আমাকে হাজতে ঢুকিয়েছেন। উনি যদি কষ্ট করে আবুল কালাম সাহেবের নাকের লোম ছোট দেন– তা হলে আমি কিছু মনে রাখব না। কবি বলেছেন- Forget and Forgive, ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ। উনাকে দেখেই বুঝেছি। উনি মহান। উনি মহান। উনি মহান একুশে ।'

ওসি সাহেব আগুন চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি বেল টিপে ডিউটি অফিসারকে ডাকালেন।

আমি গলা নামিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আরেকটা ফুলের মালা যদি

আনিয়ে দেন। আবুল কালাম সাহেবের গলায় মালাটা পরাব। গলায় মালা পরে জেল থেকে অনেকে বের হয়েছেন। হাজত থেকে কেউ বের হন নি। একটা রেকর্ড হয়ে যাক।'

'আপনার নাম হিমু?'

'জি।'

'এই দিন দিন না। আরো দিন আছে- এই গানটা শুনেছেন?'

'টিভিতে দেখেছি স্যার। কুদ্দুস বয়াতী একদল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গানটা করে।'

'গানের কথাগুলি মনে রাখবেন । ভবিষ্যতে আপনাকে যদি আমি ট্রিট করতে না পারি তা হলে আকিকা করে আমি আমার নাম আলম খান বদলায়ে রাখব।-- কুত্তা খান। আপনি আকিকার দাওয়াত পাবেন।'

রাগে ওসি সাহেবের শরীর কাঁপছে। তিনি রাগ সামলাতে পারছেন না । ডিউটি অফিসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওসি সাহেব তার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'এই লোক কী বলছে শুনুন আর একটা ফুলের মালা আনিয়ে দিন।'

আবুল কালাম সাহেবের গলায় গাদা ফুলের মালা। তিনি এলোমেলো ভঙ্গিতে পা ফেলছেন। আমি বললাম, 'শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?'

'জি না।'

'মালা গলায় নিয়ে হাঁটতে যদি খারাপ লাগে মালাটা খুলে ফেলুন।'

'জি না।'

'রিকশা নেব?'

'জি না।'

'যাবেন কোথায় ঠিক করেছেন? মেসে ফিরে যাবেন?'

'না।'

'ঢাকায় আত্মীয়স্বজন কেউ আছে? ঠিকানা বলুন সেখানে নিয়ে যাই।'

'ঢাকায় তেমন পরিচিত কেউ নাই। দেশের বাড়ি চলে যাব চাঁদপুর। লঞ্চে করে যাব।'

'চা খাবেন? চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাই, তারপর ঠিক করি কী করা হবে। চাঁদপুরে চলে যেতে চাইলে চলে যাবেন।'

'পুলিশের কাছে হাজিরা দিতে হবে না?'

'না। আপনাকে পুলিশ আর ঘাঁটাবে বলে মনে হয় না। আইজি সাহেব আপনার প্রসঙ্গে যেভাবে বলেছেন তারপর আর কিছু বলার থাকে না।'

'উনি কি বলেছেন। আমি সৎ লোক ?'

'বলেছেন।'

'কেন বলেছেন উনি তো আমাকে চিনে না।'

'আমি তাকে বলতে বলেছিলাম। উনি আপনাকে না চিনলেও আমি চিনি।'

'হিমু ভাই আপনার ধারণা আমি একজন সৎ লোক?'

'অবশ্যই।'

আবুল কালাম সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'এই প্রথম একজন কেউ বলল, আমি সৎলোক। এর আগে কেউ কোনোদিন বলে নাই। স্কুলে পড়ার সময় আমি একবার একটা কলম চুরি করেছিলাম— তারপর আমার নাম হয়ে গেল— চোর কালাম! স্কুলে দুজন কালাম ছিল। তাকে ডাকত ভালো কালাম, আমাকে ডাকত চোর

কালাম।’

‘কে কী ডাকত তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি তো জানেন আপনি কী? আপনি নিজেকে জানেন না?’

‘জানি। আমি হলাম চোর কালাম। দুই লাখ টাকা আমি সত্যিই চুরি করেছি। আপনি ফুলের মালা গলায় পরিয়ে একটা চোরকে বের করে নিয়ে এসেছেন। কাজটা ঠিক করেন নাই।’

কালাম সাহেব বড় বড় করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। আমি তাকিয়ে আছি ! কালাম সাহেব তাকালেন আমার দিকে । শান্ত গলায় বললেন, ‘আমি এখন সদরঘাট টার্মিনেলে চলে যাব। সেখান থেকে যাব চাঁদপুর। ভাই সাহেব যাই?’

ফুলের মালা গলায় দিয়ে কালাম সাহেব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। আরো অনেকেই তাঁকে দেখছে। গাদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঢাকা শহরে কেউ হাঁটাহাটি করে না।

##

জয়নাল সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গায়ে জ্বর, বুকে সামান্য ব্যথা । বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়— উঠে বসলেই বুক ধড়ফড় করে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিছু খেতেও পারছেন না। খাবার মুখে দিলেই বমি আসে। তার চেহারা একদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গোলগাল মুখ লম্বাটে হয়ে গেছে। কথাও বলছেন হাসের মতো ফ্যাসফেসে গলায় ।

অসুখটা হয়েছে আমার কারণে। আমি আবুল কালামকে দেখতে গিয়ে ফিরছি না দেখে তিনি টেনশনে অস্থির হয়ে আমার খোঁজ নিতে থানায় যান। সেখানে জানতে পারেন আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনি তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। থানার সামনের রাস্তার পাশের নর্দমায় দুবার বমি করেন। লোকজন তাঁর অবস্থা দেখে ফুটপাতেই শুইয়ে দেয়। আধঘণ্টা ফুটপাতে বিশ্রাম করে মেসে ফিরে শয্যাশায়ী।

আমি বললাম, ‘সামান্য কারণে বুকে ব্যথা বাধিয়েছেন? উঠে বসুন তো । আমি ঠিকঠাক মতো ফিরে এসেছি।’

জয়নাল সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ লাগছে। ভাই সাহেব কিন্তু বুকের ব্যথাটা যাচ্ছে না। নিশ্বাস নিতে পারছি না।’

সন্ধ্যাবেল জয়নাল সাহেবের বুকে ব্যথা আরো বাড়ল। মেসের সামনে গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তার বললেন, ‘পেটে গ্যাস হলে বুকে ব্যথা হয়। মনে হচ্ছে পেটে গ্যাস হয়েছে। এন্টাসিড দিচ্ছি- এতেই কাজ হবে। ইসিজি করে দেখতে পারেন। হার্টের কোনো প্রবলেম থাকলে ধরা পড়বে। আমি অবিশ্যি তার কোনো দরকার দেখি না। তবু সেফ সাইডে থাকা। আমার পরিচিত

একটা ক্লিনিক আছে। আমার নাম বলবেন টুয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে।

রাত একটার দিকে জয়নাল সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ করল। তাঁর প্রচণ্ড চোয়ালে ব্যথা শুরু হল। গা ঘামতে লাগল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'হিমু ভাই, মনে হয় মারা যাচ্ছি। যদি অপরাধ কিছু করে থাকি ক্ষমা দিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা যান ক্ষমা দিলাম।'

'এইভাবে বললে হবে-না ভাই সাহেব। আল্লাহ পাককে বলতে হবে।— খাস দিলে ক্ষমা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'ক্ষমার অংশটা আপাতত স্থগিত থাকুক। এই মুহূর্তে যা করতে হবে তা হল আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমার ধারণা আপনার হার্ট এটাক হয়েছে। লক্ষণ তাই বলে।'

'এত রাতে এম্বুলেন্স পাবেন?'

'দেখি চেষ্টা করে। এম্বুলেন্স না পেলে গাড়ি। গাড়ি না পেলে রিকশা, একটা ব্যবস্থা হবেই। হাসপাতাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যান।'

প্রয়োজনে কিছুই পাওয়া যায় না এরকম কথা ভুল প্রমাণিত করে একটা এম্বুলেন্স অতি দ্রুত উপস্থিত হল। স্ট্রেচারে এম্বুলেন্সের লোকজন জয়নাল সাহেবকে নামিয়ে নিয়ে গেল। এম্বুলেন্সের পোঁ পোঁ শব্দ।

এত রাতেও লোক জমে গেল ! জয়নাল সাহেব তাদেরকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'কিছুই হয় নাই সামান্য বুকে ব্যথা।'

পত্রিকায় প্রায়ই ডাক্তারদের অবহেলার কারণে মৃত্যুর খবর পড়ি। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ডাক্তারদের ছোটাছুটি দেখে মনে হল পত্রিকার খবর সব সত্যি না।

একজন রোগী চেহারার মহিলা ডাক্তার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। ম্যাসিভ এটাক হয়েছে। দুদিন না কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'আমার কি কিছু করণীয় আছে?'

'আপনার কিছুই করণীয় নেই। অষুধপত্র কিনে দিতে হবে। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে?'

'না। তবে যোগাড় করতে পারব।'

'যোগাড় করুন। আপাতত আমরা চালাচ্ছি।'

'রোগী কি বাঁচবে?'

মহিলা ডাক্তার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রোগী আপনার কী হয়?'

'কেউ হয় না। আমরা একই মেসে থাকি।'

'আপনি রোগীর আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'বলেন কী?'

'যান টাকা পয়সা ব্যবস্থা করুন। সকালের মধ্যে যোগাড় হলেও চলবে।আমরা চালিয়ে নেব।'

আমি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'রোগীর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। এই বেচারা অতি সাধারণ একজন মানুষ কোনো মন্ত্রীর আত্মীয় না, কিছু না। তার

সুপারিশ করার কেউ নেই।'

'আপনার নাম কী?'

'হিমু।'

'হিমু সাহেব শুনুন। আমরা সব সময় বলি– সব মানুষ সমান। একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো প্রভেদ নেই। কার্যক্ষেত্রে কখনোই সেরকম দেখা যায়। না। শুধু শেষ সময়ে, মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে সব মানুষ এক হয়ে যায়। শুধু তখনই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাস্তায় ইট ভাঙে যে মেয়ে তার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। এই হাসপাতালের রোগীরা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকেন কাজেই তারা সব সমান। বাইরের মানুষরা বিশ্বাস করুক বা না করুক আমরা সবাইকে একইভাবে দেখি। দেখতে দেখতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন?'

'জি বিশ্বাস করলাম। আমি টাকা নিয়ে আসছি। সকাল হবার আগেই চলে আসব।'

ফরিদা খালা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এত রাতে?'

আমি বললাম, 'কেমন আছ খালা?'

'রাত দুটার সময় "কেমন আছ খালা?" এর মানে কী? তুই সবার সঙ্গে ফাজলামি করিস বলে আমার সঙ্গেও করবি? কলিংবেল শুনে আমার বুক ধ্বক করে উঠেছে — এখনো ধ্বক ধ্বকানি হচ্ছে। এত রাতে কেন এসেছিস? তোর মতলবটা কী?'

'বিল নিতে এসেছি খালা।'

'বিল মানে? কিসের বিল?'

'আশাকে নিয়ে দুদিন ঢাকা শহর দেখলাম। প্রতিদিন এক শ' ডলার করে দু শ'' ডলার। পেমেন্টটা বাংলাদেশী কারেন্সিতে করলে ভালো হয়।'

'অনেক রসিকতা করেছিস। আর করতে হবে না। তুই এক্ষুনি বিদেয় হবি। এই মুহূর্তে। আমার সঙ্গে নাটক করবি না।'

'নাটক করছি না খালা। বিলটা আমার দরকার। তোমার কাছে যদি থাকে তুমি দিয়ে দাও। আর যদি না থাকে আশাকে ডেকে তোল।'

খালা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'রাতে কিছু খাই নি। ভাত খাব। তরকারি না থাকলে একটা ডিম ভেজে দাও। তোমার ঘরে তো সব সময় টাঙ্গাইলের গাওয়া ঘি থাকে। গরম ভাতের উপর ওই ঘি তরকারির চামচে এক চামচ ঢেলে দেবে। ডিম ভাঁজবে। সেই সঙ্গে দুটা শুকনা মরিচ ভাজবে।'

'হিমু শোন, তুই খুবই মতলববাজ ছেলে। মতলব ছাড়া তুই কখনো কিছু করিস না। রাত দুটার সময় এসেছিস । মতলব নিয়েই এসেছিস। এবং আমি যে সেই মতলব একেবারেই টের পাচ্ছি না, তাও না। তোকে তো অনেক দিন ধরেই দেখছি— তোর নাড়ি নক্ষত্র আমি জানি।'

'জানলে বল দেখি আমার মতলব কী?'

'তোর মতলব হচ্ছে আশার সঙ্গে কিছুক্ষণ লটরপটর করা। তার মাথাটা আরো খারাপ করে দেওয়া। মেয়েটাকে হকচাকিয়ে দিতে হবে। রাত দুটার সময় বিলের টাকা চাইলে সে হকচকিয়ে যাবে। ঠিক বলছি না?'

'হু।'

'তুই চলিস পাতায় পাতায়— আমি চলি— শিরায় শিরায়। আমাকে হাইকোর্ট

দেখাবি না। আমি বাস করি হাইকোর্টের ভিতরে।'

'গলা নামিয়ে কথা বল খালা— তুমি সবার ঘুম ভাঙাবে।'

'তুই বাসা থেকে বের হবি কি না সেটা বল।'

'ভাত খেয়ে যাই– ক্ষুধার্ত মানুষকে না খাইয়ে বিদেয় করলে— তুমিই পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হবে। তোমার অনিদ্রা হবে। অনিদ্রা থেকে পেপ্যাটিক আলসার... সেখানে থেকে....'

'চুপ থাক। একটা কথাও না চুপ।'

আমি চুপ করলাম আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশা দরজা ধরে দাঁড়াল। দেখে মনে হচ্ছে সে সেজোগুজে আছে। চুল আঁচড়ানো। গায়ে ইস্ত্রি করা শাড়ি। ইস্ত্রি করা শাড়ি পরে রাত দুটার সময় কেউ বসে থাকে না। ঠোঁটে লিপস্টিকও
থাকার কথা না। আশার ঠোঁটে টকটকে লাল রঙের গাঢ় লিপস্টিক। আশা আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল— "আমার ঘরে আসুন ।"

খালার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'খালা যাব?'

খালা জবাব দিলেন না। চোখ মুখ শক্ত করে তাকিয়ে রইলেন।

আশা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন আসুন।'

খালার মুখ রাগে থমথম করছে। এই রাগ সহজে যাবার না। আমি বললাম, 'খালা তুমি ভাত-ডিমভাজির ব্যবস্থা কর আমি এই ফাঁকে আশার সঙ্গে কথা বলে আসি। পেমেন্টটাও নিয়ে আসি।'

বিদেশিনী মেয়ের ঘর খুব গোছানো থাকবে, সুন্দর করে বিদেশী কায়দায় সাজানো থাকবে। ব্যাপার সেরকম না, আশার শোবার ঘরের খুবই এলোমেলো অবস্থা। খাটের বিছানায় রাজ্যের ম্যাগাজিন। মেঝেতেও বালিস চাদর পাতা। ঘরময় কাপড়াচোপড় পড়ে আছে।

'আপনি যে আজ আসবেন আমি জানতাম।'

'তাই নাকি?'

'সন্ধ্যা সাতটার সময় হঠাৎ মনে হল আপনি আসবেন। আমি আপনার খালাকে বললাম— আজ হিমু সাহেব আসবেন, রাতে খাবেন। আপনি উনার ফেভারিট আইটেম রান্না করুন। আপনার খালা বললেন— ও আসবে তোমাকে কে বলল? আমি বললাম, কেউ বলে নি কিন্তু আমি জানি উনি আসবেন।'

'তোমার মাথা থেকে কি Fruit Flower দূর হয়েছে?'

'না হয় নি— যখন চুপ করে থাকি তখন হয়। যখন কথা বলি তখন থাকে না। এই যে কথা বলছি এখন নেই। কথা বন্ধ করে চুপ করে থাকলেই আবার চলে আসবে। এই জন্যে কথাও বেশি বলছি। আমার কথা শুনে আপনার হয়তো কান ঝালাপালা করছে। কিন্তু উপায় নেই। যখন বেলটা বাজল তখনই বুঝেছি আপনি এসেছেন। বের হতে দেরি করেছি। কেন জানেন?'

'না জানি না।'

'আন্দাজ করুন।'

'আন্দাজও করতে পারছি না।'

'খুব গরম লাগছিল। এইজন্যে পুরোপুরি নগ্ন হয়ে শুয়েছিলাম। আমার এই অভ্যাস আছে। ঘুমুতে যাবার সময় গায়ে কাপড় থাকলে দমবন্ধ লাগে। আমার কথা শুনে আপনি হয়তো আমাকে খুব খারাপ একটা মেয়ে ভাবছেন। ভাবলেও কিছু

করার নেই। আমি যা তাই। বেল শোনার পর কাপড় পারলাম, চুল আঁচড়ালাম। ঠোঁটে লিপস্টিক দিলাম। আপনার কি মনে হচ্ছে। আমি খুব খারাপ টাইপ একটা মেয়ে।'

'না মনে হচ্ছে না।'

'যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে আমার রাতে ঘুমুবার এই অভ্যাস জানলে আমাকে খুবই খারাপ চোখে দেখবে। এই জন্যে আমি কি ঠিক করেছি। জানেন? আমি ঠিক করেছি। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাকে আমি আমার এই অভ্যাসের কথা আগে ভাগেই বলে দেব।'

'এটা তো ভালো।'

'আমি কি কথা বেশি বলছি?'

'সামান্য বেশি বলছি। এটা খারাপ না । তোমার বয়েসী মেয়েরা বেশি কথা না বললে ভালো লাগে না। মনে হয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে।'

'আমি ঠিক করেছি খুব শিগগিরই বিয়ে করব। কেন বিয়ে করব জানেন? বিয়ে করলে যখন-তখন স্বামীর সঙ্গে বক বক করা যাবে। মাথার অসুখটা নিয়ে তখন আর বেশি ভাবতে হবে না। কী ধরনের স্বামী আমার পছন্দ বলি?'

'হ্যাঁ বল।'

'হাইট হবে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। আপনার হাইট-কত?'

'জানি না তো— কখনো মাপি নি।'

'আপনার ধারণা আপনার হাইট পাঁচফুট সাত। আমার কাছে গজ ফিতা আছে। আমি এক্ষুনি মেপে আপনার হাইট বলে দিচ্ছি। আমার স্বামীর চোখ খুব সুন্দর হতে হবে। চোখে স্বপ্ন থাকতে হবে। মায়া থাকতে হবে। আচ্ছা হিমু। সাহেব শুনুন-- কেউ কি আপনাকে বলেছে। আপনার চোখ খুব সুন্দর?'

'না বলে নি।'

'আমি বললাম। পুরুষ মানুষের এত সুন্দর চোখ এর আগে আমি দেখি নি । আমার কথা শুনে কি মনে হচ্ছে। আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি?'

'হু মনে হচ্ছে।'

'আমার অনেক দিন থেকেই ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছিল— আজ আমিও নিশ্চিত হয়েছি যে আমি পাগলের মতো আপনার প্রেমে পড়ে গেছি—। কীভাবে নিশ্চিত হলাম জানেন? আপনাকে দেখার পর থেকে আমার কান্না পাচ্ছে। Strange type কান্না। মনে হচ্ছে সারা শরীরে কান্নাটা ছড়িয়ে আছে। ব্যথার মতো অনুভূতি। ব্যথাটা দলা পাকিয়ে ঢেউ এর মতো গলা পর্যন্ত ওঠে আসছে। সরি অনুভূতিটা আপনাকে বুঝাতে পারছি না।

'আমি বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি যে তোমার শরীরটা খুব খারাপ। মাথার ভেতর ফুল-ফল ঘুরছে, কড়া ঘুমের অষুধ খাচ্ছ— সব মিলিয়ে অবস্থাটা ভালো না। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা তোমার নষ্ট হয়ে গেছে। মাথায় মধ্যে এলোমেলো ব্যাপার চলে এসেছে। এলোমেলো ভাবটা চলে গেলেই তুমি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমাকে দেখে তখন আর কোন ব্যথা দলা পাকিয়ে উপরের দিকে উঠবে না। গজ ফিতা দিয়ে আমার হাইট মাপার ইচ্ছাও করবে না'

‘আপনি মনে হচ্ছে বিরাট জ্ঞানী। জগতের সব জ্ঞান নিয়ে নিয়েছেন। আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাকে দেখানোর দরকার নেই।’

‘রাগ করছ, কেন?’

‘রাগ করছি না। আপনি আপনার পেমেন্ট নিতে এসেছেন নিয়ে চলে যান। আপনার পাওনা কত?’

‘দু’শ ডলার। বাংলাদেশী টাকায় দশ হাজার টাকা। পেমেন্টটা বাংলাদেশী কারেন্সিতে করলে ভালো হয়।’

‘আপনি আপনার খালার কাছে গিয়ে বসুন। আমি টাকা নিয়ে আসছি।’

‘থ্যাংক য়্যু।’

‘আমার ধারণা এত টাকা ঘরে নেই। ব্যাংক না খুললে দিতে পারব না। আপনি কি আগামীকাল ব্যাংক আউয়ারের পরে এসে টাকাটা নিতে পারেন?’

‘আমার টাকাটা এখনি দরকার।’

‘আপনি ড্রয়িং রুমে বসুন। দেখি কী করা যায়।’

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে রাত তিনটা বেজে গেল! জয়নাল সাহেবকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। দর্শনার্থীদের সেই ঘরে প্রবেশ নিষেধ। মহিলা ডাক্তারের দয়ায় সেখানে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। জয়নাল সাহেব চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন। তাঁর শরীরে নানা রকম তার লাগানো। মনিটরে কী সব দেখা যাচ্ছে । পিপ পিপ শব্দ হচ্ছে। আমি জয়নাল সাহেবের কপালে হাত রাখতেই তিনি জেগে উঠলেন। চোখ মেলে ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘হিমু ভাই আপনাকে বিরাট তকলিফ দিলাম। আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। দয়া করে ক্ষমা করুন।’

‘ক্ষমা করলাম। আপনার মনে হয় কথা বলা নিষেধ। কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি বরং কিছুক্ষণ আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। আপনার কাছে শেখা বিদ্যা কাজে লাগাই।’

জয়নাল সাহেব আমার হাত ধরে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, আমার কথা বলা নিষেধ আমি জানি । কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে গেছে ! কথা বলার সুযোগ আর পাব না।’

‘সময় শেষ কে বলল?’

‘কেউ বলে নাই। এইসব জিনিস বোঝা যায়। যতবার চোখ বন্ধ হয়ে আসে আমি আমার মৃত আত্মীয়স্বজনদের দেখি। এরা বিছানার চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। এরা আমাকে নিতে এসেছে। এখনো বসে আছে- আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি আবছা আবছা দেখছি।’

‘ও।’

‘আমার বাবার পাশে আমার বড় মা বসে আছেন। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আমার বাবা দুই বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের দুই মাসের মাথায় তার প্রথম স্ত্রী মারা যায়। উনাকে আমি কখনো দেখি নি । কিন্তু আজ বাবার পাশে দেখেই চিনেছি। আমার নিজের মা বসে আছেন উলটো দিকে।’

‘আপনি কি দয়া করে কথা বলা বন্ধ করবেন?’

‘হিমু ভাই কয়েকটা জরুরি কথা আপনাকে বলব। না বললে আর বলা হবে না। যদি ইজাজত দেন।’

‘বলুন।’

'আমার মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। তাকে একটা কথা বললে মনটা শান্ত হত।'

'কী কথা?'

'বেচারী নিশ্চয়ই ধারণা করে আছে তার বাবা ভয়ঙ্কর একটা মানুষ। তার মা'র মুখে এসিড মারার জন্যে এসিড কিনে লুকিয়ে রেখেছিল। আমার সম্পর্কে এত বড় একটা খারাপ ধারণা তার থাকবে ভাবলেই অস্থির লাগে। মেয়েটাকে যদি বলতে পারতাম- সমস্ত ঘটনা সাজানো। মন শান্ত হত।'

'মেয়েটাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললে অন্য একটা সমস্যা হবে। মেয়েটা সারাজীবন তার মা'র সম্পর্কে ভয়ঙ্কর খারাপ ধারণা নিয়ে থাকবে। এটা কি ঠিক হবে?'

জয়নাল সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'না ভাই সাহেব এটাও ঠিক হবে না। বাবার সম্পর্কে খারাপ ধারণা থাকলে তেমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু মা'র সম্পর্কে খারাপ ধারণা থাকলে কোনো ছেলে মেয়ে বড় হতে পারে না। আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ধরে দিয়েছেন। এই জন্যেই আপনাকে এত পছন্দ করি। লোকে যে বলে— আপনার পাওয়ার আছে। এটা ঠিক। আসলেই আপনার পাওয়ার আছে।'

'আপনি ঘুমান আমি চলে যাই। আমি থাকলে আপনি ঘুমুতে পারবেন না।'

'ভাই সাহেব।'

'জি।'

'একটা শেষ কথা বলি মনে কিছু নিবেন না।'

'বলুন।'

'আপনার পাওয়ার আছে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা দিয়ে আপনি মেয়েটার সঙ্গে আমার শেষ দেখা করিয়ে দিন। বয়সে আমি আপনার অনেক বড় তবুও করজোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি।'

'ভাই আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমার একমাত্র ক্ষমতা হল খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটা। বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া।'

'হিমু ভাই আমি জানি আপনি ইচ্ছা করলেই পারবেন। হাত জোড় করছি ভাই সাহেব। মৃত্যুপথ যাত্রীর শেষ অনুরোধ।'

জয়নাল সাহেবের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। তিনি হাত জোড় করে আছেন।

একটা মিথ্যা আশ্বাস কি জয়নাল সাহেবকে দেব? সেটা কি ঠিক হবে? আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে কিছু কঠিন উপদেশ লিখিতভাবে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মিথ্যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

> হে আমার প্রিয় পুত্র, মিথ্যার কিছু কিছু উপকার আছে। কিছু মিথ্যা সমাজের এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ভূমিকা নেয়। কিন্তু মিথ্যা মিথ্যাই। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার। তোমার যাত্রা আলোর দিকে। মিথ্যা ছলনাময়ী নানান ছলনায় তোমাকে ভুলাইবে। তুমি ভুলিও না। কখনো না, কোন অবস্থাতেই না । ইহা আমার আদেশ।'

##

ভোর চারটার মেসে ফিরে দেখি— আবুল কালাম সাহেব আমার ঘরে বাসা। চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। মনে হচ্ছে মানুষ না কাপড়ের পুঁটলি। কতক্ষণ ধরে বসে আছেন কে জানে। মানুষটা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত লাগছে। গলায় ফুলের মালা নেই। ফুলের মালা পাঞ্জাবির পকেটে রাখা হয়েছে। মালার একটা অংশ পকেটের বাইরে। গাদা ফুলের জীবনী শক্তি ভালো। এতক্ষণেও ফুল চুপসে যায় নি। আমি হালকা গলায় বললাম, কালাম সাহেবের খবর কী?

কালাম সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'খবর ভালো না। খবর অত্যধিক খারাপ।

'শরীর খারাপ?'

'জি শরীর খারাপ, মন খারাপ, ভাগ্য খারাপ। আমার সবই খারাপ।'

'আপনি চাঁদপুরে যান নি?'

'না।'

'যান নি কেন?'

'জানি না কেন যাই নি। লঞ্চ টার্মিনেল পর্যন্ত গিয়ে ফেরত এসেছি। ঘণ্টা খানিক শহরে খামাখা ঘুরেছি। তারপর আপনার ঘরে এসে বসে আছি। সারারাত আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এক রোগী নিয়ে ছোটাছুটি করেছি।'

'আমি যে আপনার এই চেয়ারটায় বসে আছি, বসেই আছি। চেয়ারে বসেই ঘুমায়েছি। ভাগ্য ভালো আপনার ঘর সব সময় খোলা থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে ঘরে ঢুকতে পারতাম না।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'না। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে— এই জন্যে ঘর থেকে বের হইনি। মারাত্মক পিসাব ধরেছে। পিসাব করতেও যাই নি।'

'এখন যেতে পারেন। কেউ দেখবে না। ভোর চারটায় চোর পর্যন্ত ঘুমায়। তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে চলে যান ।'

কালাম সাহেব নড়লেন না। যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে রইলেন । বরং আরো গুটিসুটি মেরে গেলেন। আমি বললাম, 'বাথরুম সেরে আসুন, কোন একটা চায়ের দোকানে বসে গরম পরোটা চায়ে চুবিয়ে খাই। আমারো ক্ষিধে লেগেছে।'

'এত ভোরে চায়ের দোকান খুলবে?'

'গনি মিয়ার চায়ের দোকান আছে। সারারাতই খোলা থাকে।'

'চলুন যাই।'

চলুন যাই বলেও কালাম সাহেব বসে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনার সমস্যাটা কি বলুন তো?'

'কোন সমস্যা নাই।'

'আমার ধারণা। আপনি দুই লাখ টাকাটা ফিরত দিতে চান। এবং আপনি টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ধারণাটা কি ঠিক?'

'জি ধারণা ঠিক।'

'টাকা সঙ্গে আছে?'

'আছে। তিন শ' টাকা শুধু খরচ করেছি।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'চলুন চা খাবার পর আপনাকে থানায় দিয়ে আসি। টাকাটাও ওসি সাহেবের কাছে জমা রাখি।'

'আপনি যা ভালো মনে করেন। টাকাটা আমি কেন ফেরত দিচ্ছি জানতে চান হিমু ভাই?'

'না।'

'জানতে চাইলেও বলতে পারতাম না । আমি নিজেও জানি না। এই কাজটা কেন করলাম। ওসি সাহেব। আবার মারধোর করেন। কিনা কে জানে। মনে হয় করবে না। টাকা পেয়ে গেছে এখন আর মেরে কি হবে?'

'তিন শ' টাকা কম আছে এই জন্যে মারতে পারে। মারতে চাইলে অজুহাত তৈরি করতে কতক্ষণ। ঈশপের ওই গল্পটা জানেন না— এক ছাগলের বাচ্চা পানি খাচ্ছিল। সিংহ এসে বলল, কিরে চেংড়া হারামজাদা। তুই পানি নোংরা। করছিস কোন সাহসে। আবার দাড়িও নাড়ছিস। তোর সাহস তো কম না।'

'গল্পটা জানি না।'

'না জানলেও ক্ষতি নেই। এই যুগে ঈশপের গল্প অচল। উঠুন তো— চেয়ারে যেভাবে বসে আছেন মনে হচ্ছে শিকড় গজিয়ে গিয়েছে।'

কালাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'ফুলের মালাটা গলায় পরে নিন। মালা পরিয়ে হাজত থেকে বের করেছি— আবার মালা পরিয়েই হাজতে ঢুকিয়ে দেব। গুনগুন করে গানও গাইতে পারেন— মালা পরা ছিল মোদের এই মালা পরা ছল। মালা পরেই মালা মোরা করবে যে বিকল । গানটা জানেন?"'

'জি না।'

ওসি সাহেব তাকিয়ে আছেন কিছু বলছেন না। তিনি যে বিস্মিত হয়েছেন সে রকমও মনে হচ্ছে না। ভাবলেশ হীন দৃষ্টি। এমনভাবে বসে আছেন যেন তিনি জানেন আমি কামাল সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হব। আমি বললাম, 'স্যার টাকাটা গুনে নিন। দুই লাখের চেয়ে তিন শ' কম আছে। তিন শ' টাকা আপনার আসামি খরচ করে ফেলেছেন। কোন কোন খাতে খরচ করেছেন সেটাও লেখা আছে। এই যে স্যার খরচের ভাউচার।'

পেন্সিলে লেখা ভাউচারটায় ওসি সাহেব চোখ বুলালেন। কালাম সাহেব সব বেশ গুছিয়েই লিখেছেন।

জমা দুই লক্ষ টাকা মাত্র।

খরচ

বিরিয়ানি ফুল প্লেট	৪০ টাকা
হাফ খাসির রেজালা	২০ টাকা
দুই প্যাকেট সিগারেট	১০০ টাকা
দই-মিষ্টি	৩০ টাকা
বেবি টেক্সি ভাড়া	৪০ টাকা
রিকশা ভাড়া	৬০ টাকা
মোট খরচ	৩০০ টাকা

ব্যালেন্স এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত টাকা মাত্র।

পুলিশের লোক চোখের ইশারায় খুব ভালো কথা বলতে পারে। ওসি সাহেব মুখে

কিছু বললেন না, চোখে ইশারা করলেন এতেই কাজ হল। একজন এসে টাকা গুনতে শুরু করল। অন্য আরেকজন কালাম সাহেবকে নিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দিল।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ‘স্যার আমি যাই।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘যাবেন কোথায় বসুন। টাকা জমা দিয়েছেন। রশিদ নিয়ে যান। চা খাবেন?’

‘জি না।’

‘সিগারেট?’

‘জি না।’

ওসি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, ‘আপনি কি মিথ্যা কথা বলেন?’

আমি বললাম, ‘বলি।’

ওসি সাহেব স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘যাক বাঁচা গেল। যারা সব সময় সত্যি কথা বলে— আমরা পুলিশরা তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকি। দু' ধরনের মানুষ সব সময় সত্যি কথা বলে— সাধু সন্ত মানুষ। আর ভয়ঙ্কর যারা ক্রিমিনাল। মাঝখানের মানুষরা সত্যমিথ্যা মিশিয়ে বলে। এদেরকে নিয়ে পুলিশ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না।’

টাকা গুনা শেষ হয়েছে। ওসি সাহেব আমাকে রশিদ দিলেন। আমি বললাম, ‘স্যার যাই।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘না। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি। অসুবিধা আছে?’

‘জি না।’

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন– ‘আবুল কামালের গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে বের করে আপনি নিয়ে গেলেন— সেই দৃশ্য কি মনে আছে?’

‘জি স্যার আছে।’

‘সেদিন সঙ্গত কারণেই আপনাকে অত্যন্ত সন্দেহজনক মানুষ বলে আমার মনে হয়েছিল।’

‘মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমি সন্দেহজনক মানুষ তো বটেই।’

‘আমি তৎক্ষণাৎ আপনার পেছনে প্লেইন ক্লথ পুলিশ লাগিয়ে দিলাম। যাতে সে আপনার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে। তার দায়িত্ব ছিল আপনার প্রতিটি মুভমেন্ট ফলো করা।’

‘আপনার কথা শুনে নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে স্যার।’

‘আমরা জানি আপনি কি কি করেছেন। এম্বুলেন্স ডেকেছেন। রোগী নিয়ে হাসপাতালে গেছেন। রাত দুটায় ধানমন্ডির এক বাসায় গেছেন। আবার হাসপাতালে গেছেন। ভোর সাতটায় গনিমিয়া টি স্টলে নাশতা খেয়েছেন। আমি সবই জানি।’

‘আপনি তো স্যার মোটামুটি ইশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছেন। ইশ্বর যেমন সব জানেন, আপনিও সব জানেন।’

‘আমি বাইরের কর্মকাণ্ড জানি। আপনার মনের ভেতর কি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে সেটা জানি না।’

‘সেটা স্যার আমিও জানি না।’

‘আপনার রোগীর কি অবস্থা সেটা জানেন?’

‘জি না।’

‘রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আমি ভোরবেলা খবর নিয়েছি। রাত সাড়ে তিনটার

সময় হার্ট থেমে গিয়েছিল। ডাক্তাররা ইলেকট্রিকাশক দিয়ে চালু করেছেন।'

'ও।'

'রোগী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি নাকি তাকে কথা দিয়েছেন তার মেয়েকে এনে দেবেন। তিনি মেয়েকে দেখতে চান। মেয়েটা কোথায় থাকে বলুন-আমি আনিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ ফোর্স চলে যাবে। প্রয়োজনে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে।'

'মেয়েটা থাকে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'বলেন কী। এই মেয়েকে আপনি আনাবেন কীভাবে?'

আমি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'দেখি চেষ্টা করে। স্যার আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করি?'

ওসি সাহেব টেলিফোন এগিয়ে দিলেন। আমি আশাকে টেলিফোন করলাম।

'আশা তুমি কি আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করবে? তোমার মাথায় ফুল-ফল ঘুরছে। তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। এই কাজটা করলে তোমার মাথা থেকে ফুল দূর হয়ে যাবে।'

'আপনিতো শুধু জ্ঞানী না। আপনি একজন ডাক্তারও? হাউ ফানি।'

'কারো যখন খুব ঘনঘন হেঁচকি উঠতে থাকে তখন ভয়ঙ্কর কিছু করলে হেঁচকি থেমে যায়। তুমি যদি ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার সামনে দাঁড়াও তোমার হেঁচকি থেমে যাবে।'

'কী করতে হবে। আমাকে?'

'অভিনয় করতে হবে। মৃত্যুপথ যাত্রী এক বৃদ্ধের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

'আমার সঙ্গে খেলা করবেন না। প্লিজ ডোন্ট প্লে গেমস উইথ মি।'

'আমি খেলা খেলছি না। অভিনয় অংশে তোমার নাম অহনা।'

'প্লিজ স্টপ ইট।'

'নাটকে তোমার বাবার নাম জয়নাল। এই জয়নাল তার মেয়েকে দুবছর বয়সে শেষ দেখা দেখেছে। এখন মেয়ের বয়স আঠারো। মেয়ের বাবা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মৃত্যুর সময় মেয়ের স্নেহময় মুখ দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

'এই মিথ্যার মানে কী?'

'কোনো মানে নেই। আবার হয়তো মানে আছে। আশা তুমি চলে এসো। সোহরাওয়ার্দি হৃদরোগ হাসপাতাল। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। যার নাম আশা সে যদি আশাহীন মানুষের মনে আশা না জাগায় কে জাগাবে? তুমি কি আসবে?'

ওসি সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'মেয়েটা কী বললঃ আসবে?'

আমি বললাম, 'বলেছে আসবে না। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে। আসবে।'

'আপনি কি এখন হাসপাতালে যাচ্ছেন?'

'জি।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

##

নকল দৃশ্য। বানানো, মিথ্যা। কিন্তু দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না। আশা গভীর করছে। যে কোনো মুহূর্তে চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়বে। মন বড় টলমল করছে।

জয়নাল সাহেব বিড়বিড় কথা বলছেন। যে গাঢ় মমতা নিয়ে তিনি কথা বলছেন- এত মমতায় এর আগে কি কোনো পিতা তাঁর কন্যার সঙ্গে কথা বলেছে?

'মাগো তুমি যে আসবা আমি জানতাম। হিমু ভাইকে যখন হাতজোড় করে বললাম আমার মেয়েটাকে এনে দেন। হিমু ভাই, হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। কিন্তু আমি বুঝেছি— কাজ হয়েছে। হিমু ভাই আমার মেয়েকে এনে উপস্থিত করবে।'

আশা ফিসফিস করে বলল, 'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, প্লিজ কথা বলবেন না।'

জয়নাল সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'মাগো আমার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, শরীর জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু কী শান্তি যে পাইতেছি এটা একমাত্র আমি জানি আর আল্লাহ পাক জানেন। মা শোনা আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি চলে যাব । যাবার আগে তোমার জন্যে দেয়া করে গেলাম— খাস দিলে দোয়া করলাম।'

'ধন্যবাদ।'

'মাগো শোন, মানুষ তো ফেরেশতা না। মানুষ ভুল করে। আমি ভুল করতে পারি। আবার তোমার মা-ও ভুল করতে পারে। ভুলগুলো মনে রাখবা না।'

'জি আচ্ছা।'

'তোমার চেহারাও তোমার মা'র মতো। সেই নাক সেই চোখ। চুল কটা। তোমার মা'র চুলও ছিল কটা। বড় সুন্দর মা। মাগো তুমি নানান দেশ বিদেশ ঘুরবে—

'উঁচু কপালী চিড়ল দাঁতি
পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ'

কোন একটা সমস্যা মনে হয় হয়েছে। ডাক্তার নার্সরা ছোটাছুটি শুরু করেছেন। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে আশা।

আমি ওসি সাহেবকে নিয়ে বাইরে চলে এলাম। ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি পানি। তিনি চাপা গলায় বললেন- 'খুবই কষ্ট পেলাম। খাকি পোশাক পরে চোখের পানি ফেলা যায় না। খাকি পোশাকের এতে অপমান হয়। কিন্তু চোখেরও পানি আটকাতে পারলাম না। সরি।'

অনেকদিন পর আজ আবার বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভরতি হয়ে যাচ্ছে ঘন কালো মেঘে। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম--- 'ওসি সাহেব বৃষ্টিতে কবে শেশবার ভিজেছেন বলুন তো?'

ওসি সাহেব রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললেন– ‘খুব ছোটবেলায় ভিজেছি।’

‘আজ চলুন তো আমার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবেন। নাকি খাকি পোশাক পরে বৃষ্টিতে ভিজলে পোশাকের অপমান হবে?’

‘না অপমান হবে না।’

আমরা দুজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগোচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। লোকজন অবাক হয়ে দেখছে। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে খাকি পোশাক পরা কেউ এভাবে বৃষ্টিতে ভেজে না।

‘ওসি সাহেব!’

‘জি।’

‘বর্ষার কোনো গান কী আপনার জানা আছে।’

‘আমি গান জানি না ভাই! আমার স্ত্রী জানে। ওর গলা খুবই সুন্দর। একদিন যদি আসেন ওর গান শুনিয়ে দেব।’

‘আপনার স্ত্রী বর্ষার কোনো গান করেন না? উনার কাছে শুনেছেন এমন একটা গান গুনগুন করে ধরুন।’

ওসি সাহেব গান ধরলেন—

এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এসো করো স্নান নব্যধারা জলে।।

(সমাপ্ত)

SUVOM
SUVOM
চলে যায় বসন্তের দিন
হুমায়ূন আহমেদ

“চলে যায় বসন্তের দিন!”

কী অদ্ভুত কথা! বসন্তের দিন কেন চলে যাবে ? কোনো কিছুই তো চলে যায় না। এক বসন্ত যায়, আরেক বসন্ত আসে। স্বপ্ন চলে যায়, আবারো ফিরে আসে।

আমি হিমু!

আমি কেন বলব— ‘চলে যায় বসন্তের দিন'। আমার মধ্যে কি কোনো সমস্যা হয়েছে ?

কী সেই সমস্যা?

চ লে যা য় ব স ন্তে র দি ন

প্রসঙ্গ : হিমু।

অহঙ্কার প্রকাশ পায় এমন কিছু লেখার ব্যাপারে আমি বেশ সচেতন। খুব চেষ্টা করি কেউ যেন আমার ভেতরের অহঙ্কার বুঝতে না পারে। এই যুক্তিতে, যে-ঘটনাটি আমি এখন বলব তা বলা উচিত না। ঘটনাটির মধ্যে সূক্ষ্ম এবং স্থুল— দুই রীতিতেই অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তবু বলে ফেলছি।

দু’বছর আগে আমি কোলকাতা বইমেলায় গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মাত্র ঢুকেছি, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ছেলে পা ছুয়ে প্রণাম করে বলল, ‘দাদা, আমি হিমু। দেখুন। আমার পাঞ্জাবি– হলুদ।’ আমি বললাম, ‘হিমুরা তো খালি পায়ে হাঁটাহাটি করে। দেখি তোমার পা।’’ সে সবগুলি দাঁত বের করে তার খালি পা দেখাল ।

নিজের দেশে অনেক হিমুর দেখা পেয়েছি। বিদেশে এই প্রথম খাঁটি হিমু দেখলাম। আমার ত্রিশ বছর লেখালেখির ফসল যদি হয় কিছু হিমু তৈরি করা— তাহলে তাই সই। আমি এতেই খুশি । পরম করুণাময় আমাকে যথেষ্টই করুণা করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর
১০.০১.২০০২

১

হিমু,

আমি মহাবিপদে পড়েছি। তুই আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বিনিময়ে যা চাইবি তাই দেব। আমার অতি গুণধর পুত্র মনে হয়৷ কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। ভাড়া খাটা টাইপ একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। মুখে অবশ্যি এখনো কিছু বলছে না। আমি গন্ধে গন্ধে বুঝে ফেলেছি। আমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মেয়েটার নাম ফুলফুলিয়া। যে মেয়ের নাম ফুলফুলিয়া সে কেমন মেয়ে বুঝতেই তো পারছিস। ঘটনা এখানেই শেষ না। ঐ হারামজাদি মেয়ের বাবা কী করে জানিস? সে হারমোনিয়াম বাদক। যাত্রাদলে হারমোনিয়াম আরো কী সব নাকি বাজায়। তুই চিন্তা করে দেখ ছেলের বাবা কেবিনেট সেক্রেটারি। আর শ্বশুর হারমোনিয়াম বাদক। হিমু যেভাবেই হোক জহিরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনতে হবে। ঐ হারামজাদিকে দূরে কোথাও বিয়ে দিয়ে বিদায় করার ব্যবস্থা কর । যাবতীয় খরচ আমি দেব। প্রয়োজনে হারামজাদিকে গয়নাও কিনে দেব।

তোর দোহাই লাগে ঘটনা কাউকে বলবি না। চিঠি পাওয়া মাত্র আমার কাছে চলে আসবি। দুজনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব। তোর খালু সাহেব এখনো কিছু জানে না। তাকে ইচ্ছা করে কিছু জানাই নি। এতবড় শক সে নিতে পারবে না। ধুম করে এটাক ফেটাক হয়ে যাবে। একবার এটাক হয়েছে। দ্বিতীয়বার হলে আর দেখতে হবে না। হিমু, তুই আমাকে বাঁচা।

ইতি
তোর মাজেদা খালা।

এক পৃষ্ঠার চিঠি। চিঠির সঙ্গে পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট স্ট্রেপল করা। এটা হলো মাজেদা খালার স্টাইল। তিনি কাউকে চিঠি দিয়েছেন সঙ্গে টাকা স্ট্রেপল করা নেই এমন কখনো হয় নি। চিঠির সঙ্গে টাকা দেয়ার পেছনে একটা গল্প আছে। খুব ছোটবেলায় মাজেদা খালার বড় মামা তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির সঙ্গে ছিল একটা চকচকে দশ টাকার নোট । জীবনের প্রথম চিঠি, সেই সঙ্গে টাকা। খালার মাথার ভেতরে ব্যাপারটা ঢুকে গেল। তখন থেকেই তিনি ঠিক করেছেন- যখনই কাউকে চিঠি লিখবেন সঙ্গে টাকা থাকবে। শৈশবের প্রতিজ্ঞা কৈশোর পর্যন্ত গড়ায় না। মাজেদা খালা ব্যতিক্রম। তিনি এখনো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছেন। শুরুতে দশ টাকা, বিশ-টাকা দিতেন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ বেড়েছে। এখন চিঠি প্রতি পাঁচশ টাকা ।

মাজেদা খালার চিঠিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ার কোনো কারণ নেই। দড়ি দেখলেই যারা সাপ মনে করে তিনি তাদের চেয়েও দুই ডিগ্রি ওপরে— যেকোনো লম্বা

সাইজের জিনিস দেখলেই তিনি সাপ মনে করেন। কাছে গিয়ে দেখবেনও না- সাপ কি-না। দূর থেকেই চিৎকার চোঁচামেচি- ওমাগো, দোতলায় সাপ এলো কীভাবে ?

আমি নিশ্চিত জহিরকে নিয়ে তিনি যে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন তা পুরোপুরি অর্থহীন। জহির অতি ভালো ছেলে। সে যে কত ভালো তা একটা অতি' ব্যবহার করে বুঝানো যাবে না। খুব কম করে হলেও তিনটা অতি ব্যবহার করতে হবে- অতি অতি অতি ভালো ছেলে। সে ফিজিক্সে অনার্স পড়ছে। দুর্দান্ত ছাত্র। পাশ করেই ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে লেকচারারের চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু তার জীবনের স্বপ্ন সে একটা কফির দোকান দেবে। আধুনিক কফিশপ। জীবন কাটাবে কফি বিক্রি করে। কারণ কফির গন্ধ তার ভালো লাগে । কফি হাউসে লোকজন আনন্দ করে কফি খেতে খেতে গল্প করে- এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে এবং তার নিজেরও কফি খেতে ভালো লাগে। সে কফি হাউসের নামও ঠিক করে রেখেছে— 'শুধুই কফিতা'।

জহিরের ধারণা ফ এবং বা খুব কাছাকাছি। "শুধুই কফিতা" আসলে "শুধুই কবিতা"। নিতান্তই ভালোমানুষ টাইপ লোকজনের মাথাতেই এ রকম আইডিয়া আসে। জহির সরল ধরনের ভালোমানুষ। পৃথিবীতে বক্র ধরনের ভালোমানুষও আছে। বক্র ভালোমানুষরা ভালো। তবে তাদের চিন্তা-ভাবনা বক্র। জহির সেরকম না। ফুলফুলিয়া নামের কোনো মেয়ের সঙ্গে তার যদি ভাব হয়েও থাকে জহিরের ভালো মানুষীর জন্যেই হয়েছে। একজন ভালো মানুষ অন্য একজন ভালোমানুষকে খুঁজে বের করে। একটা চোর খুঁজে বের করে আরেকটা চোরকে। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলে দেখা যাবে সেও চমৎকার একটি মেয়ে। জহিরের "শুধুই কফিতা" কফিশপে কফি বানানোর জন্যে ছটফট করছে।

কাস্টমারকে নিজেই ছুটে গিয়ে কফি দিচ্ছে। আদুরে গলায় বলছে— কফি কেমন হয়েছে খেয়ে বলুন তো ? ভালো হলে কিন্তু আরেক মগ খেতে হবে।

মাজেদা খালার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে না, ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে কৌতুহলী হয়েই খালার ধানমণ্ডির বাসায় গেলাম। খালু সাহেব আমাকে দেখে প্রথম কিছুক্ষণ এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যেন চিনতে পারছেন না। তারপর শুকনো গলায় বললেন, কী ব্যাপার ?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না, আপনাদের দেখতে এসেছি।

খালু সাহেব 'ও' বলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনে মুখ ঢেকে ফেললেন। খালু সাহেব আমাকে সহ্যই করতে পারেন না। মাজেদা খালা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, তোর খালুর সামনে ঐ প্রসঙ্গ তুলবি না।

আমি বললাম, Ok.

খালা বললেন, জহিরের কাছ থেকে কায়দা করে ব্যাপারটা আগে জেনে নে। আমি যে ঘটনা জানি এটা যেন জহির টের না পায় ।

আমি আবারো বললাম, Ok.

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, Ok Ok করিস না তো। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ব্যাপারটা হাসি তামাশা হিসেবে নিচ্ছিস । মোটেই হাসি তামাশা না।

অবশ্যই হাসি তামাশা না। জহির কোথায় ? এক্ষুণি সাঁড়াশি দিয়ে জহিরের পেট থেকে সব কথা বের করে ফেলব। শুরু হবে সাঁড়াশি আক্রমণ ।

খালা বললেন, আজ রাতে তুই আমার বাড়িতে থাকবি।

আমি বললাম, কথা বের করে তোমাকে দিয়ে যাই। থাকার দরকার কী ?
থাকলে সমস্যা কী ?
বড়লোকের বাড়িতে আমার ঘুম হয় না খালা।
কমুনিস্টদের মতো কথা বলবি না। তুই কমুনিষ্ট না। তুই হিমু। তোকে যেখানে ঘুমুতে বলা হবে তুই সেখানেই ঘুমাবি। রাতে কী খাবি ?
যা খাওয়াবে তাই খাব ।
নতুন একটা বাবুর্চি রেখেছি, খুব ভালো মোগলাই রাধে। তোর কপাল খারাপ বাবুর্চি ছুটিতে আছে। অসুবিধা নেই পোলাও খা । পোলাও আর ঝাল মুরগির ঝোল, হবে না ? ফ্রিজে ইলিশ মাছ আছে, ইলিশ মাছ ভেজে দিতে বলব ।
আচ্ছা ।
গ্রামের বাড়ি থেকে সরবাটা ঘি এনেছি। খেয়ে দেখ ঘি কাকে বলে।
ঠিক আছে, খাব সরবাটা ঘি।
মাজেদা খালা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঘর ভরতি খাবার। কেউ খায় না।
খায় না কেন ?
তোর খালুর ডিসপেপসিয়া হয়েছে— কিছুই হজম হয় না। পানি খেলেও নাকি টক ঢেকুর উঠে। আর জহিরও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। গত এক মাস ধরে শুধু ডাল ভাত খাচ্ছে। ঐ দিন বলল শুকনা মরিচ। আর রসুন পিষে ভর্তা বানিয়ে দিলে ভর্তা দিয়ে খাবে। আর কিছু খাবে না।
বলো কী ?
খালা হতাশ গলায় বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুলফুলিয়া মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হবার পর জহির এই প্যাখনা করছে। ঐ মেয়ে যেহেতু শুকনা মরিচের ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছে, এর বেশি কিছু খাবার মুরাদ নাই কাজেই জহিরকেও তাই খেতে হবে।
তাহলে তো ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। তুমি চিন্তা করো না। আমি টেককেয়ার করছি। হয় জহিরের স্ক্রু টাইট দিয়ে দেব আর নয়তো নাট খুলে স্ক্রু বের করে নিয়ে আসব।
তুই একটা কাজ করবি ?
অবশ্যই করব। কাজ করে ভাত খাব। ফুড ফর ওয়ার্ক।
একটা ডিজিটাল রেকর্ডার পকেটে করে নিয়ে যা। জহিরের সঙ্গে কথাবার্তা যা হবে রেকর্ড করে ফেলবি।
মা হয়ে ছেলের গোপন কথা রেকর্ড করা ঠিক হবে ?
অবশ্যই ঠিক হবে। মা ছেলের ভবিষ্যৎ দেখবে না ? সে মাতারির সঙ্গে প্রেম করবে। আমি আটকাব না ?
তাহলে দাও তোমার ডিজিটাল রেকর্ডার।
আসল কথা যখন শুরু হবে তখন কায়দা করে রেড বাটন পুশ করবি। পনেরো মিনিট রেকর্ড হবে।
আমি গলা নামিয়ে বললাম, নিজেকে কেমন যেন স্পাই স্পাই লাগছে। খালু সাহেবের তো একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। পিস্তলটিও দাও । পকেটে করে নিয়ে যাই। স্পাই যখন হয়েছি পুরোপুরি হই। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দাও । স্পাইদের সঙ্গে ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে।
ফাজলামি করিস না হিমু। তোকে ফাজলামি করার জন্যে ডাকি নি। তোর সব

ভালো ফাজলামিটা ভালো না। তুই তোর খালুর সঙ্গে গল্প কর, আমি ডিজিটাল রেকর্ডারটা রেডি করে দেই। ব্যাটারি। আনতে হবে। ব্যাটারি নেই।

আমি খালু সাহেবের (রহমতউল্লাহ তালুকদার) সামনে বসে আছি। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারের ন্যাশনাল জিওগ্রাফি থেকে চোখ তুলছেন না। তিনি হাঁটুর উপর পা তুলে দিয়েছেন। পায়ের পাতা নাড়ছেন। পাশে বসে থাকা মানুষকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা । চেষ্টা সফল হচ্ছে না। আমি বরং তার কর্মকাণ্ডে মজা পাচ্ছি। আমি তাকিয়ে আছি টিভির দিকে। টিভিতে সিএনএন চলছে। শব্দহীন টিভি। খালু সাহেব ইদানীং শব্দহীন টিভি দেখেন।

হিমু।

জ্বি।

খালু সাহেব ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। তার ভুরু কুঁচকে আছে। নাকও খানিকটা কুঞ্চিত। গরম মাড়ে ছাল পুড়ে ঘা হয়ে যাওয়া নেড়ি কুত্তার দিকে মানুষ এইভাবেই তাকায়।

কী করছি আজকাল ?

কিছু করছি না।

"কিছু করছি না" বাক্যটা যেভাবে বললে তাতে মনে হচ্ছে কিছু না করাটা খুব মহৎ কিছু।

খারাপ কিছু করার চেয়ে কিছু না করা তো অবশ্যই মহৎ। চুরি-ডাকাতি তো ......

আমার সঙ্গে বাজে তর্ক করবে না ।

জ্বি আচ্ছা।

ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার কোনোই বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমি অকর্মণ্য অলস মানুষ সারাজীবন অপছন্দ করেছি, আমৃত্যু করব বলে ধারণা। তুমি যদি কিছু মনে না কর, অন্য কোথাও গিয়ে বস। তুমি আমার পাশে বসে আছ বলেই পড়ায় মন দিতে পারছি না। কিছু মনে করছ না তো ?

জ্বি না কিছু মনে করছি না।

আমি নিশ্চিত তুমি আমার কথায় হার্ট হয়েছ। তোমাকে হার্ট করার জন্যে কথাগুলি বলি নি । আমার নিজের ছেলে জহির যদি তোমার মতো জীবন যাপন করত। তাকেও আমি আমার পাশে বসতে দিতাম না।

খালু সাহেব। আবারো ম্যাগাজিন পাঠে মন দিলেন। এই পরিস্থিতিতে নিঃশব্দে উঠে অন্য কোথাও সরে যাওয়া উচিত। সেটি করছি না। মানুষটাকে আরেকটু রাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। রেগে তিনি তেতে থাকবেন, কিন্তু ভদ্রতা ও রুচিবোধের কারণে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে নিচু গলায় প্রায় হাসিমুখে— এই দৃশ্যটি দেখতে ভালো লাগে। আদ্রতা এবং রুচিবোধ থাকারও বিপদ আছে।

আমি এখন জহিরের ঘরে। জহির হাত-পা সোজা করে বিছানায় লম্বা হয়ে হয়ে ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। এক বছর পর জহিরের সঙ্গে দেখা। মানুষের বয়স বাড়ে, এই ছেলের মনে হয় বয়স কমছে। চেহারায় বালক বালক ভাব এসে গেছে। ঘুমন্ত জহিরকে দেখে মনে হচ্ছে তার স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। সে রাত জেগে পড়ছে। মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়েছিল, ভেবে রেখেছিল রেস্ট নিয়ে আবার পড়া শুরু করবে। রেস্ট নিতে নিতে ঘুম এসে গেছে। আমি ডাকলাম, এই জহির! এই!

জহির স্প্রিং-এর পুতুলের মতো উঠে বসল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রোবট টাইপ গলায় বলল, হিমু ভাইজান কটা বাজে ?

আমি বললাম, সাড়ে আট।

জহির বলল, তোমার ন'টার মধ্যে আসার কথা। তুমি সাড়ে আটটায় চলে এসেছি। আশ্চর্য তো!

আমার ন'টার মধ্যে আসার কথা না-কি ?

হু। আমি তোমাকে কল দিয়েছি সাতটা পাঁচ মিনিটে। তখনই বলে দিয়েছি বাই নাইন তুমি যেন চলে আস। মানুষ টাইমের পরে আসে, তুমি চলে এসেছ আগে ।

কীভাবে কাল দিলি ?

আধ্যাত্মিক উপায়ে কল দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সত্যি সত্যি কাজ করবে: বুঝতে পারি নি। আমার খুবই অবাক লাগছে।

মনে মনে আমাকে ডেকেছিস ?

হু। কীভাবে ডেকেছি শোন। প্রথমে দরজা জানালা বন্ধ করেছি। তারপর বিছানায় শবাসন করে শুয়েছি। হাত-পা সোজা করে সরলরেখার মতো শোয়া । চোখ বন্ধ করে একমনে বলেছি- 'হিমু ভাইজান, তুমি যেখানেই থাক রাত ন'টার মধ্যে চলে আস।' পঞ্চাশবারের মতো বলেছি। বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে পড়ার কথা না। আমার ঘুম এসে গেছে। টেলিপ্যাথিক উপায়ে তোমার কাছে ম্যাসেজ চলে গেছে। তুমি চলে এসেছ। How wonderful.

টেলিপ্যাথিক ডাকাডাকির বুদ্ধি কি তোর মাথাতেই এসেছে না কেউ দিয়েছে ?

জহির গলা নিচু করে বলল, একটা মেয়ের কাছ থেকে এই বুদ্ধি পেয়েছি। এই মেয়েটার বাসায় টেলিফোন নেই। ওর যখন কাউকে ডাকার দরকার পড়ে তখন এভাবে ডাকে। তাতে নাকি কাজ হয়। মেয়েটার কথা আগে বিশ্বাস করি নি। এখন পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে।

আমি বললাম, মেয়েটার নাম কি ফুলফুলিয়া ?

বেশ কিছুক্ষণ। হতভম্ব হয়ে থাকার পর জহির প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, তুমি কীভাবে জানো ?

সেটা দিয়ে তোর দরকার নেই। মেয়েটার নাম ফুলফুলিয়া কিনা বল ?

হু! মেয়েটার বাবা তাকে ডাকেন ফুল। মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন ডাকতেন ফুলিয়া। মেয়েটা করেছে কী দু'জনের নাম একত্র করে তার নাম দিয়েছে ফুলফুলিয়া।

তুই আমাকে ট্যালিপ্যাথিক পদ্ধতিতে ডেকে এনেছিস কেন ? ফুলফুলিয়ার বিষয়ে কথা বলার জন্যে ?

হু! তুমি এতসব জানো কীভাবে ? ভাইজান তুমি খুবই বিস্ময়কর একজন মানুষ।

তুই নিজেও কম বিস্ময়কর না। যা হোক এখন ঘটনা কী বল ?

তোমাকে আর নতুন করে কী বলব। তুমি তো মনে হচ্ছে সবই জানো।

তা জানি, তবু তোর মুখ থেকে শুনি.....

জহির চাপা গলায় প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল- ভাইজান আমি ঠিক করেছি। ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করব।

ঠিক করে থাকলে করবি।

মা মনে হয় রাগ করবে। তাই না ?

রাগ অবশ্যই করবে। তোর বাবার পিস্তল দিয়ে ফুলফুলিয়াকে গুলি করার সমূহ সম্ভাবনা।

ওকে কেন গুলি করবে ? গুলি করলে আমাকে করবে।

মাজেদা খালা তোকে কিছুই বলবে না। তুই যদি একটা খুন করে এসে বলিস- মা আমি খুন করে এসেছি। তাহলে খালা বলবেন, ভালো করেছিস । এখন যা গোসল করে আয়— ভাত খা। ইলিশ মাছের ডিম রান্না করেছি।

জহির অবাক হয়ে বলল, এত কিছু থাকতে ইলিশ মাছের ডিমের কথা বললে কেন ?

মনে এসেছে বলেছি। তুই এত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছিস কেন ?

ফুলফুলিয়ার সবচে' পছন্দের খাবার হলো ইলিশ মাছের দিম। আমার আবার ইলিশ মাছের ডিম খুবই অপছন্দের খাবার। ফুলফুলিয়ার আরেকটা পছন্দের খাবারের কথা শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

শুকনা মরিচের সঙ্গে রসুন মিশিয়ে বেটে ভর্তা।

জহিরের মুখ হা হয়ে গেল। সত্যিকার বিস্মিত মানুষের মুখ দেখা খুবই আনন্দের ব্যপার। বেশির ভাগ মানুষই বিস্মিত হবার ভান করে, বিস্মিত হয় না। জহির সত্যি সত্যি বিস্মিত। তার হা করে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি খুবই মজা পাচ্ছি।

জহির!

জ্বি ভাইজান ?

ফুলফুলিয়া সম্পর্কে তোর পরিকল্পনা কী বল শুনি। খুব গুছিয়ে বলবি। তার আগে এক মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করা।

কেন?

আমি একটা লাল বোতাম টিপব ।

কীসের লাল বোতাম ?

কীসের লাল বোতাম তোর জানার দরকার নেই। তোকে চোখ বন্ধ করতে বলছি তুই চোখ বন্ধ করা।

জহির বাধ্য ছেলের মতো চোখ বন্ধ করল। আমি ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারের বোতাম টিপে জহিরের সামনে রাখলাম।

এখন ইচ্ছা করলে চোখ মেলতে পারিস। লাজ করলে চোখ মেলার দরকার নেই। ফুলফুলিয়া সম্পর্কে তোর পরিকল্পনা গড়বড় করে বলে যা। ফিসফিস করবি না। উঁচু গলায় বলবি। প্রতিটি শব্দ যেন আলাদা করে বোঝা যায়। টু দ্য পয়েন্ট থাকবি। ফেনাবি না। রেডি, গেট সেট গো...।

জহির আবার তার বিখ্যাত রোবট গলায় কথা বলা শুরু করল। মনে হচ্ছে প্রতিমন্ত্রীদের মতো লিখিত ভাষণ পড়ছে। ভাইজান, আমি ঠিক করেছি ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করব। আমি জানি সবাই খুব রাগ করবে। কিন্তু আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। বিয়ে করব কাজির অফিসে। বিয়েতে তুমি একজন সাক্ষী হবে। আরেকজন সাক্ষীও তুমি জোগাড় করবে। কোথেকে করবে। সেটা তুমি জানো। ফুলফুলিয়া সম্পর্কে এই আমার পরিকল্পনা।

বিয়ের পরেও কি তুই তোর মা'কে জানাবি না ?

বিয়ের পর জানাব। কাজি অফিস থেকে টেলিফোন করে জানাব।

খালা তোকে ষ্ট্রেট বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তুই যাবি কোথায় ?

সেটা নিয়ে চিন্তা করি নি।

চিন্তা না করে ভালোই করেছিস। বেশি চিন্তা-ভাবনা করে কিছু হয় না। তুই একভাবে চিন্তা করে রাখবি ঘটনা ঘটবে অন্যভাবে। চিন্তাহীন জীবনযাপন করা উচিত।

ফুলফুলিয়ার একটা ছবি আমার কাছে আছে, দেখবে ?

না।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়কার ছবি। এখনকার চেহারার সাথে কোনো মিল নেই।

এই সময়ের কোনো ছেলে প্রেমিকার ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরে না। ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরাটাকে গ্রাম্যতা মনে করা হয়। তুই কী মনে করে ঘুরছিস ?

আমি ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরছি না তো। ছবিটা পেজ মার্ক হিসেবে ব্যবহার করছি। আমার অবশ্য অন্য একটা পরিকল্পনাও আছে। খুবই হাস্যকর পরিকল্পনা । বলব ?

বল।

আমার কম্পিউটারে ফটোশপ আছে। আমি করব কী ফুলফুলিয়ার ছবি ফটোশপে ঢুকাব। আইনস্টাইনের ছবি তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রিন্ট বের করব। ছবিতে দেখা যাবে আইনস্টাইন ফুলির মাথায় হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বসে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি থাকবে না ? কবিগুরুর কোলে ফুলফুলিয়া বসে আছে ? কবিগুরুর দাড়ির খোঁচা লাগছে ফুলফুলিয়ার গালে।

অবশ্যই থাকবে। কবি নজরুলের সঙ্গে থাকবে। কবি নজরুল হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন— ফুলফুলিয়া গান করছে। ।

বাংলাদেশের বিখ্যাতদের কেউ থাকবে না ?

বাংলাদেশের বিখ্যাতরাও থাকবে, তবে কোনো পলিটিক্যাল ফিগার রাখব না। শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এরা বাদ। শুধু কবি-সাহিত্যিকরা থাকবেন। আমার আসল ইচ্ছা ফুলিকে চমকে দেয়া। সমস্যা হচ্ছে মেয়েটা চমকায় না। ভাইজান, তুমি ওকে চমকাবার কিছু বুদ্ধি বের কর তো।

তুই কোনো চিন্তা করিস না। চমক কত প্রকার ও কী কী এই মেয়ে এখন টের পাবে। ওকে আমরা ধারাবাহিক চমকের মধ্যে রাখব। চমকাতে চমকাতে ওর চমকা রোগ হয়ে যাবে। তখন দেখবি কারণ ছাড়াই চমকাচ্ছে।

থ্যাংক য়্যু ।

তুই চুপ করে বসে থাক। আমি খালাকে একটা জিনিস হ্যান্ডওভার করে এক্ষুণি আসছি।

তুমি কি রাতে থাকবে ?

বুঝতে পারছি না। থেকে যেতেও পারি।

যদি রাতে থাক তাহলে ফুলির সঙ্গে পরিচয়টা কীভাবে হলো সেটা তোমাকে বলব। খুবই ইন্টারেস্টিং। শুনলে হাসতে হাসতে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমার যখনই মনে হয় আমি একা একা হাসি।

জহির মুখ টিপে হাসছে। কী সুন্দর সহজ হাসি! তার আনন্দ সারা শরীর দিয়ে আলোর মতো ঠিকরে বের হচ্ছে। ঠিক তখন একটা ঘটনা ঘটল। টিভির ওপর রাখা জাপানি চিনামাটির বালিকা মূর্তি ধুম করে নিচে পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। দেয়ালে ঝুলানো দুটা ক্যালেন্ডার হঠাৎ পেণ্ডুলাম হয়ে দুলতে শুরু করল। আমরা যে খাটে বসেছিলাম কেউ মনে হয় সেই খাট ধরে হাঁচকা টানে ইঞ্চি খানেক সরিয়ে

দিল। মাথার ভেতরের মগজও মনে হয় খানিকটা দুলল। জহির ভীত গলায় বলল, ভাইজান কী হচ্ছে ?

আমি বললাম, তেমন কিছু না। টাইট হয়ে বসে থাক। ভূমিকম্প হচ্ছে!

জহিরের মুখ দ্বিতীয়বারের মতো হা হয়ে গেল। মুখের হা বন্ধ না করেই সে কথা বলল, ভূমিকম্প হচ্ছে মানে কী ?

আমি হালকা গলায় বললাম, মা বসুন্ধরা সামান্য কেঁপে উঠেছেন। ঢাকা শহর দুলছে।

আমরা বসে আছি কেন ?

আমরা বসে আছি কারণ আমরা বসে বসে গল্প করছিলাম। যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম তাহলে— বসে না থেকে দাঁড়িয়ে থাকতাম ।

ততক্ষণে মাজেদা খালার বাড়িতে ভূতের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মাজেদা খালা চিৎকার করছেন। তার কাজের তিনটি মেয়ের দুটি চিৎকার করছে। একটি গলা ছেড়ে কাঁদছে। খালু সাহেব ইংরেজিতে সবাইকে ধমকাচ্ছেন। (দারুণ টেনশনের মুহুর্তে খালু সাহেব বাংলা ভুলে যান।) মাজেদা খালা এন্ড ফ্যামিলি আটকা পড়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। কারণ দরজা খোলার চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। মাজেদা খালা সম্প্রতি তাঁর পুরো বাড়ির দরজা তালা বদলে আমেরিকান তালা লাগিয়েছেন। এই তালাগুলো বাইরে থেকে লাগানো যায় আবার ভেতর থেকেও লাগান যায় ।

জহির বলল, ভাইজান বাড়িঘর ভেঙে মাথার উপর পড়বে না ?

আমি বললাম, পড়তে পারে।

আমাদের তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। রাস্তায় যাবি কীভাবে ? দরজা খোলার চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূমিকম্প থেমে গেছে তাই না ভাইজান ?

প্রথম ধাক্কাটা গেছে। আসলটা বাকি আছে।

আসলটা বাকি আছে মানে ? ভূমিকম্পের নিয়ম হচ্ছে প্রথম একটা ছোট ধাক্কা দেয়। সবাইকে জানিয়ে দেয় যে সে আসছে। তারপর দেয় বড় ধাক্কাটা।

বড় ধাক্কাটা কখন দেবে ?

তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পাঁচ মিনিট পরে দিতে পারে, পাঁচ ঘণ্টা পরে দিতে পারে। আবার ধর পাঁচ দিন পরেও দিতে পারে।

ভাইজান আমার খুবই টেনশন লাগছে।

ফুলফুলিয়ার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো সেই গল্পটা শুরু করা। টেনশন কমবে।

দরজায় ধরাম করে শব্দ হলো। মাজেদা খালা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন। কঁদো কঁদো গলায় বললেন, ভূমিকম্প হচ্ছে তোরা জানিস না ?

আমি বললাম, জানি।

জেনেশুনে চুপচাপ বসে আছিস কীভাবে ? রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবি না ?

রাস্তায় যাৰ কীভাবে ? তুমি তো চাবিই খুঁজে পাচ্ছ না।

এতক্ষণ খালা কাঁদোকাঁদো ছিলেন । এইবার কেঁদে ফেললেন। ফোপাতে ফোঁপাতে বললেন- চাবিটা আমি নিজের হাতে ড্রেসিংটেবিলের ফাস্ট ড্রয়ারে রাখি। আজও রেখেছি, আমার পরিষ্কার মনে আছে। ড্রেসিংটেবিলের সব ড্রয়ার খুঁজেছি। চাবি নেই।

আমি বললাম, তোমার শোবার ঘরের বালিশের নিচে দেখ তো।

খালা রাগী গলায় বললেন, বালিশের নিচে চাবি রাখি নি বালিশের নিচে কেন দেখব ?

খোঁজাখুঁজির মধ্যে থাকলে তোমার টেনশনটা কমবে এইজন্যে দেখতে বলছি। কোনো একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক। ভালো কথা, ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারটার কাজ শেষ। তোমার কাছে কি হ্যান্ডওভার করব ? পনেরো মিনিটের মতো রেকর্ড হয়েছে।

খালা যেভাবে ঝড়ের মতো এসেছিলেন ঠিক সেইভাবে ঝড়ের মতো বের হয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'চাবি পাওয়া গেছে, চাবি পাওয়া গেছে' শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার শব্দ হলো। সিড়ি দিয়ে ধুপধাপ শব্দে নামার শব্দ পাওয়া গেল এবং আমাকে চমকে দিয়ে জহির বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বন্দুকের গুলির মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধারণী দ্বিতীয়বার কেঁপে উঠল। ততক্ষণে ঢাকা শহর জেগে গেছে। চারদিকে হৈচৈ চিৎকার শুরু হয়েছে। রাস্তা ভর্তি মানুষ। এর মধ্যে একজন আবার আজান দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আজান দিতে হয়।

আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। আতঙ্কে অস্থির হওয়া লোকজন দেখতে ভালো লাগছে। তীব্র আতঙ্কেরও কিছু পর্যায় আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তীব্র আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ক্ষুদ্র একটা এলাকার ভেতর ছোটাছুটি করে। আতঙ্ক যত বাড়তে থাকে ছোটাছুটির মাত্রা তত কমতে থাকে। তীব্র আতঙ্কের শেষ পর্যায়ে কোনো ছোটাছুটি নেই।— স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা । তখন চোখের মণিও নড়বে না।

মাজেদা খালাকে দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে বাড়ির সামনের লনে ছোটাছুটি করছেন। তিনি যেদিকে যাচ্ছেন তার কাজের তিন মেয়েও সেদিকে যাচ্ছে। শুধু খালু সাহেব এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন। তাঁর ঠোঁটে সিগারেট। তবে সিগারেটে আগুন নেই। ছুটে নিচে নামার সময় নিশ্চয়ই লাইটার নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। জহিরকে দেখতে পাচ্ছি না। সে কি গেট খুলে বাইরে চলে গেছে ? এক দৌড়ে ফুলফুলিয়ার কাছে চলে যায় নি তো ? ফুলফুলিয়া যখন দেখবে খালি গায়ে একজন যুবক দৌড়াতে দৌড়াতে তার কাছে আসছে তখন সে ভালোই মজা পাবে।

মাজেদা খালার বাড়ির মূল লোহার গোটটা বন্ধ। তবে মূল গেটের সঙ্গে বাচ্চা গোটটা খোলা। সেই গেটের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝেই লোকজন উঁকি দিচ্ছে। খালার বাড়ির গেটে চব্বিশ ঘণ্টা দারোয়ান থাকার কথা। কোনো দারোয়ান নেই। যে-কোনো বিপর্যয়ের সময় প্রথম যারা দায়িত্ব ফেলে পালিয়ে যায়। তারা হলো দারোয়ান এবং সিকিউরিটি গার্ড ।

হিমু! এই হিমু!

মাজেদা খালা আমাকে দেখতে পেয়েছেন। মনে হয় তার আতঙ্ক সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। তীব্র আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ কাউকে চিনতে পারে না। মস্তিষ্কের যে অংশে পরিচিতিমূলক তথ্য থাকে সেই অংশ কাজ করে না। মাজেদা খালা ক্ষিপ্ত গলায় চেঁচালেন– এই হিমু, কথা বলছিস না কেন ?

আমি বললাম, খালা কেমন আছ ?

গাধা তুই ফাজলামি করছিস কেন ? এখন কেমন আছি জিজ্ঞেস করার মানে কী ? নেমে আয়।

তোমরা কি চা খাবে ? চায়ের পানি বসিয়ে দেই ?

নেমে আয় তো। এক্ষুণি নাম।

মাজেদা খালার পাশে খালু সাহেব এসে দাঁড়ালেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন— Himu bring me a lighter, খালু সাহেবের গলা ভাঙা ছিল না। মনে হচ্ছে ভূমিকম্পে তাঁর গলা ভেঙে গেছে। ভূমিকম্পে ঘর বাড়ি ভাঙে বলে জানি, মানুষের গলা ভাঙে এটা শুনি নি।

আমি বললাম, খালু সাহেব পোর্চের লাইটটা কি জ্বলিয়ে দিব ?

খালু সাহেব বললেন, কেন ?

আমি বললাম, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনটা পড়তে পারতেন। লনে কতক্ষণ থাকতে হয় তার তো ঠিক নেই।

খালু সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। নিশ্চয়ই ইংরেজিতে গালাগালি। দোতলা থেকে শোনা যাচ্ছে না।

রাত বারটা ।

ভূমিকম্প ভীতি সামলে মাজেদা খালা বাড়িতে উঠে এসেছেন। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। তাঁর তিন কাজের মেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। খালা খালু দু'জনই বসার ঘরের সোফায় পাশাপাশি বসে আছেন। আমি বসে আছি তাদের ডানপাশের সোফায় । খালু সাহেব ভাঙা গলায় স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু— ভূমিকম্প ।

বুঝলে মাজেদা— বিরাট কোইনসিডেন্স। যখন ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ভূমিকম্প নিয়েই একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম। আর্টিকেলের নাম— Untamed Nature, আর্টিকেলের একটা চেপ্টার ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। ঐ চেপ্টারটা পড়তে শুরু করেছি তখনই ভূমিকম্প শুরু হলো। ইন্টারেস্টিং কোইনসিডেন্স না ?

খালা জবাব দিলেন না। তিনি ভাবলেশহীন মুখে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন। টিভিতে এখনো সিএনএন। এখনো টিভি শব্দহীন। মাজেদা খালাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর আতঙ্ক এখনো পুরোপুরি যায় নি। স্বামীর প্রশ্নের জবাব তো তিনি দিলেনই না, উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু তোমার কাছে কোইনসিডেন্সটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না ?

আমি বললাম, অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। তবে আপনি দয়া করে বজ্রপাতের উপর কোনো আর্টিকেল পড়বেন না।

কেন ?

বজ্রপাতের উপরে আর্টিকেল পড়লেন– সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপর বাজ্রপাত হলো । পুড়ে কয়লা হয়ে গেলেন।

তুমি কি রসিকতা করার চেষ্টা করছি ?

জ্বি।

তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রসিকতার না। রসিকতা করবে না।

জ্বি আচ্ছা।

একটা জিনিস খেয়াল রাখবে। তোমার নাম হিমু। তুমি একজন ভ্যাগাবন্ড। তুমি চার্লি চ্যাপলিন না।

জ্বি আমি খেয়াল রাখব।

তুমি জহিরের ঘরে যাও। ওকে বিরক্ত কর। ওর সঙ্গে হিউমার করার চেষ্টা কর। আমার সঙ্গে না।

জি আচ্ছা ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। খালু সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তোমাকে আরেকটা বিষয় বলি। দয়া করে সহজ উত্তর দেবে, প্যাচানো উত্তর দেবে না।

জ্বি আচ্ছা।

ভূমিকম্প হচ্ছে। সবাই দৌড়ে নেমে খোলা জায়গায় চলে গেল। তুমি ঘরে বসে রইলো। খুব ভালো কথা, থাক ঘরে বসে, কিন্তু জহিরকে আটকে রাখলে কেন ?

খালু সাহেব, আমি জহিরকে আটকে রাখি নি। ও হঠাৎ খালি গায়ে দৌড় দিল। যাকে বলে ভো দৌড়।

দৌড়ে কোথায় গেল ?

প্রথম বুঝতে পারি নি কোথায় গেছে। পরে ওকে আবিষ্কার করলাম ছাদে। সে কোন বইয়ে পড়েছে ভূমিকম্পের সময় রাতের আকাশে আলোর খেলা হয়। বিচিত্র ভাষায় আকাশে লেখা ভাসে। সত্যি কি-না দেখতে গেছে।

যে ছেলে ফিজিক্স পড়ছে সে ভূমিকম্পে আকাশে হাবিজাবি লেখা হয় এইসব বিশ্বাস করে ? ওকে তো কানে ধরে উঠবোস করানো দরকার। ওকে আমার কাছে পাঠাও তো। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

খালু সাহেব আজ কথা না বলে আরেকদিন বলুন। এখন সে একটু ব্যস্ত আছে। ব্যস্ত বলেই আমি আপনার কাছে বসে আছি। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন জেনেও বসে আছি।

কী নিয়ে ব্যস্ত ?

সে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে একজনের কাছে খবর পাঠাবার চেষ্টা করছে। জানার চেষ্টা করছে ভূমিকম্পে তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি-না। পদ্ধতিটা খুব সহজ। শবাসন হয়ে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়.

চুপ কর।

জ্বি আচ্ছা।

খালু সাহেব থমথমে মুখে জহিরের ঘরের দিকে এগুলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। ইন্টারেস্টিং কোনো পরিস্থিতি হয় কি-না দেখার জন্যে যাওয়া। তেমন কিছু হলো না। খালু সাহেব হতভম্ব হয়ে দেখলেন, তাঁর পুত্র চোখ বন্ধ করে সরল রেখা হয়ে শুয়ে আছে। মুখে বিড়বিড় করছে। খালু সাহেব যেভাবে নিঃশব্দে ছেলের ঘরে ঢুকেছেন সেইভাবে নিঃশব্দেই ছেলের ঘর থেকে বের হলেন। আমাকে ইশারায় তার পেছনে পেছনে আসতে বললেন । আমিও বাধ্য ছেলের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। তিনি আমাকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে কঠিন গলায় বললেন, হিমু তুমি নানাবিধ যন্ত্রণা তৈরি করা। আমি আমার পরিবারে কোন যন্ত্রণা চাই না। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তুমি এক্ষুণি বিদেয় হও ।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমার রাতে খাওয়ার কথা। ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে।

কথা বাড়াবে না। বিদেয় হও ।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। খালু সাহেব দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর মুখ থমথম করছে।

২

হিমু,

তুই রাতে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলি কেন ? তুই নিজেকে কী ভাবিস ? যা মনে আসে করে বেড়াবি ? তোকে কেউ কিছু বলতে পারবে না ? বাংলাদেশের সব মানুষের মাথা কি তুই কিনে নিয়েছিস ?

ঐ রাতে কী ঘটেছিল আমার কাছে শোন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। আমি বাতি বন্ধ করে শুয়েছিলাম। এতে মাথা ধরা আরো বাড়ল। তুই বোধহয় জানিস না শুয়ে থাকলে আমার মাথা ধরা বাড়ে। আমার সবই উল্টা । যাই হোক মাথা ধরা যখন খুব বাড়ল তখন মাথা ধরার টেবলেটের খোঁজে গেলাম তোর খালুর কাছে। দেখি সে একা মুখ আমসি করে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হিমু কোথায় ? তোর খালু বলল, জানি না কোথায়। আমি বললাম, সে চলে গেছে না কি ? তোর খালু বলল, জানি না। যেতেও পারে, খবর না দিয়ে যে আসে সে খবর না দিয়ে চলে যায়। তখন আমি গোলাম জহিরের ঘরে। সেখানেও তুই নেই। কাজের মেয়েরাও কেউ কিছু বলতে পারে না। গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও বলল, গেট দিয়ে কাউকে যেতে দেখে নি। তোর খালু বলল, চলে গেছে— গেছে। এত হৈচৈ করছ, কেন ? টেবিলে খাবার দিতে বলে ।

হিমু, কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক না। আমি রাগ করেছি এবং মনে কষ্ট পেয়েছি। আমি যাদেরকে বেশি স্নেহ করি। তারাই আমাকে কষ্ট দেয়। জহিরের কথাই মনে করে দেখ ।

ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারে জহিরের সব কথাবার্তা এই নিয়ে পাঁচবার শুনলাম। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এইসব কী ধরনের কথাবার্তা ? আমার তো মনে হয় ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। তার ডাক্তারি চিকিৎসা দরকার। কোনো সুস্থ মাথার ছেলে এ ধরনের কথা বলতে পারে না। ভূমিকম্পের রাতে সে তার বাবার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে সেটা শুনলেই যে কেউ বলবে, ছেলেকে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দাও। ঐটাই তার জন্যে উপযুক্ত জায়গা। ঘটনা। কী হয়েছে শোন। বাপ-ছেলে খেতে বসেছে। আমি বসি নি। প্রথমত, আমার মাথার যন্ত্রণা; দ্বিতীয়ত, তোর জন্য রান্না-বান্না করিয়েছি। আর তুই না বলে পালিয়ে গেছিস ; যাই হোক মূল ঘটনা শোন। জহিরের বাবা বলল, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?

জহির বলল, ভালোই হচ্ছিল। তবে এখন হচ্ছে না।

জহিরের বাবা বলল, হচ্ছে না কেন ?

জহির বলল, ফিজিক্স পড়ে কোনো লাভ নেই বাবা ।

লাভ নেই কেন ?

প্রকৃতিকে বোঝার জন্যেই ফিজিক্স পড়া। আমি চিন্তা করে দেখেছি। এখন পর্যন্ত ফিজিক্সের যে উন্নতি হয়েছে তা দিয়ে প্রকৃতিকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। বরং উল্টো হবে। ফিজিক্সের জ্ঞান আমাদের চিন্তাকে আরো ধোঁয়াটে করে ফেলবে ।

জহিরের বাবা তখন শান্ত গলায় বলল, আমি ফিজিক্স জানি না। আমি ইতিহাসের ছাত্র। তুই কী বলছিস বুঝিয়ে বল।

জহির বলল, সব কিছু বোঝাতে পারব না। একটা শুধু বলি, ফিজিক্স বলছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে। প্রচণ্ড শব্দে কসমিক ডিম ফেটে মহাবিশ্ব তৈরি হলো। যে মুহূর্তে কসমিক ডিম ফাটল সেই মুহূর্ত থেকে সময়ের শুরু। কসমিক আগে কী ছিল কিছুই বলতে পারছে না।

ডিম ফাটার আগে কী ছিল ফিজিক্স তা বলতে পারছে না বলে তুই ফিজিক্স পড়বি না ?

না। আমার কাছে ফিজিক্স পড়া অর্থহীন মনে হচ্ছে।

কী করবি বলে ঠিক করেছিস ?

বাবা, আমি একটা কফিশপ চালাব।

বুঝতে পারছি না। কী বলছিস। কী চালাবি ?

কফিশপ। ছোট্ট ঘরোয়া ধরনের কফিশপ। দোকান সারাদিন বন্ধ থাকবে। খুলবে সন্ধ্যার পর। কাটায় কাটায় বারটার সময় কফিশপ বন্ধ হবে।

রসিকতা করছিস নাকি ?

না, রসিকতা কেন করব ? কফিশপের নাম ঠিক হয়ে গেছে— ‘শুধুই কফিতা’।

নাম ‘শুধুই কফিতা’ ?

হ্যাঁ, আমার কফিশপের নাম “কফিতা”। এখন কী করছি জানো বাবা ? যে মাগে করে কফি দেয়া হবে সেই মগের ডিজাইন করছি।

মগের ডিজাইন করছিস ?

হ্যাঁ। কোন রঙের মাগে কফির গেরুয়া রঙ ভালো ফুটে সেটা দেখা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে গাঢ় সবুজ রঙের মাগে কফির রঙ ভালো ফুটে । কাজেই আমাদের মগের রঙ হলো গাঢ় সবুজ। এই মগ হবে গ্লাসের মতো। মগে চায়ের কাপের মতো কোনো বোটা থাকবে না।

বোটা থাকবে না ?

জ্বি না। কেন থাকবে না শুনতে চাও ?

শুনি কেন থাকবে না।

পানির গ্লাস আমরা হাত দিয়ে ধরি। ঠাণ্ডা পানির গ্লাস হাত দিয়ে ধরেই পানির শীতলতা আমরা টের পাই। আমাদের ভালো লাগে। গরম কফির উষ্ণতাও ঠিক একইভাবে আমরা কফির মগ হাত দিয়ে ধরা মাত্র টের পাব। আমাদের ভালো লাগবে।

তুই তাহলে কফির দোকান দিচ্ছিস ?

জ্বি।

তোর নেক্সট পরীক্ষা যেন কবে ?

নয় তারিখ- সাত দিন আছে। পরীক্ষা তো দিচ্ছি না!

পরীক্ষা দিচ্ছিস না ?

না। কফিশপের আইডিয়া মাথায় আসামাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

জহিরের বাবা এরপরেও বেশ সহজভাবে খাওয়া শেষ করল। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে আবার খাবার টেবিলে বসল। জহিরের খাওয়া তখনো শেষ হয় নি। জহিরের বাবা শান্তমুখে ছেলের খাওয়া দেখতে লাগল। খাওয়া শেষ হবার পর জহিরের বাবা বলল, নয় তারিখে তুই পরীক্ষা দিতে যাবি। যদি না যাস তাহলে ঐ দিনই এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবি। কথা চালাচালি আমার পছন্দ না । আমি আমার কথা বলে শেষ করলাম। এই বিষয়ে নয় তারিখ পর্যন্ত আর কোনো কথা বলব না।

জহির বলল, আচ্ছা।

হিমু, এই হলো ঘটনা। জহিরের বাবাকে আমি মোটেই দোষ দিচ্ছি না। সে তো তাও ধৈর্য ধরে ছেলের কথা শুনেছে। আমার ইচ্ছা করছিল- খাবার টেবিলেই ঠাস করে ছেলের গালে এক চড় মারি। যাতে এক চড়ে মাথার সব আইডিয়া নাকের ফুটো দিয়ে বের হয়ে যায়।

ঐ ঘটনার পর আমি তোর খালুকে ফুলফুলিয়া মেয়েটার কথা বলেছি। আমি চিন্তা করে দেখলাম, ছেলে যেভাবে বিগড়াচ্ছে ফুলফুলিয়ার ব্যাপারটা আর গোপন রাখা ঠিক হবে না। ক্যাসেট করা কথাবার্তাও তোর খালুকে শুনিয়েছি। বেচারা যে কী পরিমাণে শকড হয়েছে তুই বিশ্বাস করবি না। তিনদিনের একটা কনফারেন্সে তার সুইডেনে যাবার কথা ছিল। এটা সে বাতিল করেছে। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল, আবার সিগারেট ধরেছে। ভোস ভোস করে দিনরাত সিগারেট টানছে। আমি কিছু বলছি না। সিগারেট টেনে যদি টেনশন কিছু কমে তাহলে কমুক। গতকাল রাতে ঢাকা ক্লাবে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরেছে মদ খেয়ে। সিগারেটের সঙ্গে মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আবারো মদ ধরবে । চিন্তা করে দেখ আমি কী বিপদে পড়েছি। তোর খালুকে আমি এখন কিছুই বলব না। নয় তারিখ পার হোক। তারপর দেখা যাক পানি কোন দিকে গড়ায়।

হিমুরে, আমি মহাবিপদে আছি। তোকে যে বাড়িতে আসতে বলব, তোর সঙ্গে পরামর্শ করব সেই উপায় নেই।

জহিরের বাবা তোর এ বাড়িতে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। দারোয়ানকে ডেকেও বলে দেয়া হয়েছে তুই যেন এ বাড়িতে ঢুকতে না পারিস। জহিরের বাবার ধারণা তার ছেলের এই সমস্যার মূলে আছিস তুই। তুই না-কি মানুষের মাথায় হালকা বাতাস দিয়ে আইডিয়া ঢুকিয়ে সটকে পড়িস। আমি তাকে বলেছি- এটা ঠিক না। হিমু আমাদের দলে। জহিরের কথাবার্তা খুব কায়দা করে হিমুই রেকর্ড করে এনেছে। তোর খালু। বলেছে- হিমু সব দলেই আছে। জহির যদি ফুলফুলিয়াকে বিয়ে করে তাহলে দেখা যাবে উকিল বাবা— হিমু। তোর খালুর কথাও আমি ফেলতে পারছি না। বল তো আমি কী করি ?

এদিকে ফুলফুলিয়া মেয়েটার বিষয়ে তোর খালুও কিছু খোঁজখবর বের করেছে। মেয়েটা কী করে শুনলে তুই মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। সে একটা ক্লিনিকে আয়ার কাজ করে। রোগীদের গু মুত পরিষ্কার করে। অবস্থাটা চিন্তা করে দেখ।

আমি মানত করেছি। সমস্যা সমাধান হলেই আজমীর শরিফে চলে যাব। খাজা বাবার দরবারে শুকরানা নামাজ পড়ব। সেখানকার এতিম মিসকিনদের একবেলা খাওয়াব। আমার যে কী রকম অস্থির লাগছে তোকে বলে বুঝাতে পারব না।

মানসিক যে অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আমি চাই না সেটা আরো খারাপ হোক। তবে তুই দূর থেকে আমার একটা উপকার করতে পারিস। ফুলফুলিয়া মেয়েটার ঠিকানা দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা করে এই মেয়েটার বিষয়ে আমাকে একটা রিপোর্ট দে। ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে জহিরের কাছ থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। এর জন্যে টাকা পয়সা যা লাগে আমি খরচ করব। কেয়ারটেকারের কাছে ঠিকানা আছে। তুই তার কাছ থেকে ঠিকানাটা নে। ওর কাছে দশ হাজার টাকাও দিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজনে গুণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটাকে হুমকি ধমকি দিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে দে। এই উপকারটা তুই আমার করা।

ইতি

তোর মাজেদা খালা

পুনশ্চ : হিমু আমার মাথাটা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে। যে ঘটনাটা তোকে জানাবার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম। সেই ঘটনাই জানানো হয় নি। অথচ চিঠি শেষ করে বসে আছি। আসলে আমি আর টেনশন নিতে পারছি না বলে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সেদিন মাথা ধরার ট্যাবলেট ভেবে তোর খালুর দুটা প্রেসারের ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। তারপর দেখি ধুম করে প্রেসার নেমে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালাঢালি- ডাক্তার ডাকাডাকি ।

যাই হোক, মূল ঘটনাটা মন দিয়ে শোন। এখন পর্যন্ত ঘটনাটা নিয়ে কারো সঙ্গেই আলাপ করি নি। শুধু আমার কাজের মেয়ে তিনটিকে বলেছি। কাজটা ভুল হয়েছে। তিনটা মেয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তোর খালুকে ঘটনাটা বলতে গিয়েও বলি নি। তাকে যা বলব— সে গম্ভীর হয়ে বলবে, এটা কিছু না। তুমি স্বপ্ন দেখেছি। চোখের সামনে দেখা জলজ্যান্ত জিনিসকে কেউ যদি বলে ‘স্বপ্ন তাহলে কেমন রাগ লাগে তুইই বল ?

ঘটনাটা ঘটেছে ভূমিকম্পের রাতে। তখন ঘটনাটা আমি নিজেও বুঝতে পারি নি। ভূমিকম্পের ভয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কী দেখছি বা কী দেখছি না বুঝতেই পারি নি। যতই দিন যাচ্ছে ব্যাপারটা ততই পরিষ্কার হচ্ছে- আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ভূমিকম্পের রাতের কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। দরজা ভেতর থেকে লক করা। আমি দরজা খুলতে পারছি না। চাবি পাচ্ছি না। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার উলট-পালট করছি। তোর খালু পাগলের মতো বিড়বিড় করছে। এক সময় ছুটে গেলাম জহিরের ঘরে। তখন তুই বললি বালিশের নিচে খুঁজে দেখতে। আমি গেলাম শোবার ঘরে। আমি মশারি

খাটিয়ে ঘুমাই। ঢাকায় ডেঙ্গু রোগ দেখা দেয়ার পর থেকে এই ব্যবস্থা। রাত আটটা বাজতেই কাজের মেয়ে মশারি খাটিয়ে দেয় । আমি গোলাম অবাক হলাম— দেখি বাড়ির চাবি। চাবি হাতে নিতে গিয়ে আরেকটা জিনিস দেখলাম— দেখি বুড়ো একজন মানুষ কুঁজো হয়ে মশারির ভেতর বসে আছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তখন আমার মাথাতেই নেই যে এটা একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আমার মশারির ভেতর কোনো বুড়ো মানুষ বসে থাকতে পারে না। ভূমিকম্পের ভয়ে আমি এতই অস্থির যে বুড়ো মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে এটা আমার মাথায় ঢুকাল না। আমি চাবি নিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে নিচে চলে গেলাম।

হিমু, ব্যাপারটা কী বল তো ? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আমার কি কথা বলা উচিত ?

সাক্ষাতে এটা নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলব। আপাতত তুই ফুলফুলিয়ার ব্যাপারটা দেখ। প্রয়োজনে কেয়ারটেকারকে সাথে নিয়ে যা। এই ধরনের মেয়েরা হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের হাতে পোষা গুণ্ডাপাণ্ডাও থাকে। তোকে একা পেয়ে কিছু করে বসতে পারে। দুজন থাকলে কিছুটা রক্ষা। ভালো থাকিস ।

ফুলফুলিয়া যার নাম তার স্বভাব-চরিত্র যাই হোক সে দেখতে খুব সুন্দর হবে এরকম ধারণা হবেই। আমি ধরেই নিলাম মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকব। মনে মনে বলব, বাহ।

মেয়েটির বাসা ঝিকাতলায়। ঠিকানা লেখা কাগজ হাতে নিয়ে তার বাসা খুঁজছি আর কল্পনা করছি মেয়েটা দেখতে কেমন হবে। গায়ের রঙ গৌর বর্ণ। মাথা ভর্তি চুল। কুচকুচে কালো চুল না। সামান্য পিঙ্গল ভাব আছে। অতিরিক্ত ফর্সা মেয়েরা সাধারণত পিঙ্গলকেশী হয়। রোগা, গোলগাল মুখ। খুবই ছটফট স্বভাবের মেয়ে। স্থির হয়ে এক জায়গায় বসেও থাকতে পারে না। অকারণে হেসে ফেলার বাতিকও আছে। সিরিয়াস ধরনের কথাতেও মুখ আড়াল করে হাসছে।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল সে-ই যে ফুলফুলিয়া এতে আমার মনে সন্দেহের তিল মাত্রও নেই। অথচ কল্পনার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। শান্ত চেহারার শ্যামলা মেয়ে। রোগাটা ঠিক আছে, তবে মুখ গোলাকার না, লম্বাটে। মনে হয় রুটি বানাচ্ছিল। হাতে ময়দা লেগে আছে। ফুলফুলিয়া অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমাকে দেখে এত বিস্মিত হচ্ছে কেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমার চেহারা বিস্মিত হবার মতো না। আমি সহজ গলায় বললাম, ফুলফুলিয়া কেমন আছ ?

মেয়েটা খানিকটা ভীত গলায় বলল, ভালো আছি।

রুটি বানাচ্ছিলে নাকি?

মেয়েটার গলা থেকে বিস্ময় ভাবটা চলে গেল। সেখানে চলে এলো আনন্দ । সে বলল, আপনি হিমু ভাই না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। চিনেছ কীভাবে ? জহির নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার চেহারার বর্ণনা তোমার কাছে করেছে।

উনি কিছুই বলেন নি। উনি শুধু বলেছেন হিমু ভাইজান যদি তোমার কাছে আসেন তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে। তিনি দেখতে কেমন, এইসব কিছু

বলার দরকার নেই।
আমি যে হলুদ পাঞ্জাবি পরি এটা নিশ্চয়ই বলেছে।
না, হলুদ পাঞ্জাবির কথাও বলেন নি। বাসা অন্ধকার কেন ?
বারান্দার বাতিটা চুরি হয়ে গেছে এই জন্যে অন্ধকার। ভেতরে আসুন, ভেতরে আলো আছে।
তুমি ছাড়া বাসায় আর কে আছে ?
রহমতের মা বলে একজন মহিলা আছেন । উনি আমার পাহারাদার । উনি ছাড়া আর কেউ নেই।
তোমার বাবা কোথায় ?
ফুলফুলিয়া মিষ্টি করে হেসে বলল, বাবা আমার উপর রাগ করে দুপুরবেলা চলে গেছেন। বলে গেছেন আর ফিরবেন না ।
প্রায়ই কি এরকম রাগ করে চলে যান ?
জ্বি।
রাগ ভেঙে গেলে দিনে দিনেই কি ফেরেন ?
না, সব দিন ফেরেন না। এমনও হয়েছে চার পাঁচদিন পরে ফিরেছেন।
আমি ফুলফুলিয়ার সঙ্গে একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরে সস্তার একটা খাট পাতা আছে। টেবিল চেয়ার আছে। আলনা আছে। আলনার কাপড়-চোপড় দেখে মনে হচ্ছে এই ঘরে ফুলির বাবা ঘুমান।
হিমু ভাইজান, দুধ ছাড়া এককাপ চা খাবেন ?
খাব।
ঘরে খুব ভালো ঘি আছে। গরম রুটিতে ঘি মাখিয়ে চিনি দিয়ে দেই ?
দাও।
ফুলফুলিয়া খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, উনি বলছিলেন। আপনি নাকি একজন মহাপুরুষ। আপনি যে-কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এটা কি সত্যি ?
না, এটা সত্যি না।
আপনি কি মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন ?
তাও পারি না।
তাহলে উনি কেন এত বড় গলায় আপনার কথা বললেন ? আপনি কী পারেন ?
আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি সুখে এবং দুঃখে মানুষের পাশে থাকতে পারি।
সে তো সবাই পারে। আপনার বিশেষত্ব কী ?
আমার বিশেষত্ব হচ্ছে আমি সব সময় একটা হলুদ পাঞ্জাবি পারি। সবাই হলুদ পাঞ্জাবি পরে না।
সব সময় হলুদ পাঞ্জাবি কেন পরেন ?
হলুদ পাঞ্জাবি পরার প্রধান কারণ হচ্ছে- হলুদ রঙের কাপড় সহজে ময়লা হয় না। একবার ধুয়ে অনেক দিন পরা যায়।
এটাকে বললেন প্রধান কারণ । অপ্রধান কারণ কী ?
অপ্রধান কারণ আমার বাবা। তিনি মহাপুরুষ বানাবার একটা স্কুল খুলেছিলেন। আমি ছিলাম স্কুলের একমাত্র ছাত্র। হলুদ পাঞ্জাবি হলো স্কুল ড্রেস। বাবার ধারণা হয়েছিল গেরুয়া বৈরাগ্যের রঙ । গেরুয়া রঙের কাপড় পরলে মনে বৈরাগ্য আসে।

মহাপুরুষদের বৈরাগ্য থাকতে হয়।

ফুলফুলিয়া কথা শুনে মজা পাচ্ছে। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ফুলফুলিয়ার পাহারাদারও একবার উকি দিয়ে দেখে গেল। মৈনাক পর্বতের মতো শরীর। সাধারণভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু ফোস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। এ রকম পাহারাদার থাকলে আর চিন্তা নেই। ফুলফুলিয়া বলল, আপনার বাবা কি সত্যি সত্যি আপনাকে মহাপুরুষ বানাবার চেষ্টা করেছিলেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বাবা রীতিমতো স্কুল খুলে বসেছিলেন! স্কুলের তিনিই প্রিন্সিপাল, তিনিই শিক্ষকমণ্ডলি, তিনিই ড্রিল স্যার। এত করেও শেষ রক্ষা হয় নি। স্কুল থেকে পাশ করে বের হবার আগেই বাবার মৃত্যু। বাবার মৃত্যু মানেই প্রিন্সিপাল স্যারের মৃত্যু, শিক্ষকমণ্ডলির মৃত্যু এবং ড্রিল স্যারের মৃত্যু।

নিজের বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা এত সহজভাবে বলছেন ?

মহাপুরুষ স্কুলের ট্রেনিং-এর কারণে বলতে পারলাম। ট্রেনিং না থাকলে বাবার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যেত। চোখ ভেজা ভেজা হয়ে যেত। তুমি তাড়াতাড়ি রুটি বানিয়ে নিয়ে এসো। খাওয়া-দাওয়ার পর ইন্টারভ্যু পর্ব।

কীসের ইন্টারভ্যু ?

মাজেদা খালাকে তোমার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিছু বুঝতে না পারা খুবই ভালো কথা। যত কম বুঝবে তত ভালো। কাগজ-কলম আছে না ? কাগজ কলম দাও- আমি পয়েন্টগুলো লিখে নেই। কী কী প্রশ্ন করব ঠিক করি।

ফুলফুলিয়া আনন্দিত গলায় বলল, আমার এখন রুটি বানাতে ইচ্ছে করছে না। আপনার প্রশ্নগুলো শুনতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক আছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব আগে শেষ হোক ।

ফুলফুলিয়া কাগজ-কলম এনে দিল। খাটের উপর বসল। আনন্দ ও উত্তেজনায় তার চোখ চকচক করছে। আমি বললাম, তোমার নাম কী ?

ফুলফুলিয়া।

ফুলফুলিয়া কোনো নাম না, ভালো নাম বলো।

আক্তারী জাহান।

বয়স?

একুশ।

উচ্চতা?

বলতে পারছি না। উচ্চতা কখনো মাপি নি ।

ওজন নিয়েছ ? ওজন কত ?

ওজনও নেই নি ।

যাই হোক অনুমান করে লিখে নিচ্ছি— উচ্চতা পাচ ফুট পাঁচ। ওজন পঞ্চাশ কেজি। পড়াশোনা কি?

ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি।

কোন ডিভিশন ?

ফাস্ট ডিভিশন।

বর্তমানে কী করছ ?

আমাদের এখানে একটা ক্লিনিক আছে। ক্লিনিকে শমসের আলি বলে একজন ডাক্তার আছেন। আমি তার রোগীদের সিরিয়েল দেই।

ক্লিনিকে আয়ার কাজ কখনো করেছ ?

জ্বি করেছি। শুরুতে তাই করতাম। ডাক্তার চাচা সেখান থেকে আমাকে নিয়ে রোগী দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।

কী খেতে পছন্দ ? আলাদা করে আইটেম বলবে। মাছের মধ্যে কোন মাছ ?

ইলিশ মাছ।

ভর্তার মধ্যে কোন ভর্তা ?

শুকনা মরিচের ভর্তা।

পোলাও, ভাত, খিচুড়ি - এই তিনটের মধ্যে কোনটা পছন্দ ?

খিচুড়ি।

শুকনা খিচুড়ি না ঢালঢ্যালা খিচুড়ি ?

শুকনা।

পছন্দের ফুল ?

যুঁই ফুল।

একজন খুব পছন্দের মানুষের নাম বলো।

ফুলফুলিয়া হেসে ফেলল। আমি বললাম, হাসছ কেন ? ফুলফুলিয়া বলল, হাসছি কারণ আমি যখনই আমার খুব পছন্দের মানুষের নাম বলব আপনি বিশ্বাস করবেন না। কারণ আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ হচ্ছেন আপনি অথচ আপনার সঙ্গে মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা হয়েছে।

তোমার খুব অপছন্দের একজন মানুষের নাম বলো।

আমার বাবা ।

জহির তোমার খুব পছন্দের তালিকায় নেই ?

না। তিনি মোটামুটি পছন্দের একজন।

মোটামুটি পছন্দের একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছ ?

ফুলফুলিয়া চমকে উঠে বলল, তাকে আমি কেন বিয়ে করব ?

বিয়ের কোনো কথা তার সঙ্গে তোমার হয় নি ?

না।

জহির তো বিয়ে করার জন্যে খুবই ভালো ছেলে। জহির যে কত ভালো ছেলে সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আমি তোমাকে দিতে পারি।

সার্টিফিকেট দিতে হবে না। মানুষের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মানুষটা ভালো না মন্দ।

তাই না কি ?

হ্যাঁ তাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে হয়তো এটা বোঝা সম্ভব না। কিন্তু সব মেয়ের এই ক্ষমতা আছে।

জহির তো পরিকল্পনা করে রেখেছে তোমাকে কাজি অফিসে নিয়ে বিয়ে করবে। বিয়েতে আমি একজন সাক্ষী । তোমার তরফ থেকে যদি কোনো সাক্ষী না পাওয়া যায় দ্বিতীয় সাক্ষীও আমিই জোগাড় করব।

কী সর্বনাশ! এইসব আপনি কী কথা বলছেন! আমার তো বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী নাইক্ষ্যংছড়ি পোস্টাপিসের পোস্টমাষ্টার। ঐ এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালিতে

ঝামেলা হচ্ছে এই ভয়ে সে আমাকে নিতে চায় না।

আমি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'পবিত্র গাভী'।

ফুলফুলিয়া বলল, পবিত্র গাভী মানে কী ?

আমি বললাম, আমেরিকানরা কোনো ঘটনায় যদি খুবই বিস্মিত হয় তাহলে বলে "হলি কাউ"। ঐটাই বাংলা করে বললাম— 'পবিত্র গাভী' ।

ফুলফুলিয়া বলল, পবিত্র গাভী তো আপনার আগে আমার বলা উচিত।

বলো।

ফুলফুলিয়া খুব গভীর গলায় বলল, পবিত্র গাভী। বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, যাও রুটি বানিয়ে নিয়ে এসো। বেশি রাত করা যাবে না। মাজেদা খালার কেয়ারটেকার অপেক্ষা করছে। তোমার উপর প্রতিবেদনটা হাতে হাতে নিয়ে যাবে।

মাজেদা খালাটা কে ?

মাজেদা খালা হচ্ছেন তোমার 'হলেও হতে পারত শাশুড়ি'। খুবই ইন্টারেস্টিং মহিলা। লোকজন গাছের ওপর ভূত বসে থাকতে দেখে। উনি একমাত্র মহিলা যিনি তাঁর শোবার ঘরের মশারির ভেতর ভূত বসে থাকতে দেখেন। বৃদ্ধ ভূত। 'Old man and the sea'-র মতোই 'Old man and the mosquito net.'

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কথা বোঝার দরকার নেই। তুমি তোমার কাজ কর। আমি এখানে বসেই প্রতিবেদনটা লিখে ফেলি। দীর্ঘ প্রতিবেদনের দরকার নেই। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে সংক্ষিপ্ত চিঠি দিয়েই কাজ সারা যায়। মাজেদা খালাকে সংক্ষেপ করে আমি লিখলাম 'প্রিয় মা-খালা'। অন্যরকম একটা অর্থ দাঁড়িয়ে গেল। চিঠির শুরুই হলো রহস্যময়।

> প্রিয় মা-খালা,
>
> ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি ফুলফুলিয়ার বাবার শোবার ঘরে বসে আছি। ফুলফুলিয়া রুটি সেঁকতে গিয়েছে। চা-রুটি খেয়ে চলে আসব। ফুলফুলিয়া মেয়েটার বায়োডাটা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। ওজন এবং উচ্চতা অনুমানে লিখলাম। এই দু'টি তথ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে।
>
> মেয়েটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হবার একশটি কারণ আছে। আমি শুধু একটা কারণ উল্লেখ করব। কারণটা হলো— 'বারুদ ভেজা।'। মনে হচ্ছে তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ? আমি ব্যাখ্যা করে বলি। একবার যুদ্ধের সময় এক গোলন্দাজ সেনাপতির দায়িত্ব ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থান নেওয়া। সেখান থেকে যখন সে দেখবে শত্রু আসছে তখন সে গোলাবর্ষণ করবে ।
>
> শত্রু এলো ঠিকই কিন্তু গোলন্দাজ সেনাপতি গোলাবর্ষণ করল না। তাকে কোর্টমার্শাল করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো । তাকে বলা হলো গোলাবর্ষণ না করার পেছনে তোমার কি কোনো বক্তব্য আছে ?
>
> সেনাপতি বলল, গোলাবর্ষণ না করার পেছনে আমার একশ' দুটা যুক্তি আছে। তার প্রথমটা হলো- আগের রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। সব বারুদ গেছে ভিজে।

বিচারপতি বললেন, বাকি একশ একটা যুক্তি বলতে হবে না। বারুদ ভেজা এই একটাই যথেষ্ট। যাও তুমি খালাস।

ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে বারুদ ভেজার অর্থ হলো— মেয়েটা বিবাহিতা। তার স্বামী নাইক্ষ্যংছড়িতে আছে। পোস্টমাস্টার। পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যার কারণে স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারছে না ঠিকই কিন্তু পোস্টমাস্টার হবার সুবাদে প্রতিদিনই একটা করে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছে।

আশা করি ফুলফুলিয়ার ব্যাপারে তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। এখন বলো তোমার বৃদ্ধ ভূতের খবর কী ? তাকে কি আবারো দেখেছ ? আগেরবার সে বিছানায় বসে ছিল। এখনো কি বসা অবস্থায় পেয়েছ ? "বসতে পেলেই শুতে চায়" এই প্রবচন ভূতদের বেলাতেও যদি খাটে তাহলে এর পরের বার শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখার কথা । তুমি ভালো থেকো।

৩

আমার সামনে জহির বসে আছে। তার গায়ে হালকা কমলা রঙের গেঞ্জি। কী সুন্দর তাকে মানিয়েছে! গেঞ্জির কমলা রঙের আভা তার গালে পড়েছে, খানিকটা পড়েছে তার চোখে— গাল এবং চোখে কমলা রঙ চকচক করছে। আমি বললাম, জহির তোকে সুন্দর লাগছে রে! প্যাকেজ নাটকের নায়কের মতো লাগছে। পার্কে গানের দৃশ্যের শুটিং করার জন্যে নায়ক প্রস্তুত। নায়িকা এখনো আসে নি। নায়িকার জন্যে অপেক্ষা ।

জহির হাসল। মিচিকা ধরনের হাসি ।

আমি বললাম, তুই হাসছিস কেন ? মিচিকা টাইপ হাসি ?

জহির বলল, পরীক্ষার হলে যাবার কথা বলে এখানে চলে এসেছি। এটা ভেবে কেন জানি মজা লাগছে।

পরীক্ষা দিচ্ছিস না?

না।

পরীক্ষা যে দিচ্ছিস না খালা-খালু কি জানেন ?

এতক্ষণে সম্ভবত জেনে গেছেন। আমি এক ওষুধের দোকান থেকে টেলিফোন করে মা-কে বলেছি।

খালা কী বললেন ?

কিছু বললেন না। প্রথমে কোঁ করে একটা শব্দ হলো - তারপর ধপাস শব্দ শুনলাম। মনে হয় মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। মা খুব সহজে অজ্ঞান হতে পারেন। একবার কী হয়েছে শোন, খাটের উপর বাবার প্যান্টের কালো বেল্ট পড়েছিল। মা সেই বেল্ট দেখে "সাপ সাপ" বলে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ।

এবার অজ্ঞান হয়েছে তোর পরীক্ষার হলে না যাওয়ায় ?

মনে হয় হয়েছে। আমি ধপাস শব্দ শুনলাম, আমি যতই 'হ্যালো হ্যালো' করি

ওপাশ থেকে কোনো শব্দ আসে না ।

তুই মনে হয় মজা পাচ্ছিস ?

পাচ্ছি। ভাইজান শোন, তোমার কাছে আমি খুব জরুরি একটা কাজে এসেছি।

বল শুনি ।

একটু পরে বলি ? প্রথমে শোন ফুলফুলিয়ার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো সেই গল্প ।

ফুলফুলিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের গল্প করার আর কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

না প্রয়োজন নেই। তবু গল্পটা বলি ? খুবই ইন্টারেষ্টিং গল্প। আমি লেখক হলে একটা গল্প লিখে ফেলতাম। হয়েছে কী ভাইজান— ঝিকাতলা স্টাফ কোয়ার্টারে আমার এক বন্ধু থাকে। দুপুরবেলা ওর কাছে গিয়েছি। একটা বই নিতে। ও বাসায় ছিল না। চৈত্র মাস, দুপুরে ঝাঝা রোদ। রিকশা পাচ্ছি না। রিকশার খোজ করছি- হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে দুহাতে দুটা আইসক্রিম নিয়ে আসছে। দামি কোনো আইসক্রিম না। সস্তার জিনিস— ললিপপ । এমন কোনো অদ্ভুত দৃশ্য না যে আমাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু ঐ দিন আমি হা করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি সে এগিয়ে আসছে। আমাকে ক্রস করে চলে গেল— তারপরেও আমি তাকিয়ে রইলাম । তারপর হঠাৎ দেখি মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেছে। আমার দিকে ফিরে আসছে। সে এসে আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আইসক্রিম খাবেন? নিন আইসক্রিম খান ।

ভাইজান আমি কোনো কথা না বলে আইসক্রিম নিলাম। পাথরের মূর্তির মতো আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা বলল, খান আইসক্রিম খান। আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসক্রিমে কামড় দিলাম। যেন জীবনে এই প্রথম আইসক্রিম খাচ্ছি। ভাইজান গল্পটা কেমন ?

ভালো। মেয়েটা দুটা আইসক্রিম নিয়ে যাচ্ছিল কেন ?

সে আর তার বাবা তাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল। তারা বাবা আইসক্রিম খেতে চাইল বলেই দুটা আইসক্রিম কেনা হলো। তখন বাবা হঠাৎ কী কারণে মেয়ের ওপর রেগে উল্টো দিকে চলে গেল। মেয়েটা দুটা আইসক্রিম নিয়ে বাসায় ফিরছে। মনে মনে ঠিক করেছে পথে টোকাই শ্রেণীর কাউকে দেখলে একটা আইসক্রিম দিয়ে দেবে। আমাকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আইসক্রিমটা আমাকে দিয়ে দিল ।

তুই কি করলি? আইসক্রিম খেতে খেতে ফুলফুলিয়ার বাসা পর্যন্ত গেলি?

হ্যাঁ ভাইজান । সে আমাকে যেতে বলে নি । হ্যামিলনের বংশীবাদকের পেছনে পেছনে ছেলেপুলেরা যেভাবে গিয়েছে আমি ঠিক সেইভাবেই গিয়েছি। একসময় মেয়েটা বলল, এই বাড়িতে আমরা থাকি। এখন আপনি বাসায় যান। আমাকে আমার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। ঘটনাটা কেমন ভাইজান ? ইন্টারেষ্টিং না ?

হু।

ভাইজান আমি ঠিক করেছি এই ঘটনা নিয়ে একটা ছোটগল্প লিখব। গল্পের নাম- “সবুজ আইসক্রিম”। আমি যে আইসক্রিমটা খেয়েছিলাম সেটার রঙ ছিল সবুজ। গল্পে ছেলেটার নাম থাকবে টগর। মেয়েটার নাম থাকবে বেলী। দুটাই ফুলের নাম।

গল্পের নামটা খারাপ না। তবে পাত্র-পাত্রীর নাম ভালো হয় নি।

গল্পের শেষটা ভেবে রেখেছি। গল্পের শেষে টগর এবং বেলী কাজির অফিসে গিয়ে বিয়ে করবে। বিয়ের পর পরই দু'জন দুটা সবুজ আইসক্রিম খেতে খেতে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। মিলনাত্মক গল্প ।

মিলনাত্মক গল্প না লিখে বিয়োগান্তক লেখ। বাস্তবের সঙ্গে মিলবে। যেমন ধরা এক পর্যায়ে ছেলেটা জানতে পারল যে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে খুব মনে কষ্ট পেল। একবার ভাবল সারাজীবন বিয়ে করবে না। সারাজীবন একা থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল। তিন বছরের মাথায় তাদের ফুটফুটে একটা মেয়ে হলো। বেলী বলল, ওগো মেয়েটার সুন্দর একটা নাম রাখো তো। আনকমন নাম। টগর বলল, ওর নাম রাখলাম "আইসক্রিম"।

জহির বলল, বিয়োগান্তক গল্পটাও খারাপ না। দেখি দু'ভাবেই লিখব। এখন তোমাকে জরুরি কাজের কথাটা বলেই চলে যাব।

যাবি কোথায় ?

এখনো ঠিক করিনি কোথায় যাব। বাড়িতে তো যাওয়াই যাবে না। কোনো এক বন্ধুর বাসায় উঠব। তারপর ডিসিসান নেব। ফুলফুলিয়াকে একবার দেখে আসতে পারলে ভালো হতো। সেটা মনে হয় ঠিক হবে না। তুমি কী বলো ? ঠিক হবে ?

না।

ওর ছবিগুলি তো ওকে ফেরত দেয়া দরকার। ছোটবেলার ছবি দিয়ে দুটা প্রিন্ট বের করেছি। একটা আইনষ্টাইনের সঙ্গে আরেকটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ছবিটা ভালো হয়েছে। ছবি দেখে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তার নাতনির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

চা খাবি ?

না ভাইজান, চা খাব না। এখন বিদেয় হব। বেশিক্ষণ থাকলে বাবার হাতে ধরা পড়ে যাব। আমি মোটামুটি নব্বই দশমিক পাঁচ ভাগ নিশ্চিত যে বাবা খবর পেয়েই সরাসরি তোমার কাছে চলে আসবে।

আমারও তাই ধারণা।

বাবার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের দু'জনকেই পালিয়ে যেতে হবে। আমি কোথায় যাব এটা এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেললাম।

কোথায় যাবি ?

কোথাও যাব না। শুধু হাঁটব ।

শুধুই হাঁটবি মানে ?

ভাইজান, তুমি ফরেস্টগাম্প ছবিটা দেখছ ?

না।

ফরেস্টগাম্প ছবিতে অভিনেতা টম হ্যাংকস হাঁটা শুরু করে। দিনের পর দিন কোনো কারণ ছাড়াই হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতেই তার দাড়ি গোফ গজিয়ে যায়। আমিও টম হ্যাংকস এর মতোই হাঁটব তবে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা না। আমি হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করব।

কী চিন্তা করবি ?

পৃথিবীতে যে মানুষের মতো ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী এসেছে, এরা কেন এসেছে ? কেন প্রকৃতি এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করল ? প্রকৃতি মানুষের কাছে কী চাচ্ছে ?

হেঁটে হেঁটে এমন জটিল চিন্তা করবি ?

হু। ভাইজান আমি হাঁটা শুরু করব তেতুলিয়া থেকে। হাঁটতে হাঁটতে বাংলাদেশের শেষ সীমানা টেকনাফের শাহপরীতে যাব। সেখানে সমুদ্রে নেমে গোসল করব। গোসল করে উঠে এসে দাড়ি গোফ কামাব। আইডিয়াটা কেমন ভাইজান ?

আইডিয়া খারাপ না ।

এখন তোমাকে জরুরি কথাটা বলি। জরুরি কথাটা হচ্ছে ফুলফুলিয়াকে তুমি ছবি দুটা দিয়ে আসবে। আমি যাব না। এখন আমার আর যেতে ইচ্ছা করছে না।

খামে ভরে বাইপোস্ট পাঠিয়ে দিলেও তো হয়।

না ভাইজান, তোমাকেই যেতে হবে। আমি তো জানতাম না মেয়েটা বিবাহিতা। গতকাল রাতে মা'র কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু তার আগেই একটা ভুল করে ফেলেছি। পরশু দুপুরে ফুলফুলিয়াকে একটা চিঠি লিখে পোষ্ট করেছি। বত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠি। আমি চাই না এই চিঠিটা সে পড়ুক।

বত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠি লিখেছিস কষ্ট করে, আরো কয়েক পৃষ্ঠা লিখলে তো উপন্যাস হয়ে যেত।

আমিও পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখব ঠিক করেছিলাম। এ4 সাইজ কাগজ শেষ হয়ে গেল। আমি যে-ধরনের চিঠি লিখেছি সে-ধরনের চিঠি লিখতে কষ্ট হয় না। দুই হাজার তিন হাজার পৃষ্ঠাও লেখা যায়। একটা বাক্যই বারবার লিখি— “আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।”

আমি বিড়বিড় করে বললাম, পবিত্র গাভী ।

জহির বলল, চিঠি তোমাকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে ভাইজান।

আমাকে গিয়ে ফুলফুলিয়াকে বলতে হবে যে, তোমার নামে আজ-কালের ভেতর একটা চিঠি আসবে। চিঠিটা তুমি না পড়েই নষ্ট করে ফেলবে।

ঠিক ধরেছ ভাইজান । এই কাজটা তোমাকে করতে হবে।

কোনো মেয়ের পক্ষে চিঠি না পড়ে নষ্ট করে ফেলা তো অসম্ভব ব্যাপার।

এই জন্যেই তো তোমাকে যেতে বলছি। তুমি বললেই অসম্ভব সম্ভব হবে। এই ক্ষমতা তোমার আছে।

আচ্ছা দেখি ।

দেখাদেখি না। তুমি আজই যাবে এবং চিঠিটা না পড়ার কথা এমন ভাবে বলবে যেন সে চিঠি না পড়ে। একটা বিবাহিতা মেয়ে যখন দেখবে কেউ তাকে তখন তার ঘেন্না লাগবে। ভাইজান চিঠিটা ফেরত আনতে পারবে না ?

চেষ্টা করব ।

ভাইজান উঠি ?

যা হাঁটা শুরু করা। খালি পায়ে না হেঁটে ভালো কেডস এর জুতা কিনে নে।

আমি ঠিক করেছি খালি পায়েই হাঁটব। সঙ্গে টাকা-পয়সা কাপড় চোপড় কিছুই থাকবে না। ক্ষিধে লাগলে মানুষের বাড়ি গিয়ে খাওয়া চাইব । খেতে দিলে খাব। খেতে না দিলে খালি পেটেই হাঁটব। সন্ন্যাসীদের মতো জীবন।

নাগা সন্ন্যাসীদের মতো পুরোপুরি নগ্ন হয়ে তুই যদি হাঁটতে পারিস তাহলে কিন্তু খাওয়ার অভাব হবে না। একজন নগ্নমানুষ কোনো বাড়িতে খেতে চাইছে আপদ বিদেয় করার জন্যেই তারা তাড়াতাড়ি খাবার দেবে। টাকা-পয়সা চাইলে টাকা-পয়সা দেবে।

নগ্ন হয়ে হাঁটতে পারব না ভাইজান, লজ্জা লাগবে।

লজ্জা লাগলে তো কিছু করার নেই। তোকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিলাম। যদি দেখিস মহাবিপদে পড়ে গেছিস, খাওয়া জুটছে না— তখন ‘নাগা' সিস্টেম।

জহির উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, শুভ দেশ হন্টন।

বিকেল তিনটায় খালু সাহেব চলে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কপালের চামড়া কুঁচকে আছে। চোখ ছোট ছোট। সুপ্ত অগ্নিগিরি টাইপ ভাব ভঙ্গি। বিস্ফোরণের আগে আগ্নেয়গিরি অতিরিক্ত শান্ত থাকে। খালু সাহেবও অতিরিক্ত শান্ত।

কেমন আছ হিমু ?

জ্বি ভাল।

তোমাকে পাওয়া যাবে ভাবি নি। তুমি তো ঘরে বসে থাকার লোক না। শুয়ে আছ যে, শরীর খারাপ না-কি ?

জ্বি না। শরীর ভালো।

অফিস থেকে বাসায় যাবার পথে ভাবলাম তোমার সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেয়ে যাই। জহিরকে নিয়ে কিছু কথা ছিল। কথাও বলি ।

আমি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম— আমি চায়ের কথা বলে আসি ।

খালু সাহেব বললেন, চায়ের কথা বলতে হবে না। আমি ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। অফিসের পিওনের কাছে ফ্লাস্ক। কাপ আনতে ভুলে গেছি। ওকে দুটা মগ। কিনতে পাঠিয়েছি।

আমার কাছে কাপ ছিল ।

তোমারটা তোমার কাছে থাকুক। মগ দুটা তোমাকে দিয়ে যাব। অফিস ফেরত মাঝে মধ্যে যদি চা খেতে আসি মাগে করে চা খাওয়া যাবে।

আপনি কি প্রায়ই আসবেন ?

খালু সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চেয়ারে বসলেন। টেবিলে রাখা ফুলফুলিয়ার ছবি দুটা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কার ছবি ?

রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের ছবি ।

সে তো বুঝতেই পারছি। মেয়েটা কে ?

ওর নাম ফুলফুলিয়া।

ফুলফুলিয়া ? নামটা পরিচিত লাগছে কেন ?

খালার কাছে তার নাম মনে হয় শুনেছেন।

ও আচ্ছা— দ্যাট ফুলিফুলিয়া ? রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের সঙ্গে তার ছবি কীভাবে এলো ।

এটা ফটোগ্রাফিক ট্রিক। ফটোশপ নামের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামে এই কাজটা সহজেই করা যায়।

জহির করেছে ?

জ্বি।

পড়াশোনা বাদ দিয়ে সে ট্রিক ফটোগ্রাফ করছে ? তুমি নিশ্চয়ই জানো আজ সে পরীক্ষা দিতে যায় নি।

জানি। আমার কাছে এসেছিল।

তোমার কাছে যে আসবে এটা আমি ধরেই নিয়েছি।

খালু সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালেন। তাঁর কপালের চামড়ায় আরেকটা ভাঁজ পড়ল। চোখ দুটা আরো ছোট হয়ে গেল। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এখন গা ঝাড়া দিচ্ছে। যে-কোনো সময় লাভা বের হতে শুরু করবে। খালু সাহেবের পিওন দুটা মগ এবং ফ্লাস্ক নিয়ে ঢুকেছে। লোকটা অতি দ্রুত মাগে চা ঢেলে দিল। সে

চায়ের সঙ্গে কেকও এনেছে। এক বাক্স টিস্যু পেপার এনেছে। টিস্যু পেপার, কেক রেখে অতিদ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মনে হয় তার ওপর এ রকম নির্দেশই ছিল।

হিমু।

জ্বি।

জহিরের পরিকল্পনা কী তা তুমি জানো ?

জানি। আমাকে বলে গেছে। আপাতত সে হাঁটবে।

হাঁটবে মানে ?

প্রথমে যাবে তেতুলিয়া, সেখান থেকে হাঁটা শুরু করবে। হাঁটা বন্ধ হবে শাহপরী দ্বীপে। শাহপরী দ্বীপ হলো বাংলাদেশের শেষ সীমানা। শাহপরী দ্বীপে পৌঁছার পর সে সমুদ্র স্নান করবে। দাড়ি কামাবে।

দাড়ি কামাবে মানে ?

এই ক'দিন সে দাড়ি গোঁফ কামবে না। ছয় মাসে দাড়ি গোফ অনেক বড় হয়ে যাবে। কামানো ছাড়া গতি কী ?

সে ছয় মাস ধরে হাঁটবে। এটাই তার পরিকল্পনা ?

জ্বি।

সে যে বর্তমানে মানসিক রোগী এটা কি সে জানে ?

জ্বি না জানে না। মানসিক রোগী কখনোই বুঝতে পারে না যে সে মানসিক রোগী ।

তোমাকে যখন সে তার পরিকল্পনার কথা বলল, তখন তুমি তাকে কী বললে?

আমি তাকে ভালো কেডস জুতা কিনতে বললাম। খাওয়া দাওয়ার সমস্যা যদি হয় তখন একটা বুদ্ধি বলে দিয়েছি। এই বুদ্ধিমতো কাজ করলে খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হবে না। যে-কোনো বাড়িতে খাবার চাইলেই খাবার দেবে।

কী বুদ্ধি ?

খালু সাহেব সেটা আপনাকে বলব না। বললে আপনি রাগ করতে পারেন।

রাগ করব না, বলো। আমি হতভম্ব অবস্থায় আছি। হতভম্ব মানুষ রাগ করতে পারে না ।

আমি জহিরকে বলেছি যদি সে দেখে কেউ তাকে খেতে দিচ্ছে না তাহলে সে যেন নাগা সন্ন্যাসী টাইপ হয়ে যায়। কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলে পুরো নগ্ন হয়ে যাওয়া। শুধু পায়ে থাকবে কেডস জুতা। এই অবস্থায় কোনো বাড়িতে খাবার চাইলে অবশ্যই খাবার দেবে।

খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলছেন না। হাত বাড়িয়ে চায়ের মগ নিয়ে মাগে চুমুক দিলেন। সিগারেট ধরলেন। আমি নিজেই মাগে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, চা-টা খুবই ভালো হয়েছে। খালু সাহেবের ঠোঁটের কোণায় রহস্যময় হাসি দেখা গেল।

হিমু!

জ্বি।

তুমি তাকে নেংটো হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি খাবার ভিক্ষা করে খেতে বলেছ ?

তেমন ইমার্জেন্সি যদি হয় তাহলেই এই পথে যেতে বলেছি। তবে সে যাবে না। সে বলেছে তার লজ্জা করে ।

তুমি একটা কথা বলবে আর তা সে করবে না এটা কখনো হবে না। ঠিকই সে নেংটো হয়ে পথে পথে হাঁটবে। হিমু শোন, আমার ধারণা— না ধারণা না আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুরো ব্যাপারটার আর্কিটেক্ট হচ্ছে তুমি। কফির দোকান, ফুলফুলিয়া, পরীক্ষা না দেয়া, নেংটো হয়ে হাঁটাহাঁটি সব কিছুর মূলে আছ তুমি। আমার ছেলে গোল্লায় গেছে যাক- আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমি তোমার হিমুগিরি বের করে দেব। তোমার খালা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তুমি আমার ছেলেকে আমার সামনে হাজির করবে। যদি করতে পার তাহলেই তোমাকে ক্ষমা করব। আর নয়তো না।

খালু সাহেব সময় আরেকটু বাড়ানো যায় না ? বাহাত্তর ঘণ্টা করা যায় ?

চব্বিশ ঘণ্টা মানে চব্বিশ ঘণ্টা। এখন বাজে দুটা একুশ । আমি আগামীকাল দুটা একুশে তোমার এখানে আসব। তখন যেন জহিরকে দেখতে পাই।

খালু সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, জহির কোথায় আছে আমি জানি না। আমাকে চেষ্টা করতে হবে টেলিপ্যাথিক পদ্ধতিতে। একটু সময় তো লাগবেই।

খালু সাহেব আগুন কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এখন ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। রাগ সামলাবার চেষ্টা। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। স্ট্রোক ফোক না হয়ে যায়। আমি বললাম, চলুন আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসি ।

ধন্যবাদ। তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। I know the way.

খালু সাহেবের রাগ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। রাগ এবং টেনশনের সময় তিনি বাংলা ভুলে যান। তাঁকে আর ঘাটানো ঠিক হবে না। আমিও খালু সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন বসে পড়লাম। আমার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়। এই চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু করা যাবে না। ফুলফুলিয়ার কাছ থেকে অবশ্যি টেলিপ্যাথিক পদ্ধতিতে মানুষকে ডাকার কৌশল শিখে আসা যায়। খালার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। খালার বাসায় যাবার প্রশ্নই উঠে না। কথা বলার কাজটা সারতে হবে টেলিফোনে। কোনটা আগে করব বুঝতে পারছি না খালার সঙ্গে কথা বলব, না ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করব ? আশ্চর্য ব্যাপার খালু সাহেব এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে বিশেষ কোনো কথা বলতে চান । কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি বললাম, খালু সাহেব কিছু বলবেন ?

চব্বিশ ঘণ্টা যাক তারপর যা বলার বলব।

খালু সাহেব দরজার দিকে রওনা হলেন। ফ্লাস্কটা ফেলে যাচ্ছেন। নিয়ে যেতে হবে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। বললে হয়তো আরো রেগে যাবেন। থাকুক ফ্লাস্ক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে দামি জিনিস। বরং এক কাজ করা যেতে পারে, ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। ঐ দিন তাঁর গরম রুটিগুলো ভালো ছিল। চা ভালো ছিল না।

কলিং বেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল এবং দরজা পুরোপুরি খোলার আগেই ফুলফুলিয়া বলল, ভাইজান আসুন। চমৎকৃত হবার মতো ঘটনা। দরজায় কোনো পিপ হোল নেই যে ফুলফুলিয়া আগে থেকে দেখবে আমি এসেছি। যেহেতু চমৎকৃত হবার ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই, আমি চমৎকৃত হলাম না। খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, কেমন আছ ?

ফুলফুলিয়া বলল, ভালো।

তোমার দুটা ছবি আছে আমার কাছে। ছবি দুটা দিতে এসেছি।

ফুলফুলিয়া বলল, রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের সঙ্গে ছবি ?

তুমি ব্যাপারটা জানো না-কি ?

উনি বলেছেন। উনি আসলে হঠাৎ করে ছবি দেখিয়ে আমাকে বিস্মিত করতে চেয়েছিলেন। পেটে কথা রাখতে পারেন নি। আগেই বলে দিয়েছেন। ভাইজান শুনুন, আমার বাবা বাসায় আছেন। উনার শরীর সামান্য খারাপ। আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কিছু মনে করবেন না।

উনি কি সব সময় খারাপ ব্যবহার করেন ?

কী করলে উনি খুশি হন ?

কোনো কিছুতেই খুশি হন না। তবে তার ব্যাঞ্জো বাজনার প্রশংসা করলে তিনি মনে মনে খুশি হন।

কী বাজনা বললে- ব্যাঞ্জো ?

জ্বি।

চল, তোমার বাবার কাছে আমাকে নিয়ে চল। উনার নাম কী ?

শমসের উদ্দিন ।

খাটের ওপর এই গরমের ভেতর কথা গায়ে দিয়ে জবুথবু হয়ে এক বৃদ্ধ বসে আছে। নেশাগ্রস্ত মানুষের লাল চোখ। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিছু মানুষ আছে সপ্তাহে একদিন শেভ করেন। উনি মনে হয় সেই দলের। ভদ্রলোকের মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফের জঙ্গল থাকলেও মাথা চুল শূন্য। টাক মাথা মানুষেরও কিছু চুল থাকে। উনার তাও নেই। তবে তার টাকে বিশেষত্ব আছে। টাক চকচক করছে না। ম্যাট ফিনিশিং। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন।

আপনে কে ?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমার নাম হিমু।

চান কী ?

বসে তারপর বলি। বসতে পারি ?

শমসের উদ্দিন লাল চোখে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন । আমার দিকে না তাঁর মেয়ের দিকে। আমি ফুলফুলিয়াকে বললাম, এই মেয়ে তুমি আমাদের দুজনকে চা দাও। আমি ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। চা খেতে খেতে আমি তোমার বাবার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলি। জরুরি কথা বলার সময় তোমার না থাকাই ভালো ।

শমসের উদ্দিন আমার দিকে ফিরলেন । আগের মতোই খ্যাক খ্যাক করে বললেন, মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন ? এই এক যন্ত্রণায় পড়েছি। দুই দিন পরে পরে যন্ত্রণা। বাংলাদেশে মনে হয় বিবাহযোগ্য মেয়ে এই একটা । প্রস্তাব দেয়ার আগে শুনে রাখেন— আমার মেয়ের দুই বছর আগে বিবাহ হয়েছে। জামাই পোষ্টমাস্টার ।

এটা কোনো ব্যাপার না ?

কী বললেন, এটা কোনো ব্যাপার না ?

জ্বি না। মোঘল ইতিহাস পড়লে দেখবেন মোঘল সম্রাটদের কোনো একটা মেয়েকে পছন্দ হলো। দেখা গেল সেই মেয়ে বিবাহিতা। কোনো অসুবিধা নেই। হাসবেন্ড মেরে ফেলা। নতুন করে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

চুপ!

আমাকে চুপ করতে বলছেন ?

হ্যাঁ চুপ। আর কোনো কথা না। এখন গেট আউট। এই মুহুর্তে গেট আউট ।

আসল কথাটা তো এখনো বলতে পারি নি ।

আসল কথা নকল কথা কোনো কথা না। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। মারধোর করব না। মানে মানে বের হয়ে যাও ।

আপনার ব্যাঞ্জো বাজনা বিষয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। আপনার মেয়ের বিবাহের বিষয়ে না। মোঘল সাম্রাজ্যও তো এখন নাই যে স্বামী খুন করে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

ব্যাঞ্জো বিষয়ে তোমার কী কথা ?

একটা সিডি কোম্পানি আপনার ব্যাঞ্জো নিয়ে সিডি বের করতে চায়। আমি তাদের এজেন্ট। এই বিষয়ে কথা বলতে এসেছি।

আমার ব্যাঞ্জো বাজনার সিডি বের করতে চায় ?

জ্বি।

তুমি আমার নাম জানো ?

নাম কেন জানিব না ? আপনি হলেন ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ ।

খাঁ পেলে কোথায় ? নামের শেষে খাঁ নাই।

খাঁ নাই, এখন লাগায়ে দিব । ওস্তাদের নামের শেষে খাঁ না থাকলে মানায় না। আপনি আগ্রহী হলে বলেন। টার্মস এন্ড কন্ডিশন ঠিক করি।

আমার ব্যাঞ্জো বাজনা তুমি শুনেছ ?

আমি শুনি নি। শোনার ইচ্ছাও নাই। গান বাজনা আমার পছন্দের জিনিস না। আমি এজেন্ট। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে, করলাম। বাকি আপনার ইচ্ছ। শুনেছি ব্যাঞ্জো যন্ত্রটা আজকাল বাজানো হয় না। লোকজন এই যন্ত্রটার কথা ভুলেই গেছে। আর আপনি নাকি মোটামুটি বাজাতে পারেন।

মোটামুটি বাজাই ? আমি মোটামুটি বাজাই ? আমি মোটামুটি বাজালে সিডি কোম্পানি তোমাকে আমার কাছে পাঠাতো সিডি বের করার জন্য ? এরা তো তোমার মত ঘাস খায় না।

তাও ঠিক। আপনি কি রাজি ?

ফট করে রাজি অরাজি কী ? জিনিসটা ভালো মতো বুঝে নেই। চা খাও। কী ধরনের বাজনা এরা চায় ? রাগ প্রধান ?

সেটা আপনার ইচ্ছা । রাগ-প্রধান বাজাতে চাইলে রাগ-প্রধান বাজাবেন । ভালোবাসা-প্রধান বাজাতে চাইলে ভালোবাসা-প্রধান বাজাবেন।

ভালোবাসা-প্রধান কী ?

আপনারা সঙ্গীতের লোক। আপনারা জানবেন ভালোবাসা-প্রধান কী ?

তুমি তো দেখি গান বাজনা লাইনের কিছুই জানো না।

আগেই তো বলেছি কিছু জানি না। আপনি কী বাজাবেন আপনি ঠিক করুন। আপনার সঙ্গে কি তবলা ফবলা লাগবে ?

ফবলা কী ? এইভাবে কথা আমার সঙ্গে বলবে না।

জ্বি আচ্ছা বলব না।

শমসের উদ্দিন সাহেবের চোখ মুখ কোমল হয়ে গেল। তিনি এই প্রথম স্নেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কী ?

হিমু।
ভালো নাম কী ?
ভালো নাম, খারাপ নাম একটাই— হিমু।
সত্যি সত্যি ব্যাঞ্জোর সিডি বের করবে ?
অবশ্যই।
এই উপমহাদেশে আমার চেয়ে ভালো ব্যাঞ্জো কেউ বাজায় না। এটা জানো ?
জ্বি না।
তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি, মনে কিছু নিও না।
আপনি ওস্তাদ মানুষ আপনি তো তুমি তুমি করে বলবেনই। তাহলে কথাবার্তা ফাইন্যাল ?
শমসের উদ্দিন নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, বত্রিশ মাত্রা, সঙ্গে তেহাই— রাগ কাফি যখন ধরব ঝড় তুলে দিব। ব্যাঞ্জোর উপর দিয়ে যখন আঙুল চলবে আঙুল দেখা যাবে না। যদি আঙুল দেখা যায়- আল্লাহর কীরা আঙুল কেটে তোমাকে দিয়ে দিব।
কাটা আঙুল দিয়ে আমি কী করব ?
তুমি আঙুল কেটে কী করবে সেটা তোমার বিবেচনা। আমার আঙুল কেটে দেয়ার কথা আমি দিলাম।
ধন্যবাদ!
তোমার নামটা যেন কী আরেকবার বলো তো। মিহি ? আজকাল মানুষের নাম মনে থাকে না।
আমার নাম হিমু। তবে আপনার যদি মিহি ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাকবেন।
রাতে আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কর। আজ বাসায় মাংস রান্না হবে। ঝোল দিয়ে গো মাংস, সঙ্গে চালের আটার রুটি । রুটি ছিড়ে ছিড়ে মাংসের ঝোলের মধ্যে ফেলবে। রুটি নরম হবে। মুখের মধ্যে ফেলবে আর গিলে ফেলবে।
কবুল।
কবুল মানে কী ?
কবুল মানে আমি রাজি।
খাওয়া দাওয়ার পরে রাগ কাফির একটা বন্দীশ শোনাব। তিন তাল শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।
মাথা তো আমার এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। দিন আরো খারাপ করে।
ঠিক করে বলো তো চালের আটার রুটি করবে না পোলাও রাধবে ? অনেক দিন পোলাও খাই না। দরিদ্র মানুষ, ইচ্ছা করলেও সম্ভব হয় না।
আপনার কি পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে ?
তুমি মেহমান মানুষ এই জন্যে বলছি। আর ফুলফুলিয়া সে-রকম ভালো রাধতেও পারে না। আমার স্ত্রী পারতেন। আফসোস তার হাতের পোলাও তোমাকে খাওয়াতে পারলাম না ।
উনি কোরমা কেমন রাঁধতেন ?
কোরমার কথা বলে দিলে তো মনটা খারাপ করে। শহরের লোকজন তো কোরমা রাঁধতেই পারে না। মুরগির রোস্ট, দোপেয়াজা, ঝালফ্রাই। বাঙালি কোরমার কাছে কিছু লাগে ? তোমার কি কোরমা খেতে ইচ্ছা করছে ?

জ্বি। আপনার কি করছে ?

আমার তো মুখে পানি চলে আসছে। বয়স হয়েছে তো, সুখাদ্যের কথা মনে হলে মুখে পানি চলে আসে। সামলাতে পারি না। দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ফুলফুলিয়া এতক্ষণ পরে চা নিয়ে ঢুকেছে। তার দেরির কারণ বোঝা যাচ্ছে। সিঙ্গাড়া ভেজে এনেছে।

শমসের উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, পোলাও রাধার ব্যবস্থা কর। পোলাও, মুরগির কোরমা, গরুর ঝাল মাংস । মিহি রাতে খাবে।

ফুলফুলিয়া বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। শমসের উদ্দিন বিরক্ত গলায় মেয়েকে বললেন, হা করে তাকিয়ে থাকিস না তো— রান্নাবান্নার জোগাড় কর । টক দৈ এর ব্যবস্থা রাখিস। গুরু ভোজনের পরে টক দৈ হজমের সহায়ক।

ফুলফুলিয়া ঘর থেকে বের হতেই শমসের উদ্দিন আমার দিকে ঝুঁকে এসে গলা নামিয়ে বললেন, মিহি এই যে আমার ব্যাঞ্জোর সিডি বের হচ্ছে। কেন বের হচ্ছে জানো ?

আমি বললাম, না।

শমসের উদ্দিন বললেন, গত মাসে সিলেটে গিয়েছিলাম। শাহজালাল সাহেবের দরগায় গিয়ে কান্নাকাটি করেছি। বলেছি আমার বড় শখ আমার বাজনা দেশের মানুষকে শোনাই। আল্লাহপাক, শাহজালাল সাবের উছিলায় তুমি বান্দার মনের বাসনা পূর্ণ কর। আল্লাহপাক যে তখনই মঞ্জুর করে দিয়েছেন বুঝতে পারি নাই। এখন বুঝলাম। ঠিক করেছি গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে দুরাকাত শোকরানা নামাজ পড়ব। মিহি, তুমি ফুলফুলিয়াকে বলো গোসলের জন্যে গরম পানি করতে। যাও রান্নাঘরে চলে যাও। কোনো অসুবিধা নাই। আমার এই বাড়ি এখন থেকে তুমি নিজের বাড়ি মনে করবে।

আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। ফুলফুলিয়া কুলায় চাল বাছছিল। আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে মোটেই অবাক হলো না। শুধু বলল, সব মানুষকেই কি আপনি মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় নিতে পারেন ? আমাকে পারবেন ?

আমি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, গরম পানি কর তো। খাঁ সাহেব গোসল করবেন।

ফুলফুলিয়া বলল, খাঁ সাহেব কে ?

তোমার বাবা ।

ও আচ্ছা ।

আমি হাসিমুখে বললাম, আরেকটা জরুরি কথা। জহির তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে। পোষ্ট করেছে। এক দুদিনের মধ্যে চিঠিটা তোমার হাতে চলে আসবে। চিঠি তুলে রাখবে। এখন পড়বে না। যখন আমি তোমাকে পড়তে বলব তখন পড়বে। ঠিক আছে ?

ফুলফুলিয়া বেশ কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ নামিয়ে শান্ত গলায় বলল, ঠিক আছে।

ব্যাঞ্জোর আসর বসল রাত বারোটায়। বাড়িওয়ালা না ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো । দরজা-জানালা বন্ধ করতে হলো যেন শব্দ বাইরে না যায়।

বাজনা শুরু হলো। আমি চমকে উঠলাম— এ-কী ? মনে হচ্ছে বাজনার তালে তালে বাতাস কাঁপতে শুরু করেছে। শুধু বাতাস না, এখন মনে হচ্ছে ঘরবাড়ি

দুলছে। বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ড দুলছে। এ যেন অলৌকিক অপার্থিব সঙ্গীতের ঝড়। আমি ভদ্রলোকের আঙুলের দিকে তাকালাম। আঙুল সত্যি সত্যি দেখা যাচ্ছে না। যে-কোনো মহৎ সঙ্গীত বুকের ভেতরে তীব্র বেদনা তৈরি করে। আমার সে-রকম হচ্ছে। বুক টনটন করছে।

এক সময় বাজনা থামল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখি আপনার পা-টা একটু এগিয়ে দিন তো। আপনার পায়ের ধুলা কপালে মাখব।

আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই ভদ্রলোক দুহাতে আমার হাত ঝাপ্টে ধরে তাঁর বুকে লাগালেন এবং ব্যাকুল হয়ে শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন।

৪

ওপাশ থেকে যে টেলিফোন ধরেছে তার গলা আমি চিনতে পারছি না। প্রচুর চিৎকার চোঁচামেচির পর গলা ভেঙে গেলে যে আওয়াজ বের হয়। সে রকম আওয়াজ হচ্ছে। গলাটা পুরুষের না মহিলার তাও বুঝতে পারছি না। আন্দাজের ওপর বললাম, মাজেদা খালা ?

হু।

তোমার গলা ভেঙে তো টুকরা টুকরা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফজলামি করবি না।

ঘটনা কী ?

জানি না ঘটনা কী। তুই কোথায় ?

এই মুহূর্তে আমি একটা টেলিফোনের দোকানে।

মেস ছেড়ে দিয়েছিস ?

হ্যাঁ। খালু সাহেব জহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু করতে পারি নি। কাজেই ভাবলাম পালিয়ে যাওয়াই ভালো। যা পলায়তি স জীবতি ।

আমার সঙ্গে সংস্কৃত কপচাবি না। তোর নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট বের হয়েছে।

বলো কী ?

তোর খালু খুবই রেগেছে। তার বন্ধু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব। সে তাকে বলে এই কাজটা করিয়েছে।

চার্জ কী ? আমি অপরাধটা কী করেছি ?

জানি না চার্জ কী! তুই পালিয়ে থাক, সেটাই ভালো। এদিকে তোর খালুকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাকে জেলে না ঢুকানো পর্যন্ত খালু ঠাণ্ডা হবেন বলে মনে হচ্ছে না।

আমার ওপর তার অনেক দিনের রাগ। প্রাচীন কাল হলে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করতেন। একালে তো আর এটা সম্ভব না। এখন আসল কথা বলো- জহিরের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়েছে ?

হয়েছে। তেতুলিয়া রওনা হবার আগে টেলিফোন করেছিল।

তেতুলিয়া রওনা হয়ে গেছে ?

হু। তেতুলিয়া থানার ওসি সাহেবের কাছে জহিরের ছবি দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছে। জহিরকে দেখলেই সে এরেস্ট করবে। আচ্ছা হিমু শোন, তোর খালু সাহেব বলছিল তুই নাকি জহিরকে বুদ্ধি দিয়েছিস তেতুলিয়া থেকে সে যেন নেংটো হয়ে হাঁটা ধরে। এমন ভয়ঙ্কর পরামর্শ তুই কীভাবে দিলি ? তোর খালু যে তোকে জেলে ঢুকাতে চায় শুধু শুধু তো ঢুকাতে চায় না। আমার নিজেরও ধারণা তোকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও সোসাইটি থেকে দূরে রাখা উচিত। তুই উপদ্রবের মতো।

খালা তোমার ভাঙা গলা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এখন পরিষ্কার আওয়াজ আসছে।

হিমু তুই কথা ঘুরাবার চেষ্টা করছিস। আমার গলা আগে যেমন ছিল এখনো সেরকমই আছে।

তাহলে মনে হয় ফ্যাসফ্যাসে গলা শুনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যাই হোক আগে কাজের কথা সেরে নেই।

তোর আবার কাজের কথা কী ?

কাজের কথা তো বেকারদেরই জিনিস। যারা বেকার না তাদের হলো কাজ। কাজের কথা বলে তাদের আলাদা কিছু নেই।

কথা পেঁচাবি না, আমার খুবই বিরক্তি লাগে। কী বলতে চাচ্ছিস বল।

ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।

কে ?

ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ । উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যাঞ্জো বাদক। ব্যাঞ্জো জগতের রাজা। তাকে আমরা আদর করে ব্যাঞ্জো-রাজও বলতে পারি।

কী বলছিস তুই আবোলতাবোল ?

ব্যাঞ্জো-রাজ ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তোমার সঙ্গে চা খেতে রাজি করিয়েছি। তিনি অটোগ্রাফ দেবেন এবং ছবি তুলতেও দেবেন। তবে জাস্ট একবার। তুমি পুরো এক রোল ছবি তাকে নিয়ে তুলবে তা হবে না। উনার এত ধৈর্য নেই। খুবই খিটখিটে স্বভাবের মানুষ। খালা, আমি তোমার ভাগ্য দেখে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত ।

ভ্যাজর ভ্যাজর না করে আসল ঘটনা বল। খুবই বিরক্ত লাগছে। ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ কে ?

একটু আগে না বললাম— এই উপমহাদেশের জীবন্ত ব্যাঞ্জো কিংবদন্তি।

আমার সঙ্গে তার কী ? তাঁর নামও কোনোদিন শুনি নি। চোখেও দেখি নি।

তার নাম না শুনলেও অবশ্যই তাকে দেখেছ। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

কোথায় দেখা হয়েছে ?

ভূমিকম্পের রাতে। উনি তোমার মশারির ভেতর ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। মনে করে দেখ। টাক মাথা বুড়ো। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো বসন্তি মানে বসা ।

কী বলছিস হাবিজাবি ? তোর কি মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে ?

তুমি ভুলে গেছ ভূমিকম্পের রাতে তোমার খাটের ওপর মশারি ফেলে ঘাপটি মেরে এক বুড়ো বসে ছিল না ? উনিই ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব। ব্যাঞ্জো জগতে অপবিত্র অবস্থায় তার নাম নেয়া পর্যন্ত নিষেধ।

হিমু শোন, ঐ রাতে ভয়ে আর টেনশনে মাথা ছিল এলোমেলো। চোখে ধান্ধার মতো লেগেছে।

ধান্ধা ফান্ধা কিছু না, যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ। বুড়োর মাথায় কোনো চুল ছিল না। মাথা ভর্তি টাক। ঠিক না ?

তা ঠিক।

গায়ের রঙ দুধে আলতায় ?

মনে পড়ছে না।

মনে করে দেখ।

হ্যাঁ ফর্সাই, পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছিল। ফর্সা পা। লম্বা। বাঁশপাতার মতো লম্বা।

পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে যাচ্ছে। তুমি মহা ভাগ্যবতী। খাঁ সাহেবকেই দেখেছ।

উনাকে কেন দেখব ?

উনাকে কেন দেখবে তা তো বলতে পারছি না। কোনো একটা খেলা হচ্ছে। তুমি এবং খাঁ সাহেব তোমরা দু'জনই খেলার পুতুল।

হিমু, তোর কথাবার্তা শুনে কেমন জানি লাগছে।

উনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও ?

কী জিজ্ঞেস করব ?

কঠিন গলায় চার্জ করতে পার। জিজ্ঞেস করতে পার— ভূমিকম্পের রাতে আপনি কী মনে করে আমার শোবার ঘরের খাটে বসেছিলেন ? দেখি ব্যাটা কী বলে । ওস্তাদ হোক আর যাই হোক এত সহজে তো আমরা তাকে ছাড়ব না।

তুই এমনভাবে বলছিস যেন ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে।

অবশ্যই ঘটেছে। আর না ঘটলেও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার না ? আসামি যখন হাতের কাছে আছে।

আসামি বলছিস কেন ? উনি নিশ্চয়ই জানেন না যে উনি আমার খাটে বসেছিলেন।

তদন্ত কমিশনে এইসব প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হবে।

নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে এ ধরনের প্রশ্ন করবি কীভাবে ?

অপরিচিত মানুষকে আগে পরিচিত করে নেব। বাসায় ডেকে একদিন চা খাওয়াব ।

বাসায় ডাকতে উপলক্ষ লাগবে না ?

উপলক্ষ একটা কিছু তৈরি করব। উনাকে বলব— মাজেদা সঙ্গীত বিতানের ডিরেক্টর মিসেস মাজেদা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। উনি খুবই খুশি হবেন যদি আপনি তাঁর সঙ্গে এককাপ চা খান।

মাজেদা সঙ্গীত বিতানটা কী ?

এটা একটা সিডি কোম্পানি। এরা প্রতিভাধর সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত সংগ্রহ করে। দেশে বিদেশে প্রচার করে। এই একাডেমী শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসার চায়।

একটা লোককে মিথ্যা কথা বলে নিয়ে আসবি ? সত্য উদঘাটনের জন্যেই আমাদের মিথ্যার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, উপায় কী ? উনাকে বলব, মাজেদা সঙ্গীত একাডেমী আপনার একটা সিডি প্রকাশ করতে চায়। চা খেতে খেতে টার্মস এন্ড কন্ডিশন্স নিয়ে একাডেমীর ডিরেক্টর মিসেস মাজেদা কথা বলবেন।

তারপর উনি যখন দেখবেন সবই ভুয়া, তখন কী হবে ?

সবই ভুয়া হবে কেন ? প্রয়োজনে আমরা উনার একটা সিডি বের করব। কত টাকা আর লাগবে! খালু সাহেব তো বিপথে প্রচুর টাকা কামাচ্ছেন। সেই টাকা যত নষ্ট করা যায় ততই ভালো। খালা কী বলো, ভদ্রলোককে বলব। চা খেতে?

সিডি বের করতে কত টাকা লাগে ?

আমি কিছুই জানি না। খোঁজ নেব। তার আগে আমরা মাজেদা সঙ্গীত একাডেমী গঠন করে ফেলি। ট্রেড লাইসেন্স বের করি। সিডি যদি ভালো চলে ঘরে বসে ব্যবসা। আমি দোকানে দোকানে সিডি দিয়ে আসব। মাসের শেষে টাকা নিয়ে আসব।

তোর খালু শুনলে রাগ করবে।

রাগ করার কিছু নেই। এটা তোমার বাতেনি ব্যবসা।

বাতেনি মানে কী ? বাতেনি মানে গোপন, অপ্রকাশ্য। সঙ্গীত হবে তোমার গোপন ব্যবসা। রাজি ?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথা আউল লাগছে। তোর যা ভালো মনে হয় কর। তোর খালুর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

তুমি পরামর্শ করতে যেও না। পরামর্শ যা করার আমি করব।

তুই কথা বলতে যাবি না। তোর ওপর সে ভয়ঙ্কর রেগে আছে। বললাম না, কেইস করেছে। তোর নামে ওয়ারেন্ট বের হয়ে গেছে। তোকে যে-কোনো দিন পুলিশ ধরবে।

ধরলে ধরুক। আপাতত আমি খালু সাহেবকে ধরব। উনার গোপন মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দাও তো। ভয় নেই, আমি নাম্বার কোথেকে পেয়েছি বলব না।

খালার কাছ থেকে মোবাইল নাম্বার নিয়ে আমি খালু সাহেবকে টেলিফোন করলাম। মাইডিয়ার টাইপ গলার আওয়াজে বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন ?

খালু সাহেব গভীর গলায় বললেন, কে ?

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, হিমু কথা বলছি। আপনার শরীর ভালো ?

তুমি কোথায় ?

খালু সাহেব, আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। শুনেছি আপনি আমার নামে কেইস করেছেন। পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে আমাকে খুঁজছে। পালিয়ে থাকা ছাড়া গতি কী ?

জহিরের খবর কিছু পেয়েছ ?

জ্বি না।

তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই?

জ্বি না।

মিথ্যা কথা বলছি কেন ? তোমার সঙ্গে তার ভালোই যোগাযোগ আছে। আমি নিশ্চিত তোমরা দু'জন। একই জায়গায় বাস করছ।

কোনো বিষয়েই এত নিশ্চিত হওয়া ঠিক না খালু সাহেব। গ্যালিলিও যখন প্রথম বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তখনো তিনি আপনার মতো নিশ্চিত ছিলেন না। কিছুটা সন্দেহ তারও ছিল।

হিমু তুমি বেশি জ্ঞানী হয়ে গেছ। তোমার জ্ঞান কমাবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যথাসময়ে তা বুঝতে পারবে।

জ্বি আচ্ছা খালু সাহেব। আপনাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। আপনার মুড কি এখন ভালো ? কথাটা মুড ভালো হলেই জিজ্ঞেস করব।

আমার মুড নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করতে চাও করো।

ট্রেড লাইসেন্স করার ব্যাপারে কি আপনি সাহায্য করতে পারবেন ? অতি দ্রুত আমাদের একটা ট্রেড লাইসেন্স বের করতে হবে। মাজেদা সঙ্গীত বিতানের নামে লাইসেন্স। লিমিটেড কোম্পানি হবে। মাজেদা খালা কোম্পানির ডিরেক্টর।

কী বললে ?

মাজেদা সঙ্গীত বিতান শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসারের জন্যে কাজ করবে। কোম্পানির প্রথম অবদান ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁর ব্যাঞ্জোর সিডি।

তোমার খালা সঙ্গীত বিতান করছে ? সিডি বের করছে ?

জ্বি।

তার একমাত্র ছেলে নেংটো হয়ে পথে পথে ঘোরার পরিকল্পনা করছে। আর সে কোম্পানি ফাঁদছে ?

গান বাজনা নিয়ে ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা। দেবদাস মদের বোতল নিয়ে দুঃখ ভুলার চেষ্টা করেছেন। খালার পক্ষে তো আর সেটা সম্ভব না।

সিডি কোম্পানি ফাদার বুদ্ধি তুমি তার মাথায় ঢুকিয়েছ ?

ঢোকানো বলতে যা বোঝায় তা না। তবে আইডিয়াটা নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি।

তুমি তার মাথায় সিডির আইডিয়া ঢুকিয়ে দিলে ? তুমি যে কত বড় বদমাশ এটা জানো? You play with human mind. এই খেলা আমি বন্ধ করতে যাচ্ছি। তুমি Unfit for the society. সোসাইটি থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য তোমাকে দূরে রাখার ব্যবস্থা আমি করছি — I have to be cruel only to be kind. কথা শেকসপিয়রের তবে এই মুহূর্তে কথাটা আমারও।

খালু সাহেব, শেকসপিয়র একটা ভুল কথা বললে সেই ভুল কথা নিয়ে মাতামাতি করতে হবে ? Kind হবার জন্যে Cruel হতে হবে কেন ? দয়া সমুদ্রে আসতে হলে দয়ার নদী দিয়েই আসতে হবে। মনে করুন আপনি দয়ার সমুদ্রে পৌছতে চাচ্ছেন। তা করতে হলে দয়ার নদী দিয়ে আপনাকে এগোতে হবে। নৃশংসতার নদী দিয়ে আপনি কখনো দয়ার সমুদ্রে পৌঁছতে পারবেন না। শেকসপিয়র বাবাজি বললেও পারবেন না।

খালু সাহেব টেলিফোনের লাইন কেটে দিলেন। টেলিফোনের দোকানের লোকটা হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার মুখে এক ধরনের সারল্য। মনে হচ্ছে টেলিফোনের দোকান দিয়ে সে সুখে আছে। কে কী কথা বলছে মন দিয়ে শুনছে। রাত এগারোটায় দোকান বন্ধ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে সারা দিনে কী হলো গল্প করছে। আমি বললাম, ভাই আপনার কত হয়েছে ? লোকটা হাসি মুখে বলল, হইছে অনেক। কিন্তুক আফনের কিছু দেওয়া লাগবে না। আপনে ফ্রি । এইসব ক্ষেত্রে আমার বলা উচিত— আমি ফ্রি কী জন্যে ? আমি সে-সব কিছুই বললাম না। শান্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে চলে এলাম। আবার টেলিফোন করতে এই দোকানে আসব। দেখা যাক তখনো ফ্রি হয় কিনা।

এখন কোথায় যাওয়া যায় ? রাতে থাকার সমস্যা নেই। ফুলফুলিয়াদের বাসায় থাকি। আরামেই থাকি। আমি এবং খাঁ সাহেব একই খাটে পাশাপাশি ঘুমাই। খুবই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তবে অস্বাভাবিকত্বটা খাঁ সাহেবের চোখে পড়ে না। তার আচার আচরণ দেখে মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। মাজেদা সঙ্গীত বিতানের এজেন্ট

তাঁর সঙ্গেই ঘুমাবে। রাত এগারোটার মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। বারোটার পর শুরু হয় বাজনা। শুনতে শুনতে নেশা ধরে যায়

রাত দু'টার আগে কখনো বিছানায় যাওয়া হয় না। বিছানায় যাওয়া মানেই যে ঘুম তাও কিন্তু না। খাঁ সাহেব গল্প শুরু করেন। একেক দিন একেক ধরনের গল্প। প্রতিটি গল্পই বিচিত্র ।

বাড়ি থেকে কত বছর বয়সে পালিয়েছি জানো ?

জ্বি না।

অনুমান করা দেখি ?

বারো বছর ?

একে দুই দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর পাবে।

ছয় বছর বয়সে পালিয়েছেন ?

হু। ক্লাস টুতে পড়ি। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। খেজুর গাছের কাছে এসে উষ্টা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠে দেখি হাতের শ্লেট গেছে ভেঙে। মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল। ঘরে সৎমা। খালি উছিলা খুঁজে কীভাবে মারবে। আজ শ্লেট ভাঙা, উছিলার প্রয়োজন নাই। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তখন পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হু।

বাড়িতে ফিরে গেলেন কখন ?

আর ফেরা হয় নাই।

বলেন কী!

চৌদ-পনেরো বছর বয়সে বাড়ি ফেরার একটা টান হলো। তখন সব ভুলে গেছি। কোথায় বাড়ি কোথায় ঘর কিছুই মনে নাই। কথায় কথায় লোকে বলে— বাপের নাম ভুলায়ে দিব। আমার হয়েছে এই অবস্থা। বাপের নাম ভুলে গেছি। শুধু দুইটা জিনিস মনে আছে। আমার সৎমার ডান কানের লতিটা কাটা। আর আমার একটা বোন ছিল, তার নাম পুঁই ।

কী নাম বললেন ?

পুঁই ।

গ্রামের নাম মনে নাই ?

'নান্দিবাড়ি' হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রেললাইন গিয়েছে। একবার রেললাইনে একটা মহিষ কাটা পড়েছিল। বাপজানের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম। এইটা পরিষ্কার মনে আছে।

গ্রামের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না ?

আগে করত না। ইদানীং করে। মনে হয় আমার মৃত্যু ঘনায়ে এসেছে। মৃত্যুর সময় জন্মস্থানের মাটি ডাকাডাকি শুরু করে।... রাত মেলা হয়েছে এখন ঘুমাও। আগামীকাল ফুলফুলিয়ার মাকে কীভাবে বিবাহ করেছিলাম। সেই গল্প বলব। সেটা একটা ইতিহাস ।

আপনি যা বলছেন সবই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইতিহাস ।

তাও ঠিক। আমার ইতিহাসের শেষ নাই। খুনের দায়ে জজকোর্টে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে ছাড়া পাই। ছ'বছর হাজত খেটেছি।

কাকে খুন করেছিলেন ?

কাউরে খুন করি নাই। খুন করতে সাহস লাগে। আমার সাহস নাই। সাহস থাকলে দুই তিনটা খুন অবশ্যই করতাম।

এখনো খুন করার ইচ্ছা আছে ?

না। বুড়ো হয়ে গেছি। রক্ত পানশা হয়ে গেছে। তাছাড়া মৃত্যু ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। এত দিন দরজার বাইরে ছিল, এখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। এখন চারপায়ে মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করে। কোনো একদিন লাফ দিয়ে বুকের উপর উঠে পড়বে।

লাফ দিয়ে বুকের উপর উঠবে কীভাবে ? মৃত্যু কি পশু ?

অবশ্যই পশু। মৃত্যু দুই পায়ে হাঁটে না। চার পায়ে হাঁটে। পশুর শরীরে যেমন গন্ধ আছে মৃত্যুর শরীরেও গন্ধ আছে। যে মারা যায় সে মৃত্যুর ঘ্রাণ পায়। আমি পাই।

ঘ্রাণটা কেমন ?

বুঝাতে পারব না। কষটা ঘাণ। ঘ্রাণে শরীর ভার হয়ে যায়। নিশার মতো লাগে। ভাং-এর শরবত কখনো খেয়েছ ?

জ্বি না।

ভাং-এর শরবতের ঘ্রাণের সাথে মিল আছে। যথাসময়ে মৃত্যুর গন্ধ তুমিও পাবে। আমার বলার প্রয়োজন নাই। থাক এইসব কথা । তোমার নিজের কথা কিছু শুনি। আমি একাই ভ্যাজর ভ্যাজর করি। অন্যের কথা শুনি না। বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধি ।

আমার নিজের কোনো কথা নাই। -

অবশ্যই আছে। না থেকে পারে না। ফুলফুলিয়ার কাছে শুনেছি তুমি নাকি সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় হাঁট । সত্য নাকি ?

জ্বি।

হাঁট কী জন্যে ?

অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। দেখতে ভালো লাগে এই জন্যে হাঁটি।

অদ্ভুত দৃশ্যটা কী ?

আছে অনেক কিছু।

একদিন নিয়ে যাবে তো আমাকে, দেখব ।

জ্বি আচ্ছা।

কবে নিয়ে যাবে ?

যেদিন আপনি বলবেন সেদিন ।

তোমার সঙ্গে যে-কোনোদিন বের হলেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখব ?

অবশ্যই।

কাল সকালে যদি বের হই দেখব ?

হ্যাঁ দেখবেন।

পরদিন আমি খাঁ সাহেবকে অদ্ভুত দৃশ্য দেখাতে নিয়ে গেছি। অতীশ দীপংকর রোডের পাশের গলিতে খোলামেলা জায়গায় বিশাল এক রাধাচুড়া গাছ। খাঁ সাহেব বললেন, এই তোমার অদ্ভুত দৃশ্য ?

আমি বললাম, জ্বি।

এই দৃশ্য দেখার জন্যে দশ কিলোমিটার হেঁটেছি ?

জ্বি।

রাধাচুড়া গাছ বাংলাদেশে এই একটাই ?

না, প্রচুর আছে। তবে এটা বিশেষ এক রাধাচুড়া।

বিশেষ কেন ?

গাছটার ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাধি হয়েছে। মানুষের যেমন ক্যান্সার হয় গাছদেরও নিশ্চয়ই হয়। এরকম কিছু হয়েছে। ব্যথায় যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা টের পাওয়া যায়।

তুমি গাছটার মৃত্যু-যন্ত্রণা টের পাচ্ছি ?

জ্বি পাচ্ছি। শুধু আমি একা না, পাখিরাও টের পাচ্ছে। আমরা অনেকক্ষণ হলো গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময়ের মধ্যে কোনো পাখিকে কি গাছের ডালে বসতে দেখেছেন ?

ঢাকা শহরে পাখি কোথায় যে গাছের ডালে বসবে ?

পাখি না থাকুক কাক তো আছে। গাছের ডালে কিন্তু কোনো কাকও বসে নেই। গাছটার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। তার যে জ্বর এসেছে হাত দিলেই টের পাওয়া যায় ।

খাঁ সাহেব গাছে হাত রাখলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, জ্বর কোথায় ?

আমি বললাম, গাছের জ্বর তো মানুষের জ্বরের মতো না যে গায়ের তাপ বাড়বে। তাদের জ্বর অন্য রকম।

তোমার যে মাথা খারাপ এটা কি তুমি জানো ?

জ্বি না। জানি না।

তোমার মাথা খারাপ। সামান্য খারাপ না, বেশ ভালো খারাপ।

হতে পারে।

তুমি কি হেঁটে হেঁটে ক্যান্সার হওয়া গাছ খুঁজে বের করা ?

তা না। আমি আমার মতো হাঁটি। হঠাৎ হঠাৎ এরকম গাছ চোখে পড়ে।

তখন কী করা ? গাছের জ্বর কমাবার জন্যে মাথায় পানি ঢাল ?

বেশির ভাগ সময় কিছুই করি না। গাছের মৃত্যু দেখি। মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখি। দু'একটা ক্ষেত্রে গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করি।

কীভাবে ?

যেমন ধরেন এই গাছটার কী রোগ হয়েছে এটা ধরার জন্যে আমি নানান লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক রিসার্চ অফিসার বলেছেন, ফাংগাসের সংক্রমণ হয়েছে। তাঁর কথামতো গাছে ফাংগাসের ওষুধ দিয়েছি। বলধা গার্ডেনের একজন মালী বলল, গাছের নিচের মাটিতে উইপোকা বাসা বানিয়েছে। এরা গাছের শিকড় খেয়ে ফেলছে। মালীর কথামতো গর্ত খুঁড়ে উইপোকার ওষুধ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির একজন শিক্ষক বলেছেন- গাছটার বিশেষ ধরনের রোগ হয়েছে। এই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম হলো- এনথ্রাকনোস। তার কথামতো এর চিকিৎসা চলছে।

কোনো পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ এনে দিচ্ছ না কেন ?

তাবিজের কথা মাথায় আসে নি। তবে স্থানীয় মসজিদের মোয়াজেন্ম সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে। উনি প্রতিদিন বাদ আছর গাছটার জন্যে দোয়া করেন ।

ঠাট্টা করছ ?

না, ঠাট্টা করছি না। মানুষের জন্যে যদি দোয়া করা যায় তাহলে গাছের জন্যেও দোয়া করা যায়। গাছেরও প্রাণ আছে। জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার।

ওষুধপত্র দোয়া এই সবে কাজ হচ্ছে না ?

জ্বি না। একটার পর একটা ডাল মরে যাচ্ছে। আগে কিছু সবুজ পাতা ছিল এখন তাও নেই। গাছটা মনে হয় 'কোমায়' চলে গেছে।

তুমি কি রোজ গাছটাকে দেখতে আস ?

রোজ আসতে পারি না। তবে দু'একদিন পরে পরে আসি।

আশ্চর্য কাণ্ড!

আমি বললাম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। চলুন ফেরা যাক। হেঁটে ফিরবেন ? না-কি রিকশা নেব ?

টাইম কত ?

চারটা দশ ।

আছর ওয়াক্তের তাহলে বেশি বাকি নাই। আছর পর্যন্ত অপেক্ষা করি। মোয়াজ্জেম সাহেব এসে গাছের জন্যে মোনাজাত করুক— এই দৃশ্যটা দেখে যাই। অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে বের হয়েছি, অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যাই। মোয়াজ্জেম সাহেবের নাম কী ?

ইদরিস মুনশি। উলা পাশ। অতি পরহেজগার আদমি। গাছের জন্যে উনি কোরান মজিদ খতম দিয়েছেন।

এখন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি রসিকতা করছ। আমার বাজনার সিডি বের করার ব্যাপারটাও রসিকতা। তুমি ধান্দাবাজ একজন মানুষ।

অতি সহজেই আমরা মানুষ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে চলে আসি। মানব চরিত্রের এটা একটা বড় দুর্বলতা। একটা মানুষ সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব তার মৃত্যুর বারো বছর পর। মৃত্যুর পর পর কোনো মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। মৃত্যুর কারণে লোকটার প্রতি মমতা চলে আসে। বারো বছর পার হবার পর সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ কী ?

আগেই বা সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভ কী ?

তোমার তর্ক ভালো লাগছে না !

চা খাবেন ? আসুন চা খাই। চা খেতে খেতে ইদারিস সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করি। সময় কাটাতে হবে। কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা শুরু করলেই সময় স্লো হয়ে যায়। টাইম ডাইলেশন হয়।

চা খাব না। এখানেই বসে থাকব ।

রোদে বসে থাকার দরকার কী— চলুন ছায়ায় গিয়ে বসি।

না।

খাঁ সাহেব মুখ গম্ভীর করে রোদে বসে রইলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর মাওলানা ইদারিসকে আসতে দেখা গেল। তিনি এসে দ্রুত গাছের চারদিকে একবার ঘুরলেন। হাত তুলে মোনাজাত করলেন। মোনাজাত শেষে গাছে তিনটা ফুঁ দিলেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, অবস্থা কেমন বুঝছেন ?

মাওলানা শান্ত গলায় বললেন, অবস্থা যা বোঝার আল্লাহপাক বুঝবেন। আমি দোয়া করে যাচ্ছি, বাকি উনার মর্জি।

কোনো খতম পড়ার কথা কি ভাবছেন ?

ইদরিস সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, দরুদে শেফা এক লক্ষ পঁচিশ বার পড়া

যায়। শেফা শব্দের অর্থ আরোগ্য। দরুদে শেফা রোগমুক্তির জন্যে ভালো দোয়া।

আমি বললাম, দরুদে শেফা শুরু করে দিন।

জ্বি আচ্ছা। গাছটা বঁচিবে কি বাঁচবে না এটা জানার জন্যে 'ইফতেখারা' করেছিলাম।

সেটা কী ?

কিছু দোয়া দরুদ পড়ে রাতে ঘুমাতে যেতে হয়। তখন স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহপাক জানিয়ে দেন।

আপনি কী জানলেন ?

বুঝতে পারছি না। ইফতেখারার উত্তর আল্লাহপাক সরাসরি দেন না। রূপকের মাধ্যমে দেন। তার অর্থ বের করা খুব কঠিন।

স্বপ্নে কী দেখেছেন। আপনি বলুন- দেখি আমরা উত্তর বের করতে পারি কি না ।

স্বপ্নে দেখেছি আপনি মারা গেছেন। গাছের নিচে আপনার নামাজে জানাজা হচ্ছে। জানাজা আমিই পড়াচ্ছি।

এর মানে কী ?

বললাম না জনাব, ইফতেখারা করে পাওয়া স্বপ্নের মানে বের করা খুব জটিল ।

মওলানা সাহেব চলে যাবার পর আমি খাঁ সাহেবকে বললাম, চলুন যাই।

খাঁ সাহেব বললেন, তুমি যাও। আমি একটু পরে আসব।

কেন ?

তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছে না। আর এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছে। আমি খাঁ সাহেবকে রেখে চলে এলাম । গাছ নিয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরে আর কোনো কথা হয় নি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী গাছটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে। সুযোগ পেলেই তিনি একা একা গাছটার কাছে চলে আসেন। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী। মানুষের পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব।

অনেক দিন গাছটার খোঁজ নেয়া হয় না। আজ যাওয়া যেতে পারে। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার দরুদে শেফা নিশ্চয়ই পড়া হয়ে গেছে। তার ফলাফল কী জানা দরকার ।

একবার খালু সাহেবের কাছেও যাওয়া দরকার। তাঁর অফিসে ঢুকে তাঁকে চমকে দেয়া। সিরিয়াস ধরনের মানুষকে চমকে দেয়ার আনন্দই আলাদা।

৫

'ভূত দেখার মতো চমকে উঠা'— এ ধরনের বাক্য বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। খালু সাহেব তাঁর অফিসে আমাকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলেন, তবে চমকটা নিজে নিজে হজম করলেন। তিনি ফাইল দেখছিলেন। চোখ নামিয়ে কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ফাইল দেখতে লাগলেন। আমি তার সামনের চেয়ারে বসলাম। তিনি ফাইল দেখা শেষ করে বেল টিপে কাকে যেন আসতে বললেন। যে

এসে ঘরে ঢুকাল তাকে কিছুক্ষণ ধমক ধমকি করে ফাইল দিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। আমি বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন ?

খালু সাহেব বললেন, তুমি কি সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে এসেছ না। অন্য মতলব আছে ?

আমি বললাম, আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি।

কীসের দাওয়াত ?

মাজেদা সঙ্গীত বিতানের প্রথম সিডির রেকর্ডিং হবে আগামী শুক্রবার। স্টুডিও দুই শিফটের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। রেকর্ডিং শুরু করার আগে মিষ্টি খাওয়া হবে। আর্টিস্টকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। ছোট্ট অনুষ্ঠান। আপনি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি।

আমি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি ?

জ্বি ।

তুমি ঠিক করেছ ?

জ্বি।

আমি ঠিক করেছি। ঐ দিন আপনার অফিসও থাকবে বন্ধ। দিনটাও শুভ – শুক্রবার।

ঠিক করে বলো তো তুমি আমার কাছে চাও কী ?

খালু সাহেব, আমি তো ঠিক করেই বলেছি। আমি চাই আপনি মহরত অনুষ্ঠানের সভাপতি হন।

শোন হিমু, দুই রকমের মাছ আছে— গভীর জলের মাছ আর অগভীর জলের মাছ। তুমি এই দু'টার বাইরের মাছ। তুমি হলে পাতালের মাছ। তুমি নিশ্চিত পরিকল্পনা নিয়ে আগাও, কেউ বুঝতে পারে না পরিকল্পনাটা কী। যখন বুঝতে পারে তখন কিছু করার থাকে না। কারণ পরিকল্পনা ততক্ষণে শেষ। তুমি যা করতে চেয়েছ তা করা হয়ে গেছে। ঝেড়ে কাশ। বলো কী করতে চাচ্ছি। নীল নকশাটা কী ?

আমি বললাম, আমার কোনো নীল নকশা নেই খালু সাহেব।

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, অবশ্যই আছে। তুমি শুধু সঙ্গীত বিতান করে একজনের সিডি বের করবে তা হয় না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এসো খোলাখুলি আলোচনা কর। তার আগে বলে জহির কোথায় ?

আমি জানি না। সে কোথায় ?

তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই ?

জ্বি না।

জহির আমার অফিসের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছে। এই চিঠি আমি তোমার খালাকে দেখাই নি, লুকিয়ে রেখেছি। তোমাকে পড়তে দিচ্ছি, তুমি চিঠিটা পড়। একবার না তিন-চার বার পড়। চিঠি পড়ার পর আমাকে বলো চিঠির মানে কী ?

মানে বুঝতে পারছেন না ?

না, আমি চিঠির অর্থ বুঝতে পারছি না। আমার মাথায় কুলাচ্ছে না।

খালু সাহেব ড্রয়ার খুলে চিঠি বের করে দিলেন। আমি চিঠি পড়তে শুরু করলাম। জহির লিখেছে—

বাবা,

তুমি এবং মা, তোমরা দু'জনই নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ

করেছ। রাগ করাই স্বাভাবিক। আমি যে কাণ্ডটা করেছি সেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য না। আমি খুব অস্থির ছিলাম বলেই হুট করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হাঁটা শুরু করার পর থেকে অস্থিরতা কেটে গেছে। যতই হাঁটছি ততই অস্থিরতা কমছে। আমার ধারণা শাহপরী দ্বীপে পৌছে সমুদ্র স্নান করার পরপর অস্থিরতা পুরোপুরি কেটে যাবে। আমি অন্য মানুষ হয়ে যাব। হিমু ভাইজান আমাকে এ রকমই বলেছেন।

এখন আমার হাঁটার অভিজ্ঞতা বলি। আমি তেতুলিয়ায় বাংলাদেশ বর্ডারের শেষ সীমা থেকে হাঁটা শুরু করেছি। কখন শুরু করলাম বলতে পারছি না। কারণ আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই। তবে হাঁটা শুরু করেছি। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক করে রেখেছি হাঁটা শেষ করব সূর্যাস্তের সময়। প্রথম দিন একুশ মাইল হেঁটেছি। খাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয় নি। যে দুটা বাড়িতে ভাত চেয়েছি সেই দু'বাড়ি থেকেই ভাত দিয়েছে। একজন আবার খুবই আদর যত্ন করল। পোলাও রাধল। খাওয়ার সমস্যা আমার হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাথরুমের সমস্যা হচ্ছে। জঙ্গলে বাথরুম সারা বেশ ঝামেলার ব্যাপার।

সবচে' বড় সমস্যা মুখ ভর্তি দাড়ি হওয়ায় সারাক্ষণ মুখ কুটকুট করছে। আরেকটা সমস্যা হলো পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। কেডস-এর জুতা জোড়া মনে হয় টাইট হয়েছিল। জুতা ফেলে দিয়ে এখন খালি পায়ে হাটছি। খালি পায়ে হাঁটার জন্যে স্পীড একটু কমে গেছে। দুপুরে মাটি তেতে থাকে। তার ওপর দিয়ে হাঁটাই মুশকিল।

হাঁটা শুরুর পঞ্চাশ দিনের দিন খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আশ্চর্যজনক এবং অবিশ্বাস্য। তবে এ রকম কিছু যে ঘটবে তা আমি জানতাম এবং ঘটনাটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতও ছিলাম। তোমাকে টেনশনে না রেখে ঘটনাটা বলি। বুধবার সকাল আটটা ন'টার দিকে (অনুমানে বলছি, আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই।) হাঁটা শুরু করলাম। সদর রাস্তায় পা দিয়েই দেখি হিমু ভাইজান। আমাকে দেখেই বলল, কী-রে তুই এত বেলা করে হাঁটা শুরু করছিস কেন ? আমি হিমু ভাইজানকে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু ভাব করলাম যেন মোটেই অবাক হই নি। হিমু ভাইজান সবাইকে অবাক করতে চায়। কেউ অবাক না হলে মনে দুঃখ পায়। হিমু ভাইজানের সঙ্গে রহস্য করতে আমার খুবই মজা লাগে।

হিমু ভাইজানকে দেখে আমার প্রথম প্রশ্ন করা উচিত ছিল তুমি কোত্থেকে এলে ? আমি যে এখানে আছি তুমি জানলে কীভাবে ? আমি কোনো রকম প্রশ্ন না করে হাঁটা শুরু করলাম। দুপুর পর্যন্ত হাঁটালাম। একা একা হাঁটা খুব বোরিং ব্যাপার। হিমু ভাইজানের মতো মজার একজন মানুষের সঙ্গে হাঁটা খুবই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। দুপুর পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে হাঁটালাম। দুপুরবেলা হিমু ভাইজান বলল, তোর হাঁটার কথা তুই হাঁটছিস। আমি তোর সঙ্গে কষ্ট করছি কেন ?

আমি বললাম, সেটা তুমি জানো। আমি তো তোমাকে বলি নি। আমার সঙ্গে হাঁটতে।

হিমু ভাইজান বলল, আমি ঢাকা চলে যাই। তোর হাঁটা তুই হাঁট।

আমি বললাম, যাও।

সাধাসাধির ধার দিয়েও গেলাম না। ঠিক করে রাখলাম হিমু। ভাইজান ডালে ডালে চললে আমি চলাব পাতায় পাতায়। হিমু ভাইজান পাতায় পাতায় চললে আমি চলব শিরায় শিরায়।

যাই হোক হিমু ভাইজান দুপুরবেলা চলে গেল। তবে আমি নিশ্চিত সে বেশিদূর যায় নি। বাসে করে খানিকটা এগিয়ে রইল। আবার পথে দেখা দেবে। এ রকম করতে করতে সে আমার সঙ্গে শাহপরী দ্বীপ পর্যন্ত যাবে। এই দুনিয়াতে কত অদ্ভুত মানুষই না হয়।

বাবা তুমি ভালো থেকে। আমাকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবে না। সমুদ্রে ডুব দেবার পর অবশ্যই আমি ভালো মানুষ হয়ে যাব। আমার মনের সব গ্লানি, ক্লেদ, যন্ত্রণা সমুদ্রের নোনা জলে রেখে আসব। মাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। এই চিঠিটাই তাকে পড়তে দিও।

ইতি
ভবঘুরে জহির

খালু সাহেব বললেন, চিঠি শেষ করেছ ?

আমি বললাম, জ্বি।

তুমি কি গিয়েছিলে জহিরের কাছে ?

জ্বি না।

তাহলে ঘটনাটা কী ? জহির কি পাগল হয়ে গেছে ?

এখনো হয় নি, তবে হব হব করছে।

তোমার পরিকল্পনাটা তো এই ছিল । ছেলেটাকে পাগল বানিয়ে দেয়া । আমি তো পরিষ্কার চোখের সামনে দেখছি, জহির নেংটো হয়ে প্রেসক্লাবের সামনে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে।

এতদূর মনে হয় যাবে না।

যেতে বাকি কোথায় ? সে চোখের সামনে দেখছে তার পেয়ারের হিমু ভাইজান তার সঙ্গে হাঁটছে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, ঘটনাটা কী হয়েছে বলি। জহিরের মনে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তাকে একা একা হাঁটতেও হচ্ছে। কাজেই জহিরকে এই স্ট্রেস এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জহিরের মস্তিষ্ক আমাকে তৈরি করে জহিরের পাশে হাঁটাচ্ছে।

এক কথায় সমাধান ?

জ্বি এক কথায় সমাধান। খালু সাহেব, কফি খেতে ইচ্ছা করছে। অনেক দিন আগে আপনার অফিসে কফি খেয়েছিলাম, স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে ।

খালু সাহেব শীতল গলায় বললেন, স্বাভাবিক সৌজন্য বোধের কারণেও তোমাকে কফি খাওয়ানো উচিত। কিন্তু তোমাকে কফি আমি খাওয়াব না। যে এত বড় সমস্যা আমার পরিবারে তৈরি করেছে তাকে আমি ছাড়ব না। তোমার নামে যে ওয়ারেন্ট বের হয়েছে এটা তুমি শুনেছ ?

শুনেছি। কোন ধারার মামলা ?

ধারা ফারা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না- আমি আমার লইয়ারকে বলে দিয়েছি আগামী পাঁচ বছর তোমাকে জেলে আটকে রাখার ব্যবস্থা যেন করা হয়। মিথ্যা

অভিযোগ, মিথ্যা সাক্ষীতে কিছু যায় আসে না। আমি দেখতে চাই পাঁচ বছর যেন তোমাকে সোসাইটি থেকে বাইরে রাখা হয়।

খালুজান উঠি ?

হ্যাঁ উঠ। আমি পুলিশ ডেকে এখনই তোমাকে এরেস্ট করিয়ে দিতে পারি। সেটা করব না। পুলিশই তোমাকে খুঁজে বের করবে।

খালু সাহেব। আপনি কি বাজনা রেকর্ডিং-এ যাবেন ? ইয়েস-নো কিছু একটা বলে দিন। আপনি না বললে প্রফেশনাল কোনো প্রধান অতিথি নিয়ে আসব।

আমার সামনে থেকে দূর হও ।

জ্বি আচ্ছা দূর হচ্ছি।

রাস্তায় নেমে মনে হলো আমার কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলা উচিত। খালু সাহেব এবার আমাকে ছাড়বে না। জেলখানায় ঢুকাবে। এটা এক অর্থে মন্দ না। নিশ্চিত মনে কিছুদিন কাটানো যায়। খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা নেই। ঘুমানোর সমস্যা নেই। সব দায়দায়িত্ব সরকারের। আমার মতো মানুষদের জন্যে জেলখানার মতো ভালো থাকার জায়গা আর কী হতে পারে। মৎস্য মারিব খাইব সুখে-র মতো— জেলখানায় থাকিব, খাইব সুখে।

জেলে ঢোকার আগে করণীয় কাজকর্মের লিষ্ট মনে মনে করে ফেললাম।

ক. খ্যা সাহেবের গানের সিডি।
(ভুজুং ভাজং দিয়ে খালার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে)

খ. খালার সঙ্গে ভুজুং ভাজং টাকা আদায় পর্ব।
(টেলিফোনে কথা বলা, খাঁ সাহেবের সঙ্গে খালার পরিচয় করিয়ে দেয়া)

গ. রাধাচুড়া গাছের সঙ্গে শেষ দেখা।
(সেটা আজই হতে পারে)

ঘ. জহিরের সঙ্গে কথা বলা ।
(মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। জহিরের মিশন শেষ হতে হতে তিন মাস লাগবে। তিন মাস সময় আমার হাতে নেই।)

ঙ. ফুলফুলিয়া!
(ফুলফুলিয়ার বিষয়ে কিছুই মাথায় আসছে না। কিন্তু নামটা লিখে রাখা দরকার।)

এখন এক এক করে আগানো যাক ।

ক. খাঁ সাহেবের গানের সিডি।

সব ব্যবস্থা করা আছে। শুধু টাকার জোগাড় হয় নি। এবং সিডির কভার ডিজাইন বাকি আছে। কভার ডিজাইনের জন্যে ধ্রুব এষকে ধরতে হবে। কী কারণে যেন সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যে ফ্ল্যাট বাড়িতে সে থাকে তার দরজায় এ4 সাইজের একটা কাগজ। সেখানে একটা উড়ন্ত কাকের ছবি, তার নিচে ধ্রুবের হাতে লেখা— ‘পাখি উড়ে গেছে।’

আমাকে যা করতে হবে তা হলো এই কাগজ ফেলে দিয়ে অন্য একটা কাগজ সাটতে হবে। সেই কাগজে লেখা থাকবে- “পাখি ফিরে এসো।”

ধ্রুব হয়তো জানে না, যে পাখি উড়ে যায়। তাকে ফিরে আসতে হয়। খাঁচায় বন্দি

পাখিরই শুধু উড়ে যাওয়া বা ফিরে আসার ব্যাপার থাকে না। তার শুধুই অবস্থান।

দোকান থেকে এ4 সাইজের কাগজ এবং লাল মার্কার কিনে ধ্রুবের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলাম। দরজায় 'পাখি উড়ে গেছে' স্লোগান নেই। তার বদলে একটা কাকের ছবি। কাকটা লাল চোখে তাকিয়ে আছে, তার পায়ে লোহার শিকল । অদ্ভুত সুন্দর ছবি।

আমি ধ্রুবের দরজার কলিংবেল টিপলাম। ভেতর থেকে ধ্রুব ঘুম মাখা গলায় বলল, কে ?

আমি হিমু। আমার ব্যাঞ্জোর কভার কোথায় ?

টাকা এনেছেন ?

না।

টাকা আনেন নি কেন ?

এখনো জোগাড় করতে পারি নি।

জোগাড় হবে ?

বুঝতে পারছি না।

আমার দরজায় যে শিকল পরা কাকের ছবি আছে। ঐটা নিয়ে যান। ফটোসেটে সিডির নামটা বসিয়ে দেবেন। কাকের চোখে যে লাল রঙ আছে ঐ লাল রঙে সিডির নামটা হবে। সিডির নাম কী ?

নাম- "একলা পাখি ।"

নামটা কি এখন ঠিক করলেন ?

জ্বি। দরজাটা খুলুন সুন্দর একটা ডিজাইন করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে যাই।

দরজা খুলতে পারব না। আমি সারা রাত ঘুমাই নি, এখন ঘুমুচ্ছি। আপনি দরজার বাইরে থেকেই ধন্যবাদ দিন।

ধন্যবাদ ।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বিদেয় হোন। প্লিজ আর বিরক্ত করবেন না। আরেকটা কথা- কভার ডিজাইনের জন্যে টাকা নিয়ে আসার দরকার নেই। কাকের ছবিটা আমি সিডির কভারের জন্যে আঁকি নি। কাজেই এর জন্যে টাকা নেয়া অন্যায় হবে।

খ. ভুজুং ভাজুং টাকা আদায় পর্ব।

আমার পরিচিত টেলিফোনের দোকান থেকে (আগেরবার - এই লোক টেলিফোনের টাকা নেয় নি) খালাকে টেলিফোন করলাম। টেলিফোনওয়ালা ঐ দিনের মতোই হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে এই লোক আজও টাকা নেবে না।

স্লামালিকুম, খালা আমি হিমু।

বুঝতে পারছি। কী চাস ?

টাকা চাই খালা। আজ ছাব্বিশ হাজার দিলেই হবে। স্টুডিও এবং হ্যান্ডস-এর খরচ।

কীসের স্টুডিও, কীসের হ্যান্ডস ?

আমাদের সিডি বের হবে। শুক্রবারে রেকর্ডিং। প্রধান অতিথিকে দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে। তিনি এপয়েন্টমেন্ট ডায়রিতে দিন এবং সময় লিখে রেখেছেন। ঐ দিন তাকে গাড়ি করে আনতে হবে এবং বাসায় দিয়ে আসতে হবে। খালা, শুক্রবারে

তোমার গাড়িটাও লাগবে।

হিমু, তুই পুরো ব্যাপারটা ভুলে যা। আমি এর মধ্যে নেই।

সে-কী ?

সে-কী ফে-কী বলে লাভ নেই। তোর খালু আমার উপর খুব রাগ করেছে।

লোকে গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়। তুমি তো আমাকে চাঁদে পাঠিয়ে রকেট কেড়ে নিয়েছ।

কেড়ে নিয়েছি। ভালো করেছি— তুই থাক চাঁদে বসে। আমার ছেলের কোনো খোঁজ নেই। আর আমি খুলব সিডি কোম্পানি!

এইগুলো তো তোমার কথা না। খালু সাহেবের কথা।

যার কথাই হোক সত্যি কথা। হিমু আমার মাথা ধরেছে— আমি তোর সঙ্গে গজগজ করতে পারব না ।

আমি খাঁ সাহেবকে কী বলব ?

তুই তাকে কী বলবি সেটা তুই জানিস। উনি বিখ্যাত মানুষ, অন্য সিডি কোম্পানি তাঁকে লুফে নেবে। এটা নিয়ে তোর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

আচ্ছা বেশ কথা শেষ। শুক্রবারটা ফ্রি রেখ।

কেন ?

বললাম না। শুক্রবারে সিডির রেকর্ডিং । তুমি অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি।

আরে গাধা আমি এক কথা কতবার বলব! আমি সিডির মধ্যে নেই।

সিডিতে তো থাকতে বলছি না। বিশেষ অতিথিতে থাকতে বলছি। তোমার কাজ হবে সঙ্গীতের উপর একটা বক্তৃতা দেবে, তারপর খাঁ সাহেবের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেবে।

জীবনে আমি বক্তৃতা দেই নি।

বক্তৃতা না দিতে পারলে নাই। ফুলের তোড়াটা দিতে পারবে। না কি সেটাও পারবে না ?

আসুক শুক্রবার। তারপর দেখা যাবে।

খালা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন । আমি টেলিফোনওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাই কত হয়েছে ?

টেলিফোনওয়ালা ঐ দিনের মতো বলল, স্যার আপনার কাছ থেকে পয়সা নেব না।

আমি বললাম, কেন ?

আপনি একবার আমাকে খুব বড় একটা উপকার করেছিলেন। মানুষ উপকারের কথা মনে রাখে না। আমি দরিদ্র মানুষ কিন্তু আমি উপকারের কথা মনে রাখি।

কী উপকার করেছিলাম ?

সেটা আপনাকে বলব না। আপনার যেহেতু মনে নাই আমি মনে করায়ে দিব না।

শুক্রবার কি আপনার কাজকর্ম আছে ?

দোকানে বসে থাকা— এছাড়া আর কাজকর্ম কী !

শুক্রবারে আপনার দাওয়াত। বাজনা শোনার দাওয়াত। ব্যাঞ্জো বাজনা !

গান বাজনা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আপনি দাওয়াত দিয়েছেন আমি অবশ্যই যাব। শুক্রবার আমার দোকান থাকবে বন্ধ।

গ. রাধাচুড়া গাছের সঙ্গে শেষ দেখা।

যা মনে মনে ভেবেছিলাম। তাই। রাধাচুড়া গাছের নিচে গভীর মুখে খাঁ সাহেব বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে সামান্য লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো। খুকধুক করে শুকনা কাশি কাশতে লাগলেন। আমি বললাম, কখন এসেছেন ?

খাঁ সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম গাছটা দেখে যাই।

কী দেখলেন ?

অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আগে তিনটা ডালে পাতা ছিল। এখন মাত্র দুটা ডালে আছে। তার মধ্যে একটার পাতা হলুদ হওয়া ধরেছে। আমি কোনো আশা দেখছি না।

আপনার মনে হয় মন খারাপ ।

মন খারাপ টারাপ না, এতগুলা মানুষ গাছটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা কাজে লাগছে না। এইটা দেখে খারাপ লাগছে। রুগ্ন গাছের গোড়ায় তুতে দিলে উপকার হয় শুনেছি। আজ কিছু তুতে দিয়েছি। আর কী করা যায় মাথায় আসছে না।

আপনি কি রোজই এখানে আসেন ?

রোজ না হলেও প্রায়ই আসি ।... কথাটা ঠিক বললাম না, রোজই আসি। কী জন্যে জানি গাছটার উপর মায়া পড়ে গেছে।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে গাছের উপর মায়া পড়ে যাওয়াতে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন। লজ্জা পাচ্ছেন কেন ?

মানুষের উপর কোনোদিন মায়া পড়ল না। গাছের উপর মায়া। এই জন্যেই লজ্জা লাগে। আচ্ছা হিমু, কয়েকদিন থেকে একটা ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। ঐটা

করলে কেমন হয় ?

ঐটা মানে কী ?

মোঘল সম্রাট বাবরের ব্যাপারটা ।

খুলে না বললে বুঝতে পারছি না।

ঐ যে সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবন সংশয়। চিকিৎসকরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তখন এক গভীর রাতে সমাট বাবর তার ছেলের বিছানার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, “হে আল্লাহপাক, আমার জীবনের বিনিময়ে আমার পুত্রের জীবন রক্ষা কর”। সকালেই ছেলে সুস্থ হতে শুরু করল আর সম্রাট বাবর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হুমায়ূন সুস্থ হয়ে উঠলেন, সম্রাট বাবর মারা গেলেন।

আপনার মাথায় কি এরকম কিছু আছে নাকি ? নিজের জীবন দিয়ে গাছের জীবন রক্ষা করা।

আরে না। কথার কথা বলেছি। আমার তো মাথা খারাপ হয় নি।

চলুন বাসায় যাই।

তুমি যাও। মওলানা সাহেব আছর ওয়াক্ত আসবেন। দরুদে শেফার খতম তিনি শেষ করেছেন। আজ দোয়া হবে। দোয়ায় সামিল হব।

ঠিক আছে আপনি থাকুন। আমি রাধাচুড়া গাছের দিকে তাকিয়ে বললাম, হে বৃক্ষ বিদায়।

ঘ. জহিরের সঙ্গে কথা বলা ।

কথা বলা সম্ভব হলো না । সে কোথায় আছে কে জানে। হাঁটো পথিক হাঁটো।

হন্টন শুধু হন্টন
নিজ দুঃখ
পথ মাঝে
করিও বণ্টন ।

ঙ. ফুলফুলিয়া ।

মেয়েটার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যা ধরতে পারছি না। সে যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁদে তা তার চোখ দেখে বোঝা যায়। আমার প্রতি তার ব্যবহার খুব আন্তরিক ছিল, সেই আন্তরিকতায় ভাটা পড়েছে। এখন মনে হয় সে বিরক্তও হয়। ঐ দিন জিজ্ঞেস করলাম, জহিরের চিঠিটা কি এসেছে ? সে তার জবাবে কঠিন গলায় বলেছে, আপনার কথা আমার মনে আছে। চিঠি তুলে রেখেছি। যেদিন পড়তে বলবেন— পড়ব ।

মেয়েটার কি তার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না ? স্বামীর প্রসঙ্গে ফুলফুলিয়া কখনো কিছু বলে না। প্রবাসী স্বামীর প্রসঙ্গ একবারও আসবে না— সেটা কেমন কথা ? একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলফুলিয়া স্বামীর কাছে কবে যাবে ?

ফুলফুলিয়া বলল, কেন জানতে চাচ্ছেন ?

আমি বললাম, পাহাড় জঙ্গলের দেশ আমার কখনো দেখা হয় নি। ঠিক করেছি আমিও তোমার সঙ্গে যাব। পাহাড় জঙ্গলে ঘুরব।

ফুলফুলিয়া বলল, ঠিক আছে।

সে মুখে বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হলো ঠিক নেই। সব কিছুই

এলোমেলো। ফুলফুলিয়ার বাবার গানের সিডি বের হচ্ছে। এ বিষয়েও তার কোনো উৎসাহ নেই, অথচ মেয়েটা এমন ছিল না। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। প্রাইভেট সিটিং। অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে ফুলফুলিয়ার মনের চারদিকে যে শক্ত আবরণটি তৈরি হয়েছে সেটা ভেঙে দিতে হবে। পাঁচ প্রশ্নের খেলা, খেলা যেতে পারে। পাঁচটি প্রশ্ন করে উত্তর বের করতে হবে। উত্তর বের করতে না পারলে আমার যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভালো না লাগলেও উত্তর দিতে হবে।

বলো তো ফুলি জিনিসটা কী ? সে ঝিকমিক করে। তাকে দেখা যায় প্রবল শোকে ও প্রবল আনন্দে।

সে দেখতে কেমন ?

তার কোনো আকৃতি নেই, কিন্তু সে ঝিকমিক করে।

তার বর্ণ কি ?

তার কোনো বর্ণ নেই, কিন্তু সে ঝিকমিক করে।

সে কোথায় থাকে ?

সে সব জায়গায় নানান ভঙ্গিমায় আছে। আকাশে আছে বাতাসে আছে, সমুদ্রে আছে, মরুভূমিতে আছে। আর মাত্র দু'টি প্রশ্নের সুযোগ আছে। দু'টি প্রশ্ন করে জেনে নাও জিনিসটা কী ।

পারছি না।

জিনিসটা— চোখের জল। এখন আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। পাঁচটা প্রশ্নের একই উত্তর হলে চলবে না। পাচ ধরনের উত্তর হতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন— মন বিষণ্ন কেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন— মন বিষণ্ন কেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন—মন বিষণ্ন কেন ?

চতুর্থ প্রশ্ন— মন বিষণ্ন কেন ?

পঞ্চম প্রশ্ন— মন বিষণ্ন কেন ?

মাজেদা খালা বলল, ঐ বুড়োই কি তোর বিখ্যাত ওস্তাদ ?

আমি বললাম, হু। ব্যাঞ্জোরাজ ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ ।

খাঁ সাহেব রেকর্ডিংরুমে কার্পেটের উপর মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর ডানপাশে ফুলফুলিয়া। খাঁ সাহেব কিছুক্ষণ পরপর কাশছেন। জটিল ধরনের কাশি। কাশির সময় ফুলফুলিয়া বাবার পিঠে হাত রাখছে। রেকর্ডিংরুমের বিশাল জানালাটা কাচের। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, খালা ভালো করে দেখ। ইনিই তোমার বিছানায় বসে ছিলেন না ?

খালা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, মানুষটাকে তো দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। বকর বকর করে কাশছে।

হু। কাল রাত থেকেই কাশছে। জ্বরও আছে। থার্মোমিটার ধরলে একশ দুই টুই

পাওয়া যাবে বলে ধারণা। আমি বলেছিলাম আজকের রেকর্ডিং শিডিউল বাতিল করতে, বুড়ো রাজি হয় নি।

বকর বকর কাশি নিয়ে গান-বাজনা করবে। কীভাবে ?

গান তো করবে না। যন্ত্র বাজাবে।

কোন যন্ত্র— হাতে যেটা নিয়ে বসে আছে সেটা ?

হু।

খেলনা খেলনা মনে হচ্ছে।

বাজনা শুরু হলে বুঝবে খেলনা না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

'এত ক্ষুদ্র যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া জগতের লাগে পরম বিস্ময় ।'

খালা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, হিমু তোর সঙ্গে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে নেই- আমি কিন্তু বক্তৃতা দেব না। হাতে ফুলটুলও তুলে দিতে পারব না। আচ্ছা দিতে হবে না।

তুই আবার কায়দা করে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে ফাঁসাবি না। আমি একটা পয়সাও দেব না।

আচ্ছা দিও না। তুই তো টাকা পয়সার জোগাড় করেছিস ?

এখনো করি নি। তবে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এসো তোমার সঙ্গে ওস্তাদজীর পরিচয় করিয়ে দেই।

কোনো দরকার নেই। আমি কিন্তু দশ পনেরো মিনিট থেকেই চলে যাব। বাজনা ফাজনা আমার ভালো লাগে না। এখানে এসেছি জানতে পারলেও তোর খালু রাগ করবে।

ঠিক আছে। চলে যেও।

ওস্তাদজীর পাশে যে মেয়েটা বসে আছে সে কে ?

উনার মেয়ে। দেখতে সুন্দর না ?

খুবই সুন্দর। মেয়েটাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন ?

জানি না । জিজ্ঞেস করে আসব ?

তুই কী যে কথা বলিস। কী জিজ্ঞেস করবি ?

জিজ্ঞেস করব যে, আমার খালা জানতে চাচ্ছেন- তুমি এত চিন্তিত কেন ? তুই কি মেয়েটাকে চিনিস ?

সামান্য চিনি। কোনো মেয়েকেই পুরোপুরি চেনা সম্ভব না। সেই চেষ্টাও করা উচিত না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই মেয়েদের পুরোপুরি চিনতেন। তাও দেশী মেয়ে না। বিদেশী মেয়ে।

তাই না-কি?

উনার গান শুন নি

"চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।"

হিমু আমার সঙ্গে ফাজলামি করবি না। ওস্তাদজীর মেয়েটার কি বিয়ে হয়েছে ?

হু।

হাসবেন্ড কী করে ?

ডাক বিভাগে কাজ করে।

মেয়েটার চুল সুন্দর না। কোঁকড়ানো চুলে মেয়েদের ভালো লাগে না। পার্লারে

গিয়ে কোঁকড়ানো চুল ঠিক করা যায়।
মেয়েটার সঙ্গে কি কথা বলতে চাও ?
কী উল্টাপাল্টা কথা বলছিস ? আমি কী কথা বলব ?
পার্লারে গিয়ে চুল ঠিক করার কথা বলবে।
হিমু তুই খুবই বিরক্ত করছিস। আমার সামনে থেকে যা। বাজনা ফাজনা কী করার শুরু কর, ঘড়ি ধরে দশ মিনিট থাকব। তারপর চলে যাব। আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেও রাখতে পারবে না।
আমি ওস্তাদজীর কাছে গেলাম।

ওস্তাদজীর শরীর যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, দেখা গেল শরীর তার চেয়েও খারাপ। চোখের মণি ছোট হয়ে গেছে এবং মণি চকচক করছে। হাত কাঁপছে। তার হাতে এক লিটারের পানির বোতল। একটু পর পর গ্লাসে পানি ঢেলে পানি খাচ্ছেন। ফুলফুলিয়া চিন্তিত গলায় বলল, বাবার শরীর বেশি খারাপ। উনার বিছানায় শুয়ে থাকা দরকার। শমসের উদ্দিন খাঁ সাহেব জ্বলজ্বলে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যন্ত্রণা করিস না। আমার যন্ত্রণা ভালো লাগে না।
ফুলফুলিয়া বলল, যন্ত্রণা আমারও ভালো লাগে না। আমি সারাজীবন তোমার যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করেছি। এখন তুমি কিছুক্ষণ আমার যন্ত্রণা সহ্য করবে ।
তুই কী করবি ?
আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব ।
জোর করে বাসায় নিয়ে যাবি ?
হ্যাঁ জোর করে বাসায় নিয়ে যাব।
খাঁ সাহেবের দুটা চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। তিনি স্টুডিওর সবাইকে চমকে দিয়ে পাশে বসে থাকা মেয়ের গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। ফুলফুলিয়া মাথা ঘুরে এলিয়ে পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। নিজেকে সামলাবার জন্যে কিছুটা সময় নিল। তারপর শাড়ির আঁচল মাথায় তুলতে তুলতে সহজ গলায় বলল, বাবা রেকর্ডিং শেষ করে চলে এসো। আমি বাসায় যাচ্ছি।
খাঁ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, রেকর্ডিং-এর সময় তুই থাকবি না ?
ফুলফুলিয়া বলল, না। আমি না থাকলে তোমার জন্যে ভালো আমার জন্যেও ভালো।
খাঁ সাহেব বললেন, যেখানে ইচ্ছা যা। আমি বাকি জীবন তোর মুখ দেখতে চাই না।
ফুলফুলিয়া কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল।
গল্প উপন্যাসে প্রায়ই পাওয়া যায়- এমন প্রচণ্ড চড় দেয়া হয়েছে যে গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে। এই ব্যাপার বাস্তবে ঘটে না। বাস্তবে যা হয় তা হচ্ছে লাল হয়ে গাল ফুলে যায়। সমস্ত মুখে লাল আভা ছড়িয়ে যায়। যে গালে চড় দেয়া হয়েছে সে দিকের চোখ খানিকটা ছোট দেখা যায়। চোখে পানি ছলছল করতে থাকে। ফুলফুলিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাপারটা ঘটছে না। তার চোখে ছলছলানি নেই। বাবার চড় খেয়ে মেয়েটা হয়তো অভ্যস্ত।
আমি ফুলফুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাসায় যাবে তো? এসো রিকশা করে দিচ্ছি। ফুলফুলিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠে এলো। তাকে নিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। লোকজনদের কৌতুহলী চোখের আড়াল থেকে যত দ্রুত তাকে সরিয়ে দেয়া যায়

ততই ভালো। রাস্তায় নেমে ফুলফুলিয়া বলল, ভাইজান আমি বাসায় যাব না। স্টুডিওর কোথাও লুকিয়ে থাকব যাতে বাবা আমাকে দেখতে না পান। বাবার বাজনা রেকর্ড হবে, আমি শুনব না— এটা কেমন কথা ?

আমি বললাম, অবশ্যই তুমি শুনবে। তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি।

বাবার শরীরটা অসুস্থ। মেজাজও খারাপ। কাজেই বাবা আজ চমৎকার বাজাবে। শরীর খারাপ থাকলে এবং মেজাজ খারাপ থাকলে বাবা ভালো বাজায়।

তাই না-কি ?

জ্বি। আপনি দেখবেন— এখানে যারা আছে। বাবা তাদের সবার আক্কেল গুড়ুম করে দেবেন।

তোমার গালগুড়ুম করে শুরু, শেষ হবে আক্কেলগুড়ুমে। ফুলফুলিয়া শোন— চা খাবে ? আমাদের চিফ সাউন্ড রেকডিস্ট এখনো এসে পৌঁছায় নি। কাজেই হাতে সময় আছে।

ফুলফুলিয়া ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি আমার মন ভালো করার চেষ্টা করছেন। তার দরকার নেই। বাবার চড় খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

চড়ের পর চা খেতে কিন্তু খারাপ লাগে না। রাস্তার পাশের দোকানগুলি খুব ভাল চা বানায়। খেয়ে দেখ।

চলুন যাই।

ফুলফুলিয়া শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছে। আঁচল এমন সাবধানে গালের উপর টেনেছে যে ফুলে উঠা গাল দেখা যাচ্ছে না। তাকে বউ বউ লাগছে। ফুলফুলিয়া বলল, বাবার শরীর হঠাৎ কেন খারাপ করেছে জানেন ?

আমি বললাম, না।

ফুলফুলিয়া বলল, আপনার জানার কথা না। বাবা পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছে। আমি খুব কায়দা করে বের করেছি।

বল শুনি।

ফুলফুলিয়া ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবা ঢাকা শহরের কোথায় যেন অসুস্থ একটা গাছ দেখেছেন। বাবা ঐ গাছকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন— গাছের অসুখটা যেন তার শরীরে চলে আসে। গাছ যেন বেঁচে যায়। এখন না-কি গাছের অসুখ তার কাছে চলে এসেছে। বাবার মাথা শুরু থেকেই খারাপ ছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে।

সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।

কিছু কিছু মানসিক রোগী আছে যাদের দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে তারা মানসিক রোগী। সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। অসুখের খবরটা টের পাচ্ছে শুধু তাদের অতি কাছের মানুষজন।

তুমি নিশ্চিত তোমার বাবা একজন মানসিক রোগী ?

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। আমি আরো একটা ব্যাপার নিশ্চিত, সেটা কি বলব ?

বলো।

অসুস্থ গাছের ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার যোগ আছে। বাবার মাথায় জিনিসটা আপনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আপনার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে কি-না আমি জানি না, তবে মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে যাবার ক্ষমতা যে আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার কথাগুলি কি ঠিক ?

ফুলফুলিয়ার দিকে আমি হাসিমুখে তাকালাম। ফুলফুলিয়া কঠিন গলায় বলল, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট চলে এসেছে। এসো তাড়াতাড়ি যাই, তোমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করি ।

দশ মিনিটের ভেতর খালার চলে যাবার কথা, তিনি যাচ্ছেন না। এখানকার কর্মকাণ্ডে মজা পেয়ে গেছেন। খাঁ সাহেবের মেয়ের গালে চড় মারাটা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কী কারণে মেয়ে চড় খেয়েছে এটা না জেনে তিনি নড়বেন না। প্রয়োজনে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন। খালা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মেয়েটা চলে গেছে না কি ?

আমি বললাম, না। লুকিয়ে আছে। বাবার বাজনা না শুনে সে নড়বে না।

এত লোকের সামনে এত বড় অপমান। তারপরও মেয়ে বসে আছে। তার কি আত্মসম্মান নেই ?

আত্মসম্মানের চেয়ে বেশি আছে বাবার প্রতি মমতা।

কী জন্যে মেরেছে গুছিয়ে বল তো ।

জানি না তো কী জন্যে মেরেছে।

অবশ্যই জানিস, তুই তো তখন আশেপাশেই ছিলি। কথাবার্তা শুনেছিস ।

আশপাশে থাকলেও কিছু শুনতে পাই নি। হঠাৎ চড়ের শব্দ শুনলাম। তুচ্ছ কোনো কারণ হবে ।

তুচ্ছ কারণ তো অবশ্যই না। তুচ্ছ কারণে এত লোকের সামনে এত বড় মেয়েকে বাবা মারে না। অবশ্যই জটিল কিছু আছে। আমি একটা সন্দেহ অবশ্যি করছি। শুনতে চাস ?

চাই- কিন্তু এখন না। বাজনা শুরু হবে।

মেয়েটা কোথায় লুকিয়ে আছে ?

রেকর্ডিং-এর কয়েকটা স্টুডিও আছে, ওর একটাতে লুকিয়ে রেখেছি। তুমি এক কাজ কর, তোমাকেও সেখানে লুকিয়ে রাখি। তুমি স্পাইয়িং করে ঘটনা বের করে ফেল ।

তুই আমাকে ভাবিস কী ? আমার কি স্পাইগিরি করা স্বভাব ? আমি যদি ঐ ঘরে থাকি মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে থাকব। এত মানুষের সামনে অপমানিত হয়েছে। একটা মেয়ে মানুষ।

প্রফেশন্যাল একজন সভাপতিকে আসতে বলা হয়েছিল। (অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরা রাজনীতিতে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দৌড় এলেবেলে অনুষ্ঠানের সভাপতি পর্যন্ত ।)

গাড়ি না পাঠানোয় তিনি আসেন নি। তবে আমার টেলিফোনওয়ালা এসেছে। নিজের লোকের মতো ছাটোছুটি করে চা খাওয়াচ্ছে। পানি খাওয়াচ্ছে।

মাইক অনা হয়েছে। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ওকে সিগন্যাল দিয়েছে। লালবাতি জ্বলেছে। ওস্তাদ শমসের উদ্দিন খাঁ এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, কিছু বলবেন ?

শমসের উদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন, ফুলফুলিয়া কি সত্যি চলে গেছে ?

আমি বললাম, না। আপনার পাশের ঘরেই লুকিয়ে আছে। আপনার বাজনা না

শুনে সে যাবে না ।

শমসের উদ্দিন বললেন, আপনি কি দয়া করে আমার মেয়েটাকে বলবেন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। আমি অনেক অপরাধ অনেকবার করেছি, কখনো তার জন্যে ক্ষমা চাই নাই । আজ আমি আমার মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এইটা তাকে জানিয়ে আসুন, তারপর বাজনা শুরু করব।

আপনার মেয়েকে কিছু বলতে হবে না। মাইক অন করা আছে। আপনার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে।

আপনার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে ?

শরীর খারাপ লাগছে। কিন্তু অসুবিধা নাই। বিসমিল্লাহ।

শমসের উদ্দিন খাঁ ব্যাঞ্জোর উপর ঝুঁকে পড়লেন। প্রথমে টুং করে একটা শব্দ হলো। তারপরে দু'বার টুং-টাং ! তারপরই মনে হলো টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। একেকবার দমকা হাওয়া আসছে বৃষ্টি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— আবার ফিরে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। না, এখন আর বৃষ্টির শব্দ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে শিকলপরা বন্দিনী রাজকন্যা কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ আসছে একই সঙ্গে তার পায়ের শিকলের শব্দও আসছে। মায়া ধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বর বলেছেন--

> হে পতিত মানবসন্তান। তোমরা ভুল জায়গায় আমাকে অনুসন্ধান করো না। আমাকে অনুসন্ধান করা সঙ্গীতে। আমি ছন্দময় সঙ্গীত। আমার সৃষ্টি ছন্দময় সঙ্গীত। আমার ধ্বংস ছন্দময় সঙ্গীত ।

বাজনা শেষ হলো। ফুলফুলিয়ার ঘরে ঢুকে দেখি সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। খালা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমাকে দেখেই খালা বললেন, ওস্তাদজীকে এ রকম মন খারাপ করা বাজনা বাজাতে নিষেধ কর। মেয়েটা কেঁদে অস্থির হচ্ছে। গান বাজনা মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। কাদাবার জন্যে তো না। তুই এক্ষুণি গিয়ে উনাকে আমার কথা বলে নিষেধ করবি। আমার কথা উনাকে শুনতে হবে। আমি প্রডিউসার । টাকা আমি দিচ্ছি।

টাকা তুমি দিচ্ছ ?

অবশ্যই। কত টাকা দিতে হবে বল। চেক বই সঙ্গে আছে। চেক লিখে দিচ্ছি।

বাজনার দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়েছে। ফুলফুলিয়ার কান্না থেমেছে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে। যেন সে এই ভুবনে নেই। তার যাত্রা শুরু হয়েছে অন্য কোনো ভুবনের দিকে। খালার চোখে পানি টলমল করছে। আমার সামনে তিনি যদি চোখের পানি ফেলেন তাহলে খুব লজ্জায় পড়বেন। আমি ঘরের বাইরে চলে এলাম ।

> হে মানবসন্তান আমি নানান রূপে তোমাদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করেছি। চোখ মেললেই আমাকে দেখবে। কান পাতলেই আমাকে শুনবে। কেন তোমরা চোখ ও কান দুই-ই বন্ধ করে রেখেছ ?

৭

হিমু ভাইজান,

এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কি-না আমি বুঝতে পারছি না। আমার হাতে এখন কোনো টাকা-পয়সা নেই। চিঠিটা লিখে খামে ভরে, খামের উপর তোমার মেসের ঠিকানা লিখে এক মুদির দোকানির হাতে দিয়েছি। সে যদি পাঠায় তাহলে হয়তো পাবে। মুদি দোকানির চেহারাটা সরল টাইপ। সে বিনে পয়সায় আমাকে একটা গায়ে মাখা সাবান দিয়েছে। তার দেয়া সাবান দিয়ে অনেক দিন পর সাবান মেখে গোসল করেছি। দোকানির নাম কুদ্দুস মিয়া। বাড়ি রংপুর। বিয়ে করেছে খুলনায়। এই চিঠি তোমার হাতে পৌছবে এটা ভেবেই লিখছি। শুরুতে আমার খবর সব দিয়ে নেই।

প্রথম খবর আমি নর্থ বেঙ্গল হাঁটা শেষ করেছি। এখন আছি যমুনা নদীর পাড়ে। পা ফুলে গেছে বলে হাঁটতে পারছি না। এক দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করব। ঠিক করেছি ঢাকা হয়ে যাব। আমাকে দেখলে এখন তুমি চিনতে পারবে না। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে বিন লাদেনের মতো চেহারা হয়ে গেছে। শরীরের রঙও জ্বলে গেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে খুবই মজা লাগে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলব বলেছিলাম — এখন আর কামাতে ইচ্ছা করছে না। মায়া পড়ে গেছে। দাড়ির জন্যে একটা অসুবিধা শুধু হচ্ছে। উকুন। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালেই পুট পুট করে উকুন পড়ে। মাথার চুলের উকুন এবং দাড়ির উকুন কিন্তু আলাদা। দাড়ির উকুন সাইজে ছোট, একটু সাদাটে রঙ আছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো গবেষণা হয়েছে কি-না কে জানে। গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। দাড়ির উকুন মাথায় যায় না। মাথার উকুন দাড়িতে আসে না। তাদের সীমানা নির্দিষ্ট। যেন উকুনরা দুটা আলাদা দেশের অধিবাসী। কেউ বর্ডার ক্রস করে না।

দ্বিতীয় খবর, এই খবরটা মজার। চুল দাড়ির কারণে অনেকেই আমাকে পীর ফকির ভাবতে শুরু করেছে। কোনো বাড়িতে খেতে চাইলে আগ্রহ করে খাওয়াচ্ছে। গত বুধবার রাতে কী হয়েছে শুনলে তুমি খুবই মজা পাবে। আমি এক বাড়িতে রাতে থাকার জন্যে জায়গা চেয়েছি, তারা সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাঘরে আমার থাকার জায়গা দিয়েছে। গোসল করার জন্যে গরম পানি। যেন অনেক দিন পরে বাড়িতে মেহমান এসেছে। গোসল শেষ করে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমুতে যাব এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোলে নিয়ে তার বাবা-মা উপস্থিত। বাচ্চাটা পেটের ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদছে। বাবা মা চাচ্ছে আমি যেন মেয়েটার পেটে একটা ফুঁ দিয়ে দেই। চিন্তা কর কী অবস্থা। আমাকে কে ফুঁ দেয় তার নাই ঠিক। শেষে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দিলাম একটা ফুঁ। আমার দাঁত মুখ খিঁচানো দেখে মেয়েটা হয়তো ভয় পেয়েছে। ভয়েই তার ব্যথা কমে গেল । মেয়ের বাবা-মা যত না অবাক আমি তার চেয়েও অবাক । মেয়ের বাবা একটা বিশ টাকার নোট আমাকে দিতে গেল । আমি গম্ভীর গলায় বললাম- "টাকা দিয়ে কী হয় ? টাকা দিয়ে তুমি কি চাঁদের আলো কিনতে পারবে ?"

খুবই ফিলসফি মার্ক কথা। নিজের কথা শুনে আমি নিজেই মুগ্ধ! ঐ বাড়ি থেকে মোটামুটি আমি একজন পীর সাহেব হিসেবে বের হলাম। বাড়ির মানুষ খুবই অবাক, যখন আমি সকালের নাশতা খেলাম না। আমি বললাম, দিনে আমি কিছু খাই না। সূর্য ডোবার পর একবেলা খাই। ঘটনা অবশ্যি এ রকমই। ভরপেটে হাঁটতে কষ্ট হয়। তবে ঐ বাড়ির লোকজন ভেবেছে আমি সারাদিন রোজা রাখি। আমি কারো ভুল ভাঙ্গাচ্ছি না। নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর ভাবতে ভালো লাগছে। কেউ যখন আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তখন বলি- পরিচয় তো ভাই জানি না। পরিচয়ের খোঁজেই পথে পথে হাঁটছি। খুবই উচ্চমার্গের কথা ।

এখন তোমাকে জরুরি একটা কথা বলি। ফুলফুলিয়ার সঙ্গে তোমার কি কোনো যোগাযোগ আছে ? এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম ফুলফুলিয়ার বাবা খুবই অসুস্থ। তাকে খোলা মাঠে শুইয়ে রাখা হয়েছে। গাছের পাতা দিয়ে তার সারা শরীর ঢাকা । ফুলফুলিয়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিজেকে বোরকায় ঢেকে বাবার চারদিকে ঘুরছে। স্বপ্নটা দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়েছে। যদিও জানি স্বপ্ন কোনো ব্যাপার না। সারাক্ষণ ফুলফুলিয়ার কথা ভাবি বলেই এমন স্বপ্ন দেখছি।

ভাইজান, আমি তোমাকে নিয়েও একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম পুলিশ এসে তোমাকে ধরেছে এবং জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তোমার জন্যে নতুন কিছু না। প্রায়ই তো তুমি থানা হাজতে রাত কাটাও । আমি এটা নিয়ে ভাবছি না। শুধু ফুলফুলিয়ার স্বপ্নটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা লাগছে। ভাইজান শোন, ঢাকায় এসে আমি যদি ফুলফুলিয়ার সঙ্গে দেখা করি সেটা কি খুব খারাপ হবে ? তুমি যা বলবে তাই করব।

তুমি ভালো থেকো।

৮

ভোর পাঁচটায় পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করল। টিভি নাটকের মতো দৃশ্য। একজন পুলিশ অফিসার পিস্তল হাতে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে দুই দুবলা পুলিশ। রাইফেলের ভারে মাথা ঘুরে যে-কোনো সময় পড়ে যাবে এমন অবস্থা। পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার দিলেন– “হ্যান্ডস আপ”।

আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, স্যার ভালো আছেন ?

পুলিশ অফিসার আগের মতোই হুঙ্কার টাইপ গলায় বললেন, ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট ।

কিছু কিছু বাক্য আছে ইংরেজিতে না বললে ভালো শুনায় না। ‘ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট' এরকম একটি বাক্য। বাংলায় যদি বলা হয়, “তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।” তা হলে পানশে শুনাবে। হুমকি ধামকির জন্য এবং কুকুরের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ইংরেজি ভাষার কোনো তুলনা হয় না।

পুলিশ অফিসার এখনো পিস্তল উঁচিয়ে আছেন। ভাবখানা এরকম যে আমি ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসী। আমার নাম হিমু না। আমার নাম মুরগি হিমু কিংবা ‘সুইডেন

হিমু'।

স্যার আমার অপরাধটা কী ?

সেটা থানায় গিয়ে জানবে। ততক্ষণে দুবলা পুলিশের একজন আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়েছে। কোমরে দড়ি বাঁধার চেষ্টা করছে। গিট দিতে পারছে না। আসামির কোমরে দড়ির গিট দেয়ার বিশেষ পদ্ধতি আছে। আন্ধা গিন্টু দিলে হবে না।

স্যার দুটা মিনিট সময় যদি দেন। বাথরুমে যাবার প্রয়োজন ছিল।

আগে থানায় চল। তারপর বাথরুম । বদমায়েশ কোথাকার!

কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। অন্য একজন পুলিশ আমার বিছানা উল্টাচ্ছে। চৌকির নিচে উঁকিঝুকি দিচ্ছে। পুলিশ অফিসার চোখে কী একটা ইশারা করলেন— অম্নি আমার বালিশ ছুড়ে তুলা বের করে চারদিক ছড়িয়ে দিল।

মেসের লোকজন এরমধ্যে খবর পেয়ে গেছে। তারা সবাই বারান্দায় ভিড় করেছে। পুলিশ অফিসার তাদের দিকে তাকিয়েও হুঙ্কার দিলেন— 'ভিড় করবেন না। খবরদার ভিড় করবেন না।' তার হাতে এখনো পিস্তল ধরা। মনে হচ্ছে তিনি টিভি প্যাকেজ নাটকের অভিনতা। দুর্দান্ত পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালকের নির্দেশে প্রতিটি ডায়ালগ পিস্তল নাচিয়ে বলতে হচ্ছে ।

অনুসন্ধান করে কিছু পাওয়া গেল না। পুলিশ অফিসার ছোটখাট একটা প্রসেশন করে আমাকে নিয়ে গাড়িতে তুললেন। তাঁর মুখে বিমলানন্দ। মনে হয় এই প্রথম তিনি কাউকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেয়েছেন। আজ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মজা করে গল্প করবেন- জীবনবাজি রেখে এ্যারেষ্ট করেছি। অন্ধকার থাকতেই ক্রিমিন্যাল কর্ডন করে ফেললাম। দরজা ভেঙে কেউ ঢুকতে চায় না। রিসকি ব্যাপার তো। এরা বিছানার পাশে কাটা রাইফেল নিয়ে ঘুমায়। এদের হাতের নিশানাও থাকে ভালো। কেউ যখন দরজা ভাঙতে রাজি হচ্ছে না তখন আমিই এগিয়ে গেলাম। হাতে খোলা পিস্তল নিয়ে দরজা ভেঙে হারামীটার উপর লাফিয়ে পড়লাম। সে তোষকের নিচে রাখা কাটা রাইফেলে হাত দিয়ে ফেলেছিল— তার আগেই হাতে হ্যান্ডকাফ।

পুলিশ অফিসারের স্ত্রী এই পর্যায়ে ভীত গলায় বলবে— আগ বাড়িয়ে তোমার সাহস দেখানোর দরকার কী ? অতিরিক্ত সাহসের জন্যেই তুমি একদিন বিপদে পড়বে। খবরদার আর কখনো তুমি এমন ভয়ঙ্কর অপরাধীকে ধরতে যাবে না। এ ধরনের ভয়ঙ্কর ক্রিমিনালদের ধরার জন্যে তুমি ছাড়া কি আর লোক নেই ? এদের ধরার বেলায়ই শুধু তোমার ডাক পড়ে কেন ?

আমাকে গ্রেফতার করেছেন মোহম্মদপুর থানার সেকেন্ড অফিসার। তিনি আমাকে থানায় জমা দিয়ে আরেকজন কাকে যেন গ্রেফতার করতে গেলেন । আমি থানার ওসি সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেলাম আমার অপরাধ গুরুতর। ভোর পাঁচটার সময় আব্দুর রহমান নামের এক লোক ব্যাগে দশ হাজার টাকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে কাওরান বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় ধারালো ক্ষুর হাতে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাকে আহত কয়ে ব্যাগ নিয়ে ছুটে পালানোর সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। পুলিশ। হ্যান্ডব্যাগ, টাকা এবং রক্তাক্ত ক্ষুর উদ্ধার করেছে এবং আমাকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এসেছে।

আমি ওসি সাহেবকে বললাম, মামলাটা ভালো সাজাতে পারেন নি। ভোর পাঁচটায় কেউ দশ হাজার টাকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে কাওরান বাজার যাবে না। দিনকাল

খারাপ। স্যার আপনি এক কাজ করুন- টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিন। চারশ টাকা করে দিন। অনেক বিশ্বাসযোগ্য হবে। চারশ টাকার জন্যেও খুন হয়।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কাছে তো পরামর্শ চাচ্ছি না।

পুলিশ এত দুর্বলভাবে মামলা সাজাচ্ছে- ভাবতেই খারাপ লাগছে। পুলিশ মামলা সাজানোর পরও তাতে ফাঁক থাকবে তা কেমন করে হয় ? আব্দুর রহমান সাহেবের শরীরে ক্ষুরের দাগ আছে তো ? নাকি তাও নেই।

বেশি কথা বলবেন না।

জ্বি আচ্ছা, বেশি কথা বলব না।

আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে আপনি কি তা অস্বীকার করতে চান।

সবই স্বীকার করছেন ?

অবশ্যই। শুধু দশ হাজার টাকাটা বাদ। টাকার পরিমাণটা কমাতে হবে। টাকাটা কমিয়ে চারশতে নিয়ে আসুন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্টেটমেন্ট দেবেন ?

জ্বি দেব।

চা খাবেন না-কি ?

জ্বি স্যার চা খাব। সকালে নাশতাও খাই নি ।

চা-নাশতার ব্যবস্থা করছি। আপনি জেনেশুনে মিথ্যা ষ্টেটমেন্ট দিতে চাচ্ছেন কেন?

আপনারা চাচ্ছেন, কাজেই আমি চাচ্ছি। আমি স্টেটমেন্ট দিতে রাজি না হলে তো মারধর করে রাজি করাবেন। খামাখা মার খেয়ে লাভ কী ?

ভালো লজিক। হিমু সাহেব শুনুন - উপরের নির্দেশে আমাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু অন্যায় করতে হয়।

খারাপ লাগে না।

প্রথম দুই বছর খারাপ লাগে, তারপর আর খারাপ লাগে না। অভ্যাস হয়ে যায়। মানুষ অভ্যাসের দাস ।

আপনার চাকরি কত দিন হয়েছে ?

পাঁচ বছর।

অনেক দিন তো হয়ে গেল। আপনার খারাপ লাগার কথা না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে কেন ?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমি ওসি সাহেবের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, যে আব্দুর রহমান সাহেবের গায়ে ক্ষুর দিয়ে আমি টান দিয়েছি, তার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি ?

না।

না কেন ?

সে গুরুতর আহত । হাসপাতালে আছে। জ্ঞান নেই।

মরে যাবে না তো?

মরে যেতেও পারে। অবস্থা ভালো না।

মরে গেলে তো আমি খুনের দায়ে ফেঁসে যাব।

তা যাবেন ।

ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ?

ওসি সাহেব ফাইল থেকে মুখ তুলে আমাকে আশ্বস্ত করার মতো গলায় বললেন, ফাঁসি হবে না। প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই। যাবজ্জীবন হবে। এখনো ভেবে বলুন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্টেটমেন্ট দেবেন ? আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে কোনো কঠিন মামলায় ফাঁসানো। যাতে চার-পাঁচ বছর আপনি জেলে থাকেন। আমি সেই ব্যবস্থা ভালোমতো করেছি।

প্রমোশন নিশ্চয়ই পাবেন ?

ওসি সাহেব সরু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সিগারেট টানতে লাগলেন। তাকে সামান্য চিন্তিত মনে হলো ।

সকাল দশটায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লিখিত স্টেটমেন্টে দস্তখত করলাম । অল্পবয়েসী ম্যাজিস্ট্রেট। বিসিএস পাশ করে সদ্য জয়েন করা তরুণ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, তুমি যখন মানুষটাকে ক্ষুর দিয়ে পোচ দিচ্ছিলে তখন তোমার একটুও খারাপ লাগে নি ?

আমি হাসি মুখে বললাম, জ্বি না স্যার।

একবারও ভাবলে না লোকটা মরে যেতে পারে ?

মরে তো সবাই যাবে। মানুষ মরণশীল।

'মানুষ মরণশীল'। এই ফ্রেজও জান ?

জ্বি জানি।

পড়াশোনা কতদূর ?

পড়াশোনা বেশিদূর না। আমি স্বশিক্ষিত।

শিক্ষা তো ভালোই পেয়েছ। মানুষ মেরে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছ। এই শিক্ষা কার কাছে পেয়েছ ?

এই শিক্ষা স্যার পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছি। শিক্ষক হিসাবে পুলিশ খারাপ না ।

মাস্তান হয়েছ না ?

মাস্তান হওয়া তো স্যার খারাপ কিছু না। মাস্ত থেকে মাস্তান। মাস্ত মানে হলো মত্ত । ঈশ্বরপ্রেমে যে মত্ত সে মাস্ত। সেই মাস্ত থেকে মাস্তান। মাস্তান হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার।

তোমার গলার কাছে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে এটা জানো ? ফাঁসির দড়ি তো স্যার সবার সামনেই ঝুলছে। আপনার সামনেও ঝুলছে। ওসি সাহেবের সামনেও ঝুলছে। তবে আপনাদের দড়ি দৃশ্যমান না। দেখা যাচ্ছে না। আমারটা দেখা যাচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, যাকে তুমি ক্ষুর দিয়ে আহত করেছ সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে। জ্ঞান যদি কিছুক্ষণের জন্যে ফেরে তাহলে তার ডেথ বেড ষ্টেটমেন্ট নেব। ডেথ বেড কনফেসনের ওপর ফাঁসি হয়ে যায়- এটা জানো ?

জানতাম না। এখন জানলাম।

কেমন লাগছে জেনে ?

ভালো লাগছে এই ভেবে যে মৃত্যুর ঠিক আগে বলা কথার উপর আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। মৃত্যুপথ যাত্রীকে সম্মান দেখাচ্ছেন। যদিও এটা করা ঠিক না।

কেন ঠিক না ?

মৃত্যুর আগে মানুষের মাথা এলোমেলো থাকে। চিন্তা-ভাবনা লজিক সব পাল্টে

যায়। সেই সময়ের কথার কোনো গুরুত্ব থাকা উচিত না। আমার বাবা মৃত্যুর সময় আমাকে বলেছিলেন– “হিমু, তোর মা আমাকে নিতে এসেছে। তোর পাশের চেয়ারে বসে আছে। সে এত রেগে আছে কেন বুঝতে পারছি না।” এখন স্যার আপনি বলুন যে লোক এই কথা বলছে তার কোনো কথার কি গুরুত্ব দেয়া উচিত ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, তোমার মতো ক্রিমিনালের সঙ্গে এইসব আলাপ করার কোনো ইচ্ছা নেই। শুধু জেনে রাখ— তোমার খবর আছে ।

আপনিও জেনে রাখুন। স্যার। আমাদের সবারই খবর আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চলে যাবার পরপরই পত্রিকার রিপোর্টাররা এলো। পুলিশের এত বড় সাফল্য। ভয়ঙ্কর একজন ক্রিমিন্যালকে ক্ষুর হাতে ধরে ফেলেছে। খবরটা পত্রিকায় যাবে। আমাকে একটা রক্তমাখা ক্ষুর দেয়া হলো। সেই ক্ষুর হাতে নিয়ে আমি দাঁড়ালাম। আমার পাশে খোলা পিস্তল হাতে সেকেন্ড অফিসার দাঁড়ালেন। ছবি তোলা হলো। ছোটখাট ইন্টারভ্যু হলো। রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ? আমি বললাম আমার নাম- হিমু।

শুধু হিমু ?

জ্বি না- চন্দ্র হিমু। বেশির ভাগ সময় চাঁদে বাস করি বলে চন্দ্র হিমু।

সকালের নাস্তা খেয়ে আমি দুপুর পর্যন্ত হাজতে ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে আরাম করে দুপুরের খাবার খেলাম। ওসি সাহেবের জন্যে বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এসেছিল। তিনি ডিউটিতে যাবেন। সেখানেই দুপুরের খাবার খাবেন বলে টিফিন কেরিয়ার তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন। চারটা বাটিতে অনেক আয়োজন। করলা ভাজি, কচুর মুখির ভরতা, ইলিশ মাছের ঝোল, লাল লাল করে ভাজা ছোট চিংড়ি। টিফিন কেরিয়ারের প্রথম বাটিতে পলিথিনে মোড়া একটা চিঠিও পাওয়া গেল। ওসি সাহেবের মেয়ের লেখা চিঠি।

বাবা,

চিংড়ি মাছের ভাজা আমি রান্না করেছি। মা শুধু মশলা মাখিয়ে দিয়েছে। চিংড়ি মাছটা প্রথম খাবে। প্রথমে চিংড়ি মাছ না খেয়ে অন্য কিছু খেলে আমি খুব রাগ করব । বাবা তুমি জানো চিংড়ি মাছ কিন্তু মাছ না— পোকা। চিংড়ি মাছের "গু" থাকে মাথায়। এটা কি জানো ? এটা আমাকে বলেছে রহিমা বুয়া।

তবে সে খুব মিথ্যা কথা বলে। আর চিংড়ি মাছ যে পোকা এটা বলেছে মা। চিংড়ি মাছ যদি পোকা হয় তাহলে আমরা কেন চিংড়ি মাছ বলি ? আমরা কেন চিংড়ি পোকা বলি না ? বাবা এখন তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলো তো

তিন অক্ষরে নাম তাঁর
বৃহৎ বলে গণ্য
পেটটি তাহার কেটে দিলে
হয়ে যায় অন্ন।

এটা কী? একটু চিন্তা করলেই পারবে। এই জিনিসটা তুমি আজ খাবে। জিনিসটার রঙ সাদা।

আজ এই পর্যন্ত। এবার তাহলে (৭০ + ১০)। তুমি ভালো থেকে। কেমন ?

তোমার আদরের মেয়ে
Pয়াল

দুপুরে খাবার পর আরেকবার লম্বা ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙলো সেন্ট্রি পুলিশের ডাকাডাকিতে। আমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে। আবদুর রহমানের জ্ঞান ফিরেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর সামনে আমাকে হাজির করা হবে। আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে দেখে বলবেন— আমিই সেই ব্যক্তি কিনা। ওসি সাহেব নিজেই আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে তার কন্যা পিয়ালের চিঠির কথা বললাম। তিনি চুপ করে রইলেন। মনে হলো খুবই চিন্তিত। আমি বললাম, এত চিন্তিত কেন ?

ওসি সাহেব বললেন, আপনাকে নিয়ে চিন্তিত। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আপনাকে নিয়ে যখন তার সামনে হাজির করা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট যখন বলবে- এই কি সেই ব্যক্তি ? আব্দুর রহমান অবশ্যই বলবে, হু। কিছু না বুঝেই বলবে। আগে এ রকম দেখেছি। নিরাপরাধ লোক হাজির করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করেছে— এই কি আপনাকে গুলি করেছিল ? গুলি খাওয়া মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, জ্বি।

নিরাপরাধ মানুষটাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে ?

হু।

আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি এত চিন্তিত হবেন না। ফাঁসিতে ঝুলতে হলে ঝুলব। এতে আপনার নাম ফাটবে। উপরওয়ালার নির্দেশে এমন মামলা সাজানো হয়েছে যে পাঁচ বছর জেলে থাকার বদলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়তে হয়েছে।

ওসি সাহেব আবারো বললেন, হু।

আমি বললাম, একটা সিগারেট দিন। ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাই।

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, প্যাকেটটা রেখে দিন ।

আব্দুর রহমান পুলিশ পাহারায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাকে ঘিরে আছে আত্মীয়স্বজন । তিনি কাউকে চিনতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। মাথার ওপর স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। একটা হাত উচু করে বাঁধা।

ভদ্রলোক হা করে আছেন। নাক দিয়ে স্যালাইন দেয়া হলেও তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন মুখে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তার বুকে ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে।

সকালের তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবদুর রহমানের পাশেই চেয়ারে বসে আছেন। তার হাতে ফাইলপত্র। তিনি আমাকে দেখিয়ে উঁচু গলায় বললেন, চাচামিয়া একে চিনতে পারছেন ? আব্দুর রহমান মাথা নাড়লেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, মাথা নাড়লে হবে না। মুখে বলতে হবে, হ্যাঁ। বলুন হ্যাঁ।

আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

এই লোকটা কি আপনাকে ক্ষুর দিয়ে ফালা ফালা করেছে ?

আব্দুর রহমান আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, মাথা নাড়লে হবে না। মুখে হ্যাঁ বলুন।

আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার উনার যে অবস্থা আপনি উনাকে যাই জিজ্ঞেস করুন। উনি মাথা নাড়বেন। হ্যাঁ বলতে বললে বলবেন- হ্যাঁ। আপনি উনাকে জিজ্ঞেস করুন— গরু কি আকাশে উড়তে পারে ? উনি বলবেন- হ্যাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার খালু সাহেবের মতো ইংরেজিতে আমাকে যা বললেন তার সরল বাংলা হলো— আমি কী জিজ্ঞেস বা করব না সেই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেব। তোমার কাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

আব্দুর রহমান সাহেবের আত্মীয়স্বজনরা এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। তাদের কারো চোখে ভয়, কারো চোখে ক্রোধ, কারো চোখে তীব্র ঘৃণা। শুধু একটা পাচ ছ' বছরের বাচ্চা মেয়ের চোখে প্রবল বিস্ময়। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, খুঁকি তোমার কী নাম ? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার নাম ঊর্মি। আমি ক্লাস টুতে পড়ি।

আমি বললাম, ক্লাস টু খায় গু।

ঊর্মি ফিক করে হেসে ফেলল। বয়স্ক একজন মহিলা ধাক্কা দিয়ে ঊর্মিকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন।

৯

ওসি সাহেবের ঘরে আমি বসে আছি। আমার সামনে ফুলফুলিয়া। সে আমাকে দেখতে এসেছে। ওসি সাহেব ভদ্রতা করে ফুলফুলিয়াকে তাঁর ঘরে বসিয়েছেন। আমাকে হাজত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আমরা দু'জন যেন নিরিবিলি কথা বলতে পারি। তার জন্যে নিজে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেছেন। আমার হাতে হাতকড়া নেই, কোমরে দড়ি নেই। সকালে দাড়ি শেভ করার জন্যে ওসি সাহেব ডিসপোজেবল শেভার এবং শেভিংক্রিম পাঠিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া তাঁর বাসা থেকেই আসছে। আজ দুপুরের পর আমাকে থানা হাজত থেকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওসি সাহেবের সমস্যার সমাধান। বেচারা খুবই লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। কেইস সাজানো এত নিখুঁত হবে সেটা মনে হয় ভবেন নি।

তারপর ফুলফুলিয়া কেমন আছ ?

ফুলফুলিয়া জবাব দিল না। চেয়ারে বসা ছিল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর ব্যাপারটা তরুণী মেয়েদের মধ্যে নেই।

আমি যে হাজতে আছি খোঁজ পেলে কী করে ?

সব পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছে। আপনি ক্ষুর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার হাতে হাতকড়া পরানো। আপনার সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার। তার হাতে পিস্তল ।

ছবিটা সুন্দর হয়েছে ?

খুব ভালো হয়েছে। কোনো খুনি আসামি ক্ষুর হাতে এমন হাসিমুখে ছবি তুলে না। আপনার মুখ ভর্তি হাসি। এই ঝামেলায় আপনি ইচ্ছা করে জড়িয়েছেন, তাই না ?

মানুষ ইচ্ছা করে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

ভুল বললেন। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই ইচ্ছা করে ঝামেলায় জড়ায়। মানুষ ঝামেলা পছন্দ করে।

ফুলফুলিয়া দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বোস।

ফুলফুলিয়া বসল। আমি বসলাম তার পাশে এবং মুগ্ধ হয়ে তাকালাম। ফুলফুলিয়াকে আজ ইন্দ্রাণীর মতো লাগছে। আজ যে তার সাজাগোজের পরিবর্তন হয়েছে তা না। তার বাবার বাজনা রেকর্ডিং-এর দিন যে শাড়ি পরা ছিল সেই শাড়িটিই সে পরেছে। চোখে কাজল দেয় নি বা মুখে পাউডার দেয় নি। মেয়েদের এই একটি বিশেষ ব্যাপার আছে- দিনের কোনো কোনো সময়ে তাদের ইন্দ্রাণীর মতো লাগে।

ফুলফুলিয়া বলল, বাবার সিডিটা বের হয়েছে। আপনি অসাধারণ একজন মানুষ। সত্যি সত্যি সিডি বের করেছেন?

কই দেখি কেমন হয়েছে।

আমি আনি নি। বাবার ইচ্ছা সিডিটা উনি নিজে আপনার হাতে দেবেন।

উনি কেমন আছেন ?

ভালো না।

ভালো না মানে কি?

তিনি কারো সঙ্গেই কথা বলছেন না। ডাক্তাররা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না ।

তাকে কি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ?

জি। হাসপাতালের বেডে তিনি হাত-পা সোজা করে লম্বা হয়ে পড়ে থাকেন। কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দেন না।

তোমার কথারও জবাব দেন না ?

না। শুধু গতকাল রাতে অতীশ দীপংকর রোডের রাধাচুড়া গাছটার কথা বললেন। গাছটা দেখে আসতে বললেন ।

তুমি নিশ্চয়ই গাছ দেখতে যাও নি ?

না, আমি যাই নি। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব হাস্যকর লাগছে। একটা মানুষ তার নিজের জীবন গাছকে দিয়ে সে গাছ হয়ে যাবে। একজন উন্মাদও তো এভাবে চিন্তা করবে না।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমার বাবা গাছ হয়ে গেলে তোমার জন্যই তো সুবিধা।

ফুলফুলিয়া অবাক হয়ে বলল, আমার জন্যে কী সুবিধা ?

তোমাকে আগলে আগলে রাখবেন না । তোমার সঙ্গে যাতে কোনো তরুণের পরিচয় না হয় তার জন্যে আগ বাড়িয়ে বলবেন না যে আমার মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী থাকে নাইক্ষ্যংছড়ি।

ফুলফুলিয়া এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পলকহীন মাছের দৃষ্টি। আমি বললাম, যতদিন তোমার বাবা বেঁচে থাকবেন ততদিন তোমার জীবন শুরু হবে না।

একজন মানুষের মৃত্যুর ব্যাপার আপনি এত সহজে বলতে পারলেন ?

হ্যাঁ পারলাম।
আপনি পাথরের মতো মানুষ, এটা জানেন ?
জানি।
যদি আপনার ফাঁসি হয় আপনি কি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় দিতে পারবেন ?
চেষ্টা অবশ্যই করব। পারব কি-না বুঝতে পারছি না।
চেষ্টা কেন করবেন ? আপনি আলাদা, আপনি অন্যদের মতো না, এটা প্রমাণ করার জন্যে ?
আমরা কেউ তো কারো মতো নাই। আমরা সবাই আলাদা ।
আমার বিয়ে হয় নি। বিয়ের কথা মিথ্যা করে বলা হচ্ছে – এই তথ্য আপনাকে কে দিল ? বাবা দিয়েছেন ?
না। আমি নিজেই চিন্তা করে বের করেছি।
কবে বের করেছেন ?
যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো সেদিন ।
এতদিন বলেন নি কেন ?
তোমরা পিতা-কন্যা একটা খেলা খেলছ, আমি খেলাটা নষ্ট করি নি।
আজ হঠাৎ খেলাটা নষ্ট করলেন কেন ?
খেলা নষ্ট করলাম কারণ- জহির ঢাকায় আসছে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। আমি চাই তোমরা ঝামেলা সেরে ফেল।
কী ঝামেলা ?
বিয়ের ঝামেলা ।
আপনি অবলীলায় এইসব কথা কীভাবে বলছেন ?
দীর্ঘদিনের অভ্যাস। জটিল কথা সহজ করে বলে ফেলি। ফুলফুলিয়া শোন, তুমি কিন্তু আমার কথা রাখ নি। তোমাকে বলেছিলাম আমি না বলা পর্যন্ত তুমি যেন জহিরের চিঠি না পড়। তুমি কিন্তু পড়ে ফেলেছ।
এটাও কি অনুমান করে বললেন?
হ্যাঁ।
আপনার অনুমান শক্তি ভালো। এখন বলুন তো চিঠিতে কী লেখা।
আমি হাসতে হাসতে বললাম, দীর্ঘ চিঠিতে একটাই বাক্য গুটি গুটি করে লেখা— "তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি।" জহির চিঠিতে এত অসংখ্যবার "তোমাকে ভালোবাসি' বলে ফেলেছে যে বাকি জীবনে সে যদি আর একবারও না বলে তোমার কোনো অসুবিধা হবার কথা না। ফুলফুলিয়া তুমি খুবই ভাগ্যবতী মেয়ে।
ফুলফুলিয়ার কঠিন চোখ কোমল হতে শুরু করেছে। চোখের দু'পাশের ল্যাকরিমাল গ্র্যান্ড উদ্দীপ্ত হয়েছে। এখনই চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। চোখের পানি বর্ণহীন। কিন্তু ভালোবাসার চোখের পানির বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। ফুলফুলিয়া গাঢ় স্বরে বলল, হিমু ভাইজান আমাদের বিয়েতে আপনি থাকবেন না ?
আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম না। সব প্রশ্নের জবাব দিতে নেই।

ওসি সাহেব নিজেই আমাকে জেল হাজতে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার হাতে হাতকড়া নেই, কোমরে দড়ি নেই। আমি পুলিশের জিপের পেছনের সিটে বেশ আরাম করেই বসে আছি। ওসি সাহেব বসেছেন আমার পাশে । তিনি একটার পর একটা সিগারেট

টানছেন। জিপের ভেতরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ওসি সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন- ওপরের দিকে যারা আছেন তাদের কাজকর্ম বোঝা খুবই মুসকিল। এখন প্রাণপণ চেষ্টা চলছে— যে প্যাচে আপনি পড়েছেন সেখান থেকে আপনাকে উদ্ধার করা। আপনার এক আত্মীয়, সম্ভবত সম্পর্কে আপনার খালু, তিনি হেন কোনো জায়গা নেই যেখানে ধরনা না দিচ্ছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি বুঝতে পারছেন না যে, প্যাচ থেকে আপনাকে উদ্ধার করা অসম্ভব কঠিন। আপনি এখন হত্যা মামলার আসামি। মৃত ব্যক্তি আপনাকে ফাঁসিয়ে ডেথ বেড কনফেসন দিয়ে গেছে।

আমাকে দড়িতে ঝুলতেই হবে ?

ওসি সাহেব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে শুরু করলেন। আমি বললাম, ওসি সাহেব আপনি এত আপসেট হবেন না। জগৎ খুব রহস্যময়। হয়তো এমন কিছু ঘটবে যে আমি হাসিমুখে জেল থেকে বের হয়ে আসব। জহিরের বিয়েতে আমার সাক্ষী হবার কথা। হয়তো দেখা যাবে যথাসময়ে আমি কাজি অফিসে উপস্থিত হয়েছি।

ওসি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, যে লোক আসলেই খুনটা করেছে হয়তো দেখা যাবে সে অপরাধ স্বীকার করে পুলিশের হাতে ধরা দেবে, কিংবা পুলিশ বলবে উপরের নির্দেশে আমরা নিরপরাধ একটা লোককে ধরে এনে মামলা সাজিয়েছি। কী বলেন এ রকম কি ঘটতে পারে না ?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ভাই আপনি কি আমার ছোট্ট একটা উপকার করবেন ? জেল-হাজতে ঢুকবার আগে আমি একজনের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই ।

কার সঙ্গে ?

একটা গাছের সঙ্গে। মানুষ জেল হাজতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে । গাছতো পারবে না। তার কাছ থেকে বিদায় নিতে হলে তার কাছেই যেতে হবে।

আমি রাধাচুড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছের রোগমুক্তি ঘটেছে। পত্রে পুষ্পে সে ঝলমল করছে। বিকেলের পড়ন্ত আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে গাছের পাতায় আগুন ধরে গেছে। অপার্থিব কোনো আগুন । যে আগুনে উত্তাপ নেই— আলো আছে, আনন্দ আছে।

আমি গাছের গায়ে হাত রেখে বললাম, বৃক্ষ তুমি ভালো থেকো।

বৃক্ষ নরম কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, হিমু তুমিও ভালো থেকো। ভালো থাকুক তোমার বন্ধুরা। ভালো থাকুক সমগ্র মানব জাতি।

(সমাপ্ত)

সে আসে ধীরে

হুমায়ূন আহমেদ

সে আসে ধীরে

হুমায়ূন আহমেদ

সে আসে ধীরে

হুমায়ূন আহমেদ

উৎসর্গ

মৃত্যুর কাছাকাছি যাবার মতো ঘটনা আমার জীবনে কয়েকবারই ঘটেছে। একবারের কথা বলি। আমায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে- আমাকে নেয়া হয়েছে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। আমি চলে গিয়েছি প্রবল ঘোরের মধ্যে, চারপাশের পৃথিবী হয়েছে অস্পষ্ট। এর মধ্যেও মনে হচ্ছে হলুদ পাঞ্জাবি পরা এক যুবক আমার পাশে বসে। কে সে ? হিমু না-কি ? আমি বললাম, কে ? যুবক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, হুমায়ূন ভাই, আমি স্বাধীন। আপনার শরীর এখন কেমন। শরীর কেমন জবাব দিতে পারলাম না, আবারো অচেতন হয়ে পড়লাম। এক সময় জ্ঞান ফিরল। হলুদ পাঞ্জাবি পর যুবক তখনো পাশে বসা। আমি বললাম, কে ? যুবক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি স্বাধীন।

হিমুর এই বইটি স্বাধীনের জন্যে। যে মমতা সে আমার জন্যে দেখিয়েছে সেই মমতা তার জীবনে বহুগুণে ফিরে আসুক- তার প্রতি এই আমার শুভকামনা।

@@

"আক্কেলগুডুম" নামে বাংলা ভাষায় একটি প্রচলিত বাগধারা আছে। যা দেখে গুডুম শব্দে আক্কেল খুবড়ি খেয়ে পড়ে- তাই আক্কেলগুডুম। মাজেদা খালাকে দেখে আমার মাথায় নতুন একটা বাগধারা তৈরি হলো।– 'দৃষ্টিগুডুম' আক্কেলগুডুমে যেমন আক্কেল খুবড়ি খেয়ে পড়ে, দৃষ্টিগুডুমে দৃষ্টিরও সেই অবস্থা হয়। আমার দৃষ্টি খুবড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। খালা হুলুস্কুল আকার ধারণ করেছেন। ফুলে-ফোঁপে একাকার হয়েছেন। ইচ্ছা করলেই বিশ্বের এক নম্বর মোটা মহিলা হিসেবে তিনি যে-কোনো সার্কাস পার্টিতে জয়েন করতে পারেন। আমি নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম-- ইয়া হু।

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কী বললি ?

আমি বিনীতভাবে বললাম, ইয়া হু বলেছি।

খালা বললেন, ইয়া হু মানে কী ?

'ইয়া হু'র কোনো মানে নেই। আমরা যখন হঠাৎ কোনো আবেগে অভিভূত হই তখন নিজের অজান্তেই ইয়া হু' বলে চিৎকার দেই। যারা ইসলামি ভাবধারার মানুষ, তারা বলে 'ইয়া আলি'।

'ইয়া হু' বলার মতো কী ঘটনা ঘটেছে ?

আমি বললাম, ঘটনা তুমি ঘটিয়েছ খালা। তোমার যে অবস্থা তুমি যেকোনো সুমে রেসলারকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের মতো কুৎ করে গিলে ফেলতে পার। ব্যাটা বুঝতেও পারবে না।

খালা হতাশ গলায় বললেন, গত বছর শীতের সময় টনসিল অপারেশন করিয়েছি, তারপর থেকে এই অবস্থা। রোজ ওজন বাড়ছে। খাওয়া-দাওয়া এখন প্রায় বন্ধ। কোনো লাভ হচ্ছে না। বাতাস খেলেও ওজন বাড়ে। গাত পনেরো দিন ভয়ে ওজন করি নি।

ভালো করেছ। ওজন নেয়ার স্টেজ তুমি পার করে ফেলেছ।

আমাকে নিয়ে তোর বক্তৃতা দিতে হবে না। তোকে এ জন্যে ডাকি নি। আরো সিরিয়াস ব্যাপার আছে। তুই চুপ করে বোস। কিছু খাবি ?

না।

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার কোনো কথায় "না" বলবি না। আমি না' শুনতে পারি না। গরম গরম পরোটা ভেজে দিচ্ছি, খাসির রেজালা দিয়ে খা। আমার নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্যদের খাইয়ে কিছুটা সুখ পাই। বাসি পোলাও আছে। পরোটা খাবি না-কি বাসি পোলাও গরম করে দেব ?

দু'টাই দাও।

মাজেদা খালার বিরক্ত মুখে এইবার হাসি দেখা গেল। তিনি সত্যি সত্যি থপথপ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। এই মহিলাকে দেড় বছর পর দেখছি। দেড় বছরে শরীরকে 'হুলুস্কুল' পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা। বিস্ময় হজম করতে আমার সময় লাগছে।

তুমি হিমু না ?

আমার পিছন দিকের দরজা দিয়ে খালু সাহেব ঢুকেছেন। তিনি এই দেড় বছরে আরো রোগা হয়েছেন। চিমশে মেরে গেছেন। মানুষের চোখে হতাশ ভাব দেখা যায়-

ইনার শরীরের চামড়ায় হতাশ ভাব চলে এসেছে। তিনি অসীম বিরক্তি নিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছি— কোনো বাড়িতে যদি কেউ একজন আমাকে খুব পছন্দ করে তাহলে আরেকজন থাকবে যে আমাকে সহ্যই করতে পারবে না। যতটুকু ভালোবাসা ঠিক ততটুকু ঘৃণায় কাটাকাটি। সাম্যাবস্থা, ন্যাচারাল ইকুইলিব্রিয়াম।

খালু সাহেব বললেন, তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমার যতদূর মনে পড়ে তোমাকে আমি বিশেষভাবে বলেছিলাম, ভবিষ্যতে কখনো এ বাড়িতে পা দেবে না। বলেছিলাম না ?

জি বলেছিলেন।

তাহলে এসেছি কেন ?

খালা খবর পাঠিয়ে এনেছেন। তার কী একটা সমস্যা নাকি হয়েছে।

তুমি সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে ? আমি আমার জীবনে তোমাকে কোনো সমস্যার সমাধান করতে দেখি নি। তুমি যে-কোনো তুচ্ছ সমস্যাকে ঘোট পাকিয়ে দশটা ভয়াবহ সমস্যায় নিয়ে যাও। সমস্যা তখন মাথায় উঠে জীবন অতিষ্ঠা করে তুলে। তুমি এক্ষুণি বিদেয় হও।

চলে যাব।

অবশ্যই চলে যাবে।

বাসি পোলাও, রেজালা এবং গরম গরম পরোটা ভেজে এনে খালা যখন দেখবেন আমি নেই, তখন খুব রাগ করবেন।

সেটা আমি দেখব।

খাবারগুলি তখন আপনাকে খেতে হতে পারে।

আমার সঙ্গে রসিকতা করবে না। তোমার সস্তা রসিকতা অন্যদের জন্যে রেখে দাও। গোপাল ভাড় আমার পছন্দের চরিত্র না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। চলে যাবার উদ্দেশ্যে যে উঠে দাঁড়ালাম তা না। যাচ্ছি যাব যাচ্ছি যাব করতে থাকব, এর মধ্যে খালা এসে পড়বেন। পরিস্থিতি তিনিই সামলাবেন।

খালু সাহেব থমথমে গলায় বললেন, এই যে তুমি যাচ্ছি। আর কখনো এ বাড়িতে পা দেবে না। নেভার এভার । তোমাকে এ বাড়ির সোফায় বসে থাকতে দেখা অনেক পরের ব্যাপার, এ বাড়িতে তোমার নাম উচ্চারিত হোক তাও আমি চাই না। এ বাড়ির জন্যে তুমি নিষিদ্ধ চরিত্র।

জি আচ্ছা।

এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন ? হাঁটা শুরু করা। ব্যাক গিয়ার।

মাজেদা খালা যে পর্বতের সাইজ নিয়ে নিচ্ছেন- এই নিয়ে কিছু ভেবেছেন ?

ভাবলেও আমার ভাবনা তোমার সঙ্গে শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

জি আচ্ছা।

তোমার ত্যাঁদাড়ামি অনেক সহ্য করেছি, আর না।

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, যাবার আগে আমি শুধু একটা কথা জানতে চাচ্ছি। কথাটা জেনেই চলে যাব। ভুলেও এদিকে পা বাড়াব না।

কী কথা ?

এই যে আপনি বলেছেন- তোমার ত্যাঁদড়ামি আর সহ্য করব না। ‘ত্যাঁদড়ামি’

শব্দটা কোথেকে এসেছে ? 'বান্দর' থেকে এসেছে "বাদরামি। সেই লজিকে 'ত্যাদড়' থেকে আসবে "ত্যাঁদড়ামি"। "ত্যাঁদড়' কোন প্রাণী ?

খালু সাহেবের মুখ দেখে মনে হলো, একটা থাপ্পড় দিয়ে আমার মাড়ির দু'একটা দাঁত ফেলে দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে তিনি দরজার দিকে আঙুল উচিয়ে আমাকে ইশারা করলেন। আমি সুবোধ বালকের মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়লাম। ঘটাং শব্দ করে খালু সাহেব দরজা বন্ধ করে দিলেন। তবে আমি চলে গেলাম না। বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে রাখলাম ড্রয়িং রুমের দিকে। যেই মুহূর্তে ড্রয়িংরুমে খালা এন্ট্রি নেবেন সেই মুহুর্তে আমি কলিংবেল টিপব। আমার নিজের স্বার্থেই খালার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জন্যে প্রয়োজন। কারণ খালা আমাকে লিখেছেন-

হিমুরে,

তুই আমাকে একটা কাজ করে দে। কাজটা ঠিকমতো করলেই তোকে এক হাজার অষ্ট্রেলিয়ান ডলার দেয়া হবে। তোর পারিশ্রমিক।

ইতি—

মাজেদা খালা।

পুনশ্চ : ১. তুই কেমন আছিস ?

পুনশ্চ : ২. আমি আর বাঁচব না রে।

এক হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার ঠিক কত টাকা তা আমি জানি না। আমার এই মুহুর্তে দরকার বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ বিশ হাজার টাকা। খালার সঙ্গে নেগোসিয়েশনে যেতে হবে। অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বদলে আমাকে বাংলাদেশী টাকায় সেটেলমেন্ট করতে হবে।

ড্রয়িংরুমে খালার গলা শোনা যাচ্ছে। আমি কলিংবেল চেপে ধরে থাকলাম। যতক্ষণ দরজা খোলা না হবে ততক্ষণ বেল বাজতেই থাকবে।

খালা দরজা খুলে দিলেন। আমি আবার এন্ট্রি নিলাম। বসার ঘর শত্রুমুক্ত। খালু সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না।

মাজেদা খালা বিস্মিত গলায় বললেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি ? তোর খালুকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল তাকে দেখেই না-কি তুই ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিস। ঘটনা কী ?

আমি বললাম, খালা, উনাকে কেন জানি খুব ভয় লাগে। তাকে ভয় লাগার কী আছে ? দিন দিন তোর কী হচ্ছে ? নিজের আত্মীয়স্বজনকে ভয় পেতে শুরু করেছিস। কোনদিন শুনব তুই আমার ভয়েও অস্থির। খাবার ডাইনিং রুমে দিয়েছি, খেতে আয়।

ডাইনিং রুমে খালু সাহেব বসে নেই তো ?

থাকলে কী ? আশ্চর্য! তুই তো দেখি মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছিস। রোগা চিমশা তেলাপোকা টাইপের একটা মানুষ। তাকে ভয় পাওয়ার কী আছে ?

খালু সাহেব ডাইনিং রুমের চেয়ারে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে মুখের উপর থেকে কাগজ সরিয়ে একবার শুধু দেখলেন, আবার কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। যে দৃষ্টিতে দেখলেন সেই দৃষ্টির নাম সর্পদৃষ্টি। ছোবল দেবার আগে এই দৃষ্টিতে তারা শিকারকে দেখে নেয়। আমি বললাম, খালু সাহেব ভালো আছেন ?

তিনি জবাব দিলেন না। মাজেদা খালা বললেন, এ কী! তুমি ওর কথার জবাব দিচ্ছি না কেন ? বেচারা এমনিতেই তোমাকে ভয় পায়। এখন যদি কথারও জবাব না দাও, তাহলে তো ভয় আরো পাবে।

খালু সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আমি কাগজ পড়ছিলাম। কী বলেছে শুনতে পাই নি।

মাজেদা খালা বললেন, হিমু জানতে চাচ্ছে তুমি ভালো আছ কিনা।

আমি ভালো আছি।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, এই তো আবার মিথ্যা কথা বললে। তুমি ভালো আছ কে বলল ? তোমার পেটের অসুখ। ডিসেনট্রি। দুদিন ধরে অফিসেও যাচ্ছ না। ফট করে বলে ফেললে ভালো আছি। তুমি জানো কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়, পালপিটিশন হয়। হিমুকে সত্যি কথাটা বলো। বলে যে তোমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।

খালু সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললেন- আমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। ডিসেনন্ট্রির মতো হয়েছে। দিনে দশ-বারোবার টয়লেটে যেতে হচ্ছে। গত দু'দিন অফিসে যাই নি। আজও অফিস কামাই হবে।

খালুর সত্যভাষণে মাজেদা খালার মুখে হাসি দেখা গেল। খালা বললেন, ঠিক আছে, এখন তুমি খবরের কাগজ নিয়ে তোমার ঘরে যাও। হিমুর সঙ্গে আমার কিছু অত্যন্ত জরুরি কথা আছে।

খালু সাহেব কোনো কথা বললেন না, কাগজ হাতে উঠে চলে গেলেন। তাকে দেখাচ্ছে যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দি জেনারেলের মতো। যে জেনারেল শুধু যে পরাজিত এবং বন্দি তা না, তিনি আবার বন্দি অবস্থায় পেটের অসুখও বাধিয়ে ফেলেছেন। অস্ত্র-গোলাবারুদের চিন্তা তার মাথায় নেই, এখন শুধু মাথায় পানি ভর্তি বদনার ছবি।

খালার জরুরি কথা হলো তাঁর এক বান্ধবী (মিসেস আসমা হক, পিএইচডি) দীর্ঘদিন অস্ট্রেলীয়া প্রবাসী। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেন- আর হবে না। তারা বাংলাদেশ থেকে একটা বাচ্চা দত্তক নিতে চান।

মাজেদা খালা বললেন, কী রে হিমু, জোগাড় করে দিতে পারবি না ?

আমি বললাম, অবশ্যই পারব। এটা কোনো ব্যাপারই না। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বেবি জোগাড় করে দেব।

এক্সপোর্ট কোয়ালিটি মানে ?

কালাকোলা, বেঁকা বেবি না, পারফেক্ট গ্লাক্সো বেবি। দেখলেই গালে চুমু খেতে ইচ্ছা করবে। থুতনিতে আদর করতে ইচ্ছা করবে। স্পেসিফিকেশন কী বলো। কাগজে লিখে নিই।

স্পেসিফিকেশন আসমা লিখেই পাঠিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনিশ-বিশ হতে পারে। আবার কয়েকটা জায়গায় ওরা খুবই রিজিড। যেমন ধর, বাচ্চার মুখ হতে হবে গোল। লম্বা হলেও চলবে না, ওভাল হলেও চলবে না।

গোল হতে হবে কেন?

খালা বললেন, আসমা এবং আসমার স্বামী দু'জনের মুখই গোল। এখন ওদের যদি একটা লম্বা মুখের বাচ্চা থাকে তাহলে কীভাবে হবে! লম্বা মুখের বাচ্চা দেখেই লোকজন সন্দেহ করবে। হয়তো এদের বাচ্চা না। মূল ব্যাপার হলো- বাচ্চাটাকে

দেখেই যেন মনে হয় ওদেরই সন্তান।

আর কী কী বিষয়ে তারা রিজিড ?

বাচ্চার বয়স হতে হবে দুই থেকে আড়াই-এর মধ্যে। দুইয়ের নিচে হলে চলবে না, আবার আড়াইয়ের উপরে হলেও চলবে না।

আমি বললাম, মাত্র জন্ম হয়েছে এরকম বাচ্চা নেয়াই তো ভালো। এ ধরনের বাচ্চা বাবা-মা'কে চিনে না। আশেপাশে যাদের দেখবে তাদেরই বাবামা ভাববে।

খালা বললেন, ন্যাদা-প্যাদা বাচ্চ ওরা নেবে না। বাচ্চার হাগামুতা তারা পরিষ্কার করতে পারবে না। আসমার আবার শুচিবায়ুর মতো আছে।

আমি বললাম, দু'বছরের বাচ্চারও তো 'শুচু' করাতে হবে। সেটা কে করাবে ? যে মহিলার শুচিবায়ু আছে সে নিশ্চয়ই অন্যের বাচ্চাকে শুচু করাবে না।

খালা বললেন, এটা তো চিন্তা করি নি।

তুমি বরং উনাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। আমার তো মনে হচ্ছে উনার দরকার টয়লেট ট্রেইন্ড বেবি।

আমি এক্ষুণি টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি। তুই বরং এই ফাঁকে আসমার পাঠানো স্পেসিফিকেশনটা মন দিয়ে পড়।

ছেলে বাচ্চানা মেয়ে বাচ্চা ?

ছেলেবাচ্চা।

ছেলেবাচ্চা কেন ?

খালা বললেন, আসমার স্বামীর পছন্দ ছেলেবাচ্চা। স্বামীয় পছন্দটাকেই আসমা গুরুত্ব দিচ্ছে। যদিও আসমার খুব শখ ছিল মেয়েবাচ্চার। কারণ বিদেশে মেয়েদের অনেক সুন্দর সুন্দর ড্রেস পাওয়া যায়। ছেলেদের তো একটাই পোশাক। শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্ট।

গায়ের রঙ?

গায়ের রঙ শ্যামলা হতে হবে। আসমা এবং আসমার স্বামী দু'জনই কুচকুচে কালো। সেখানে ধবধবে ফরসা বাচ্চা মানাবে না।

আমি বললাম, অত্যন্ত খাঁটি কথা। কার্পেট সবুজ রঙের হলে সোফার কাভারের রঙও সবুজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, এটা কী রকম কথা ? মানুষ আর কার্পেট এক হলো ? তুই কি পুরো বিষয়টা নিয়ে রসিকতা করছিস ?

মোটেই রসিকতা করছি না। আমার টাকার দরকার। অস্ট্রেলিয়ান এক হাজার ডলারে আমার কাজ হবে না। আমার দরকার বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ বিশ হাজার টাকা।

এত টাকা দিয়ে তুই করবি কী ?

টাকার দরকার আছে না ? সাধু-সন্ন্যাসীদেরও টাকা লাগে। আমি তো কোনো সাধু-সন্ন্যাসী না।

টাকার কোনো সমস্যা হবে না। তুই জিনিস দে।

আমি যথাসময়ে মাল সাপ্লাই দেব- তুমি এটা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

খালা রাগী গলায় বললেন, কুৎসিতভাবে কথা বলছিস কেন ? মাল আবার কী?

তুমি বললে জিনিস, আমি বলেছি 'মাল'। ব্যাপার তো একই।

ব্যাপার মোটেই এক না। এ ধরনের অভদ্র ল্যাঙ্গুয়েজ আমার সামনে উচ্চারণ

করবি না। **খবরদার! খবরদার।**

ঠিক আছে আর উচ্চারণ করব না। তুমি স্পেসিফিকেশনগুলো দিয়ে উনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বাচ্চার বয়সটা জেনে দাও।

খালা বিরক্ত মুখে কম্পিউটারে কম্পোজ করা দু'টা পাতা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে টেলিফোন করতে গেলেন। কাগজ দুটিতে সবই বিস্তারিতভাবে লেখা—

গুন	শর্ত	মন্তব্য

সেক্স	: ছেলে	অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।
মুখের শেপ	: গোলাকার	অবশ্যই গোলাকার হতে হবে। এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।
রঙ	:শ্যামলা	শিথিলযোগ্য। তবে অবশ্যই ধবধবে ফরসা চলবে না।
বয়স	:২৪ থেকে ৩০ মাস	আবশ্যকীয় শর্ত।
ওজন	: ২৫ থেকে ৩০ পাউন্ড	শিথিলযোগ্য। তবে ওজন ২০ পাউন্ডের নিচে হলে চলবে না।
চোখের রঙ	: কালো	আবশ্যকীয় শর্ত ।
নাক	: খাড়া	শিথিলযোগ্য শর্ত। তবে অতিরিক্ত থ্যাবড়া চলবে না।
বুদ্ধি	: এভারেজের উপরে	আবশ্যকীয় শর্ত।
স্বভাব ও মানসিকতা	: শান্ত স্বভাব	শিথিলযোগ্য। চঞ্চল স্বভাবও গ্রহণযোগ্য, তবে অবশ্যই ছিচকাঁদুনি চলবে না।
গলার স্বর	: মিষ্টি	আবশ্যকীয় শর্ত।
সন্তানের বাবা-মার শিক্ষাগত যোগ্যতা	: দুজনের মধ্যে অন্তত	আবশ্যকীয় শর্ত। একজনকে গ্রাজুয়েট হতে হবে।
সন্তানের বাবা-মার বিবাহিত জীবন	: সুখী হতে হবে।	আবশ্যকীয় শর্ত। ডিভোর্সি চলবে না।
ধর্ম	: ইসলাম	অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

বিশেষ মন্তব্য: পিতৃপরিচয় নেই এমন সন্তান কখনো কোন অবস্থাতেই চলবে না। পিতা-মাতার পরিবারে পাগলামির ইতিহাস থাকলে চলবে না। ফ্ল্যাট ফুট চলবে না। মঙ্গোলয়েড বেবি চলবে না। জোড়া ভুরু চলবে না। লেফট হ্যান্ডার চলবে না। তবে কোনো শিশু যদি বাকি সমস্ত শর্ত পুরো করে তাহলে লেফট হ্যান্ডার বিবেচনা করা যেতে পারে।

পড়া শেষ করে আমি মনে মনে তিনবার বললাম, ‘আমারে খাইছেরে’। এর মধ্যে টেলিফোন শেষ করে খালা আনন্দিত মুখে বললেন, বয়স যা লেখা আছে তাই। আসমা বলেছে সে ডিসপোজেবল গ্লাভস পরে শুচু করাবে। এখন বল কবে নাগাদ তুই পারবি ?

আমি বললাম, সাত দিনে।

খালা বললেন, বেকুবের মতো কথা বলবি না। সাত দিনে তুই জোগাড় করে ফেলবি ?

অবশ্যই। আর্জেন্ট অর্ডারে আর্জেন্টি মাল ডেলিভারি।

স্পেসিফিকেশনগুলি ঠাণ্ডা মাথায় পড়ে দেখেছিস ?

দেখেছি, জটিল ব্যাপার। তবে যত জটিল তত সোজা। সত্যি কথা বলতে কী, আমার হাতেই একজন আছে। প্রয়োজনে চব্বিশ ঘণ্টায় মাল ডেলিভারি দিতে পারি।

খালা বিরক্ত মুখে বললেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুই আজেবাজে জিনিস গছিয়ে দেবার তালে আছিস।

তোমরা যাচাই করে নেবে। একটা জিনিস কিনবে, দেখে নেবে না ?

জিনিস কেনার কথা আসছে কোত্থেকে ?

একই হলো।

মোটেই এক হলো না। এ ধরনের কথা তুই ভুলেও উচ্চারণ করবি না। যে বাচ্চাটা তোর হাতে আছে তার নাম কী ?

ইমরুল।

এটা আবার কেমন নাম! শুনলেই চিকেনরোলের কথা মনে হয়। ইমরুল-চিকেনরোল।

তোমার বান্ধবী নিশ্চয়ই নাম বদলে নতুন নাম রাখবে। তাদের যেহেতু টাকার অভাব নেই তারা নাম চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারে। যার নাম সিলেক্ট হবে তার জন্যে ঢাকা-অস্ট্রেলিয়া-ঢাকা রিটার্ন টিকিট।

খালা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আজ বিকেলের মধ্যে ছেলের একটা ছবি নিয়ে আয়, আমি ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দেব। ছবি পছন্দ হলে আসমাকে বলব সে যেন এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসে।

আমি বললাম, এখন আমাকে বায়নার টাকা দাও।

বায়নার টাকা মানে ?

ইমরুলকে বায়না করলে বায়নার টাকা দেবে না ?

কত দিতে হবে ?

আপাতত বিশ হাজার দাও। জিনিস ডেলিভারির সময় বাকিটা দিলেও হবে।

কিছু না দেখেই বায়নার টাকা দেব ? ছবিও তো দেখলাম না। এতগুলো টাকা কোন ভরসায় দেব ?

আমার ভরসায় দেবে। আমি কি ভরসা করার মতো না ?

মাজেদা খালা বিড়বিড় করে বললেন, তোর উপর ভরসা অবশ্যি করা যায়।

তাহলে দেরি করবে না, এখনি টাকা নিয়ে এসো। টাকা ঘরে আছে না ?

আছে।

আমি টাকা শুনছি, এমন সময় খালু সাহেব বের হয়ে এলেন। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কিসের টাকা ? আমি জবাব দেবার আগেই খালা বললেন, তোমার এত কথা জানার দরকার কী ? খালু সাহেব সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলেন। ক্ষমতাবান কোনো মানুষকে চোখের সামনে চুপসে যেতে দেখলে ভালো লাগে। আমি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললাম, খালু সাহেব, আপনার পেটের অবস্থা কী ? তিনি জবাব দিলেন না। চুপসানো অবস্থা থেকে

নিজেকে বের করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। লাভ হলো না। ফুটো হওয়া বেলুন ফুলানো মুশকিল। যতই গ্যাস দেয়া হোক ফুস করে ফুটো দিয়ে গ্যাস বের হয়ে যাবে। খালার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি ইমরুলের বাসার দিকে রওনা হলাম। ইমরুলের বাবার হাতে টাকাটা পৌঁছে দিতে হবে।

@@

যে কয়েকটা জিনিস ঢাকা শহর থেকে উঠে গেছে তার একটা হচ্ছে- টিনের চালের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে নারিকেল গাছ। হঠাৎ হঠাৎ যখন নারিকেল গাছওয়ালা একতলা বাড়ি দেখা যায় তখন কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বাড়ির সৌভাগ্যবান মালিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে।

টিনের চালের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছটা নারিকেল গাছ। মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতো। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। টিনের চালে বৃষ্টি অনেকদিন শোনা হয় না। যে সৌভাগ্যবান ভদ্রলোক এই বাড়িতে থাকেন তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে ঘোর বর্ষায় এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হওয়া যাবে।

আমি গেট খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। দরজায় কলিং বেল নেই। পুরনো আমলের কড়া নাড়া সিস্টেম। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। মধ্যবয়ষ্ক এক ভদ্রলোক ভীত চোখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে বললেন, কে ?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু। কেমন আছেন ?

ভদ্রলোক কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। চুপসানো গলায় বললেন, ভালো। আপনাকে চিনতে পারলাম না।

আমি বললাম, আমাকে চিনতে পারার কোনো কারণ নেই। আমার সঙ্গে আগে আপনার কখনো দেখা হয় নি। আমি অনেক দিন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনি না। আপনি যদি অনুমতি দেন কোনো বৃষ্টির দিনে এসে আপনার বাড়ির উঠানে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনে যাব।

ভদ্রলোকের চোখে ভয়ের ভাব আরো প্রবল হলো। তিনি কিছুই বললেন না। আমি বললাম, আমাকে মনে হয় আপনি ভয় পাচ্ছেন। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি খুবই নিরীহ মানুষ। আচ্ছা আজ যাই, কোনো এক বৃষ্টির দিনে চলে আসব।

ভদ্রলোক তারপরেও কোনো কথা বললেন না। দরজার ফাঁক দিয়ে মাধ্যা বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন না। আমি যখন গোট পার হয়ে রাস্তায় পা দিয়েছি তখন তিনি ডাকলেন—একটু শুনে যান।

আমি ফেরত এলাম। ভদ্রলোক বললেন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

হাবিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা এই। ঝড়-বাদলার দিনে আমি এই বাড়িতে উপস্থিত হই। হাবিবুর রহমান সাহেব আমাকে দেখে খুব যে খুশি হন তা না। কিছুটা সন্দেহ নিয়েই তিনি আমাকে দেখেন, তবে তাঁর স্ত্রী ফরিদা অত্যন্ত খুশি হয়। আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলে, বৃষ্টি-ভাই আসছে। আমার বৃষ্টি-ভাই

আসছে। বৃষ্টি-বাদলা উপলক্ষে ফরিদা বিশেষ বিশেষ রান্না করে। প্রথম দফায় হয় চালভাজা। কাচামরিচ, সরিষার তেল, পিয়াজ দিয়ে মাখানো চালভাজাকে মনে হয় বেহেশতি কোনো খানা। রাতে হয় মাংস-খিচুড়ি। সামান্য খিচুড়ি, ঝোল ঝোল মাংস এত স্বাদু হয় কিসের গুণে কে জানে!

ফরিদা আমাকে দেখে যে রকম খুশি হয়— তার ছেলে ইমরুলও খুশি হয়। এই খুশির কোনোরকম ন্যাকামি সে দেখায় না। বরং ভাব করে যেন আমাকে চিনতে পারছে না। শুধু যখন আমার চলে যাবার সময় হয় তখন মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলে- হিমু যাবে না। হিমু থাকবে।

ইমরুল বারান্দায় বসে ছবি আঁকিছিল। আমাকে দেখেই ফিক করে হেসে অন্য দিকে ঘুরে বসল। দু'হাত দিয়ে ছবি ঢেকে ফেলল।

আমি বললাম, অন্য দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? আমার দিকে তাকা। ইমরুল তাকাল না। গভীর মনোযোগে ছবি আঁকতে থাকল। সে সাধারণ ছবি আঁকতে পারে না। রাক্ষসের ছবি আঁকে। তবে ভয়ঙ্কর রাক্ষস না। প্রতিটি রাক্ষস হাস্যমুখী। আমাকে চিনতে না পারা হলো ইমরুলের স্বভাব। তার সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবারই প্রথম কয়েক মিনিট ভাব করে- যেন আমাকে চিনতে পারছে না।

আমি বললাম, তোর খবর কী রে ?

ইমরুল জবাব দিল না। আমাকে চিনতে পারছে না- এখন সে এই ভাবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

কিসের ছবি আঁকিছিস ?

রাক্ষসের।

কোন ধরনের রক্ষস ? পানির রাক্ষস না-কি শুকনার রাক্ষস ?

পানির রাক্ষস।

রাক্ষসটার নাম কী ?

নাম দেই নাই।

নাম না দিলে হবে ? তোর নিজের নাম আছে আর রাক্ষসটার নাম থাকবে না?

তুমি নাম দিয়ে দাও।

রাক্ষসটা কেমন এঁকেছিস দেখা, তারপর নাম ঠিক করব। চেহারার সাথে তার নামের মিল থাকতে হবে। কানা রাক্ষসের নাম পদ্মলোচন রাক্ষস দেয়া যাবে না। তোর বাবা কি বাসায় আছে ?

হু।

আমি তোর বাবার কাছে যাচ্ছি। ছবি আঁকা শেষ হলে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আকিকা করে নাম দিয়ে দেব।

আকিকা কী ?

আছে একটা ব্যাপার। নাম দেয়ার আগে আকিকা করতে হয়। ছেলে রাক্ষস হলে দুটা মুরগি লাগে, মেয়ে রাক্ষসের জন্যে লাগে একটা। তুই যে রাক্ষসটা আঁকছিস সেটা ছেলে না মেয়ে ?

ছেলে।

ঠিক আছে, ঐকে শেষ কর। ততক্ষণে তোর বাবার সঙ্গে জরুরি কিছু আলাপ করে নেই।

হাবিবুর রহমান সাহেবের বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। গত ছ'মাস ধরে তাকে

দেখাচ্ছে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ের মতো। মাথার চুল খাবলা খাবলাভাবে পেকে গেছে। মুখের চামড়া ঝুলে গেছে। গলার স্বরেও শ্লেষ্মা মেশানো বৃদ্ধ ভাব এসে গেছে। শুধু চোখে ছানি পড়াটা বাকি। চোখে ছানি পড়লে ষোলকলা পূর্ণ হয়। গত ছ'মাস ধরে ভদ্রলোকের চাকরি নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা গুরুতর অসুস্থ। গত দু'মাস ধরে হাসপাতালে আছে। হার্টের ভাল্বে সমস্যা হয়েছে। দূষিত রক্ত, বিশুদ্ধ রক্ত হার্টের ভেতর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের মিলমিশ বন্ধ না হলে ফরিদা জীবিত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে বের হতে পারবে এমন মনে হয় না। এক লক্ষ টাকার নিচে হার্টের অপারেশন হবার সম্ভাবনা নেই। বিশ হাজার টাকা কয়েক দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

হাবিবুর রহমান ঠাণ্ডা মেঝেতে বালিশ পেতে শুয়েছেন। তাঁর গা খালি। লুঙ্গি অনেকদূর গুটানো। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেমন কিছুক্ষণ হকচকানো অবস্থায় থাকে, কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না তার সে-রকম হলো। তিনি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে ?

আমি বললাম, আমি হিমু।

ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কিছু মনে করবেন না। সরি। আমার মাথা পুরাপুরি আউলা অবস্থায় চলে গেছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে এসেছেন ? বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

হচ্ছে না। তবে হবে। আপনি ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আছেন কেন ?

হাবিবুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, হিমু ভাই, শরীর চড়ে গেছে। সারা শরীরে জ্বালাপোড়া। সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকলে আরাম হয়। তা-ও পুরোপুরি জ্বলুনি কমে না। বরফের চাঙের উপর শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত।

আমি বললাম, মাছপট্টি থেকে বরফের একটা চাঙ কিনে নিয়ে আসেন। দাম বেশি পড়বে না।

সত্যি কিনতে বলছেন ?

হ্যাঁ। সব চিকিৎসার বড় চিকিৎসা হলো মন-চিকিৎসা। মন যদি কোনো চিকিৎসা করতে বলে সেই চিকিৎসা করে দেখা দরকার। চলুন যাই, বড় দেখে একটা বরফের চাঙ কিনে নিয়ে আসি।

হাবিবুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, আপনাকে এত পছন্দ করি। কিন্তু আপনার কথাবার্তা বেশিরভাগই বুঝতে পারি না। কোনটা রসিকতা কোনটা সিরিয়াস কিছুই ধরতে পারি না। ফরিদা দেখি ধরতে পারে। তার বুদ্ধি বেশি। তার তুলনায় আমি পাঁঠা-শ্রেণীর।

ফরিদা আছে কেমন ?

ভালো না। ভাব দেখাচ্ছে ভালো আছে। দেখা করতে গেলে ঠাট্টা ফাজলামিও করে। কিন্তু আমি তো বুঝি!

আপনি কীভাবে বুঝবেন ? এইসব সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে হলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে। আপনার বুদ্ধি তো পাঠা-শ্রেণীর।

হাবিবুর রহমান বললেন, এইসব জিনিস বোঝা যায়। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ফরিদা পনেরো-বিশ দিনের বেশি নাই। ইমরুলকে নিয়ে কী করব আমি এই চিন্তায় অস্থির। আমার একার পক্ষে ইমরুলকে বড় করা সম্ভব না।

দত্তক দিয়ে দিন। ছেলেপুলে নেই এমন কোনো ফ্যামিলির কাছে দিয়ে দিন। ওরা পেলে বড় করুক। বড় হবার পর আপনি পিতৃপরিচয় নিয়ে উপস্থিত হবেন। ছেলে

সব ফেলে-ফুলে বাবা বাবা বলে আপনার কাছে ছুটে আসবে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় সন্তান পালন করে, অনেকটা সে-রকম।

হিমু ভাই!

জি।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা করব কী জন্যে ?

আমি আমার এত আদরের সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দেব ? আমার কষ্টটা দেখবেন না?

অবশ্যই আপনার কষ্ট হবে। আপনার যতটুকু কষ্ট হবে ঠিক ততটুকু আনন্দ হবে যে ফ্যামিলি আপনার ছেলেকে নেবে। একে বলে ন্যাচারাল ইকুইলিবিয়াম। সাম্যাবস্থা। একজনের যতটুক আনন্দ অন্যের ততটুকু দুঃখ। Conservation of Happiness হিমুর সেকেন্ড ল' অব মেন্টাল ডিনামিক্স।

হিমুর সেকেন্ড ল' অব মেন্টাল ডিনামিক্স ?

জি, থর্মোডিনামিক্সের ল'র সঙ্গে কিছু মিল আছে।

হাবিবুর রহমান দুঃখিত গলায় বললেন, হিমু ভাই, কিছু মনে করবেন নাআপনি সবসময় ধোঁয়াটে ভাষায় কথা বলেন, আমি বুঝতে পারি না। আমার খুবই কষ্ট হয়।

বুঝিয়ে দেই ?

দরকার নেই, বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনাকে দেখে ভালো লাগছে এটাই বড় কথা। আপনাকে যখনই দেখি তখনই ভরসা পাই। চা খাবেন ?

চা-পাতা চিনি এইসব আছে, নাকি কিনে আনতে হবে ?

চা-পাতা চিনি আছে। দুধও আছে। আপনি আসবেন জানি, এই জন্যে আনিয়ে রেখেছি।

হাবিবুর রহমান চা বানাতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। পাপ-পুণ্য বিষয়ক যে থিওরি মাথায় এসেছে, সেই থিওরিটা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

হাবিবুর রহমান সাহেব।

জি।

আপনি কি নীলক্ষেতে পশুপাখির দোকানে কখনো গিয়েছেন ?

জি।

টিয়া পাখির সিজনে যাবেন, দেখবেন অসংখ্য টিয়া পাখি তারা খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। পঞ্চাশ টাকা করে পিস বিক্রি করে। আপনি যদি দুটা টিয়া পাখি একশ' টাকায় কিনে খাঁচা খুলে পাখি দুটা আকাশে ছেড়ে দেন, ওদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেন, তাহলে কি আপনার পুণ্য হবে না ?

জি, হবার কথা। এখন ভালোমতো চিন্তা করে দেখুন- আপনি যাতে পুণ্য করতে পারেন তার জন্যে একজনকে পাপ করতে হয়েছে। স্বাধীন পাখিগুলি ধরে ধরে বন্দি করতে হয়েছে। কাজেই যতটুকু পাপ ততটুকু পুণ্য। Conservation of energy-র মতো Conservation of পাপ।

ভাই সাহেব, আপনি খুবই অদ্ভুত মানুষ। চা-টা কি বেশি কড়া হয়ে গেছে ?

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, অসাধারণ চা হয়েছে। না কড়া, না পাতলা।

হাবিবুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ফরিদাও আমার হাতে বানানো চা

খুব পছন্দ করে। রাতে ঘুমোতে যাবার সময় সে বলবে- এক কাপ চা বানিয়ে দাও না প্লিজ! আচ্ছা হিমু সাহেব, বেহেশতে কি চা পাওয়া যাবে?

বেহেশতে চা পাওয়া যাবে কি-না এই খোঁজ কেন নিচ্ছেন ?

হাবিবুর রহমান অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, ফরিদার কথা ভেবে বলেছি। ও যে টাইপ মেয়ে, বেহেশতে যে যাবে এটা তো নিশ্চিত। তার চা এত পছন্দ! বেহেশতে চা পাওয়া গেলে সে নিশ্চয়ই আরাম করে খেত।

উনার পছন্দ আপনার হাতে বানানো চা। গেলমানদের হাতের বানানো চা খেয়ে উনি তৃপ্তি পাবেন বলে মনে হয় না। চা যত ভালোই হোক আমার ধারণা উনি ভুরু কুঁচকে বলবেন, বেহেশতের এত নামডাক শুনেছি, কই এখানকার চা তো ইমরুলের বাবার হাতের চায়ের মতো হচ্ছে না।

হাবিবুর রহমান হেসে ফেলে বললেন, মনে হচ্ছে কথাটা আপনি ভুল বলেন নি। ইমরুলের জন্মের পরের ঘটনা কি আপনাকে বলেছি ?

কি ঘটনা?

ফরিদা যখন শুনল তার ছেলে হয়েছে, কেঁদে-কেটে অস্থির। ছেলেকে কোলে পর্যন্ত নিবে না।

এমন অবস্থা! কেন ?

কারণ আমি চেয়েছিলাম মেয়ে হোক। ফরিদার সব কিছু আমাকে ঘিরে। এখন সে মারা যাবে বিনা চিকিৎসায়, আমি কিছুই করতে পারছি না- এটা হলো কথা ।

বিশ হাজার টাকা জোগাড় হয় নি ?

হাবিবুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না। চেষ্টাও করি নি।

কেন?

বিশ হাজার টাকা যদি জোগাড় করি, বাকিটা পাব কোথায় ?

আমি বললাম, সেটা অবশ্য একটা কথা।

হাবিবুর রহমান বললেন, ফরিদা আমার সঙ্গে থাকবে না- মানসিকভাবে এই সত্যি আমি মেনে নিয়েছি। ইমরুলকে কীভাবে বোঝাব মাথায় আসছে না।

আমি বললাম, এইসব জটিল জিনিস ছোটরা খুব সহজে বুঝতে পারে। ইমরুলকে নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না।

আরেক কাপ চা কি দেব হিমু ভাই ?

দিন আরেক কাপ।

আমি দু'কাপ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললাম, ও আচ্ছ, ইমরুলের জন্মদিনের উপহার তো দেয়া হলো না। আজ উপহার নিয়ে এসেছি। ঐদিন খালি হাতে জন্মদিনে এসেছিলাম। তখনই ভেবে রেখেছি। পরে যখন আসব কোনো উপহার নিয়ে আসব।

হাবিবুর রহমান বললেন, কী যে আপনি করেন হিমু ভাই। গরিবের ছেলের আবার জন্মদিন কী ? তারিখটা মনে রেখে আপনি যে এসেছেন এই খুশিই আমার রাখার জায়গা নাই। কী গিফট এনেছেন ?

ক্যাশ টাকা এনেছি। গিফট কেনার সময় পাই নি।

আমি টাকার বান্ডিলটা হাবিবুর রহমান সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলাম। হাবিবুর রহমান সাহেব অনেকক্ষণ টাকার বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, এখানে বিশ হাজার টাকা আছে, তাই না ?

আমি বললাম, হু।

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। চোখের পানি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি লক্ষ করেছি, শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের চোখের পানি দেখতে ভালো লাগে। পুরুষ মানুষের চোখের পানি দেখা মাত্রই রাগ ভাব হয়। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার চোখের পানি বিরক্তি তৈরি করে।

আমি হাবিবুর রহমান সাহেবের চোখের পানি কিছুক্ষণ দেখলাম। আমার রাগ উঠে গেল। আমি তার দিকে না তাকিয়ে বললাম, যাই। তিনি জবাব দিলেন না। আমি চলে এলাম বারান্দায়। ইমরুল এখনো ভূতের ছবি এঁকে যাচ্ছে। আমি বললাম, ইমরুল যাই। সে মাথা নিচু করে ফেলল। এটা তার কান্নার প্রস্তুতি। আমি চলে যাচ্ছি — এই দুঃখে সে কিছুক্ষণ কাঁদবে। আগে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত । এখন মা পাশে নেই। কাঁদার ব্যাপারটা তাকে একা একা করতে হয়।

কাঁদছিস না-কি ?

হু।

ভালোই হলো। বাপ-বেটা দু'জনের চোখেই জল। চোখের জলে চোখের জলে ধুল পরিমাণ। মাকে দেখতে যাবি ?

না।

না কেন ? মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না ?

ইমরুল জবাব দিল না। চোখ মুছে ফোঁপাতে লাগল। ইমরুলের চরিত্রের এই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না । যে মায়ের জন্যে তার এত ভালোবাসা অসুস্থ হবার পর সেই মা'র প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই কেন? সে কি ধরেই নিয়েছে মা আর সুস্থ হয়ে ফিরবে না ?

কিরে ব্যাটা, মাকে দেখতে যাবি না ? চল দেখে আসি ?

না।

তাহলে একটা কাজ কর— রাক্ষসের ছবিটা দিয়ে দে, তোর মাকে দিয়ে আসি। ছবির এক কোনায় লাল রঙ দিয়ে লিখে দে— মা। মা লিখতে পারিস?

পারি।

সুন্দর করে মা লিখে চারদিকে লতা-ফুল-গাছ দিয়ে ডিজাইন করে দে। পারবি না ?

পারব ।

পারলে তাড়াতাড়ি কর । কান্না বন্ধ। কাঁদতে কাঁদতে যে ডিজাইন করা হয় সে ডিজাইন ভালো হয় না ।

ইমরুল কান্না থামিয়ে ডিজাইন করার চেষ্টা করছে। কান্না পুরোপুরি থামছে না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কিছুক্ষণ পর পর উঠে আসছে। আচ্ছা— কান্নার সঙ্গে তো সমুদ্রের খুব মিল আছে। সমুদ্রের জল নোনা । চোখের জল নেন। সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। কান্নাও আসে ঢেউয়ের মতো ।

কোনো কোনো মানুষকে কি অসুস্থ অবস্থায় সুন্দর লাগে ? ব্যাপারটা আগে তেমনভাবে লক্ষ করি নি। ফরিদাকে খুবই সুন্দর লাগছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এইমাত্র গরম পানি দিয়ে গোসল করে সেজেগুজে বসে আছে। কোথাও বেড়াতে যাবে। গাড়ি এখনো আসে নি বলে অপেক্ষা। আমি বললাম, কেমন আছ ফরিদা ?

ফরিদা বলল, খুব ভালো।

আমি বললাম, তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে- খুব ভালো আছ। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে ?

রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাই। ঘুম তো ভালো হবেই। তবে কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি।

কেন ?

সেটা আপনাকে বলা যাবে না।

ফরিদা মুখ টিপে হাসছে। দুষ্টুমির হাসি। এইসব দুষ্টুমির ব্যাপার তার মধ্যে আগে ছিল না। ইদানীং দেখা দিয়েছে।

ইমরুল তোমার জন্যে উপহার পাঠিয়েছে, ভূতের ছবি। আমি স্কচ টেপ নিয়ে এসেছি। এই ছবি আমি তোমার খাটের পেছনের দেয়ালে লাগিয়ে দেব। ডাক্তাররা রাগ করবে না তো ?

রাগ করতে পারে ।

ছেলে মা'র জন্যে ছবি এঁকে পাঠিয়েছে- এটা জানলে রাগ নাও করতে পারে।

আমি ছবি টানিয়ে দিলাম। ফরিদা মুগ্ধ চোখে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

হিমু ভাইজান!

বলো।

ইমরুল আমাকে দেখতে আসতে চায় না- এটা কি আপনি জানেন ?

জানি না।

ও আসতে চায় না। সে যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি, হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসতে রাজি না। কেন বলুন তো।

মনে হয় হাসপাতাল তার পছন্দ না।

ফরিদা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আমার ধারণা সে বুঝে ফেলেছে আমি বাঁচব না। এই জন্যে আগে থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। আমার ধারণা কি ঠিক হিমু ভাই ?

আমি বললাম, ঠিক হতে পারে।

ফরিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি মরে গেলে ওর বাবা ওকে নিয়ে বিরাট বিপদে পড়বে। ঠিক না হিমু ভাই ?

আমি বললাম, বিপদে তো পড়বেই।

ও কী করবে বলে আপনার ধারণা ?

প্রথম কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করবে। তারপর ইমরুলের দেখাশোনা দরকার- এই অজুহাতে অল্পবয়সী একটি তরুণী বিয়ে করবে। তরুণীর মন জয়ের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকবে। প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে তার প্রথম স্ত্রীর চেয়ে এই স্ত্রী মানুষ হিসেবে অনেক ভালো। প্রায় তুলনাহীন।

ফরিদা হাসছে। প্রথমে চাপা হাসি, পরে শব্দ করে হাসি। সে মনে হলো খুবই মজা পাচ্ছে। হাসি থামাবার জন্যে তাকে মুখে আঁচল চাপা দিতে হলো।

হিমু ভাই।

বলো।

আমার মৃত্যুর পর আপনি যা করবেন তা হলো ছেলে-মেয়ে নেই এমন কোনো

পরিবারে ইমরুলকে দত্তক দিয়ে দেবেন। যাতে ওরা তাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

ফরিদা দুঃখিত গলায় বলল, আপনি এত সহজে আচ্ছা বললেন ? আপনার আচ্ছা বলতে একটুও মন খারাপ হলো না ? আপনি যে হৃদয়হীন একজন মানুষ- এটা কি আপনি জানেন হিমু ভাই ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

মিসেস আসমা হক
পিএইচডি
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার সালাম গ্রহণ করুন। আশা করি মঙ্গলময়ের অসীম করুণায় আপনি সুস্থ দেহে সুস্থ মনে শান্তিতে বাস করিতেছেন। আপনার স্বামীকেও আমার আসসালাম। আল্লাহপাকের কাছে আপনাদের সুখ কামনা করি। আল্লাহপাক গুনাহগার বান্দার দোয়া কবুল কর। আমিন।

এখন কাজের কথায় আসি— জনাবা, আমার কোম্পানি [হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড] আপনার 'জিনিস' ডেলিভারি দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। আমার কোম্পানি আপনার জন্য যে শিশুটি বাছিয়া রাখিয়াছে ইনশাআল্লাহ সে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আপনি মাজেদা খালার পূর্বপরিচিত। আপনার কাছে বাজে মাল গছাইব না। এতে কোম্পানির সম্মানহানী হয় এবং আত্মীয়স্বজনের কাছেও মুখ ছোট হয়। আমার কোম্পানি একদিনের ব্যবসায়ী নয়। সুনামের সাথে আমরা দীর্ঘদিন ব্যবসা করিব ইহাই আমাদের অঙ্গীকার।

আমার কোম্পানি যে শিশুটিকে ঠিক করিয়াছে তাহার নাম ইমরুল। আপনি যে-সব শর্ত আরোপ করিয়াছেন এই শিশুটি ইনশাল্লাহ সব শর্তই পূরণ করে। দুই একটি ক্ষেত্রে একটু উনিশ-সাড়ে উনিশ হইতে পারে। ইহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আপনি শিশুটির ওজন পঁচিশ হইতে ত্রিশ পাউন্ডের ভিতর থাকিতে হইবে- এমন শর্ত দিয়াছেন। ইমরুলের ওজন তার চেয়ে কম।

সে খুব অসুখ-বিসুখে ভুগে বলিয়া শরীরের ওজনের তেমন বৃদ্ধি নাই। কয়েকদিন যাবত সে হামে শয্যাশায়ী। খাওয়া-দাওয়া কমিয়া গিয়াছে। সে আরোগ্য লাভ করা মাত্র হাইপ্রোটিন ডায়েটের মাধ্যমে তার ওজন বৃদ্ধি করা হইবে। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে বাংলাদেশে চিকন স্বাস্থ্য মোটা করিবার ভালো ব্যবস্থা আছে। বড় বড় রাস্তার দুই পাশে সচিত্র বিজ্ঞাপন আছে— 'চিকন স্বাস্থ্য মোটা করা হয়'। আমি এদের সঙ্গে

যোগাযোগ করিয়া সঠিক পন্থা অবলম্বন করিব। শিশু ডেলিভারি নিবার পূর্বে আপনার সামনে তাকে ওজন করা হইবে।

ইমরুলের একটি 3R সাইজ ছবি পাঠাইলাম। ছবিতে সে একটু বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা কোনো শারীরিক ত্রুটি নহে। ছবি তুলিবার সময় কেন জানি সে খানিকটা ডান দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়। ফুল ফিগারের এই ছবিতে তার মুখাবয়ব স্পষ্ট নয় বলিয়া মুখের একটি ক্লোজ-আপ ছবিও পাঠানো হইল। একটি হাস্যমুখী ছবি পাঠাইতে পারিলে ভালো হইত। তাহার হাসি সুন্দর। সে এমনিতে খুবই হাসে, শুধু ছবি তুলিবার সময় গম্ভীর হইয়া থাকে। ইহা তাহার পুরানা অভ্যাস।

ইমরুলের আঁকা কিছু ছবি (সর্বমোট তিন) পাঠাইলাম। তিনটিই ভূত-প্রেতের ছবি। তাহার আঁকা একটি ল্যান্ডস্কেপ পাঠাইতে পারিলে ভালো হইত। গাছ-নদী-সূর্যস্ত-পালতোলা নৌকা টাইপ ছবি। কিন্তু ইমরুল ভূতের ছবি ছাড়া অন্য কোনো ছবি আঁকে না।

আপনাকে যে তিনটি ভূতের ছবি পাঠানো হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি পানিভূতের ছবি। বাকি দুইটি রাক্ষসের ছবি। ইমরুলের আঁকা প্রতিটি রাক্ষস এবং ভূতের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন, পানিভূতটির নাম— 'হাক্কু'। এই ভূতের বিশেষত্ব হইল তাহার প্রধান খাদ্য মানুষের "গু" । ['গু' শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করিবার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার রুচিবোধকে আহত করিয়া থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।]

বিশেষ আর কী ? ইমরুল বিষয়ে সমস্ত তথ্যই জানাইলাম, বাকি আপনার বিবেচনা। অতি শীঘ্র দেশে আসিয়া মাল ডেলিভারি নিয়া আমাকে দায়মুক্ত করিবেন। অধীনের ইহাই বিনীত প্রার্থনা। আল্লাহপাক আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে মঙ্গলমতো রাখুক— ইহাই তাহার দরবারে আমার ফরিয়াদ।

আসসালাম।

হিমু
প্রোপাইটার
হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড নাম্বার পেনডিং

জনাব হিমু সাহেব,

অপ্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। আপনার দীর্ঘ পত্র পেয়ে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। আপনি কুরুচিপূর্ণ আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন, আপনার হাতের লেখাও অপাঠ্য। ভবিষ্যতে ভাষা ব্যবহারে শালীন হবেন এবং যা বলতে চান সরাসরি বলবেন। দীর্ঘ পত্র পাঠের সময় আমার নেই।

যে শিশুটিকে আপনি আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তার বিষয়ে আমার এবং আমার স্বামী দু'জনেরই কিছু আপত্তি আছে। যতদূর মনে হয় এই শিশুটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারব না। কারণগুলি স্পষ্ট করে বলি।

এক

শিশুর মানসিকতা সুস্থ নয়। যে শিশু ভূত-প্রেত-রাক্ষস ছাড়া অন্য কিছুর ছবি আঁকতে পারে না তার মানসিকতা অবশ্যই সুস্থ নয়। এই বিষয়ে আমরা মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর জেনিংস-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাকে ছবি তিনটিও দেখিয়েছি। উনি নিজেও বলছেন শিশু অসুস্থ পরিবেশে বড় হচ্ছে। শিশুর মনে নানান ধরনের ক্রোধ এবং ভীতির সঞ্চার হচ্ছে বলেই ছবিগুলি এমন হচ্ছে। ছবিতে গাঢ় লাল রঙের অতিরিক্ত ব্যবহারেই তিনি চিন্তিত বোধ করছেন।

দুই

আপনি লিখছেন শিশুটি সব সময় অসুখে-বিসুখে ভোগে। তার মানে শিশুটি জন্ম-রুগ্ন। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই নেই। আমরা একটি স্বাস্থ্যবান শিশু চেয়েছি। চির রুগ্ন শিশু চাই নি।

তিন

শিশুটির যে ছবি পাঠিয়েছেন তা দেখেও আমি চিন্তিত বোধ করছি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তার চোখ ছোট এবং টানা টানা। মঙ্গোলিয় বেবির লক্ষণ।

চার

ছবিতে শিশুটি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি লিখেছেন এটা তার কোনো শারীরিক ক্রটি নয়। ছবি তোলার সময় সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে পোলিও রোগগ্রস্ত। তার একটি পা অপুষ্ট।

আমার কেন জানি ধারণা হচ্ছে আপনার কোম্পানি আমাকে বাজে শিশু গছিয়ে বাণিজ্য করার চেষ্টা করছে। আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, বাংলাদেশের সব কোম্পানিই এই জিনিস করে। আপনি তার ব্যতিক্রম হবেন কেন ?

যাই হোক, আপনি এই শিশুটি বাদ দিয়ে অন্য কিছু দেখুন। আমি ইমরুল নামের শিশুটির প্রতি আগ্রহী নই। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে আমি দেশে আসব। তখন যদি সম্ভব হয় কয়েকটি শিশু আমাকে দেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

ইতি
আসমা হক
পিএইচডি

পুনশ্চ : ভবিষ্যতে আমাকে হাতে লিখে কোনো চিঠি পাঠাবেন না। কম্পিউটারে কম্পোজ করে পাঠাবেন। অবশ্যই চিঠি সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

••• ••• •••

মিসেস আসমা হক
পিএইচডি
জনাবা,

আপনার পত্র পাইয়া মর্মাহত হইয়াছি। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ইমরুলকে ডেলিভারির জন্যে প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আপনার পত্র পাইয়া

মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি। এখন ইমরুলকে নিয়া কী করি! মিডলইষ্টে উটের জকি হিসাবে প্রেরণ ছাড়া এখন আর আমার কোনো গতি নাই। কী আর করা, ইহাই ইমরুলের কপাল। এই জন্যেই পল্লীর মরমী কবি বলিয়াছেন, "কপাল তোমার রঙ্গ বোঝা দায়।" আপনার কপালে যে শিশু আছে আপনি তাহাকেই পাইবেন। শত চেষ্টা করিয়াও অন্য কোনো শিশুকে আপনার কাছে গছাইয়া দেওয়া যাইবে না। আমাদের কোম্পানি আপনার কোলে আপনার পছন্দের শিশু তুলিয়া দিবে, ইহাই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের কোম্পানির মটো

'বিদেশের ঘরে ঘরে দেশের সেরা শিশু'। ইহা শুধু কথার কথা নহে। ইহাই আমাদের পরিচয়।

আপনাকে আরো দীর্ঘ পত্র লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আপনি সংক্ষিপ্ত পত্র দিতে বলিয়াছেন বলিয়া এইখানেই শেষ করি।

ইতি আপনার একান্ত বাধ্যগত

হিমু

প্রোপাইটার

হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

•••••••••

হিমু,

এই ছাগলা তুই পেয়েছিস কী ? আসমাকে তুই ছাইপাশ কী চিঠি লিখছিস ? তোর মতলবটা কী ? আমি যদি ঝাড়ুপেটা করে তোর বিষ না ঝাড়ি আমার নাম মাজেদা না।

তুই আসমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিস আসমা ফ্যাক্স করে সেসব চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছে। চিঠি পড়ে আমার আক্কেলগুড়ুম। হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি ? ইয়ারকি পেয়েছিস! সবার সঙ্গে ইয়ারকি করে করে তুই যে মাথায় উঠে গেছিস এই খবর রাখিস ? তুই কি ভাবিস সবাই ঘাস খায় ? আসমা বেচারি তোর লক্ষণ জানে না। সে তোর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে বসে আছে। আমি যখন তাকে বললাম হিমুর প্রতিটি কথা ভুয়া। সত্যি কথা সে অতীতে কোনোদিন বলে নি। ভবিষ্যতেও বলবে না।— আসমা আমার কথা শুনে তোর উপর খুবই রাগ করেছে। সে বলছে তোকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিতে। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। তোর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় আছে তারই কখনো না কখনো মনে হবে তোকে পুলিশে দিয়ে ছেঁচা খাওয়াতে।

আসমা সামনের সপ্তাহে দেশে আসছে। ইমরুল না ভিমরুল কাকে যে তুই জোগাড় করে রেখেছিস তাকে দেখিয়ে দিস। পছন্দ হলে হবে, না হলে নাই। নতুন ঝামেলায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

এখন অন্য একটা জরুরি খবর তোকে দিই। তোর খালু অসুস্থ।

প্রথম ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। এখন মনে হচ্ছে সিরিয়াস। গত আটদিন ধরে তোর খালু কোনো কথা বলতে পারছে না। গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। ভোকাল কর্ডে কী যেন সমস্যা হয়েছে। ইএনটির প্রফেসর নজরুল চিকিৎসা করছেন । চিকিৎসায় কোনো উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত হয়তো দেশের বাইরে নিয়ে যেতে হবে । তোর কি পাসপোর্ট আছে ? পাসপোর্ট থাকলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। তুই কোনোই কাজের না- তার পরেও তোর হলুদ পাঞ্জাবি দেখলে কেমন যেন ভরসা পাওয়া যায়।

হিমু, তুই একবার এসে তোর খালুকে দেখে যা। বেচারা খুবই মুসড়ে পড়েছে। তাকে দেখলেই এখন আমার মায়া হয়।

ইতি

তোর মাজেদা খালা

••••••••••

হিমু ভাই,

আমার সালাম নিন। ইমরুল গত তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। জ্বর একশ' থেকে একশ' তিনের ভেতর উঠা-নামা করছে। জ্বর যখনই বাড়ছে তখনি সে আপনাকে খুঁজছে। তার মাকে খুঁজছে না। যে ইমরুল সারাক্ষণ 'মা মা' করে সেই ইমরুল কেন জ্বরে অস্থির হয়ে তার মাকে ডাকবে না ? ঘটনাটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। বলেই আপনাকে জানালাম। জগতের সকল ঘটনার পেছনেই কোনো না কোনো কার্যকারণ থাকে। এই ঘটনার পেছনের কারণ কী হতে পারে তা নিয়ে ভেবেছি। আমি এর পেছনে একটি কারণ বের করেছি। কারণটি সত্যি কি-না তা দয়া করে আপনি জানাবেন। কারণ এই রহস্য উদ্ধার না করতে পারলে আমি শান্তি পাব না। আমি সামান্য কারণে অস্থির হই। এখন অস্থিরতা বোধ করছি।

আমার ধারণা কোনো এক সময় ইমরুল বড় ধরনের কোনো শারীরিক কষ্টে ছিল, তখন আপনি তার কষ্ট দূর করেছেন। যে কারণে সে কোনো শারীরিক কষ্টে পড়লেই আপনার কথা মনে করে। আমি এই বিষয়ে ইমরুলের সঙ্গে কথা বলেছি। সে কিছু বলতে পারে না। আপনার কি কিছু মনে আছে ? যদি মনে থাকে আমাকে জানাবেন। আমার সংশয় দূর করবেন।

ইমরুলের মাকে দেখলে এখন আপনি চমকে যাবেন । তাকে দেখলে মনে হয় তার রোগ সেরে গেছে। সে খুবই হাসিখুশি দিন কাটাচ্ছে। সাজগোজও করছে। গত পরশু আমাকে দিয়ে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি কিনে আনাল। শাড়ির সঙ্গে সবুজ টিপ। তার না-কি সবুজ কন্যা সাজার ইচ্ছা করছে। তার ছেলে অসুস্থ— এটা শোনার পরও কোনো ভাবান্তর হলো না। একবার বলল না, 'ইমরুলকে নিয়ে এসো আমি দেখব'। এইসব লক্ষণ ভালো না । নেভার আগে প্রদীপ দপ করে জ্বলে উঠে। হিমু ভাই, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ইমরুলের মা'র যদি কিছু হয় আমার আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। আমি ইমরুলকে আপনার হাতে দিয়ে লাফ দিয়ে

কোনো চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়ে যাব। এটা কোনো কথার কথা না। ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সাহস আমার আছে।

ইমরুলের মায়ের বিষয়ে একটি তথ্য আপনাকে জানাতে চাচ্ছি। তথ্যটি খুবই সেনসেটিভ। আমার মর্মযাতনার কারণ। ঘটনা হয়তো কিছুই না, তারপরও আমার কাছে অনেক কিছু। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, অনেক বড় বড় ঘটনা আমি সহজভাবে নিতে পারি। কিন্তু অনেক তুচ্ছ ঘটনা সহজভাবে নিতে পারি না। হয়তো এটা আমার কোনো মানসিক ব্যাধি। এমন এক ব্যাধি যে ব্যাধির কোনো চিকিৎসা নাই।

ঘটনাটা বলি— ইমরুলের মা ফরিদা যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখন তারা থাকত ময়মনসিংহের শাওড়াপাড়া বলে একটা জায়গায়। চারতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিন তলায়। একতলায় থাকত বাড়িওয়ালা। বাড়িওয়ালার বড় ছেলের নাম হাসান। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। ছুটিছাঁটায় বাড়ি আসত। এই ছেলের হঠাৎ মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল — সে ফরিদাকে বিয়ে করবে। ছেলের বাবা-মা খুবই রাগ করলেন। পড়াশোনা শেষ হয় নি, এখনই কিসের বিয়ে ? কিন্তু ছেলে বিয়ে করবেই। সে পড়াশোনা ছেড়ে দিল, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল। তার মধ্যে মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। তখন সবাই ঠিক করল বিয়ে দেয়া হবে। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক হলো । কী কারণে জানি শেষপর্যন্ত বিয়ে হয় নি। ফরিদার বাবা বদলি হয়ে ঢাকায় চলে এলেন। ছেলে চলে গেল দেশের বাইরে।

হিমু ভাই, আমার ধারণা- ঐ হারামজাদা ছেলে এখন দেশে। এবং সে রোগী দেখার নাম করে প্রায়ই ফরিদার সঙ্গে দেখা করছে। ফরিদা যে হঠাৎ সাজগোজ শুরু করেছে, সবুজ শাড়ি পরে সবুজ কন্যা সাজতে চাচ্ছে, তার মূল কারণ হয়তো এই।

হিমু ভাই, আমি অনুমান বা সন্দেহ থেকে কিছু বলছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বদমায়েশ ফরিদার সঙ্গে দেখা করছে। ফরিদাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি বলে জিজ্ঞেস করতে পারছি না, তবে ক্লিনিকের নার্সকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি— এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ফরিদার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

গত পরশু যখন ফরিদাকে দেখতে গেলাম, তখন দেখি তার মাথার কাছে এক প্যাকেট বিদেশী চকলেট। সে প্যাকেট থেকে চকলেট বের করে বলল, নাও। চকলেট খাও। আমি বললাম, চকলেট কে দিয়েছে ? ফরিদা কিছু বলল না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

হিমু ভাই, আমার মনের ভেতর কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন না। আমার আর এক মুহুর্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না। শুধু ইমরুলের জন্যে বেঁচে আছি। এবং প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমার সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়। আপনার উপর দায়িত্ব, আপনি জেনে দিন ঘটনা কী ?

যে লোক চকলেট নিয়ে এসেছে সে যদি ফরিদার পুরনো প্রেমিক হয় তাহলে ঘটনা কোন দিকে যাবে তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

এই হারামজাদা এখন বলবে আমি ফরিদার চিকিৎসার খরচ দিব। মহৎ সাজার চেষ্টা। হিমু ভাই, এ ধরনের লোককে আমি চিনি। এই মতলববাজরা মতলব নিয়ে ঘোরে। অন্য আরেক লোকের স্ত্রী নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন ? তুই মহৎ সাজতে চাস মহৎ সাজ। স্কুল দে, হাসপাতাল দে, তোকে তো কেউ মানা করছে না।

হিমু ভাই শুনুন, এই ব্যাটার টাকায় আমি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাব না। কক্ষনো না। ফরিদা যদি চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যায় তাহলেও না। এই লোক যদি ফরিদার চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে কোনো কথা বলে তাহলে জুতিয়ে হারামজাদার আমি দাঁত ভেঙে দেব।

হিমু ভাই, উল্টাপাল্টা কীসব লিখছি আমি নিজেও জানি না। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। একটা কিছু ঘটনা আমি অবশ্যই ঘটাব। এখন আপনি এসে পুরো ঘটনার হাল ধরুন। আপনার কাছে এই আমার অনুরোধ।

মন অসম্ভব খারাপ। রাতে ঘুম হয় না। গত রাতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রামের দুটো ডরমিকাম খেয়েও সারারাত জেগে বসেছিলাম। শেষ রাতের দিকে বুকে ব্যথা শুরু হলো। সেই সঙ্গে ঘাম। হার্ট এটাক-ফেটাক হয়েছে বলে শুরুতে ভেবেছিলাম। ঐ শুয়োরের বাচ্চা সত্যি সত্যি ফরিদাকে দেখতে এসেছে- এটা জানায় আগে আমার মৃত্যু হলে ভালো হতো। তা হবে না, কারণ আমি হচ্ছি এই পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান অভাগা।

হিমু ভাই, আপনি আমার ব্যাপারটা একটু দেখেন। ফরিদাকে জিজ্ঞেস করে কায়দা করে জেনে নেন- সত্যি সত্যি সে এসেছে কি না।

ইতি

হাবিবুর রহমান

পুনশ্চ-১ : হিমু ভাই, শুয়োরটার নাম রশিদুল করিম। নিউ জার্সিতে থাকে। বলে বেড়ায় কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করেছে। আমার ধারণা- সব ভুয়া। খোঁজ নিলে জানা যাবে পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ঢালে।

পুনশ্চ-২ : হিমু ভাই, আমি যে আমার সংসারের গোপন কথা আপনাকে জানিয়েছি এটা যেন ফরিদা জানতে না পারে। আপনাকে দোহাই লাগে।

••• ••• •••

প্রিয় বৃষ্টি ভাইজান,

হিমু ভাই, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে ? বৃষ্টি শুরু হয় শেষ রাতে। বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি আয়োজন করে বৃষ্টির শব্দ শুনি। বৃষ্টির শব্দ যে আয়োজন করে শোনা যায় এটা আমি শিখেছি আপনার কাছে। প্রথম যেদিন আপনি টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্যে আমাদের বাসায় এসেছিলেন সেদিন আপনাকে ধান্ধাবাজ মানুষ মনে হয়েছিল। যখন দেখলাম আপনি সত্যি সত্যি খুব আগ্রহ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছেন তখন আপনার প্রতি আমার শুরুতে যে মিথ্যা ধারণা হয়েছিল তার জন্যে খুব লজ্জা পেয়েছি।

হিমু ভাই, আমার এখন চিঠি লেখা রোগ হয়েছে। আয়াকে দিয়ে চিঠি লেখার কাগজ-খাম আনিয়েছি। স্ট্যাম্প আনিয়েছি। পরিচিত অপরিচিত সবার কাছে চিঠি লিখছি। আপনি শুনে খুবই অবাক হবেন যে আমি আমার স্কুল-জীবনের এক বান্ধবী লুনাকেও চিঠি লিখেছি। সে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় জন্ডিস হয়ে মারা গিয়েছিল। লুনাকে লেখা চিঠিটা আমি বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি। আপনার কি ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? আমার ধারণা আমার মাথা ঠিকই আছে। আমার শরীর অসুস্থ কিন্তু মাথা সুস্থ।

আমি যে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে চিঠি লিখছি তার পেছনে কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনাকে চিঠি লেখার পেছনে কারণ আছে। আপনি দয়া করে ইমরুলের বাবাকে একটু শান্ত করবেন। সে আমার চিকিৎসার টাকা জোগাড়ের চিন্তায় আধাপাগলের মতো হয়ে আছে। আধাপাগল হলে তো লাভ হবে না। টাকা এমন জিনিস যে পাগল হলেও জোগাড় হয় না। ওর কিছু বড়লোক আত্মীয়স্বজন আছে। এক মামা আছেন কোটিপতি। আমার ধারণা সে প্রতিদিন একবার বড়লোক আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ভিক্ষুকের মতো উপস্থিত হচ্ছে। আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে।

ওর কোটিপতি মামার বাড়িতে বিয়ের পর আমি একবার গিয়েছিলাম। সে-ই আমাকে খুব আগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা সেই বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে থাকার পর ভদ্রলোক খবর পাঠালেন। আজ তাঁর শরীর খারাপ। নিচে নামবেন না। আরেকদিন যেন যাই। সেই দিন আমি যে কষ্ট পেয়েছিলাম এত কষ্ট কোনোদিন পাই নি। আমার ধারণা টাকার সন্ধানে গিয়ে ইমরুলের বাবা রোজ এই কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। টাকা এত বড় জিনিস আমার ধারণা ছিল না। সারাজীবন শুনে এসেছি অর্থ অনার্থের মূল। অর্থ তুচ্ছ। আজ টের পাচ্ছি। অর্থ অনেক বড় জিনিস ।

হিমু ভাই, আপনি ওকে শান্ত করুন। ওর অস্থিরতা দূর করুন।

বিনীতা
ফরিদা

পুনশ্চ-১ : কামরুলের আঁকা ভূতের ছবি যেটা আপনি আমার বেডের পাশের দেয়ালে টানিয়েছেন সেই ছবি সুপার হিট করেছে। ডাক্তার নার্স যেই আসে সেই কিছুক্ষণ ছবি দেখে। অদ্ভুত ভুত দেখে খুব মজা পায়।

@@

মাজেদা খালা দরজা খুলে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকলেন। ভাবটা এরকম যে আমাকে চিনতে পারছেন না। যেন আমি মানুষ না, অন্য গ্রহের কোনো প্রাণী। ফ্লাইং সসারে করে এসেছি। যান্ত্রিক গণ্ডগোলে ফ্লাইং সসার স্টার্ট নিচ্ছে না। আমি ফ্লাইং সসার লুকিয়ে রেখে এই বাড়িতে এসেছি খাদ্যের সন্ধানে। সপ্তাহখানিকের খাবার-দাবার নিয়ে উড়ে চলে যাব।

আমি বললাম, খালাজি সুপ্রভাত।

খালা বললেন, সুপ্রভাত মানে ? তুই কী চাস ? কী জন্যে এসেছিস ? চাঁদমুখ দেখাতে এসেছিস ? তোর চাঁদমুখ কে দেখতে চায় ?

আমি বললাম, রেগে আছ কেন খালা ?

রেগে থাকব না তো কী করব ? তোকে কোলে করে নাচানাচি করব ? আয়, কোলে আয়।

খালা সত্যি সত্যি দু'হাত বাড়ালেন। তার মানে খালার রাগ এখন তুঙ্গস্পর্শী। তুঙ্গস্পর্শী রাগের বড় সুবিধা হচ্ছে- এই রাগ ঝট করে নেমে যায়। রাগ নামানোর জন্যে তেমন কিছু করতে হয় না। আপনা আপনি নামে। সাধারণ পর্যায়ের রাগ নামতে সময় লাগে। রাগ নামানোর জন্যে কাঠ-খড়ও পোড়াতে হয়। আমি খালার রাগ নামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। খালার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাগ নামি নামি করছে।

খালা বললেন, তুই নিজেকে কী ভাবিস ? খোলাসা করে বল তো শুনি ? এক সপ্তাহ হয়েছে আসমা এসেছে। রোজ তোর খোঁজ করছে। আমি দু'বেলা তোর কাছে লোক পাঠাচ্ছি। আর তুই হাওয়া হয়ে গেলি ? কোথায় ছিলি ?

আমি মিনমিন করে বললাম, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহিলার কাছে গিয়েছিলাম।

কী সম্পন্ন মহিলা ?

আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সাইকিক। ইনি যে-কোনো মানুষের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান দেখতে পারেন। সময়ের কঠিন বন্ধন থেকে উনি মুক্ত। উনার নাম তারাবিবি। ইংরেজিতে Star Lady

একটা থাপ্পড় যে তুই আমার কাছে খাবি!

থাপ্পড় দিতে চাইলে দাও। তবে তারাবিবির কাছে একবার তোমাকে নিয়ে যাব। উনি আবার গাছ-গাছড়ার ওষুধও দেন। কয়েকটা গাছের ছাল বাকল হামানদিস্তায় পিষে দেবেন। খাওয়ার পরে দেখবে ওজন কমতে শুরু করেছে। দৈনিক এক কেজি করে যদি কমে তাহলে চারমাসের পর তুমি মোটামুটি একটা শেপে চলে আসবে। রিকশায় উঠতে পারবে । চাকার পাম্প চলে যাবে না।

আমাকে নিয়ে তোর এত দুশ্চিন্তা এটা তো জানতাম না ?

আমি সোফায় বসলাম। খালার তুঙ্গস্পর্শী রাগ এখন সমতল ভূমিতে নেমেছে। তবে তিনি প্রাণপণে রাগ ধরে রাখার চেষ্টা করছেন । তেমন লাভ হচ্ছে না। তারাবিবির বিষয়ে কৌতুহলে তাঁর চোখ চকচক করছে।

মহিলার কি নাম বললি?

তারাবিবি। The great star lady তবে আশেপাশের সবাই তাকে মামা ডাকে।

মামা ডাকে মানে! একজন মহিলাকে মামা ডাকবে কেন ?

সিস্টেম এরকম দাঁড়িয়ে গেছে। উনি যে লেভেলে চলে গেছেন সেই লেভেলে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। উনার নিজের ছেলেমেয়েরাও উনাকে মামা ডাকে। তার স্বামী বেচারাও মামা ডাকে।

আবার তুই আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস ?

বিশ্বাস কর খালা, কোনো ফাজলামি না।

উনার কি সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে ?

অবশ্যই আছে। ক্ষমতা না থাকলে নিজের স্বামী তাকে কোন দুঃখে মামা ডাকবে ? জগতের কোনো স্ত্রী কি সহ্য করবে- স্বামী তাকে সিরিয়াসলি মামা বলে ডাকছে ? তুমি সহ্য করতে ? দৃশ্যটা কল্পনা কর, খালু সাহেব তোমাকে “ওগো” না বলে গম্ভীর গলায় ‘মামা’ ডাকছেন ।

‘ওগো’ সে আমাকে কখনো ডাকে না ।

কী ডাকে ?

কিছুই ডাকে না। হু-হাঁ দিয়ে সারে । এখন তো ডাকাডাকি পুরোপুরি বন্ধ। গলা দিয়ে শব্দই বের হচ্ছে না ।

গলা এখনো ঠিক হয় নি ?

না।

চিকিৎসা চলছে না ?

চলছে, তবে দেশী চিকিৎসার উপর থেকে আমার মন উঠে গেছে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? মাদ্রাজ ?

না জেনে কথা বলিস কেন তুই ? মাদ্রাজে হয় চোখের চিকিৎসা। নেত্র হসপিটাল। আমি তোর খালুকে নিয়ে যাচ্ছি বোম্বেতে।

কথা না বলা রোগের চিকিৎসা কি বম্বেতে ভালো হয় ?

তুই চুপ করে থাক। তোর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যন্ত্রণার মতো।

আমি বললাম, খালু সাহেব কথা বলতে পারছেন না- এটা তো তোমার জন্য ভালোই হলো। উনার কথা শুনলেই তো তোমার রাগ উঠে যেত। এখন নিশ্চয়ই নিমেষে নিমেষে রাগ উঠছে না ?

খালা বললেন, খামাক বকর-বকর না করে তুই চুপ করবি ?

আচ্ছা চুপ করলাম।

সকালে নাশতা খেয়েছিস ?

না।

এগারোটা বাজে, এখনো নাশতা খাস নি ? আলসার-ফালসার বাঁধিয়ে একটা কাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত ভালো লাগে না ? কী খাবি ?

গোশত পরোটা। ডাবল ডিমের ওমলেট, সবজি। সবশেষে সিজনাল ফ্রটস।

মাজেদা খালা ভয়ঙ্কর মুখ করে বললেন— তুই ভেবেছিস কী ? আমার বাড়িটা ফাইভ স্টার হোটেল ? গড়গড় করে মেনু দিয়ে দিলি- টেবিলে নাশতা চলে এলো।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে এক কাজ কর— গত রাতের ফ্রিজে রেখে দেয়া ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত দাও। বাসি তরকারির ঝোল-টোল থাকলে দাও। বাসি তরকারি মাখা কড়কড়া ভাত। খেতে খারাপ হবে না।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ করে বসে থাক। আমি নাশতা নিয়ে আসছি। একটু সময় লাগবে। খবরের কাগজ পড়। কিংবা তোর খালুর সামনে বসে থাক। সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু অন্যরা কথা বললে খুশি হয়। মাঝে মাঝে টুকটাক জবাব দেয়।

কীভাবে জবাব দেন ? ইশারায় ?

না। ঘরে একটা বোর্ড লাগিয়েছি। চক আছে। বোর্ডে চক দিয়ে লেখে।

আমার কথা শুনলে খুশি হবেন বলে তো মনে হয় না। আমার ছায়া দেখলেই উনি রেগে যান।

ভদ্রভাবে কথা বলবি। চেটাং চেটাং করবি না। তাহলে রাগবে না।

উনার কথা বলা বন্ধ হলো কীভাবে ?

নাশতার টেবিলে বসেছে। আমি একটা ডিম পোচ করে সামনে রেখেছি। ডিম পোচটার দিকে তাকিয়ে বলল- আচ্ছা ডিম...... বাকিটা বলতে পারল না। কথা গলায় আটকে গেল।

আমি খালু সাহেবকে দেখতে গেলাম।

খালু সাহেবের বয়স মনে হচ্ছে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। খাটের উপর জবুথবু বৃদ্ধ টাইপ একজন বসে আছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, উনার চেহারা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। আধাপাকা চুল। চিমশে ধরনের মুখ। কপালের চামড়ায় নতুন কোনো ভাঁজ পড়ে নি। তাহলে লোকটাকে হঠাৎ এতটা বুড়ো লাগছে কেন ? আমি হাসি হাসি মুখ করে বললাম, খালু সাহেব, ভালো আছেন ? তিনি বৃদ্ধদের শুকনা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

কিছু কিছু মানুষকে রাগিয়ে দিতে ভালো লাগে। খালু সাহেব সেই কিছু কিছুদের একজন। তাঁকে রাগিয়ে দেবার জন্যেই আমি তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে গেলাম। আমার লক্ষ্য তাঁর পাশে খাটে গিয়ে বসা। তিনি সে সুযোগ দিলেন না। মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করে আমাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। আমি যেহেতু মাছি না, সরে গেলাম না। বরং খুঁটি গেড়ে বসার মতো করে তাঁর পাশে বসলাম। তিনি ভেতরে ভেতরে কিড়ামিড় করে উঠলেন। আমি মধুর গলায় বললাম, খালু সাহেব, আমি শুনেছি আপনার সাউন্ড বক্স অফ হয়ে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। আপনি সর্বশেষ যে কথা খালার সঙ্গে বলেছিলেন সেটা নিয়ে গবেষণার মতো করছি। আপনি বলেছিলেন, আচ্ছা ডিম...। সেনটেন্স শেষ করেন নি। বাকিটা কী ?

খালু সাহেব ঘোৎ করে উঠলেন। সেই ঘোৎ ভয়াবহ। সাউন্ড বক্স অফ হয়ে গেলেও ঘোৎ-ঘাৎ শব্দ ঠিকই হচ্ছে। আমি বললাম, শেষ বাক্যটা কী- 'আচ্ছা! ডিম পোচ কেন দিলে ? অমলেট চেয়েছিলাম।' না-কি অন্য কিছু ?

খালু সাহেব এখন আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে আগুন খেলা করছে। আমি বললাম, আপনি মোটেই দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে আমার পরিচিত একজন আধ্যাত্মিক মহিলার কাছে নিয়ে যাব। তিনি সব ঠিক করে দেবেন। ইনশাল্লাহ। আপনি আবার ফুল ভলিউমে কথা বলতে পারবেন ।

তিনি আবার হাত ইশারা করে আমাকে উঠে যেতে বললেন। আমি ইশারা না বোঝার ভান করে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

মহিলার নাম তারাবিবি, তবে সবাই তাকে মামা ডাকে। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো মামা মামা বলে পায়ে পড়ে যেতে হবে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হবে না। তারপরও তারাবিবি বুঝে নেবেন। অত্যন্ত ক্ষমতাধর মহিলা।

খালু সাহেব ঘো ঘোঁ জাতীয় শব্দ করলেন। আমি এই বিকট শব্দে সামান্য বিচলিত হলাম। সাউন্ড বক্স যে এতটা খারাপ হয়েছে তা বোঝা যায় নি। আমি বললাম, একটা দিন-তারিখ ঠিক করে আমাকে জানান, আমি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব। আপনার সমস্যা কী তা আগে থেকে জানিয়ে রাখলে সময় কম লাগবে ।

খালু সাহেব তাড়াক করে খাট থেকে নেমে অতি দ্রুত জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। যেভাবে এগুলেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি জানালা দিয়ে

লাফিয়ে দোতলা থেকে নেমে পড়তে চাইছেন। বাস্তবে দেখা গেল, জানালার পাশে লেখার বোর্ড ঝুলানো। বোর্ডের উপর ডাস্টার আছে। লাল-নীল মার্কার আছে। তিনি বড় বড় করে লিখলেন-

GET OUT

আমি বললাম, খালু সাহেব। আপনি রাগ করছেন কেন ? আপনি অসুস্থ মানুষ- হঠাৎ রেগে গেলে আরো খারাপ হতে পারে।

খালু সাহেব আবার লিখলেন-

I am saying for the last time
Get Out

আমি বললাম, ঠিক আছে এখন চলে যাচ্ছি। কিন্তু যে-কোনো একদিন এসে আপনাকে তারা মামার কাছে নিয়ে যাব। উনি খুবই পাওয়ারফুল স্পিরিচুয়েল লেডি — সাউন্ড বক্স ঠিক করা উনার কাছে কোনো ব্যাপারই না।

খালু সাহেব এবার লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লিখলেন

SHUT UP

আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আর থাকা ঠিক হবে না। খালু সাহেব যে-কোনো মুহুর্তে ডাস্টার ছুড়ে মারতে পারেন। ডাস্টারটা তিনি একবার ডান হাত থেকে বাম হাতে নিচ্ছেন, আবার বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিচ্ছেন। লক্ষণ সুবিধার না।

নাশতার টেবিলে খালা নাশতা দিয়েছেন। গোশত, পরোটা, ভাজি, সিজনাল ফ্রুটস হিসেবে সাগর কলা। যা যা চেয়েছিলাম সবই আছে। বাড়তি আছে সুজির হালুয়া। খালাকে খুশি করার জন্যে আমি প্রায় হামলে পড়লাম। অনেক দিনের ক্ষুধার্ত বাঘ যে ভঙ্গিতে হরিণশিশুর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সেই ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়া।

খালা স্নেহমাখা গলায় বললেন, আস্তে আস্তে খা। এমন তাড়াহুড়া করছিস কেন ? খাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। খেতে ভালো হয়েছে?

আমি বললাম, এই পরোটাকে ভালো বললে ভালোর অপমান হয়। বাংলা ভাষায় এই পরোটার গুণ বর্ণনার মতো বিশেষণ নেই। ইংরেজি ভাষায় আছে।

ইংরেজি ভাষায় কী আছে ?

The grand.

তুই এমন পাম দেয়া কথা কীভাবে বলিস ? জানি সবই মিথ্যা, তার পরেও শুনতে ভালো লাগে।

খালা বসেছেন আমার সামনের টেবিলে। তাঁর চোখেমুখে আনন্দ ঝরে পড়ছে। কাউকে খাওয়াতে পারলে তার মতো সুখী হতে আমি কাউকে দেখি নি। ভিক্ষুক শ্রেণীর কাউকে যদি তিনি খেতে দেন তখনো সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখ দিয়ে স্নেহ গলে গলে পড়ে।

খালা, তুমি খালু সাহেবের চিকিৎসার কী করেছ ?

এখনো কিছু করা হয় নি। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের এক ডাক্তারের সঙ্গে তোর খালু ই-মেইলে যোগাযোগ করেছেন। সামনের মাসে যাব। মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের ঢাকা অফিস আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

সিঙ্গাপুরে যেতে চাও যাও। তার আগে মামাকে দিয়ে একটা চিকিৎসা করালে হয়

না ?

কোন মামা ?

তারা-মামা। আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। খরচ নামমাত্র। এক ছটাক গাজা লাগবে। এক নম্বরি গাঁজার পুরিয়া। দুই নম্বরি হলে চলবে না। তিনি লাথি দিয়ে ফেলে দেবেন, তখন হিতে বিপরীত হবে। এখন তো কথা বলতে পারছেন না, তখন দেখা যাবে কানেও শুনছেন না ।

ঐ মহিলা গাঁজা খায়?

আমি কখনো খেতে দেখি নি। তবে গাঁজা ছাড়া তিনি চিকিৎসা করেন না। গাঁজার পুরিয়া পায়ের কাছে রেখে তারপর কদমবুসি করতে হয়। গাঁজা ছাড়া কদমবুসি করতে গেলে গোদা পায়ের লাথি খেতে হবে।

কদমবুসি করতে হবে ?

অবশ্যই।

তোর খালু কোনোদিনও ঐ মহিলার কাছে যাবে না।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজি করতে পার কিনা দেখ। এক লাখ ডলার খরচ করে বিদেশে যাবার দরকার কী ? যেখানে এক ছটাক গাজায় কাজ হচ্ছে।

অসম্ভব! ওই প্রসঙ্গ বাদ দে।

আচ্ছা যাও বাদ দিলাম। তোমাদের ডলার আছে। ডলার খরচ করে চিকিৎসা করে আস।

তুই আসমার সঙ্গে কবে দেখা করবি ?

যখন বলবে তখন। ঠিকানা দাও, নাশতা খেয়ে চলে যাই।

মাজেদা খালা অবাক হবার ভঙ্গি করে বললেন- তুই আসমাকে কী ভেবেছিস ? সে চুনাপুটি না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সে দেখা করবে না।

বলো কী!

সোনারগাও হোটেলে উঠেছে। টেলিফোন নাম্বার নিয়ে যা- অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর যাবি। এক কাজ করি— আমি টেলিফোনে ধরে দেই,- তুই কথা বল।

বাংলায় কথা বলা যাবে ? আমার তো আবার ইংরেজি আসে না।

রসিকতা করিস না হিমু। সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না।

খালা টেলিফোন করতে গেলেন। এই ফাঁকে খালু সাহেব একবার খাবার ঘরে উকি দিলেন। আমার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (বর্শা যেভাবে নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ) আবার নিজের ঘরে ঢুকে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মিসেস আসমা হক পিএইচডি'কে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, হিমু সাহেব বলছেন ?

আমি অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ইয়েস ম্যাডাম।

আপনি আজ বিকেল পাঁচটায় হোটেলে আসুন।

ইয়েস ম্যাডাম।

ঠিক পাঁচটায় আসবেন, তার আগেও না, পরেও না ।

ইয়েস ম্যাডাম।

আপনার খালার কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে যে-সব তথ্য পেয়েছি তারপর আর আপনার উপর ভরসা করা যায় না। তারপরও আসুন।

ইয়েস ম্যাডাম।

কখন আসবেন বলুন তো ?

বিকেলে।

বিকাল সময়টা দীর্ঘ। তিনটা থেকে বিকাল শুরু হয়, সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত থাকে। আপনাকে আসতে হবে। পাঁচটায়।

ইয়েস ম্যাডাম।

ইমরুল ছেলেটার বিষয়ে আমরা ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি। ওকে আমরা নেব না। কাজেই আপনাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। আমি এখন টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। দীর্ঘ সময় ধরে টেলিফোনে বকবক করতে আমাৰ ভালো লাগে না।

ম্যাডাম, একটা ছোট্ট কথা ছিল।

আবার কী কথা ?

আপনার কুশল জিজ্ঞেস করা হয় নি। শরীরটা কেমন আছে ?

তার মানে ?

অনেক দিন পরে যারা দেশে ফিরে তারা খুব বেকায়দা অবস্থায় থাকে। দেশের নোংরা আবহাওয়া, জীবাণুমাখা খাবার খেয়ে অসুখে পড়ে। আপনাদের সে-রকম কিছু হলো কি-না।

আপনি খুবই আপত্তিকর কথা বলছেন তা কি জানেন ?

জি-না। জানি না।

আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে এই কাজটা করবেন না। মনে থাকবে ?

ভদ্রমহিলা খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন। আমাকে শেষবারের মতো 'ইয়েস ম্যাডাম' বলার সুযোগ দিলেন না।

ইমরুলের সাজসজা আজ চমৎকার।

টকটকে লাল শার্ট। শার্টের চারটা বোতামের মধ্যে একটা বোতাম শুধু আছে। বাকি তিনটা 'মিসিং'। মা হাসপাতালে, শার্টের বোতাম লাগানোর কেউ নেই। বোতাম আছে এমন শার্ট তার আছে কিন্তু ইমরুল এই শার্ট ছাড়া অন্য কোনো শার্ট পরবে না। এমনিতে সে জেদি ছেলে না। সবার কথা শোনে। কিন্তু এই শার্টটির জন্যে তার দুর্বলতা আছে। ঘরে কোনো সেফটিপিন পাওয়া গোল না। বোতামহীন ফুটোগুলি আটকানো গেল না।

শার্টের চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হলো তার একটা পায়ে শুধু জুতা। বাম পায়ে। ডান পায়ের জুতা নাকি একটা কুকুর কামড় দিয়ে নিয়ে গেছে। এক পায়ে জুতা পরেই সে বের হবে। খালি পায়ে যাবে না।

উদ্ভট পোশাকের ইমরুলকে নিয়ে আমি যথাসময়ে সোনারগাও হোটেলে উপস্থিত হলাম। মিসেস আসমা হকের ঘরে। আদবের সঙ্গে কলিংবেল টিপলাম। আদবের সঙ্গে কলিংবেল টেপা হলো ফুস করে একটা টিপ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। মিসেস আসমা হক দরজা খুললেন। চোখ সরু করে কিছুক্ষণ ইমরুলকে দেখলেন। রোবটদের মতো গলায় বললেন- Please Come in.

আমি বললাম, কেমন আছেন আপা ?

উনি জবাব দিলেন না। ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমার মুখে আপা ডাকটা মনে হলো তার পছন্দ হলো না। তিনি এখন তাকিয়ে আছেন ইমরুলের দিকে। ইমরুলকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি। সে গটগট করে হেঁটে বিছানার কাছে রাখা চেয়ারে উঠে বসল। হাতলে দু'হাত রেখে গভীর ভঙ্গিতে পা দোলাতে শুরু করল। সোনারগাও হোটেলের সুইটে ঢুকলে যে-কোনো সাধারণ মানুষের আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায়। শিশুরা সাধারণ মানুষ না। অসাধারণ মানুষ। সহজে তাদের আক্কেলগুড়ুম হয় না।

মিসেস আসমা হক বললেন, আমি কি জানতে পারি এই ছেলে কে ?

আমি বললাম, এর নাম ইমরুল ।

আমি এরকমই ভেবেছিলাম। ওকে নিয়ে এসেছেন কেন ? আমি বলেছিলাম না। এই ছেলের ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড না! ওকে কেন দেখাতে এসেছেন ?

ওকে দেখাতে আনি নি। আমার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে। তারপর আপা বলুন, এতদিন পর দেশে এসে আপনার কেমন লাগছে ?

আমাকে আপা ডাকবেন না ।

জি আচ্ছা ।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। দাঁড়িয়ে থাকব না-কি ইমরুলের মতো কোনো একটা চেয়ারে বসে পড়ব ? ঘরে দ্বিতীয় যে চেয়ারটা আছে সেখানে মিসেস আসমা হক বসেছেন। বসতে হলে আমাকে বসতে হবে বিছানায়। সেটা মিসেস আসমা হক পছন্দ করবেন না ।

ছেলেটার নাম যেন কী ?

ইমরুল ।

ও হ্যাঁ ইমরুল। আমার সমস্যা হচ্ছে মানুষের নাম মনে থাকে না।

ভিমরুলের কথা মনে রাখবেন । হুল ফোটায় যে ভিমরুল সেই ভিমরুল। ভিমরুল মনে থাকলে ইমরুল মনে পড়বে। এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ডস।

এর পায়ে একটা জুতা কেন ?

ডান পায়ের জুতাটা কুকুর নিয়ে গেছে। মানুষের ব্যবহারী জিনিসের মধ্যে জুতা নিয়ে যায় কুকুর এবং সাবান নিয়ে যায় কাক ।

আসমা হক বিরক্ত গলায় বললেন, ছেলেটাকে একটা জুতা পরে বের না করে দোকান থেকে এক জোড়া জুতা কিনে দিতেন।

আমার টাকা-পয়সার কিছু সমস্যা আছে ম্যাডাম ।

মিসেস আসমা হক আরো ভুরু কুঁচকে ফেললেন। এই মহিলা মনে হয় ভুরু কুঁচকে তাকাতে পছন্দ করেন। তাঁর কপালে ভুরু কুঁচকানোর স্থায়ী দাগ পড়ে গেছে ।

এর শার্টেরও দেখি বোতাম নেই। বোতাম আছে এমন শার্ট ছিল না ? নাকি বাকি

শার্টগুলিও কুকুর নিয়ে গেছে ?

এইটি ইমরুলের প্রিয় শার্ট। এই শার্ট ছাড়া সে বাইরে বের হয় না।

আমার ধারণা— আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অদ্ভুত একটা পোশাক পরিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছেন। এক ধরনের শো-ডাউন । শো-ডাউন আমার পছন্দ না।

আমি বিনীত গলায় বললাম, ম্যাডাম, আমার সমস্যা হচ্ছে আমি যখন সত্যি কথা বলি তখন সবাই ভাবে মিথ্যা কথা বলছি। আবার যখন মিথ্যা বলি তখন সবাই ভাবে সত্যি বলছি । ইমরুলের পোশাকের ব্যাপারে আমি একশ' ভাগ সত্যি কথা বলছি। আমার কথা বিশ্বাস করলে সুখী হব ম্যাডাম ।

আমাকে ম্যাডাম ডাকবেন না ।

তাহলে ডাকব কী ?

নাম ধরে ডাকবেন । আমার নাম আসমা । আসমা ডাকবেন ।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন ?

একজন পিএইচডি'কে নাম ধরে ডাকব ?

পিএইচডিওয়ালাদের কি নাম থাকে না ?

কাউকে নাম ধরে ডাকলে তুমি করে বলতে হয়। আপনার সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে আমাকে বলতে হবে— আসমা তুমি কেমন আছ ? সেটা কি ঠিক হবে ?

আপনি দেখি অকারণে খুবই বকবক করতে পারেন। বকবকানি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ইমরুল ছেলেটা তো খুব চুপচাপ। আপনার বকবকানি স্বভাব পায় নি ।

ইমরুল খোঁচার অপেক্ষা করছে। খোঁচা খেলেই বিড়বিড় করে কথা শুরু করবে, তখন আপনার মাথা ধরে যাবে।

খোঁচার অপেক্ষা করছে মানে কী ? কী খোঁচা ?

কথার খোঁচা ।

কিছুই বুঝতে পারছি না।— প্লিজ আপনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলুন। কথার খোঁচাটা কী ?

আমি কোনো জবাব দেবার আগেই ইমরুল খিলখিল করে হেসে উঠল। আসমা বিস্মিত হয়ে বলল, এই ছেলেটা হাসছে কেন ?

আমি বললাম, আপনি ইমরুলকেই জিজ্ঞেস করুন কেন হাসছে। সে কেন হাসছে এটা তো তারই জানার কথা ।

আসমা ইমরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলে, তুমি হঠাৎ হেসে উঠলে কেন ?

ইমরুল স্পষ্ট করে বলল, তুমি শুধু হাসির কথা বলো এই জন্যে আমি হাসি।

আসমাকে দেখে মনে হলো সে খুবই অবাক হয়েছে। এত সুন্দর করে গুছিয়ে বাচ্চা একটা ছেলে কথা বলবে এটা হয়তো আসমা ভাবে নি ।

আমি হাসির কথা বলি ?

হু।

আমার কোন কথাটা হাসির ?

সব কথা ।

আমার সব কথা হাসির! এই বিচ্ছু বলে কী ? আমি হাসির কথা বলি— আজি

পর্যন্ত কেউ আমাকে এ ধরনের কথা বলে নি । বরং বলেছে আমি না-কি সিরিয়াস টাইপ। আমার মধ্যে কোনো ফানি বোন নেই। আমার সেন্স অব হিউমার নেই।

আমি কিছু বললাম না। লক্ষ করলাম মহিলার ভুরু সরল হয়ে এসেছে। তিনি হঠাৎ আনন্দ পেতে শুরু করেছেন। প্রাণী হিসেবে মানুষ অতি বিচিত্র। সে যখন আনন্দ পেতে শুরু করে তখন সব কিছুতেই আনন্দ পায়। তার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলেও আনন্দ পায় ।

হিমু সাহেব।

জি।

বোতাম নিয়ে আসুন তো!

কী নিয়ে আসব ?

বোতাম। আমি এই ছেলের শার্টে বোতাম লাগিয়ে দেব। হোটেলে সুই সুতা থাকে। শুধু বোতাম আনলেই হবে। পারবেন না ?

পারব ।

আর ভিমরুলের জুতাটা খুলে নিয়ে যান। এই মাপে তার জন্যে এক জোড়া জুতা নিয়ে আসবেন। আমি টাকা দিয়ে দেব। পারবেন না ?

পারব ।

ভিমরুল কি এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে পারবে একা একা ?

বলেই ভদ্রমহিলা ইমরুলের দিকে তাকাল ।

ইমরুল গম্ভীর গলায় বলল, আমার নাম ভিমরুল না। আমার নাম ইমরুল। তুমি আমাকে ভিমরুল ডাকবে না।

সরি সরি! আর ভুল হবে না। ইমরুল তুমি কি একা একা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে পারবে ?

হু।

তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে ? কিছু খাবে ?

হু।

দাঁড়াও, তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। আমারও ক্ষিধে পেয়েছে।

আসমা জুতা কেনার টাকা দেবার সময় গলা নামিয়ে বললেন, এই ছেলেকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আমি একেই নেব ।

আমি হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়ে গেছে মানে ?

আপনি ইমরুলকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, এই জন্যে আমি আবার অন্য পার্টির সঙ্গে কথা ফাইনাল করেছি। উট পার্টি।

উট পার্টি মানে ?

উটের জকি হিসেবে যারা বাচ্চা নিয়ে যায়। পার্টি হিসেবে এরা ভালো । গুড পেমেন্ট । পেমেন্টে কোনো গণ্ডগোল করে না ।

আপনাকে পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেয়া যায়, এটা জানেন ? আপনি বিরাট ক্রিমিন্যাল ।

তা ঠিক।

আমার কাছে ক্ষমতা থাকলে প্রকাশ্য রাজপথে আপনাকে গুলি করে মারতাম।

হাসছেন কেন ? আমি হাসির কোনো কথা বলছি না। আই মিন ইট। যান, জুতা নিয়ে আসুন।

জুতা দেবেন কিনা ভেবে দেখুন। ইমরুলকে তো আর আপনারা রাখতে পারছেন না। খামাখা কিছু টাকা খরচ করবেন। দেখা যাবে আপনার দেয়া জুতা পরে সে উটের পিঠে বসল।

জুতা আনতে বলছি আনুন। বোতাম আনতে আবার যেন ভুলে যাবেন না।

নতুন এক জোড়া জুতা (রঙ টকটকে লাল), শার্টের বোতাম (রঙ লাল), দুটা বিশাল বেলুন (রঙ লাল) কিনে হোটেলে ফিরে দেখি বাথটাব ভর্তি পানিতে ইমরুল ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ইমরুলের পাশে রাগত মুখে (কপট রাগ) কোমরে হাত দিয়ে আসমা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একাই কথা বলে যাচ্ছেন-

ইমরুল, দুষ্ট ছেলে, এইসব কী করছ ? বাথটাবের পানি খাচ্ছ। ইমরুল, তুমি খুবই দুষ্ট ছেলে। দুষ্ট ছেলে আমি পছন্দ করি না। এরকম করলে আর কিন্তু তোমাকে বাথটাবে নামাব না। আমি খুবই রাগ করছি। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলে লাভ হবে না। আমি হাসিতে ভোলার মানুষ না ।

আমার আসল রাগ তো তুমি দেখ নি। আমাদের স্কুলের অঙ্ক টিচার মিস রিনা দাসকে পর্যন্ত একদিন ধমক দিয়েছিলাম। এমন সমস্যা হয়েছিল স্কুল থেকে আমাকে প্রায় টিসি দিয়ে দেয়। টিসি দেয়া কী জানো ? টিসি দেয়া মানে বের করে দেয়া। বাথটাব থেকে তোমাকে নামিয়ে দেয়ার মতো। বুঝেছ ? যেভাবে মাথা নাড়ছ তাতে মনে হচ্ছে সবই বুঝে ফেলছ।

এত জোরে মাথা নাড়বে না। শেষে মাথা ঘাড় থেকে খুলে পড়ে যাবে। তুমি হয়ে যাবে কন্ধকাটা ভূত। তুমি যে এত ভূতের ছবি আঁক কন্ধকাটা ভূতের ছবি এঁকেছ কখনো ? বাথটাব থেকে বের হয়ে আমাকে একটা কন্ধকাটা ভূতের ছবি এঁকে দেখাবে।

শোন ইমরুল, শুধু ভূত প্রেতের ছবি আঁকলে হবে না। এখন থেকে ল্যান্ডস্কেপ আঁকবে। ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে নদী, গাছপালা, সূর্যস্ত- এইসব। বুঝতে পেরেছ ? বুঝতে পেরেছ বললেই এইভাবে মাথা নাড় কেন ? বললাম না এইভাবে মাথা নাড়লে ঘাড় থেকে মাথা খুলে পড়ে যাবে। পিপি পেয়েছে নাকি ? খবরদার বাথটাবে পিপি করবে না। দাঁড়াও কমোডে বসাচ্ছি।

এক সময় গোসলপর্ব সমাধা হলো । ম্যাডাম কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে রাগারগি করলেন কারণ আমি দামি জুতা কিনি নি। আমার উচিত ছিল এডিডাস বা নাইকির জুতা কেনা। ম্যাডাম তারপর শার্টে বোতাম লাগালেন। এই ফাঁকে হোটেলের প্যাডে ইমরুল দুটা কন্ধকাটা ভূত এঁকে ফেলল। একটা ছেলে কন্ধকাটা, একটা মেয়ে কন্ধকাটা ।

ইমরুলকে নতুন জুতা পরিয়ে নিয়ে আসব তখন একটা ছোট্ট সমস্যা হলো। ইমরুল মুখ শক্ত করে বলল, আমি যাব না।

আমি রাগী গলায় বললাম, যাবে না। মানে কী ?

ইমরুল বলল, আমি আসমা'র সঙ্গে থাকব।

আমি ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললাম, ফাজিল ছেলের কাণ্ড দেখেছেন! চড় দিয়ে দু'তিনটা দাঁত তো এক্ষুণি ফেলে দেয়া দরকার। আপনাকে নাম ধরে ডাকছে। কষে একটা চড় দিন তো । দাঁত নরম আছে। কষে চড় দিলে দাঁত পড়ে যাবার কথা।

ম্যাডাম বললেন, চড় দেবার মতো সে কিছু করে নি। শুধু শুধু চড় দেব কেন ? আপনাকে আমি নাম ধরে ডাকতে বলেছিলাম। সেখান থেকে শিখেছে। ছেলেটার পিক-আপ করার ক্ষমতা অসাধারণ । আমি ইমরুলকে বললাম, দুষ্টছেলে, আবার যদি উনাকে আসমা ডেকেছ তাহলে তোমার খবর আছে। এখন থেকে উনাকে ডাকবে ন-মা ।

আসমা বললেন, ন-মাটা কী ?

ন-মা হলো নকল মা । বাইরের যারা শুনবে তাদের কাছে মনে হবে ন-মা হলো নতুন মা ।

আপনার কথাবার্তা খুবই কনফিউজিং। আমি নকল মা কেন হব ? আমি এই ছেলেকে নিয়ে যাব। আমি হব তার আসল মা। আমি সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব পেটে সন্তান না নিয়েও আসল মা হওয়া যায় ।

কথা বলতে বলতে আসমার গলা ভারী হয়ে গেল। তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন এমন অবস্থা। পরিস্থিতি আরো মলিন করে তুলল ইমরুল, সে খাটের পায়া ধরে ঝুলে পড়ল। সে কিছুতেই যাবে না। এখানেই থাকবে।

মিসেস আসমা হকের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। তার মতো মানুষ বাইরের একজন মানুষের সামনে এভাবে কাঁদবে এটা ভাবাই যায় না। এই যে তিনি চোখের পানি ফেলছেন তার জন্যে তিনি লজ্জাও পাচ্ছেন না। আমার ধারণা তিনি বুঝতেও পারছেন না যে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

আমি বললাম, ম্যাডাম, আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।

তিনি ধরা গলায় বললেন, কী সুসংবাদ ?

ইমরুলকে আপনার অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যেতে হবে না। আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাবেন তাকে ছাড়া ।

এটা সুসংবাদ হলো ?

হ্যাঁ, সুসংবাদ কারণ আপনাকে ন'মা হতে হবে না। আপনি হবেন- আমা। অর্থাৎ আসল মা । বাইরের একটা শিশুর প্রতি আপনি যে মমতা দেখিয়েছেন তার পুরস্কার হিসেবে আপনার কোলে আসবে আপনার নিজের শিশু। আপনি আমার দিকে এভাবে তাকাবেন না। আমি অনেক কিছু আগে ভাগে বুঝতে পারি।

ইমরুল হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসছি। আসমা ঠিক আগের জায়গায় বসে আছেন। তার চোখে এখন কোনো পানি নেই। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তার চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্যা বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু অশ্রু আছে চোখে দেখা যায় না।

হিমু সাহেব!

জি।

আপনি কি ইমরুলকে নিয়ে যাচ্ছেন ?

নিয়ে যাওয়াটাই কি ভালো না ? ইমরুলের প্রতি মমতা দেখানোর আপনার আর কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের জিনিস আসছে।

দয়া করে আপনি আমাকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখাবেন না। কোনটা হবার কোনটা হবার না তা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ইমরুলকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন নিয়ে যান- একটা ছোট্ট কাজ কি করতে পারবেন । রাত দশটার দিয়ে টেলিফোন করতে পারবেন ?

অবশ্যই পারব। কেন বলুন তো ?

ইমরুল কান্না থামিয়ে শান্ত হয়েছে কি হয় নি এটা জানার জন্যে।

আমি টেলিফোন করে আপনাকে জানাব।

ভুলে যাবেন না। কিন্তু।

আমি ভুলে যাব না।

রাত দশটার দিকে টেলিফোন করার কথা, আমি কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় টেলিফোন করলাম। একজন পুরুষমানুষ টেলিফোন ধরলেন এবং গঞ্জীর গম্ভীর বললেন- আপনি কি হিমু ?

আমি বললাম, জি ।

আমার নাম ফজলুল আলম। আমি....

পরিচয় দিতে হবে না। আপনি কে বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক কাঁটা কাঁটা গলায় বললেন, আমি বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আর কখনোই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না। তাঁকে বিরক্ত করবেন না। আপনি মানসিকভাবে তাঁকে পঙ্গু করে ফেলেছেন। ভদ্রলোক খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

হাবিবুর রহমান সাহেবের ব্রেইন যে একেবারেই কাজ করছে না তা তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি এলোমেলো। তিনি স্থির হয়ে তাকাতে পারছেন না । মানুষের মন যেমন ছটফট করে, চোখও করে। মনের ছটফটানি ধরার কোনো উপায় নেই । চোখেরটা ধরা যায় ।

আমি বললাম, কেমন আছেন ?

হাবিবুর রহমান চমকে উঠলেন। তার ভাব দেখে মনে হবে আশেপাশে কোথাও ককটেল ফুটেছে। তিনি বললেন, কিছু বলেছেন ?

আমি বললাম, চমকে উঠার মতো কিছু বলি নি। জানতে চাচ্ছিলাম কেমন আছেন?

ভালো।

আপনার কি শরীর খারাপ না-কি ?

জানি না ।

কোনো কারণে কি মন অশান্ত ?

জি-না, আমি ভালো আছি।

বলেই তিনি পুরোপুরি ঝিম মেরে গেলেন। এতক্ষণ তিনি চোখের দৃষ্টি স্থির করতে পারছিলেন না। এখন তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। তাঁকে এখন দেখাচ্ছে ধ্যানমগ্ন মানুষের মতো। আমি বললাম, রাশিদুল করিম নামের হারামজাদাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

হাবিবুর রহমান হতভম্ব গলায় বললেন, কীভাবে বুঝলেন ?

আপনি থ মেরে গেছেন। সেখান থেকে অনুমান করছি। দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাচ্ছি।

হাবিবুর রহমান বললেন, কুত্তাটার সাহস দেখে অবাক হয়েছি। বাসায় চলে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। স্যুট টাই মচমচা জুতা। সেন্ট মেখেছে। গা দিয়ে ভুরিভুর করে গন্ধ বের হচ্ছিল। পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে চেয়েছিলাম ।

দিলেন না কেন ?

এখন তাই চিন্তা করছি। কেন দিলাম না! মানুষ কুকুরের গায়ে গরম মাড় ঢেলে দেয়। আমার উচিত ছিল কুকুরটার গায়ে গরম মাড় ঢেলে দেয়া। আফসোস হচ্ছে কেন মাড় ঢেলে দিলাম না!

ঘরে বোধহয় মাড় ছিল না।

হাবিবুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, ঠাট্টা করছেন? আমার এই অবস্থায় আপনি ঠাট্টা করতে পারছেন। আপনি এতটা হার্টলেস ?

আমি বললাম, আপনার কাছে এসেছিল কী জন্যে ? সে কী চায় ?

হাবিবুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, মহৎ সাজতে চায়। ফরিদার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ দিতে চায়। শুয়োরটার সাহস কতা! বলে কী প্রয়োজনে সিঙ্গাপুর-

ব্যাংকক নিয়ে যাব। আরে কুত্তা, তোর সিঙ্গাপুর-ব্যাংকককে আমি পেসাব করে দেই।

বলেছেন এই কথা ?

না। বলা উচিত ছিল। যা যা করা উচিত ছিল তার কিছুই আমি করি নি। এখন রাগে আমার ইচ্ছা করছে নিজের হাত নিজে কামড়াই। গতকাল রাতে আমি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারি নাই। দুটা ফ্রিজিয়াম খেয়েছি, তারপরেও ঘুম আসে না। হিমু ভাই, আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না আমি উল্টা ঐ কুত্তাটার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলেছি।

চা বানিয়েও তো খাইয়েছেন।

আপনাকে কে বলল ?

আমি অনুমান করছি।

হ্যাঁ, কুত্তাটাকে চা বানিয়ে খাইয়েছি। কুত্তাটা আমার সামনে বসে চুকচুক করে চা খেয়েছে।

শুধু চা ? নাকি চানাচুর-টানাচুর কিছু ছিল ?

শুধু চা ।

চিকিৎসার ব্যাপারে কী বলেছেন ?

বলেছি আমি আমার যা সাধ্য করব । কারোর কোনো দান নেব না।

এইটুকুই বলেছেন ? আর কিছু বলেন নি ?

না, এইটুকুই বলেছি। তবে শক্তভাবে বলেছি। আমার বলার মধ্যে কোনো ধানাই-পানাই ছিল না। ভালো বলছি না?

অবশ্যই ভালো বলেছেন। তবে এই সঙ্গে আরো দু'একটা কথা যুক্ত করে দিলে আরো বালো হতো।

কী কথা ?

আপনার বলা উচিত ছিল- এই কুত্তা, তুই খবরদার আমার স্ত্রীকে দেখতে যাবি না। আমার স্ত্রী তোর লাইলী না। আর তুইও মজনু না। তোকে যদি হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখি তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব। টান দিয়ে তোর বাঁকা ল্যাজ সোজা করে দেব। বাকি জীবন সোজা লেজ নিয়ে হাঁটবি। কুকুর সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবি না।

হাবিবুর রহমান আহত গলায় বললেন, হিমু ভাই, আপনি তো হৃদয়হীন একজন মানুষ। আমার এমন অবস্থায় আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন ?

ঠাট্টা করছি কেন বলছেন ?

অবশ্যই ঠাট্টা করছেন। আপনি বলছেন টেনে লেজ সোজা করে দেবেন। সোজা লেজ নিয়ে সে কুকুর সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। এগুলো ঠাট্টার কথা না ? আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলে রসিকতা করতেন না ।

মনের অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

আমি চার পাতা ফ্রিজিয়াম কিনেছি। এক এক পাতায় আটটা করে মোট বত্রিশটা ফ্রিজিয়াম । কাল রাতে ভেবেছিলাম। সবগুলো খাব ।

খেলেন না কেন ?

ইমরুল আমার সঙ্গে থাকে। সে ভোরবেলা জেগে উঠে দেখবে একটা মারা

মানুষকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। প্রচণ্ড ভয় পাবে এই জন্যে খাই নি।

আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম, আজ রাতে যদি এ ধরনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে আমি বরং ইমরুলকে নিয়ে যাই ।

হাবিবুর রহমান জবাব দিলেন না। মানসিক রোগীদের মতো অস্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, ইমরুলকে নিয়ে যাব কি-না বলুন। বত্রিশটা ট্যাবলেটের ভেতরে দু'টা মাত্র খেয়েছেন। আরো ত্রিশটা আছে। এই ত্রিশটায় কাজ হয়ে যাবার কথা ।

আপনি আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলছেন ?

হু।

কেন বলছেন ? যাতে আমার মৃত্যুর পর ঐ কুত্তাটা ফরিদাকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করতে পারে।

সেই সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা-না। আপনার তো আপনার স্ত্রীর জন্যে কোনো প্রেম নেই। ঐ ভদ্রলোকের আছে। সবাই চায় প্রেমের জয় হোক ।

আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো প্রেম নেই ?

না।

কী করে বুঝলেন ? আমার কপালে লেখা আছে ?

কপালে লেখা থাকে না । প্রেম আছে কি নেই তা লেখা থাকে চোখে । আপনার দু'টা চোখেই লেখা- 'প্রেম নেই।'

আপনি কি চোখের ডাক্তার ?

চোখের ডাক্তার চোখের লেখা পড়তে পারে না।

হাবিবুর রহমান ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, আপনি মহা তালেবর। আপনি চোখের লেখা পড়তে শিখে গেছেন ?

তা শিখেছি। অবশ্যি চোখের লেখা যে পড়তে পারে না তার পক্ষেও বলা সম্ভব যে আপনার মধ্যে আপনার স্ত্রীর প্রতি কোনো প্রেম নেই।

তাই ?

জি। প্রেম থাকলে আপনার একমাত্র চিন্তা থাকত আপনার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করা। তার চিকিৎসার টাকা কে দিল সেটা হতো তুচ্ছ ব্যাপার। রশীদ সাহেবের টাকা নিতে আপনার অহঙ্কারে বাঁধছে। প্রেমিকের কোনো অহঙ্কার থাকে না ।

যথেষ্ট বকবক করেছেন। দয়া করে মুখ বন্ধ করুন।

জি আচ্ছা। মুখ বন্ধ করলাম।

আমার সামনে বসে থাকবেন না। এই মুহূর্তে বের হয়ে যান।

যাচ্ছি।

Go to hell.

মৃত্যুর পর চেষ্টা করে দেখব- Hell এ যেতে পারি কি-না। আপাতত গুলিস্তানের দিকে যাই । ভালো কথা ইমরুলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই । আজ রাতে যদি ঘুমের ওষুধ ইস্তেমাল করতে চান তাহলে আপনার সুবিধা হবে। পথ খোলা থাকিল ।

আর কোনো কথা না । অনেক কথা বলে ফেলেছেন ।

আমি বললাম, শেষ কথা বলে যাই, উত্তেজিত অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাবেন না। বমি হয়ে যাবে। খালি পেটেও খাবেন না। খালি পেটে ঘুমের ওষুধ খেলেও বমি হয়। হালকা স্ন্যাকস জাতীয় কিছু খেয়ে নেবেন। সব ট্যাবলেট খাওয়ার পর গরম

কফি খেতে পারেন। এতে Action ভালো হয় ।

Get Out

আমি ইমরুলকে নিয়ে ‘গেট আউট হয়ে গেলাম। হাবিবুর রহমান সাহেব ঘুমের ওষুধ খাবেন কি-না বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা না। ফিফটি ফিফটি চান্স। মজার ব্যাপার হলো মানব জীবনের সব সম্ভাবনাই ফিফটি ফিফটি । বিয়ে করে সুখী হবার সম্ভাবনা কতটুকু ?

ফিফটি ফিফটি চান্স ।

বড় ছেলেটি মানুষ হবে সেই সম্ভাবনা কত পারসেন্ট ?

ফিফটি পারসেন্ট ।

ইমরুলকে নিয়ে রিকশায় চড়েছি। সে খুবই আনন্দিত। আমি বললাম, কেমন আছিসরে ব্যাটা ?

ভালো ।

কতটুকু ভালো আছিস হাত মেলে দেখা ।

সে হাত মেলছে । মেলেই যাচ্ছে.......

বুঝতে পেরেছি। খুব ভালো আছিস । দেখি এখন একটা গান শোনা ভালোবাসার গান। ভালোবাসার গান জানিস ?

জানি ।

ইমরুল তৎক্ষণাৎ গান ধরল-

তুমি ভালোবাস কিনা
আমি তা জানি না....

ভালোবাসার গান ইমরুল এই দুই লাইনই জানে। শিশুদের নিজস্ব বিচিত্র সুরে সে এই গান করছে। রিকশাওয়ালা গান শুনে খুব খুশি । সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে বলল — মাশাল্লাহ, এই বিচ্ছু দেহি বিরাট গাতক ।

আমি বললাম, এই বিচ্ছু, বল দেখি আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

ইমরুল বলল, জানি না।

বিশেষ কোথাও যেতে ইচ্ছা করে ?

ইমরুল বলল, না।

মাকে দেখতে যাবি ?

না।

আসমা হক নামের একজন মহিলা ছিলেন যিনি তোকে নতুন জুতা কিনে দিয়েছেন, তার কাছে যাবি ?

না।

রিকশায় চড়তে আমার সব সময়ই ভালো লাগে । আজ যেন একটু বেশি ভালো লাগছে। শুনছি ঢাকা শহর রিকশামুক্ত হবে। আমরা পুরোপুরি মেট্রোপলিটন সিটির যুগে প্রবেশ করব। শনশন করে গাড়ি চলবে। আধুনিক গতির যুগ। শনশন ঝনঝন ।

উল্টোটা হলে কেমন হতো। কেউ যদি এমন ব্যবস্থা করতেন যেন এ শহরে কোনো গাড়ি না চলে। শুধু রিকশা এবং সাইকেল চলবে। কোনো গাড়ি থাকবে না। পৃথিবীর একমাত্র নগরী যেখানে কোনো গাড়ি নেই। রাস্তায় কুৎসিত হর্ন বাজবে না। জলতরঙ্গের মতো টুনটুন করে রিকশার ঘন্টি বাজবে । নগরীতে কোনো কালো

ধোয়া থাকবে না। পর্যটনের বিজ্ঞাপনে লেখা হবে-

DHAKA
CITY OF RICKSHAW

প্রতিটি রিকশার পেছনে বাধ্যতামূলকভাবে চিত্রকর্ম থাকতে হবে। ভ্রাম্যমাণ চিত্রশালা। আমরা পেইনটিং দেখতে দেখতে রিকশায় চড়ে ঘুরব। মন্ত্রীদের জন্যে থাকবে ফ্ল্যাগ বসানো রিকশা । প্রধানমন্ত্রীও রিকশায় করেই যাবেন । তার আগে পেছনে থাকবে সাইকেল আরোহী নিরাপত্তা-কমীরা । রিকশার কারণে গতির দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাব। সবদিক দিয়েই তো পিছিয়ে পড়ছি। গতির দিকে পিছিয়ে পড়লে ক্ষতি কী ?

ইমরুল বলল, পিপি করব।

আমাদের রিকশা রাস্তার মাঝামাঝিতে। জামে জট খেয়ে গেছে। জটি খুলবে এমন সম্ভাবনা নেই। বাধ্য হয়েই ইমরুলকে রিকশার পাটাতনে দাঁড় করিয়ে প্যান্টের জিপার খুলে দিলাম। সে মহানন্দে তার কর্ম করছে। আশপাশের সবাই মজা পাচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে দেখছে। একজন আবার গাড়ির কাচ নামিয়ে ফট করে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলল। ছবিটা ভালো হবার কথা। সুন্দর কম্পোজিশন।

ইমরুল বলল, আমি ছান্তা খাব।

ছান্তা হলো ফান্টা। সে বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে বলতে পারে, তারপরও কিছু কিছু অদ্ভুত শব্দ সে তার ঝুলিতে রেখে দিয়েছে। ফান্টাকে বলবে ছান্তা । গাড়িকে বলবে রিরি। শিশুদের মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে। প্রথম শৈশবের কিছু শব্দ সে অনেকদিন ধরে রাখে। একদিন হঠাৎ সে এই শব্দগুলি ছেড়ে দেয়। আর কোনোদিন ভুলেও উচ্চারণ করে না। যে বিশেষ দিনে এই ঘটনাটি ঘটে। সেই বিশেষ দিনেই তার শৈশবের সমাপ্তি ।

ইমরুলকে ছান্তা খাইয়ে আমি মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। তিনি টেলিফোনে আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন- তুই কোথায় ?

আমি চমকে উঠে বললাম, আবার কী হয়েছে ?

তুই ডুব মেরে কোথায় ছিলি ? আমি কম করে হলেও দশ হাজারবার তোর খোঁজে লোক পাঠিয়েছি।

গুরুতর কিছু কি ঘটেছে খালা ? খালু সাহেবের জবান খুলেছে ? উনি কথা বলা শুরু করেছেন ?

ও যেমন ছিল তেমন আছে। তোকে খুঁজছি অন্য কারণে। আসমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে।

কেন ?

তুই একবার ইমরুলকে দেখিয়ে এনেছিস, তারপর আর তোর কোন খোঁজ নেই। বেচারি ছেলেটার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।

টাকা-পয়সা ক্লিয়ার করে মাল ডেলিভারি নিয়ে যাক। মাল আমার সঙ্গেই আছে ।

হিমু শোন, এ ধরনের ফাজলামি কথা তুই আর কোনদিন বলবি না। কোনোদিন না ।

আচ্ছা, বলব না।

ছেলেটাকে তুই এক্ষুণি ওদের কাছে দিয়ে আয়। এই মুহূর্তে।

এই মুহূর্তে ডেলিভারি দিতে পারব না।

কেন ? শেষ সময়ে বাবা-মা ঝামেলা করছে? জানি এরকম কিছু হবে। শেষ মুহূর্তে দরদ উথলে উঠবে।

এই মুহূর্তে ডেলিভারি দিতে পারছি না, কারণ মিসেস আসমা হকের স্বামী আমাকে বলেছেন, তাঁর স্ত্রীর ত্রিসীমানায় যেন আমি না থাকি। তাঁর সঙ্গে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত মাল ডেলিভারি হবে না।

বলিস কী! আসিমার স্বামী বিগড়ে গেল কেন ? আসমা তো আমাকে কিছু বলে নি ।

এখন আমি কী করব বলো ।

আসমা ইমরুলকে দেখতে চাচ্ছে। তুই আসমার কাছে ওকে দিয়ে কেটে পড়।

ঠিক আছে তাই করছি। তুমি খালু সাহেবের ব্যাপারে কী করলে ?

ভিসা নিয়ে কী যেন ঝামেলা হচ্ছে। ভিসা পেলেই চলে যাবে।

জবান এখনো বন্ধ ?

হ্যাঁ।

মহিলা পীরের চিকিৎসাটা করাবে না ?

মহিলা পীরের কোন চিকিৎসা ?

বলেছিলাম না তোমাকে- প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সঞ্চয় করা পীরনি। সবাই যাকে মামা ডাকে। উনার পায়ে পড়লেই.... ।

ভুলে যা। তোর খালু যাবে মামা ডাকতে!

খালু সাহেবের তো জবানই বন্ধ। আমি উনার হয়ে মামা ডাকব। উনার হাসবেন্ডকে ডাকব মামি ।

তার হাসবেন্ডকে মামি ডাকতে হয় ?

মহিলাকে যখন মামা ডাকতে হয়। পুরুষকে মামি ডাকতে হবে সেটাই তো স্বাভাবিক ।

খামাকা বকবক করবি না। সকালবেলা বকবকানি শুনতে ভালো লাগে না।

টেলিফোন রেখে দেব ?

না, রেখে দিবি না। কানে ঝুলিয়ে বসে থাক। গাধা কোথাকার। টেলিফোন রেখে এক্ষুণি ঐ ছেলেকে আসমার কাছে পৌছে দিয়ে আমার এইখানে আয় ।

আচ্ছা, আসব।

আমার বাড়িতে এখন নতুন নিয়ম— বাসায় ঢুকে কোনো কথা বলতে পারবি না। ফিসফিস করেও না ।

কেন ?

তোর খালু কথা বলতে পারে না তো, এই জন্যে কাউকে কথা বলতে শুনলে রেগে যায়। ভয়ঙ্কর রাগে। এই জন্যেই বাড়িতে কথা বলা বন্ধ।

ভালো যন্ত্রণা তো!

মহা যন্ত্রণা। এই যে তোর সঙ্গে কথা বলছি, কর্ডলেস নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছি। কথাও বলছি ফিসফিস করে। বুঝলি হিমু— মাসখানিক এই অবস্থা চললে দেখবি আমিও কথা বলা ভুলে গেছি। ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ করছি। খুবই খারাপ অবস্থায় আছি রে হিমু!

এই বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না। আমি ভুজুং ভাজুং দিয়ে খালু সাহেবকে চিকিৎসা করিয়ে আনব । মামা-চিকিৎসা ।

তুই কখন আসবি ?

দু'একদিনের মধ্যে চলে আসব।

দু'একদিন না, এক্ষুণি আয়।

দেখি ।

কোনো দেখাদেখি না। লাফ দিয়ে কোনো বেবিটেক্সিতে উঠে পড়।

আমি খালার কথামতোই কাজ করলাম। ইমরুলকে মিসেস আসমা হকের দরবারে পৌঁছে দিয়ে লাফ দিয়ে একটা বেবিটেক্সিতে উঠে পড়লাম। তবে আমার গন্তব্য খালু সাহেবের বাড়ি না— হাসপাতাল। ফরিদা কী করছে না করছে এই খোঁজ নেয়া। হাসপাতালে কী ড্রামা হচ্ছে কে জানে! থানা এবং হাসপাতালে মানব জীবনের সবচে' বড় ড্রামাগুলি হয়। দর্শক হিসেবে অসাধারণ নাটক দেখতে হলে এই দু'জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হতে হয়। চমৎকার কিছু দৃশ্য হলো, মনে মনে হাততালি দিয়ে ফিরে চলে আসা। আবার নাটক দেখতে ইচ্ছা হলে আবার চলে যাওয়া। আমার (মহান!) বাবা তাঁর 'মহাপুরুষ বানানোর শিক্ষা প্রণালি'তে পরিষ্কার করে লিখেছেন-

> মৃত্যুপোঠযাত্রী কখনো দেখিয়াছ? কখনো কি তাহার শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাপন করিয়াছ? কখনো কি দেখিয়াছ কী রূপে ছটফট করিতে করিতে জীবনের ইতি হয় । জীবনের প্রতি মানুষের কী বিপুল তৃষ্ণা। আর কিছুই চাই না— শুধু বঁচিবার জন্যেই বাঁচিতে চাই।
>
> বাবা হিমালয়, তুমি অবশ্যই তোমার জীবনের কিছু সময় মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্যে আলাদা করিয়া রাখিবে। তাহাদের শয্যাপার্শ্বে রাত্রি যাপন করিবে । যে হাহাকার নিয়া তাহারা যাত্রা করিতেছে সেই হাহাকার অনুভব করার চেষ্টা করিবে ।

বাবা সামান্য ভুল করেছেন। তিনি ভুলে গেছেন সব মানুষই মৃত্যুপথযাত্রী। যে শিশুটি হেসে খেলে ছুটে বেড়াচ্ছে সেও মৃত্যুপথযাত্রী। তার চোখের দিকে তাকালেও জীবনের প্রতি মানুষের বিপুল তৃষ্ণার খবর পাওয়া যায়। এই খবর জানার জন্যে হাসপাতালে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।

ফরিদার বিছানার পাশে সোনালি চশমা পরা যে যুবকটি বসে আছে তার নামই বোধহয় রাশেদুল করিম। সাদা ফুলপ্যান্টের সঙ্গে আকাশি নীল রঙের হাওয়াই শার্ট পরেছে বলেই পোশাকটা ইউনিফর্মের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। শুধু চেহারা দেখে প্রেমে পড়ার বিধান থাকলে সব মেয়েই এই ছেলের প্রেমে পড়ত। তারা দু'জন মনে হয় মজার কোনো কথা বলছিল। দু'জনের মুখই হাসি হাসি। আমাকে দেখে রাশেদুল করিমের মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ফরিদা কিন্তু হাসতেই থাকল। মেয়েদের এই ব্যাপারটা আছে। কোনো রসিকতা তাদের মনে ধরে গেলে তারা অনেকক্ষণ ধরে হাসে ।

রাশেদুল করিম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষের মতো বললেন, হিমুভাই, কেমন আছেন? বলেই হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালেন ।

আমি এখন মজার একটা খেলা খেলতে পারি। রাশেদুল করিমের হাত অগ্রাহ্য করে তাকে খুবই বিব্রত অবস্থায় ফেলতে পারি। বিব্রত অবস্থায় সে কী করে এটাই তার আসল চরিত্র ।

আমি রাশেদুল করিমের দিকে তাকালাম। তাঁর বাড়িয়ে দেয়া হাতের দিকে

তাকালাম। নিজে হাত বাড়ালাম না। ভদ্রলোক হাত নামিয়ে নিলেন এবং হেসে ফেললেন। আবারো বললেন, হিমুভাই, কেমন আছেন ?

ভালো ।

আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে না দেখে যদি আপনার ছায়া দেখতাম তাহলেও বলে ফেলতে পারতাম— এই ছায়া হিমু সাহেবের।

ছায়া দেখে চিনতে পারতেন না। সব মানুষ আলাদা কিন্তু তাদের ছায়া একরকম ।

এটা কি কোনো ফিলসফির কথা ?

অতি জটিল ফিলসফির কথা । অবসর সময়ে এই ফিলসফি নিয়ে চিন্তা করবেন। কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন।

ফরিদার মাথায় এখনো বোধহয় রসিকতাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে হেসেই যাচ্ছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হাসি সামলাবার চেষ্টা করল। রোগ যন্ত্রণায় কাতর রোগীর আনন্দময় হাসির চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। আমি মুগ্ধ হয়ে হাসি দেখছি। রাশেদুল করিম বললেন, হিমুভাই, আপনি কি দয়া করে ফরিদাকে একটু বুঝবেন ? আমি নিশ্চিত সে আপনার কথা শুনবে ।

কোন বিষয়ে বুঝাতে হবে ?

চিকিৎসার জন্যে আমি তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে চাই। সে যাবে না। হিমুভাই প্লিজ, আপনি তাকে রাজি করিয়ে দিন। যদি আপনি এটা করে দিতে পারেন তাহলে বাকি জীবন আমি আপনার মতো হলুদ পাঞ্জাবি পরে কাটাব। পায়ে জুতা-স্যান্ডেল কিছুই থাকবে না। প্লিজ প্লিজ।

ফরিদা আমাদের কথা শুনছে। কিন্তু তার মুখের হাসি যাচ্ছে না। আমি তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ফরিদা বলল, হিমুভাই, গত রাতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। মানুষ কখনো হাসির কোনো ঘটনা স্বপ্নে দেখে না। আমি এমন একটা হাসির স্বপ্ন দেখেছি যে হাসতে হাসতে আমার ঘুম ভেঙেছে। যতবারই আমার স্বপ্নের কথাটা মনে হচ্ছে ততবারই আমি হাসছি।

স্বপ্নটা কী ?

স্বপ্নটা কী আমি বলব। তার আগে চেয়ারটায় আপনি বসুন। আসল কথাটা মন দিয়ে শুনুন ।

আসল কথাটা কী ?

ফরিদা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আমি অন্যের টাকায় চিকিৎসা করাব না। ইমরুলের বাবা মনে কষ্ট পাবে। এই কষ্ট আমি তাকে দেব না।

তুমি মরে গেলে ইমরুলের বাবা কষ্ট পাবে না ?

পাবে। দুটা কষ্ট দু'রকম।

রাশেদুল করিম সাহেবের টাকায় তুমি চিকিৎসা করাবে না ?

না।

তোমার মৃত্যুর মাস ছয়েকের মধ্যে ইমরুলের বাবা আরেকটা বিয়ে করবে, তারপরেও না ?

না।

সৎমা ইমরুলকে নানানভাবে কষ্ট দেবে, তারপরেও না ?

না।

তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছ— স্বামীর প্রতি তোমার গভীর প্রেম ?

আমি কোনো কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। আমি ইমরুলের বাবার মনে কষ্ট দিতে চাচ্ছি না ।

ঠিক আছে, মামলা ডিসমিস।

আমি রাশেদুল করিমের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ শুকনা হয়ে গেছে। সে তাকিয়ে আছে হতাশ চোখে । সে কী করবে বুঝতে পারছে না। হাসপাতালের কেবিন ঘরে একটাই চেয়ার। সেই চেয়ার আমি দখল করে আছি। তাকে বসতে হলে ফরিদার পাশে খাটে বসতে হয় । এই কাজটা সে করতে পারছে না। আবার সে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না । সে ফরিদার দিকে তাকিয়ে বলল, ফরিদা আমি চলে যাই। ফরিদা বলল, আচ্ছা। তারপরেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত আশা করল ফরিদা তাকে আরো কিছু বলবে। ফরিদা কিছুই বলল না। কঠিন চোখে কেবিন ঘরের ধবধবে সাদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল ।

ঘরে আমি এবং ফরিদা। রাশেদুল করিম চলে গিয়েছে। ফরিদার মুখে আগের কাঠিন্য নেই। কিছুক্ষণ আগে নার্স এসে একগাদা ওষুধ খাইয়ে গেছে। নার্সের সঙ্গে সে হেসে হেসে কথা বলেছে। সেই হাসির রেশ এখনো ঠোঁটের কোনায় ধরা আছে।

হিমুভাই ।

বলো ।

আপনি একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে চাই বলেই কি বিদেশে যেতে চাচ্ছি না ? আমি এখন প্রশ্নটার জবাব দেব। জবাব শুনে আপনি চমকে যাবেন।

জবাবটা কী ?

ফরিদা বলল, ওর প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। কখনো ছিল না।... আপনি আমার কথা শুনে খুবই চমকে গেছেন। তাই না হিমুভাই ?

আমি সহজে চমকাই না।

তারপরেও আপনি চমকে গেছেন। আমি আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। হিমুভাই শুনুন, যাকে একটু আগে আপনি দেখেছেন, কিশোরী বয়সে তার প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েরা যে কত আবেগ নিয়ে ভালোবাসতে পারে তা আপনারা পুরুষরা কখনো বুঝতে পারবেন না।

পুরুষরা ভালোবাসতে পারে না ?

না। আর পারলেও তার মাত্রা অনেক নিচে । পুরুষের হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা। মেয়েদের ব্যাপার অন্যরকম, তাদের কাছে ভালোবাসার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক নেই। একটা মেয়ে যখন ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার সঙ্গে অনেক স্বপ্ন যুক্ত হয়ে যায়। সংসারের স্বপ্ন। সংসারের সঙ্গে শিশুর স্বপ্ন। একটা পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন সে শুধু তার প্রেমিকাকেই দেখে। প্রেমিকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি শিশুর স্বপ্ন দেখে না।

তুমি নিজে এইসব ভেবে ভেবে বের করেছ ?

জি, আমার তো শুধু শুয়ে থাকা। হাসপাতালের বিছানায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুয়ে শুয়ে আমি শুধু ভাবি। ভেবে ভেবে অনেক কিছু বের করে ফেলেছি।

ভালো তো । অনেক জ্ঞান পেয়ে গেলে ।

জ্ঞান পেয়ে হবে কী ? আমি তো মরেই যাচ্ছি।

আইনস্টাইনও অনেক জ্ঞান পেয়েছিলেন। তিনিও কিন্তু তার জ্ঞান নিয়ে মরে

গেছেন।

হিমুভাই প্লিজ, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না। এক সময় আমি তর্ক করতে খুব ভালোবাসতাম। এখন তর্ক করতে ভালো লাগে না। কেউ তর্ক করতে এলে আগেভাগে হার মেনে নেই। শুরুতেই বলে দেই- তাল গাছ আমার না। তাল গাছ তোমার। এখন তর্ক বন্ধ কর।

তোমার সঙ্গে হাসপাতালে নিশ্চয়ই কেউ তর্ক করতে আসে না ।

আসবে না কেন ? আসে। আপনিও তো কিছুক্ষণ তর্ক করেছেন। করেন নি?

আমার বেলায় তুমি কিন্তু বলো নি যে তালগাছ আপনার ।

প্লিজ হিমুভাই, চুপ করুন তো ।

চুপ করলাম। আমি কি চলে যাব ?

না, আপনি চলে যাবেন না। আমার ব্যাপারটা আমি আপনাকে বলব। আমি তো মরেই যাচ্ছি। মরার আগে গোপন কথাটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা! করছে ।

লাভ কী ?

জানি না লাভ কী, আমার বলতে ইচ্ছা করছে আমি বলব।

বেশ বলো ।

ফরিদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার দম ফুরিয়ে গেছে। আমি একটু দম নিয়ে নেই। আমি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। আপনি কিন্তু চলে যাবেন না।

আমি চলে গেলাম না।

ফরিদা চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বসে আছি তার পাশে। তাকিয়ে আছি একটি ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে । দেখেই মনে হচ্ছে ফরিদা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের লাশকাটা ঘরের ঘুম—

> এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
> রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
> আঁধার যুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
> কোনোদিন জাগিবে না আর ।

ফরিদা টানা দুঘণ্টা ঘুমুল । সময়টা আন্দাজ করে বলছি। আমার হাতে ঘড়ি নেই। হাসপাতালের এই কেবিনেও ঘড়ি নেই। দুঘণ্টা আমি চুপচাপ বসে রইলাম। ঘুমের মধ্যে মানুষ নড়াচড়া করে। এপাশ ওপাশ করে। চোখের পাতা কখনো দ্রুত কাঁপে কখনো অল্প কাঁপে। ফরিদার বেলায় সে-রকম কিছুই হলো না। তার নিঃশ্বাসের শব্দ হলো না । চোখের পাতাও কাঁপল না । এক সময় জেগে উঠে বিড়বিড় করে বলল, পানি খাব।

আমি পানি খাওয়ালাম। তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, ঘুম ভালো হয়েছে ?

ফরিদা বলল, হ্যাঁ।

ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখেছ ?

না। আমি কতক্ষণ। ঘুমিয়েছি ?

দুঘণ্টার মতো।

ছিঃ ছিঃ— আপনি দু'ঘণ্টা বসেছিলেন!! আমার খুবই লজ্জা লাগছে। চলে গেলেন না কেন?

তুমি বসে থাকতে বলেছ।

থ্যাংক য়্যু । আমি যে এতক্ষণ ঘুমিয়েছি নিজেই বুঝতে পারি নি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল- চোখ বন্ধ করেই জেগে উঠেছি। মৃত্যু কাছাকাছি চলে এলে সময়ের হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যায় । আমার বোধহয়....

ফরিদা কথা শেষ না করে হাসল। আমি বললাম, তুমি আমাকে কিছু গোপন কথা বলার জন্যে বসিয়ে রেখেছিলো। আমার ধারণা কথাগুলি তুমি এখন বলতে চাও না।

আপনার ধারণা ঠিকই আছে।

আমি কি এখন চলে যাব ?

হ্যাঁ, চলে যান।

অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে ছিলাম, তুমি কিন্তু একবারও জানতে চাও নি ইমরুল কেমন আছে।

ফরিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ইমরুল কেমন আছে ?

আমি বললাম, ভালো ।

ফরিদা বলল, আপনার সঙ্গে আমার আর মনে হয় দেখা হবে না।

আমি বললাম, আমারও মনে হয় দেখা হবে না।

ফরিদা বলল, আপনাকে নিয়ে আমি খুবই হাসির একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নের কথা এখন আর আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে না। তবে আমি একটা কাজ করব।— লিখে ফেলব। তারপর লেখাটা আপনাকে পাঠাব। হিমুভাই, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে। আমি চেষ্টা করলে গল্প-উপন্যাস লিখতে পারব। বিছানায় শুয়ে মজার মজার সব গল্প আমার মাথায় আসে।

লিখে ফেললেই পার।

লজ্জা লাগে বলে লিখতে পারি না।

লজ্জা লাগে কেন?

বুঝতে পারছি না কেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লজ্জা লাগুক বা না লাগুক আমি একটা গল্প লিখে ফেলব।

@@

বিস্ময়কর ঘটনা শেষপর্যন্ত ঘটেছে। খালু সাহেবকে নিয়ে আমি মহিলা পীরের উদ্দেশে রওনা হয়েছি। মাজেদা খালা সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। খালু সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন। ধমক দিলেন বাক্যটা ঠিক হলো না। তিনি ধমক দেয়ার মতো মুখে বিকট ভঙ্গি করলেন, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না। এতেই মাজেদা খালা ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, ঝামেলা তুই নিয়ে যা।

যাত্রাপথ দীর্ঘ। প্রথমে আমরা খালু সাহেবের গাড়িতে করে বাদামতলী ঘাট পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে বুড়িগঙ্গা পার হবার জন্যে নৌকা নিলাম। নৌকায় উঠে তিনি আমার দিকে সুচ-চোখে তাকিয়ে রইলেন। যে চোখের সৃষ্টি সুচের মতো বিঁধে সেটাই সুচ-চোখ। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে আমার শরীরের নানান জায়গায় ফুটা করতে

লাগলেন। এক পর্যায়ে পকেট থেকে ডায়েরি বের করে লিখলেন—আর কত দূর? আমি কিছু বললাম না; মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। মধুর ভঙ্গির হাসি সব সময় সুখকর নয়। খালু সাহেবকে দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। যতবারই হাসছি ততবারই উনি চিড়বিড়িয়ে উঠছেন। নৌকায় আছেন বলে উল্টে দিকে হাঁটা দিতে পারছেন না । তার মনের যে অবস্থা এতে তিনি যে আমাকে ফেলে হাঁটা দিতেন এটা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার মাঝামাঝি এসে তিনি ডায়েরি বের করে লিখলেন—'আমি কোথাও যাব না। নৌকা ঘুরাতে বলো।' আমি আবারো আগের মতো হাসলাম। তবে এই হাসির প্যাটার্ন একটু অন্যরকম। দুষ্ট শিশুর অন্যায় আবদার শুনে মুরুব্বিরা যে হাসি হাসেন আমি হাসলাম সেই হাসি। খালু সাহেব চিড়বিড়িয়ে উঠলেন।

নৌকা থেকে নেমে আমরা একটা টেম্পো নিলাম। টেম্পো থেকে নেমে গরুর গাড়ি। দিনের আলো তখনো আছে। তবে দ্রুত কমে আসছে। খালু সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি এরকম যে যে-কোনো মুহূর্তে তিনি গরুর গাড়ি থেকে নেমে পড়বেন। তিনি আবারো পকেট থেকে ডায়েরি করে লিখলেন- 'আর কতদূর ?' আমি আগের চেয়েও মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। মধুরতম হাসি খালু সাহেবের গায়ে মনে হলো পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে ধরিয়ে দিল।

আমি বললাম, খালু সাহেব এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? দৃশ্য দেখুন। কী সুন্দর দৃশ্য! বাংলার গ্রাম। পল্লীবধু কলসি কাখে নদীতে পানি আনতে যাচ্ছে। গরু অলস ভঙ্গিতে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে । আকাশে দিনের শেষের কন্যা সুন্দর আলো ঝলমল করছে। ঐ কবিতাটা কি আপনার মনে আছে খালু সাহেব ? 'তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায় ?'

খালু সাহেব ঘোৎ করে এমন এক শব্দ করলেন যে গরুর গাড়ির গারোয়ান চমকে উঠে বলল, উনার ঘটনা কী ?

ঘটনা ব্যাখ্যা করলাম না, তবে আমি চুপ করে গেলাম। খালু সাহেবকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

আমরা গরুর গাড়ি থেকে নামলাম সন্ধ্যা মিলাবার পর। এখন হাঁটাপথ । ক্ষেতের আল বেয়ে হাঁটা। খালু সাহেবের ইটালিয়ান জুতা কান্দাপানিতে মাখামাখি হয়ে গেল। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল বিল পার হওয়ার সময়। খালু সাহেবের বা পা হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডেবে গেল। পা সহজেই টেনে তোলা গেল। কিন্তু সেই পায়ের জুতা কাদার ভেতর থেকে গেল। আমি শান্ত গলায় খালু সাহেবকে বললাম, এক পায়ের জুতা কি থাকবে ? না-কি এটা ফেলে আমার মতো খালি পায়ে যাবেন ? খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে কিছু নিশ্চয়ই বললেন। ভাগ্যিস তার জবান বন্ধ— কী বললেন শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলে অবশ্যই ভালো লাগত না ।

পীর মামার বাড়িতে আমরা পৌঁছলাম রাত আটটার দিকে। পীর মামা তখন মাত্র এশার নামাজ আদায় করে হুজরাখানায় বসেছেন। নানান বয়সের নারীপুরুষ তাকে ঘিরে বসে আছে। মামা কল্কেতে টান দিচ্ছেন। এই দৃশ্য ভক্তরা অতি ভক্তির সঙ্গে দেখছে। পীর-ফকিররা গাঁজা খেলে দোষ হয় না। সাধারণ মানুষরা খেলে দোষ হয়।

পীর মামা আমাকে দেখে কল্কে নামালেন। টকটকে লাল চোখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে অতি মিষ্ট গলায় বললেন, কেমন আছিস রে হিমু ?

মামার শরীর মাঝারি সাইজের হাতির মতো কিন্তু গলার স্বর অতি মধুর। আমি বিনীত গলায় বললাম, ভালো আছি।

রোগী নিয়ে এসেছিস?

জি।

তোর জানি কী হয় ?

খালু হয় । এর দেখি আদব লেহাজ কিছুই নাই। আমারে সেলামালকি দিল না। কদমবুসিও করল না।

মামা মাফ করে দেন। রোগীমানুষ।

জবান বন্ধ ?

জি।

মামা আবারো কল্কে হাতে নিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে দার্শনিকের মতো গলায় বললেন, জবান বন্ধ থাকাই ভালো । জগতের বেশিরভাগ পাপ কাজ জবানের কারণে হয় ।

আমি বললাম, মামা, আশা নিয়ে শহর থেকে এসেছি, জবান ঠিক করে দেন।

মামা বললেন, আমি জবান ঠিক করার মালিক না। জবান ঠিক করার মালিক আল্লাহপাক। যাই হোক, এসেছিস যখন চেষ্টা করে দেখি। ওরে তোরা রোগীরে শক্ত করে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেল। হাত-পা যেন নাড়াইতে না পারে।

উনার কথা শেষ হবার আগেই মামার লোকজন অতিদ্রুত খালু সাহেবের হাত-পা বেঁধে খুঁটির সঙ্গে লটকে দিল। উনি ভয়ে চুপসে গেলেন। তেমন কোনো বাঁধা দিলেন না। এ ধরনের কোনো ঘটনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। খালু সাহেব এতই ঘাবড়ে গেছেন যে আমার দিকেও তাকাচ্ছেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে পীর মামার দিকে তাকিয়ে আছেন।

পীর মামা বললেন, এখন এক কাজ করা- পাটকাঠির মাথায় কাচা গু মাখিয়ে আন । এনে এই জবান বন্ধ লোকের মুখে ঢুকিয়ে দে। ইনশাল্লাহ জবান ফুটবে।

এক লোক দৌড়ে গেল পাটকাঠিতে গু মাখিয়ে আনতে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে আনন্দের নাড়াচাড়া দেখা গেল। খালু সাহেবের চোখ দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে অক্ষিকোটির থেকে চোখ বের হয়ে আসবে। চারদিকে চরম উত্তেজনা ।

পীর মামা হাত উচু করে উত্তেজনা কিছুটা কমালেন। মিষ্টি গলায় বললেন, গু খাওয়ানোর আগে এর মাথাটা কামায়ে দে । মাথা কামানো কোনো চিকিৎসা না। আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে বলে শাস্তি । আমারে সেলামালকি দেয় নাই ।

মামার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো । ওয়ান টাইম রেজারে মাথা মুণ্ডিত হলো। খালু সাহেবকে এখন দেখাচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো। চেহারার মধ্যে কেমন যেন মায়া মায়া ভাব চলে এসেছে ।

পীর মামা খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে অতি মধুর গলায় বললেন- বাবা গো, এখন একটু গু খাও। বেশি খাইতে হবে না। পাটকাঠির মধ্যে যতটুকু আনছে ততটুকু খাইলেই কাজ হবে। মুখ বন্ধ কইরা রাখবা না। কেমন ? মামার কথা শোন।

গু-মাখানো পাটকাঠি এসেছে। মামার মতোই অত্যন্ত বলশালী এক লোক সেই পাটকাঠি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সেই কাঠি মুখের ভেতর ঢুকাতে হলো না। তার আগেই খালু সাহেব স্পষ্ট গলায় বললেন, খাব না, আমি গু খাব না।

চারদিকে আনন্দের হুল্লোড় উঠল। ফুটেছে, জবান ফুটেছে। আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর।

আমি খালু সাহেবকে নিয়ে ফিরছি। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় উঠা পর্যন্ত তিনি কোনো কথা বললেন না। আমার ধারণা হলো আবারো বোধহয় জবান বন্ধ হয়ে গেছে। নৌকায় উঠার পর তিনি কথা বললেন। শান্ত গলায় বললেন, হিমু, তুমি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে ?

আমি বললাম, জি খালু সাহেব বলব।

খালু সাহেব বললেন, আমার ধারণা— যে চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে পীর মামা আমাকে আরোগ্য করলেন, সেই চিকিৎসাপদ্ধতি উনার মাথায় আসে নি। তুমি তাকে শিখিয়ে দিয়েছ। আমি ঠিক ধরেছি না ?

জি, ঠিক ধরেছেন।

হিমু শোন, আমার বাড়িতে একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। তোমাকে আর যদি কোনোদিন আমার বাড়িতে দেখি পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলব। আমার ফাঁসি হোক যাবজীবন হোক কিছু যায় আসে না। মনে থাকবে হিমু ?

জি, মনে থাকব।

আমি কথা বলতে পারছি – I am happy about that. Thank you. কিন্তু আমার বাড়িতে তোমাকে দেখলে অবশ্যই আমি তোমাকে গুলি করব। বুড়িগঙ্গার উপরে তোমার সঙ্গে দেখাই যেন আমাদের শেষ দেখা হয়।

জি, আচ্ছা।

খালু সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাতের বুড়িগঙ্গার শোভা দেখতে লাগলেন। রাতের বুড়িগঙ্গা সত্যিই অপূর্ব।

হিমু।

জি ।

ধর। আমি যদি কথা না বলতাম তাহলে ঐ বদ মেয়ে কি আমার মুখে গুয়ের কাঠিটা দিয়ে দিত?

মনে হয় দিত।

শেষ মুহূর্তে তুমি আটকাতে না ?

ইচ্ছা থাকলেও আটকানো যেত না । মব সাইকলজি কাজ করছিল। যেখানে মব সাইকোলজি কাজ করে সেখানে চুপ করে থাকতে হয়।

হিমু!

জি।

যে চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে আমি আরোগ্য লাভ করেছি। আশা করি এই চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে তুমি কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

আমি বলব না।

হিমু।

জি।

তোমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না।

খালু সাহেব, আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে না। ক্ষমা করলেই আমি লাই পেয়ে যাব। আরো বড় কোনো অপরাধ করে ফেলব।

কথা ভুল বলো নি। আচ্ছা হিমু শোন— আমার গলার স্বর কি আগের মতোই আছে ?

সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। আপনার গলার স্বর আগের চেয়ে মধুর হয়েছে।

খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, আমার নিজেরও তাই ধারণা।

তিনি নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। নদীর ঘোলা পানির দিকে তাকিয়ে হয়তো পানিতে নিজের ছায়া দেখছেন। মানুষ চলমান জলে নিজের ছবি দেখতে খুব পছন্দ করে।

@@

ফরিদার চিঠি পেয়েছি। মেয়েদের অনেক গুণের মধ্যে বড় গুণ হলো এরা খুব সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে। কথাবার্তায় নিতান্ত এলোমেলো মেয়েও চিঠি লেখায় গোছানো। মেয়েদের চিঠিতে আরেকটি ব্যাপার থাকে- বিষাদময়তা। নিতান্ত আনন্দসংবাদ দিয়ে লেখা চিঠির মধ্যেও তারা কী করে জানি সামান্য হলেও দুঃখ মিশিয়ে দেয়। কাজটা তারা যে ইচ্ছা করে করে তা-না। প্রকৃতিতাদের চরিত্রে যে বিষাদময়তা দিয়ে রেখেছে তাই হয়তো চিঠিতে উঠে আসে।

ফরিদা লিখেছে—

হিমুভাই,

আজ একটু আগে আপনি হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন। দীর্ঘসময় আপনি আমার বিছানার পাশে চুপচাপ বসে ছিলেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। জেগে উঠে সে জন্যেই খুব লজ্জা পেয়েছি। আপনি আমার কাছের কেউ নন। খুব কাছের কেউ আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এটা ভাবতেই আমার অস্বস্তি লাগে। আপনি তাকিয়ে ছিলেন ভেবে সে কারণেই খুব সঙ্কুচিত বোধ করছি। হিমুভাই, আপনি রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি আমার পাশেই বসে ছিলেন তারপরও আমার দিকে একবারও তাকান নি। আপনি সবসময়ই পর্দার আড়ালের একজন। আমি আপনাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। বুঝতে পারি নি। জটিল মানুষ খুব সহজেই বোঝা যায়। আপনি জটিল না, আবার আপনি খুবই সরল সাদাসিধা মানুষ তাই বা বলি কী করে ?

আপনার কথা থাক ।নিজের কথা বলি। এই কথাটা না বললেও কিছু যেত আসত না। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হচ্ছে পৃথিবীর একটি মানুষও কি আমার ভেতরের সত্যটা জানবে না! সেই সত্য যত নির্মমই হোক তারপরও তো সত্য ।অন্তত একজন মানুষ আমার সত্যি পরিচয় জানুক ।সেই একজন আপনি হওয়াই সবচে’ নিরাপদ।

হিমুভাই, আমি আমার মোটামুটি দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ইমরুলের বাবাকে ভালোবাসতে পারি নি। পাশাপাশি (এক বিছানায়) বাস করলে যে মমতা তৈরি হয় তা হয়েছে। সেই মমতাও খুব বেশি কিন্তু না।

না, আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নি। সবার কাছে আমাদের পরিচয় আদর্শ দম্পতি ।আপনার বন্ধু ধরেই নিয়েছিল- তার প্রতি ভালোবাসায় আমার হৃদয় টলমল করছে। সে হয়তো ভেবেছে, যে বন্ধু তার

স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ দশ বছরে একটি বারও উচু গলায় কথা বলে নি, কঠিন করে তাকায় নি। সেই তরুণী বধুর হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ। বোকা মানুষটা বুঝতেও পারে নি ব্যাপারটা কী। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে- জীবন তো চলেই যাচ্ছে । কোথাও থমকে যাচ্ছে না। যখন অসুখটা হলো- আমি বুঝে গেলাম সময় চলে এসেছে, তখন হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হলো । মনে হলো— কিছু না পেয়েই চলে যাচ্ছি ?

তারপর একটা ঘটনা ঘটল । বিশেষ ঘটনা । কিশোরী বয়সে যে মানুষটাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছিলাম সে হঠাৎ উদয় হলো তখন । তাকে দেখে কী যে ভালো লাগল। ইচ্ছা করল চিৎকার করে আনন্দে কেঁদে উঠি । হিমুভাই, আপনি শুনলে খুবই অবাক হবেন, হয়তো বা খানিকটা কষ্টও পাবেন, মানুষটাকে দেখে আমার মনে হলো- ইস, সে যদি আমাকে নিয়ে অনেক দূরের কোনো দেশে চলে যেত! যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। যে দেশে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। (এমনকি ইমরুলও নেই।)

আপনার কাছে অকপটে সত্যি কথা বললাম । এখন নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। রাশেদুল করিম নামের মানুষটা মহা ব্যস্ত হয়ে গেছে আমাকে বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে। খুব লোভ হচ্ছে। চিকিৎসা হোক বা না হোক তার সঙ্গে কিছু দিন তো থাকতে পারব ! রোজ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলতে পারব। (আমি খুব খারাপ, তাই না হিমুভাই) আমার ভেতর যত লোভই থাকুক এই কাজ আমি করব না। ভালো না বেসে একধরনের অপমান আমি ইমরুলের বাবাকে করেছি। বেচারা সেটা বুঝতে পারে নি বলে কষ্ট পায় নি। এখন যদি আমি রাশেদের টাকায় চিকিৎসা করি ইমরুলের বাবা কষ্ট পাবে। এই কষ্ট আমি কখনো, কোনোদিনও দিব না। এই সম্মানটুকু আমি তাকে করব।

শুনতে পেয়েছি ইমরুলকে আপনি আসমা হক নামের এক মহিলার কাছে রেখে এসেছেন। এই মহিলা তাকে পালক পুত্র হিসেবে বড় করবে। এইসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ আমি নিশ্চিত জানি- ইমরুলের জন্যে যা ভালো আপনি তাই করবেন। মানুষ আপনাকে নিয়ে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে কিন্তু আমি জানি মানুষের জন্যে যা শুভ যা কল্যাণকর আপনি সারাজীবন তাই করে এসেছেন ।

আমি মাঝে মাঝে এই ভেবে অবাক হই যে পৃথিবীতে আপনার মতো ভালো মানুষ যেমন আসে, আমার মতো খারাপ মানুষও আসে। এইভাবেই পৃথিবীতে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে ।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
ফরিদা

ফরিদার চিঠি ভালোমতো বোঝার জন্যে দ্বিতীয়বার পড়া উচিত। পড়া গেল না, কারণ আমার (মহান!!)। শিক্ষক বাবা এই বিষয়ে কঠিন নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

বাবা হিমালয়, পৃথিবীর যে-কোনো দৃশ্য প্রথমবার দেখিবে। একবার দৃষ্টি ফিরাইবার পর দ্বিতীয়বার তাকাইবে না। তাহাতে মায়া তৈরি হইবে ।

মায়া তৈরি হওয়ার অর্থই বিভ্রম ও ভ্রান্তি তৈরি হওয়া। ভ্রান্তি উদয় হওয়ার অর্থই হইল ভ্রান্তি বিলাস তৈরি হওয়া । বিলাসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা।

একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেই। মনে কর তুমি একজন প্রবাসী। তোমার অতি নিকট একজন তোমাকে একটি পত্র দিয়াছেন। পত্রটি দীর্ঘ, কিন্তু কিছুটা জটিল। পাঠোদ্ধারের জন্য তোমাকে পত্রটি দ্বিতীয়বার পড়িতে হইবে। ভুলেও এই কাজ করিবে না। লাভের মধ্যে লাভ হইবে তুমি মায়ায় জড়াইবে। পত্র তা সে যত মূল্যবানই হোক পাঠ সমাপ্ত মাত্র কুচি কুচি করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিবে। চেষ্টা করিবে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে।

আমি বাবার উপদেশমতো ফরিদার চিঠি কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম। দক্ষিণের মৌসুমী বায়ুর কারণে চিঠির কুচিগুলো কিছুক্ষণ হাওয়ায় উড়ল। যে-কোনো উড়ন্ত জিনিসই দেখতে ভালো লাগে । আমার মনে কিছুক্ষণের জন্যে ভালো লাগার বোধ তৈরি হলো। ভালো লাগার বোধ তৈরি হলেই ভালো মানুষদের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করে। মাজেদা খালার বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। যোগাযোগের মাধ্যম টেলিফোন। ঠিক করলাম খালু সাহেব টেলিফোন ধরলেই গলা মোটা করে বলব— আচ্ছা এটা কি মোহাম্মদপুর দমকল বাহিনী ? এই মুহূর্তে আমার একটা দমকল দরকার।

টেলিফোন ধরলেন খালা। আমি কিছু বলার আগেই খালা বললেন, হিমু না কি ?

আমি বললাম, বুঝলে কী করে, আমি তো এখনো হ্যালো বলি নি ।

খালা বললেন, খুব প্রিয় কেউ টেলিফোন করলে বোঝা যায়। টেলিফোনের রিং অন্যরকম করে বাজে ।

খালু সাহেব কেমন আছেন ?

ভালো।

কথা বলে যাচ্ছেন তো?

সারাক্ষণই কথা বলছে। বিরক্ত করে মারছে। অনেকদিন কথা বলতে পারে নি, এখন পুষিয়ে নিচ্ছে।

মাথায় চুল উঠেছে ?

উঠেছিল। নাপিত ডাকিয়ে আবার পুরো মাথা কামিয়েছে।

কেন?

জানি না কেন। তবে সে সুখে আছে।

খালা আনন্দের হাসি হাসলেন। আমি বললাম, অসুখ সেরে যাওয়ায় খালু সাহেব নিশ্চয়ই খুশি ।

খুশি তো বটেই। তোর উপর কেন জানি খুবই নারাজ। আমি তোর খালুকে বললাম, বেচারা হিমু এত কষ্ট করে চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে ভালো করেছে। তুমি কেন তার উপর নারাজ ?

তার উত্তরে খালু সাহেব কী বলেছেন ?

সে চিৎকার করে বলেছে- শাটআপ । তোর নামই সে শুনতে পারে না। নাম শুনলেই চিৎকার চোঁচামেচি করে। আচ্ছা হিমু, ঐ মহিলা পীর কী চিকিৎসা করেছিলেন বল তো ?

শুনে কী করবে ? বাদ দাও। চিকিৎসায় ফল হয়েছে- এটাই আসল কথা ।

অবশ্যই ।

মনে করা যাক চিকিৎসা হিসেবে সে গু খাইয়ে দিয়েছে। তখন ধরতে হবে গু হলো কোরামিন ইনজেকশন। ঠিক না খালা ?

অবশ্যই ঠিক ।

খালা, কথা শেষ, টেলিফোন রাখি।

খালা টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন, না না খবরদার। আমি আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার কী হয়েছে কে জানে, দুনিয়ার কথা টেলিফোনে বলি, আসল কথা বলতে ভুলে যাই।

আসল কথাটা তাড়াতাড়ি বলো। নয়তো আবার ভুলে যাবে।

আসমা তোকে খুঁজছে। পাগলের মতো খুঁজছে।

উনি যখন খোঁজেন পাগলের মতো খোঁজেন। এটা নতুন কিছু না।

এইবার সত্যি সত্যি পাগলের মতো খুঁজছে। আমার মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে।

@@

মিসেস আসমা হক পিএইচডি আমার সামনে বসে আছেন। আসমা হকের পাশে তাঁর স্বামী। আমি ভদ্রলোকের নাম জানি ফজলুল আলম। তবে আসমা হক তাকে ডাকছেন 'চার্লি' নামে । ভদ্রলোকের মধ্যে আমি কোনো চার্লি ভাব দেখছি না। উনাকে সিরিয়াস ধরনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। চার্লি নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের নাম না । মনে হচ্ছে এটা আসমা হকের দেয়া আদরের নাম । এখন হুট করে আমি যদি বলি — কেমন আছেন চার্লি ভাই- উনি রেগে যেতে পারেন। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তার ভেতর চাপা রাগ আছে। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি টাইপ পুরুষ। অনেকদিন পর পর হঠাৎ করে লাভা বের হয়ে আসে ।

হোটেলের পরিবেশ সংবাদপত্রের ভাষায়- অস্বস্তিকর । চার্লি সাহেব ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছেন। পাতা উল্টানোর ফাঁকে ফাঁকে আমাকে দেখছেন। যতবারই দেখছেন ততবারই তার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। মুখ যদিও হাসি হাসি। আমি যখন বললাম, কেমন আছেন স্যার ? তিনি তার উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনি ভালো আছেন তো ?

যেসব মানুষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে তাদের বিষয়ে সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়। আসমা হক বললেন, চার্লি তুমি বোধহয় উনাকে চিনতে পার নি।

ভদ্রলোক বললেন, চিনতে পারার কথা নয়। ইনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হয় নি। তবে টেলিফোনে কথা হয়েছে।

আসমা হক বললেন, এর নাম হিমু। ইমরুলকে ইনিই এনে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, ও আচ্ছা, আপনিই সেই এজেন্ট ! শিশুটিকে আমাদের পছন্দ

হয়েছে। আপনি অতি দ্রুত এডপসন পেপারস রেডি করুন। আমরা আর বেশিদিন থাকব না। এক মাস আঠারো দিন থাকা হয়ে গেছে। এডপসান পেপারস রেডি করতে কতদিন লাগবে ?

এক সপ্তাহ ।

আরো তাড়াতাড়ি করার ব্যবস্থা করুন। শুনেছি। এ দেশে টাকা দিয়ে সব কিছু করানো যায়। টাকা ঢালুন।

জি আচ্ছা ঢালব ।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক রোগে যাচ্ছেন। তিনি যে রেগে যাচ্ছেন তা নিজেও বুঝতে পারছেন। অবশ্যই এটা একটা মহৎ গুণ। বেশির ভাগ মানুষই রেগে যাবার সময় বুঝতে পারে না সে রেগে যাচ্ছে। ভদ্রলোক পত্রিকার পাতা অতি দ্রুত উল্টে রাগ কমানোর চেষ্টা করছেন। এই পদ্ধতিতে রাগ কমবে না। রাগের সঙ্গে বিরক্তি যোগ হবে। কারণ ছাড়া বইয়ের পাতা উল্টানো বিরক্তিকর ব্যাপার।

ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। তিনি কি ইমরুলকে দত্তক নিতে চাচ্ছেন না ? স্ত্রীর চাপে পড়ে রাজি হয়েছেন ?

আসমা হক বললেন, চার্লি, তুমি কি একটা কাজ করবে ? হোটেলের লবিতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবে ? আমি হিমু সাহেবের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলব ।

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হলো না । হঠাৎ পত্রিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রেখে কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পৃথিবীর কোনো দেশ নেই যেখানে ট্রাফিক লাইট থাকার পরেও ট্রাফিক পুলিশ আছে। কেন বলুন তো ? ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলছে না সবুজবাতি জ্বলছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে ট্রাফিক পুলিশের দিকে। হোয়াই ?

আমি বললাম, বাংলাদেশের মানুষ যন্ত্রে বিশ্বাস করে না। মানুষে বিশ্বাস করে। যন্ত্র সবুজবাতি জ্বালিয়ে যেতে বললেই আমি কেন যাব ? একজন মানুষ বলুক।

আপনি কত হাস্যকর একটা যুক্তি দিয়েছেন তা কি জানেন ?

জি জানি।

যে জাতি যন্ত্র বিশ্বাস করে না সেই জাতির ভবিষ্যৎ কী তা জানেন ?

ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হবার কথা।

ভদ্রলোকের চোখ ধক করে উঠল। মনে হচ্ছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে। আসমা হক গলা কঠিন করে বললেন, চার্লি, তুমি কি তোমার ম্যাগাজিনটা নিয়ে লবিতে কিছুক্ষণ বসবে ? হিমুর সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে ।

আমিও কিন্তু জরুরি কথা বলছি।

না, তুমি জরুরি কথা বলছি না। তুমি রাগ করার মতো অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করছ ।

ভদ্রলোক ম্যাগাজিন ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ম্যাগাজিন হাতে নিলেন। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আসমা হক বিরক্ত গলায় বললেন, কী হলো ?

তিনি বললেন, লবিতে যাচ্ছি। তোমাদের কথাবার্তা শেষ হলে আমাকে ডেকে নিও।

আসমা হক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চার্লি অনিয়ম সহ্য করতে পারে না।

অনিয়ম দেখলেই রেগে যায়। হিমু, আপনি চা-কফি কিছু খাবেন ?

না।

আপনার খালা বলছিলেন, আপনার সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার মারাত্মক, অনেকবার আপনি আপনার এই ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন । এটা কি সত্যি ?

না, একেবারেই সত্যি না। সুপারম্যানরা থাকে কমিকের বই-এ, পৃথিবীতে ৎ65 ।
।

আমার তো ধারণা আপনার খালার কথা সত্যি । আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি শেষপর্যন্ত কোনো শিশু দত্তক নেব না, কারণ আমার নিজেরই সন্তান হবে ।

হ্যাঁ, একটা মেয়ে হবে।

মেয়ে হবার কথা বলেন নি।

আসলে ভুলে গেছি কী বলেছিলাম।

আসমা হক বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গত আঠারো বছর ধরে আমি আর আমার স্বামী সন্তানের জন্যে এমন কোনো চেষ্টা নেই যা করি নি। এমন কোনো চিকিৎসা নেই যা করাই নি। একবার পত্রিকায় পড়লাম নিউজিল্যান্ডের মুর আদিবাসীরা নিঃসন্তান দম্পতিকে কী এক আরক খেতে দেয়, তাতে সন্তান লাভ হয়। আমি নিউজিল্যান্ডের আরকও খেয়েছি ।

আরকটা খেতে কেমন ছিল ?

আসমা হক বিরক্ত গলায় বললেন, সস্তা রসিকতা আমার সঙ্গে করবেন না। আরক খেতে কেমন ছিল সেই আলাপ করবার জন্যে আপনাকে ডাকি নি।

কী জন্যে ডেকেছেন ?

ইমরুলকে দত্তক নেবার আমাদের আর প্রয়োজন নেই- এটা জানানোর জন্য।

আপনার স্বামী চার্লি সাহেব যে বললেন, এডপসান পেপারস রেডি করতে ?

সে এখনো কিছুই জানে না আমি যে কনসিভ করেছি। এটা তাকে জানানো হয় নি। শুধু আমি জানি, আমার গাইনোকালজিস্ট জানে আর আপনি জানেন।

আপনার স্বামীকে জানান নি কেন ?

আসমা হক বললেন, আমি ঠিক করে রেখেছিলাম এই অদ্ভুত আনন্দময় খবরটা প্রথম আপনাকে দেব। আপনাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই চার্লিকে খবরটা দেয়া হয় নি। আপনি চলে যাবার পর তাকে খবরটা দেব ।

আমি চলে যাই। তাড়াতাড়ি তাকে খবরটা দিন ।

আসমা হক বললেন, আমি আপনার জন্যে কিছু করতে চাই। আল্লাহ আমাকে যে উপহার পাঠিয়েছেন হয়তো তার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরেও আমি আপনার জন্যে কিছু করতে চাই। আপনি আমার কাছে কিছু একটা চান।

এখন চাইতে হবে ?

হ্যাঁ, এখন।

আসমা হকের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ, এখন চাইতে হবে।

আমি বললাম, ইমরুলের মা খুব অসুস্থ। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। অনেক টাকার ব্যাপার, হয়তো তাকে দেশের বাইরেও নিতে হতে পারে।

আসমা হক কঠিন গলায় বললেন, টাকা-পয়সার ফিরিস্তি দিতে তো আপনাকে বলি নি। আপনি আমার কাছে কী চান জানতে চাচ্ছি।

এইটাই চাচ্ছি।

নিজের জন্যে কিছু কি চাইবার আছে ?

আছে। কিন্তু সেটা আপনি পারবেন না।

অবশ্যই পারব। কেন পারব না ? বলুন কী চান ?

আমার খুব শখ চাঁদে যাওয়া। চাঁদ থেকে আমাদের পৃথিবীটা কেমন দেখায় সেটা দেখা। আমাকে চাঁদে পাঠাতে পারবেন ?

আসমা হক অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দুঃখিত গলায় বললেন, না, পারব না। আমার ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই আপনাকে চাঁদে পাঠাতাম ।

আমি এখন উঠি ? লবি থেকে আপনার স্বামীকে পাঠাচ্ছি। তাকে আনন্দের সংবাদটা দিন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আমি আপনার স্বামীকে একটু রাগিয়ে দিয়ে যাব।

আসমা হক বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মজা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আপনি কি সব সময় মজা করেন ?

না। করতে ইচ্ছা করে। করতে পারি না ।

আমি আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আপনি কি খারাপ ব্যবহারের কথাগুলি মনে রাখবেন ?

আপনি চাইলে মনে রাখব। আপনি কি চান ?

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। চোখ মুছতে লাগলেন। এই মহিলার মনে হয় কান্না রোগ আছে।

ফজলুল আলম সাহেব রাগীমুখে লবিতে চায়ের কাপ হাতে বসেছিলেন। আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন। আমি বললাম, এই চার্লি, তোমাকে তোমার বউ ডাকে। আজ তোমার খবর আছে। তোমাকে সে প্যাদানি দিবে।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। টপ করে শব্দ হলো । তার হাত থেকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কপিটা মেঝেতে পড়ে গেল।

@@

আমার বিছানার পাশে কে যেন বসে আছে। সূর্যের আলো ভালোমতো ফোটে নি। যে বসে আছে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তারপরেও চেনা চেনা লাগছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই লোকটাকে চিনে ফেলব। আমি তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মনে হলো এত কষ্ট করে চেনার কি কোনো প্রয়োজন আছে ? শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর পাতলা চাদর থাকায় আরামদায়ক ওম। চেনাচেনি বাদ দিয়ে আরো খানিকক্ষণ ঘুমানো যেতে পারে। বিছানার পাশে যে বসে আছে বসে থাকুক। ঘুম ভাঙার পর দিনের প্রথম আলোয় তার সঙ্গে পরিচয় হবে। দিনের প্রথম আলোয় বিভ্রম থাকে না । পরিচয়ের জন্যে বিভ্রমহীন আলোর কোনো বিকল্প নেই।

আমি চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিলাম। আমার মাথার ভেতর জটিল গবেষণামূলক আলোচনা আসি আসি করছে। তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আরাম করে কিছুক্ষণ ঘুমানো দরকার। ‘পৃথিবীতে সবচে’ সুখী মানুষ কে ?’ যার কাছে ঘুম আনন্দময় সে-ই পৃথিবীর সবচে’ সুখী মানুষ।' কথাটা কে বলেছেন ? বিখ্যাত কেউ নিশ্চয়ই বলেছেন। সাধারণ মানুষ যত ভালো কথাই বলুক কেউ তা বিবেচনার ভেতরও আনবে না। কথাটা বলতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজনকে।

পৃথিবীর সবচে’ সুখী মানুষের মতো আমি ঘুমালাম। ঘুম ভাঙার পরেও বিছানায় উঠে বসলাম না। ছোটবেলার মতো চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে রইলাম। আমার বিছানার পাশে বসে থাকা লোকটা এখনো আছে। তাকে এখনো চিনতে পারছি না। তবে চিনে ফেলব। সমস্যা হচ্ছে তাকে চিনতে ইচ্ছা! হচ্ছে না।

হিমু সাহেব!

জি।

মনে হচ্ছে আপনার ঘুম ভেঙেছে । আমি ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এসেছি। মুখ না ধুয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস কি আপনার আছে ?

আছে ।

এক কাপ চা কি দেব ?

দিতে পারেন ।

আমাকে কি আপনি চিনতে পেরেছেন ?

না।

আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিজেই আমাকে চিনতে পারছি না। আয়নার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে ভেবেছি— এ কে ? গত রাতে আমি গোঁফ ফেলে দিয়েছি। এতেই চেহারাটা অনেকখানি পাল্টে গেছে। তার উপর গায়ে দিয়েছি কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি। কড়া হলুদ রঙ যে আইডেনটিটি ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে তা জানতাম না।

ভদ্রলোক শরীর দুলিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। হাসি থামার পরেও আমার খাট দুলতে লাগল।

আমি চোখ মেলে ভদ্রলোককে দেখলাম। বিছানায় উঠে বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে গরম চা ভর্তি মগ ধরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি কে ?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার আসমা ম্যাডামের হাজবেন্ড। নাম ফজলুল আলম।

আপনি এখানে কেন ?

আমি ঠিক করেছি আজ সারাদিন আমি আপনার সঙ্গে থাকব। এই উপলক্ষে একটা হলুদ পাঞ্জাবি বানিয়েছি। আমি এসেছিও খালি পায়ে।

আমি কিছু বললাম না। চায়ে চুমুক দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, চাটা কি ভালো হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমি কি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকতে পারি ?

থাকতে চাচ্ছেন কেন ?

আপনি সারাদিনে কী কী করেন সেটা দেখার ইচ্ছা ।

আমি সারাদিনে কিছুই করি না।

আমি এই কিছুই করি না-টাই দেখব। ভালো কথা, আমি ইমরুল ছেলেটির মায়ের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছি। এই মহিলাকে তার স্বামী এবং সন্তানসহ দেশের বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি।

আমি কিছু না বলে আমার চায়ের মগ বাড়িয়ে দিলাম। চা খেতে খুবই ভালো হয়েছে। এই চা দু'তিন মগ খাওয়া যায়।

ভদ্রলোকের ধৈর্য ভালো । আমি তাঁকে নিয়ে সারাদিন হাঁটলাম । উদ্দেশ্যহীন হাঁটা । তিনি একবারও বললেন না, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

মতিঝিল এলাকায় একুশতলা বিল্ডিং-এর ফাউন্ডেশন হচ্ছে। আমি ভদ্রলোককে নিয়ে ঘণ্টাখানেক মাটি খোড়া দেখলাম। সেখান থেকে গেলাম নাটকপাড়া বেইলী রোডে। সেখানে একটা ফুচকার দোকানে রুপবতী সব মেয়েরা নানান ধরনের আহ্লাদ করতে করতে ফুচকা খায়। দেখতে ভালো লাগে।

ফুচকা খাওয়া দেখে গেলাম রমনা থানায়। এই থানার বারান্দায় কেরোসিনের চুলা পেতে ইদ্রিস নামের এক ছেলে চা বানায় । তার চা হলো অসাধারণ টু দা পাওয়ার টেন। আসমা ম্যাডামের হাজবেন্ডকে এই চা খাইয়ে দেয়া দরকার। থানার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, হিমু না ?

আমি বললাম, জি ।

আপনাকে আমি বলেছি থানার ত্রিসীমানায় যদি আপনাকে দেখি তাহলে খবর আছে। আমি আপনাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেব।

চা খেতে এসেছি। স্যার । ইদ্রিসের চা । চা খেয়েই চলে যাব। প্রমিস ।

থানার ভেতর চা খাওয়া যাবে না। এটা কোনো রেস্টুরেন্ট না। কাপ হাতে নিয়ে রাস্তায় চলে যান। এক্ষুণি । এক্ষুণি ।

আমরা কাপ হাতে রাস্তায় চলে গেলাম। চা শেষ করে গেলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই সময় সেখানে নানান ধরনের মানুষের সমাগম হয়। ওদের দেখতে ভালো লাগে। পার্কের একটি অংশে আসে হিজড়ারা। তারা আসে পুরুষের বেশে। এখানে এসে নিজেদের নারী করার চেষ্টা করে। ঠোঁটে কড়া করে লিপষ্টিক দেয়। নারিকেলের মালার কাচুলি পরে। মুখে লজা লজ্জা ভাব এনে একজন আরেকজনের চোখে কাজল দিয়ে দেয়। এদের সবার সঙ্গেই আমার খুব খাতির। আমাদের দু'জনকে দেখে তারা খুশি হলো ।

একজন আনন্দিত গলায় বলল, কেমন আছেন গো হিমু ভাইজান?

ভালো আছি।

সাথে কে ?

জানি না। আমার সাথে কে ? আমি নিজেকেই চিনি না। অন্যকে চিনব কীভাবে ?

আমার কথায় তাদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। তারা খুবই মজা পেল।

সন্ধ্যার আগে আগে আমি ফজলুল আলম সাহেবকে নিয়ে গেলাম বুড়িগঙ্গায় চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে। রোজ সন্ধ্যায় সেখানে একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হন। তার উদ্দেশ্য সেতু থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়বেন। আত্মহত্যা করবেন। শেষপর্যন্ত সাহসের অভাবে কাজটা করতে পারেন না। বাড়িতে ফিরে যান। পরদিন আবার আসেন। ইনার সঙ্গে কথা বললে ফজলুল আলম সাহেবের মজা পাওয়ার কথা। চারদিকে এতসব মজার উপকরণ ছড়ানো।

পাওয়া গেল না। হয় তিনি আত্মহত্যা করে ফেলেছেন কিংবা আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন। এখন এই সময়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের গরম সিঙ্গাড়া দিয়ে চা খাচ্ছেন।

হিমু সাহেব!

জি।

দিন তো শেষ হয়ে এলো। আপনি আমার এবং আমার স্ত্রীর জন্যে যা করেছেন তার জন্যে 'Thank You'- এই ইংরেজি বাক্যটা বলতে চাই। কখন বললে ভালো হয় ?

সবচে' ভালো হয়। সূর্য ডোবার সময় বললে।

তিনি সূর্য ডোবার বিশেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি অপেক্ষা করছি... । থাক বলব না কিসের অপেক্ষা করছি। ভর সন্ধ্যায় যখন চারদিকে হাহাকার ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে তখন ব্যক্তিগত অপেক্ষার কথা বলতে হয় না।

হিমু সাহেব!

জি ।

থ্যাংক য়্যু বাক্যটা ঠিকমতো বলতে পারছি না। কথাগুলি গলায় আটকে যাচ্ছে ।

আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আসুন চুপচাপ সূর্যস্ত দেখি।

আমি সূর্যস্ত দেখছি। ফজলুল আলম সাহেব দেখছেন না। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছেন। তারপরেও চোখের পানি আটকাতে পারছেন না। সূর্য ডোবার মাহেন্দ্রক্ষণে একবার কান্না পেয়ে গেলে সেই কান্না থামানো খুব কঠিন।

(সমাপ্ত)

একটি শুভম ক্রিয়েশন